

অষ্টাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা



বৈশাখ তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

স্ব. চ. প. প.

CVK-H01922-13-294016

ডঃ রঘুবীর ॥ গৌরান্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৭

নারী ॥ সম্বরণ রায় ২৬

বিলাত যাত্রার আদিপর্ব ॥ চণ্ডী লাহিড়ী ৩৫

বিশ্বত সীতানাথ বোষ ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৪

অখ্যতর নগর ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৫২

আলোচনা : মানবপ্রেমিক রাসেল ॥ স্বথরঞ্জন চক্রবর্তী ৫৫

সমালোচনা : বঙ্কিম অভিধান ॥ ভবতোষ দত্ত ৫৮

13

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্টোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী বোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আমাদের শক্তি শুধু ইম্পাভেই নয়,
মানুষেও। বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে শুধু খাওয়া
পরা নয়, তার সঙ্গে চাই গদীত, নৃত্য ও
অজ্ঞাত আনন্দের খোরাক। জামসেদপুরের
নাগরিক জীবনে তার সবরকম স্বযোগ
হবিধা আছে।

টাটা স্টীল



অষ্টাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা



জ্যৈষ্ঠ তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

স্ব স্ব পত্র

মানবতাবাদী রাসেলের বিজ্ঞান-চিন্তা ॥ অমিয়কুমার মজুমদার ৭৩

ভাষার আলোকে ছতোম প্যাচার নকশা ও হরিদাসের গুপ্তকথা ॥ নবেন্দু সেন ৮১

স্বথের আখড়াই ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৯৩

দেশ কাল সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভূমিকা ॥ রণজিৎকুমার সেন ১০০

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণনাত্মক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ১০৫

সমালোচনা : সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ ॥ তারাপদ পাল ১০৯

প্রথম মুখ ও আলোকিত অন্ধকারে ॥ নিখিলেশ্বর দাশগুপ্ত ১১১

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী বোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রলিপি ১

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত আঠারোটি চিত্রের সংকলন। ছয়টি ত্রিবর্ণ ও একটি চতুর্বর্ণ। কবির হস্তাক্ষরে লিখিত কবিতা ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ সংবলিত।

মূল্য ২০.০০

চিত্রলিপি ২

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পনেরোটি চিত্রের সংকলন। সাতটি ত্রিবর্ণ ও দুইটি চতুর্বর্ণ।

মূল্য ১৮.০০

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁর কবিমানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের আড়াই শতের অধিক বাংলা ও ইংরাজী কবিতাগুলি ইতিপূর্বে অগ্নি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি।

আপানী বাঁধাই, মূল্য ৪.০০, শোভন ১০.০০

ফুলিস

লেখনের সগোত্র আরও বহু কবিতা যা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও তাঁহার স্নেহভাজন আশীর্বাদ-প্রার্থীদের সংগ্রহে বিকিপ্ত ছিল, সেই ২৬০টি কবিতাসমষ্টির সংকলন 'ফুলিস'।

পরিবর্ধিত সংস্করণ।

মূল্য ৩.৫০, শোভন সংস্করণ ৫.৫০ টাকা

রূপান্তর

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী-নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রাবলী সংবলিত।

মূল্য ৭.০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

অষ্টাদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা



আষাঢ় ভৈরব' সাতাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সুচী পত্র

বাংলাদেশে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান ॥ দেবকুমার চক্রবর্তী ১২১

ভূগোলের উপেক্ষিতা ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ১২৭

তুর্কী আমলে বাংলাদেশ ॥ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৩১

জীবনানন্দের কবিতা ও সেলুলয়েড ॥ স্বথরঞ্জন চক্রবর্তী ১৩৬

লোকদেবতা ও লোকসাহিত্য ॥ অজিতকুমার মিত্র ১৪২

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণালীক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ১৫১

সমালোচনা : দীর্ঘশ্বাস মধ্যে স্মৃতিময় ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৫৯

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী বোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

৬৫ বছর ধরে জনপ্রিয়-
আজও সবার সেরা।

লিলি'র থিন এরোয়ট বিস্কুট



লিলি বিস্কুট কোম্পানি প্রাঃ লিঃ । কলিকাতা-৪

অষ্টাদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা



শ্রাবণ তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সুচী পত্র

মিউজিয়ামের রূপকল্পনার ইতিহাস ॥ তারাপদ সঁাতরা ১৬৯

পেঙ্গুর আদিম ইতিহাস ॥ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৭

জীবনী ও আত্মজীবনী ॥ মানসী দাশগুপ্ত ১৮৫

অন্য দৃষ্টিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯১

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণালীক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ১৯৪

আলোচনা : আশ্রমিক সংঘের রবীন্দ্রনাট্যোৎসব ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ১৯৮

সমালোচনা : সাহিত্যে শালীনতা ও অগ্রাগ্র প্রবন্ধ ॥ তারাপদ পাল ২০১

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হাইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হাইতে প্রকাশিত

বৈচিত্র্যের

মাধ্যম একা...



দূরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত করে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম করে যে আর্থিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

চাক্র ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও



পূর্ব রেলওয়ে



অষ্টাদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা



আশ্বিন ভৈরব' সাতাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সুচী পত্র

গদ্যধর কবিরাজ ॥ গৌরান্দগোপাল সেনগুপ্ত ২৮১

জন কোম্পানীর এক অখ্যাত বাঙালী কর্মচারী—রামচন্দ্র ॥ নারায়ণ দত্ত ২৮৯

রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ-পাঠক এগুরুজ ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু ২৯৭

আত্মজিজ্ঞাসা ॥ মানসী দাশগুপ্ত ৩০৩

পুষ্পপট্ট ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৩০৯

‘পরধনে লোভে মত্ত’ রাম শর্মা ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩১২

সমালোচনা : দুর্লভ এক খেলায় আমি ॥ ইন্দ্রনীল সেন ৩১৭

পরিবার পরিকল্পনা ক্রোড়পত্র : বিংশ শতাব্দীর একটি সমস্যা ॥ কে কে শাহ ৩১৯

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

Sri Annapurna Cotton Mills Ltd.

Regtd Office

P10. New Howrah Bridge

Approach Road

CALCUTTA - 1

Telegram

Accelerate, Calcutta

Phone :

34-2474 & 34-9640

Founder

LATE GIRIJAPRASANNA CHAKRAVARTI

Manufacturers of :

Hank Yarn : From 2's to 100's Count.

Hosiery Yarn : From 20's to 50's & 2/80's Mercerised.

Grey Cloth Fabric : Medium, Fine, Superfine.

Exports :

All fabrics produced out of Automatic Looms to

U. S. A., U K., Germany and Indonesia.

Spindles : 26,904

Looms : 300

Factory :

SHAMNAGAR, 24 PARGANAS.

Phone : Bhat. 109.

অষ্টাদশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা



কার্তিক তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচী পত্র

প্রাচীন রোম ও মিউজিয়মের রূপকল্পনা ॥ তারাপদ সাত্তরা ৩৪৫

লোকশ্রুতির সংস্কৃতি বিশ্লেষণ ॥ গৌরাচাঁদ কুণ্ড ৩৫১

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও বহ্মিমচন্দ্র ॥ বৈজনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৬৮

ভারতের চিরায়ত নৃত্য ॥ স্বভদ্রা অধিকারী প্রামাণিক ৩৭৩

বহ্মিম উপন্যাসের বর্ণাহুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৩৮১

সমালোচনা : সন্নিহিত কোণ ॥ শোভন গুপ্ত ৩৮৩

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হাইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হাইতে প্রকাশিত

Instant Building

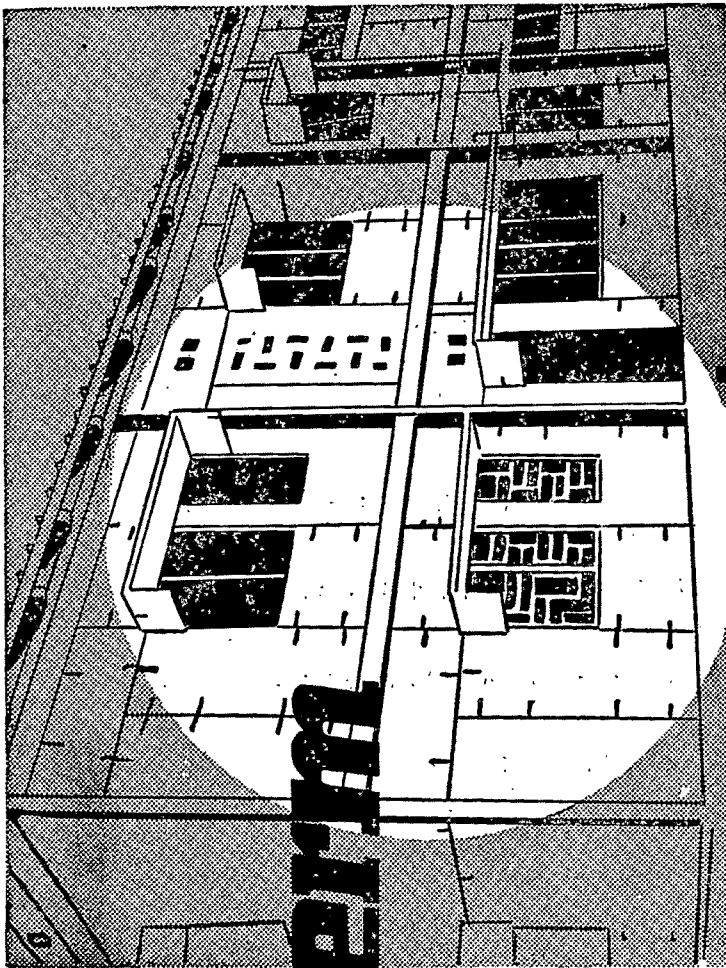
with

Unitherm

The Government are now set on a programme of speeding up erection of low cost pre-fabricated houses. The shortage of bricks in many places and their cost have made it necessary to evolve special material. UNITHERM re-inforced wall slabs, which have been just designed for this purpose, are now accepted as the ideal material for pre-fabricated buildings. It is possible to design and erect a complete building with UNITHERM.

For the armed forces or for civilians, on the plains or in mountainous terrain, UNITHERM re-inforced wall slabs now provide the answer.

UNITHERM re-inforced wall slabs are provided with a special interlocking system to make a perfect, rigid wall. Slabs are grooved during manufacture for interlocking. To provide water proofing and ensure protection against climatic changes, the slabs should be plastered after erection or laminated at the time of manufacture. • Patent pending



And UNITHERM offers numerous other advantages—lightness of weight (so easy to transport), ease and speed of installation, rugged strength, thermal insulation and real economy. It can be put to many uses—including partitions and false ceilings. Available in any size to the specification of Architects, Engineers and Contractors.

Unitherm

Re-inforced wall slabs
for pre-fabricated buildings

Contact the manufacturers for detailed information:

CHAUDRI & COMPANY

4, Bankshall Street, Calcutta-1 Phone : 23-9811 Grams : Auldhard Telex : 021-7774

অষ্টাদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা



অগ্রহায়ণ তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সু ঘি পত্র

ডঃ শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকর ॥ গৌরঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩৯৫

মালিনী ও রবীন্দ্রনাটে গ্রীক প্রভাব প্রসঙ্গ ॥ পুলিন দাশ ৪০১

তিন প্রেমের কবিতা ॥ শকুন্তলা দেবী ৪১৬

অতন্ত্র সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেন ॥ স্বথরঞ্জন চক্রবর্তী ৪২৫

আলোচনা : প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যসংকলন ॥ বিদ্যুৎ মৈত্র ৪২৯

সমালোচনা : এপার বাংলা ওপার বাংলা ॥ অধীর দে ৪৩২

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত



মানদে
উজবে...

આગતિક પ્રયોજન..

ਸਵਾਸ ਮਲਾਵਭਲ...

প্রবিনীসবসনীয
কিনতেন

কম্বাউন

[illegible]

অষ্টাদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা



পৌষ তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সুচী পত্র

কীটসের কবিসত্তা ও মৌল্যবোধ ॥ স্বরত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩৯

আচার্য যত্ননাথ সরকার ॥ গৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত ৪৪৩

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মায়াবানন' ॥ স্বরেশপ্রসাদ নিয়োগী ৪৫৫

কথকের কথকতা ॥ সুভদ্রা প্রামাণিক ৪৭১

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণাঙ্কমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৪৭৩

সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি ॥ মনয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ৪৭৭

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

দেয় করের মিথ্যা হিসেব দিচ্ছেন !

এর পরিণাম কি জানেন ?

সাবধান ! দেয় করের মিথ্যা হিসেব দেওয়া আর কর, সম্পত্তি কর ও দান কর আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। যা গোপন রেখেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পকেট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

আয়কর আইনে ন্যূনতম অর্থদণ্ডের পরিমাণ, গোপন করা সম্পত্তির সমান এবং সর্বাধিক অর্থদণ্ড তার দ্বিগুণ। তার ওপর আবার মামলার অভিযুক্ত হবার আশঙ্কা আছে। অভিযুক্ত হলে অন্ততঃ ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড তো বাটেই, ক্ষেত্র বিশেষে, দণ্ডের মেয়াদ দু বছর পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে।

তেমনি সম্পত্তি কর আইনে, সম্পত্তি কর ফাঁকির শাস্তিও কঠোর। ন্যূনতম অর্থদণ্ডের পরিমাণ, গোপন সম্পত্তির সমান অথবা সম্পত্তির যে পরিমাণ গোপন করা হয়েছে কিংবা ঋণের যে মাত্রা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে তার সমান ধার্য। এই অর্থদণ্ড, গোপন করা সম্পত্তির দ্বিগুণ পরিমাণেও দাঁড়াতে পারে। এছাড়া মামলার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শাস্তি হলে, সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ ছ'মাস থেকে দু বছর গড়াতে পারে।

কোনও দান সম্বন্ধে ভুল তথ্য দেওয়ার শাস্তি হ'ল, সেই তথ্যের ভিত্তিতে যে পরিমাণ কর এড়ানো যেতে পারত, তার ন্যূন পক্ষে শতকরা কুড়ি ভাগ অন্যথায় দেড়গুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড দেওয়া। এছাড়াও এর জন্য আপনাকে অভিযুক্ত করা হতে পারে। অপরাধী সাব্যস্ত হলে, এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটি দণ্ডই ভোগ করতে হবে।

**মনে রাখবেন
কর ফাঁকি দেওয়া
একটা অপরাধ**

গোড়ায় যে করের দেয় হিসেব দেখিয়েছেন তাতে কোনোও ভুল থেকে থাকলে সংশোধিত হিসেব একটা দিয়ে দিন না—তাহলে তো ব্যাপারটা চাউর হবে না।

প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় গণক

(রাজস্ব ও বীমা বিভাগ)

অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার

অষ্টাদশ বর্ষ ০১ম সংখ্যা



মাঘ তেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সুচী পত্র

মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা ॥ গৌরানন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৪৮৭

লোকগীতি ও শ্রীকৃষ্ণ ॥ গুরুপ্রসাদ রায় ৪৯৩

দীনবন্ধু এগুজ ও অত্যাচারিত পঞ্জাব ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু ৫০০

স্বপ্রাচীন বঙ্গভাষার কল্পিত রূপ ॥ রামপ্রসাদ মজুমদার ৫০৬

আদিত্য—মধু ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৫১৬

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণনাত্মক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৫২০

আলোচনা : কবিনট জয়দেব ও নটী পদ্মাবতী ॥ বিদ্যায় মৈত্র ৫২১

সমালোচনা : সংগীতে হৃন্দর ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৫২৪

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মার্গ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হাইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হাইতে প্রকাশিত

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল!



S Ph. 2/67

মেয়েদের
ত্বক-সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।



প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য
কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব, যৌবন স্থলভ, লাভণ্যময় ত্বক—
এইতো সাধনা বিউটি ক্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান
সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
কলিকাতা কেন্দ্র:

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য

অষ্টাদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা



ফাল্গুন তেরশ' সাতাত্তর



সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

স্ব স্ব পত্র

অলঙ্কার কথা ॥ ভোলানাথ ভট্টাচার্য ৫৩৫

একটি হারানো প্রথা : একটি হারানো গান ॥ অজিতকুমার মিত্র ৫৪২

বিভাগসাগরের অপ্ৰকাশিত পত্রাবলী ॥ স্বরেশপ্রসাদ নিয়োগী ৫৫১

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৫৬২

আলোচনা : দীনবন্ধু শতবার্ষিকী ॥ সব্যসাচী গুপ্ত ৫৬৯

সমালোচনা : বিভাগসাগর ॥ ভবতোষ দত্ত ৫৭১

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

Statement in Form IV of the Registration of News Papers (Central) Rules, 1956.

S A M A K A L I N

- | | |
|---|---|
| 1. Place of Publication | Calcutta. |
| 2. Periodicity of its Publication | Monthly. |
| 3. Printer's Name | Anandagopal Sengupta. |
| Nationality | Indian. |
| Address | 24, Chowringhee Road, Calcutta. |
| 4. Publisher's Name | Anandagopal Sengupta. |
| Nationality | Indian. |
| Address | 24, Chowringhee Road, Calcutta. |
| 5. Editor's Name | Anandagopal Sengupta. |
| Nationality | Indian. |
| Address | 24, Chowringhee Road, Calcutta. |
| 6. Name and address of individuals who own the newspaper and partner or shareholders holding more than one per cent of the total capital. | Anandagopal Sengupta.
Proprietor.
24, Chowringhee Road.
Calcutta-13. |

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) A. G. SENGUPTA.

Dated, 1st March, 1971.

Signature of Publisher.

অষ্টাদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা



চৈব ভেরশ' সাতাত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সুচী

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ॥ গৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত ৫৭২

বিভাগাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ স্বরেশপ্রসাদ নিয়োগী ৫৮২

বঙ্গ-ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের স্থান ॥ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬০০

পল্লী-সংগঠন ও রবীন্দ্রনাথ ॥ অমিয়কিশোর মণ্ডল ৬০৭

বঙ্গিম উপন্যাসের বর্ণনাত্মক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৬১৩

আলোচনা : অতুলপ্রসাদের গান ॥ শৈলেশ ভট্ট ৬১৬

সমালোচনা : কখনো মুহূর্তের আলো ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ৬১৮

বার্ষিক সূচী (মে ১৯৭০—এপ্রিল ১৯৭১) ৬১৯

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মজার ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

চড়া সুদ
চান?

বছরে

৭ বছরের

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৭৫ ইস্যু)

সঞ্চয়ের একটি উত্তম প্রস্তাব।

করমুক্ত সিকিউরিটি এবং অন্যান্য জমায় সুদ সমেত
3000 পর্যন্ত সুদের টাকায় কর দিতে হবে না।

বিশদ বিবরণীর জন্যে আপনার বাড়ীর কাছের পোস্ট
অফিসে খোঁজ নিন।

জা তী য় স ণ্ য় স ঙ্ গ্ য়



ডঃ রঘুবীর

গৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত

অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের রাওলপিণ্ডি শহরে এক সংগতিপন্ন বৈষ্ণব পরিবারে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর রঘুবীরের জন্ম হয়। ইহার পিতা শ্রীমন্সীরাম রাওলপিণ্ডির একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রঘুবীর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। লাহোরস্থিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ উপাধিলাভ করিয়া রঘুবীর কিছুকাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক ছাত্ররূপে নিযুক্ত থাকেন। পরে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভার্থে নেদারল্যান্ডের (হল্যান্ড) উত্রেচ্ট (utrecht) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। উত্রেচ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের একটি প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র। বৈদিক সাহিত্য ও সূত্র বিশেষজ্ঞ ডাচ পণ্ডিত ডঃ উইলেম কালাণ্ড (Dr. Willem Caland, 1859—1932) স্তরীক্ষকাল যাবৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিজ্ঞা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন (১৯০৩—২৯)। পণ্ডিত কালাণ্ডের অধীনে “বরাহ সূত্রসূত্র” সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রঘুবীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ছাত্ররূপে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও যোগদান করেন এবং কপিষ্টল কঠ সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট উপাধি অর্জন করেন।

ইউরোপে অধ্যয়নান্তর রঘুবীর লাহোরের সনাতন ধর্ম কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন এবং অল্পদিন পরেই ইহার বিভাগীয় প্রধানাধ্যাপক হন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রঘুবীর ভারত বিদ্যাচর্চার জ্ঞান লাহোরে নিজের পরিচালনায় একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন (International Academy of Indian Culture)। ইহার ভারতীয় নাম হয়—“সরস্বতী—বিহার” এই গবেষণা কেন্দ্রের বহু বিস্তৃত কার্য পরিচালনার জ্ঞান তিনি কিছুদিন পর

কলেজের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চা করিতে থাকেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশ বিভাগের পর রঘুবীর তাঁহার গবেষণা কেন্দ্রসহ তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে স্থানান্তরিত হন। এই প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর গুরু ডাঃ রঘুবীরকে তাঁহার সারস্বত সাধনায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে নাগপুর হইতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে স্থানান্তরিত হইলে ডাঃ রঘুবীরের গবেষণা কেন্দ্রটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ডাঃ রঘুবীর ও তাঁহার স্ত্রীগণ্য পুত্র ডাঃ লোকেশ চন্দ্রের প্রযত্নে নাগপুরে অবস্থিতি কালেই International Academy or Indian Culture জগতের মধ্যে একটি প্রমুখ ভারত বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ইহার কর্মসূচি বিস্তৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠাও দৃঢ়ীভূত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি স্বপণ্ডিত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং বিদ্যোৎসাহী প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আত্মকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। ডাঃ রঘুবীর জীবনান্ত কাল পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক ভারত বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র “সরস্বতী বিহার” পরিচালন করেন। নয়া দিল্লী হইতে কুতুব মিনার যাইবার পথে “হাউসখাম্” নামক অঞ্চলে অবস্থিত “সরস্বতী বিহার” বর্তমান দিল্লীর অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান।

ডাঃ রঘুবীরের আজীবন সারস্বত সাধনা সাধারণভাবে তিন ধারায় চিহ্নিত করা যায়। প্রথমেই তাঁহার সংস্কৃত সাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তরুণ বয়সেই রঘুবীর বৈদিক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। হল্যাণ্ডে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদ-বিদ বিশেষতঃ কর্মকাণ্ড বিশারদ ডাঃ কালাণ্ডের শিক্ষাগুণে তিনি বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “বরাহগৃহ সূত্র” গ্রন্থের একটি সঠিক সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (লাহোর)। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় “বরাহ শ্রৌত সূত্র” প্রকাশিত হয় (লাহোর); এই পুস্তকটির সম্পাদনায় রঘুবীর শিক্ষাগুরু ডাঃ কালাণ্ডের সহযোগিতা লাভ করেন; দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পুস্তকটি প্রকাশের পূর্বেই কালাণ্ড পরলোক গমন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কপিষ্টল কাঠক সংহিতার সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ ডাঃ রঘুবীরের সম্পাদনায় লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯০০-১০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত L. Von. Schreder (1851—1920) কর্তৃক সম্পাদিত সমগ্র কাঠক সংহিতার সংস্করণ প্রকাশের পর কাঠক সংহিতা সম্পর্কিত লব্ধ গবেষণার ফলগুলি এই গ্রন্থ সম্পাদনায় ডাঃ রঘুবীর কর্তৃক স্বীয় মতামত সহসন্নিবিষ্ট হয়। ইহাতে ষজুর্বেদীয় কাঠক সংহিতা চর্চার দ্বার বিদ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্য সংক্রান্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিও রঘুবীর বিপুল পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন—সামবেদীয় জৈমিনীর সংহিতা (লাহোর, ১৯৩৮); সামবেদীয় জৈমিনীর ব্রাহ্মণ (লাহোর, ১৯৩৭); অথর্ববেদ (পৈপ্পলাদীয়, ৩খণ্ড, লাহোর, ১৯৩৬—৪১)। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদীয় শাখার কোন পুঁথি না পাওয়ার রঘুবীর জার্মেনী হইতে পুঁথির অনুলিপি সংগ্রহ করিয়া সর্বপ্রথম উহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। (মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্যের চেষ্টায় ওড়িশা হইতে পৈপ্পলাদ শাখার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ও উহা এ যাবৎ আংশিকভাবে উক্ত পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে)।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের একটি স্মৃতিসংস্করণ ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর হইতে ডঃ রঘুবীর সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন, এই সংস্করণটি নবাবিস্কৃত পুঁথিসমূহের ভিত্তিতে ডঃ লোকেশচন্দ্রের সহায়তায় সম্পাদিত হয়। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের এইটিই যে সর্বোত্তম সংস্করণ এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতবৈধতা নাই। দুপ্রাপ্য বৈদিক গ্রন্থাদি স্মৃতি সম্পাদন ও প্রকাশ দ্বারা রঘুবীর ভারতে বেদচর্চার পথ স্ফূর্ত করিয়া দেন ইহা তাঁহার জীবনের এক বিরাট কীর্তি। স্মৃতি মন্ত্রণের জ্ঞান তিনি লাহোর, নাগপুর ও দিল্লীতে স্বগ্রহেও মুদ্রাস্থ স্থাপন করেন, তাঁহার পুস্তকাবলী তাঁহার নিজস্ব প্রেসে নিজ তত্ত্বাবধানেই মুদ্রিত হয়। লাহোরে অবস্থানকালে তিনি Journal of vedic Studies (1934—35) নামে একটি সাময়িক পত্রও প্রকাশ করেন, ইহাতেও তাঁহার ও অগ্রাগ্র বিখ-বিশ্রুত পণ্ডিতদের অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পুনা ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের কাজ অর্ধশতাব্দীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় সম্প্রতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্করণটির একটি বিরাট পর্ব (বিরাট পর্ব) ডঃ রঘুবীরের স্বযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বদেশ ও বিদেশের বিদ্বৎসংস্থাগুলির পত্রিকাতেও রঘুবীর লিখিত সংস্কৃত বিশেষতঃ বৈদেশিক শাস্ত্র সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের নাম উল্লেখযোগ্য।

ডঃ রঘুবীরের সাধনার দ্বিতীয় ধারা ছিল ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে অতীতকালে ভারতসভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুসন্ধান। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন তিনি হল্যান্ডের বিজ্ঞানীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ডাচ পণ্ডিতেরা ইন্দোনেশিয়ায় (সবদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা) হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণায় রত ছিলেন, কারণ এই দ্বীপগুলি তখন ডাচদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এদিকে ফরাসী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের অধীন শ্রাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের অতীত ইতিহাসে ভারতীয় প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই বৈদিক পণ্ডিত ও গবেষক ডঃ রঘুবীরের দৃষ্টি বৃহত্তর ভারত সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে ফরাসী দেশে ডঃ সিলভা লেভির (১৮৬৩—১৯৩৫) সহিত পরিচয় হওয়ায় ভারত সভ্যতার দিক্‌জয়ের প্রাচীন উপকরণসমূহ অনুসন্ধান, আহরণ ও প্রচারের ব্যাপারে রঘুবীর বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

এই অনুপ্রেরণা লইয়াই ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তিনি International Academy of Indian Culture প্রতিষ্ঠা করেন ও পরবর্তীকালে তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে “শত-পিটক” আখ্যায় এক শতটি পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই পুস্তকমালায় ভারতবর্ষ ও ভারত সভ্যতার দ্বারা গৃহীত অগ্রাগ্র দেশগুলি হইতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এশিয়া মহাদেশের সভ্যতা বিস্তারে ভারতবর্ষের যে বিপুল পরিমাণ দান রহিয়াছে তাহার সম্যক অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থার জ্ঞান রঘুবীর এই শতাব্দীর পঞ্চদশকে চীন মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া (U. S. S. R.) জাভা, সুমাত্রা, বালি, ব্রহ্মদেশ, মালয়, কম্বোজ, শ্রাম, সিংহল প্রভৃতি দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করেন। কোন কোন যাত্রায় তিনি সপরিবারেও ভ্রমণ করেন এবং অনুসন্ধান কার্যে তাহার বিদূষী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূরও সহায়তা লাভ করেন। সমগ্র পরিবার

গৃহকর্তার আদর্শে আত্মনিবেদিত এমন দৃষ্টান্ত ডঃ রঘুবীরে পরিবারেই দেখা গিয়াছে। এই সকল অভিযানকালে ডঃ রঘুবীর ও পরিবারবর্গ তওড় দেশেরও ভাষা ও বর্তমান সংস্কৃতিও আয়ত্ত করিয়া লইতেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রঘুবীর ইন্দোনেশিয়া হইতে তালপত্রে লিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি ও অগ্রাঙ্ক পুঁথির ফটো কপি লইয়া আসেন। চীন হইতে তিনি ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, জীবনী, ব্যাকরণ, চিকিৎসা, তন্ত্র, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় তিনশতটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। মধ্য এশিয়ার বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী উলান উদে নামক স্থান হইতে তিনি সংস্কৃত ভাষার সুভাষিত রত্ন নির্বিপুলকোর মঙ্গোল ভাষার অনুবাদ সংগ্রহ করেন। সাইবেরিয়ার প্রান্তরে ধ্বংস স্তূপের মধ্য হইতে তিনি যে সব প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন তাহার মধ্যে তন্ত্রবর্ণিত ৮৪ সিদ্ধের চিত্র অগ্রতম। মঙ্গোল, কোরীয় ও মাঞ্চুভাষায় সংস্কৃত হইতে অনূদিত বহু পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ রঘুবীর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সরস্বতী বিহার বা International Institute of Indian Culture দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ডঃ রঘুবীর সংগৃহীত পুঁথি, চিত্র ও প্রত্নবস্তুগুলি এই সরস্বতী বিহারেই রক্ষিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সীমার বাহিরে আফগানিস্তান, চীন, মধ্যএশিয়া, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, নেপাল, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, শ্রাম, কম্বোজ, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে অতীত ভারত সভ্যতার স্থায়ী নিদর্শনগুলির যে বিপুল সংগ্রহ সরস্বতী বিহারে সমাধিষ্ট—তাহা অতুলনীয়। পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানক্ষেত্রেই এক স্থানে একত্র এত অধিক বহু বিচিত্র সম্পদ রক্ষিত নাই। ডঃ রঘুবীরের জীবন সাধনা যদি মাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিত তথাপিও তিনি এই সংগ্রহের জ্ঞান ভারত-বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

“শত পিটক” প্রকাশের পরিকল্পনাটিকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ডঃ রঘুবীর একটি স্বল্পষ্ট রূপ দান করেন। ইতিপূর্বে তিনি পশ্চিম জার্মানীর বন নগরে জার্মানীর প্রাচ্য বিজ্ঞান সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন, অত্রস্থ ভারতবিজ্ঞান বিশারদদেরা শত পিটক প্রকাশ ব্যাপারে তাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। ডঃ রঘুবীর স্থির করেন যে শত পিটকের একশত খণ্ডের মধ্যে ৫০টি খণ্ড ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে ও বাকী ৫০টি খণ্ড বহির্ভারে প্রাপ্ত ভারত প্রভাবিত তদ্দেশীয় সাহিত্যের সম্পাদনা ও প্রকাশের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে। এই সাহিত্যসম্পদগুলি সংগৃহীত হইবে নেপাল, তিব্বত, মধ্যএশিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্রাম, কম্বোজ, লাওস, আনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মধ্যএশিয়ার সহিত যোগাযোগস্থলে চীনে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সাহিত্য প্রবেশ লাভ করে এবং খৃষ্টীয় ষষ্ঠম-সপ্তম শতাব্দীতে হইয়া দৃঢ়বদ্ধ হয়। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে চীন হইতে কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য প্রবেশ লাভ করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ ও ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ায় ভারতের সাহিত্য-ধর্ম ও দর্শন বহুলভাবে পরিব্যাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত জাভা-সুমাত্রা-বালিদ্বীপ শ্রাম ও কম্বোডিয়ায় সহিত সাংস্কৃতিক সংস্পর্শ ও প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। মধ্যএশিয়া হইতে ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ হইতে মঙ্গোলিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে যুগে যুগে ভারতবর্ষে সভ্যতা সংস্কৃতির সম্পদ বিতরণ করিয়া আসিয়াছে তাহার

শ্রুতি চিহ্নগুলি ঐসব দেশের লুপ্ত-প্রায় সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া শতপিটক গ্রন্থমালা প্রকাশ ও প্রচার রঘুবীরের ঈঙ্গিত ছিল।

এই কার্য অষ্টভাবে রূপায়িত করার জন্য দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী লইয়া তিনি কয়েকটি পরিষদ গঠন করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীতে সরস্বতী বিহার ভবনের শিলাভাস কালে আনুষ্ঠানিক ভাবে শতপিটক গ্রন্থমালারও প্রবর্তন করেন। শতপিটক গ্রন্থমালায় অয়ং রঘুবীর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা বা সম্পাদন করেন—এই রচনাবলীর কতকংশ তাঁহার মৃত্যুরপর প্রকাশিত হইয়াছে।

Mongol Sanskrit Dictionary (no-5), New Delhi, 1958, Gilgit Buddhist Mass (4 vols, with Lokesh chandra, no : 10) New Delhi 1959-57 ; Arajī Bōoji (no : 15), New Delhi 1961. (মঙ্গোল ভাষায় লিখিত ও মঙ্গোলীয়ায় প্রাপ্ত রাজা ভোজসম্বন্ধীয় কাহিনীর হিন্দী ও সংস্কৃত অনুবাদ) ; মঞ্জুশ্রী নাম সঙ্গীতি (১৮নং) (সংস্কৃত, মঙ্গোল, তিব্বতীয় ও চীনা এই চারিটি বিভিন্ন বর্ণমালায় মুদ্রিত)—নিউ দিল্লী, ১৯৬১ : Pentagot Dictionary of Buddhist Terms (সংস্কৃত শব্দাবলীর তিব্বতীয়, মালয়ী, মঙ্গোলীয় ও চৈনিক ভাষায় অনুবাদ) No. 19—New Delhi, 1961, A new Tibeto Mangolian Pantheon (with Lokesh chandra) no : 21 in 17 parts, 1962—67, New Delhi, সারসমুচ্চয় (ইন্দোনেশীয় প্রাচীন নীতিগ্রন্থ) No : 24, New Delhi, 1962, The Mongol chronicle. No : 31, New Delhi 1963, India's National Language (collection of 69 articles) No : 36, 1965, Sanskrit Bijas and Mantras in Japan (with Lokesh chandra) No : 39, New Delhi—1965 Kala chakra Tantra & other Texts (no : 69—70), New Delhi 1966.

এই প্রসঙ্গে শতপিটক গ্রন্থমালার বাহিরে সরস্বতী বিহার (৮) গ্রন্থমালায়—ডঃ রঘুবীর রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নামও উল্লেখযোগ্য :—

Vedic Mysticism, Lahore, 1932, Uddhar kosa of Dakshinamurti (Tantric work), Lahore, 1938, Buddha and Bodhisatwa in Indian Sculpture (In three parts), Lahore (1938—41) ; Ramayana in China (Chinese Text with Eng. Trans and Introduction), Nagpur, 1955 ,

Fan fan yu (chinese Dictionary of Indian Geographical names rendered in Sanskrit) Lahore 1943 ;

Svara —Vyanjana, a kavi—Balinese and Devnagari script material, New Delhi, 1956.

শতপিটক গ্রন্থমালায় এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ডঃ স্বদর্শনা দেবী সিংহল (ডঃ রঘুবীর কন্যা)—গণপতি তত্ত্ব, অরতিশাসন, তত্ত্বজ্ঞান :—মহাজ্ঞান : (নং ৬, ২০, ২৩), ডঃ সারদা রানী (পুত্রবধূ)—শ্লোকান্তর (এই চারিটি

294016

পুস্তকের উৎস বলি দ্বীপ), Dr. Lokeshchandra: Eminent tibetan Polymaths of Mongoliar; Materials for a history of Tibetan Literature, Golden Annals of Lamaism, Indo-Asian Studies; the Amarkosa in Tibet; Sanskrit Texts from the Imperial palace Peking; Yotho's Treatise on Tibetan Medicine; the Autobiography and Diaries of Si-tu-Pan-Chen;

Rinchen—Four Mongolian Historical records; Charles R. Baurwden—Vikramaditya Tales from Mongolia; Geldner—Manava—Sranta-Sutra (Eng, Trans), P. N. Sastri—Jaiminiya Srantasutra Vritli, J. Kochanewska—Gypsy Studies P I)

ডঃ রঘুবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বযোগ্য পুত্র ডঃ লোকেশচন্দ্রের স্বল্প পরিচালনায় সরস্বতী বিহারের কর্মধারায় ছেদ পড়িতে পায় নাই। আশাকরা যার লোকেশচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর সহযোগিতায় শতপিটক প্রকাশের কাজ অচিরকালের মধ্যেই সম্পন্ন হইবে। এযাবৎ এই সিরিজে প্রায় আশিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

ডঃ রঘুবীরের সারস্বত সাধনায় তৃতীয় ধারা ছিল ভারতীয়ভাষা বিশেষতঃ হিন্দীভাষার শব্দমালা গঠন ও অভিধান প্রণয়ন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই রঘুবীর ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন যে অনন্ত কাল ধরিয়া বিদেশীয় ইংরাজী ভাষা এই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যের ও উচ্চ-শিক্ষার বাহনরূপে থাকিতে পারে না—এবং ইংরাজী ভাষাকে স্থানচ্যুত করার পূর্বে ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে ব্যবসায়িক, ও রাষ্ট্রনৈতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক শব্দ ভাণ্ডার পুষ্ট করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে ভারতীয় ভাষাগুলির অপূর্ণতা ও পশ্চাদপদতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। এই প্রসঙ্গে তিনি চিন্তা করেন যে সংস্কৃত তাবৎ ভারতীয় ভাষা সমূহের জননী এমনকি দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি সংস্কৃত ভাষা মূলক না হইলেও বহুল ভাবে সংস্কৃত প্রভাবিত। সংস্কৃতভাষায় প্রাপ্ত শব্দগুলি গ্রহণ করিতে হইবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব্দগুলিকে সংস্কৃত শব্দ গঠনের দ্বারা সংস্কৃত ভিত্তিকরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্য ও পাণিনীয় ব্যাকরণে রঘুবীর যৌবন কালীই অতিশয় দক্ষতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বহু বিদেশীয় ও ভারতীয় ভাষা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। বঙ্গভাষার দক্ষতা লইয়া রঘুবীর এইরূপে ভারতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডার গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

উত্তরকালে ডঃ রঘুবীর হিন্দী প্রচারের একজন অত্যাগ্র সমর্থকরূপে হিন্দী বিরোধীদের বিরাগ ভাঞ্জন হইয়াছিলেন, আবার সংস্কৃত ভিত্তিক হিন্দী শব্দমালা স্বজনের জন্ত বহু হিন্দী প্রেমিক ও প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অপপ্রচার করিতেন। রঘুবীর এই দ্বিবিধ বিরোধিতায় অবিচলিত থাকিয়া বিজ্ঞান-সম্মতরূপে হিন্দী তথা ভারতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডার সৃষ্টির কাজ অনলসভাবে করিয়া যান। তাঁহার সৃষ্ট বিপুল শব্দভাণ্ডার সংস্কৃত ভিত্তিকরূপে সকল ভারতীয় ভাষাতেই ব্যবহার-যোগ্য—কেবলমাত্র হিন্দীতে নহে। হিন্দী ভাষা একদিন না একদিন সর্বভারতের যোগস্বত্রে ভাষা হিসাবে স্থান গ্রহণ করিবে। হিন্দীভাষা যে দিন স্বমর্যাদায়

প্রতিষ্ঠিত হইবে—সেই দিন সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কৃতজ্ঞ অন্তরে অভিনব পাণিনি ডঃ রঘুবীরকে স্মরণ করিতে হইবে। ডঃ রঘুবীরের সাধনায় শুধু হিন্দী নহে সমগ্র ভারতীয় ভাষাগুলিই উপকৃত হইয়াছে, তাবৎ ভারতীয় ভাষায় পরিভাষা প্রণয়নের কার্যে রঘুবীর রচিত শব্দাবলী প্রয়োজনীয়।

লাহোরে অবস্থানকালেই ডঃ রঘুবীর তাঁহার পরিকল্পিত the Great English Indian Dictionary গ্রন্থের তিনখণ্ড প্রকাশ করেন (Lahore, 1944—45), এই খণ্ডগুলি রসায়ন শাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক উপকরণ সংক্রান্ত বৈদেশিক শব্দগুলি সংস্কৃত তৎসম অথবা সংস্কৃত ভিত্তিক শব্দে দেবনাগরী, বাঙ্গলা, কন্নড় ও তামিল অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। এই অভিধানের রঞ্জন-দ্রব্য ও বর্ণসম্বন্ধীয় চতুর্থ খণ্ড অপরূপ চারিটি লিপিতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নাগপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই অভিধান প্রকাশের পর ডঃ রঘুবীর তাঁহার A consolidated Great English Dictionary প্রকাশ করেন। ইহা ১ লক্ষ শব্দ সমন্বিত। ইহাতে বিস্তৃত বিজ্ঞান ব্যতীত বাণিজ্য রাষ্ট্রশাসন, অর্থনীতিশিক্ষা প্রভৃতি মানবিক বিজ্ঞা বিষয়ক শব্দাবলীও গৃহীত হয় (১৯৫০, নাগপুর)।

হিন্দী সহ সমগ্র ভারতীয় ভাষাগুলিতে ব্যবহারযোগ্য শব্দাবলী সমন্বিত নিম্নলিখিত অভিধানগুলিও রঘুবীর কর্তৃক সংকলিত হয়—:

A dictionary of Indian Birds, Nagpur, 1949; An elementary English—Indian Dictionary of Scientific terms Nagpur, 1948 (For students)

A Dictionary of English—Indian terms of administration, Nagpur, 1950.

A Dictionary of Indian Mammals, Nagpur 1953.

উপরোক্ত অভিধানগুলি ব্যতীত ডঃ রঘুবীর ৫ লক্ষ শব্দযুক্ত একটি ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান ও প্রায় ১ লক্ষ শব্দযুক্ত ইংরাজী-পালি অভিধান সংকলন করিয়া যান—এই অভিধানগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

নাগপুরে অবস্থানকালে ডঃ রঘুবীরের সম্পাদনায় বীজগণিত, পদার্থবিজ্ঞা, জ্যামিতি রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় চল্লিশটি উচ্চতর কলেজীয় শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিদেশীয় ভাষা হইতে দেশীয় ভাষায় পরিভাষা প্রণয়নে ডঃ রঘুবীরের অসাধারণ মনীষা মধ্যপ্রদেশ সরকার ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনাপ্রকল্পে প্রচুর সহায়তা দান করে।

হিন্দীভাষায় পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ডঃ রঘুবীর সংকলিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—:

English Hindi Glossary of Indian Medicince plants—1946, English Hindi Glossary of Pharmaceutical codex—1946, English Hindi Dictionary of Commerce—1947, English Hindi Dictionary of Statistice—1948; English Hindi Dictionary of Economies—1949; Hindi Equivalents of Statistal Terms

1949; A Glossary of Logic (Sanskrit & Hindi) 1949. A Dictionary of Administrative Terms (Eng to Hindi), 1949.

English—Hindi Glossary of Mathematics, 1950 (for B. Sc students)

”	”	”	of Physics	”	”
”	”	”	of Chemistry	”	”
”	”	”	of Astronomy	”	”
”	”	”	of Agriculture	”	”
”	”	”	of Zoology	1951	”
”	”	”	of Botany	”	”

English Hindi Glossary Technical, Scientific, Agricultural and administrative Terms and Phrases—1951, Hindi—English Dictionary of Technical Terms—1951. English Hindi Glossary of words used in the Various ministries Govt of India. 1951.

English—Hindi Glossary of Forestry 1952. English—Hindi Marathi Dictionary of Administrative Terms—1953 Hindi — Marathi — English Dictionary of Administrative terms—1953. English—Hindi Dictionary of Railway Terms 1953, Comprehensive English Hindi-Dictionary of Governmental and Educational Words and Phrases (with Lokeshchandra & others—1955.)

এই গ্রন্থের পরে পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার প্রথম সংস্করণে প্রায় দুইলক্ষ শব্দ ছিল, এই অভিধানটি পরিবর্ধনের কাজ অব্যাহত আছে। Glossary of Parliamentary, Legal and Administrative Terms (Lok Sabha Secretariat, New Delhi—1957.

শব্দমালা প্রণয়নে রঘুবীরের দক্ষতা ও প্রতিভা তুলনা রহিত। তাঁহাকে অভিনব পানিনি আখ্যায় অভিহিত করা হইত। সত্য সত্যই তাঁহাকে পানিনির উত্তর সাধক বলা যায়।

বিচিত্র প্রতিভাধর রঘুবীর একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিকও ছিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৯৪৬ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যরূপে ভারতের সংবিধান প্রণয়নে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই দীর্ঘ দশবৎসরকাল তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের রাজ্যসভার কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য ছিলেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভ্রমণের সময় তাঁহার এই অভিজ্ঞতা হয় যে চীন বাহুতই ভারতের সহিত মৈত্রী স্বত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। আসলে তাহার উদ্দেশ্য ভারত আক্রমণ ও ভারতের বিস্তীর্ণ উত্তরাঞ্চলের চীনভুক্তি। চীন ভ্রমণকালে চীনের তীব্র সমরোন্মাদনা তাঁহার দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাজ্যসভার মধ্যে ও বাহিরে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করেন।

চীন কর্তৃক তিব্বত গ্রাসও তাঁহাকে ব্যথিত করে। চীনের রাষ্ট্রনায়কদের আগ্রাসী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশ রক্ষার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করার জন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া পার্লামেন্টের সদস্যগণকে অবহিত করিতে থাকেন। ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকদের ঔদাসীন্য ও আত্মভুষ্টির বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ দিন দিন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। দেশক্ষার খাতে ব্যয় হ্রাস করিবার প্রস্তাব হইলেই রাজ্যসভায় তিনি এবিষয়ে সকলকে সতর্ক করিতেন ও চীন আক্রমণের সম্ভাব্যতার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে বলিতেন। রঘুবীর আজীবন কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে এই দলের দেশরক্ষা নীতি সম্বন্ধে মতভেদের ফলে তিনি কংগ্রেস দল হইতে পদত্যাগ করিয়া ভারতীয় জনসংঘে যোগদান করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় জনসংঘ দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়। ইতিমধ্যেই চীনের ভারত আক্রমণ ঘটনায় রঘুবীরের রাজনৈতিক দূর্বদর্শিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। চীনের ভারত আক্রমণ কালে দেশরক্ষার জনমত উদ্বুদ্ধ করায় রঘুবীর স্বরগীষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বীয় দলের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচনের অল্পকূলে নির্বাচনী প্রচার ভ্রমণ কালে ডঃ রঘুবীর একটি মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং এই দুর্ঘটনার ফলে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরে তাঁহার জীবনান্ত হয়। মহাপণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক ডঃ রঘুবীরের মৃত্যুতে দেশের সকলস্তরের জরসাধারণ শোকার্ত হইয়াছিল। ডঃ রঘুবীরের মত বিচিত্র প্রতিভাধর মানুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে ডঃ রঘুবীর স্ত্রী, একপুত্র ও তিনকন্যা রাখিয়া যান। ডঃ রঘুবীরের উপযুক্ত পুত্র ডঃ লোকেশচন্দ্র বিদ্যুী ভগ্নি ও সহধর্মিনী সহ সর্বস্বতী বিহারের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার কর্মধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। সর্বস্বতী বিহার বিশেষজ্ঞ দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিত্যসেবায় সমৃদ্ধ হইতেছে ইহা যে মাত্র একটি “ষাডু-ঘর” বা সংগ্রহশালায় পরিণত হয় নাই ইহাও সম্ভ্রামের বিষয়।

রঘুবীরপুত্র ডঃ লোকেশচন্দ্র ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে অম্বালায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ ও হলান্ডের উত্রেচট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট। বহুভাষাবিদ লোকেশচন্দ্র বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করিয়া পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নারী

সম্বরণ রায়

একজন ভদ্রমহিলার কাহিনী নিয়ে বর্তমান আলোচনা শুরু করা যাক। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। চারটি ছেলেমেয়ের মা। স্বামী ভালো চাকরী করেন। অবস্থাপন্ন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বেশ সুখী দম্পতি। গয়নাতে জীর অঙ্গভরা। শাড়ী-বোঝাই বাক্সপেটরা। ঘর ভর্তি আসবাব-পত্র। স্বামীর দেয়া-খোয়ার কার্পণ্য নেই। মুখ খুলেই হ'ল। কিন্তু একটা সত্ত আছে। জীর স্বাধিকার বলে কিছু থাকবে না। খুঁটান ধর্মপূরণে আছে, শয়তান মানুষকে ধনদৌলত দেয়, পরিবর্তে তার আত্মাটির উপর সার্বভৌম অধিকার চায়। এও অনেকটা তেমনি। জী তাঁর আত্মাকে স্বামীর হাতে সঁপে দিয়ে ধনদৌলত ভরণপোষণ ইত্যাদির অধিকার পান। মানুষের পরিচয় তার আত্মায়, তার ব্যক্তিতে। আত্মাহীন জীব জন্তু-সদৃশ, কেনা গরুর মত মালিকের অধীন। জী যখন এইরকম একটা জন্তুবিশেষে পর্ববাসিত হয় তখন তার ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ ধর্ম-অধর্ম এক কথায় মন বলতে যা বোঝায় সেটা স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী ওঠে-বসে-চলে। উপরে বর্ণিত স্বামী জীকে ঐ রকম একটা জীব বিশেষ ভাবেন, মানুষ হিসেবে তাঁর যে কোনো সত্তা আছে সে কথা স্বামীর মনে কখনো ঠাঁই পায় না।

এই ধরণের জীবন যে-মহিলা হাসিমুখে-সহ্য করে পতিকে দেবতার সম্মান দেন, তিনি ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী আদর্শ নারী। আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শীর কাছে তখন তিনি অলঙ্কার। মেশানো প্রশংসার পাত্রী হয়ে ওঠেন। কিন্তু যদি কোনো মহিলা এই অপমানকর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, স্বাধিকারপ্রমত্ত স্বামীকে অস্বীকার করেন তিনি হল বিদ্ভূতের পাত্রী। সেই মহিলার জন্তে নরকেও নাকি স্থান নেই। ভারতীয় নারীধর্মের মূল মন্ত্র হল : আত্মদান। আত্মদান বলতে বোঝায়, নিজের ইচ্ছাকে ব্যক্তিত্বকে সমূলে নষ্ট করা। ধরণ, বিব্রমঙ্গল এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। বণিকপত্নীকে তাঁর খুব পছন্দ হল এবং সেই মহিলাটির সঙ্গে রাত্রিবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বণিক অত্যন্ত অতিথি বৎসল, অতিথিকে কিছুই অদেয় নেই; ধনদৌলত, বাড়ী, দাসদাসী, এমনকি, জী—যা কিছুর উপর তাঁর মালিকানার অধিকার আছে সেটাই তাঁর দানের অধিকারভূক্ত। তাই স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী জীকে বিব্রমঙ্গলের ঘরে প্রবেশ করতে হল। এমনি করে বণিকপত্নী প্রমাণ করলেন তিনি সত্যি সাবিত্রী। কিন্তু যদি এমন হ'ত, যদি বণিকপত্নী বিব্রমঙ্গলকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ করতেন, তবে তিনি হতেন অসত্যী, ব্যাভিচারিণী।

ইচ্ছাহীনতা নারীর ধর্ম বলে প্রচারান্তরে প্রচার করা হয়। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই নারীধর্মের কেন্দ্রকথা হ'ল ইচ্ছাহীনতা। এর কারণ, জীলোক পুরুষের কাছে অত্যন্ত কাম্য, কিন্তু রহস্যময়ী বলে পুরুষ কিছুতেই জীলোকের কলকনিয়া পায় না। তাই তার কামনাও সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। কখন হাতছাড়া হয়ে যায় সেই চিন্তাতেই

সে উৎকর্ষিত। এই পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব অশান্ত পুরুষ নারীর ইচ্ছাকে সামাজিক বিধিনিষেধ দিয়ে আটপেঁতে বেঁধে রেখে তবে খানিকটা স্থিতির হয়ে বাহিরের কাজে মন দিতে পারে। প্রাচীন ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরুষ যখন তিমি-শিকারে বেরত, তখন তার স্ত্রীকে একটা বদ্ধ ঘরে কুলুপ মেরে বন্দী করে রাখা হত যাতে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী কারুর মুখ পর্যন্ত দেখতে না পায়। আদিম পুরুষের কাছে নারীর পরিচয় কি ছিল তার এক স্বন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ল্যাংডন—ডেভিস : “নারীর মধ্যে আছে অভাবনীয়ে রহস্য, কুহকের মায়া। পুরুষ তার সম্বন্ধে চির-সন্দিগ্ধ, কেননা পুরুষের কাছে সে অত্যন্ত কাম্য। পুরুষের দেহে-মনে নারী যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর সেইজন্তেই কোনো পুরুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে না—কি স্বামী, কী ভাই, কি বাবা, কি ছেলে। নারী অনিষ্টের নিত্য উৎস বলে মনে করা হয়। তাই অনিষ্ট-সৃষ্টির সমস্ত সম্ভাবনা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা দরকার। অফুরন্ত সন্তোগের সামগ্রী এই যে নারী, তাকে নিষ্কটক ভাবে উপভোগ করার এই একমাত্র পথ। (১) যাকে বিশ্বাস করা যায় না, অথচ যাকে না হলে সন্তোগস্থ অতৃপ্ত থেকে যায় তার ইচ্ছাকে স্বাধীনতা দেওয়া—এতো নিজেই পায়েই নিজে কুড়াল মারার সামিল। কাজেই পুরুষ প্রভাবিত ধর্ম ও-সমাজ নারীর ইচ্ছাশক্তিকে আপন মালিকানার ঘানিতে জুড়ে দিল।

কি আদিম সভ্যতা, কি ইতিহাসের সভ্য—পুরুষের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কিন্তু বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। এথেন্সের স্বর্ণযুগের কথা ধরা যাক। তখনও এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, নারীদের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। লেখাপড়া শেখা, স্ত্রীলোকের পক্ষে একেবারে পরিহার্য। সাত বছর বয়স হলেই মেয়েরা অন্তরমহলের বাইরে যেতে পারত না। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে সে “স্বামীর ঘর” করতে যেত অর্থাৎ দাসত্বের শিকল পরত। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে কি হ’ত? তখন তো সেখানে “শিভ্যালরি”র আদর্শ। ঐ শিভ্যালরির যুগেও স্বামী স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম দিত, কারণ আইন তাকে সেই অধিকার দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে। এইটাই আশ্চর্য লাগে যে, আইন পুরুষকে যে অধিকার দিত পুরুষ সেটা পুরোপুরি কার্যকরী করতে পারে। কিন্তু যেখানে স্ত্রীর কিছু অধিকার আইনে মেনে নেওয়া হয়, সেখানেই যত গুণগোল। তখন চিরচরিত সমাজপ্রথার সঙ্গে আইনের গরমিল বাধে এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রথারই প্রতিপত্তি বজায় থাকে। একটা মজার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ইতিহাসে বলে, প্রাচীন ব্যাবিলনে স্ত্রীলোকের অনেক অধিকার আইনে স্বীকৃত হত, এমনকি বিবাহ-বিচ্ছেদও। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অল্পসারে স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে ছেড়ে দিত, তার অবস্থা হ’ত শোচনীয়। সে তখন সমাজ-পরিভ্রান্ত হয়ে ঘৃণিত জীবন বাপন করতে বাধ্য হত, কিংবা প্রথা অনুযায়ী তাকে নোংরা পরিবেশে ভেলায় চড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হ’ত।

আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, আমরা নারীকে উচ্চ স্থান দেই। এই বিশ্বাস যে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রবঞ্চনার একটা প্রকৃষ্ট নমুনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় নারীর প্রতি আমাদের ঐতিহ্য-সম্মত মনোবৃত্তি থেকে। এদেশে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

এমন সার্বভৌম ছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর জীবনের অর্থও নিঃশেষিত হয়ে যেত। সহমরণ প্রথা এইটাই প্রমাণ করত যে, স্ত্রী একটা রোবোট জাতীয় জীব, স্বামীর জীবনী শক্তি ইচ্ছাশক্তি তাকে চলিষ্ণু করে রাখত, ঐ জীবনীশক্তি যখন শেষ হয়, তখন স্ত্রী-রোবোট-জীবনও মনে এসে পৌঁছয়। আলো চলে গেলে ছায়ার কি অস্তিত্ব থাকে? বিধবা-বিবাহ নিষেধও স্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্যের নিদর্শন। পতিদেবতার মৃত্যুর পর স্ত্রী শুধু প্রাণে বেঁচে থাকবার অধিকার পায়, কিন্তু জীবনবোধের যে-আনন্দ তাতে আর কোনো অধিকার থাকে না। শাঁখা-সিঁদুর যেই মুহূর্তে তার অঙ্গ থেকে তিরোহিত হল, সেই মুহূর্তেই তার প্রকৃত জীবনস্পন্দন থেমে গেল। যে-বিধবা শাক দিয়ে মাছ ঢাকে, তার অবস্থা তো সবাই জানে। সমাজের তৃতীয় নয়ন তাকে ভয় করে ফেলে।

আমাদের সমাজে একটা স্ত্রী-আচার প্রচলিত ছিল। ছেলে বিয়ে করতে যাবার আগে মাকে বলে যেত, “মা, তোমার জন্তে দাসী আনতে যাচ্ছি।” এই “দাসী” হওয়াটাই যে নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আদর্শ তা সগোরবে ঘোষিত হ’ত। মানুষ হিসেবে দাসীর কোনো পরিচয় নেই, কোনো সত্তা নেই; প্রভুর পরিচয়েই তার পরিচয়। তাই বিয়ের পর মেয়েদের পূর্ব পরিচয় মুছে ফেলতে হয়। তারা “গোত্রান্তরিত” হয়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। স্বামীর গোত্রই তাদের গোত্র, স্বামীর পরিচয়েই তাদের পরিচয়। এই পরিচয়হীনতার সাধনা শুরু হয় যখন মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। বাপ-মা আত্মীয়স্বজনের তখন থেকেই চিন্তা—কেমন করে মেয়েকে “পার” করবে অর্থাৎ গোত্রান্তরিত করবে, কেমন করে তার পূর্ব পরিচয় নিশ্চিহ্ন মুছে ফেলা হবে। জ্ঞান অবধি মেয়ে শুনে আসছে, তার ইহকাল-পরকাল স্বপ্নরবাড়ীতেই বাঁধা। সেখানে সে যদি নিজের বিনিময়ে হাসি ফোটাতে পারে, তবেই তার জীবন সার্থক, অক্ষয় স্বর্গলাভ—অন্ত্যায় নরকেও তার স্থান হবে না। এই স্বপ্নরবাড়ীর প্রতিপত্তি যে কতখানি তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় বিবাহ-সংলগ্ন স্ত্রী-আচারগুলি থেকে। একটি আচার হচ্ছে, বউ ঘরে এলে শাশুড়ী তার কানে মুখে মধু দেয়। অর্থাৎ যত কটুবাক্য তার উপর প্রয়োগ করা হোক না কেন, সেগুলি তার কর্ণকূহকে মধুর হয়ে প্রবেশ করবে, তার মনে যেন কোনো অভিযোগ দানা না বাঁধে। আর, কটু ব্যবহারে সে যেন রা না করে; যদি একান্ত করে, তবে সেই রা মধুর মতো মধুর হওয়া চাই। তত্ত্বার্থ, মেয়েদের মন বলে কিছু থাকবেনা যদি থাকে সেটা স্বপ্নর বাড়ীর ইচ্ছানুযায়ী ওঠ-বোস্ করবে। প্রায় প্রত্যেক মেয়ের মাকে বলতে শোনা যায়, “বেয়াইন, আপনার হাতে সঁপে দিলাম, মনের মতো গড়ে-পিটে নেবেন।” যেন মেয়ের মনটা আঠারো-বিশ বছর ধ’রে নরম মাটিই রয়ে গেছে, যে ছাঁচে ঢালবে সেই রূপটাই নেবে।

আমার স্বাধীনতার যদি কেউ হাত দেয় আমি ক্ষেপে উঠি। যদি আমার চেয়ে তার গায়ের জোর কম থাকে, তবে উত্তম-মধ্যম দিতেও পিছপা হই না। দেশের স্বাধীনতা যদি কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, তবে তার সঙ্গে মরণপণ লড়াই করি। এই যে-স্বাধীনতার কথা আমরা উঠতে বসতে বলি থাকি আলোচনা করি তার অর্থ কি? এক কথায়, আত্ম-কর্তৃত্বের অধিকার। মানুষ বিশ্বাস করে, প্রত্যেক ব্যক্তির কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—মানুষ হিসাবে

আত্মকর্তৃত্বের অধিকার আছে কেননা আত্মকর্তৃত্বের মধ্য দিয়েই সে প্রকৃত ব্যক্তি-মানুষ হয়ে ওঠে। আত্মকর্তৃত্বের মর্যকথা হ'ল, নিজের জীবনের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজে বহন করা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানবসভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতখানি স্বীকৃত হয়েছে তাই দিয়ে বিচার করা হয় আমরা কতটা সভ্য হয়েছি। যে যুগে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল, সে যুগের তুলনায় আমরা সভ্যতর বলে পরিগণিত হই কারণ আমরা মানুষকে আর ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করি না। বিংশ শতাব্দীতে কে না ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। কিন্তু এই বিশ্বাস শুধু মুখে প্রকাশ করলেই হয় না, কাজেও তার প্রতিফলন চাই। তখন আমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠি যখন এক অপূরণীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মন এবং কাজের মধ্য দিয়ে স্বীকার করে শ্রদ্ধা করে। এক দেশের যেমন কোনো নীতিগত অধিকার নেই আর-এক দেশের স্বাধীনতা হরণ ক'রে নেওয়া, তেমনি একজন মানুষেরও কোনো নীতিগত অধিকার নেই আর একজন মানুষের আত্মকর্তৃত্বের অধিকারকে হনন করা। যদি করে তবে বুঝতে হবে মানুষ হিসেবে তার কোনো অগ্রগতি হয় নি, সে এখনো জন্তু-মানুষের পর্যায়ে পড়ে আছে। বাহ্যিক ভদ্রতার খোলসের আড়ালে তার জন্তুব পরিচয় ঢাকা।

কিন্তু মজা এই, জীলোকের স্বাধীনতার গলায় দড়ি দিয়ে যখন আমার ইচ্ছের খুঁটিতে বেঁধে রাখি, তখন একথা একবার মনে হয় না যে, আমি একটা নীতিবিগর্হিত কাজ করছি। কারণ আমরা আজন্ম বিশ্বাস করতে শিখেছি, পুরুষের ইচ্ছার বাহন হল নারী। যে-সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজ বড় গলায় বলে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য। আমাকে পুন্মামক নরক থেকে বাঁচাবার জেঁটেই ভার্যার দরকার। হালচাঁষের জন্তু যে বলদ কেনা হয়, তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল হাল টানা। মালিক সেই বোবা বলদকে কখনো জিজ্ঞেস করে না সে হাল টানতে রাজী আছে কি না। সাতপাকে বেঁধে পুরুষ যে মানুষ-রূপী গরুকে নিজের পদবীর বোলো আনা প্রভুত্বের ছাপ দিয়ে পুত্রার্থে ঘরে নিয়ে আসে তার অবস্থাও তদ্রূপ বিবাহের পালা সাজ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী (চলতি কথায় যাকে বলে “কর্তা” যেমন “তোমার কর্তার অনুমতি নিয়ে এসেছ তো”) পুত্রার্থ-ক্রিয়ার উত্তোগী হন, সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা করে না। আর করবেই বা কেন? সে কি মস্ত পড়ে নারায়ণ শিলা সাক্ষী করে ভর্তা-পদে অভিষিক্ত হয় নি? যদি ভার্য কখনো স্বাধীন সত্তা ঘোষণা করে, তবে ভর্তা জোর গলায় গুনিয়ে দেয়, “মস্ত পড়ে বিয়ে করিনি?” যেন মস্তের মধ্যে এমন বাছ আছে যে উচ্চারণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার, আত্মকর্তৃত্বের ক্ষমতা একেবারে নাকচ হয়ে যায়।

এমনি করে আবহমান কাল চলে আসছে। স্ব-পরিচয়ের অভাব যে অভাবই নয় সেটা নারীমনে একেবারে মজ্জাগত হয়ে আছে। বলা হয়, জীলোক সাধারণত রক্ষণশীল। সারা জীবনে যে নারী আত্মপরিচয় খুঁজে পায় না, এমনকি খোঁজাটাই ধর্মবিরুদ্ধ, সে রক্ষণশীল হবে না তো কি? চিরচরিতকে স্বীকার করে নেওয়াই তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অচলায়তনের মধ্যে বাস ক'রে সে ভাবে, ‘এখানেই অবলম্বনের ভরসা। এখানেই আলোবাতাস

এখানেই মুক্তির আনন্দ।” যারা দেয়াল ভাঙার কথা বলে তারা ঘোরতর শত্রু। সমাজের বিধিনিষেধ এমন করে যুগ যুগ ধরে স্ত্রীলোকের মনে ভয় জাগিয়ে রেখেছে যে সেই বিধিনিষেধ গুলোর যৌক্তিকতা সন্দেহে প্রশ্ন করবে কার এমন বুকের পাটা! ধর্মের ভয়, নিরাবলম্বনের ভয়, অপমানের ভয়—সবগুলো অপদেবতার ভয় তার স্বকীয় চিন্তাশক্তির সামর্থ্যকে একেবারে পাষাণ ক’রে ফেলেছে।

অনেকে বলবেন, “আমাদের দেশে নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়নি, এটা মিথ্যে কথা। আইন করে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ স্ত্রীলোক সম্পত্তিতে অধিকার পেয়েছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার পেয়েছে। তার কল্যাণের জন্তেই বহু বিবাহ রদ করা হয়েছে।” এর উত্তরে বলতে হয়, এই আইনগুলো তো হালে হ’ল। আর, আইন পাশ হ’লেই মানুষের স্বভাব বদলায় একথা কে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে? বার্নহার্ড জে স্টার্ন সত্য কথাই বলেছেন, “আইন, মতবাদ এবং প্রচলিত রীতি—এদের মধ্যে প্রকাণ্ড ফারাক। আইনের কাছ থেকে নারী যে অধিকার পায়, সেগুলিকে সামাজিক বিধিনিষেধ বিকল করে দিতে পারে। অপরপক্ষে, আইনে যেগুলো বারণ করা হয়েছে সেগুলো হয় এড়িয়ে যাওয়া হয় না-হয় উদ্ধতভাবে অগ্রাহ করা হয়।” (২): বাস্তবে এবং আদর্শে গরমিল অনেক। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায়, লোকে কিভাবে আইনের পাশ কাটিয়ে যায়, কিভাবে অলিখিত সামাজিক বিধিনিষেধ আইনের উপর টেকা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বিধবা-বিবাহের কথা। ওটা তো আজকাল আইন-সম্মত। কিন্তু ক’জন বিধবা ধর্ম-অম্লসারের বিরুদ্ধে সমাজের কটাক্ষ উপেক্ষা করে বিয়ে করে? এই তো সেদিন আমার স্ত্রীর কাছে একটা কাহিনী শুনলাম। একজন মহিলা বছর তিনেক আগে দুটি সন্তান নিয়ে বিধবা হন। তিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব—এক কথায় তথাকথিত সমাজ তাঁকে প্রকাশ্যে ছুরো দিল, বলল, “কামচরিতার্থের এতই যদি প্রয়োজন পড়েছিল, তাহ’লে তো লাল-পাড়ায় টিকিট করলেই হ’ত। মা হয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ এমন ক’রে নষ্ট করল?” যেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ। সন্তানরা কাকে বাপ ব’লে পরিচয় দেবে তাই ভেবে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে সবাই মিলে মহিলাকে একঘরে করে গায়ের ঝাল কিছুটা কমালো। আমার স্ত্রী এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বস্থতা সন্দেহে সমালোচক সন্দ্বিগ্ন হলেন। জনান্তিকে বলে রাখা ভালো, ঐ সমালোচক স্ত্রী-বিয়োগের পরেই দ্বিতীয় দায় পরিগ্রহ করেছিলেন তাঁর মা-মরা সন্তানদের মুখ চেয়ে! তারপর ধারণ, বিবাহবিচ্ছেদ আজকাল আইন সম্মত। কিন্তু ক’জন স্ত্রী স্বামীর জাম্বাব ব্যবহারের বিরুদ্ধে, দৈহিক মানসিক নির্ধাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পান? প্রথমত, অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পা ছুটো ছুঁল, আত্মনির্ভর হওয়ার মতো সাহস বা সংস্থান নেই। বার আছে, তার সামনে একটা বিরাট ভয় : সমাজের রক্তচক্ষু। দ্বিতীয়ত, আইনের ব্যাপার ক’জন স্ত্রীলোক জানে বোঝে? আর-একটা কথা। আইনের সাহায্য নিতে পারে এমন সংগতি দেশের ক’জন মহিলার আছে? অবশ্য যদি সমাজের উপরতলার দিকে চোখ রাখি, তবে হয়তো কিছু সংগতিপন্নর উদাহরণ মিলতে

পারে। কিন্তু সমাজের উপরতলার কথা ভাবলে স্ত্রীলোকের অবস্থা এবং সামর্থ্যের বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে যদি দৃষ্টি পড়ে নীচতলার দিকে। সেখানে তাদের দাসত্ব, তাদের অসহায়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম সমাজ এতদিন ধরে তাদের যা শিখিয়েছে তা তারা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে, তাই নিয়ে সান্ত্বনা পায়, ভাবে, “মেয়েমানুষের জন্ম তো দুঃখভোগ করবার জন্মেই। এ জীবনে যদি দুঃখকষ্ট সহিতে পারি, তাহলে পরজন্মে স্বর্থের মুখ দেখতে পাবো।” এই দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে আইন তো আইন, স্বয়ং বিধাতাও দারুভূত হয়ে পড়েন।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নতুন আইন সামাজিক ব্যবস্থার নতুন পরিস্থিতির পরিচায়ক। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের রূপ পালটায়। আইনের ভিতর দিয়ে প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধগুলি যৌক্তিকতা পায়। সুতরাং যখন সেই সম্বন্ধের রূপ পালটায়, তখন আইনের রূপান্তর প্রয়োজন, কেননা পুরনো আইনগুলি তখন আপন যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে সাম্যতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহু যুগ ধরে প্রচলিত ছিল যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ প্রভুত্ব বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইনের কাজ ছিল সেই প্রভুত্ববোধকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশ শিল্পযুগের আদর্শ গ্রহণ করল। এই আদর্শের মূল কথা হল! ব্যক্তি-স্বাধীনতা। সুতরাং সামন্তযুগের প্রভুত্বভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের রূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হ’ল। সেই সংগে আইনেরও সংস্কার হ’ল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা পেল। যে প্রভুত্ববোধকে আবহমানকাল ধরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আঁকড়ে ধরে ছিল। তারই শিকড়ে এবার টান পড়ল। নারীর অধিকার নিয়ে যে আইনগুলি পাশ হ’ল, সেগুলি এই নতুন শিল্পযুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষের নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ যাকে “ঢাকা পাক্কীর যুগ” বলে অভিহিত করেছেন, তার মরণদশা উপস্থিত হল।

কিন্তু মরতে মরতেও সেটা এখন বেঁচে আছে। কেননা ঐ “ঢাকা পাক্কীর যুগ” যেমনটাকে সৃষ্টি করেছে, সেই মনটা যে এখনো জীবিত সক্রিয়। নারীর মন চিরদিন একটা নির্দিষ্ট বেড়ার মধ্যে বিচরণ করত। তার বুদ্ধি বিশ্বাস জদয়-মাধুর্য সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ বহুযুগ ধরে নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছিল। আজ বেড়া-ভাঙার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু কই, নারীর মন বেড়ার সংসার থেকে আজো মুক্ত হল না।

আমরা বলি, নারী শক্তিরূপিনী। কথাটার মানে হয় আমরা বুঝি না, না-হুয় চাটুবাক্য হিসেবে ব্যবহার করি। সব শক্তির উৎস আত্মশক্তি। মানুষ আত্মশক্তি নিয়ে জন্মায় না, জন্মায় আত্মশক্তির সম্ভাবনা নিয়ে। জীবন ভরে তাকে সাধনা করতে হয় সেই সম্ভাবনাকে মূর্ত করবার জন্মে। বহুদিন সঞ্চিত বুদ্ধি সংস্কার বিশ্বাসের সহজাত সংকীর্ণ গভী পেরিয়ে মন যখন প্রসন্ন করতে শেখে, সকল অপদেবতার ভয় কাটিয়ে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তখন আত্মশক্তির সাধনা সফলতার দিকে অগ্রসর হয়। আজকাল অনেক বাপ-মায়ের মুখে শোনা যায়, “মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি যাতে তার পা দুটো শক্ত হয়, প্রয়োজন হ’লে নিজের পায়ে

দাঁড়াতে পারে।” নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটাই অর্থ হয় : আত্মশক্তি বিকাশ। লতা কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু আমরা চাই, আমাদের মেয়েরা যেন লতার স্বভাব পায়—নম্র গৃহবধুর উপযুক্ত। আমরা চাই, তারা যেন শিশুর স্বামীপুত্রের গুঁড়ি ধরে জীবন যাপন করে সার্থক বোধ করে। তবে আমরা এও চাই যে, যদি এখনো বনিবনা না হয়, তখন যেন নির্ধাতন-অপমান সয়ে তাদের জীবন কাটাতে না হয়, তখন যেন স্বাধীন সত্তা ঘোষণা করতে পারে। এই চিন্তাধারার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অন্তর্বেষম্য আছে, সেটা আমরা বুঝেও না-বোঝার ভান করি। একদিকে আমরা চিরাচরিতকে স্বীকার করতে শেখাই, আর একদিকে স্বাধীন সত্তার কথা বলি। একদিকে মেয়ে কলেজে পড়ে, ফুটবল-ক্রিকেট-ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করে, কমিউনিজম্ আওড়ায়; আর-একদিকে পরীক্ষার আগে মন্দিরে গিয়ে পূজা দেয়, রোগ হলে মাদুলী খোঁজে, বিয়ের বয়স হলে বাপ তাকে কোষ্টি-গোত্র-গণ মিলিয়ে পাত্রস্থ করে। ফলে, আমাদের শিক্ষিত মেয়েরা স্বভাবতই চিরাচরিতকে মেনে নেয়, প্রকৃত স্বাধীন সত্তালাভের সাধনাতে অগ্রসর হতে পারে না। চিরাচরিতের শেষবোধ পরাশ্রয়ী, লতাদর্মী। আত্মশক্তির শেষবোধ সম্পূর্ণরূপে আত্মশ্রয়ী। যে ব্যক্তি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, তার পক্ষে পরাশ্রয় স্বধর্মের পরিপন্থী। কিন্তু যার মন পরাশ্রয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত তার পক্ষে স্বাধীন হওয়া এক বিড়ম্বনা, কেননা তার স্বভাব লতাদর্মী। যখন বাবা মেয়েকে শেখায়, “পা ছুটো শক্ত করো” তখন সে মেয়ের মনে আত্মশক্তির বীজ বপন করে না। তাই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। তখন শুধু মেয়েদের আচারে ব্যবহারে স্বাধীনতার জেরা দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা নিরাবলম্বন সজ্জস্ত অসহায়।

একটা গল্প মনে পড়ল। এক কৃষ্ণভক্ত গান করতেন, যার আহার না ছোটে, তাকে হরিই আহার ছোটান। অবিখ্যাসীদের ঠাট্টায় কৃষ্ণভক্ত মনস্থ করলেন, তিনি তাঁর বিখ্যাসের সত্যতা প্রমাণ করবেন। একদিন সারাদিন উপোস করে একটা গাছতলায় বসে রইলেন। বেলা যখন পড়ে এল, গ্রামের মেয়েরা দয়াপরবশ হয়ে অভুক্ত ভক্তের চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি রেখে গেল। ভক্ত আশাবিত্ত হয়ে ভাবলেন, ‘হরির কৃপায় চাল ডাল তো জোগাড় হ’ল। এবার দেখি তাঁর দয়ায় অন্ন প্রস্তুত হ’ব কি না।’ সন্ধ্যা হয়ে গেল, অন্ন আর প্রস্তুত হয় না। তখন হরি ভক্তের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, “মুখ, হরির কৃপায় চাল-ডাল হ’ল। হরির কৃপায় একজন না হয় একজন রেঁধেই দিল। হরির কৃপায় একজন না হয় তোকে খাইয়েই দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিলতে হবে তো তোকেই। সেটা তো তোর হয়ে কেউ করে দিতে পারবে না।” “গেলো” ক্রিয়াটা একান্ত ব্যক্তিক ব্যাপার, সেটার জন্তে কারুর উপর নির্ভর করবার উপায় নেই। অনেকে বলবেন, “জীলোককে যতই স্বাধীনতা দিন, লেখাপড়া শেখান, অধিকার দিন তারা ওসবের মর্মই গ্রহণ করতে পারে না। গিলবার চেষ্টাই করে না।”

কথাটা সত্য। কিন্তু সেইজন্তে দায়ী এমন একটা সমাজব্যবস্থা যেখানে মেয়েদের পরাশ্রয়ী রূপটাকেই আদর্শ করে রাখা হয়েছে। তাদের পরিচয় শুধু ভার্য্যা ব’লে জননী ব’লে, নারী বলে নয়। আত্মশক্তি জাগাবার সুযোগ যদি না পায়, তবে “গিলবার” ক্ষমতা কোথা

পাবে? এটা জানা কথা যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক জানে না আইন তাদের কি অধিকার দিয়েছে। জানবার প্রয়োজন কি? পুরুষরাই তো আছে : বাবা-শ্বশুর-ভাস্কর-দেওর-ছেলে। ওরাই তাদের ভাবনা ভাববে। ওরাই তাদের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামাবে। চিরকাল ধরে পরাশ্রয়ী—তাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার মতো মন আজও তাদের সৃষ্টি হয় নি। এক কথায় পুরুষরা তাদের সাবালিকা হ'তে দেয়নি। আজ মনের দিক থেকে স্ত্রীলোক সাবালিকা।

অনেকে বলবেন, আলোচনাটি একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট। তাঁরা নজীর দেবে “বহু” নারীর যারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে! এর উত্তরে বলতে হয়, ইতিহাসে তো সব যুগেই স্বনামধন্য মহিলা আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরাশ্রয়ী নারীর সামাজিক আসনের সঠিক চিত্র কি ক'রে পাবেন? আজকের দিনেও ঐ কথা খাটে। অনেক মহিলাই তো আজকালকার দিনে প্রগতিশীল বলে স্বীকৃত হন। কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, যারা চিরাচরিতের বেড়া ভেবে আজও বেরুতে পারে নি, এমনকি বেরুবার কথা ভাবাটাও পাপ মনে করে, তাদের তুলনায় প্রগতিশীলার সংখ্যা কি নগণ্য মুষ্টিমেয় নয়।

নারীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এমন নারী যার মূল্যবোধের গোড়ার কথা হল আত্মশক্তি। সে নিজের পায় দাঁড়াতে শিখেছে। সে স্বাধীনতার মর্ম বোঝে মনে প্রাণে স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকার করে, কাজে সেই আদর্শকে প্রতিফলিত করে। পুরুষের যোগ্য দোসর একমাত্র সে-ই হতে পারে। আর, সেই নারীই আবার কঠিন বিদ্রোহ করে যখন পুরুষ প্রমাণ করে সে আজও তার আদিম জন্তু-পরিচয় অতিক্রম করতে পারে নি। এমন নারী প্রকৃত শক্তিরূপিনী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নারী আত্মশক্তির স্বপ্ন দেখে, আত্মশ্রমের সাধ পোষণ করে, ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ খোঁজে, কিন্তু পা দুটো এখনো দুর্বল। তার মন থেকে এখনো অপদেবতার ভয়গুলি মিলিয়ে যায় নি। সে পরাধীনতার গ্লানি প্রতি পলে অনুভব করে, কিন্তু সমাজের জুকুটি উপেক্ষা করে বিদ্রোহ ক'রে এমন আত্মিক সাহস নেই, ব্যবহারিক সংগতিও নেই। তার কল্পনা ছিল পুরুষের দোসর হবে। কিন্তু যখন প্রেমহীন স্বামীর জান্তব দৃষ্টি তার দেহকে চোঁটে বেড়ায় তখন সে লজ্জায় ঘুণায় আপন নারীজন্মেই দ্বিষ্কার দেয়, বলে, “ভগবান, আর-জন্মে যেন মেয়েমানুষ হয়ে না জন্মাই।” তার মধ্যে শক্তিরূপিনী হবার সম্ভাবনা কুঁড়িতেই শুকিয়ে গেল।

তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ লতাধর্মী। তার জীবনবাদে আত্মশ্রমের কথাই ওঠে না, আত্মশক্তির প্রশ্নই জাগে না। সে বিশ্বাস করে, মেয়েদের জীবন পরনির্ভর, এই সমাজরীতি ধর্মনীতি। যারা তার এই বিশ্বাসে ঘা দেয়, সে তাদের থেকে শত যোজন দূরে থাকে। তার জীবন স্মৃতিই কাঁটে—দিনে দাম্পত্য কলহের গর্জন-বর্ষণ, রাত্রে সহবাসের নিশ্চিন্ত আরাম। তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক নারীত্ব কি তা জানে না। শুধু ভাষা ও জননী হয়ে থাকাই তার জীবনের চরম সার্থকতা। কখনো বোঝে না যে, শুধু একটা উপভোগ্য দেহধারী আজ্ঞাবাহন জীব ছাড়া আর কোনো পরিচয়ই তার নেই, সমাজ তাকে যতই প্রশংসার শিখরে তুলুক না কেন।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হ'ল স্ত্রীলোক। আবার স্ত্রীলোকের মধ্যেও উপরে আলোচিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক বহুলাংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওরা না জাগলে দেশও জাগবে না, সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা স্থাপ্তির চেষ্টাও হ'বে নিষ্ফল। অবশ্য একথা প্রায়ই শোনা যায়, “নারী জাগরণ তো হচ্ছেই এবং হবেও, তবে ধীরে ধীরে। প্রকৃতিই যে ওদের মেরে দিয়েছে।” এ কথা যাঁরা বলে তারা পুরুষ। মেয়েদের মনে মায়াজাল ছড়ানোর উপায় ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। এই মায়াজালের প্রভাব কাটিয়ে পুরুষের মৌরুসী পাট্টার বিরুদ্ধে নারী যেদিন সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, কায়মী স্বার্থের দুর্গের কপাটে যেদিন তারা স্বেচ্ছায় মরণপণ আঘাত হানতে পারবে। সেইদিন প্রকৃত স্বাধীন হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সেইদিন তারা মানবিক সম্ভালাভের যোগ্য হয়ে উঠবে।

(১) J. Langdon-Davies : A Short History of Women.

(২) Woman, Position in Society : Historical Bernhard J. Stern.

[Encyclopaedia of Social Sciences. Vol XV]

বিলাত যাত্রার আদিপর্ব

চণ্ডী নাহিড়ী

যে কারণে ইউরোপীয়দের দলে দলে ভারতে আসতে হয়েছিল সে কারণে ভারতীয়দের ইউরোপের পথে পা বাড়াতে হয়নি। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। লুণ্ঠণ ও ধর্মপ্রচার ছিল ইউরোপীয়দের ভারত অভিযানের লক্ষ্য। ঐতিহাসিকরা এককথায় একে বলেছেন ভাগ্যাস্বেষণ।

ফার্সী বিলায়ৎ শব্দটির অর্থ রাজ্যের দেশ। ইংরেজরা ভারতে রাজ্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ইউরোপকে রাজ্যের দেশ হিসাবে বিলাত বলে আখ্যা দেওয়ার নজির নেই।

রাজা রামমোহন পরাজিত মুগল সম্রাটের বংশধরের জন্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্ত ইংলণ্ডের রাজ্যের (স্বভাবতই ভারতেরও রাজ্য) কাছে প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। সে হিসাবে রামমোহনকে আমরা হীনমন্ত্রতায় প্রথম বিলাতযাত্রী অর্থাৎ রাজ্যের দেশ ভ্রমণকারী বলে গণ্য করি।

কিন্তু তাঁর বহু আগে বেশ কিছু ভারতীয় নানা কারণে কতকটা ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে ইউরোপ গিয়েছিলেন। এঁদের প্রায় কেউই শিক্ষিত ছিলেন না। সেকালের সেই মধ্যযুগের ইউরোপ তাঁদের কেমন লেগেছিল জানার কোন উপায় নেই। দাসব্যবসায় ও ধর্মাস্ত্ররণে পারদর্শী পতুগীজেরা যে সব ভারতীয়কে বন্দী অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের বংশধরদের সন্ধান এখনো পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ব-পুরুষদের লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামের কাছে চন্দ্রদ্বীপের রাজার ছেলে অপহৃত হয়ে পতুগালে চলে যান, পরে তিনিই মনোয়েল ডু আসম্পসাম নাম নিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে আসেন। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ তিনি লিখেছিলেন কিন্তু সেকালের ইউরোপের কোন বর্ণনা লিখেছেন বলে শুনিনি। লিস্বনের ও গোয়ার লাইব্রেরীগুলিতে হয়তো কিছু পুঁথি আলোকলাভের অপেক্ষায় আছে।

ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ সালে ভারত আবিষ্কারে এসেছিলেন। ফেরার পথে তিনি কালিকট থেকে কিছু ভারতীয় বন্দী পতুগালে নিয়ে যান। রাজা ইম্যানুয়েলের কিছুদিন পর ইচ্ছা হোল ভারত-অভিযানের ১৫০০ সালে পেড্রো আলভারেস কাব্রালের নেতৃত্বে তিনি যে অভিযাত্রীদল ভারতে পাঠান তার সঙ্গে সেই বন্দীদেরও ভারতে ফেরৎ পাঠান। ফেরৎ পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল যাতে “তারা পতুগাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার করতে পারে।” রাজা ইম্যানুয়েলের নির্দেশ ছিল। ধর্মপ্রচারের মারফৎ রাজ্যজয়ের চেষ্টা চালাতে হবে। তাতে যদি কোন কাজ না হয় তখন তরবারীতো আছেই।

দেখা যাচ্ছে কাব্রালের বাহিনীর সহস্রাধিক লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচারক মাত্র সত্তের জন। মালাবার উপকূলের সিরিয়ান খৃষ্টানদের সঙ্গে কাব্রালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

একবছর পর কাব্রাল পতুগালে ফিরে এলেন। সঙ্গে দুজন ভারতীয়। ধর্মে সিরিয়ান খৃষ্টান। নাম মাথাই ও যোশেফ। ইউরোপের মাটিতে সেই প্রথম ভারতীয় খৃষ্টান। রাজা

ইমানুয়েলের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। মাথাই ছুবছর পরে মারা যায় লিসবনেই। যোসেফকে নিয়ে সাড়ম্বরে সারা পর্তুগাল সফর করা হয়। প্রদর্শনী বলা যেতে পারে। যোসেফ বই লিখেছিলেন ‘ভয়েজেস অব যোসেফ ইন ইন্ডিয়া’।

লগুনে প্রথম ভারতীয়ের ভারতীয় নামটি জানা যায়নি। ১৬১৪ সালের ১২শে আগস্ট অর্ধোল্ড অবস্থায় একটি ভারতীয় বালক ক্যাঠন বেটের সঙ্গে ইংলণ্ডে অবতরণ করে। তাঁর পূর্বাভিহাস অজ্ঞাত। কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে ‘ব্রোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের’ বলে অনুমান করেছেন। লগুনে অবস্থানকাল এই বালক পাদ্রী প্যাট্রিক কোপল্যাণ্ডের কাছে আশ্রয় পায়। তিনি তাকে লেখাপড়া শেখান। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করেন যাতে করে লেখাপড়া শিখে খৃষ্টধর্ম রপ্ত করে ভবিষ্যতে কোন দিন স্বদেশ ফিরে দাঁখরের ইচ্ছায় নিজ দেশবাসীর কয়েকজনকে অন্ততঃ ধর্মান্তরিত করতে পারে। তার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানী বৎসরে ২০ মার্ক মঞ্জুর করেছিল।

ছুবছর পর কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ এক বৈঠকে বসলেন—আলোচ্য বিষয় বালকটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত করা। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হল। আর্চবিশপ জর্জ এবট সানন্দে সম্মতি দিলেন। খৃষ্টীয় নাম স্থির করলেন স্বয়ং রাজা প্রথম জেমস, পৌরোহিত্য করলেন ডাঃ জনউড। লর্ড মেয়র, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যবর্গ, ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ভার্জিনিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ও আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। (এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য চার্চে প্রচুর লোকের ভিড় হয়। সরকারী রেকর্ডে আছে—1616 December 22. An East Indian was Christened by the named of peter.)

কয়েকবছর পর পিটার রয়েল জেমস জাহাজে ভারতে ফেরেন। তাঁর পরবর্তী কাহিনী জানা যায়নি।

টমাস কুরিয়েট মর্মে আঘাত পেয়েছিলেন একজন ভারতীয়ের কাছে। এই ভারতীয় মুসলমানকে ক্লোরেনটাইনরা ধরে নিয়ে যায় কনস্ট্যান্টিনোপলে। যাবার পথে তাকে লেগহনে কিছুদিন থাকতে হয়। ইটালিয়ান ভাষাও সে রপ্ত করে। কুরিয়েট মূলতানে খৃষ্টবর্ম প্রচার করতে গেলে এই ভারতীয় মুসলমান তাঁকে বিধর্মী বলে গাল দেয়। কুরিয়েট বাধ্য হয়ে ইটালিয়ান ভাষায় তাকে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বোঝাবার চেষ্টা করেন। এক সাধারণ ভারতীয়ের মুখে ইটালিয়ান ভাষা শুনেই কুরিয়েট তাঁর পূর্ব ইতিহাস জানতে চান। তাতেই জানা যায় ক্লোরেনটাইনরা তাকে নিয়ে যায় কনস্ট্যান্টিনোপলে পরে লেগহর্নে। হয়ত আরও দু’একস্থানে তিনি গিয়েছিলেন। এণ্ড্রু সাহেবের ‘নর্থ ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে আর এক জন বিলাতফেরৎ ভারতীয়ের কথা আছে। ১৭৭৫ সালে দিল্লী থেকে গণেশ দাস নামক এক ফার্সী অনুবাদক ইংলণ্ড যান। কলকাতায় এ্যাংলিকান চার্চের প্রথম পাদরী কিয়েরনাওয়ার এই গণেশ দাসকে খৃষ্টধর্মে দক্ষিত করেন।

গুলাম হেসেন খানের সিয়ের মৃত্যুফরিণে লেখা আছে মহম্মদ ফজলুল (১৭৭৫-৭৬ সালে ইংলণ্ড যান। সঙ্গে ছিলেন মিঃ ইলিয়ট ও টাঙ্গাইলের বোগেন সমাদ্দার। যতদূর জানাবায় মুহম্মদ

ফজলুল বিলাতে প্রায় তিনবছর ছিলেন ও বহু বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। শল্যচিকিৎসাসহ আরও বহু বিষয়ের বই তিনি দেশীয়ভাষায় তর্জমা করেন।

১৭৪১ সালে এডমণ্ড বার্ক লণ্ডনের এক অখ্যাত পার্কের এক কোণে ‘দুটি বিচিত্র প্রাণী’কে দেখতে পান। তাদের দুর্বস্থা দেখে বার্ক স্থির থাকতে পারলেন না, তৎক্ষণাৎ নিজের আশ্রয়ে তাদের নিয়ে গেলেন। এই দু’জনের একজন হিন্দু, নাম হরিমন। অপরজন পার্শী নাম মনিয়ার। পেশোয়া রঘুনাথ রাও তাঁর এজেন্ট হিসাবে এই দুজনকে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন কোম্পানী ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক কর্ম সম্পাদনের জন্ত।

বার্ক বরাবরই বিদেশীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। এই “বিচিত্রদেশে” দুই বিচিত্র বিদেশী অতিথির দুর্বস্থা দেখে তাঁর বড়ই করুণা হল। বিশেষত ধর্মাচরণ করতে না পেরে তাঁর মনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন। বার্ক তাঁদের তাঁর গ্রামের বাড়ী বেকমস্ফিল্ডে নিয়ে গেলেন। সেখানকার বাগানবাড়ী অবাধে ব্যবহার করার ও ধর্মাচরণের সবরকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

বার্কের এই আতিথেয়তায় ভারতীয় দুজন খুবই স্তব্ধ ছিলেন। ইংলণ্ডে একবৎসর অবস্থানকালে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন।

আবু তালিব লণ্ডনী নামে সমাধিক পরিচিত মীর্জা আবু তালিব খান প্রায় ছ’ বছর নবাব মুজফ্ফর জঙ্গের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে ছিলেন। ১৭৯৮ সালে তিনি যান ও ফিরে আসেন ১৮০৩ সালে। পাটনার খুদা বক্স লাইব্রেরীতে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর পাণ্ডুলিপি মসির-ই-তালিবী ফি বিলাইৎ-ই আফগানজি রক্ষিত ছিল। এ্যাফেয়ার্স অব দি কর্ণাটিক গ্রন্থে দেখা যায় ১৮০৩ সালে হার্টফোর্ডে কোম্পানীর কলেজে মাত্র একজন ভারতীয় আছে। জনৈক ভারত-ফেরৎ সাহেবের হুকুমদার হিসেবে সে বিলাত যায়। কোম্পানী কলেজের ছাত্রদের ভারত সম্পর্কে জ্ঞান দেবার জন্ত হুকুমদারকেই নিয়োগ করা হয়েছিল একথা ভাবতে এখন অবাক লাগলেও সেকালের দুঃসাহসিক ও অনিশ্চিত সমুদ্রযাত্রার দিনে, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাবার এ হেন ব্যবস্থায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে ১৮১৭ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যান। দেশে ফেরার সময় তিনি সঙ্গে একজন ভারতীয় ভৃত্য নিয়েছিলেন। মাঝ পথে সেন্ট হেলানা দ্বীপে নেপোলিয়ানকে দেখিয়ে থ্যাকারে ভারতীয় ভৃত্যকে বলেছিলেন—সংঘাতিক মাল্লুয়, রোজ চারটে ভেড়া হল তাঁর খাণ্ড, স্বযোগ পেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জলখাবার হিসেবে খেয়ে ফেলেন। বিখ্যাত ইটালীয়ান পর্যটক পিয়ের্টো ডেলাভাল ১৮২৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সুরাটে পৌছান। সারাভারত ব্যাপকভাবে পর্যটন করে তিনি ১৮২৬ সালে নেপলসে ফিরে যান। সঙ্গে একটি ভারতীয় ভৃত্য নিয়ে গিয়েছিলেন। রোমে একবার এক শোভাযাত্রার সময় এই ভারতীয় ভৃত্যটির সঙ্গে পোপের একজন ভৃত্যের ঝগড়া হয়। পোপের ভৃত্যটি রেগে ভারতীয়টির তরবারী কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে। সব ঘটনা ঘটে পোপের সামনে পিয়ের্টো নীরবে বসে থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ নিজ কোমর থেকে তরবারী নিয়ে পোপের সামনেই তার ভৃত্যকে হত্যা করলেন। পোপ পিয়ের্টোকে নির্বাসিত করেন অবশ্য। কিছুদিন পরে নির্বাসনদণ্ড হ্রাস করে

তাকে আবার রোমে ফিরে আসার আদেশ দেন। এই ভারতীয় ভৃত্যটি বহুদিন রোমে বেঁচে ছিলেন।

ক্লিমেট ভাউনিং তাঁর হিস্টরী অব ইণ্ডিয়ান ওয়ার্স গ্রন্থে (১৭৮৭) নওরোজ নামক এক পার্শীর নাম উল্লেখ করেছেন। ক্রমশ মানেকের কনিষ্ঠ পুত্র নওরোজ সুরাটের ইংলিশ ফ্যাক্টরীর ব্রোকার ১৭২২ সালে লণ্ডনে যান তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা সংক্রান্ত একটি প্রাপ্য টাকার মীমাংসা করতে। ১৭২৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি স্মালিসবেরী জাহাজযোগে লণ্ডন পৌছান। কোম্পানীর ডিরেকটর বর্গ নওরোজের বক্তব্য শুনে তাঁর অনুকূলেই রায় দেন। অর্থাৎ স্থির হয় ঐ পার্শী পরিবার কোম্পানীর কাছ থেকে তিন কিস্তিতে পাঁচলক্ষ ছটল্লিশ হাজার টাকা পাবে নওরোজ যখন লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন সেখানকার কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হয়।

পার্শীদের মত আর্মেনিয়ানরাও ভারতীয় হিসাবেই গণ্য। তুর্কীরা আর্মেনিয়া দখল করে নেওয়ায় বহু আর্মেনীয়ান এশিয়ার ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যায়। ভারতে যারা আসেন তাঁরা এদেশে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। পরে রাশিয়া আর্মেনিয়া গ্রাস করায় এদের দেশে ফেরার পথে চিরদিনের মত বদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আর্মেনিয়া বলে কোন দেশ নেই। ১৭৬৯ সালে আর্মেনিয়ান জর্জ খোজামল বাংলাদেশ থেকে লণ্ডনে যান কোম্পানীর সদর দপ্তরে অভিযোগ জানাতে। তাঁর অভিযোগ ছিল কোম্পানীর কলকাতার কর্মচারী ও খুদে নবাবরা নানাভাবে তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করে। রচিত কালুনেরচোটে খোজামলের ব্যবসা প্রায় বন্ধ। এমনকি তাকে অকারণে জেলে দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরগণ তার আবেদনে কর্ণপাত করেনি। খোজামল বাধ্য হয়ে তখন কমন্সভায় অভিযোগ পেশ করলেন। কমন্স সভায় প্রেরিত আবেদনে তিনি বললেন, কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের কাছে আবেদন করায় কোম্পানীর কলকাতার কর্মচারীরা দেশে ফিরলে প্রতিশোধ নেবে। যে অত্যাচারের প্রতিবিধান চেয়ে তিনি এই বিদেশে এসেছেন সেই অত্যাচার আরও নির্মমভাবে তার ও তার পরিবারের উপর চালানো হবে। অতএব মহানুভব পার্লামেন্ট যেন তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। যাই হোক পার্লামেন্টের সিলেক্টকমিটি ডেকে পাঠালেন খোজামলকে। বললেন তাকে—অভিযোগের সঠিক বিবরণ চাই। খোজামল বিস্তারিতভাবে বললে ১৭৬৮ সালের ১৪ই মার্চ রাজা বলবন্ত সিংএর কর্মচারীরা তাঁকে প্রেস্তার করে নিয়ে যায়। আর ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট ভেরেলেষ্ট সাহেবই স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজা বলবন্তরাসকে তাঁকে প্রেস্তার করার। “প্রায় চল্লিশ জন লোকের সতর্ক প্রহরায় আমি বিভিন্ন ফোর্টে বন্দী হয়ে থাকি। নৌকা যোগে আমায় নিয়ে বাবার সময় ম্যালকম ফিলিপ নামক একজন আর্মেনিয়ানকেও বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। মুর্শিদাবাদে ২৩ শে মে তারিখে আমি মুক্তি পাই।”

যাইহোক কমিটি শেষ পর্যন্ত এব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেন তাতে খোজামলের কোন স্তুবিধা হয়নি।

লর্ড মরলে তাঁর ‘বার্কে’ আর একজন আর্মেনিয়ানের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি এডমণ্ড বার্কের সহায়ত্বে অর্জন করেছিলেন।

এই আর্মেনিয়নের নাম য়োশেফ এমিন। য়োশেফ এমিন। যখন লণ্ডনে আসেন তখন বার্কের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তবু এমিনের বিদেশে কষ্ট হচ্ছে ভেবে পকেটে সামান্য যা টাকা ছিল তা তার হাতে তুলে দেন। তাছাড়া যতদিন অত্রকোন ব্যবস্থা না হয় ততদিন লিপিকর হিসাবে যাতে পেট চালাতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দেন। এরপর বুটেনে যান লক্ষ্মীর ব্রাহ্মণ শেরমল। শেরমলের বিলাতযাত্রার কারণটি বড় মজার। ব্যক্তিগত জীবনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। তাঁর ধারণা ছিল বেদ ও উপনিষদের মধ্যেই বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান সঞ্চিত আছে। এদের বাইরে বিশ্বের কোথাও কোন শাস্ত্র নেই। ভারতে থাকার সময় বহুবার ইংরেজদের সঙ্গে এ নিয়ে তিনি তর্ক করেছেন। সাহেবরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে বাইবেল নামে তাঁদের যে শাস্ত্র আছে সেটাও পবিত্র। কিন্তু শেরমল বাইবেলের পবিত্রতা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর এই বিশ্বাসের মূলে আরও একটি কারণ ছিল। জর্নৈক ইংরেজ পণ্ডিত ভারততত্ত্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। শেরমলকে তিনি বেদ উপনিষদ অম্বুবাণের কাজে নিয়োগ করেন। শেরমলের ধারণা ইংরেজদের নিজেদের যদি শাস্ত্র থাকে তবে আমাদের শাস্ত্র পড়তে চায় কেন? আমি নিজেই তাদের দেশে যাব, দেখব সত্যিই তাদের সে রকম শাস্ত্র আছে কিনা যদিও তার জন্ম কালপানি পার হতে হবে তবু নিজে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।

বাই হোক এই জেদী ব্রাহ্মণ ইংলণ্ড ও স্কটল্যান্ডে দশবছর বাস করে তাদের ধর্ম সমাজ আইন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন।

এই শেরমলের কল্যাণে সর্বপ্রথম আমরা একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম বিলাত দেশটা মাটির। তাঁর বর্ণনায় অবশ্য রক্ষণশীলতার ছাপ খুবই স্পষ্ট। দশ বৎসর বিলাত বাসের পরও তাঁর ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

তাঁর বর্ণনাটা এইরকম—সারা গ্রেটবুটেনে জাতিভেদ প্রচণ্ড। প্রত্যেকটি জাত পৃথক ও স্পষ্ট। প্রথম জাত যাদের পারিবারিক পরিচয় আছে, দ্বিতীয়—যাদের কোন পারিবারিক পরিচয় নেই, তৃতীয় অভিজাত। এদের মধ্যে প্রথম দুটি জাতি প্রাচীন, তৃতীয় জাত গড়ে উঠেছে উভয় সম্প্রদায় থেকে বাছাই করা নয়নারীর অবাধ মিলনকে কেন্দ্র করে।

স্ত্রী শিক্ষার ফলে বেশ কিছু অবটন ঘটে গেছে এমন প্রমাণ আছে। স্ত্রীলোকদের এই বিভাগশিক্ষাকে অত্র কোন কাজে লাগানো হয় না। কেবল বাজে প্রেমের ও খুনের গল্প পড়েই তারা সময় কাটায়। লাইব্রেরী নামক পুস্তকের গুদাম থেকে এইসব নোংরা বই প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়। সত্যিকথা বলতে কি ইংলণ্ডে বিভাগশিক্ষার বহর দেখে আমি যত হতাশ হয়েছি এত হতাশ অত্রকিছু দেখে হইনি। ভাবতে পারো সে দেশে শত শত লোক আবুলফজলের মত প্রাজ্ঞব্যক্তির নামই শোনেনি। আমি এমন অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি যাদের কাছে ব্যাস দেবের (মহাভারত রচনাকার) নাম অজ্ঞাত। সে দেশে বহু লোক আছে যারা বলতেই পারবেনা কনোজ রাজ্য মুসলমান না হিন্দু রাজ্যের স্থাপন করেছিল। এর ঠিক পরেই উল্লেখযোগ্য রাজা রামমোহন রায়েব বিলাতযাত্রা ১৮৩০ সালে। এই বিলাতযাত্রার কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। খ্রিষ্টাব্দে ১৮৩৩ সালে রাজার মৃত্যুর পর তাঁর পালিত পুত্র লণ্ডনে এসে বোড অব

কমিশনার্স এর প্রেসিডেন্ট আর জন হবহাউসের সঙ্গে দেখা করে বলেন ইংলণ্ডে ও সরকারী কাজকর্ম কিভাবে চালানো হয় তৎসম্পর্কে জ্ঞান অর্জনেরও পরে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি বাধিত হবেন। ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে তাঁকে মাসিক একশত টাকা বেতনে কেরাণী হিসাবে নিয়োগ করা করা হয়। প্রায় তিন বৎসর সেখানে চাকরী করার পর রাজারাম দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বোর্ড তাঁর প্রতি প্রথম থেকেই সদয় ছিলেন। বৎসরের বাকী কয়েকমাসের বেতন তো বটেই তৎসহ কর্তব্যপরাগতার জন্ত আরও একশত টাকা উপহারসহ বোর্ড তাঁকে ভারতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্ত বিলাত যাত্রায় রাজারামকেই পথিকৃৎ বলা যায়।

বোর্ডের চেয়ারম্যান সার জন হাবহাউসের ডায়েরীতে রাজারাম সম্পর্কে একটি মজার কথা উল্লেখ করা আছে।

‘রাজা বয়সে তরুণ ও উচ্চশ্রেণীর। সেদিন সে পায়ে হেঁটে স্কটল্যান্ড ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। ভ্রমণ করতে করতে একসময় সে মাঠের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেখানে এক বৃদ্ধি ক্ষেতের কাজ করছিল? রাজা তাকে পথের নির্দেশ জিজ্ঞেস করে, বৃদ্ধি মাথা না তুলেই জবাব দেয়। পরমুহুর্তে মাথাতুলে রাজাকে দেখে ভয়ে ‘ডেভিল’ ‘ডেভিল’ বলে চৈচিয়ে ওঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

১৮৩২ সালের ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে মৌলবী রফিউদ্দীন আমেদ রাণী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে ভিক্টোরিয়ার হিন্দুস্থানী শিক্ষক মুন্সী হাফিজ আবদুল করিমের কথা ও ছবি আছে। মৌলবী রফিউদ্দীন নিজেও ইংলণ্ড কন্সট্যাটিনোপল গিয়েছিলেন।

মুন্সী আবদুল করিম রাণীকে হিন্দুস্থানী শেখাবার ফাঁকে ফাঁকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও ইংরেজদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কেও অবহিত করতেন। রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর কথায় যে প্রভাবিত হতেন তার প্রমাণ মণিপুর অভিযানের সময় সেখানকার ব্রিটিশ রেসিডেন্টের ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা তিনি করেছিলেন।

১৮৩৮ লালে সৈয়দ মীর আফজল লগুন যান সাতারার সিংহাসনচ্যুত রাজা প্রতাপ সিংহের প্রতিনিধিরূপে। রাজা তাঁর অপসারণের আদেশ রহিত করার জন্ত বোম্বাইয়ের গভর্নরের কাছে কয়েকবার আবেদন করেন। পরে গভর্নর জেনারেল ও কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কাছেও আবেদন জানান কিন্তু কোন ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্ত তিনি সৈয়দ মীরকে ইংলণ্ড পাঠালেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য। বিলাতে পৌঁছে সৈয়দ মীর তাঁর কাজ ভালভাবে করতে পারেননি। তাঁকে দেশে ফেরৎ আনিয়ে এবার রাজা সাহেব ভগবন্তরাও বিটল ও রঙ্গো বাপুজীকে পাঠালেন। কিন্তু রাজায় তখন আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, নিয়মিত টাকা পাঠাবার সঙ্গতি ছিল না। কোম্পানীর কাছ থেকে রাজা বা টাকা পেতেন তাতে তাঁর নিজেই চলতেন। বাধ্য হয়ে ১৮৪১ সালে তাঁরা দেশের দিকে যাত্রা করলেন। রঙ্গো বাপুজী মার্টায় পৌঁছে রাজার কাছ থেকে খবর পেলেন আবার লগুন পৌঁছে তদ্বিষয়ের কাছে আত্মনিয়োগ করার। রঙ্গো বাপুজী চেষ্টায় ক্রটি করেননি। তাঁকে যোশেফ হিউম ও জর্জ টমসন নামক দুজন ইংরেজ যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু সাতারায় প্রাক্তন নৃপতির কপাল

খুললোনা রঙ্গো বাপুজী একেবারেই ইংরেজী ভাষা জানতেননা। পরে যখন বুঝলেন ঐ ভাষাটা না জানলে বিদেশে কাজ এগোবেনা তখন অল্প সময়ের মধ্যে শিখে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁর বারো বছরের বিদেশবাস ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে রাজা প্রতাপ সিংএর মৃত্যুর পরেও রঙ্গো বাপুজী রাজার পরিবারের পক্ষ থেকে দাবী আদায়ের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন হরিঅবতার দাস লিখেছেন—ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে দেশে ফেরার মত অর্থও তাঁর আর ছিলনা। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী শেষ পর্যন্ত তাঁর জাহাজভাড়া ও তৎসহ আড়াই হাজার পাউণ্ড নগদ দিয়ে ইংলণ্ড থেকে বিদায় দেয়। দেশে ফেরার সময় তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা যে রৌপ্যফলক উপহার দেয় তাতে জোসেফ হিউম জন ব্রাইট ও জেমস গ্র্যাণ্ট ডাক্তার স্বাক্ষর ছিল।

এই সময়কার সর্বাধিক রোমান্টিক বিলাত যাত্রা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের। সবরকম অর্থেই রোমান্টিক শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ায় সঙ্গে প্রিন্স দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়িয়েছিল তা জানার কোন উপায় এখন আর নেই। প্রিন্সকে লেখা মহারাণীর চিঠিগুলিও চিরদিনের মত যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে। দ্বারকানাথ ইউরোপ যাত্রার সময় সঙ্গে একজন ইংরেজ ডাক্তার ও একজন মুসলমান বাবুঁচি ও তিনজন হিন্দু ভৃত্য নিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে যাবার পথে তিনি রোমে অবতরণ করেন, সেখানে পোপ তাকে সন্মিলন জানান। লণ্ডনে পৌঁছবার পর কোম্পানীর ডিরেক্টররা তাঁর সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করেন। রাণী ভিক্টোরিয়া ও যুবরাজ স্বয়ং তাঁকে রাজপ্রাসাদে সন্মিলন জানিয়ে রাজপরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর সম্মানের জন্ত সেদিনেই তিনটি স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দ্বারকানাথকে উপহার দেন। লণ্ডনে অবস্থানের সময় তিনি প্রায় সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করেছিলেন—তার রবার্ট পীল, লর্ড ফিটজেরাল্ড লর্ড ব্রাহাম, মাকুইম অব ল্যান্সডাউন ও লর্ড পামারষ্টেন। লিভারপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার ব্রিস্টল ও স্কটল্যান্ড সফর করে আবার যখন রাজধানী লণ্ডনে ফিরে এলেন তাঁকে উইন্সটার ক্যাসেলে মহারাণী ও যুবরাজ মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করলেন। তারপর মহারাণী, যুবরাজ ও প্রিন্স দ্বারকানাথের তৈলচিত্র অঙ্কিত হল পাশাপাশি বসিয়ে। দেশে ফেরার পথে ফ্রান্সে লুই ফিলিপ তাঁকে সন্মিলন জানান। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ডের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়।

১৮৪৫ সালে দ্বারকানাথ আবার ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এবার লুই ফিলিপ তাঁকে ভিসাঁই নগরীতে এই বিশেষ উৎসব অলুঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। এই উৎসবে দ্বারকানাথের যোগদানের বর্ণনায় বলা হয়েছে—মেলায় আগত হাজার হাজার উৎসুক নরনারীর মুখে একটাই প্রশ্ন : এই মানুষটি কে? কে সে নরশ্রেষ্ঠ থাকে আমাদের রাজা স্বয়ং সন্মিলন জানাচ্ছেন? বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মঃ ফুয়েং মানুষের এই কৌতূহল কিছুক্ষণ উপভোগ করে করে অবশেষে বললেন—এই বিশিষ্ট ব্যক্তি খোদ স্বর্গের রাজা। একথা শুনে সমাগত নরনারী মঁদিউ বলে চৈচিয়ে উঠলেন ও জানালেন, এটা তাঁদের পরম সৌভাগ্য যে স্বর্গে না গিয়েও পৃথিবীতে বসেই তাঁকে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হল। দ্বারকানাথ লণ্ডনে ১৮৪৬ সালে মারা যান। তাঁর বিলাত কেমন লেগেছিল সে বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। অন্য ব্যক্তির বিবরণ থেকে আন্দাজ করে নিতে হয়।

১৮৪৩ সালে লুফউল্লা নামক আর একজন ব্যক্তি জনৈক দেশীয় নৃপতির প্রতিনিধিরূপে লণ্ডন যান। পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদলের তিনিই ছিলেন একমাত্র ইংরেজী জানা ব্যক্তি। তাঁর ভ্রমণকাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যদিও আবেগবর্জিত। এদেশে থাকার সময় ইংরেজদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছেই তাঁর ধারণা পাল্টায়। এ কথা বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন যে মিশর ছাড়িয়ে যতই ইংলণ্ডের কাছাকাছি যাচ্ছি—ততই ইংরেজদের সৌজন্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। যুবরাজ এলবার্টের সঙ্গে তাঁর যখন দেখা হয় তখন যুবরাজ তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন—এদেশের সবচেয়ে ভাল লেগেছে কোনটি? লুফউল্লার জবাব—অভিজাত ব্যক্তিদের সৌজন্যবোধ। যুবরাজ এই জবাব শুনে কেবল একটু মুচকি হেসে সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু সাউদাম্পটন বন্দরে পৌঁছাবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা তাঁদের সমগ্র দলকে বড়ই লজ্জা দিয়েছিল। সাউদাম্পটন বাজারে যাবার সময় তাঁদের বিচিত্র পোষাক গাত্রবর্ণ ও ভাষা শুনে দলে দলে লোক জমতে থাকে তাঁদের দেখার জন্ত। যেখানেই যান, পায়ে পায়ে একদল জনতা আকুল ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁদের সঙ্গে চলতে থাকে। ‘আমরা যেন সপ্তমাশ্চর্যের অল্পতম আশ্চর্য।’ এভাবে পাঁচজনের দ্রষ্টব্য হয়ে পথে চলা দায়। বাধ্য হয়ে হোটেল ফিরে এলেন। বাজার করা হলনা। জনতা এভাবে পশ্চাদ্ধাবন করায় দলের বিশিষ্ট সদস্য জবদরুদ্দীন রোগ গিয়ে বললেন—‘ইচ্ছা করছে ওদের ইট ছুড়ে মারি।’

‘দোহাই হুজুর, অমন কাজ করবেন না। ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করেছে। ওরা খুব সাহসী। ওদের মারলে আমাদেরও পালটা মার খেতে হবে।’

সাউদাম্পটন থেকে লণ্ডনে। সেখানে তাঁরা প্রথমে ছিলেন মিভার্ট হোটেলের কিন্তু ভাড়া বেশী হওয়ায় বাড়ীভাড়া করে অগ্রজ চলে যান। লণ্ডনের প্রথম বৈশিষ্ট্য যেটা তাঁর নজরে পড়েছিল তা হল লোহার অরূপণ ব্যবহার। ঝোলাপুল ও লম্বা ভাসমানপুল সবই লোহার তৈরী। এমন বাড়ী খুব কমই আছে যেখানে লোহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়নি। বাড়ীর চারিধারের বেড়া গেট, দরজা জানালা সবকিছুতেই লোহা; “এদেশে নিশ্চয়ই অনেক লোহার খনি আছে।” লণ্ডনে কোম্পানীর মিউজিয়মে তিনজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। হিন্দুস্থানী ডিক্সনারীর সংকলনিতা জন সেক্সপীয়রের পরিচয় শুনে লুফউল্লা হিন্দুস্থানীতে বাক্যল্যাপের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন ভুল্লোক বিন্দুমাত্রও হিন্দুস্থানী জানেননা। অবশ্য অধ্যাপক উইলসনের সঙ্গে কথা বলে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

“ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবে বাঙ্গালীর কীভি” নামক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধে (“সাহিত্য” পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১) একজন বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে। প্রবন্ধের সারাংশ এই—ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইর শেষ উপপত্নী মাদাম দুবারীর একজন বালক ক্রীতদাস ছিল। তার নাম—“জামর”। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যকারী একটি ইংলণ্ডের জাহাজের কাপ্তেন বাঙলাদেশ থেকে একটি বালককে কিনে বা জোর করে নিয়ে যায় এবং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীসে মাদাম দুবারীর কাছে বেচে দেয়। জামর হন সেই বালক। তার পুরো নাম—লুই বেনেডিক্ট জামর। মাদাম

দুবারীর আশ্রয়ে থেকে সে লেখাপড়া শিখতে থাকে এবং রুশোর লেখা পড়ে ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্রকে অন্তরে গ্রহণ করে। কিন্তু জামর বিশ্বাসঘাতক এবং কৃত্রিম। তারই চেষ্টায় এবং গ্রীভ নামে একজন ইংরেজ বিপ্লবীর সহায়তায় মাদাম দুবারীকে হত্যা করা হয়। এরপর ফরাসী বিপ্লবের কর্মীরাও জামরকে বিশ্বাস করত না। জামর নিরুদ্দেশ হয়। ওয়াটালুর যুদ্ধ, নেপোলিয়নের নির্বাসন, অষ্টাদশ লুইয়ের সিংহাসনে অধিরোহনের পর জামরকে প্যারিসের একটি নোংরা পল্লীতে দেখা যায়। তখন সে নির্বাক, কেউ তাকে কৃপাও করত না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সে খাঁটি ভক্ত ছিল। তার মৃত্যুকালেও তার সঙ্গে মারাট ও রোবেশপিয়রের দুখানি মলিন ছবি এবং রুশোর ক'খানি বই ছিল।

সালের ১৮৭০ আগে পর্যন্ত খুব বেশী রাজামহারাজা ইওরোপযাত্রা করেননি। কুর্গের রাজা কিছুদিন ভেলোর ও বেনারসে বন্দীজীবন যাপনের পর ইংলণ্ড যাত্রার অনুমতি পান। ১৮৫২ সালে তিনি সফল ইংলণ্ড যান। সেখানে পিতার অনুমতিক্রমে রাজকন্যাকে ধর্মাস্তরিত করে কর্ণেল জন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। রাজকন্যা অবশ্য কিছুদিন পরেই মারা যান। রাজা মারা যান ১৮৬৩ সালে। কেনসলগ্রীনে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়।

কুর্গের রাজার আগে আলমোড়ায় রাজা জারমন্ট রোহিল্লায়ুদের ঠিক পরেই ইংলণ্ড গিয়েছিলেন কিন্তু কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়না। প্যারিসে পিয়ের লাসেজ সমাধিক্ষেত্রে (২নং মহমেডানক্ষেত্র) অযোধ্যার রাণী ও তাঁর ছেলের সমাধি আছে।

ক্লোরেন্সের কাছে ক্যাসেইনে কোলাপুরের রাজার স্মারকসম্বন্ধ আছে। তাতে কোলাপুরের রাজার মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ক্লোরেন্সে ১৮৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ও সেখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিস্মৃত সীতানাথ ঘোষ

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম অথচ অধুনা প্রায় অপরিচিত সম্পাদক সীতানাথ ঘোষ। সীতানাথের পরিচয় এই একটাই নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন “এই প্রসঙ্গে সীতানাথবাবুর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন।” কিন্তু বোধকরি সীতানাথের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পরিচয় হল : বালক রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞান পড়বার জন্য তিনিই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিশোর মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে পর্যাপ্ত কোতূহল জাগাতেও পেরেছিলেন। বাল্যজীবনের অধিকাংশ শিক্ষকই রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে চকচকে বেতের ধ্বংসাবশেষ কিন্তু সীতানাথ সম্পর্কে ছাত্রের স্মৃতি রোমন্থন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কথা পরে আলোচ্য।

সীতানাথের জীবনকথা সম্বন্ধে কিছু তথ্য যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার একদা প্রবাসী পত্রিকায় পরিবেশন করেছিলেন। ১২৪৮ সালের ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে যশোহরের রায়গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা গিরিধরঘোষ, মাতা-আনন্দময়ী। গিরিধর চাকরি করতেন নোয়াখালিতে। কিছুদিনে গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক লেখাপড়ার পর সীতানাথ নোয়াখালির জেলাস্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু অসুখ হওয়াতে আবার তাকে রায়গ্রামে ফিরে আসতে হয়। তখন সীতানাথ নড়াইলের জমিদারদের ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই এনট্রান্স পরীক্ষা দেন ও বৃত্তি লাভ করেন। “অবস্থা ভাল না থাকায় এবং অন্যান্য কারণবশতঃ তিনি কলেজে তাহার পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।”

বাল্যকাল থেকেই সীতানাথের বৈজ্ঞানিক কোতূহল একটু বেশী। বৃত্তিলাভের পর কলকাতায় এসে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তখন মফঃস্বলের লোক কলকাতায় এলে প্রথমেই হত ‘লোনালাগা’ রোগ—কার্তিকৈয়চন্দ্র রায় তাই বলেছেন। কিন্তু সীতানাথের এসেই হল ‘বাত’। তখন রায়গ্রামে ফিরে গিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। তাও কিছুদিনের জন্য। এবার সীতানাথ একটু স্কুলের শিক্ষক হলেন। তাও কিছুদিনের জন্য। তখন তিনি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কিছুদিনের জন্য চাকরি করেন। ১৮৭০ সালের ২৪শে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকায় জানা যাচ্ছে। ‘এক্ষণে কলিকাতায় অল্প বেতনে কেরানিগিরি করিতেছেন’। ‘যখন তিনি কলিকাতাস্থ কটোলার অফিসে কার্য করিতেন, তখন এক দিবস কার্যালয়ে যাইবার পথে চাকুরীরূপ দাসত্ব বৃত্তির উপর ঘুণা হওয়ায় সেই দিনই কার্যে ইস্তফা দেন।’ [যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার]

সীতানাথ এবার বিজ্ঞানে বেশি নজর দিলেন। ‘চাকুরী ত্যাগ করিয়া সীতানাথ বিদ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন’। শুধু বিদ্যায় নয় চুষকের ধর্মেও তাঁর কোতূহল। তিনি বলতেন “It has been found by experiments that the human body is a magnetizable object through for inferior to Iron or Steel”.

এই তথ্য নিয়ে আরও গবেষণা শুরু করলেন সীতানাথ। মা ঠাকুমারা বলেন উত্তর দিকে মাথা রেখে শোওয়া উচিত নয়। এ “কুসংস্কার” কেন? সীতানাথ কিন্তু এর পৌরাণিক প্রমাণ পেলেন। প্রথমত আঙ্গিকতত্ত্বের শ্লোক—

স্বর্গঃ প্রাকশিরাঃ শেতে
আয়ুস্তো দক্ষিণা শিরাঃ
প্রত্যেক শিরাঃ প্রবাসে তু,
ন কদাচিহ্নদক শিরাঃ।

অর্থাৎ নিজের বাড়িতে শোবার সময় পূর্ব দিকে মাথা রাখা উচিত। তবে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শুলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। প্রবাসে গেলে পশ্চিমেও মাথা রাখা যায়। কিন্তু উত্তর দিকে মাথা রেখে শোওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

দ্বিতীয় শ্লোক—

প্রাক শিরাঃ শরনে বিত্যাং,
বলমাযুচ্চ দক্ষিণে,
পশ্চিমে প্রবলাং চিস্ত্যাং
হানিং মৃত্যুমথোত্তরে।

অর্থাৎ পূর্ব দিকে মাথা রেখে শুলে মানুষ জ্ঞানী হয়, দক্ষিণে রাখলে বলবান ও দীর্ঘজীবী, পশ্চিমে রাখলে চিন্তা হয় আর উত্তর দিকে মাথা রেখে শুলে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এর পরেও এ ব্যাপারে কেউ যদি আরো পৌরাণিক রেফারেন্স খুঁজতে চান তবে তিনি বিষ্ণু পুরাণে পাবেন—

প্রাচ্যাং দিশি শিবঃ শস্তং
বামাষামথবা নৃপ
সদৈব স্বপতঃ পুংস
বিপরীতস্ত রোগদং

পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শোওয়াই ঠিক বিপরীত অর্থাৎ পশ্চিম বা উত্তরে মাথা রেখে শুলে রোগের সম্ভাবনা।

এখন দেখা যাচ্ছে উত্তরে মাথা রেখে শোওয়া অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক উদ্ভৃতি তাই বলে। শাস্ত্রের প্রতি ‘বৈজ্ঞানিক’ সীতানাথের প্রচণ্ড বিশ্বাস। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন মন্দিরের চূড়ায় যে লোহার ত্রিশূল থাকে তাও বিজ্ঞানভিত্তিক। প্রবন্ধটিতে ছবি ছিল—
“A Temple with Iron trisul”। এমনকি সীতানাথ “বৈজ্ঞানিক মাদুলী”তেও বিশ্বাসী। বস্তুত বহুবিধ কলের জনক সীতানাথই বৈজ্ঞানিক মাদুলীর আবিষ্কর্তা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার সচিত্র প্রবন্ধ ছিল এ বিষয়ে : ছবি ছিল,—“An asthmatic Patient with manduli”। এই বৈজ্ঞানিক মাদুলীর কপিরাইট সীতানাথ দান করেছিলেন ব্রজমোহন করকে। “কর মহাশয়” তাই দিয়ে যথেষ্ট “খ্যাতি ও অর্থ লাভ করিয়াছেন”। সে কথা থাক, উত্তর দিকে মাথা রেখে শোওয়ার বিরুদ্ধে পৌরাণিক নিষেধাজ্ঞা পাবার পর সীতানাথ এবার বিজ্ঞানের গভীরে নামলেন। বিজ্ঞানও বলছে “পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ধরিতে গেলে মস্তিষ্কের মস্তক উত্তর মেরু এবং হৃৎপিণ্ডাদি দক্ষিণ মেরু

বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে” এই ব্যাপারটাও তত্ত্ববোধিনীতে সচিত্র প্রবন্ধ যোগে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ছবি ছিল, “A man lying down on the surface of the Northern sphere of the Earth with his head South ward.”

এই “ধর্ম” থেকেই জানা গেল এক বৈদ্যুতিক চিকিৎসার কথা। একটি কাঠের ফ্রেমে বিলিত থেকে আনা ১/১৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ৬০০০ ফুট ‘অপরিচালক’ তামার তার চারবারে জড়ান হয়। তারের দুই প্রান্ত (ধন প্রান্ত ও ঋণ প্রান্ত) ফ্রেমের দু’পাশে পেতলের জুতে আটকান থাকে। যন্ত্রটি ২৬ ইঞ্চি লম্বা দু’পাশের পরিধি ১০ ও ২৪ ইঞ্চি। এই ধরণেরই কিন্তু সাইজে বড় আর একটা যন্ত্র সীতানাথ পরে করেছিলেন সেটা ৪ ফুট লম্বা দু’পাশের পরিধি ১৪ ও ২১ ইঞ্চি—দশ হাজার ফুট তার জড়ান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই যন্ত্র দেখেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সমাদার যখন প্রবন্ধটি লেখেন তখনও সীতানাথের বাড়ীতে একটি যন্ত্র ছিল, তবে কার্যকরী অবস্থায় নয়।

যন্ত্রটির তারসহ ফ্রেমটি চট, মোমজাম ও চামড়ার আবরণী দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। এরপর জু দুইটির সংগে গ্যালভানিক ব্যাটারীর যোগ করে দেওয়া হয়। সীতানাথের এই প্রাচীন পুরাণ ও গ্যালভানিক ব্যাটারী মিশিয়ে “কল” প্রস্তুতের উদ্দেশ্যেই রসিকতা করে কি একদা ছাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছিলেন “প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারী ছিল কিনা?” উৎসাহী পাঠককে প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

সে যাক, এই যন্ত্রটির নাম হল “Magnetic Healer” ‘ভারতে এই বৈদ্যুতিক চিকিৎসার জনক সীতানাথ। তিনি তাঁর বইয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছেন “Founder of electropathy—Magnetic System of treatment in India” বলে। ১৮৮০ সাল নাগাদ ৫৪ নং মেছোবাজার স্ট্রীটে সীতানাথ এই যন্ত্রে চিকিৎসার জন্ম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন।

আগেই বলেছি পৃথিবীর হিসেবে আমাদের মাথা উত্তর দিকে। এখন এ অবস্থায় রোগীর প্রতি এই যন্ত্র ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে। “ব্যাটারীর ‘ধন প্রান্ত’ ও ‘ঋণ প্রান্ত’ তাড়িত তারযন্ত্র যেভাবে যোগ করিয়া দেওয়া হইত তাহাতে রোগীর মস্তক দক্ষিণ দিকে থাকিলে রোগ উপশম হইত কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম করিলেই রোগ বৃদ্ধি পাইত” আবার ‘ব্যাটারীর তারে ধনপ্রান্তের দিকে ঋণপ্রান্ত ও ঋণপ্রান্তের দিকে ধনপ্রান্ত যোগ করিয়া দিলে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিরেক হইত এবং সেজন্য রোগী আরও যাতনা ভোগ করিত।” এর কারণ আর কিছুই নয়। সীতানাথের ধারণা মাথা উত্তর দিকে রাখা-না-রাখাই হল মৌল প্রশ্ন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মাথা উত্তরদিকে রাখার প্রশ্নে সীতানাথ এ দেশে প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদ শুরু করলেও বিদেশে আগেই শুরু হয়েছে। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা সংক্রান্ত যে ইংরেজী বইটি (Medical Magnetism) সীতানাথ প্রকাশ করেছিলেন যেটি যন্ত্রস্থ অবস্থাতেই সীতানাথের অকালমৃত্যু হয়। বই প্রকাশকালে পরলোকগত সীতানাথের ভাই জ্ঞানকীনাথ ঘোষ লিখেছিলেন “The subject of the proper position of the head of a man in the bed which has at present engaged the attention of eminent electrician has been discussed at length by Babu Sitanath Ghosh and he has proved by reasoning based solely upon experiments

by futility of the theory laid down by Mr. Baron von Richenbach of Germany."

এই সময় 'কলিকাতা হইতে প্রকাশিত' হিন্দুপত্রিকার সম্পাদক হন সীতানাথ। হিন্দু পত্রিকার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় কিনা জানি না তবে 'বাংলা সাময়িক পত্রে' তার উল্লেখ নেই। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন সীতানাথ হিন্দু তাড়িৎজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সময়টা ১৮৭১ সাল।

"In Summer of the year 1871 requested by some of my friends, I delivered two successive addresses at the National Society's (১) meeting in the Calcutta Training Accademy's (২) Hall on the ideas I conceived about the electrical and Magnetical importance of the said Practices." বলছেন সীতানাথ স্বয়ং। হিন্দুপত্রিকার প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধমালা ও উপরিউক্ত দুটি বক্তৃতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নজরে পড়ে এবং ভাল লাগে। প্রসংগত উল্লেখ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পদটি তখন খালি হতে চলেছে। সমসাময়িক সম্পাদক অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর প্রতি মহর্ষি বিরক্ত হয়েছেন। ১৮৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট অযোধ্যানাথ দেহত্যাগ করেন—মৃত্যুর আগে "৩ মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া"। রামগোপাল সাহা জানিয়েছেন হিন্দু প্যাট্রিয়টে অযোধ্যানাথের মৃত্যুর সংবাদে জানান হয়েছিল যে অযোধ্যানাথের ভাই এ সময় নিহত হন, অযোধ্যানাথ মহর্ষির বিরাগভাজন হন এছাড়া অযোধ্যানাথের বহুমুখ রোগের বাড়াবাড়ি ত ছিলই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বছর শুরু হয় ইংরেজি এপ্রিল এবং বাংলা নববর্ষ বৈশাখ থেকে। নতুন সম্পাদকও নিযুক্ত হন সে সময়। সীতানাথ সম্ভবতঃ সম্পাদক হন ১৮৭২ সালের এপ্রিল থেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন সীতানাথ "কিছুদিন" সম্পাদক ছিলেন। সাধারণতঃ এই চর্চিত চর্চনই ফুটনোটে উল্লেখ করা হয় বিনা অস্বস্তানে। অথচ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক হিসেবে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম উল্লেখ করা হয় ১৮৭৭ সালের এপ্রিল থেকে। এই মধ্যবর্তী সময়টুকুর সম্পাদক কে ছিলেন তা আলোচনা হওয়া দরকার।

১৮৭২ সালে পত্রিকা সম্পাদনাকালে সীতানাথ তত্ত্ববোধিনীতে ৩৫১, ৬৫২ ও ৭৫৩ সংখ্যায় বিদ্যুৎ ও চুম্বকের গুণাবলী নিয়ে যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন তার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বছরে ৩৬৫ সংখ্যায় তিনি আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন। "The essays were illustrated by sour engraved plates"। উপরিউক্ত সংখ্যাগুলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নেই। বরং ৩৭৩ সংখ্যায় 'তড়িতির আশ্চর্য লীলা' প্রবন্ধ পাওয়া যায়। ৩৭৪ সংখ্যায় রয়েছে 'স্বাস্থ্যনিবাস' নামে একটি আপাত নিরীহ প্রবন্ধ। মূলতঃ এ প্রবন্ধের বক্তব্য আমরা নদীর ধারে স্বাস্থ্য নিবাস নির্মাণ করি কেন। আগেই বলেছি মল্লভ্যাদেহ চুম্বকশক্তি গ্রহণে সক্ষম আর প্রবহমান নদীর স্রোতে রয়েছে বিদ্যুৎ। তাই নদীর ধারে স্বাস্থ্যনিবাসে আমরা স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে যাই। (৩)

তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হবার আগে থেকেই সীতানাথ মহর্ষির স্নেহভাজন হয়েছেন হিন্দু পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার জন্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হবার পর তিনি ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের সংগে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্ববর্তী সম্পাদক

অবোধানাথ পাকড়ানী ঠাকুরবাড়ীর মেয়েবোঁদের লেখাপড়া শেখাতেন। সেই প্রথম ঠাকুরবাড়ীর অন্তরমহলে বহিরাগত পুরুষশিক্ষক। সে যাক্ এবার সীতানাথ নিযুক্ত হলেন অল্পরূপ একটি কাজে—কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের গৃহশিক্ষক। গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষার বর্ণনা স্বয়ং ছাত্র ‘জীবনস্মৃতি’তে ধরে রেখেছেন। ক্রটির মধ্যে বাল্যস্মৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে সীতানাথ ঘোষকে তিনি বলেছেন সীতানাথ দত্ত। সম্ভবতঃ সমসাময়িক অপর শিক্ষক সাতকড়ি দত্তের পদবীর জগুই তাঁর স্মৃতিতে এই বিভ্রাট ঘটেছে। তাই জীবনস্মৃতির টীকায় জানা যায় “সীতানাথ নামে সমসাময়িক অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের জোড়াসাঁকো বাড়ীতে যাতায়াত ছিল না।” ‘সীতানাথ দত্ত’ই আসলে সীতানাথ ঘোষ।

নানাবিভার আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ বলছেন “প্রায় মাঝে মাঝে [অর্থাৎ প্রায় প্রতি রবিবার। রবিবার স্কুলের ছুটি তাই যেদিন সকালে বিজ্ঞান পড়াতে আসতেন সীতানাথ। কবি বলেছেন “যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।] সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতত্ত্বযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।” “যন্ত্রতত্ত্ব” কথাটা দ্ব্যর্থক হতে পারে। সীতানাথ এ সময় প্রাচীন পুরাণতত্ত্ব এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমাহারে প্রবন্ধ লিখছেন—যন্ত্র প্রস্তুত করছেন। কবি তারই উদাহরণ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন “এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বজনক ছিল। জল দিবার সময় তাপ সংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এই জগুই জল টগবগ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিশ্বয় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। হৃদয়ের মধ্যে জল জ্বিনিষটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটা যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল।”

প্রসংগত বলা দরকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময় ফ্রেনোলজির ছাত্র। তিনি বিভিন্ন লোকের ‘মাথা’ দেখে পরীক্ষা করতেন। আবার “জন্মকাল হইতেই সীতানাথের মস্তক অস্বাভাবিক বৃহদাকারের ছিল।” জানিনা, এজন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সীতানাথের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা।

সে যাক্ এ সময় ‘স্বদেশী’ উদ্ভেজনার দেশ ভরপুর। সঞ্জীবনী সভার সেই রোমাঞ্চের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে রেখেছেন। ‘স্বদেশিকতা’ অধ্যায়ে কবি ‘স্বদেশী’ উদ্ভাদনার বিভিন্ন দেশী কল তৈরির খবর দিয়েছেন। দেশলাই তৈরির কল, কাপড়ের তাঁত তার অন্যতম। সীতানাথও এই ব্রতে নামলেন। ‘নূতন ধরণের বস্ত্রবয়নের’ যে কল তিনি প্রস্তুত করলেন তা রেখিয়ার মহারানী পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনতে চাইলেও সীতানাথ দেননি। অর্থাভাবে নিজেও চালাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দেশলাইয়ের কল থেকে এক বাস্ক দেশলাই তৈরি করতে যা খরচ পড়বে তাতে একটি গ্রামের সারা বছরের দেশলাই খরচ মেটান যেত। অনুমান করা যেতে পারে সীতানাথের কাপড়ের কলও ছিল সেইরকম। এ ছাড়াও তিনি গমভাদ্রানির কল, ধানের কল, কলের লাংগল, কলের নৌকাও তৈরি করেন। তবে তাঁর বড় কৃতিত্ব লিখবার জন্য ও মুদ্রায়ন্ত্রের

জ্ঞান তিনি কালি তৈরিও করেন। “তঁাহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয়কে এই কালি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেন।’ আজকাল A. L Roy-এর কালির বাজারে বেশ নাম আছে এবং রায় মহাশয় কালি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জনও করিয়াছেন; কিন্তু প্রস্তুতকারক ইচ্ছা করিয়াই উহাকে লাভের ব্যবসায় পরিণত করেন নাই।”

সীতানাথ এরপর বিস্মৃতিকা রোগে আক্রান্ত হন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অসুস্থ সীতানাথ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু স্বদেশী উত্তেজনা তখনও রয়েছে পুরোদমে। গ্রামশাল নবগোপাল মিত্রের মত তিনি স্বদূর রায়গ্রামেও স্বদেশীমেলার আয়োজন করতেন। “সীতানাথের উদ্যোগে রায়গ্রামে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইত। মেলাস্থলে তিনি ভাটিখানা খুলিতে বা বেস্তাদের আসিতে বা থাকিতে দিতেন না। এক সময়ে কয়েকজন বেস্তা মেলাস্থলে থাকিবার জন্য তাঁহার নিকট দরবার ও একসহস্র মুদ্রা প্রণামী বাবদ দিবার প্রার্থনা করে। সীতানাথ ঘৃণাভরে তাঁহাদের মোক্তারকে দূরীভূত করেন।’ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে ‘স্বদেশী’ সীতানাথকে পেলেও বৈজ্ঞানিক সীতানাথকে পাই অজ্ঞ। ‘যখন এই প্রদর্শনী খোলা হইত তখন নদীর ঘাট হইতে প্রদর্শনীর কার্যালয়ে সীতানাথ টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ঘাটে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়ের সম্মান করিতেন। সীতানাথ একাই এ সকল কার্যনির্বাহ ও তত্ত্বাবধান করিতেন। যখন গ্রামে প্রদর্শনী হইত তখন সীতানাথ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন।”

মেলা ছাড়াও সীতানাথ গ্রামে স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় নজর দিলেন। মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস প্রতিষ্ঠাতেও তিনি বহু পরিশ্রম করেন। স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় করার জন্যও সীতানাথ বহু চেষ্টা করেন।

এরপর কবে সীতানাথ স্বস্থ হয়ে কলকাতা ফিরেছিলেন সঠিক জানা যায়নি কিন্তু ১৮৮০ সালে তিনি মেছোবাজারে ডাক্তারখানা করেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। এছাড়া আগে আরও বলেছি সীতানাথ ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। স্বদেশী উন্মাদনায় তাঁর বৈজ্ঞানিক মন বহু কল তৈরী করেছিল। স্বাদেশিকতা অধ্যায়ে জেনেছি এসব কলে প্রচুর অর্থব্যয় হোত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দেৱাছুনে অসুস্থ তখন এখানে সীতানাথ ঋণভার জর্জরিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন ‘পিতৃদেব যখন দেৱাছুনে ছিলেন আমি কোন বিষয়ে কর্ম উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম তিনি সীতানাথ ঘোষের পত্র বাহির করিয়া বলিলেন “বেচারি বড় কষ্টে পড়েছে”। এই বলিয়া সীতানাথকে ৭০০০ টাকা দিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। শুনিলাম সীতানাথবাবু অতটাকা পাইবেন বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই। বলা বাহুল্য সীতানাথের এই ঋণভাবের কারণ নিয়ে আগেই আলোচনা করা গেছে কিন্তু কেন মহর্ষি সীতানাথের প্রত্যাশারও অতীত সাত হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করলেন তাঁকে তার স্পষ্ট ধারণা করা দরকার। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে মনে হয় সীতানাথ অর্থ সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, স্বয়ং দেৱাছুনে যাননি। দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সৌদামিনীদেবী জানাচ্ছেন ‘সীতানাথ ঘোষ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া যখন তাঁহার (মহর্ষির) কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি এককালে সাত হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ

তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।' সীতানাথ না হয় দেৱাত্বনে স্বয়ং গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ঋণভার কমাতে মহর্ষির 'অপ্রত্যাশিত' পরিমাণ দানের পিছনে একটি ছোট্ট ঘটনাও পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষদর্শী কালীমোহন ঘোষের কলমে। 'মন্ডুরী অবস্থানকালে বৎসরাধিক কাল মহর্ষিদেব পীড়িত থাকেন; ক্ষুধার উদ্রেক একেবারেই হইত না; আহার দুই পেয়ালা অর্ধসের আন্দাজ দুধ মাত্র। ৩৮ সীতানাথ ঘোষ মহাশয় নিজে উদ্ভাবিত একপ্রকার বৈদ্যাতিক প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে যন্ত্রাদির জন্ত মহর্ষি মহাশয় আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। অর্থের অভাবে পড়িয়া এই সময় মহর্ষি সমীপে তিনি মন্ডুরীতে আসেন। আশ্চর্য্য, কি একরূপ বৈদ্যাতিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে একদিন মহর্ষিকে রীতিমত আহার করাইয়া দিলেন। ঋণ পরিশোধার্থ মহর্ষি তাহাকে সাত হাজার টাকা দান করেন।' সহজেই বোঝা যায় এই বৈদ্যাতিক যন্ত্রটি পূর্বে আলোচিত সেই "Magnetic Healer"। আর এই যন্ত্রে সীতানাথ স্বয়ং ত বলেছেন "Every description of indisposition known or unknown, felt or sighted by the patient, is partially or entirely removed, as it is slight or serious."

আগেই বলেছি ১৮৮০ সাল নাগাদ মেছোবাজারে সীতানাথ বৈদ্যাতিক চিকিৎসার জন্ত নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুদিনের মধ্যেই সীতানাথ দেহত্যাগ করেন। ১৮৮৩ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে এই বৈজ্ঞানিকের অকালমৃত্যু হল। মৃত্যুর সাতদিন আগে থেকেই তিনি আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন। জুপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

এই হল স্বল্পায়ু বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সম্পর্কে একমাত্র গৃহশিক্ষক প্রভৃতি বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আজ তিনি অনালোচিত। ডঃ স্কুয়ার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই "কিছুদিনের" সম্পাদকের কথা একটুও বলেননি। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখ সাময়িকপত্রের গবেষকগণ সীতানাথের স্থান দিয়েছেন ছোট অক্ষরের ফুটনোটে। স্বদেশী উত্তেজনার পালাটুকু ছাড়া জীবিত থাকাকালীন অল্প সময়ে সীতানাথ বিশেষ সাড়াও পাননি। তত্ত্ববোধিনীর পাতায় সচিত্র বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনা করলেও তা লোকের চোখে পড়েনি সেদিন। সীতানাথেরও তা অজানা ছিল না—"The singularity of the explanations combined with the oddness of the plates, excited as I learnt, laughter and ridicule among the ordinary readers and applause and admiration mingled with doubts among the more intelligent class of readers." এই শেষোক্ত বুদ্ধিমান পাঠকদের সংখ্যাও ছিল সীমিত। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু সীতানাথের প্রচেষ্টাকে চিরদিনই সমর্থন জানিয়েছেন। তাই বোগীন্দ্রনাথ সমাদর জানিয়েছেন "শ্রীমহর্ষির জ্ঞান যদি আর কেহ কেহ সীতানাথকে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে কে বলিতে পারে সীতানাথও বর্তমান বঙ্গ গৌরব বৈজ্ঞানিকদিগের জ্ঞান সভ্য জগতকে চমৎকৃত না করিতে পারিতেন।"

প্রবন্ধে যে সব তথ্য সংকলিত হয়েছে তাদের সূত্রও যথাস্থানেই উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। শুধু একটি বইয়ের পৃথক উল্লেখ করতে চাই—শ্রীবোগেশচন্দ্র বাগলের 'হিন্দুমেলায় ইতিবৃত্ত'।

(১) তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে মহর্ষির উৎসাহে সীতানাথ তাঁর বিজ্ঞান চিন্তায় নজর দিলেন। সচিত্র বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখলেন তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায়। মনুষ্যদেহে বিদ্যুৎ চার্জকালে সেখানে চুষক শক্তি উৎপাদিত হয় এ তথ্য তখন সীতানাথ পেয়েছেন। এই গ্রাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা স্থাপিত হয় হিন্দুমেলায় চতুর্থ বর্ষে। প্রতিমাসেই বক্তৃতার আয়োজন করা হত। অমৃতবাজার জানাচ্ছেন “সম্প্রতি বাংলায় যে চারিটি বক্তৃতা হইতেছে তাহার প্রথম বক্তৃতা সীতানাথবাবু দিয়েছেন। প্রথম বক্তৃতা যন্ত্রবিষয়ক...। সীতানাথবাবুর বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা স্থলে তাঁহার এয়ার পাশ্পয়ন্ত্র আর তাঁহার সৃষ্ট নূতন একটি তাঁত দেখান। তিনি বলেন তদ্ব্যস্ত্রে একটি লোকের ৪ জনের কাজ করিতে পারে।” সংবাদটি ১৮৭০ সালের ২৪ শে মার্চ তারিখের।

১৮৭১ সালের পঞ্চম অধিবেশনে (১২—১৩ ফেব্রুয়ারি) হিন্দু মেলায় সীতানাথ উপরোক্ত তাঁত যন্ত্র দেখান। ১৮৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি স্থলভ সমাচারে জানা যাচ্ছে “আমাদের বহুকালের বৃদ্ধ মাতামহী চরকা সমস্ত দিন ঘেনর ঘেনর করিয়া চালাইলেও তাহার নিকট হইতে চার আনার সূতা পাওয়া মুশ্কিল, কিন্তু একটি ভদ্রলোক নূতন রকমের একটি সূতার কল প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিন জায়গায় ঘুরিয়া সূতা হইতেছে এবং তাহা আপনা-আপনি জড়াইয়া যাইতেছে। বারবার হাত উচু-নীচু করিয়া একবার সূতা কাটা একবার সূতা জড়ান সে ভোগ ইহাতে ভুগিতে হয় না। খানিকটা তুলা থেকে এক সময়েই সূতাকাটা ও জড়ান হইতেছে। একটি ক্রটি দেখা গেল যে সূতা বরাবর এক আঁচের হইতেছে না। এক একবার মোটা এবং এক একবার সরু হইয়া পড়িতেছে। আশাকরি এ দোষটি শীঘ্রই নিরাকরণ হইবে। সেই লোকটি আবার একটি নূতন রকমের তাঁতের কল করিয়াছেন কিন্তু এ বিষয়ে তিনি এখনও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।’

(২) “বর্তমান সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের সম্মুখে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের পূর্বপারে এক বড়বাড়ীতে যে সময় একটা স্কুল ছিল—তার নাম ছিল ট্রেনিং একাডেমী—Training Accademy” (সত্তর বৎসর—বিপিনচন্দ্র পাল) যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন বাড়ীটির ঠিকানা ১৩ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট।

(৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হবার পর ১৮৭৩ সালের হিন্দুমেলায় (১৫—১৭ ফেব্রুয়ারি) শেষদিনে সীতানাথ বক্তৃতা দিলেন সভাপতি রাজনারায়ণ বসু। বক্তৃতার বিষয় ‘বৃদ্ধের সংক্রামক জরের কারণ’। ১৮৭৩ সালের ২৩শে মার্চ জাতীয় সভার অধিবেশনে রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুরের সভাপতিত্বে যা আলোচনা হয় তাতে মনে হয় সীতানাথের উপরোক্ত প্রবন্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল জানাচ্ছেন “সীতানাথ ঘোষ বিগত মেলায় সংক্রামক জরের কারণ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার ভিতরে এমন অনেকগুলি গুরুতর বিষয় সন্নিবেশিত ছিল যাহা বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয়দের এবং গভর্ণমেন্টের গোচরে আনা কর্তব্য। এতদুভয়ের সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের প্রস্তাবে ইংরেজীতে উক্ত প্রবন্ধের সারমর্ম সংকলনের কথা হয়।” সম্ভবতঃ এ তথ্য তিনি পেয়েছেন ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকার কাটিং থেকে।

অত্মতর নগর

চিন্নয় চট্টোপাধ্যায়

অত্মতর নগর—লক্ষণাবতী—লক্ষ্মী আজও আধুনিকতার দাপাদাপি ও ছোটোছুটির মধ্যেও তন্ম্রাবিজড়িত নগরী যেন মায়াজালে জড়িত স্বপ্নপুরী। এই স্বপ্নপুরীর ইতিবৃত্ত লিখিত আছে প্রাচীন মুদ্রাগুলির মধ্যে। লক্ষণাবতীর ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বৃক্কে ক’রে আজও বেঁচে আছে মুদ্রাগুলি কোষাগারে। এই নগরীর ইতিহাস বলতে হ’লে আরম্ভ করতে হবে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব হতে। পূণ্যশ্রোতা গোমতী নদীর পূর্বতটবর্তী লক্ষ্মণ-টীলা আজও সাক্ষী দিচ্ছে লক্ষণাবতীর অতীত কাহিনীর। এই নগরীর ইতিহাস অল্পসন্ধান করতে হলে উনাও জেলার লোটাপুর মুদ্রা সমষ্টি ও খেরী জেলার পৈলা মুদ্রাসমষ্টির বিশ্লেষণ করতে হবে।

একদিন লক্ষ্মী ও তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী কোশল রাজ্যের অংশ ছিলো। কোশল জনপদের বহু মুদ্রা অযোধ্যা ও তার নিকটবর্তী স্থান-গুলিতে পাওয়া যায়। এই সূত্রে ডাঃ এ, কে শ্রীবাস্তবের ‘মুদ্রার মাধ্যমে লক্ষ্মী’ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। (আর্কেয়োলজি ইন ইউপী-ভলিউম ওয়ান।)

তাছাড়া পুরাকালে ইণ্ডো-ব্যাকট্রিয়ার দুর্দৈর্ঘ্য শাসকগণের অন্ততম সিনাণ্ডার যখন শাক্যে অর্থাৎ অযোধ্যা আক্রমণ করেন ঐতিহাসিকেরা ব’লে থাকেন সিনাণ্ডারের সৈন্যদলের পদচারণে লক্ষণাবতী ধূলায় ধূসরিত হয়েছিলো। কুশান, গুপ্ত ও মোঘলীদের কালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিলো সেগুলি রায়বেরেলী, স্থলতানপুর, খেরি ও বারাংকী প্রভৃতি জেলা হতে পাওয়া যায়।

হুয়েন শাং যখন সম্রাট হর্ষের সময় ভারত ভ্রমণ করেন তাঁর দৈনন্দিনীতে কিশ্বাশি পুলো এবং পো-সিকিয়া নামে দুটি স্থানের উল্লেখ আছে। কিশ্বাশিপুলো ঐতিহাসিক স্মিথের মতে লক্ষ্মী-এর নিকটবর্তী ছোট তহসীল মোহনলালগঞ্জই। এবং পো-সিকিয়া ছিলো লক্ষ্মীয়েই কাছাকাছি মোহনা নামে আর একটি ছোট তহসীল। বিগ্রহ পাল, মিহিরভোজ, বিনায়ক পাল দেব, গোবিন্দ চন্দ্রের মুদ্রাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে লক্ষণাবতী মধ্যকালীন হিন্দু রাজা পুশ্যভূতি গুর্জর প্রতিহার, গহড়ওয়ালাদের শাসিত হয়েছিলো (৫০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

লক্ষ্মীয়েই ইতিহাস আরও স্পষ্ট হয় মুসলমান সাম্রাজ্যের সময়। দিল্লীর সিংহাসনে পর পর তুর্কী, খিলজী, তুগলক ও লোদী সম্রাটেরা যখন সমাসীন হন তখন তাঁদের দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা অর্থাৎ মুসলমানী সিকা হাতে লক্ষণাবতী ইতিবৃত্ত আরও স্পষ্টতর হয় এবং এই মুদ্রাগুলি পাওয়া যায় ১২৪৩-৪৪ থেকে ১২৬৬-৬৭ বৎসরের মধ্যে বারাংকী রায়বেরেলী, হরাদাই ও লক্ষ্মী-এর নানাস্থানে। সৈয়দ রাজাদের কালে অবশু কোন সিকা পাওয়া যায় না। জোনপুরের স্থলতানেরা যখন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরাক্রমশাহী হয়ে উঠেন এবং ১৪৭৬ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশকে বিপর্যস্ত করেন তখন দিল্লীর সম্রাট বল্লাল লোদী লক্ষ্মীকে জয় করেন এবং স্থলতান হুসেন শাহকে পরাজিত

করেন (তারিখ—ই-ফিরিস্তা, ভলিযুম.১, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

কলকাতা থেকে পাঞ্জাবমেনে বা দেরাচুন একসপ্রেসে আসবার সময় যখন বেনারসের পরে জৌনপুর, অযোধ্যা, ফায়জাবাদ এবং বারাণসী স্টেশনগুলি পর পর আসতে থাকে তখন মনে হয় লক্ষ্মী-এর ইতিহাসের সাথে এই যাত্রাগুলির কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যেকটিরই যেন স্বদূর অতীতের কত কাহিনী বলার আছে।

মোগল সাম্রাজ্যকালে সম্রাট হুমায়ূঁ চেয়েছিলেন লক্ষ্মীকে অধিকার করতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর সেই মনোবাসনা পূর্ণ করেন বাবর (বিভারিজ এ, এস “বাবরনামা” (ইং) ভলিযুম ২ পৃ-৫৪৪)। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্মী জয় করেন। “জয় লক্ষ্মী” নামক মুদ্রাগুলির মধ্যে লক্ষ্মী-এর গল্প-কথা ও ইতিহাস লেখা আছে। পরবর্তীকালে সেরশাহ সুরী এই লক্ষ্মীতে একটা টাকশালা স্থাপিত করেন—আজও চকের বাজারের মধ্যে লক্ষ্মীতে “টাকশালা মোহল্লা” নামে একটি পাড়া আছে।

সম্রাট আকবরের সময় লক্ষ্মী-এর ভাগ্যাংশ উদ্ভাসিত হয়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মী “আউধের সরকার” হিসাবে অভিহিত হয় অর্থাৎ তখনকার দিনের এই ছোট্ট শহরটাই হয়ে ওঠে “আউধের” প্রশাসন কেন্দ্র। লক্ষ্মীবতীর মুসলমানী নামকরণ হয়—“দারুল খিলাফত” (আইন-ই-অখবরী পৃ: ৩৭৩)। সে সময়কার রোপ্য ও তাম্র-মুদ্রাগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কোন লক্ষ্মী-এর মুদ্রা পাওয়া যায় না অথচ সম্রাট একদিন এই “দারুল খিলাফতে” পদার্পণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় “মছীভবনের” পশ্চিমাংশে মির্জামুল্লী নামে এক বাজার প্রতিষ্ঠিত করেন (এমপায়ার অব দী গ্রেট মোগলস্ পৃ-৬৩ এবং ডাঃ শ্রীবাস্তবের লক্ষ্মী-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সাহজাহানের সময় লক্ষ্মী-এর চকের টাকশালায় আবার রোপ্য ও তাম্র মুদ্রা তৈরী হতে আরম্ভ হয়। সে সময় তিনি সোনার টাকারও প্রচলন করেছিলেন যাকে বলা হতো “আসফি”।

সম্রাট-আউরঙ্গজেবের সময় লক্ষ্মী-এর টাকশালের মাহাত্ম্য বজায় রাখা হয়। তাঁর সময় সোনা, রূপা ও তাম্রের টাকা পরস্রা তৈরী হতো এই লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মী-মোগলযুগের টাকশাল হিসাবে নিজের প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে শেষ মোগল বাদশাহদের সময় পর্যন্ত যেমন শাহ আলম (১), জাহান্দর, রফিউদ্দজাত ফারুখশিয়ায় এবং মহম্মদ শাহ। সে সময় লক্ষ্মীতে রূপার টাকাই বেশী তৈরী হতো।

শাহ আলাম দ্বিতীয় যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন তখন, এখানে তাঁর উজীর আসাফুদ্দৌলা লক্ষ্মীকে আউধের রাজধানী ঘোষণা করে এই নগরীকে গৌরবান্বিত করেন। দয়ালু নবাব আসফুদ্দৌলার ইমামবাড়া অনেকেই দেখেছেন। কথিত আছে আউধে একবার দুর্ভিক্ষ হয়। তখন নবাব তখন এই ইমামবাড়া তৈরী করান। সারাদিন একে গ’ড়ে তোলা হতো রাজ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হতো। আবার রাজ্যে গড়া হতো দিনের আলোয় এটাকে ধুলিসাৎ করা হ’তো—আহা ভদ্রঘরের সন্তান এমন কি মেয়েরা দিনের বেলা কাজ কি করে করবে তাদের উদর পূর্তিই বা কি করে হবে। নবাবের মনে হলো মানুষ গরীব হতে পারে কিন্তু তার মান-ইজ্জৎ বলে কিছু আছে। মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তবে তার খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। নবাব তাই

করলেন। রাত্রিতে মেয়েদেরও কাজ করার সুবিধা হয়ে গেলো।

এই সময়ের মুদ্রাগুলির মধ্যে শাহ আলম্ব দ্বিতীয়ের নাম ও “বেনারস” এই শব্দটি পাওয়া যায়। মনে হয় এই সময় লক্ষ্মীএর টাকশালকে স্থানান্তরিত করা হয় বেনারসে।

লক্ষ্মী-তার হারাণো গৌরব ফিরে পায় ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন গাজীউদ্দীন হৈদর প্রথম নিজেই আউধের নৃপতি ব’লে ঘোষণা করেন। তখন মুদ্রাগুলির মধ্যে আবার লক্ষ্মীএর নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মী টাকশালের মাহাত্ম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব গাজীউদ্দীন হৈদর লক্ষ্মীকে নতুন নামে অভিহিত করেন—দারুল অমাবৎ অর্থাৎ (শাসন কেন্দ্র) ও দারুস সলতনৎ” অর্থাৎ আউধের রাজধানী এবং নিজে এখানে থাকতেন ব’লে নাম দিয়েছিলেন—“বৈতুস সলতনৎ” (১২৩৬-১২৫৩)।—

লক্ষ্মী-ক্রমে শীর্ষস্থান অধিকার করে ইতিহাসের পাতার পরবর্তী নবাবদের সময় এবং এই এই শহরটি কুষ্টি ও সাধনায়, সঙ্গীতে ও সভ্যতায় চরম উৎকর্ষলাভ করে নবাব ওয়াজিদ আলীর সময়। এখানকার ঐ “বারাদরী” ঐ “ছত্রমঞ্জিল” ঐ “শাহনজফ” একদিন নবাবের লীলাভূমি ছিলো। ঐ যে পুরাতন বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর মধ্যে এখনও অখতপিয়ায় ঠুংরীর সুরের রেশ শুনতে পাওয়া যাবে, আর শুনতে পাওয়া যাবে ঘুঙুরের চন্‌চন শব্দ। নবাব লক্ষ্মীকে ভালবেসেছিলেন প্রেমিক যেমন ভালবাসে তার প্রিয়াকে এবং আদর ক’রে লক্ষ্মীকে বলতেন—অখ্‌তর নগর।” অখ্‌তরনগরের “গুলিস্তাঁতে” “দামিস্কের” রক্তগোলাপ হয়তো আর ফুটবে না কিন্তু তার সৌরভ আজও ছড়িয়ে আছে লক্ষ্মীএর বাগ-বাগিচায়। কথক নৃত্যের তালে তালে বেগমদের পায়ের বঙ্কার বা ঘুঙুরের শব্দ হয়তো কোনদিনই বেজে উঠবে না নবাবী মহলগুলিতে। কিন্তু সূর্যের ডাক শোনার জন্ত যদি কেউ কান পেতে থাকে হয়তো আজও শুনতে পাবে লক্ষ্মীএর আকাশে বাতাসে তার চন্দ। আজও যেন শুনতে পাওয়া যায় বাতাসের সৌ সৌ শব্দের মধ্যে নবাবের গুমরাগী ব্যথার মুহূর্ণ ক্রন্দন। নবাব আজও চাপা কামার সুরে যেন গাইছেন—“বাবুল মোরা নেইহর ছুটো যায়।” বাবুল তো আজও উড়ে বেড়ায় এই—অখ্‌তর নগরে কিন্তু। নেই তার “চাহ-চাহনা” (কাকলী), “গুলিস্তাঁ” আছে, নেই সেখানে অখ্‌তরী গোলাপ, আছে ঠুমরী কিন্তু “দরদ” নেই। আজও এই অখ্‌তর নগরের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় নবাবের বিদায় দিনের শেষ নিশ্বাস।

মানবপ্রেমিক রাসেল

আবার আমরা এক দুঃসহ বেদনার মুখোমুখি হলাম। সকালবেলার সংবাদপত্র হাতে নিয়েই গভীর ব্যথায় বিষগ্ন হয়ে পড়লাম। আমাদের চারিদিককার অজস্র বেদনা, বিকার বিকোভ; সংঘর্ষসেচন বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—মুচুতার আক্ষালন, সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হাতের বিস্তার, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ, আনবিক যুদ্ধের বিভীষিকা যখন জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয়ের দিকে, অব্যর্থ কুয়াশার দিকে বারবার ঠেলে ফেলে দিচ্ছে এহেন কুহেলীকুহক আচ্ছন্ন মানবচৈতন্যকে একক অরুণ প্রকাশক মূর্তিতে যিনি কুস্মিত করতে চেয়েছিলেন সেই নিঃসংগ পদাতিক প্রেমিক রাসেলও আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন!

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স সাতানব্বই হয়েছিল। একটি মাহুঘের পরমায়ুর হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু আজ তাঁর মহাপ্রয়াণের পর ভাবতে হচ্ছে তিনি শুধুই একজন মাহুঘ ছিলেন কী? আপনার আমার মতন—গুণু দিনযাপন আর প্রাণধারণের যানি নিয়ে ব্যস্ত, পরিশ্রান্ত, আপন সীমায় স্ফীত, গর্বিত এবং অসুখায়ুক্ত টম ডিক হারী; হরিপদ, ইয়াসিন, তারাপদ ইত্যাদি অসংখ্যের মতন?

না অসংখ্যের মতন তিনি ছিলেন না। কোথায় যেন একটু ব্যবধান ছিল। ছিল খানিকটা দূরত্ব। যে দূরত্ব থেকে তিনি মাহুঘের স্নান ব্যথিত মুখাবয়ব দেখতে পেয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন তার ক্রুরতা, নির্মমতা। দেখতে পেয়েছিলেন তার হীনতা ও মুঢ়তা অশাস্ত মানবজীবন তাই তাঁকে করেছিল প্রথম যুক্তিবাদী—একহাতে তুলে দিয়েছিল শাসনের বেত্রদণ্ড; অগ্রহাতে সোহাগের স্নেহের, ভালবাসার ও প্রেমের বীজ।

তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ইতিহাসকে কে কোন্ কোন্ পর্বে বিভক্ত করবেন জানিনা! আমি কিন্তু তাঁর সকল পর্বের কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকেই আবিষ্কার করেছি এক ক্ষমাশ্রম প্রেমিক রাসেলকে। তিনি যখন গণিতের জটিলতায় আচ্ছন্ন, বীজগণিতের দুর্ভ্রম সূত্রে মগ্ন—১৯১১তে লেখেন “প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা”, ১৯১৮তে বিশ্বরহস্যের দ্বারউদ্ঘাটনকারী “মিটিসিজিম এ্যাণ্ড লজিক, তারপর রাশিয়া থেকে ঘুরে এসে লেখা “প্র্যাকটিস এ্যাণ্ড থিওরি অফ বলশেভিজিন” ১৯২০ সালে, তারপর ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান ও গাণিতিক সাধনার যৌথ ফলশ্রুতি সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ “এ্যানালিসিস অফ মাইণ্ড (১৯২১)” দি এ. বি. সি. অফ এ্যাটমস্ (১৯২৩)” “এ. বি. সি. অফ রিলেটিভিটি (১৯২৫)” ইত্যাদি এবং পঞ্চাশের পূর্বে লেখা তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসমূহ, স্কেপটিক্যাল এসেজ (১৯২৫) ম্যারেজ এ্যাণ্ড মরালস (১৯২৯), কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস (১৯২৯), আওয়ার নলেজ অফ দি একস্ট্যান্স ওয়ার্ল্ড (১৯২৩) “ফ্রিডম ভারসার্স অরগ্যানাইজেশানস্ শ্রুতি এবং পরিণত বার্ধক্যের রচনা, “অন ইউরোপিয়ান পলিটিকস্,” “ইন প্রেইজ অফ আইডেলনেস” (১৯৩৫) “রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড

সায়েন্স, (১৯৩৫)” “পাওয়ার : এ সোসাল এ্যানালিসিস (১৯৩৮),” “হোয়াই আই এম নট এ ক্রিস্টিয়ান (১৯৪০), “এন ইনকোয়ারি ইনটু মিনিং এ্যাণ্ড টুথ (১৯৫০), “লেট দি পিপল থিংক (১৯৪১) “এ হিসট্রি অফ ওয়েসটার্ন ফিলজফি (১৯৫৬) “অথরিটি এ্যাণ্ড দি ইণ্ডিভিডুয়াল (১৯৪২), “দি ইনপ্যাক্ট অফ সায়েন্স অন সোসাইটি (১৯৫২) “হাজ ম্যান এনি ফিউচার (১৯৬১), ইত্যাদি আরও অনেক অনেক রচনা, বিচিত্র এবং বিভিন্নবিষয়ে আমি কিন্তু সবকিছুর মধ্যদিয়েই আবিষ্কার করতে চেয়েছি এক প্রেমিক রাসেলকে।

মার্ক্সের প্রতি মমত্ববোধে মহান রাসেলের চারচারটি বিবাহ, জ্ঞানের বিচিত্রলোকে দিগন্ত পরিভ্রমণ—আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবনা, পরমাণু বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন, অঙ্কশাস্ত্রের জটিলতার অরণ্যে পদচারণা; মার্ক্সের অবাধ উপভোগের স্বাধীনতার জ্ঞাত আন্দোলন; হাইডপার্কের দাঁড়িয়ে বক্তৃতাকরা ১৯৩০ সালে; মহাযুদ্ধের প্রাকালে যুদ্ধবিরোধিতার জ্ঞাত কারাবরণ; ব্রিটেনের শ্রমিক দলে ধোঁগদান; রাশিয়া ও চীনে পরিভ্রমণ, আমেরিকায় গমন এবং মুক্ত মতবাদ প্রচারের জ্ঞাত তথায় নানা নিপীড়ন ও বহিস্কার এবং পরিশেষে ব্রিটেনে প্রত্যাবর্তন এবং নিজে একজন শান্তিবাদীরূপে সর্বাত্মে চিহ্নিতকরণ। অতঃপর স্বইন্ডেনে ভিয়েতনাম ট্রায়ালে বক্তব্য পরিবেশন ইত্যাদি প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়েই আমি দেখেছি প্রেমিকরাসেলেরই ঘটেছে স্ব প্রকাশ। ১৯২৭ সালে পরীক্ষামূলকভাবে স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে নার্শারিস্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৯ সালে নিউইয়র্কের সিটিকলেজের গণিতের অধ্যাপনা, উত্তরকালে এ্যালবার্ট বার্গসের সঙ্গে কলহ—এসবই সাময়িক ঘটনা। কিন্তু এই সাময়িকতাও প্রেমিক রাসেলেরই জীবনালেখ্যকে উদ্ভাসিত করেছে আমার চোখের সামনে। মনে পড়ছে রাসেলতো নিজেই বলেছিলেন—আমার প্রথম অঙ্ক কষা এবং আমার প্রথম প্রেম একই জিনিস। অঙ্ককষার আনন্দ নিয়ে সত্যউপলব্ধির অগ্রিময়তা নিয়ে রাসেল প্রেম বিতরণ করেছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর প্রেম আমাদের সাধারণের মতন ব্যক্তিক না হয়ে হয়েছিল নৈব্যক্তিক—ইস্পারসেগাল। আর সেই কারণেই হাইডপার্ক বক্তৃতায় শোনা গিয়েছিল প্রেমিক রাসেলের উদাত্ত কণ্ঠ, “ভারত মহাসাগরের উত্তরপ্রান্তে হিমালয় উপত্যকা বরাবর যে ঝড় উঠেছে আজ, সেটা অতলান্তিকের আলোড়ন তুলতে পারে—ব্রিটিশ শাসকদের অমার্জনীয় মূঢ়তা দণ্ড থেকে রেহাই পাবে না।”

রাসেল ব্যথিত চিত্ত ছিলেন সর্বত্র মরুত্বের অবমাননায়। সর্বত্র পরাধীনতার বেদনা তাঁকে বাজতো। তাইতো ষাঁওখুঁটকেও তিনি রেহাই দেননি তাঁর বিচারের বেত্রপাণি থেকে। হিরোসিমার ব্যথার পঙ্কভিলক মেখে তাইতো অসংকোচে ছুড়েফেলে ছিলেন তিনি আমেরিকার প্রযুক্তিবিজ্ঞা ও দর্শনের প্রতি অলুয়গকে।

ভালোবাসার জ্ঞাত—শান্তিরজ্ঞাত (শান্তিতো ভালোবাসারই শেষনাম) রাসেল সারাজীবন লড়াই করে গিয়েছেন। হয়তো বেঁচে থাকলে আরও নতুন নতুন সংঘর্ষে, লড়াইতে নামতে দেখতুম তাঁকে।

ভালো না বাসলে, প্রেম না করলে যুদ্ধ করা যায় না। যে যুদ্ধে ‘প্রেম’ নির্বাসিত তাতে নৈতিক সমর্থন নেই। সেযুদ্ধ পরাজিত হতে বাধ্য। জীবনকে অবমাননা করেন যারা,

ধিকার হানেন মানুষের ভবিষ্যৎকে তাঁরা লঘুচন্দ্র প্রজ্ঞাপ্রেমিকের দল, চারপাশে আত্মসন্ত্রস্ততার শিবির রচনা করে পৃথিবীর সব আলোড়ন আন্দোলন থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখেন শামুকের মতন। আর যারা তাতে সাড়া দিতে চান তাঁরা বাঁপিয়ে পড়েন জীবনের কটক শয্যাকে দেখেও।

সভ্যতার সংকটমূর্ত্ত প্রেমিক কৃষ্ণের মতন, নরনারায়ণের মতন তাঁরাই বাজান পাঞ্চজন্ম। মুরলীধরের কণ্ঠেই নিনাদিত হয় পাঞ্চজন্ম।

ধর্মের গ্লানি, অধর্মের প্রতিষ্ঠার লগ্নে এই শতাব্দীতে রাসেলের কণ্ঠেই আমরা সোচ্চারভাবে শুনতে পেরেছিলাম এক পাঞ্চজন্ম। মনে পড়ছে তাঁর ১৯৬১ (১) সালে প্রকাশিত “হাজমান এ “ফিউচার গ্রন্থের শেষাংশ—“If our present troubles can be conquered, man look forward to a future immeasurably longer than his past, inspired by a new breadth of vision, a continuing hope perpetually fed by a continuing achievement. Man has made a beginning creditable for an infant. No limit can be set to what he may achieve in the future. I see, in my mind's eye, a world of glory and joy, a world where minds expand, where hope remains undimmed, and what is noble is no longer condemned as treachery to this or that paltry aim. All this can happen if we will let it happen. It rests with our generation to decide between this vision and an end decreed by folly.”

এমন কথা রাসেল কি করে বলতে পারলেন? এর পেছনকার রহস্য কি? রাসেল-তাঁর আত্মজীবনীতে অকপট স্বীকার করেছেন যে প্রেমই তিনি চেয়েছেন এবং তাইই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

বাস্তবিকই প্রেমই জীবনকে দেয় মুচ্ছনা। তাকে নবনব উন্মেষের দিগন্তঘারে দেয় পৌঁছে। রাসেল এই পৃথিবীর মানুষকে ভালবেসেছিলেন। তাই তারজন্মে অত নির্বাতন সহ করেছেন।

ভবিষ্যৎ বংশধরকেও প্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। হলে স্মৃধ। ভবিষ্যৎ নিরাপদ। কিন্তু ভাবনা যায় না। কেননা এযুগের নির্বাসিত প্রজ্ঞা, মূঢ় আত্মভিম্বানীর দল আকাশের দিকে তাকিয়েই নিগ্ধবন ত্যাগ করতে উৎসুক। বোঝেনা তাতে নিজের আত্মাই সর্বাগ্রে কলুষিত হবে।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বঙ্কিম-অভিধান অশোক কুণ্ডু ভারতী বুক স্টল। কলিকাতা-২। মূল্য পনেরো টাকা মাত্র।

বর্তমান বইটি বঙ্কিম উপন্যাসের সমালোচনা-গ্রন্থ নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গে যাবতীয় তথ্যের সংকলন। নির্দেশিকা ছাড়া এতে আছে সাতটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী। মূলত সাহিত্যসাধক চরিত্র এবং অগ্ণাত বঙ্কিমজীবনী অবলম্বন করে কয়েকটি উপরিভাগে ভাগ করে জীবনী সংক্রান্ত সব খবরই লেখক দিয়েছেন। এই অধ্যায়টি মোটামুটি একটি প্রবন্ধেরই মতো। এর উপরিভাগগুলি বর্ণনাত্মক নয়। সূচীপত্রের এই অধ্যায়টির উল্লেখ একটু অনবধানতা ঘটেছে। ১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই অধ্যায়টির শিরোনাম 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনীসংক্রান্ত তথ্য'। ১৮ পৃষ্ঠাতেই এই শিরোনাম ব্যবহৃত। এই দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে বঙ্কিম-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানের বর্ণনাত্মক বিবরণ ও সংবাদ। ৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়ে 'বঙ্কিম-উপন্যাসের নাম ও পরিচ্ছেদের নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা'। এর উপবিভাগগুলিও বর্ণনাত্মক কিন্তু ১৭৭ পৃষ্ঠার কোনো অধ্যায় ভাগ না থাকলেও সূচীপত্র-নির্দিষ্ট 'বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা' বর্ণনাত্মক ভাবেই শুরু হয়েছে এবং চলেছে ৩১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পরবর্তী অধ্যায় 'বঙ্কিম-উপন্যাসের দুর্লভ শব্দ, ভৌগোলিক স্থান ও বিবিধ বিষয় ৩১১ থেকে ৩৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। অতঃপর বঙ্কিম-স্বভাষিত অধ্যায়ে (৩৩৫-৩৪৪) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে স্মরণীয় উক্তি বর্ণনা ও মন্তব্য সংকলিত হয়েছে। সর্বশেষ মূল্যবান অধ্যায় বঙ্কিমসম্বন্ধীয় আলোচনা গ্রন্থের তালিকা (৩৪৫-৩৫০)। এই তালিকা শুধু উপন্যাস-আলোচনার নয় সর্ববিধ আলোচনাই তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি খুব প্রয়োজনীয় হয়েছে।

আশা করি তরুণ গবেষক শ্রীঅশোক কুণ্ডু বঙ্কিম-অভিধান প্রণয়নে যে দুর্লভ কর্মভার গ্রহণ করেছেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে তার আভাষ পাওয়া যাবে। সভ্য ও শিক্ষিত দেশে এ কাজ বস্তুত সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো গবেষণা সংস্থা অথবা বিদ্যাপরিষদের কাজ। আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কেউ এই ধরনের বিবলিওগ্রাফিক্যাল কাজের বিষয়ীভূত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন নি। মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে কিছু কাজ হয়ে থাকলেও সে-রকম গুরুদায়িত্ব নিয়ে কেউ আগ্রহের হয়ে আসেন নি। জানি না, নৈহাটির বঙ্কিমসংগ্রহশালায় এ ধরনের কাজের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা এখনও পর্যন্ত সে-রকম কিছু দেখি নি। অতএব বঙ্কিম-অভিধান প্রণয়নের এই একক প্রচেষ্টা একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উত্তম। একক বলেই এতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি অপ্রত্যাশিত হবে না, কিন্তু সাধু সংকল্প সত্যতা এবং নির্ভর্য এই কাজটি ভবিষ্যৎ কর্মীদের নিকট আদর্শ ও

অনুগ্রহণা দেবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান গ্রন্থটি কেবল বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে, লেখক বলেছেন ভবিষ্যৎ খণ্ডে বঙ্কিমের অন্যান্য রচনার সম্বন্ধীয় সংবাদ সংকলিত হবে। বঙ্কিম-ব্যবহৃত শব্দের একটি কোষগ্রন্থ রচিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার যিনিই অগ্রসর হবেন এ বই পড়ে পড়েই তাঁদের কাজে লাগবে। অবশ্য এতদিন এ বই না থাকাতে উপন্যাস সমালোচনা যে আটকেছিল তা নয়। বরং রসসমালোচনা পরিমাণে যথেষ্ট হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখেছি, উপন্যাসগুলি ধরে ধরে সমগ্রভাবে আলোচনাই যেন স্বীকৃত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে তবু কোনো চরিত্র নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, এমনকি কপালকুণ্ডলাতন্ত্রের মতো পূর্ণাবয়ব বইও লেখা হয়েছে। ইদানীং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের ব্যবস্থা একেবারেই বিরল হয়ে এসেছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের বহু দিক নিয়েই আলোচনা হতে পারে। উপন্যাসে বিদেশী সাহিত্যের ছায়াপাত, উপন্যাসে বাংলা দেশ ও প্রকৃতি, উপন্যাসের কালভূমি ও কালপরম্পরা, তাহার বিবর্তন—ইত্যাদি কতদিকেই তো দেখবার আছে। আমার মনে হয়, বঙ্কিম-অভিধানের মতো বই এই শ্রেণীর কাজের প্রচুর সহায়তা করবে। ঈশ্বোৎকটিক আলোচনা খুবই দুর্লভ এবং প্রয়োজনীয় কিন্তু এর মান যেমন সমান হতে পারে না, তেমনি ইংরেজিতে যাকে বলে ‘থেরোনস’ সে-জিনিসও আসে না। স্তাডলির উৎকৃষ্ট শেকসপীয়র-সমালোচনা কি পূর্ববর্তী প্রচণ্ড তথ্যের ভিত্তিতেই গড়া নয়? শেকসপীয়রের ইমেজারি নিয়ে চমৎকার কাজ হয়েছে বলেই কি নতুন শেকসপীয়র সমালোচনার ধারা গড়ে উঠছে না? বঙ্কিম-অভিধানে ঠিক সে পরিধি গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে, তাতে অবশ্য বঙ্কিম উপন্যাসের সর্ববিধ আলোচনারই যে সুবিধা হবে তা বলতে পারি না। যেমন স্টাইলের আলোচনার পক্ষে এ বই সহায়ক হবে না। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের মোটামুটি প্রাসঙ্গিক তথ্য হাতের কাছে পাওয়া গেল। কোন উপন্যাসের কটা সংস্করণ হয়েছিল, কোন চরিত্র কোন বইতে এবং কোন অধ্যায়ে আছে, কোন অধ্যায়ের বক্তব্য কি, কোনো উপন্যাসের সারসংক্ষেপ সহ রচনাকাল প্রকাশকাল সমসাময়িক সমালোচনা প্রভৃতি যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে।

এই শ্রেণীর সংগ্রহ-কর্মে সাহিত্য-সমালোচনা করবার প্রবণতা থেকে নিবৃত্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়, যদিও কঠিন। কেননা, উপন্যাসের তথ্যসংগ্রহ করতে কিছু বাছবিচার এবং নিম্নস্তম্ভ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়তে বাধ্য। অবচেতনভাবে এসে পড়লেও লেখকের এ বিষয়ে সচেতন ও জাগ্রত থাকাই উচিত। এ বইতে লেখক সর্বত্র এই ভেদরেখা মেনে চলতে পারেন নি; মেনে চলতে পারলে আদর্শ হত সন্দেহ নেই। কোনো উপন্যাসের তথ্য-সংকলন করতে গিয়ে ‘জাতিবাদ’ নামে কোনো অন্তর্ভুক্তি না থাকাই তো সঙ্গত। কিংবা ‘বিষবৃক্ষ’ বা ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে আলোচনা ঠিক এই শ্রেণীর গবেষণাপদ্ধতির মধ্যে আসে না। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত মোটের দিক দিয়ে স্বষ্টি কিনা সে আলোচনাও এই গ্রন্থের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বোধ হয় নয়। তবে এ সংক্ষেপে লেখকের দিক থেকে বলবার এই যে, এই রসসমালোচনা যুক্ত হওয়াতে বঙ্কিম অভিধান শুধু গবেষক নয় সাধারণ পাঠোৎসুক ব্যক্তির পক্ষেও কাজের হবে, ছাত্রদের তো হবেই।

এই বইয়ের প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠা প্রচুর। আমাদের পক্ষে এ বই চমৎকার 'হাণ্ডবুক'। লেখক এই কাজের ধারা নিরলস চিন্তে অল্পসরণ করে যাবেন; এটাই কামনা করি। কামনা করি বলেই এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাবও করি। লেখক সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ সংস্করণে অবহিত হলে ভালো হয়।

প্রথমত সাজানো সম্বন্ধে। কোনো বইয়ের সাধারণ বিবরণ প্রসঙ্গ-প্রসঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ আলোচ্য বিষয় যে স্থলাঙ্করে মুদ্রিত, বইয়ের বিবরণ শেষ হলে নতুন বিষয়ের নামও সেই স্থলাঙ্করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোনটা সেই বিশেষ বইয়ের প্রাসঙ্গিক, কোনটা নতুন, হঠাৎ ধরা মুশকিল। অবশ্য পুস্তকাস্তরের বিষয়ের সঙ্গে ব্যাকটে পরিচ্ছেদের উল্লেখ আছে। তথাপি একটা প্রভেদ-চিহ্ন থাকাতালো। যেমন কোনো বিশেষ বইয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয়-নাম বর্জ্যেস অক্ষরে দিলে বোধহয় ভালো।

১৫ পৃষ্ঠায় 'হুগলী' জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' বই থেকে উদ্ধৃত আছে, বঙ্কিম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দলিল সম্পাদন করেন। কিন্তু ১৭ পৃষ্ঠায় তারিখ '১৮৬৭, ২১ ফ্রেব্রুয়ারী'। নিশ্চয় দ্বিতীয় তারিখটি ছাপার ভুল।

২৩ পৃষ্ঠায় ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কলিনাটক', 'নাটক' 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' এই তিনটির নাম করা হয়েছে। এই তিনটি বই সত্যিই কি ছিল বা আছে?

৫৩ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, তাতে তাঁদের বিখ্যাত বিতর্কের কোনো উল্লেখ দেখলাম না। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এবং রচনাবলী-সংস্করণে বউঠাকুরাণী হাটের ভূমিকায় বঙ্কিম সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্তত বহু জায়গায় তিনি বঙ্কিমের শিক্ষিত মনের বিষয় উল্লেখ করতেন।

১১০ পৃষ্ঠায় পরপর দুটি বাক্যে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—দু'রকম ছাপা হয়েছে। ওই পৃষ্ঠাতেই দুর্গেশনন্দিনীর 'সমসাময়িক সমালোচনা'র শিবনাথ শাস্ত্রী-লিখিত সমালোচনা 'রামতলু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে অথচ রহস্যসন্দর্ভের স্মরণীয় সমালোচনার উল্লেখ নেই যদিও গ্রন্থপঞ্জীতে (পৃ-৩৪৯) উল্লিখিত আছে।

৭৫ পৃষ্ঠায় আনন্দমঠের ঐতিহাসিক পটভূমির যে উল্লেখ আছে সেই প্রসঙ্গে সম্প্রতি স্বর্গত রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষের Sannyasi Rebellion of Bengal বইটির নাম থাকা দরকার।

২১২ পৃষ্ঠায় চঞ্চলকুমারীর 'ভ্রান্তির' কথন বলে সমালোচনা করা হয়েছে। একেই Tragedy of Error বলে কি?

৩২৩ পৃষ্ঠায় রামনিধি গুপ্ত সম্পর্কে সংবাদ ঠিক নয়। তার মৃত্যু ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নয়। ইনি কি 'কর্মোপলক্ষে কলকাতায় অ্যুসেন'?

বঙ্কিম-অভিধান আমাদের প্রভূত কাজে আসবে বলেই এগুলো উল্লেখ করলাম। তা না হলে পাঁচখানা বইয়ের মতোই উদাসীন অবহেলায় রেখে দিতাম। লেখককে অভিনন্দন জানাই।

ভবতোষ দত্ত

Sri Annapurna Cotton Mills Ltd.

Regd Office

P10. New Howrah Bridge
Approach Road
CALCUTTA - 1

Telegram

Accelerate, Calcutta
Phone :
34-2474 & 34-9640

Founder :

LATE GIRIJAPRASANNA CHAKRAVARTI

Manufacturers of :

Hank Yarn : From 2's to 100's Count.

Hosiery Yarn : From 20's to 50's & 2/80's Mercerised.

Grey Cloth Fabric : Medium, Fine, Superfine.

Exports :

All fabrics produced out of Automatic Looms to
U. S. A., U. K., Germany and Indonesia.

Spindles : 26,904

Looms : 300

Factory :

SHAMNAGAR, 24 PARGANAS.

Phone : Bhat. 109.

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী প্রকাশন

চিত্রে ভারতের ইতিহাস

৪'৬২

ভারতীয় প্রদর্শনশালাসমূহের বিবরণপঞ্জী

২০'০০

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব

২'০০

বাংলার উৎসব

১'২৫

খনার বচন

২'৫০

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

৫'০০

দ্বিতীয় খণ্ড

৫'০০

তৃতীয় খণ্ড

৯'০০

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনিঅর্ডার পাঠাইবার

—ঠিকানা—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওয়েষ্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস

পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

নগদ বিক্রয় : পাব্লিকেশন সেল্‌স অফিস, নিউ সেক্রেটারীয়েট,

১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়.

শ্যামাপদ চক্রবর্তী

ডঃ ভারতেন্দুনারায়ণ রায়

কাব্য রূপ ও রস ৫০০

অরণ্যময় আফ্রিকায় একযুগ ৪০০

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

ঢলো যাই টাঁদের দেশে ৩৫০

(বহু মনোরম রঙিন ও বিচিত্র ছবিতে ভরপুর)

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দক্ষিণের বারান্দা ৪৭৫

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র এই গ্রন্থের রচয়িতা। গতানুগতিক ধাঁচে লেখা জীবনী এ নয়— অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ঠাকুর পরিবার তথা একটি বিশেষ যুগের বাঙালী দেশের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে এ গ্রন্থে। বাংলা ভাষায় একখানা নতুন ধরনের বই।

স্বনীলকুমার নাগ ॥ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম ১০০০

শ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষরবাহী এই গ্রন্থে লেখক বাঙালী পাঠকের কাছে বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী কথাসাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। একটি মাত্র গ্রন্থের সীমিত পরিসরের তুলনায় বিষয়টি বৃহৎ, তবু বলা যায় লেখকের প্রযত্ন সার্থক হয়েছে।

স্বধীরচন্দ্র সরকার ॥ বিবিধার্থ অভিধান ৬৫০

বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দ এবং বাক্যাংশ, দেব-দেবীর নাম, বিপর্যয়ার্থক যুগ্ম শব্দ এবং বিভিন্ন আওয়াজ বা ডাক, বাংলা শব্দের বিকৃত ও গ্রাম্যরূপ যুদ্ধোত্তর বাংলা শব্দ, রাজনৈতিক ও সাংবাদিক পরিভাষা ইত্যাদি প্রায় পনেরো হাজার শব্দের যথাযথ অর্থ এই অভিধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এমন বই বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ বিজ্ঞানধর্ম ৪৫০

বিজ্ঞানের নানা বিভাগে লব্ধ জ্ঞান আহরণ করে এবং তা' মন্বন করে নানা বিষয়ে এমন সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন লেখক যা আজকের দিনের প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর চিন্তাকে সুসংবদ্ধ করবে।

শৈল চক্রবর্তী

কানাই সামন্ত

ছোটদের ক্র্যাফট্ ২৫০

রবীন্দ্র প্রতিভা ১০০০

অহীন্দ্র চৌধুরী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নিজে হারায়ে খুঁজি ২০০০

বঙ্কিমচন্দ্র ৫০০

রাহুল সংকৃত্যায়ন

বিমলচন্দ্র সিংহ

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর ৬০০

বিশ্বপথিক বাঙালী ৫০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

বসন্তসংকলন

চিত্রলিপি ১

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত আঠারোটি চিত্রের সংকলন। ছয়টি ত্রিবর্ণ ও একটি চতুর্বর্ণ। কবির হস্তাক্ষরে লিখিত কবিতা ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ সংবলিত।

মূল্য ২০.০০

চিত্রলিপি ২

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পনেরোটি চিত্রের সংকলন। সাতটি ত্রিবর্ণ ও দুইটি চতুর্বর্ণ।

মূল্য ১৮.০০

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁর কবিমানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের আড়াই শতের অধিক বাংলা ও ইংরাজী কবিতাগুলি ইতিপূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি।

জাপানী বাঁধাই, মূল্য ৪.০০, শোভন ১৭.০০

স্মৃতিস্ম

লেখকের সংগোত্র আরও বহু কবিতা যা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও তাঁহার স্নেহভাজন আশীর্বাদ-প্রার্থীদের সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেই ২৬০টি কবিতাসমষ্টির সংকলন 'স্মৃতিস্ম'।

পরিবর্ধিত সংস্করণ।

মূল্য ৩.৫০, শোভন সংস্করণ ৫.৫০ টাকা

রূপান্তর

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ত কবিতাবলী-নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রাবলী সংবলিত।

মূল্য ৭.০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

সমকালীন

মানবতাবাদী রাসেলের বিজ্ঞান-চিন্তা

অনিয়কুমার মজুমদার

শীতের তীব্র স্পর্শে খসে পড়া অগ্নিভ পাতার মত টুপ করে বায়ে পড়লেন বাউঁগু রাসেল। শাস্ত নিরুদ্বেলিত শবদেহের প'রে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো শতাব্দীর হিমশীতল চোখ থেকে বেদনাঞ্জন। একটি মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবীতে কতটুকু ক্ষতি হয়? কিন্তু রাসেল—অনন্ড রাসেল, মাত্র একটি মানুষ নন; তিনি বুদ্ধিদীপ্ত একটি বিরাট বৃত্তলোকের কেন্দ্রবিন্দু যার বিচ্ছিন্নতায় বৃত্তটি একটি সাধারণ রেখা মাত্র। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ঘণ্টা। রাসেল কালের গভীর মধ্যে থেকে কালোত্তর হয়েছেন। যেমনিভাবে দ্রুতধাবমান গ্যালিলিও সবে যাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পেরিয়ে অথচ রেখে যাচ্ছে তার অস্তিত্বের ছবি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে, তেমনি রাসেল তাঁর মৃত্যুর পরে কয়েকশতাব্দী থাকবেন প্রোজ্জ্বল মানুষের মনের আকাশে।

বাউঁগু রাসেলের মৃত্যু মানে হৃদয়হীন স্বার্থসর্ব্বাধিপতি পৃথিবীতে একটি সমবেদনার অবলুপ্তি, বুদ্ধির উজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান একটি মহান জীবনের অবসান, তমসাম্পন্ন পৃথিবীতে একটি হৃদয়বর্তিকার নির্বাপন।

রাসেল প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানী-তথা গণিতবিদ। বিজ্ঞানের মূলকথা সত্য অন্বেষণ। যিনি বিজ্ঞানী তিনি হবেন সত্যবাক্য, সত্যপ্রিয় এবং অল্পসঙ্কিৎস্। ত্রিবিধগুণের অধিকারী রাসেল তাই আজীবন অসহযোগিতা করে এসেছেন মিথ্যার সঙ্গে, প্রবঞ্চনার সঙ্গে। তাঁর সত্যপ্রিয়তা তাঁকে কখনো চোলে নিয়ে গেছে কারাগারের অন্তরালে, কখনো বা নিন্দুকের হিংস্র আক্রমণের মুখোমুখি, আবার এনে দিয়েছে বিশ্বের জয়মুকুট।

জীবনের শুরুতেই তিনি অরুসন্ধিগ্ন ছিলেন কার্য ও কারণের সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজে। গণিতে তাঁর একনিষ্ঠ প্রীতির মূল এখানেই। গণিত তাঁকে দিয়েছে 'লজিক', দিয়েছে সত্য অন্বেষণের প্রেরণা। এবং তাঁর লজিক্যাল বোধ সর্বত্র তাঁকে খাঁটি বস্তুর সন্ধান দিয়েছে। এই বোধের সঙ্গে সন্মিলিত হয়েছে মানুষের প্রতি মমতা। যার ফলশ্রুতিতে তিনি বৃদ্ধ বয়সে আইন অমান্য করে কারারুদ্ধ হলেন। জানালেন পশুশক্তির অপরিমিত ব্যবহারে মানবসভ্যতা লোপের আশঙ্কায় সতীত্র প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন আইনস্টাইন থেকে শুরু করে ত্রিশ জন নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতিনামা বিজ্ঞানী।

কৈশোরে তিনি ছিলেন ডারউইনের ভক্ত। এ নিয়ে এক কৌতুকপ্রদ ঘটনা আছে। রাসেল ডারউইনে বিশ্বাসী একথা জানা মাত্র তাঁর গোঁড়া গৃহশিক্ষক বলেছিলেন, 'বৎস' তোমাকে আমি করুণা করি। কারণ একই ব্যক্তি একাধারে খৃষ্টান ও ডারউইনের বিশ্বাসী হতে পারে না। রাসেল আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি দুয়ের মধ্যে অসহযোগীতা দেখতে পান নি। তবে যদি সত্যিকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হতো তাহলে তিনি ডারউইনতত্ত্বকেই প্রাধান্য করতেন। ধর্মের গোঁড়ামীর প্রতি তীব্র অনীহা জীবনের প্রান্তভাগ পর্যন্ত অটুট ছিল।

কেশুজ্জ্বে ছাত্রাবস্থায় প্রভাবান্বিত হলেন স্টুয়ার্ট মিল দ্বারা। কিন্তু বড়ো প্রভাব পড়লো গণিতশাস্ত্রের। ভাষনামিক্স পড়তে গিয়ে গণিতের যুক্তিরাজ্যে আপ্লুত হয়ে পড়লেন।

কেশুজ্জ্বে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ইব্‌সেন, শ, ফ্লবার্ট, ছইটম্যান, নীৎসে প্রভৃতি খ্যাতিনামা লেখকদের রচনার সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু ইবসেন ছাড়া কেউ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেননি।

রাসেল তাঁর মাকে হারিয়েছেন ছুবছর বয়সে, তিন বছরে তাঁর বাবাকে। বড়ো হয়েছেন পিতামহ লর্ড জন রাসেলের কাছে। তিনি তাঁর মা-বাবা সম্বন্ধে অত্যন্ত কম জানতেন। জানতে পারলেন যখন তাঁর বয়স একুশ। অবাক বিষয়ে বাট্রাণ্ড রাসেল লিপ্য করলেন তাঁর মানসিক গঠন তাঁর বাবার মতো। রাসেলের বাবা রাজনৈতিক জীবন বেছে নেবেন এইটেই ঠিক ছিল, কারণ রাসেল পরিবারের এইটেই বৈশিষ্ট্য। তিনি ১৮৬৭-৬৮ সালে পাল'মেটে নির্বাচিতও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক গঠন তাঁকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে আনলো, তিনি একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি খৃষ্টান নন, অতএব বড়দিনে চার্চে যাবেন না। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের ভক্ত ও বন্ধু হলেন। বাট্রাণ্ডের জীবনেও এমনি দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি নিজেকে খৃষ্টান মনে করতেন না, রাজনৈতিক জীবনেও লিপ্ত হননি গভীরভাবে। তিনি বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক আনন্দলোক। এই অমর্তলোকের প্রহরী হলো যুক্তি।

রাসেল বেড়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে। সকলেই আশা করেছিলেন। তিনি এই জীবন বেছে নেবেন। অথচ রাসেলকে দর্শনশাস্ত্র রাজনীতির থেকে বেশি আকর্ষণ করতো। একসময় তিনি স্থির করে ফেলেন দর্শন চর্চাকেই জীবনের প্রধান কাজ বলে মেনে নেবেন। রাসেলের ঠাকুমা এতে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। রাজনীতি কখনোই তাঁকে বেশি টানতে পারেনি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বালিনে থাকাকালীন কাইজারের বিরোধিতা করেছেন, এমনকি মার্ক্সীয় গোঁড়ামীকে অপছন্দ করতেন। কিছুকালের জন্ত সিডনী ওয়েবের প্রভাবে ইম্পেরিয়ালিস্ট

হয়েছিলেন। ১৯০১ সালে তাঁর মন থেকে এই প্রভাব চলে যায়। সেই থেকে তিনি মাল্লম্বের পরে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে। ১৯১০ সালে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’ প্রায় শেষ করে এনেছেন।

বিংশ শতকের গণিতের ও দর্শনের জগতে ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’র প্রভাব প্রবল হয়েছিল। দীর্ঘ-দশবছর পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থ আমাদের জ্ঞানের জগতে অগতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন। এই প্রকাশের পরে বিশেষজ্ঞরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এঁদের বাইরে অতি সামান্য মাল্লম্ব এই গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহী। গণিতকে তিনি লজিকে পরিণত করেছিলেন। গণিত সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হৃদয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ‘The New Quarterly’ পত্রিকায় ‘The Study of Mathematics’ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন গণিত শুধু সত্যের আধার মাত্র নয়, তার মধ্যে রয়েছে এক মহান সৌন্দর্য—স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর, অনেকটা ভাস্কর্যের মতো। এতে নেই আমাদের দুর্বল প্রকৃতিকে নাড়া দেবার কোন উপকরণ, নেই আড়ম্বরে ভরা চিত্র বা সঙ্গীতের চোখধাঁধানো জড়ির কাজ, তথাপি তা পবিত্র এবং এর সম্পূর্ণতায় ভরা সিদ্ধান্ত যে কোন মহৎ শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। গণিতের পরে তাঁর ভালবাসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসেল বলেছেন, গণিতের সমস্যাগুলি সমাধান করে এক অভূত আনন্দ পাওয়া যায়। গণিতের বিচার পদ্ধতিতে রয়েছে নানা যুক্তি, তাছাড়া আছে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, সর্বোপরি সমগ্র প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে গণিতের নিয়মালুসারে। এমনকি উপযুক্ত নৈপুণ্যের অধিকারী হলে গণিতের সাহায্যে মানবদেহের বিভিন্ন গতি প্রকৃতির উপরে প্রাকৃতিক প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব। এই বিশ্বাস তাঁকে উদ্বোধিত করেছিল ‘Introduction to Mathematical Philosophy’, ‘Principles of Mathematics’, ‘My Philosophical Development’, ‘Analysis of Matter’, ‘ABC of Atoms’, ‘ABC of Relativity’ ইত্যাদি নানা গ্রন্থ রচনায়।

শুধু গণিত চিন্তা নয়, রাসেল দার্শনিক এবং মানবপ্রেমী। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থরাজি মাল্লম্বের জ্ঞানের রাজ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সাহিত্যে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যিনি লন্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংস্থা রয়াল সোসাইটি থেকে ‘ফেলো’ (F. R. S.) নির্বাচিত হয়েছিলেন, এই নোবেল পুরস্কার তাঁকে হয়ত কিঞ্চিৎ ব্যথিত করেছিল। কিন্তু মনে হয় তাহলে রাসেলের একটি দিক মাত্র উদঘাটিত হতো। নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁকে পুরস্কার দেবার সময় বলেছিলেন,—‘in recognition of his many sided and important work in which he has constantly stood forth as a champion of humanity and freedom of thought,’

উক্তের গণিতের চর্চায় মনোনিবেশ করার জন্য তিনি স্বভাবতঃই আপেক্ষিকত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্বন্ধে বোঝবার আগে তিনি বলেছেন, প্রায় সকলেই জানেন যে আইনস্টাইন ‘বিশ্বায়কর’ কিছু একটা বের করেছেন, কিন্তু অতি অল্পলোকই জানেন কি করেছিলেন বা তাঁর তত্ত্বের মানে কি। একথা সাধারণভাবে প্রচারিত যে তিনি প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন, কিন্তু নতুন সিদ্ধান্তসমূহ

গাণিতিক জটিলতার মধ্যে আবৃত রয়েছে। একথা সত্য যে আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জনপ্রিয় বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু যখনই সেই সব বর্ণনার মধ্যে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হয় তখনই তা হয়ে পড়ে দুর্বোধ্য। রাসেল বলতেন, এর জন্তে গ্রন্থ প্রণেতা বা লেখকদের দোষ দেওয়া চলে না। অনেক নতুন তত্ত্বকে গাণিতিক ভাষার সাহায্য ছাড়াও প্রকাশ করা যায় এবং তার জন্তে তা যে কম দুর্বহ একথাও স্বীকার করা যায় না। এর জন্তে প্রয়োজন বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার পরিবর্তন—যে ধারণা আমরা করেছি আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা করে এসেছেন তাঁদের গৈশবাবস্থা থেকে। একথা অনস্বীকার্য যে যখন আমরা আর শিশু নই সেই অবস্থায় পূর্বতন ধারণার পরিবর্তন করা বেশ কষ্টকর। যেমন কোপানিকাসের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পরে প্রাচীন ধারণার মূলে আঘাত এসেছিল, আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্পর্কেও একই কথা। এবং এখন যে শিশু জন্ম নেবে তাদের পক্ষে এই তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফ্‌হাল হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার হবে না।

রাসেল মনে করতেন বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে সাধারণ জ্ঞান থেকে—যাকে তিনি বলেছেন ‘কমনসেন্স’। এবং আকস্মিকভাবে তা হয়নি, ধীরে ধীরে ঘটেছে বিজ্ঞানের প্রগতি। যখনই কোন সমস্তার উদ্ভব হয়েছে যা সাধারণ বোধ বা জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না, তখনই বিশেষক্ষেত্রে চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে হয়েছে, আনতে হয়েছে নতুন তত্ত্ব; অথচ অল্পসব বিষয়ে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয় নি। এমনিভাবে একস্থানে যখন কোন পরিবর্তন ঘটলো তার সূত্র ধরে অল্পত্র হয়তো আবার কিছু অদল-বদল হলো। এমনিভাবে সাধারণ জ্ঞান থেকে রচিত হয়েছে বিজ্ঞানের পটভূমিকা অম্পষ্টভাবে। এ থেকে ক্রমে এসেছে বিজ্ঞানের দীপ্তিময় মণ্ডল। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে এইটেই পার্থক্যের সেতু। দর্শনের কাজ প্রয়াস সাধন, হয়তো সর্বদা তা সাফল্যের প্রাপ্তি আসে না। তা না হোক তথাপি অনেক ক্ষেত্রে তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব। বর্তমান কালের দার্শনিকেরা আর স্কুল কল্লনা থেকে সৃষ্টি অথচ বিরাট কোন কিছুর আভাস দিতে পারছেন না। সপ্তদশ শতক থেকেই বিজ্ঞান গোঁড়া দার্শনিকদের তৈরী ভিত্তিভূমির বুনியাদ আলগা করে দিয়েছিল। সম্ভবতঃ দার্শনিক চিন্তাধারায় অগ্রগতি অপেক্ষা বিজ্ঞানের অগ্রগতি অধিক। তবে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ জ্ঞানের উপরে আশ্রয় ক’রে বিজ্ঞান উন্নতি করেছে, দর্শনও একইরকম সাধারণ জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে দর্শন দিতো বিজ্ঞানকে পরিচালনা, বর্তমান বিজ্ঞান দর্শনকে চালনা করেছে। রাসেল বিজ্ঞান ও দর্শনের এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অতি সচেতন ছিলেন এবং তিনি বিজ্ঞানের সীমা বা তার দুর্বল স্থানগুলি সম্বন্ধেও ছিলেন সজাগ।

‘Physics And Neutral Monism’ প্রবন্ধে পদার্থবিজ্ঞান ও মনোজগৎ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে রাসেল পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, The aim of physics, Consciously or unconsciously, has always been to discover what we may call the Causal Skeleton of the world. It is perhaps surprising that there should be such a skeleton, but physics seem to prove that is,.....’। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের

সম্পর্ক দেখিয়ে রাসেল মন্তব্য করেছেন, একথা হয়তো সত্যি আমরা কি শুনবো বা দেখবো অথবা চিন্তা করবো এ বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞা কিছু বলতে পারে না, কিন্তু আমরা কি বলবো বা লিখবো কোথায় যাবো অথবা আমরা খুন করবো বা চুরি করবো কি না এসব বিষয়ে বলতে পারে।

‘দি অ্যানালিসিস অব ম্যাটার’ প্রবন্ধে রাসেল পদার্থবিজ্ঞা সম্বন্ধে আরো চমৎকার কথা বলেছেন। পদার্থবিজ্ঞা নীতিগতভাবেই ‘কোয়ালিটি’কে তুচ্ছ করে। সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎটাকে মনে করে ঘূর্ণিমান বস্তুপুঞ্জ। আরো এগিয়েছে ধারণা। বস্তু থেকেও আরো প্রয়োজনীয় হচ্ছে ‘শক্তি’ বা এনার্জি। আলোকের রয়েছে অনেক ধর্ম, তারমধ্যে গ্রাভিটি একটি। এই ধর্ম একমাত্র বস্তুর ছিল এইটেই ছিল প্রচলিত মতবাদ। পৃথকভাবে ‘দেশ’ ও ‘কাল’ না দেখে একত্র তার প্রভাব পদার্থবিজ্ঞানের জগতে এনে দিয়েছে নতুন আলোক। এমন কি কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কার বস্তুর অবিচ্ছিন্ন চলমান তত্ত্বের উপরেও সন্দেহ এনে দিয়েছে। এসব নানা কারণে প্রাচীন বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার জগতে যে সরলতা ছিল তার অবলুপ্তি হয়েছে।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞার মধ্যে রয়েছে চরম অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাব। এর জন্মেই তাকে বোঝা কঠিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু যারা এই বিজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁদের কাছে এনে দিয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক ধারণা, তার কাঠামো এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জানা সম্ভব হতো না। এবং এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট বিজ্ঞার প্রয়োগসাধন তা এক প্রতিভার স্ফূরণ মাত্র। প্রয়োগবিজ্ঞার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হয়। রাসেল তাই তাঁর ‘Limitations of Scientific method’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘The power of using abstractions is the essence of intellect, and with every increase in abstraction the intellectual triumphs of science are enhanced.’

ভাবতে আশ্চর্য লাগে বার্তাও রাসেল বিজ্ঞানী হয়েও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যকর্মের জন্ত। এর জন্মে যদি মনে করেন যে বিজ্ঞান তাকে তৃপ্ত করতে পারে নি সে ধারণা ভুল। এমনকি তিনি বলেছেন শিশুদের গোড়া থেকেই বিজ্ঞান শেখানো দরকার। ‘সাইন্স অ্যাণ্ড এডুকেশন’ প্রবন্ধে রাসেল বলেছেন, বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে অনেক বিপদমুক্ত করে তুলেছে এবং মানুষের মন থেকে ‘ভয়’ দূর করেছে অনেকটা। কাজেই শিক্ষা স্বর্গ হওয়া ভাল বিজ্ঞান দিয়েই যাতে শিশুর মন বিদ্যুৎ পরিবাহীর (lightning conductor) মত তৈরী হয়, যেন বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে সে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে ওঠে। রাসেল বলেছেন এই কথা দ্বারা তিনি বিশেষ কোন ব্যাপারে ভয় পাবার কথা বলেছেন না, তিনি সাধারণ কোন কিছুতেই ভীত হবার কথা মনে করেছেন।

রাসেল মনে করতেন বিজ্ঞান দুভাবে আমাদের উপকার সাধন করে থাকে। এক—এর দ্বারা মন্দ জিনিস, খারাপ ধারণার অবলুপ্তি ঘটে বা হ্রাস পায়। দুই—ভাল জিনিসের বৃদ্ধি সাধন। তিনি বলেছেন বিজ্ঞান দারিদ্র্য দূর করতে পারে, মানুষের শ্রমের সময় কমিয়ে আনতে পারে। কৃষিকর্মের প্রচলনের আগে প্রতিটি মানুষকে অন্ততঃ দু’বর্গমাইল স্থান জুড়ে থাকতে হতো তার জীবনধারণের জন্ত। সেকালে অনাহারে মৃত্যু অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। তখন মানুষের যেমনি

মুক্তজীবন ছিল, তেমনি ছিল দুঃখ দারিদ্র্য। কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। তার সাহায্যে মানুষ তুলতে পেরেছে তার মুখের অন্ন। সঙ্গে সঙ্গেই রাসেল স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রাচীনকালে কৃষিব্যবস্থার সূত্রপাতের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অত্যাচার নিপীড়নের ইতিহাস। দাসত্ব, সার্ক, আত্মবলিদান, একনায়েকত্ব এবং বড়ো বড়ো যুদ্ধ সব জড়িয়ে ছিল এই সঙ্গে। এই ইতিহাস আজকের মানুষের কাছে সতর্কবাণী।

রাসেল বলেছেন ('সাইন্স অ্যান্ড ভ্যালুস' প্রবন্ধ দ্রঃ) বিজ্ঞানের কাছ থেকে মানুষ যে বড় বরলাভ করেছে তাহলো ভেষজবিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে এসে গেছে এক বিরাট পরিবর্তন। এমন কি অষ্টাদশ শতকে অধিকাংশ মানুষের ধারণা ছিল যে তাদের সম্ভান পরিণত হবার আগেই মারা যাবে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই এই ধারণার পরিবর্তন হ'তে আরম্ভ করলো বিশেষতঃ ভ্যাকসিনেশন বা টীকা দেবার ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের রথ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে, অগ্রগতির পথে এবং বর্তমানে দীর্ঘজীবন লাভ করা আর অলীক কল্পনা নয়।

কেন বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি? এর কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বলেছেন, 'due to the Substitution of observation and inference of authority'. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রতিটি পদক্ষেপ বুদ্ধি দীপ্ত। তাছাড়া বিজ্ঞান কখনো বলেনা যে তার বক্তব্য 'চরম'। বলে, অনুসন্ধানের ফলে সম্ভাব্য সূত্র আবিষ্কার করা হয়েছে মাত্র। যারা বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করেন তাঁরা কুসংস্কার বিমুক্ত জীবন যাপন করতে প্রয়াসী। বিজ্ঞান যে চরম কথা বলে না, এ কারণেই তার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়নি বরং হয়ে উঠেছে ত্বরান্বিত। অগ্রগতির ফলে অতীতের অনুসন্ধানকে বা মতবাদকে যদি ভ্রান্ত মনে করার কারণ ঘটে তবে তা করতে পশ্চাৎপদ হয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে হারে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, সেই হারে তাল রেখে মানুষ চলতে পারবে কি না। যদি না পারে তাহলে খাপ খাইয়ে নিতে না পারার জগ্রে অতীতে যে সব অতিকার্য প্রাণী ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের মতই অবস্থা হবে? বিজ্ঞান ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এই যে মানুষ নিজেই তার পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন সৃষ্টি করছে এবং তাকে ক্রতবেগে এই পরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে হবে। একথা সত্যি যে পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে মানুষের হাত রয়েছে, তবে প্রাকৃতিক শক্তি যার পরে আমাদের তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই তা অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল। যাইহোক, মানুষ বিজ্ঞানের অদূরগত বৈপ্লবিক অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারবে কি না এ এক বড়ো প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের গুণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ক্রটি। অবশ্য এ ক্রটি বিজ্ঞানের নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক যখন কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য থাকে মানবের কল্যাণ সাধন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের উল্টো দিক থাকা স্বাভাবিক। রাজনীতিবিদ যাদের অধিকাংশই ক্ষমতালোভী, সম্ভেদ পরায়ণ, অসহিষ্ণু এবং ভীত তারা বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থে। এর জগ্রে মানুষ মদমত্ত হয়ে দুর্বলকে নিপীড়ন করে, যুদ্ধের সূচনা হয়।

রাসেল বলেছেন বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের সমাজের প্রতি এক বড়ো কর্তব্য আছে।

বিজ্ঞানীদের দ্বারা থার্মোনিউক্লিয়ার সময় সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যুদ্ধ হলে রাশিয়া-চীন ইংলণ্ড আমেরিকা কেউ রক্ষা পাবে না। তেজস্ক্রিয় মেঘ বায়ু চালিত হয়ে যাবার সময় নিরপেক্ষ দেশগুলিকে রেহাই দেবে না। বিজ্ঞানীদের কর্তব্য বিশ্বের সর্বত্র এই অস্ত্রবিরোধী জনমত গড়ে তোলা। রাসেল তাঁর 'এইচ্ বোমা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, পারমাণবিক বোমা যখন সত্তা আবিষ্কৃত হলো তখন মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জ্ঞান উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং বুঝতে পারলো যে পারস্পরিক আক্রোশের স্তত্রতা প্রকাশের জ্ঞান পারমাণবিক বোমা যথেষ্ট নয়, তার জ্ঞান প্রয়োজন আরো শক্তিশালী অস্ত্র, যাতে শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চল সমেত সমগ্র জনপদ ধ্বংসাত্মক পরিণত হয়। যে জঘন্যতর বস্তুটি আবিষ্কৃত হলো, তা হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা। মানবদরদী রাসেল ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'মনে' করুন পৃথিবীটার আকাশ জুড়ে চলেছে রাশিয়া ও আমেরিকার উৎকৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহগুলি। তারা পরিভ্রমণ করে চলেছে ভূমণ্ডল এবং তার থেকে নিষ্কিপ্ত হচ্ছে প্রাণঘাতী অস্ত্র। এহেন অবস্থায় কি জীবন বেঁচে থাকতে পারে? মানুষের স্নায়ুগুণী কি এই দুঃসহ জীবন সহ্য করতে পারবে? মনে হবে না কি প্রতি ঘণ্টার, প্রতিদিনের এই আতঙ্ক থেকে চিরমুক্তি অধিক কাম্য?'

রাসেল একারণেই বলেছেন কোন রাষ্ট্রেরই আত্মরক্ষার নামে নিরীহ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অধিকার নেই। এই কি গণতন্ত্র? তাঁর কণ্ঠস্বর সোচ্চার হ'য়ে বলেছে 'উড্‌নট ডেমোক্রেসি ডিম্যাণ্ড ছাট আনকমিটেড্‌ নেশনস্‌ শুড্‌ নট বো ইন্‌ভলভ্‌ড্‌ উইদাউট দেয়ার ওন কনসেন্ট?' তাঁর মতে পৃথিবীতে যদি কয়েক শতক ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয় তাহলে 'যুদ্ধ' কথাটাই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে অবাস্তব মনে হবে যেমনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ আজকাল আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। এর জ্ঞানে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের (সকলেই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) স্বাক্ষর সহ আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্ণধারদের কাছে। মিনতি জানিয়েছেন বন্ধ হোক এই সর্বনাশা খেলা, রক্ষা পাক মানব সভ্যতা।

-রাসেল নিজের কাছেই এক প্রশ্ন তুলেছেন, বিজ্ঞান প্রভাবিত সমাজ স্থায়ী হবে কিনা। যদি তা হয় তবে সমাজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে আরো বিজ্ঞানোন্মিত হয়ে পড়বে। যদি না হয় তবে এই সমাজ ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকবে যেমনিভাবে সূর্য নিরন্তর বিকিরণের ফলে অতি ধীরে শীতল হচ্ছে। অথবা সূর্যদেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো সমাজে স্তব্ধ হবে বিপ্লব। বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ হবে মানব সমাজ। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক সন্ধিক্ষণে। একদিকে মানুষের প্রতিভার অতুজ্জল বিকাশ অপরদিকে তার নিবুদ্বিতা আমাদের জীবনকে সংশ্লিষ্ট করে তুলেছে। ১৯৪৯ খ্রষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিনে লন্ডন্‌ রবার্টস্‌ বক্তৃতায় রাসেল বলেছিলেন মানুষের নৈপুণ্যের ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিয়েছে বর্বরতা ও নিবুদ্বিতার অতিবৃদ্ধি। কৌতুক করে বলেছেন যে মানব সভ্যতা বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও বেঁচে ছিল তার মূলে তার অজ্ঞতা ও অপটুত্ব। কিন্তু জ্ঞান ও পারদর্শিতার সঙ্গে যদি দুবুদ্ধির সংযোগ ঘটে তবে সভ্যতা রেহাই পাবে না। জ্ঞান-ই শক্তি তবে এই শক্তির শুভ ও অশুভ দুটি

দিক বর্তমান। যদি মানুষ তার জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞাবান না হয় তবে তার ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান দুঃখের কারণ হবে।

চিন্তাবিদ রাসেল বলেছিলেন কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্ভাধীনে বিজ্ঞানান্ত্রিত সমাজ বেঁচে থাকতে পারে। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বে একটিমাত্র গভর্নমেন্ট থাকবে। তারই হাতে থাকবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। পৃথিবীর সর্বত্র সমান উন্নতি সাধন করাতে হবে যাতে এক অংশের অধিবাসী অপর অংশের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ না হতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র জন্মহার কমাতে হবে, যাতে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল থাকতে পারে। এই সঙ্গে থাকবে ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনের সর্ববিধ ব্যবস্থা। মানুষের প্রতি মানুষের চরম অত্যাচার, অবিচার, ভবিষ্যৎ অন্নসংকট এবং নৃশংস যুদ্ধের ফলাফলের কথা ভেবে এই জাতীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো তাহলে যুদ্ধের ও অন্ত্যান্ত সঙ্কটের অবসান হতো। তা না হলে তৃতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সব মানুষ বেঁচে থাকবে তারা সকলেই নিদারুণ ব্যথির কবলে প'ড়ে অভিসম্পাত দেবে মানবসভ্যতাকে।

আশাবাদী রাসেল একথাও বলেছেন, এযুগে আতঙ্ক আছে সত্যি, কিন্তু 'আশা' ও আছে। বিজ্ঞানের অন্ধকার দিক ষতটাই থাকনা কেন, তার স্বভাব হচ্ছে মুক্তিদাতার। মানুষকে মুক্তি দেবে প্রকৃতির কবল থেকে, মুক্তিদেবে নিষ্পেষণের হাত থেকে। জাগরিত হবে মানুষের গুণবুদ্ধির অন্তর্মিত সূর্য। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন—The road, fear is long, but that is no reason for losing sight of the ultimate hope.'

আশা নিয়েই তো জীবন! জীবনের প্রথমদিকে রাসেল বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থেকে ছিলেন সাধারণের প্রতি নিরাসক্ত। দুটি মহাযুদ্ধ তাঁকে নিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের আঙিনায়। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি উচ্চারণ করেছেন সতর্কবাণী, গুনিয়েছেন জীবনের মর্মবাণী—যে বাণী এক বেদনার্দ্র, উদ্বেলিত মানবপ্রেমী বিজ্ঞানীর।

ভাষার আলোকে হতোম প্যাচার নকশা ও হরিদাসের গুপ্তকথা

নবেন্দু সেন

কিছুদিন ধরে কাগজপত্রে হতোম প্যাচার নকশা'র (১৮৬২) লেখক নিয়ে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা চলেছিল। উনবিংশ শতকের অগ্রতম জনপ্রিয় লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এই বহুল পঠিত গ্রন্থটি রচিত কিনা সে সম্পর্কেও নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। এই তর্ক প্রকাশে এই প্রথম হলেও তার আলোকপাত ঘটেছে স্বকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'। কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানের উপর কোন সিদ্ধান্ত হয় না। তথ্য, তত্ত্ব 'মনে হওয়ার' উপর নির্ভর করতে পারে না। কেবল ব্যাখ্যা দিয়েও প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না। যে ব্যাখ্যা একজনের নিকট গ্রাহ্য তা অন্যের নিকট অগ্রাহ্যও হ'তে পারে। তাই এ সমস্ত ক্ষেত্রে যতটা পারা যায় Objective analysis-এ কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় কিনা দেখা উচিত। বর্তমান আলোচনায় তারই চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভুবনচন্দ্রের 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' (১৮৭১—৭৩) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হতোম প্যাচার নকশার অনুসরণে কলিকাতার কথ্যভাষার লেখা এবং দেশি ছাঁচে ঢালা ও যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রচনা বলিয়া হরিদাসের-গুপ্তকথা দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত ছিল, এবং বটতলার ছাপাখানা হইতে 'গুপ্তকথা'—নামিত বহু ছোট বড় বই বাহির করা হইয়াছিল।" (১)

অপরপক্ষে 'হতোম প্যাচার নকশার ১৯৬২'-র সংস্করণে ভূমিকায় শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "...সর্বজনবোধ্য চলতিভাষায় লেখা বই হিসাবে বাঙলা গড়ে এইটিই প্রথমতম। ...কিন্তু মনে রাখতে হবে—চলতিভাষা প্রাকৃতজনের মুখের কথাই যে আগামী দিনের সাহিত্যের বাহন, বীরবলের 'সবুজপত্রে'র কালীপ্রসন্ন সিংহ তার স্মৃচনা করে দিয়েছিলেন।"

এই দুটি উক্তি থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হয় যে 'হতোম প্যাচার নকশা' ও 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' উভয় গ্রন্থেরই ভাষা কথ্যভাষার কাছাকাছি। 'হতোম প্যাচার নকশা'র এই ভাষারই অনুসরণ হয়েছে 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'র। কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত বলে প্রচলিত এই হতোম প্যাচার ভাষা 'সর্বজনবোধ্য' এবং 'কলিকাতার কথ্যভাষার লেখা এবং দেশি ছাঁচে ঢালা যথা সম্ভব পরিচ্ছন্ন'। আর এই পরিচ্ছন্নতাই 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'র দীর্ঘকাল সমাদৃত হওয়ার কারণ। কিন্তু মনে রাখা দরকার জনপ্রিয়তার দিক থেকে হতোম প্যাচার নকশার সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের 'গুপ্তকথা'র কোন তুলনা হয় না। 'হতোম' আজো পঠিত হয়, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিও 'হতোম প্যাচার নকশা' নামটি অন্তত জানেন। পাঠকের সংসারেই লেখকের খ্যাতি যশ নির্ধারিত হয়; নির্ধারিত হয় লেখার মূল্য। সর্বাংশে এবং সর্বক্ষেত্রে এই নিয়ম অপরিহার্য না হলেও অনেকাংশে এবং অনেক ক্ষেত্রে তো বটেই। কালের সাগর পাড়ি দিয়ে যে লেখকের যে রচনা নিত্য হয়ে ওঠে তার মূল্য নিশ্চয়ই আছে।—এই বক্তব্যের অর্থ 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'র যোগ্য মূল্য বিচার। "হরিদাসের গুপ্ত কথা দীর্ঘকাল সমাদৃত ছিল" কিন্তু হতোম প্যাচার

নকশা এখনো সমান আদৃত। যার জন্ত বহু দিন পরেও তার সংস্করণ প্রকাশিত হল।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে উভয় গ্রন্থের পারস্পরিক মূল্য বিচার এই আলোকে হবে না। উভয় গ্রন্থের লেখক—পরিচিতি অর্থাৎ দুটি গ্রন্থ সত্যি পৃথক পৃথক দু'জন লেখকের রচিত না একই লেখকের নামান্তর মাত্র তাই বিচার্য। ভাষাভিত্তিক মূল্য বিচারের পদ্ধতিতে এই বিষয়টি, আলোচিত হবে। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে যা সামান্য আলোচনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হতোমের' ভাষার অনুসরণে ভূবনচন্দ্রের 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'র অনুবর্তিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে হতোম প্যাচার ভাষাদর্শ সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা আবশ্যক। “কলকাতার কথ্যভাষায় লেখা এবং দেশি ছাঁচে ঢালা” বা “সর্বজনবোধ্য চলতি ভাষায় লেখা” ‘হতোম প্যাচা’ সম্ভবত সকলেই ‘চলিত ভাষা’র রচিত বলে স্বীকার করেন। কিন্তু ‘চলিত ভাষা’ বলতে কী বুঝি সেটা কেউই স্পষ্ট করে বলেন নি। অথচ চলতি ও সাধু, ভাষার এই দুটিরূপ সম্পর্কে সচেতন ভাবনা রামমোহনের সময়েও ছিল দেখা যায়। রামমোহন ‘বেদান্ত গ্রন্থের’ (১৮১৫) ‘অনুষ্ঠান’-অংশে স্পষ্টতই লিখেছেন, “...বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার দ্বারা স্মরণ না পাইয়া কেহই ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। ঐহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিৎ থাকিবেক আর ঐহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।” এই ‘আলাপের ভাষা’ এবং ‘সাধুভাষা’ পরে ‘চলিতভাষা’ ও ‘সাধুভাষা’রূপে পরিচিত হয়েছে। তবে সাধুভাষা বলতে যে বাদলা ভাষার এক বিশেষরূপকে বোঝায় তাতে সাধুভাষা এখন আর কথ্যভাষা নয় বাংলা ভাষার লিখিত একটি রূপ। চলতি ভাষাও কিন্তু কোন অঞ্চলের অবিকৃত কথ্যভাষা নয়। মুখের ভাষার কাছাকাছি প্রধানত কৃষ্ণনগর ও গংগার দুই তীরবর্তী অঞ্চলের ব্যবহারিক জীবনের মুখের ভাষার সর্বজন স্বীকৃত লিখ্য রূপ। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে চলিতভাষা বলে বাংলার যে বিশিষ্ট ভাষারূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বহু শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তি ও বানানের পরিবর্তনও লক্ষিত হয়। চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার সোচ্চার ঘোষণা বিবেকানন্দের মধ্যে প্রথম বলিষ্ঠরূপে দেখা গেল। ‘সবুজ পত্র’ (১৯১৪) প্রথম চৌধুরীর হাতে এবং ১৯১৬’র পরে সমস্ত রবীন্দ্র গড়ে ‘চলিত ভাষা’র সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও সম্মান লক্ষিত হয়। অবশ্য চলিতভাষার প্রথম সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয় ১৮৬২-তে ‘হতোম প্যাচার নকশায়।’ ‘আলাপের ঘরের ছালা’ (১৮৫৮) চলিত ভাষার অবিমিশ্র প্রয়োগ নেই। আলোচনায় সেদিক থেকে কেরীর ‘কথোপকথনে’ (১৮০০) এবং রামরাম বহুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে (১৮০২) চলিত ভাষায় অস্পষ্টরূপ মাঝে মাঝে লক্ষিত হয়। বর্তমানে এই চলিত ভাষায় বহুসংখ্যক সাহিত্য রচিত হচ্ছে। স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের এই রীতিটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়; সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ পরিত্যজ্য—এ কথা তারা প্রথমেই শেখে।

সাধুভাষা ও চলিতভাষার মূল পার্থক্য ক্রিয়া পদ ও সর্বনামবাচক পদের ব্যবহারে। যথা : সর্বনামবাচক পদ।

(চলিত)

(সাধু)

আমা/দের

আমা/র+দের

=আমাদের

তা/র, তা

তা/হার, তাহা

যা/র, যা

যা/হার, যাহা

এ/কে, এ/কে (নিয়ে যাও)

ইহাকে/ইহাকে (লইয়া যাও)

তা/কে

তা/হাকে

তা/দের

তা/হাদের, দিগকে, দিগের

প্রধানত এই পার্থক্য সর্বনাম পদের বহুবচনের ক্ষেত্রে বেশী। এক বচনের ক্ষেত্রে হা, বা হার, হাকে যোগে সাধুভাষার রূপ গঠিত হয়েছে। বর্তমান বাংলায় সাধু ও চলিতের সর্বনামবাচক এই পার্থক্য অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় না। যেমন উনবিংশ শতকের সাধুভাষার রূপ ‘আমাদের’ বর্তমান শতকের চলিত রূপ ‘আমাদের’ সংগে একভাবেই ব্যবহৃত হয়। ‘দিগের’ ও ‘দিগকে’ যোগে বহুবচনের সাধুরূপও এখন প্রায় ব্যবহার হয় না বললেই চলে। তেমনি গুলি। গুলিন যোগে বহুবচনের ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। -গুলি যোগে (যেমন : ছেলেগুলি) বহুবচনের প্রয়োগ সাধুরূপে বর্তমান বাংলায় এখনো ব্যবহৃত হলেও—গুলিন যোগে (যেমন : মেয়ে গুলিন) তার ব্যবহার এখন প্রায় নেই বললেই চলে।—ক্রিয়াপদের রূপে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য, দুই রীতি—বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট করে। যেমন :

(চলিত)

(সাধু)

সাধারণ বর্তমান

খাই

খাই

=আমরা | আমি খাই

খায়

খায়

=তাহারা | সে খায়

খাও

খাও

=তোমরা | তুমি খাও

ঘটমান

খাচ্ছি

খাইতেছি

=আমি | আমরা

খাচ্ছ

—তেছ

=তুমি | তোমরা

খাচ্ছে

—তেছে

=সে | তাহারা

সাধারণ ভবিষ্যৎ

খাব

—ইব

=আমরা | আমি

খাবে

—ইবে

=তোমরা | তুমি

খাবে

—ইবে/ন

=() তাহারা | তিনি সে

সাধারণ অতীত

খেতাম

—ইতাম

=আমি | আমরা

খেতে

—ইতে

=তুমি | তোমরা

খেত

—ইত

=সে | তাহারা

মনে রাখা দরকার মুখের ভাষার কাছাকাছি হয়েও চলিত ভাষা লিখবার ভাষা, কথ্যভাষা নয়। এ সম্পর্কে ডঃ শিশিরকুমার দাশ একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “The Calit Bhasa provides the closer approximation to the spoken language, but still it is a style of written Bengali, and therefore, must not be equated with spoken language.”

ডঃ দাশ কথ্যভাষার ৩টি স্তর দেখিয়েছেন L1, L2, L3 ; অর্থাৎ Colloquial, informal educated speech এবং formal speech ; মূলত শব্দসম্পদের উপরে এই বিভাগ রচিত। ডঃ দাশ L1-এ সবচেয়ে কম সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ কিন্তু অল্পভাষার শব্দ ও উপভাষার শব্দে সম্পূর্ণ বলে লক্ষ্য করেছেন। অল্পদিকে L2 ও L3 যথাক্রমে ৪০%—৫০% সংস্কৃত শব্দ এবং প্রায় ৭০% সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হয়, দেখিয়েছেন। ধ্বনিবিজ্ঞানেও এই স্তরগুলির পার্থক্য নজরে পড়ে বলে ডঃ দাশ মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ L1-এর পদান্তে মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায় নেই বললেই চলে কিন্তু L3-তে মহাপ্রাণ ধ্বনি পদশেষে স্পষ্ট উচ্চারিত। Intonation-গত বৈশিষ্ট্যও সেক্ষেত্রে L1-এ যত বেশী, L3-তে তত নয়।

বর্তমান বাংলা গড়ে যে সাধুভাষা ও চলিতভাষার দুটি রীতি প্রচলিত আছে তারও (কথ্য ভাষার অনুরূপ) তিনটি অনুরূপ স্তর রেখে কথ্যভাষার সংগে পার্থক্য বিচার করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য বিচার মূলতঃ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সাধু ও চলিতের (ঐ তিন স্তরে) ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে কথ্যভাষার সংগে কী সম্পর্ক, তার উপর হবে।

কথ্য বাংলা	লিখিত বাংলা	
	চলিত রূপ	সাধু রূপ
L1 Colloquial	উপহাস, কথোপকথন, লোক কথা, নাটক, সরস রচনা নকশা প্রভৃতি।	লোক কথা ও সরস রচনা
L2 informal, educated speech	Novels, plays, written speech বা উপহাস, নাটক, লিখিত ভাষণ।	উপহাসের বর্ণনামূলক অংশ লিখিত ভাষণ, সংবাদ পত্র।
L3 formal lectures	যে কোন রচনা।	যে কোন রচনা।
L4	উপন্যাস, সাহিত্যিক রচনা প্রভৃতি।	

এই বিভাগ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে কথ্য ভাষার তিনটি স্তরে সম্পর্কিত চলিত ও সাধু রূপেরও বিভিন্ন স্তর আছে এবং বিভিন্ন বস্তু বিষয় তাতে সজ্জিত করা যায়। এই বিভাগ-চিত্র থেকে এও বোঝা যায় যে চলিতরূপ সাধুরূপ অপেক্ষা অনেক বেশী কথ্যের নিকটস্থ এবং L1 স্তরে এই নৈকট্য সবচেয়ে বেশী। L1 স্তরে Slang ও উপভাষার শব্দ ছাড়াও কিছু বিদেশী শব্দ, বিশেষত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার হয়; চলিত ভাষার L1-এ এই বৈশিষ্ট্য পরিষ্কৃত হয় বেশী। কথ্যভাষার L2 স্তরে ইংরেজী শব্দ, বাগধারা, বাক্য হামেশাই ব্যবহৃত হয় কিন্তু সমস্তের চলিত ও সাধুতে, (বিশেষ করে সাধুতে) ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ বা সংস্কৃত ব্যবহারের আধিক্য লক্ষিত হয়। L4-এর রচনায় বাক্যবিন্যাস, শব্দসজ্জা ও বাক্যাংশ বিন্যাসে এক নতুন রীতি ও রূপ লক্ষিত হয় যা সাধু ও কথ্য বাংলায় দৃষ্ট হয় না। যেমন : বাতাসে কান্না ভেসে আসে এই বাক্যটিকে L4 স্তরে কান্না ভেসে আসে বাতাসে, ভেসে আসে কান্না বাতাসে, বাতাসে কান্না আসে ভেসে বা আসে কান্না

বাতাসে ভেসে এইভাবে নানারূপেই লেখা যায়। কিন্তু চলিত বা সাধুর অন্যন্তরে এরূপ শব্দসজ্জা, চলে না। আর কথ্য বাংলায় এভাবে কোন বাঙালী কথা বলে না। ‘সে জোরে হাসে’ই বলবে ‘জোরে সে হাসে’ বা ‘হাসে সে জোরে’ কেউ বলবে না; বলতে গেলে সত্যিই হাসি পাবে।—প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য। প্রথম চৌধুরী ‘সবুজপত্রে’ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণসাহিত্যে, ১৯১৬-র পরে লেখা উপন্যাস ও কথাসাহিত্যে যে চলিতভাষার ব্যবহার করলেন তাও কিন্তু কথ্যভাষার কাছাকাছি নয়। বরং বলা চলে LiI স্তরের কথ্যভাষার অনেক কাছে ছিল ‘ছতোম প্যাচার নকশা’; প্রথম চৌধুরী ও পরে রবীন্দ্রনাথ সেই সম্ভবনাকে অনেক পিছিয়ে দিলেন। এই পিছিয়ে যাওয়ার কারণ কেবল Morphological Change নয় Syntactical ও semantic বৈশিষ্ট্যও। এই কারণেই মনে হয় চলিতভাষা ও সাধুভাষা কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ—কেন্দ্রিক পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; vocabulary, word-order, clause pattern প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপরেই উভয়ের পার্থক্য নির্ধারিত হয়। বহু রচনা আছে যেগুলি Style-র দিকে থেকে চলিত কিন্তু তৎসম শব্দের ব্যবহার তাতে বহু। আবার বহু সাধুভাষার রচিত লেখা আছে যেগুলি চলিতভাষায় লেখা রচনার চেয়ে সহজ বোধগোম্য। নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যটি এই প্রসঙ্গে একবার দেখা যেতে পারে।

(১) আজি তোমাকে পেয়ে মনোরথ পূর্ণ হল।

(২) কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিজা আর তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার।

(৩) অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়।

বন্ধঘরে সবুজ ছুখে পাণ্ডু হয়ে যায়।

প্রথম চৌধুরী বলেছিলেন “....., আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।” বোধহয় তা এখনো হয়ে ওঠেনি; এবং এই না হয়ে ওঠার কারণ সম্ভবত প্রথম চৌধুরীরও ১৯১৬-র পরবর্তী রবীন্দ্রগুণ রচনার ভাষাদর্শ। উপরের উদ্ধৃত বাক্যগুলি আমরা ব্যবহারিক জীবনের কথোপকথনে বা মুখের ভাষায় কখনো ব্যবহার করি না। কেবল তাই নয় অন্তত প্রথম বাক্যটিকে চলিতভাষার অন্তর্গত করা হবে কিনা বিচার্য। Vocabulary-র ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচার্য।

‘আলালের ঘরের ঢুলালের’ পঞ্চত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রমথনাথ শর্মার নববাবুবিলাসে (১৮২৩) কিন্তু চলিতভাষার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই চলিতভাষার প্রকাশ বলতে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। (১) চলিতভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, (২) চলিতভাষার Rhetorical qualities বা Style গত বৈশিষ্ট্য। চলিতভাষার ব্যাকরণ গত বৈশিষ্ট্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চলিতভাষার Rhetorical Criticismই উনবিংশ শতকে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম চৌধুরীও কিন্তু ‘সবুজপত্রে’ এই দিকটির প্রতি জোর দিয়েছিলেন। Rhetorical বৈশিষ্ট্য অন্তত দুটি বিষয়কে অবশ্যই স্পষ্ট করে। (ক) রচনার শব্দ নির্বাচন ও (খ) কথ্যভাষার ছন্দস্পন্দনের উপর (Speech Rhythm)।

দ্বিতীয়টি সম্পর্কে প্রভূত গবেষণার অবকাশ রয়ে গেছে। বস্তুত কিসের উপর যে Speech Rhythm দাঁড়িয়ে আছে বলা শক্ত; অথচ সাধুভাষার উচ্চারণগত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য আর মুখের ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য যে এক নয় তা বোঝা যায়; একইভাবে চলিতভাষার উচ্চারিত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ও সাধুর ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের পার্থক্যও স্পষ্ট অনুভূত হয়। আমরা সাধারণ জীবনযাত্রায় যে সকল কথাবার্তা বলি তাতে ইংরেজীতে যাকে High Flown ও Chest Language বলে সাধারণত তার ব্যবহার করি না। অথচ কোন সভাপ্রস্থানে যে কথাবার্তা হয়, বা ভাষণ দেওয়া হয় তাতে oratory-র ভাষা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ভাষণ কলায় সমৃদ্ধ যে ভাষা তা চলিত হতে পারে কিন্তু তা সাধারণের কথ্যভাষা নয়। এই ভাষণকলা ভাষায় উপস্থিত এবং অনুপস্থিত থাকায় চলিত ও সাধুর এবং কথ্য ও চলিতের Speech Rhythm-র পার্থক্যও রচিত হয়। এই কারণে word order, sentence structure-র pattern এবং choice of word-র ও পার্থক্য হয়। অনিবার্যভাবেই তার সব পাঠের যে ধ্বনি বৈশিষ্ট্য তারও পার্থক্য লক্ষিত হয়।

‘নবাবু বিলাসে’র ভাষার চলিত ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য কম। কিন্তু যেখানে লক্ষিত হয় সেখানে বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ক্রিয়াপদের চলিতরূপ হিসাবে নিম্নলিখিত উদাহরণ দেখা যেতে পারে। যথা :

- (i) ছোট পুত্রকে কহিলেন লেখ দেখি।
- (ii) সম্প্রতি এই অবধি পারসী পড়ানে ভাল হয়।

সর্বনাম বাচক পদেও চলিতরূপ লক্ষিত হয়; যথা :

- (i) নামের সম্পর্ক নাই তাতে।

এবার Rhetorical qualities দেখা যেতে পারে। ‘নবাবু বিলাসে’ এমন বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি কথ্যবাংলার L1 স্তরের। যেমন : বিছানা, বালিশ, খলিপা, কয়েদ, পেয়াদা, সুরবাবু, লোট, বাবুগিরি, খোসার্মদি, টেলর, জামা, পাজামা, পাগড়ী, ছাতা, পালকী, রাষ্ট্রল, ননসেন্স, মারপিট, মেজাজ খারাপ হয়।

কখনো বাক্যাংশেও এইরূপ; যথা : চিন্তা কি যাওনা কেন! লোট বারবার ফেরাফেরি হইয়াছে। দুই একখানা ইংরাজী চিঠি, টিফিন খাওয়া, আমি গবাকর দ্বারা অর্থাৎ জানলা দিয়া.....দেখিয়াছি।

এই expressionগুলি ‘শব্দ পোড়া মরা দাহ’ কিনা সে প্রশ্ন যদি ওঠেও তাহলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে উনবিংশ শতকে বা এই মতবাদের সময়ে ভাষার শব্দ নির্বাচনের একটা সিন্ধুরূপ ছিল যাতে সকল শব্দই সকল শব্দের পাশে ব্যাকরণ ঠিক রেখেই ব্যবহৃত হতে পারত না। এই না পারাটা কোন Formula গ্রন্থিত নয়, Convention পুষ্ট মাত্র। এটিই ভাষার Rhetorical quality ও Style বিচারে ধর্তব্যবিষয়। উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি সাধুভাষার সংগে খাপ খায় না, চলিতভাষার সংগে বেশী সম্পর্কিত।

১৮৫৭-র আলাপের ঘরের জ্বালালে চলিতভাষার ব্যাকরণ ও স্টাইল আরো অধিক পরিমাণে এলেও সাধু ও চলিতে মিশ্ররূপেই সেখানে প্রধান। যথা : উণ্টে যাইবার সম্ভাবনা, বিবাহের কথা

উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে। Vocabularyতে ও মিশ্ররূপ; যথা: এ আশাদিগের জেতের দোষ। অর্থাৎ 'শব পোড়া মরা দাহ-র পরীক্ষায় 'আলালের ঘরের দুলালও' উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু চলিত ভাষায় যে Rhetorical আবেদন তা কিন্তু রচনাতেও বিদ্যমান।

'ছতোম প্যাচার নকশায়' (১৮৬২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম বাচক পদের চলিতরূপ এবং উচ্চারণ ঘোঁষা বানান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ব্যাকরণ ও স্টাইলগত দিক থেকে, অর্থাৎ চলিত-ভাষার ভাষা ও আলাংকারিক উভয় বৈশিষ্ট্যই এই গ্রন্থে বিদ্যমান। 'গুরু চণ্ডালী' 'শব পোড়া মরা দাহ' জাতীয় আলাংকারিক যে দোষ ১৮২৩ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত স্পষ্ট ছিল তা ১৮৬২-র এই রচনায় প্রায় সংশোধিত; এক প্রকার নেই বললেই চলে। আমরা ছতোমের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে নিতে পারি।

ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য :

গড়াচ্ছে, ঠেকছে, রইলেন, ঝুলতো, ফুরালো, বললেন, উঁকি মেরে দেখতে লাগলো, বলে চলে গেল, ঘুচেন, বসবেন, হেসে টলে, হাত নেড়ে, গান ধরেন, কোমর ভেঙে গেল, চশমা ভিন্ন দেখতে পাইনে ইত্যাদি।

সর্বনাম পদের বৈশিষ্ট্য :

আমি অমনি ফস্ করে বললুম তোর শব্দর হুমান। এঁরা, তাতে, তাদের, তিনি, ঝারা, ঝারা, এরই, সে, তার প্রভৃতি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে L1-র যে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে সে বৈশিষ্ট্য 'ছতোম প্যাচার নকশা'র বহু ক্রিয়াপদে বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ গ্যাচে, গড়াচ্ছে, পাচ্ছেন, পাচ্ছেন, ফেলবেন, দেখচো, হুচে, দিচ্ছেন, দেখছেন, কচে ইত্যাদি। অর্থাৎ ছ স্থানে 'চ' বা মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অল্পপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য মহাপ্রাণ উচ্চারণ অন্যত্র রক্ষিত হয়েছে; যেমন : ঘোড়া, ছেলে, হয়েছিল।—

বিবেকানন্দ আক্ষেপ করেছিলেন যে আমরা বলি এক ভাষা লিখবার সময় লিখি অন্তরূপ। ছতোমের লেখকই বোধহয় প্রথম এই গ্রন্থে মূখ্য ভাষার কাছাকাছি শব্দ ও শব্দ গুচ্ছের বহুল ব্যবহার করেছিলেন। বিভিন্ন ভাবে এই vocabularyর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

(১) বিদেশী শব্দের ব্যবহারে :

ওয়াচ গার্ড, ট্যানল, স্কলফ্রেণ্ড, ডাইরেট, সার্টিফিকেট, ডিগ্রী, মডেল, সুপারিনটেন্ডেন্ট, রিফর্মেশন, ক্লাব, মিটিং, আলবার্ট, ফ্যানসন, গুড্‌ইভিনিং, শেকহাণ্ড, বোট, স্টাফ, এনট্রান্স, ডেসিংক্রম, কমপ্লিমেন্ট, ইত্যাদি। ভঙ্গি, চাকর, বাইনাচ, জান, চাবি, আমলা, মুচ্ছুদী, হুজুর, হুকুম, পীর, লুচি, মেঠাই, হাকিম, টুপি, আমীর, নবাব, জুতো, পায়জামা, বদমাইশ, পাইক, জায়গা, জানালা, রোজগার, চাবুক, মস্কী ও মুসল্লির ইত্যাদি।

(২) দেশী শব্দের ব্যবহারে

ঠুকে, কঞ্চি, ঝোল, ঝোলা, মোটা, ঘটি, থালা, ছেলে, চ্যাটালো, ছোরা, ফুটা, ঢুলী, প্রভৃতি।

(৩) অনুকার শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দে, অনুগামীশব্দে

রাজ-রাজড়া, ধুমধাম, তুকতাক, ধোপদস্তুর, কাপড় চোপড়, ফাঁক ফাঁক, হেঁড়াছুঁড়ি, সপাসপ, টুং টাং, কোঁ কোঁ, ভোঁ পোঁ, থপথপ, বাম বাম, হৈ হৈ রৈ রৈ, টুহু নাংটাং, ছেলেপিলে, পোশাক আসাক ইত্যাদি।

একজন শিক্ষিত ও স্বাভাবিক বাঙ্গালী তার ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু দেশি অনুকার, ধ্বন্যাত্মক ও অনুগামী শব্দ বাদ দিয়ে কথোপকথনের কাজ চালাতে পারে না। চলতি ভাষাতে কথোপকথনের ভাষার ব্যবহারই স্বাভাবিক। L 1 স্তরের vocabulary তাই চলতি ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। কেবল ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম বাচক পদের চলতিরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে সাধারণ vocabulary-র ক্ষেত্রে যদি একটি কৃত্রিম পরিশীলিত রূপ বজায় রাখা যায় তাতে চলতিভাষার ব্যাকরণ ঠিক থাকলেও তা সেই বহুল অভিপ্রেত মুখের ভাষার কাছাকাছি আসতে পারে না। স্বসন্ধ্যা, সভা, সমিতি পরিচালক, বিদ্যালয়ের বন্ধু প্রভৃতি শব্দ Good Evening, Meeting, Club, Director বা School friend-এর ভাষাগত চলৎশক্তি কিছুতেই দিতে পারে না। ভাষার স্বাভাবিকতা এতে আহত হতে বাধ্য। অবশ্য 'কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিছা আর তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার' কেবল সেইজন্মই মুখের ভাষার নিকটস্থ নয় বললে ঠিক হবেনা। এ ভাষার প্রকাশভঙ্গীতেই আছে শিক্ষিতজনের সীমাবদ্ধ আভিজাত্য। একটা ডুইংক্রমের Intellectual ও artificial atmosphere; ভাষার জগতেও রামা কৈবর্তীদের সংখ্যা বেশী; বাদ দিলে আর সাধারণের মুখের ভাষা হয় কোথায়? হতোমের ভাষাতে এই সাধারণের মুখের কথা শোনা যায়। সেটা নিতান্ত পরিচিত আংগিকের। তাই অস্পষ্টতা নেই; একধরনের নিজেই চিনতে পারার আনন্দ বোধ হয়। 'এই Identification-র তর তম'র জন্যেই কিন্তু এক লেখকের রচনা বহুল জনপ্রিয় হয় আবার অজ্ঞানের রচনা অতি অপরিচিত থেকে যায়। কে বলবে এই প্রকাশভঙ্গীর সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এত বেশী পঠিত হত কিনা। হতোমের ভাষার প্রকাশভঙ্গীর গুরুত্ব এদিক থেকে খুব বেশী। কাজেই 'বাবুর' আত্মীয়দের বর্ণনাকালে যখন বলা হচ্ছে, "তারা রাত্রি তিনটির সময় উঠেছেন, চোক লাল টুক টুক হচ্ছে, মাথা ভবানীপুরে ও কালীঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে" তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লালচোখও টন টন ক'রে না; তখন শান্তিনিকেতনী বেডকভারের মত বা বগুরে কই'র মতই ভবানীপুরে ও কালীঘেটে ধুলোয় ভাল লাগার প্রশ্নই বড় হয়ে ওঠে। সেই মাথাভর্তি ধুলো নিয়েই দর্শকেরা তখন "হাঁ করে গাজন দেখছেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া ক্ষেপেছে—ছড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়ছেন, হোঁচ্রে মাথা ফেটে যাচ্ছে—তথাপি নড়বেন না।"—অধিকাংশ বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল ঘটমান বর্তমান। এবং একটি বাক্যে Present perfect-র effect; যথা, সময় উঠেছেন, ভরে গিয়েছে; এবং ওদিকে "ঘোড়া ক্ষেপেছে।" দ্বিতীয় বাক্যটির 'ক্ষেপেছে' বাদ দিলে যে চারটি ক্রিয়ার ব্যবহার তা সবকটিই Present Continuous Tense-র। এবং এই চারটি ক্রিয়ার 'তথাপি' বাক্য সংযোজকের প্রয়োগে বক্তব্যের কলাকৌশল দাঁড়িয়ে আছে। বিষয়টি অত্যন্ত ক্রিয়ামুখীন ঘটনাবলীর বর্ণনা। তাকে প্রত্যক্ষতর করে তুলবার জন্য এই Present Continuous Tense-র

ব্যবহার; এবং একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার গুরুত্ব অধিকতর বোঝানোর জন্য 'তথাপি'র ব্যবহার। হাঁ করে গাঙ্গন দেখার চেয়ে ঘোড়ার ক্ষেপে যাওয়া, ফলে দোকানে ও থানায় হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়া এবং রোডে মাথা ফেটে যাচ্ছে—এসব সম্বন্ধেও তথাপি নড়চেন না। আমরা প্রত্যক্ষ করছি এমনি কোন ঘটনার বর্ণনা দিতে গেলে এমনি Direct Description-ই দিই। যেটা মুখে করি এখানে ভাষাতেও সেটাই করা হয়েছে। রোডে মাথা ফেটে যাচ্ছে। রোডটি একটু Sabire-র আলোয় ভরা ব্যবহার। যেমন অনূত্র, “কীর্তন অঙ্গের ছোটো পদাবলী মুখস্তকরেই মজুরা কন্তে বেরোন।”

প্রকাশ ভাঙ্গীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, ‘এবং’ সংযোজক অব্যয়ের স্থলে ‘ও’-এর ব্যবহার বেশী। যেমন :

- (i) ...মজুরা কন্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন।
- (ii) নবাবী আমিরী ও নবাবী মেজাজের...নাড়াচাড়া হয়।
- (iii) কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি...পোশাক।

বাক্ধর্মী বাক্য :

- (i) আরে আর শুনেচ ? রমাপ্রসাদবাবুর মার সপিগুরুণের ধুম।
- (ii) বলো আমি রাধা, তুমি শ্যাম।
- (iii) আজ যাও। কাল এস।

এগুলি সবই Direct Speech-এ প্রকাশিত। কিছু Topical Colour-এর প্রকাশ। যথা :

- (i) দশ দিন চোবের একদিন সেধের।
- (ii) পাথরে পুজিলে পাঁচ পীর হয়ে পড়ে।
- (iii) শ্রাব্দের দাগা বাঁড়।
- (iv) ছাদন দড়ি গোদা বাড়ি এখন তুমি কার।

মনে রাখা দরকার ‘এবং’ আমরা সাধারণত কথোপকথনের ভাষায় স্বল্পই ব্যবহার করি। ‘ও’-র প্রয়োগ তার তুলনায় বেশী। Informal কথায়, বিশেষত মেয়েদের আলাপে এক ধরনের, কৌতুহল, বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতির উদ্বেক ক’রে এমনি শব্দের প্রয়োগ ও প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করা হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই মানবিক প্রবৃত্তি বা মানসিক ভাবগুলি বক্তব্যের মধ্যে ব্যবহৃত উক্ত ব্যঞ্জক শব্দগুলি না থাকলেও রস নিষ্পত্তিতে সঞ্চারিত হতে পারত হয়তো; কিন্তু Informal Speech-এ বক্তা রস নিষ্পত্তিও কেমন হবে তা ভাষায় ব্যক্ত ক’রে দিতে চান। বাক্ধর্মী বাক্যের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি লক্ষ্য করলেই এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়। রমাপ্রসাদবাবুর মায়ের সপিগুরুণের খবরটি পরিবেশনে যে গ্রাম্য কৌতুহল স্পষ্ট তা “আরে আর শুনেচ”-র মধ্যেই ধরা পড়ে।—প্রবাদমূলক বাক্য ও বাক্যাংশের ব্যবহারও সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে হামেশাই ব্যবহৃত হয়। এই কথ্য ভাষার কাছাকাছি ভাষা ব্যবহারের জন্তে উচ্চারণমুখীন বানানও করা হয়েছে। যেমন : জুতো; মঁতো, ছাপানো, বড়ো, নেবো। পোতুর, মিত্তির, যোত্তর, উজ্জুগ, কল্লেন, হচ্ছে। রোজা, হুদ, সওয়া কুনুতে চেলের মুনো বাঁধেন।

‘ও’-কারন্ত উচ্চারণ পশ্চিম বাংলার Standard Colloquial Dialect-র একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্ব বাংলার প্রায় সব Dialect-এই ‘ও’কার ‘আ’কার বা অ-কারে উচ্চারিত হয়। জুতো—জুতা, মতো—মত। আর বর্ণের মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জন সম্বন্ধিত ব্যঞ্জনে (Cluster) উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতাও কথ্য Standard-র বৈশিষ্ট্য। যেমন; ত্র/ত=মিত্র—মিত্রির এই পরিবর্তনে vowel Harmony-র নিয়মও লক্ষিত হয়। যেমন, মিত্র-র ই-কার পরবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পরিবর্তিত যুগ্মরূপের সংগেও ব্যবহৃত হল ফলে ই-কার+ম+ই-কার+ও এবং ‘ত্র’ যে ‘র’ ‘ত’ যে পরিবর্তিত হল সেই ‘র’ কিন্তু সম্পূর্ণ লুপ্ত হল না। ‘র’ Cluster-র পরে ব্যবহৃত হয়ে ‘মিত্রির’ হল। উজ্জুগ কিন্তু উৎ+যোগ=উজ্জোগ—উজ্জুগ হয়েছে; অর্থাৎ ব্যঞ্জন সন্ধি এবং vowel Harmony-র ফলে তার উদ্ভব। ক্রিয়াপদগুলির ক্ষেত্রে প্রায়ই অযুক্ত ব্যঞ্জন এবং স্বর লুপ্ত বা পরিবর্তিত হয়ে নূতন Clusteral form-এ প্রকাশিত হয়েছে। যথা : করিলেন—কল্লেন=ক+(ই-কার)+এ-কার+ল্ল+ন। অর্থাৎ Initial Consonant-এর কোন রূপান্তর হয়নি; কিন্তু অন্তবর্তী ঘরের পরিবর্তন (যেমন ই-কার—এ-কার) এবং অব্যবহিত পরবর্তী ব্যঞ্জনটি যুগ্ম হয়েছে (যথা : (ল—ল্ল)। কিন্তু হইতেছে—হ+‘ইতে’ লুপ্ত+এ-কার+ছ—চ। মহাপ্রাণ বর্ণ এখানে অল্পপ্রাণ হয়। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলি চলিত ভাষার এবং কখনো কখনো অতি Colloquial বা বিশেষ কোন Dialect-র বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য এ Dialect পশ্চিমবঙ্গেরই কথ্যভাষা, কলকাতার উত্তরাঞ্চলের মুখের ভাষার বেশী কাছাকাছি কিন্তু সকল অঞ্চলের সকলের মুখের ভাষার কাছাকাছি নয়।—এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে এবার আমরা হতোম প্যাটার নকশা-র ভাষার Style সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কালীপ্রসন্ন সিংহের এই গ্রন্থ কেবল চলিত ভাষাতেই রচিত নয়, কলকাতার কথ্য ভাষারও কাছাকাছি যে ভাষা তারও প্রয়োগে স্পষ্ট। অর্থাৎ প্রমথ-রবীন্দ্র যুগের চলিত ভাষার চেয়েও কালীপ্রসন্নের চলিত ভাষা কথ্য ভাষার কাছাকাছি।

এবারে ভুবনচন্দ্রের রচনার Stylistics featureগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দরকার। ভুবনচন্দ্রের যে রচনার সংগে হতোম প্যাটার অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় সেই হরিদাসের গুপ্তকথা (১৯০৪) থেকে যে কোন একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

“বঙ্গের প্রধান পর্ব দুর্গাপূজা। বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির এমন পর্ব আর নাই। বৎসরের মত দুর্গাপূজা ফুরিয়ে গেল। আশ্বিন মাস প্রায় শেষ। ছয়মাস আমি কলিকাতায়। রাস্তাঘাট অনেক জানা হয়েছিল। বিসর্জনের পাঁচদিন পরে কোজাগরী পূণিমার দিন বৈকালে আমি একাকী চিংপুর রোডে বেড়াতে বেড়িয়েছিলাম। বৈকালে এ রাস্তায়ে আমি একদিনও আসি নাই। অল্প দিন অল্প সময়ে এ রাস্তায় যে রকম ভিড় আর যে রকম শোভা দেখি আজো সব সেই রকম, কেবল একটা শোভা আজ আমার চক্ষে নূতন। গরণহাটা থেকে কলুটোলা পর্যন্ত, বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেম দু’ধারে বারান্দায় বারান্দায় রকমারি মেয়ে মানুষ। রকমারি বর্ণের কাপড় পরা, রকমারি ধাতুর গহনাগড়া, রকমারি ধরনের খোঁপা বাঁধা। অনেক রকম মেয়ে মানুষ। কেহ কেহ টুলের উপর বসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বসেছে,.....”

হতোমের ‘দুর্গোৎসব’ের বর্ণনা থেকে এবার তুলনামূলক টুকরো টুকরো কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক। যথা : দুর্গোৎসব বাংলাদেশের পরব | দুর্গোৎসব এক বছরের মতো ফুল্লো | কল্কেতায় আর অন্য কোনো মেলা নাই | কাপড়-চোপড় পরে আতরের তুলো গুঁজে | কেঁপে উঠতে | লেগে গেছে | ইত্যাদি।

উভয়ের vocabulary-র বিশ্লেষণে কতকগুলি পার্থক্যের উপর স্বর পড়ে। যেমন হরিদাসের গুপ্ত কথায় ‘বঙ্গের’ হতোমে ‘বাংলাদেশের’, হরিদাসের ‘পর্ব’ হতোমে ‘পরব’, ‘ফুরিয়ে গেল’ ‘ফুল্লো’; ক্রিয়াপদের অন্য বৈশিষ্ট্য হতোমে বসেছে, উঠেছে। গ্যাচে কিন্তু হরিদাসে বসে আছে, বেরিয়েছি, হয়েছিল। হতোমের চোখে, হরিদাসের চোক্ষে; আবার হতোমের “কেউ ঘড়ির চেন, কেউ আংটি ও ইষ্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কত্তে আরম্ভ কল্লেন” কিন্তু হরিদাসের “কেহ কেহ টুলের উপর বোসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বোসেছে।”—এই পার্থক্যে উভয়ের রচনার Style-র স্বাতন্ত্র্য স্থপ্তি করেছে বলে মনে হয়। হতোমের ভাষায় যত Colloquial flair পাওয়া যায় হরিদাসের ভাষায় তত পাওয়া যায় না। এই পার্থক্য বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয় কিনা দেখা যেতে পারে। হতোম প্যাচার ‘দুর্গোৎসব’ অংশের “রামলীলা এ দেশের...বেশাও বেনেই অধিক” রচনাংশটির বাক্যগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট ৬টি বাক্যে একটি অল্পচ্ছেদ রচিত হয়েছে এবং এই বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য মথাক্রমে ৭, ৩১, ১২, ৮, ১১ ও ১০। মোট শব্দ-সংখ্যা ৭২। গড় পড়তা বাক্য দৈর্ঘ্য কিকিঁদোখিক ১৩। অপরপক্ষে হরিদাসের গুপ্ত কথায় দুর্গোৎসবের বর্ণনা থেকে “বঙ্গের প্রধান পর্ব.....চক্ষ নতুন” এই অংশটির বাক্যগুলি দেখলে দেখা যাবে মোট ৭টি বাক্যে একটি অল্পচ্ছেদ রচিত হয়েছে এবং বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য মথাক্রমে ৪, ১২, ৪, ৪, ৪, ১৩, ৭ ও ২০, বাক্যগুলির গড়পড়তা দৈর্ঘ্য কিকিঁদোখিক ৮। অর্থাৎ হতোম ও হরিদাসের গড়পড়তা দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কম বেশী ৫। ১৩কে Standard Length ধরা হলে হরিদাসের বাক্যদৈর্ঘ্য রেখাচিত্রে নিম্নমুখীন হবে অর্থাৎ Short Length-র হবে। আবার ৮কে Standard Length ধরলে হতোমের বাক্য দৈর্ঘ্য উর্দ্ধমুখীন হবে অর্থাৎ Length বড় হবে। এই বিশ্লেষণ থেকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে উভয়ের বাক্য দৈর্ঘ্যও এক নয়।

বাক্যের বিন্যাসগত অন্যান্য Rhetorical ও Struction গত বিশ্লেষণেও হতোম ও হরিদাসের পার্থক্য চোখে পড়ে। গতের যে Rhythm তার অনেকখানিই নির্ভর করে Sentence-র arrangement-র উপর। সাগর-তরঙ্গ-ভঙ্গেই সামুদ্রিক ছন্দ যেমন লক্ষিত হয় তেমনি গত-ছন্দ লক্ষিত হয় বাক্যতরঙ্গ ভঙ্গে। বাক্যের এই তরঙ্গভঙ্গ বিবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, বাক্যদৈর্ঘ্য ও তার বিন্যাসের উপর এই ছন্দ যে অনেকখানি নির্ভর করে এবং ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’র ও ‘হতোম প্যাচার নকশায়’ তার প্রকাশগত স্বাতন্ত্র্য কেমন তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। উক্ত যে অংশটির বাক্যদৈর্ঘ্য আলোচিত হয়েছে সেটি দেখলেও বোঝা যাবে যে হরিদাসের বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য ও বিন্যাসে যত বৈচিত্র্য হতোমে তার চেয়ে অধিক বিশিষ্টতা। ৭ থেকে ৩১ এবং ৩১—১২—৮—১১—১০ এই পর্যায়ে সেগুলির উত্থান ও পতন সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই বাক্যগুলির ধনিতরঙ্গের যে বৈচিত্র্য ৪, ১২, ৪, ৪, ৪, ১৩, ৭ ও ২০তে সে বৈচিত্র্য নয়।

একই দৈর্ঘ্যের একাধিক বাক্যে পর পর ব্যবহারে ধ্বনি প্রবাহের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না। প্রবাহ বার বার ধাক্কা হয়ে যায়। এই Halting Language-র বৈশিষ্ট্য হতে পরে গুণ নয়। অর্থাৎ বিরতিচিহ্নের যখন বেশী ব্যবহার হয় তখন ধ্বনি প্রবাহও বার বার থেমে যায়। তথ্য দেখলে তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে 'হরিদাসের গুপ্ত কথায়, আর 'হতোম প্যাঁচার নক্শায়' বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহ একরকম। ভাষাগত এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে এই দুটি পুস্তকের পার্থক্য অস্বীকার করার উপায় নেই। Style সম্পর্কীয় আলোচনায় তাই হতোমের ভাষা যত বেশী মুখের ভাষার কাছাকাছি দেখা যায় হরিদাসের গুপ্ত কথার তত বেশী দেখা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র এই তথ্যের ভিত্তিতে কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখক উপাধি কেড়ে নেওয়া যায় না বা ভুবনচন্দ্রকে হতোমের লেখকরূপে প্রতিপন্ন করা যায় না। উভয় গ্রন্থের রচনাকালের ব্যবধানও আছে। রচনার যে আপাতমিল আছে তাতে প্রাচীনের প্রভাব অল্পবর্তীর উপর বর্তাতেও পারে। উভয় গ্রন্থের এক লেখক হলে, Style বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, style পরিবর্তিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের আরো লেখা যদি উভয়ের থাকত তাহ'লে কীভাবে এই পরিবর্তন ক্রমশ হয়েছে তার বিশ্লেষণ সম্ভাবিত হত। কারণ উভয়গ্রন্থের Stylistic feature-র যে ব্যবধান তা দুস্তর; এই ব্যবধান একদিনে রচিত হয় না—কাজেই ভুবনচন্দ্র ও কালীপ্রসন্নের সমস্তা সমাধান ঐতিহাসিক তথ্য ও ভাষা বিশ্লেষণজাত প্রমাণের যৌথ দায়িত্বের উপর নির্ভর করছে। ইতিহাসগত আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আর কোন বড় সমর্থন পাওয়া না যাচ্ছে তত দিন এই বিশ্লেষণ নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ রইল।

সখের আখড়াই

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আখড়াই গানের ইতিহাস জানতে গেলে কিছুটা বিব্রত হতে হয় বিশেষত সঙ্গীতে অনভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে তো বটেই। আখড়াই কবে কে সৃষ্টি করেছেন ঠিক জানা যায়নি। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন ‘আখড়াইয়ের সৃষ্টিকর্তা কোন ব্যক্তি স্থিররূপে ইহার নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।’ কিন্তু গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন ৮৭১ সালে স্বর্ণনদীর ধারে ভাটকলাগাছি গ্রামে রথযাত্রার দিন দু’দলে মিলে আখড়াই গান শুরু হয়। এ দৃষ্টান্তে আরো কিছু তিনি বলেছেন কিন্তু গবেষকরা তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। প্রথমত আখড়াই ‘গানের ভিতর দিয়া’ কোন লড়াই নয়। ‘আখড়াই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর নাই, যাহার দিগের স্বর ও গাহনা ভাল হইত, তাঁহারাই জয়পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাদ্ধিয়া আনন্দপূর্বক গমন করিতেন।’

যাঁরা খেউড়, তরঙ্গা, কবিগানের মত আখড়াইকেও উত্তর প্রত্যুত্তরের মিশাল জবাবী গান মনে করেন তাঁদের জ্ঞান গুপ্তকবি বলে গেছেন, ‘আখড়াই গাহনা যে প্রকার বাহুল্য ব্যাপার তাহাতে কোনমতেই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে পারে না, কারণ ১০।১২ জন গায়ক একত্র হইয়া ক্রমশঃ একবৎসর কাল স্বর ও তাহার মিছিল সমুদয় অভ্যাস করতঃ গলার মিল করিয়া যখন দুই তিন গোপনীয় সভা করিয়া দেখেন যে সকল দিক সমান হইয়াছে, আর কোনরূপ অনৈক্য দোষ নাই, তখন পরস্পর সম্মত হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধের দিন স্থির করেন।’

তাহলে আখড়াই গান সৃষ্টি হলো কিভাবে। ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছেন ‘হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবদেব আখড়ায় এর জন্ম হয়েছিল।’ বৈষ্ণবধর্মের প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক তলানি হয়ত আখড়াই গানে ঠেকেছিল। বলা বাহুল্য বাঙালী মাঝেই বুঝবেন এই তলানিটুকু আদিরসের ইঙ্গিতে সিক্ত হওয়া শক্ত নয়। বিশেষত আদিরসলোলুপ সেকালে ধনী নৃপতিদের কল্যাণে। ‘বৈষ্ণবী’ অধ্যুষিত সেকালের চঞ্চল আখড়ার কথা থাক্, গুপ্তকবি বলেছেন ‘সর্বপ্রায়ে শান্তিপূরুষ ভদ্র-সন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন।’ লক্ষ্যণীয় এই যুবকেরা আখড়াই বলতে বুঝতো প্রভাতী ও খেউড়, বাকি অংশ ‘ভাবনীবিসয়’ নয়। সে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। তখন শান্তিপূর অঞ্চলের মেয়েদের ‘চোপা’ (তীক্ষ্ণ তীর্থক বাগ্‌ভঙ্গী) বিখ্যাত। সাধারণত মেয়েরা তাদের এই চোপার ব্যবহার করতেন তীব্র আদিরসের মিশেল দিয়ে বিবাহ বাসরে। মেয়েরা বেশিক্ষণ রসিকতা করলেই তা আর শুভ থাকে না, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তীব্র আদিরসে বাক নেয়। উপরন্তু স্ত্রী-আচারের ঘনিষ্ঠ কর্মী ধূর্ত নাপিতও এতে নীরব থাকত না। মনে হয় স্ত্রীআচারে নাপিতের কর্তব্য ‘ক্ষোঁরি’ ও তৎসহ আদিরসাত্মক ছড়া থেকেই খেউড়ের জন্ম। ডঃ স্বকুমার সেনের মতে খেউড় কথাটা এসেছে ‘ক্ষেড়’ থেকে, যার অর্থ কুংসিং অঙ্গভঙ্গী, নিগীবন ইত্যাদি। উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা যে কাদা, রক্ত, নিগীবনকে ভুলি না তার প্রমাণ উনবিংশ শতাব্দীর নবমী উৎসব ও আজকের হোলিতে। মহানবমীর বলির রক্তকাদা-উৎসবের নাম ছিল

কাদাথেউড়। হতোম পৌচা চলছেন 'বাবু নবমী গাইছেন ও কাদা মাখছেন।'

এই অঙ্গীল উৎসবের হোতা ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। চোপার তীক্ষ্ণ তীর্থক বাগভদ্রী, তীব্র আদিরসের স্কুল ইঙ্গিত ইত্যাদি তখন ধৃত নাপিতের হাত ধরে খেউড়ে বাসা বাঁধল। হরিহর শেঠ জানাচ্ছেন 'নবমীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমীকীর্তন উপলক্ষ্যে নবমীপূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদাথেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক একটি সকার বকারের খেউড় রচনা করিতে হইত।'

ক্রমশঃ অঙ্গীল খেউড় সামাজিক আচার হয়ে দাঁড়াল এই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলছেন 'তাহারই (কৃষ্ণচন্দ্রের) উৎসাহে খেউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই।' প্রসঙ্গত বলা দরকার এই অঙ্গীল গান অন্তর্ভুক্ত ছিল, দীনেশ সেন বলেছেন পূর্ববঙ্গে এর মাম ছিল 'লাল গান'। ছেলে বুড়ো একসঙ্গে বসে শুনত এ গান।

সে যাক শান্তিপুত্রের খেউড়ের কথা বলা যাক। 'এই সকল গীতে 'ননদী, এবং দেওরা' এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য বাক্যে গীত সমুদায় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই আমোদ হইত। তচ্ছবণে শান্তিপুত্রের স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন।' অর্থাৎ এইভাবে অঙ্গীল আদিরস নির্ভর খেউড় সম্বল আখড়াই শান্তিপুত্রের সর্বত্র জনপ্রিয় হল। এইটাই স্বাভাবিক রাজার পৃষ্ঠপোষিত সামাজিক আচার-ধর্মই সবিশেষ জনপ্রিয় হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন 'দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলেও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দৃষ্টবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচলিত কবি ও খেউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই।'

বরং সে 'ছড়িয়ে গেল সবখানে'। তবে একটা কথা শান্তিপুত্রের আখড়াইতে কথার গুরুত্ব ছিল বেশী তার বাগভদ্রী, ইঙ্গিত ও আদিরস। 'কিন্তু 'যজ্ঞের বিশেষ বাহুল্য এবং সূত্রের তাদৃশ্য পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না।' শান্তিপুত্রের খেউড়ই 'সামান্য টপার দ্বারা সূত্র গান করিয়া তাহাকেই 'আখড়াই' নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।'

শান্তিপুত্র থেকে গঙ্গা পেরিয়ে আখড়াই এবার এল চুঁচুড়ায়। বলা বাহুল্য এর ফলে কিছু পরিবর্তনও ঘটল। প্রথমত শান্তিপুত্রের আখড়াই গাহনার দৃষ্টান্ত ক্রমে 'ইতর শব্দ পরিহার পূর্বক অতি সরল সাধুভাষার গান সকল' রচিত হতে লাগল। শান্তিপুত্রের চোপার তীক্ষ্ণতা এখানে হ্রাস পেল। বদলে বাড়ল সুর মান ভাল লয়ের দিকে দৃষ্টি। এরই ফলে লক্ষ্য পড়ল বাগযজ্ঞের আধিক্যের প্রতি। চুঁচুড়ার আখড়াই নাম পেল 'বাইসেরা'—অর্থাৎ বাইশটি বাগযজ্ঞ সহযোগে গান হত। গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিভাগাগর বলেছেন এই সব যজ্ঞাদির মধ্যে 'হাড়ী কলসী প্রভৃতি' ও থাকত। সে যাক 'আখড়াই বাজনার প্রধান যজ্ঞ 'তানপুরা বেহালা মন্দিরে, ঢোল, মোচঙ্গ খরতাল', সিটি ইত্যাদি, ইহার সঙ্গে সপ্তসারা, জলতরঙ্গ, বীণা, বেণু, সেতার প্রভৃতি যত যোগ কর, ততই উত্তম, কিন্তু না করিলে কিছুমাত্র হানি হয় না। আখড়াই ঢোল বাজানার যে প্রকার নৃতন, তাহার বেহালায় গৎ সকলি সেই প্রকার নৃতন, কিন্তু কোন কোন আখড়াই সম্প্রদায় ২০২১

খান পর্যন্ত যন্ত্র একত্র বাজাইয়াছেন।’

জানিনা, গান-বাজনা কথাটা কেন এত ঘনিষ্ঠ, কিন্তু আখড়াই গান ক্রমশ বাজনাবহুল হয়েই উঠল। গুপ্তকবি বলছেন ‘আখড়াই সাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠই ঢোল তাহার নীচেই বেহালা।’ কলকাতার আখড়াই গানে এই বাজনা ও তার শিল্পীদের কথা একটু পরে বলছি।

এখন চুঁচড়ার এই ‘বাইসেরা’ আখড়াই ‘বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া যুক্ত করিতেন।’ ‘এর ফলে কলিকাতায় বিজ্ঞানসাহী জনেরা সুর ও বাজের রুশংখলা করত অনেকাংশ পরিবর্তন করিয়া আখড়াইয়ের আমোদে আমোদি হইলেন।’

১৮০৩ সালের পূর্বে ‘মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙালি মহাশয় দিগের মধ্যে আখড়াই গাহনার অত্যন্ত আমোদ ছিল।’ অর্থাৎ চুঁচড়ার বাইসেরা এসে আশ্রয় পেলে শোভাবাজারের রাজসভায়। গুপ্তকবি আগে জানতেন না আখড়াইয়ের সৃষ্টিকর্তা কে। কিন্তু শোভাবাজারের রাজসভার পোষা গায়ক ছিলেন জনৈক কুলুইচন্দ্র সেন। ‘ঐ মহাশয় সংগীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য হয়।’ তাই ভোলা ময়রার এক কবি গানের লহরে জানা যায় ‘আখড়াইয়ের সৃষ্টি কোলে কুলুইচন্দ্র সেন।’ অর্থাৎ কলকাতায় আখড়াইকে নতুনরূপে পরিচিত করলেন কুলুইচন্দ্র সেন।

এখন এই নতুন রূপটি কি? আমরা আগেই বলেছি আখড়াই আদিতে ছিল খেউড় তীক্ষ্ণ মেয়েলি রসিকতা—আদি রসিকতা স্বলভতীর বাগভঙ্গী—শান্তিপুর থেকে চুঁচড়ার এসে আখড়াই ‘কথা’র গুরুত্ব কমিয়ে বিবিধ বাগযন্ত্রের বাহুল্য সৃষ্টি করলে। এখন শোভাবাজার রাজসভায় ‘বাইসেরা’ এসে দেখল সেখানে বেতনভূক ওস্তাদের দল বাগযন্ত্রের কান মুখে সর্বদা ‘মেও মেও’ করে। যেখানে পাতা পেতে হলে তাল মান লয়ের কালোয়াতী দরকার, যাতে শরৎচন্দ্রের গল্পের ওস্তাদের গানের শেষে ঘাড় ঢুলিয়ে বলেন ‘এয়াসা কভি নেহি জ্ঞানা।’

কুলুইচন্দ্র সেন ভুলে গেলেন আখড়াই ‘আদিতে বা য ছিলেন’, তিনি ক্ষণ মধ্যে বাইসেরার কথা কিছু মনে রাখলেন বটে কিন্তু সে কেবল তাল মান লয় সুরের কালোয়াতি ফোটাতেই। ‘কুলুই চন্দ্র ‘সুর ও গীতকে নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে যুক্ত করত নতুন নতুন বাজের সূচনা করিয়াছিলেন।...আখড়াই গীতের ইনি যে সকল নতুন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অজাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।’ গুপ্তকবি বর্ণিত এই নতুন প্রণালীই হল রাগের কালোয়াতি। এই ‘নতুন প্রণালী’র বিবর্তন কিন্তু বেশিদিন ধরেছিল না যে কথা পরে বলছি। আগে বলা দরকার কলকাতায় রাজসভায় বাইসেরার বাগ যন্ত্রগুলোর খবর। খেয়াল প্রভৃতি রাগসংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের মত সাধারণ শ্রোতা বুঝতে পারি-গায়কের গানে থাকে রাগরাগিনীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টানা পোড়েন দ্রুত বিলম্বিত কালোয়াতি। কিন্তু রাগ প্রধান সাধারণ গানে এ কালোয়াতি কিছুটা কমে আসে-আবার আধুনিক বাংলা গানে সেটুকুও ঘুচে দেশি বিদেশী বিবিধ যন্ত্রের বিভিন্ন আভ্যন্তর গুরু হয়। কতকটা এ ধরণেরই ঘটনা ঘটেছিল সে যুগের বাইসেরায় বিপরীত ভাবে। আখড়াইতে যখন রাগ রাগিনীর কালোয়াতি গুরু হল চুঁচড়ার বাইসেরা দেখানে কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল।

কলকাতায় এসে বাইসেরার কিছু কিছু অবশ্য বাগযন্ত্র টিকে রইল কিছু আরও উৎকর্ষ লাভ

করল। ‘আখড়াই সাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠই ঢোল তাহার নীচেই বেহালা। পূর্বেই যত ব্যক্তি ঢোল বাজাইয়াছেন তন্মধ্যে বাগবাজার নিবাসী ৩৭সিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের অপেক্ষা প্রধান আর কেহই হয়েন নাই; জোড়াসাঁকোস্থ ‘জাটা বলাই’ নামে একজন স্বর্ণবণিক আখড়াই বাজে অত্যন্ত নিপুণ হইয়াছিলেন, আর ‘লবু আঢ়া বাজু আঢ়া এবং রূপচাঁদ’ এই তিনজন স্বর্ণবণিক ইহার নিকট বাজুশিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শি হইলেন।’

জোড়াসাঁকোর আখড়াই দলে বেহালা বাজাতেন হোগলকুঁড়ে নিবাসী পার্বতীচরণ বসু। ‘পার্বতীবাবুর বেহালা শুনিয়া তাবতেই মুগ্ধ হইয়াছেন, ইনি বাগবাজারস্থ ৩রাধানাথ সরকারের তুল্য প্রতিযোগী ছিলেন।’ এই রাধানাথ সরকারের বেহালা সম্পর্কে গুপ্তকবি বলেছেন ‘বালীস্থ ৩বাবু রাধানাথ সরকারের অপেক্ষা বেহালা বিজ্ঞায় কেহই নিপুণ ছিলেন না।’ শেষে বলি রসিকচাঁদ গোস্বামীর ঢোল ও রাধানাথ সরকারের বেহালা সম্বন্ধে গুপ্তকবি বলেছেন ‘গোস্বামীর ঢোল ও সরকার বাবুর বেহালা যিনি না শুনিয়াছেন তাঁহার কর্মই বুঝা।’

পাঠক হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন আখড়াই বাজের ইতিহাস বলতে গিয়ে আমি হঠাৎ বাগবাজার ও জোড়াসাঁকো দলের বাজির কথা পেড়েছি। কিন্তু নবকৃষ্ণের রাজসভা থেকে আখড়াই কিভাবে সেখানে গেল তা জানাই নি। ঠিক কথা কিন্তু আখড়াইয়ের বাজনা নিয়ে আলোচনা করার আর সুযোগ ছিল না। নবকৃষ্ণের বেতনভুক্ত গায়ক কুলুইচন্দ্র সেন যখন নূতন প্রণালীর আখড়াই প্রতিষ্ঠিত করলেন রাজসভার, তখন বাইরের ধনী ও হঠাৎ বাবু বাদে কপালে এখনও রাজমার্কী উপাধি শিরোপা জোটেনি তাঁরা রাজসভায় বাইরেও আখড়াই প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এক একটি দল প্রতিষ্ঠা করে। এরা পেশাদার গায়কের দল এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ধনীরা। অর্থাৎ এরা সৌখিন ধনীর বেতনভুক্ত পেশাদার গায়ক দল। এদেরকে সখের দল বলা যায় না। অথচ গুপ্তকবি রাজসভার বাইরে প্রথম পেশাদার আখড়াই দলকে সখের বলেছেন। ‘ঐ সময়ের সখের আখড়াই লড়াই কলিকাতাস্থ বড়বাজার নিবাসী ৬কাশীনাথবাবুর ফুল বাগানেই হইত, অগ্ৰজ হইত না।’

সখের দলের কথা পরে আলোচনা করছি। নবকৃষ্ণের রাজসভা থেকে বাইরে যে সব পেশাদার আখড়াই দল স্থাপিত হল তাদের কথাই বলি। ‘ঐ সময়ের কিছু পরে পেশাদারদিগের যে কয়েকটা দল স্থাপিত হয়, তাহার দিগের সেই সকল দলের গীতযুক্ত এতন্নগরস্থ হালসীর বাগানে নিয়মিতরূপে সর্বদাই হত। ধনি ও সৌখিন বাবু লোকেরা ইহার দিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া অর্থদান প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন।’

এরাই হল তথাকথিত পেশাদার সখের আখড়াই দল। ধনী হঠাৎ-বাবুর অর্থসাহায্যে গঠিত এই সব দলের গায়করা ছিলেন পেশাদার। অর্থাৎ ঠিক ‘সৌখিন’ দল বলতে যা বোঝায় তা নয়। নবকৃষ্ণের রাজসভায় বেতনভুক্ত গায়ক কুলুইচন্দ্র যে কালোয়াতী ওস্তাদী রাগ রাগিনী মিশিয়ে আখড়াই গাইতেন এই সব ধনী লালিত সখের আখড়াই দলের পেশাদার গায়করাও তারই অশ্রুণ করতেন মাত্র।

সে যাক্, বাগ্মন্ত্রের কথায় আবার বসি। ঢোল বেহালা তো সনাতন বাগ্মন্ত্র। তাই বাজনার নজর পড়ল এবার সুরের বৈচিত্র্যে তালের নূতনত্বে। আগে আখড়াই হত কেবলমাত্র আড়াতালে অন্য কোন তালে নয়। কিন্তু পেশাদার দলের মধ্যে এক গুণী শিল্পী বৈষ্ণবদাস আড়াতাল থেকে এক অত্যাস্চর্য নূতন রূপ করত : দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়ে বন্দি ও মোড় প্রভৃতি ‘অতি সুশ্রাব্য মনোহর মধুর বাগ্মন্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া’ সকলকে মোহিত করলেন। এই মনোহর মধুর বাগ্মন্ত্র জনপ্রিয় হতে দেরি হল না। ‘অনন্তর রামজয় সেন নামক একজন বৈষ্ণব বৈষ্ণবদাসের সৃষ্টিত সমস্ত বাগ্মন্ত্র এবং তালকে আরো অধিক উত্তম করিয়া লইলেন।’ প্রসঙ্গত বলা যায় পূর্বে আলোচিত ঢোল বাদক রসিকচাঁদ গোস্বামী রামজয় সেনের শিষ্য। সে যাক্ এভাবে নতুন সুর ও বাজনা আখড়াই কালোয়াতী ওস্তাদের তৃপ্ত করল। ‘গোলাম আব্বাস যিনি অধিতীয় বাগ্মন্ত্র ছিলেন তিনি আখড়াই বাগ্মন্ত্র অতিশয় চমৎকৃত হইতেন এবং কহিতেন “এ কি আশ্চর্য ব্যাপার। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।” এ যেন ঠিক শেষ প্রান্তের ওস্তাদের শিবনাথের গান শুনে বলা, ‘এয়াসা কভি নেহি শুনা’।

এইভাবে কুলুইচন্দ্র সেন ওস্তাদের সৃষ্টি কানকে সঙ্গীত রসে তৃপ্ত করে শাস্তিপুরের আখড়াইকেই কিছুটা ভিন্নরূপে শোভা বাজারের রাজসভায় প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু কুলুই চন্দ্রের সৃষ্ট ‘নূতন প্রণালী’ চিন্তন নয়। রাজসভায় তৃপ্তি তাতে হলেও জনতার দরবারে এই সৃষ্টি রাগ রাগিনীর ততটা আদর হবার কথা নয়। তাঁরা শুনেছেন শাস্তিপুরের ভদ্র সম্ভানেরা খেউড় নামক আদি রসাত্মক গানগুলোই ‘সামান্য টপ্পার ছায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই আখড়াই নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।’ সেখানে বাইসেরার বাগ্মন্ত্রের বাহাচুরি ছিল না-আবার রাজসভায় ওস্তাদের কালোয়াতীও ছিল না। অত্যন্ত সরল সুরে আদি রসাত্মক ছড়া কাটাকাটি (যার জন্ম শাস্তিপুরের ঐশ্যেদের অঞ্জলি চোপা থেকে) হল আখড়াই অথচ রাজসভায় আখড়াইকে অনুকরণেজু পেশাদার দলগুলো সৌখিন ধনীদের অর্থ সাহায্যে কুলুইচন্দ্র নির্দিষ্ট কালোয়াতী গানকেই আখড়াই বলে চালাচ্ছেন।

এমন সময় বাংলা দেশে নিধুবাবুর আবির্ভাব। বটতলার এই সম্রাটের কথা আমরা আলোচনা করেছি। তিনি কুলুইচন্দ্রের ভাগ্নে। শোভাবাজার রাজসভা থেকে বটতলার আটচালায় —আখড়াই থেকে টপ্পার বিবর্তনের অন্তর্বর্তী পথ কিন্তু আলোকিত। রাজসভায় তখন ওস্তাদের কালোয়াতি অতীতকে হালসী বাগানের ‘সঙ্গীত সংগ্রামে’ সৌখিন ধনীর টাকায় পেশাদার দলের অঙ্ক অনুকরণ সেই কালোয়াতিকেই। এই পেশাদার দলগুলো সম্বন্ধে গুণ্ডকবি বলেছেন ‘ইহারা তাবতেই বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিল, কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেশাদারি করিয়া টাকা লইত।’ এই পেশাদারির মঞ্চ পথে কালোয়াতির গতানুগতিকতা চলতে পারে কিন্তু ‘নূতন প্রণালী’র কথা ভাবা যায় না।

কিন্তু, কুলুইচন্দ্র সেন যেমন নতুন পথের কথা একদা ভেবেছিলেন শোভাবাজারের রাজসভায় —তেমনি তার ভাগ্নে নিধুবাবুও ‘আখড়াই’ গান ভেঙ্গে অতীতের কোন নূতনপ্রণালীর কথা ভাবেছিলেন তখন। ‘নিধুবাবুর উদ্যোগে এতদূরগে দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হইল। তাহার

একপক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ ভদ্রসন্তান এবং আর একপক্ষে মনসাতলা অথবা পাথুরেঘাটা নিবাসি নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাহার বন্ধুবর্গ ব্রতি হইলেন।' অর্থাৎ নীলমণি মল্লিক করলেন প্রচলিত সখের আখড়াই দল কিন্তু নিধুবাবুর উত্তোগে হল সংশোধিত সখের আখড়াই দল। তার সদস্ত বাগবাজার-শোভাবাজারের ধনীপুত্রেরা তারা পেশাদার নয়—সখের গায়ক। নিধুবাবু এদের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য বটতলার আটচালায় 'গাঞ্জার গুঞ্জন' তুলেন (খানিকটা এ যুগের হিপিদের মত) সেই সঙ্গে সে যুগের পক্ষী (এ যুগের হিপি) দল। এরই ভেতরে নিধুবাবু তার নতুন ধরণের আখড়াইয়ের কথা প্রচার করলেন তারই নাম টপ্পা।

কিন্তু নীলমণি মল্লিক ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। বলা বাহুল্য তিনি রাজসভার কালোয়াতী অনুসরণে গড়ে ওঠা আখড়াই পছন্দ করতেন। প্রতি বছর সরস্বতী পূজার রাতে এ আখড়াই বলত। তখন নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু নিধুবাবুর টপ্পাকেও পেরিয়ে হাফ আখড়াই প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। নীলমণি তাই প্রচলিত আখড়াইকে নতুন নাম দিলেন ফুল আখড়াই। অর্থাৎ রাজসভার কালোয়াতি সমৃদ্ধ আদি আখড়াই। আদি-আখড়াই গাইতেন কুলুইচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সেন। বাজাতেন সেই পেশাদার শ্রীদাম দাস। অর্থাৎ 'শ্রেণীচরিত্র' পুরোপুরি বজায় রইল 'ফুল আখড়ায়ে'।

নিধুবাবু ছিলেন জনসভায় গায়ক। তিনি রাজসভার সংকুচিত আসর থেকে আখড়াইকে আটচালার উন্মুক্ত আসরে আনতে চেয়েছিলেন। তারই প্রাথমিক ধাপ হল আদি আখড়াই বনাম নব আখড়াইয়ের সংগীত সংগ্রাম। আদি আখড়াই বজায় ছিল নীলমণি মল্লিকের ফুল-আখড়াই দলে। নবকৃষ্ণ ও কুলুইচন্দ্র সেনের বিদায়ের পর রাজসভার আখড়াই ছিল না। নীলমণি রাজা নর হঠাৎ-বাবু (ঐতিহ্য সম্পন্ন)। বিপরীত শিবিরে রইলেন জোড়াসাঁকো ও বাগবাজারের সৌখিন যুবকদের 'সখের আখড়াই দল'। তারা বেতনভুক্ত নয়। কোন কোন ধনী তাঁদের মাঝে মধ্যে অবশ্য অর্থ সাহায্য করতেন। জোড়াসাঁকো ও বাগবাজারের দলে ছিলেন নিধুবাবু। সঙ্গীত সংগ্রাম শুরু হল। বলা বাহুল্য নিধুবাবুর দলের কাছে ফুল-আখড়াই হার মানল। এ সময় রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আরেকবার আদি-আখড়াই দল করে 'আখড়ায়ী আমোদে আমোদী হইলেন।' রাজকৃষ্ণ ও তার দল গড়তে নিধুবাবুকেই নিলেন। শ্রীদাম দাস রামঠাকুর ও নৃসিংহ সেকরা প্রমুখ পেশাদার বাদক এল। এইখানেই নিধুবাবু তার গানের ভাগ্যবান মোহনচাঁদ বসুকে শিষ্য হিসেবে পেলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণের উৎসাহ সফল হল না। আদি-আখড়াই—কুলুইচন্দ্র যে প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা এইভাবে হারিয়ে গেল নতুন যুগে। নব-আখড়াইয়ের লজ্জা।

কুলুইচন্দ্রের নতুন প্রণালীর আখড়াই তখন শ্রান। নিধুবাবুর গলায়, সে তখন বিবর্তিত হয়েছে টপ্পায়। ক্রমশ আরও চটুল হাফ-আখড়াইয়ে। ১২৬১ সালে গুপ্তকবি বলছেন তিরিশ বছর হল 'আখড়াই গাহনা' রহিত হয়েছে। মনোমোহন বসু লিখছেন নিধুবাবু প্রাচীন হইরা পড়িলেন এবং অস্ত্রান্ত প্রধান উত্তোগী অনুরাগীগণকে মৃত্যু অপসারিত করিল; ইহাতে বোধহয় কৃষ্ণসাধ্য আখড়াই আমোদ বন্ধ হইয়া গেল।'

অবশ্য পুনর্জীবনের কিছু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা হয়েছিল। '১২৬০ সালের চরমকালে শ্যামপুকুরে

নব্যাবুবা কয়েকমাস চাগিয়া উঠিয়াছিলেন শেষ ৬১ সালের পদার্পণেই ত্রিবিষ্ণু স্মরণ করিলেন। অনেকের মনে এ মত আশা জন্মিয়াছিল যে বহুকাল পরে আখড়াই শুনিব। তাহা না হওয়াতে 'অজায়ুদে ঋষি শ্রাদ্ধে' শ্লোক পাঠ করিতে হইল।'

অবশেষে গুপ্তকবি দুঃখ করছেন 'বাঙ্গালার মধ্যে আখড়াই গাহনায় অনেক সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে অতি অল্প কালের মধ্যেই এই ব্যাপার একেবারে লোপ পাইয়া গেল, আর তাহার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। কাল সহকারে মানুষের মনে ষত পরিবর্তন হইতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আমোদ প্রমোদের উচ্ছেদ হইতেছে।"

দেশ কাল সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভূমিকা

স্বপ্নজিৎকুমার সেন

সাহিত্য কথাটি সহিতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। কি এই সহিতত্ত্ব? সহিতত্ত্ব ব্যক্তির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে। সহিতত্ত্বের দ্বারা চিত্তের স্বাধীন ও মননের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রকৃতির প্রাচুর্য, ব্যক্তির সৌহার্দ্য ও সমাজের মান্দল্য একদিকে আমাদের মনকে যেমন উন্নত করে, তেমনি আমাদের জীবন-গঠনেরও উপাদান পরিবেশন করে থাকে। জীবনের প্রথম সূত্রটিই হচ্ছে কিছু একটা হ'য়ে ওঠা। কুঁড়ি যেমন বিকাশলাভ করে ফুল হ'য়ে ওঠে, মানুষও তেমনি নিজের ব্যক্তিত্ব, শুভ-চেতনার সংস্কার ও রুচি-প্রবণতা দ্বারা একটি বিশেষ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। এই হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্যাণ-বুদ্ধিরও স্ফূরণ ঘটে—যার ফলে বহুজন হিতায় চ বহুকর্ম-ধৃত্য সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করে আনন্দিত হ'তে চায়। যখন এই আনন্দ তার জীবনে আসে, তখন আর কোনো প্রস্ন নেই; আনন্দই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা। আনন্দলাভের ক্ষেত্রেই মানুষের সারাজীবনের কৃষ্ণতা সাধন। সহিতত্ত্বলাভ থেকে আনন্দে পূর্ণতা—এর মাঝখানের স্তর হচ্ছে কর্মের ও সাধনার স্তর। নদীর মুখে প'ড়ে মাঝি যেমন দিক ঠিক করে—কোনদিকে সে তার নৌকো ভাসাবে, জীবনসমূহেও তেমনি মানুষ ভেবে নেয় কোনদিকে সে পাড়ি জমাবে! এই দিক নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ হয় ছুতোয়, ডাক্তার, উকীল, মুদী বা হাকিম, কেউ হয় গায়ক, শিল্পী, লেখক, শিক্ষক বা অভিনেতা। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য থাকে ব্যক্তি, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণের সঙ্গে নিজের কল্যাণবোধের দ্বারা শালীন ও শোভনজীবনযাপনের।

একজন সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যিকর্মের মাধ্যমে এই শালীনতা ও শোভনতা রক্ষা করা অধিকতর কাম্য। কারণ সাহিত্যের ক্ষেত্র অসীম সকল ক্ষেত্র থেকে ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কি সর্বত্রই তার ইচ্ছার দ্বারা কর্মজীবন গঠন করে নিতে পারে? না। কারণ হয়তো বৈজ্ঞানিক হবার বাসনা, কিন্তু ঐকান্তিক মানসিকতা ও অক্লান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও সে হয়তো হলো একজন করণিক মাত্র। নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যেখানে সাযুজ্য ঘটে না, সেখানে এই বৈপরীত্য অবশ্যম্ভাবী। ফলে ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে আসে দ্বিধার এবং সেই দ্বিধার থেকে জন্ম নেয় 'সিনিসিজম'; ফলে সেই ব্যক্তি জীবনে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তার কাছে তখন আর ভালো বলে কিছু থাকে না, ভালোকেও বিকৃত ব্যাখ্যা করে তা থেকে সপক্ষে সে আত্মভাবে কিছু-একটা দার্শনিক সূত্র উদ্ঘাটন করে তৃপ্ত হয়। সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা যত না মারাত্মক হয়, তার চাইতে অধিক বিনষ্ট ঘটে কোনো সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে। তার জীবনে যদি নিজেকে গড়ে তোলার কোনো প্রস্তুতি না থাকে, যদি নিজের শুভবুদ্ধির দ্বারা জাগতিক কল্যাণবোধের সঙ্গে সে একাত্ম হ'তে না পারে, যদি গঙ্গার জলের পবিত্রতা উপলব্ধি না করে শুধু তার পঙ্কিলতাকেই সে গ্রহণ করে তবে জীবনের রাজদরবারে সে শুধুমাত্র দৌবারিক হয়েও দীর্ঘকালের লিপিকুশলতা ও কল্লনাশক্তির জোরে হয়তো সাহিত্যিকর্মের দ্বারা

সাহিত্যিক আখ্যাত্য করে তৃপ্ত হ'তে পারে, কিন্তু সে-সাহিত্য প্রায়শঃই জনপ্রিয় হয়েও রাজকীয় মর্যাদার অধিকার হারায়; কারণ জীবনে সে যেখানে দৌবারিক মাত্র, তার সৃষ্ট সাহিত্যও প্রধানতঃ সেই স্তরেরই হতে বাধ্য।

বড় না হয়ে বড়কে ধরা যায়না। একটি সমুদ্রই আর একটি সমুদ্রকে ধারণ করতে পারে, কোনো পুষ্করিনীর পক্ষে কোনো সমুদ্রকে ধারণ করা সম্ভব নয়। সাহিত্যিককে চাই তাই জীবনপ্রস্তুতিতে সেই বৃহত্ত্বকে পাওয়া। 'আমি' মধ্যে 'বড় আমি'র যে লুকোচুরি চলেছে অহরহ, সেই 'বড় আমি'কে মনের মধ্যে ধরতে পারলেই 'আমি' রাজা হয়ে ওঠে, অন্ততঃ 'আমি' দৌবারিক হয়ে 'ছোট আমি'তে পরিণত হয়। - ব্যক্তির সৌহার্দ্য, প্রকৃতির প্রাচুর্য ও সমাজের মঙ্গল্যের সঙ্গে এসে যুক্ত হয় এই 'বড় আমি' আর 'ছোট আমি' কেবলই সন্ধান করে তার বিপরীত চিহ্ন। ব্যক্তি ভগবান নয়, ব্যক্তি মানুষ; যাজ্ঞও তেমনি মাত্র দেবালয় নয়, সেখানেও পাক আছে। অতএব যে সাহিত্যিক ব্যক্তিকে সেই ক্ষেত্র পরিবেশে মাত্র রেখে, সেখান থেকে তুলে এনে তাকে মহত্তর জীবনের দেবত্বে উন্নীত করতে পারে না, সেই সাহিত্যিক যতবড় রিয়ালিষ্ট আখ্যায়িতই হোক না কেন, সে না-পারে সাহিত্যকে বড় করতে, না পারে সমাজকে। প্রচলিত সমাজকে সে যদি সাহিত্যের মাধ্যমে তার একই ক্ষেত্রে জিইয়ে রাখে, তবে সমাজ যেমন উন্নত হবার ও এগিয়ে যাবার পথ পায় না, সাহিত্যও তেমনি পরিশীলিত অঙ্গভরণে চিন্ময় হয়ে ওঠে না। ব্যাধির জন্ত যেমন চিকিৎসক আছে, চিকিৎসকের কাজ হচ্ছে দেহকে ব্যাধিমুক্ত করে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ক'রে তোলা, সাহিত্যিকেরও তেমনি কাজ হচ্ছে ব্যক্তিকে সমাজকে সুন্দর শোভন ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে তোলা।

সাহিত্যের প্রথম কাজই হচ্ছে রসসৃষ্টি করা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। সুন্দরের স্পর্শ ভিন্ন এই রসস্বজন আদৌ সম্ভব নয়। 'উপনিষদে বলা হয়েছে 'রসঃ বৈ সঃ', 'রস্তুতে ইতি রসঃ, রসয়তি ইতি রসঃ' অর্থাৎ ঈশ্বর রসস্বরূপ, তিনি যেমন নিজের মাধুর্য দিয়ে অপরের মনে রসসঞ্চার করেন তেমনি অপরের আনন্দের সঙ্গে নিজের আনন্দ যুক্ত ক'রে রসাহুভব করেন। সৃষ্টিজগতের দ্বিতীয় ঈশ্বর তেমনি সাহিত্যিক। তার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এই রস ও সৌন্দর্যের পরবর্তী ভূমিকাই হচ্ছে বিচারকের ভূমিকা ধারা বলেন—সাহিত্যিক আর বাহোক, স্থূল মাষ্টার বা বিচারকের ভূমিকা তার নয়, তাঁরা নিতান্তই কাঁচা রসের কারবারী; রসের ভিত্তানে যেখানে গুড় বা মিষ্টান প্রস্তুত হয় তার আশ্বাদ থেকে তাঁরা পুরোমাত্রায় বঞ্চিত। সাহিত্যিককে সেইখানেই বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়—যেখানে ব্যক্তির দ্বারা সমাজ এবং সমাজের দ্বারা জাতি বিনষ্টির পথে অগ্রসর হয়। তাকে পরিশুদ্ধ, মার্জিত ও সংস্কৃত করে ভোলাই হচ্ছে সাহিত্যিকের ধর্ম।

কিন্তু এ কোন্ সাহিত্যিক করতে পারে? পারে—যে সাহিত্যিকের পূর্বাঙ্কে নিজেকে যথোচিত মানবিকধর্মে গড়ে নিতে পেরেছে। যাকে বলেছি—'হয়ে ওঠা।' তার এই 'হয়ে ওঠা'র উপরে সাহিত্যও হ'য়ে ওঠে, সমাজও হয়ে ওঠে, জাতিও হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যত দেশ এই ভাবে 'হয়ে' উঠেছে, জানতে হবে—তার মূলে তৎতদদেশীয় সাহিত্যিক আগে নিজ নিজ জীবনে হয়ে উঠেছেন, গড়ে। দেশ-কাল ছাপিয়ে তার ধারা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে। যেখানে তার ব্যত্যয় ঘটেছে, যেখানে ব্যক্তি পঙ্খ হয়ে পড়েছে, সমাজ স্থায় হয়ে পড়েছে, জাতি হয়েছে

পতনোন্মুখ, সেখানে বুঝতে হবে সাহিত্যিকের পঙ্গুতাই তার মূলে অধিক কাজ করেছে। কারণ, বলেছি—সাহিত্যের ক্ষেত্র হচ্ছে অসংখ্য সকল ক্ষেত্র থেকে ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত এবং সেই সঙ্গে স্থায়ী ও কার্যকরীও। সেখানে মানুষের হয়ে সে কাজ করেছে, মানুষকে তার প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণার উদ্দেশ্যে এক আনন্দলোকে তুলে ধরেছে। সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে প্রকৃতিকে আরও রূপময়ী করে তুলেছে এবং সমাজকে তার প্রচলিত ধারা থেকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে সংস্কৃতির আলোয় ঐতিহ্যময় করে তুলেছে, সেখানে সাহিত্য তার নিজের সৃষ্টি কালকে ছাপিয়ে কালান্তরের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত লক্ষণ স্পষ্ট, সেখানে সাহিত্য তার আপন সৃষ্টির স্মৃতিকাগারেই স্বল্প প্রাণের অপটু দেহে মৃতের ভূমিকা নিয়েছে। তার জন্মলগ্নে হয়তো বহুজনের মুখে মুখে শব্দ নিনাদিত হয়েছে, কিন্তু অচিরে শোকের ছায়া নেমে আসতেও বিলম্ব হয় নি। এই উভয়দিক ইতিহাসই আমাদের চেতনায় প্রত্যক্ষ। তাই দেখি কোনো প্রজ্ঞাবান সাহিত্যিকের অমৃত সৃষ্টি ক্লাসিক হয়ে উঠেছে, আবার কোনো লিপিকুশল সাহিত্যিকের অমরসারণ সৃষ্টি স্বজনকালের অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে গেছে। Ruskin এই জাতীয় গ্রন্থের সংজ্ঞা আরোপ করেছেন ‘Books of the hour’ বলে। এ সাহিত্য কখনই ‘Books for time’-এর অধিকার পায় না। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দিক দু’টি সম্বন্ধে যার ধারণা যতবেশী স্বচ্ছ হবে, সাহিত্যবিচারে এবং সাহিত্য থেকে প্রাণরস আহরণে সে ততবেশী কৃতি হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে যে রেনেসাঁ ঘটেছিল, তার মূলে ছিল দেশের মহৎ সাহিত্য এবং সাহিত্যিক তথা চিন্তানায়কদের জীবন প্রজ্জ্বলিত। তাই ধর্মে, দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, শিল্পে, লৌকিক কাহিনী ও গাথায়, লোকাচারে, এমন দিক নেই—যাকে কেন্দ্র করে এই সাহিত্য দেশ ও জাতিগঠনের অন্যতম আধার হয়ে না উঠেছিল। আর এই সব কিছুর মূলে ছিল তৎকালীন চিন্তানায়কদের ব্যক্তিত্ব, উন্মেষিত মনোভাব ও জীবনপ্রাচুর্য। বিন্দুকে তাই তাঁরা সিদ্ধ করে তুলেছিলেন। এখন সাহিত্য বলতে প্রধানতঃ কথাসাহিত্যকেই বুঝায়। কিন্তু একদা ‘সাহিত্য’ কথাটি এত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হ’তেনা। ইংরেজি ‘Literature’ বলতে যে ব্যাপ্তি বুঝায়, বাংলায়ও সেই ব্যাপ্তি ছিল। তাই বিবেকানন্দের হাতে বেদান্তও সাহিত্য হ’য়ে উঠেছিল, বিজ্ঞানও সাহিত্যে হয়ে উঠেছিল, বিজ্ঞানও সাহিত্যের রূপ নিয়েছিল জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রচন্দ্র ও জগদীশনাথের হাতে। সাহিত্যের এই multipurpose বা বহু মুখতার মধ্য দিয়েই দেশ গড়ে উঠেছিল, সমাজে বয়েছিল এক প্রাণবান সংস্কৃতির হাওয়া। সাহিত্যিকের বাইরেও তৎকালীন চিন্তাবিদরা ব্যক্তিগত জীবনে গড়ে তুলেছিলেন সামাজিকহিতকারী নানা প্রতিষ্ঠান। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের আদি সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও বহুবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিদ্যাসাগরের সাগরসদৃশ নানামুখি উন্নয়ন ও বিধবা বিবাহ প্রথার প্রবর্তন, বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণমহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ও জ্ঞাননিকেতন, তারকনাথ পালিত ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান কলেজের সমুন্নতিবিধান, জগদীশচন্দ্রের বসুবিজ্ঞানমন্দির এবং এমনি আরও বহু-বহুবিধ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ

সেদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিরাট হয়ে উঠেছিল। অথচ সে-যুগে একালের মতো সংবাদপত্র, সাহিত্যপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার বা প্রকাশকমহল থেকে রচনা বা গ্রন্থের জ্ঞান দক্ষিণাদানের উদার ব্যবস্থা ছিল না, ব্যবস্থা ছিল না তেমনি একালের মতো সরকারী ও বেসরকারী কোনো পুরস্কারদানের।

একালের জীবনযাত্রা কঠিনতম সন্দেহ নেই, তাই বুঝি প্রাণের ক্ষেত্রও কাঠিন্যের রূপ নিয়েছে, এই জীবনকে ফাঁকি দেবার নানা ফিকির। এখন জীবনপ্রস্তুতির আগেই জীবনযন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠছে। আগে মানুষকে ও সমাজকে গ্রহণ করবার যেমন একটা সহজ স্বচ্ছন্দ প্রাণাবেগ ছিল, এখন সেই প্রাণাবেগ মানুষকে ঘৃণা করবার ও সমাজকে নস্যাৎ করবার প্রবণতায় উচ্ছ্বসিত। তাই একালে দেখা যায়—মানুষের সব খাপি সংস্করণ; তার মধ্যেই এক একজন চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। আগে বৃহত্তর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ ছিল না, অথচ সেই অবরুদ্ধকালের বিপুল অর্থসংকোচন ও সমাজবন্ধনের মধ্যে বহু চেষ্টা করে একজন রামমোহন, কি কেশবচন্দ্র, কি রবীন্দ্রনাথ, কি বিবেকানন্দ যখন বৃহত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন গোটা ভারতবর্ষই গিয়ে যেন দাঁড়াতো পৃথিবীর সামনে। ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি ছিলেন তাঁরা। আর আজ? আজ এদেশ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ‘ডেলিগেশন’ বাবার অস্ত নেই, এ বেলা ও বেলা কত শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পণ্ডিতজনই না লওনে, আমেরিকায়, রাশিয়ায়, রুম্যানিয়ায়, জার্মানীতে, ফ্রান্সে ইজরাইলে ছুটছেন কিন্তু কারুর সংগে আজ আর গোটা ভারতবর্ষ কেন, সামান্য কলকাতা শহরটাও গিয়ে পৌছাচ্ছে না। কেউ আর দেশের বাণী মহাদেশে পৌছে দিতে পারছেন না। বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমায় বিভক্ত হয়েছে ১৯০৫ ও ’৪৭-এ দু’ভাগে, আর উত্তর-স্বাধীনতাকালে ঐতিহাসিক সীমায় বিভক্ত হয়েছে কম’রেও সাতাশভাগে। এখানে সাতাশটি রাজনৈতিক দল, দেশ এখন মানুষের নয়, দলের। তাই মানবীয় জীবনপ্রস্তুতি নেই, আছে দলীয় প্রস্তুতি। এর বাইরেও আছে বৃহত্তর চোরাকারবারী, ভেজালকারবারী, অসুস্থ জনতা ও তাদের মনোরঞ্জনকারী ঠিকাদারী বড় বড় রকুশিয়ারদ ও যৌনবিশেষজ্ঞ সাহিত্যিক; আছে কিশোর ও যুবকের চিত্তবিভ্রমকারী নানা রম্য ও প্রণয়বিলাসিত পোষ্টার ও দেয়ালচিত্র। পশ্চাতে থেকে যারা এদের বলছে—‘বুদ্ধ নাচ করো’, এরা সেই পশ্চাতের পাশ্চাত্য চাকের বাইরে এসে আত্মসমাহিত হতে পারছে না। একালের এইটেই হচ্ছে সবচাইতে বড় ব্যাধি। এই ব্যাধিই আজ ক্যান্সারে, থুথোসীসে ও কুষ্ঠে মারাত্মক হ’য়ে উঠেছে। দেশের তাই আজ নাভিস্থানের কাল।

অথচ এ কালেই চন্দ্রবিজয় ও মঙ্গলগ্রহে পৌছবার কী বিপুল প্রয়াস, ভাগ্যগণনায় কম্পুটারের বিস্ময় এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস ব্যাখ্যার কি নব নব রূপায়ণ। আমাদের দেশের চিন্তে তা এসে ঘা দিলেও প্রাণকে উদ্ধীপ্ত করছে না। যেন-তেন-প্রকারেণ কিভাবে নিজের পাতে ঝোল টানা যায়, কি ক’রে কাকে ধ’রে কোথায় কতখানি সুবিধে ক’রে নেওয়া যায়, কি ক’রে গাড়ী-ফ্রিজ-রেকর্ডপ্লেয়ার করা যায়—একালের এক বৃহৎ-সংখ্যক সৃষ্টিকামী মানুষদের এই চিন্তাই অহর্নিশি মন ও মেজাজকে বিব্রত করে রাখছে। তার ফলে যথোচিত জীবনবোধের অভাবে যেমন চিন্তার ক্ষেত্রে দৈন্য এসেছে, তেমনি তার অবশুস্তাবী পরিণতি হিসেবে সাহিত্য থেকে গুরু ক’রে

সমাজের সর্বক্ষেত্রে চটুল ও অগ্রিম্যান্যকারী বিষয়ের একটানা বহা ব'য়ে চলেছে। অথচ একালের বাংলাসাহিত্যেই ভৌগোলিক বিস্তৃতি ঘটেছে; কিন্তু সে বৃষ্টি পাঠক-মনকে মায়ের ঘর থেকে ভুলিয়ে মাসীর ঘরে নিয়ে যাবার কৌশল মাত্র। তাতে তাই মায়ের বুকের স্বধা নেই, আছে মাসীর হাতের মোয়া। যে যুগ স্বধা ফেলে মোয়ার তুট্ট হ'তে পারে, সে যুগ ক্ষুণ্ণবৃত্তির অবকাশে যে অমৃতের অধিকার হারিয়েছে, তাতে সন্দেহ কি?

কথাসাহিত্য এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে Craftsmanship-এর অংগ আর্ট বা জীবনদর্শনের আধার নয়। বিগত দু'দশকের মধ্যে তাই এমন বই খুব কমই দেখা গেছে—যার কোনো-না-কোনো পংক্তি মানুষের স্মৃতিকে এসে বার বার সতেজ ও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে। এখন করমাস দিয়ে একদিকে ঢালাও বিকৃত ইতিবৃত্তমূলক ইতিহাসাশ্রয়ী ও অন্যদিকে রক-প্রধান জীবনকেন্দ্রিক যৌনরসাস্রয়ী উপহাস রচনার দুর্দমনীয় লক্ষণ অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে—যার ফল গিয়ে আজ দাঁড়াচ্ছে বিচারশালায়। একটা কিছু হতে গিয়ে অন্য কিছু হ'য়ে যাবার উদাহরণটি এখানে উজ্জলতর। একটা বলিষ্ঠ সমাজব্যবস্থার অভাবে বা হবার, আজ তাই হচ্ছে। এখানে আজ স্বস্থ নাগরিকতাবোধ নেই, বোধ নেই তেমনি জীবনের মহৎ আদর্শ সম্পর্কে। তার অনেকখানিই ধ্বংস হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দেশবিভাগে ও বন্যায়, বাকীটা গেছে শোষণে, শাসনে; বেকারত্বে, দারিদ্র্যে ও জীবনধারণের ন্যূনতম পরিবেশ ও অধিকারের বঞ্চে। জীবন থেকে স্বর কেটে গিয়ে বীণাযন্ত্র আর রাগিনীমুখর হ'য়ে ওঠে না। বাইরে যতকিছু জলসা ও কাওয়ালাী আসর, তা শুধু মনের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেবার প্রয়াস মাত্র, আর কিছু নয়। এই বিপরীতমুখী অবস্থার মধ্যে জীবনগঠন বা জীবনপ্রস্তুতির স্বযোগ কোথায়?

সেই স্বযোগের অবশ্যই মরমী ক্ষেত্র আছে সাহিত্যিকের লেখনীতে। আমাদের সামনে জগৎ দু'টি, একটি ভাবময়, অন্যটি বস্তুময়। ভাবময় জগৎই বস্তুময় জগৎকে পরিচালনা করে। এই ভাবময় জগতের প্রধান নায়ক হচ্ছে সাহিত্যিক। বস্তুজগৎকে স্বন্দর ও স্বস্থ এবং মানুষের আশাহত প্রাণসত্তাকে জীবনধর্মে পরিপূর্ণ করে তুলবার সামগ্রিক দায়িত্ব তার। এ দায়িত্ব পালনে তার নিজের ব্যক্তিসত্তার মানও অবশ্যই বিচার্য। সেখানে যে বলতে পারে: 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ', তার জীবনের স্পর্শেই দেশের জাগরণ সম্ভব; আর সেই জাগরণের মধ্যেই নতুন ক'রে জন্ম নেয় রেনেসাঁ। পরিতাপের বিষয়, আজ তার আভাসটুকু পর্যন্ত দেশ ও জাতির কোনো স্তরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তুল হিমালয়শীর্ষে উঠে হঠাৎ পা ফসকে গভীর খাদে পড়ে যাবার বে অবস্থা, আজকের দেশের অবস্থা তাই। তবু একথা বলবো না যে 'দাঁও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর', কারণ, পশ্চাৎমুখিতা পাপ, বিশেষত: সে ভাব্যকে এ যুগ 'প্রোগেসিভ' না বলে 'রি-এ্যাক্সনারী' বলে অভিসম্পাত দেবে। বলবো—'চরৈবেতি, চরৈবেতি।' কিন্তু এই প্রচলিত অবস্থার চরৈবেতি নয়, এই অবস্থায় সামগ্রিকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে নতুন এক মানবতাবোধের অভ্যুদয়ের পথে চরৈবেতি। সেদিন সাহিত্যে নতুন ক'রে আবার জন্ম নেবে প্রাণবান মানুষ; প্রকৃতি যেদিন পাক্ষ্যন্যে জয়ধ্বনি করবে, সমাজ আনবে বিজয় উৎসবের বরণডালা সাজিয়ে। সেদিন সাহিত্যিকের নব অভিষেকের দিন।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

থাণ্ডবদাহ (কৃ: কঃ ৪র্থ খণ্ড | ৪র্থ পরি:) ॥

অজুর্ন যখন থাণ্ডবদাহ করেন তখন কৃষ্ণ তাঁর সহায় ছিলেন। এই থাণ্ডবদাহ দাহন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলেই মনে হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এটুকুই স্বীকার করতে চান—“যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণাজুর্ন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন।” এই থাণ্ডবদাহনের সংগে ময়দানব নামে যে অপূর্ব নির্মাতার ঘটনা সংযুক্ত আছে তাকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করতে চাননি।

খতোৎ (গল্প পত্র বা কবিতাপুস্তক) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪, পৃ. ৯২—৯৪। “খতোৎ অর্থাৎ জ্ঞানাত্মকে অনেকেই অবজ্ঞা করে। কারণ চন্দ্র-সূর্যের তুলনায় তার আলো অত্যন্ত কম।” কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই খতোৎয়ের আলোককেই অন্ধকারের দিশারূপে গ্রহণ করেছেন। এই রচনাটিকে ‘কমলাকান্তের দপ্তরের’ পূর্বাভাসরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষতঃ কমলাকান্তের দপ্তরের ‘বসন্তের কোকিল’-এর সঙ্গে নিম্ন লিখিত অংশটির বর্ণনারীতির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।—

“যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সঙ্গই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন, নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জলময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি; মেঘগর্জন শুনিয়া, সর্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জন শ্রবণ করি;—বিদ্যাদাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণিক—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জলই প্রেরিত হইয়াছিলাম; কাঁদিবার কথা নাই। আইস, নীরবে জলিতে জলিতে, অনেক জালায় জলিতে জলিতে সকল সছ করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোকে বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কতবার কাঁপ দিয়া পড়িলাম, কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি। জ্যোতিষ্মান হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হায়! আমরা খতোৎ! এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! কাজ নাই। তুমি ঐ বকুল কুঞ্জকিশলয়কৃত অন্ধকার মধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাত, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

গগন পর্যটন (বিজ্ঞান রহস্য) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, পৌষ ১২৮০। বর্তমান যুগে গগনপর্যটন ও তৎসম্বন্ধীয় গবেষণার

অত্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু এর সূচনাপর্বের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও আমাদের অনেকেই অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অজ্ঞাত গগনপর্যটনের কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া শৃঙ্খলোক সম্বন্ধে অনেক কথাও বর্ণিত হয়েছে। রচনাটির মধ্যে কৌতুকরসের স্নিগ্ধ প্রলেপ আছে।

গল্প (বাল্যরচনা : পুং অগ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—‘সংবাদপ্রভাকর’ ২৩ এপ্রিল ১৮৫২। সূত্র—“গগনমণ্ডলের বিরাজিতা কাদম্বিনী...”।

অনিত্যবস্তুর প্রতি মানবজীবনের আসক্তি দূর করার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গল্পনিবন্ধটি রচিত। ভাষা অত্যন্ত জটিল, তৎসমবহুল ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ। উদাহরণ—“অনুবিষ্মুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে, সে সব উৎসব শব্দ হইলে কি হইবে এবং পরম নিধি প্রিয় পিতা পরাংপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মুঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্তেকও বিবেচনা করে না যে, তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রবৃত্ত পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যে দেহে ধূলিকণা পতনে পাষণ্ড প্রহার প্রায় বোধহয়, আশু সেই দেহ স্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, বাহার রাজীব রাজী বিরাজিতে শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনাশ্তে সে ধূলি কর্দম অস্থিকণা কীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত প্রেতাতির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক।”

এই গল্প কিভাবে ‘দুর্গেশনন্দিনী’র সাবলীল গতে পরিণত হল তার ইতিহাস আবিষ্কার কৌতুহলপূর্ণ।

গর্দভ (লোকরহস্য) ॥

প্রঃ প্রকাশ—“বঙ্গদর্শন”, শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৮৭—৮৮। ‘গর্দভ’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, মহাশয়-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীতেই যে একধরনের অকর্মণ্য লোক গা ঢাকা দিয়ে দিব্যি নাম কিনছে, তাদের লক্ষ্য করে তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন। বিচারক, শিক্ষক, পণ্ডিত, গায়ক—কাউকেই বাদ দেননি। এমনকি দশরথকে (বিচারবুদ্ধিহীন ভীমরতিগ্রস্ত বলে), যুধিষ্ঠিরকে (দ্রুতক্রীড়ায় সর্বস্ব পণ করার জন্তে), এবং সেনরাজা লক্ষ্মণ সেনকে (বঙ্গে মুসলমান অধিকারের জন্তে) গর্দভ আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

এখানে বক্তব্যের ভঙ্গীটি সরাসরি ও অত্যন্ত তীব্র হলেও হতাশ হবার কিছু নেই। বঙ্কিম নিজেদের দলের গর্দভদেরও ছেড়ে দেননি। তাই প্রথমেই বিচারকের কথা—“তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ষীয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রাবণভূমিস্থ অবিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহস্পতি! তখন সেই কাব্যরসে আত্মীভূত হইয়া তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে

রামের সর্বস্ব আমিহকে দাও, আমিহের সর্বস্ব কানাইকে দাও ; তোমার দয়ার পায় নাই।”

গ্রন্থের উদ্দেশ্য (কৃঃ চঃ ১ম খণ্ড | ১ম পরিঃ) ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে প্রধানতঃ তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত অলৌকিক গালগল্প প্রচলিত তার মিথ্যা প্রতিপাদন। দ্বিতীয়ত, “ধর্মোন্মোলনের প্রবলতার এই সময়ে (ঊনবিংশ শতাব্দীতে) কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়।” তৃতীয়ত, ‘ধর্মতত্ত্বে’ তিনি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট মানবীয় বৃত্তিগুলির উল্লেখ করেছেন তার একমাত্র সামগ্রিক বিকাশ হয়েছে কৃষ্ণচরিত্রে। সুতরাং এই তিনটি দিক থেকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র রচনায় ত্রুটি করেছেন।

গ্রাম্যকথা (লোকরহস্য) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘প্রচার’—ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ৬২—৬৮ ও পৌষ ১২৯১, পৃ. ১২০—১২৪।

‘গ্রাম্যকথা’র বঙ্কিমচন্দ্র সরল গল্পের সাহায্যে গ্রামের শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন।

গ্রাম্যকথা-র প্রথম সংখ্যার শিরোনাম—‘পাঠশালার পণ্ডিতমশায়’। লেখক একদিন রুটি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এক পাঠশালায় আশ্রয় নিয়ে দেখেন—ভূ ধাতুর উত্তর ত্ত প্রত্যয় কি হয় তা না বলতে পারার জন্যে ভোঁদাকে গুরুমশাই প্রহার করলেন। ভোঁদার বাড়ীতে কান্না দেখে তার মা গুরুমশায়কে শিক্ষা দিতে এলেন। তারই রসগ্রাহী বর্ণনা গল্পটিতে। গ্রাম্য পণ্ডিতের বিজ্ঞার দোঁড় কি রকম তা পণ্ডিতমহাশয়ের সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে লেখক প্রকাশ করেছেন।

গ্রাম্য কথায় দ্বিতীয় সংখ্যার নাম—‘ধর্ম-শিক্ষা’। তার প্রথম ভাগ হল Theory অর্থাৎ পাঠ। পিতা পুত্রকে শেখাচ্ছেন—পরজীকে মা বলে মনে করবে, পরের দ্রব্যকে মাটির ঢিল-এর মত মনে করবে এবং সকলকেই আপনার মত দেখবে। কিন্তু ছেলে শিখলো অগ্ররকম। দ্বিতীয় ভাগ Practice-এ সে তা প্রয়োগ করছে। কাদম্বিনী নামে এক স্ত্রীলোককে মা সম্বোধন করে তার ওপর অত্যাচার করেছে, ময়রার দোকানে সন্দেশ লুণ্ঠ করে—‘পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ’-এর প্রয়োগ করেছে, এবং পণ্ডিতমশাইকে মার দিচ্ছে—‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু’ শিক্ষার প্রয়োগ দেখিয়েছে।

এখানে মুখ্যতঃ গল্পের দ্বারাই হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

গীতিকাব্য (বিবিধ প্রবন্ধ | ১ম) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, বৈশাখ ১২৮৭।

“গীতিকাব্য” প্রবন্ধটির প্রেরণা নবীনচন্দ্র সেনের ‘অবকাশরঞ্জিনী’ কাব্য। এই কাব্যটিতে ২২টি গীতিকবিতা স্থানলাভ করেছে। এই কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতবর্ষে সমস্ত সাহিত্যকেই কাব্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেমন দৃশ্যকাব্য, আখ্যানকাব্য বা

মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র খণ্ডকাব্যের মধ্যেই গীতিকাব্যকে স্থান দিতে চেয়েছেন। গান ও গীতিকাব্যের পার্থক্যের কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করেছেন। তবে তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে—“গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয়ে গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিমুচ্যতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।”

গীতিকাব্য কেবলমাত্র স্বতন্ত্রগ্রন্থের বিষয় নয়, নাটকের মধ্যে কোথাও কোথাও গীতিকাব্যোচিত ভাবের প্রকাশ হতে পারে। যেমন ‘উত্তররামচরিতে’ সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারের মধ্যে গীতিকাব্যের প্রকাশ দেখা যায়।

গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার বুলি (বিবিধ প্রবন্ধ | ২য়) ॥

‘গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার বুলি’ প্রবন্ধটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ‘রামবল্লভবাবুর ভিক্ষাদান’ প্রথম প্রকাশিত হয়—‘প্রচার’ ১২২১, পৌষ সংখ্যায়। এখানে বাবাজি এবং রামবল্লভবাবুর কথোপকথনের দ্বারা কৃষ্ণ যে অশরীরী নন, তিনিই জগৎ শরীরের আত্মা তা প্রমাণ করা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত রূপ কল্পনা করা হয় তারও রূপকমোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাবু এখানে ইংরেজীশিক্ষিত ঈশ্বর অবিস্বাসীর প্রতীক?

দ্বিতীয়ভাগ—“পূজাবাড়ীর ভিক্ষা”—প্রচার, ১২২১, বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পূজা উপলক্ষে এক জমিদারবাড়ীতে বাবাজিকে ছাগমাংস ভোজন করতে দেখে শিষ্য অবাক হল। কিন্তু বাবাজি বৈষ্ণবধর্মের তাৎপর্ষ্য ব্যাখ্যা করে জানাল—নিষ্ঠাপালনই বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র নয়, সমদর্শীতাই এর মূলমন্ত্র।

তৃতীয়ভাগ—“রাধাকৃষ্ণ”, প্রথম প্রকাশিত হয়—‘প্রচার’, ১২২২, আষাঢ় সংখ্যায়। এতে রাধা-কৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য নামের ধাতুগত ব্যাখ্যা দেখান হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে কথোপকথনের ভঙ্গী অনুসরণ করা হয়েছে এবং যথেষ্ট সরসতার সঞ্চার করা হয়েছে।

ঘটোৎকচ বধ (কৃ: চ: ৬ষ্ঠ খণ্ড | ৪র্থ পরিঃ) ॥

ভীমের ঔরসজাত রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করার জন্য কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তিশালী বাণ ‘এক পুরুষঘাতিনী’ প্রয়োগ করেন। ঘটোৎকচ মারা গেলেও কৃষ্ণ এতে আনন্দিত হন। কারণ ঐ অস্ত্র একবারই ব্যবহার করা চলে এবং কর্ণ সেটি অজুর্নের জ্ঞাত তুলে রেখেছিলেন। ঘটোৎকচের প্রতি সেটি ব্যবহারে সেই অস্ত্রের গুণ নষ্ট হল। এইপ্রসঙ্গে কৃষ্ণ অত্যাশ্চর্য রাক্ষসদের বধে নিজের কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—এখানে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ কোন হাত না থাকলেও তিনি বোঝাতে চাইছেন যে স্ববুদ্ধির মতই দুষ্টির বিনাশের জন্য দুবুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত।

সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । জিজ্ঞাসা ; ১৩৩এ রাসবিহারী
অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২২ । মূল্য দশটাকা ।

উনিশশো একাল সালের চ'ব্বশে এপ্রিল পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের টেনিস গ্রাউণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ মেমোরিয়াল কন্ভেনশনের দুইদিন-ব্যাপী এক অধিবেশন হয় । বিষয় ছিল শ্রীঅরবিন্দ আত্মজাতিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা । সেই অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন “শ্রীঅরবিন্দের জীবন এবং তাঁর শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয় । তাঁর দর্শন হল মানবজাতির অশ্রান্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা এক সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ চিন্তাধারা ।” বাক্য দুটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য । বাস্তবিকই শ্রীঅরবিন্দকে চেনা, জানা বা উপলব্ধি খুব সহজ সাধারণ ব্যাপার নয় । কেননা বাইরে থেকে এই কাজটি সম্পন্ন হবার নয় । অন্তরের গভীরতায় ডুবে যেতে না পারলে তাঁকে সঠিক ভাবে জানা যায় না । বোধহয় সেই জেজেই আজও তাঁকে নিয়ে অনেক পরস্পর বিরোধী অভিমতের অবসান ঘটেনি । এবং সব মিলিয়ে আজও তিনি রহস্যময় হয়ে আছেন । আগামী উনিশশো বাহান্ন সালে তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হবে ।

শ্রীঅরবিন্দ-র সমগ্র জীবন চারটি বিশেষ পর্বে চিহ্নিত । ইংল্যান্ড-পর্ব, বরোদা পর্ব, কলকাতা পর্ব এবং পণ্ডিচেরী পর্ব । মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত চৌদ্দবছর কাটান । এই পর্ব তাঁর জীবনের শিক্ষাগ্রহণের পর্ব । ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তাঁর বরোদার কর্মজীবন । এই সময় থেকেই তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতর প্রকাশের সূত্রপাত ঘটতে থাকে । ১৯০২ সালে বাংলা ও পশ্চিম ভারতের বিপ্লবীগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় । ১৯০৩ সালে তিনি “ভবানী মন্দির” পুস্তিকা রচনা করেন । এইভাবে তাঁর কর্মজীবনে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে থাকে । ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে তিনি কলকাতাকে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র স্থির করে চলে আসেন । ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কলকাতায় থাকেন । তাঁর কলকাতার কর্মজীবন জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা নেতৃত্ব ও পরিচালনায় মুখর । “যুগান্তর” ও “বন্দেমাতরম্”, প্রকাশ । মজফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা । তারপরই ১৯০৮ সালের ২রা মে গ্রেপ্তারের বাসস্থান থেকে গ্রেপ্তার হলেন—মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী হিসেবে বেশ কিছুদিন তাঁকে কাটাতে হলো আলিপুরের কারাকক্ষে । কারাবাস কালেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম অভিব্যক্তি ঘটে তাঁর জীবনে । এই মামলার তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়নি । তিনি মুক্তি পান । কিন্তু পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলতে থাকে । ঠিক সেই সময় ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কলকাতা ছেড়ে চন্দনগর চলে যান এবং সেখান থেকে ১লা এপ্রিল তিনি পণ্ডিচেরী পৌঁছান । সেখান থেকে

আর তিনি ক্ষেয়েন নি। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর মহাসমাদি লাভ করেন। তাঁর ৭১ বছরের কর্মজীবনের অবসান ঘটে।

তাঁর পণ্ডিতেরীতে যাওয়া নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। এটা নাকি তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয়। সংগ্রাম বিমুখতা তাঁকে ফরাসী অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে আত্মরক্ষায় প্ররোচিত করে। শ্রীঅরবিন্দের জীবন সম্পর্কে এ-ধরনের উক্তি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে আত্মশক্তিতে বলীয়ান একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠুক। তা নাহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনই জাতীয় মুক্তি আনতে সক্ষম হবে না। একই সঙ্গে দূরদৃষ্টির দ্বারা তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় জীবনধারা যে ভাবে চলছে তাতে, পরবর্তীকালে জাতীয় আত্মহননের পথই সূচ্য হতে পারে। জাতীয় অবক্ষয়ের এক বীভৎস চিত্র সেদিন তাঁর মানসপটে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের ধ্বংসের রূপ যেমন ফুটে উঠেছিল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মধ্যে। তাই মনঃপ্রবৃত্তিতে সেই ধ্বংসরোধকারী এক শক্তি সঞ্চার করার প্রচেষ্টার সাধনায় আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। দেশসেবার যে উদগ্র বাসনার দ্বারা তিনি পরিচালিত হয়েছেন—তার মধ্যে এক উচ্চশক্তি সম্পন্ন আধ্যাত্মিক-চেতনা সব সময় কাজ করেছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ‘ভারতের সেবা তিনি সম্যকতরূপে করতে পারবেন, নিজের সমস্ত শক্তিকে যদি ভারতের জ্ঞান ও শাস্ত্র বিজ্ঞানের গভীরতা সাধনে তিনি নিয়োগ করতে পারেন, সেই জন্মেই তিনি তাঁর বিপুল মানসিক ক্ষমতাকে একাগ্র তপস্যায় প্রয়োগ করেছেন ঈশ্বরকে পাবার মর্চে-ধরা চাবিকাঠিটি আয়ত্ত্ব করবার সঙ্কল্পে, যার সাহায্যে, তাঁর বিশ্বাস, সমগ্র মানব জাতির সামনে তিনি খুলে দিতে পারবেন জ্ঞান আর শক্তির নিত্য নূতন অগণ্য ক্ষেত্র।’

এ হেন অরবিন্দকে জানতে হলে, তার ৭১ বছরের জীবনে বিভিন্ন সময়ে, যে সব মনোবীরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের বক্তব্য ও রচনাবলী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর সম্বন্ধে কিছুনা কিছু লিখেছেন। এবং সমসাময়িক কালে তাঁকে ও তাঁর কার্যাবলীকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছে বহুক্ষেত্রে। সেগুলির মধ্যে থেকে শ্রীঅরবিন্দকে সমগ্রভাবে চেনা জানা সম্ভব। কিন্তু সেই সব রচনাবলী সংগ্রহও পাঠকের শ্রীঅরবিন্দকে সম্যকরূপে জানা সাধারণ-পাঠকদের পক্ষে সব সময় সম্ভব নয়। তাই সেই সব সমসাময়িক মনোবীরদের রচনাবলীর সাহায্যে যুগ্মভাবে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-চিত্রকে সম্যক রূপে গ্রন্থবদ্ধ করে লেখক পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি অভাব দূর করেছেন। এজন্য বাঙালী পাঠকদের কাছে তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্থ। ভাষার সৌকুমার্য ও লেখন ভঙ্গি, অল্পবাদের (অধিকাংশ উক্তিই ইংরাজী, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত); এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কর্ম উদ্ভাবনে সহায়ক যথাসাধ্য অংশগুলি নির্বাচনে লেখকের আন্তরিকতা ও মূল্যায়নের পরিচয় স্পষ্ট। সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ-র জীবন-কর্ম বিশ্লেষণও সঠিক হয়ে উঠেছে। যে সকল মনোবীর উক্তি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন : স্বস্তার ব্রাউনিং (কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন কালে অরবিন্দের পরীক্ষক); অবিনাশ ভট্টাচার্য (বিপ্লবী সহকর্মী); অমলকিরণ (কে, ডি. সেঠনা); অ্যানি বেসান্ত; এস. কে. ব্যাটলিক্স;

চিত্তরঞ্জন দাশ; ডব্রোথি রিচাডসন; তান-মুন-শান; নলিকান্তগুপ্ত; প্রথেরো জি. এন., ফিলিপ বাধিরে স্যাতিগার (পবিত্র); মারোয়েনা ডনোলি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রেমণ্ড ফ্রান্স পাইপার; রোম্যা রোল্লা; লরেন্স বিনিয়ন; লোকমাগ্ন ভিলক। এছাড়া আরও অনেক সমসাময়িক ব্যক্তি অরবিন্দর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, অল্পবক্ত-ভক্ত এবং অল্পগম্যদের রচনাবলীও উদ্ধৃত হয়েছে।

ভারাপদ পাল

প্রথম মুখ ॥ রূপাই সামন্ত। দু টাকা

আলোকিত অন্ধকারে ॥ মায়ী বহু। আড়াই টাকা। প্রকাশক গ্রন্থাগার, কলিকাতা-২২

আলোচ্য বই দুটি আধুনিক কবিতার। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি যুগের বিশেষীকরণ সহজ সাধ্য নয় কারণ, কোন বিশেষ যুগের সাহিত্য বলতে যে রূপ রীতি ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা অন্য যুগের নামী লেখকের লেখায়ও দেখা যেতে পারে। আবার অনেক সময়ে কোন কোন গ্রন্থে গ্রন্থকারের অগ্রবর্তী চিন্তাধারার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বক্তব্যের ভিন্নতায় বা চিন্তাধারার বৈপরীত্যের মধ্যদিয়েই ক্রমশ একটি যুগ বিবর্তিত হয় অথচ এলিঅট বলেন যে, কেউই নতুন কিছু বলেন না, শুধু হয় টেকনিক ও ফর্মের পার্থক্য, অর্থাৎ যুগোপযোগী করে এক নয়া রীতিতে বলাই আধুনিকতা।

সুতরাং ‘আধুনিক’ শব্দটি ব্যবহারে কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। কারণ চিরকাল কিছুই আধুনিক থাকতে পারে না। সাহিত্য চিরায়ত। কবিতা যখন বিশেষ একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করে তখন তা হয় সংবাদপত্রের সামিল। যদিও প্রত্যেকটি সৃষ্টিসাহিত্যে যুগের প্রচ্ছায়া থাকবেই তথাপি তার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যার সত্যতা সর্বকালে স্বীকার্য। এই যুগ-ক্ষেপে ‘আধুনিক কবিতা’র উপস্থিতি বিশ্বয়কর সাল-তামামির হিসেবে শুধু তাই নয়, আবির্ভাব হয়েছে বেশ কয়েকজন যোগ্য কবি। কিন্তু এখনও কবিতার পাঠক তৈরী হয়নি কম্পিত দুর্বোধ্যতা এবং অর্থহীনতার জন্ত। আসলে তাঁদের সামনে কবিতার কোন রূপ গড়ে ওঠেনি। আধুনিক যুগের কাব্য চর্চায় যাঁরা চিত্রকল্প, ধ্বনি, রঙ এমন কি শব্দের যাদুতে কবিতাকে এমন একটি স্তরে নিয়ে যেতে উৎসাহী বা শুধুমাত্র ‘বিস্মিন্ন প্রতীক’ ছাড়া আর কিছুই নয় তাঁদের মস্তোচ্চারণের দুর্বোধ্যতা পাঠককে বিরক্ত করে। কখনো কখনো মালার্মে বোদলেঅর বা এলিঅটকে অনুকরণ করতে গিয়ে বাঙলা কবিতায় ব্যর্থতার ছাপ পড়েছে, সম্ভবত মানসিক আবহাওয়ার বৈপরীত্যের দরুণ। বর্তমানে, রবীন্দ্রোত্তর যুগে, আধুনিক বাংলা বিশেষ উন্নত স্থান অধিকার করেছে এ কথাও স্বীকার্য।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অনেক কবি সামাজিক অবক্ষয় সম্পর্কে চিন্তিত এবং তাদের কাব্যে অবক্ষয়িত সমাজের রূপ প্রতিফলিত। কবিকে সমাজ-সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। সমাজের

অবস্থা প্রতিফলিত হবে কবির কবিতায়। এলিঅটের সমাজ-চিন্তা যেটস্-এর ও স্টোলেন চাইল্ড-এর শাস্ত এক অদ্ভুত কল্পনা রাজ্যের ছবি থেকে ভিন্ন এবং রচনার চরিত্রগত বিশিষ্টতায় বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। আমাদের আলোচ্য প্রথম বইটিতে শ্রীযুক্ত রূপক সামন্ত সামাজিক ক্ষয় অথবা অবস্থা সম্পর্কে চিন্তিত নন হয়ত এই কারণে যে, তিনি প্রেমের কবি। তাঁর প্রেম দেহসর্বস্ব। এবং কিছুটা অমুদার কারণ তিনি নারীদেহকে কেবলমাত্র ভোগ্যব্রব্য করে তুলেছেন। 'রমণীর মুখের গন্ধ নেওয়া গেছে ঢের'—স্বগার উদ্রেক করে। 'মুখের গন্ধ' কোন প্রতীক নয়। খেয়ালের সন্তান। 'হাতের শূণ্যে' কবিতায় কবির মানসীকে স্বদূর রোমের পথে লিওনার্দোদার রূপে কেন স্থাপিত করলেন এবং 'চালতা ফুলের সাদা বারে বাওয়া' প্রতীকের অর্থ আমাদের ভাবায়। কোন পথ দেখায় না।

কবি তাঁর পাঠকের কাছে কি উপহার এনে দিল তার কবিতার মধ্য দিয়ে? শ্রীযুক্ত সামন্ত প্রেমিক। প্রেমের কবি। সমস্ত শরীর নিঙ্রে নির্ধাস নেওয়াই হয়ত তাঁর কাম্য প্রেম। কবি দেহাতীত প্রেমের দ্বিজিত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তবে কয়েকটি কবিতা আমাদের কাছে উচুদরের মনে হয়েছে বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, চিত্রকল্প ও রঙের নিপুণ ব্যবহারে। কিন্তু ধ্বনি সৃষ্টিতে তার সাফল্য কামনা করি—যা তাঁর কবিতায় প্রায় নেই। তবে শ্রীযুক্ত সামন্তের বইটি হাতে পেয়ে লাভ হয়েছে। এই যে, পড়তে পেলাম কয়েকটি ভাল কবিতা, যেমন—বয়স বাড়ে; সব মুখ, মৃত্যুর্নৈতি, পথ যাত্রা দাস্তুর পক্ষে প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বই 'আলোকিত অন্ধকারে'। কবি মায়া বহু তাঁর সহজ, চিন্তা ও ভাব প্রকাশে কোন কোন কবিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রকাশের বিভিন্ন রীতি ও মাধ্যম আছে। (১) চিত্রকল্প, (২) শব্দ, (৩) রঙ, (৪) অভিব্যক্তি। শব্দ ও চিত্র তৎসহ অভিব্যক্তির ব্যবহারে কার মনোভাব কতটুকু প্রকাশ পেল সে সম্পর্কে লক্ষ্য করলে এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বলবার কথা, তা সে যে রীতিতেই হোক না কেন প্রায় একই, ভঙ্গীর রৈপরীত্যের দরুণ বোধ্যতা অবোধ্যতার একটা ক্ষীণ প্রস্থ যদিও ওঠে তথাপি তা তেমন গুরুতর নয়—কারণ সব কিছুর উর্দ্ধে যে অভিব্যক্তি তা শব্দ ও চিত্র অপেক্ষা মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়ের কাছে বোধ হবে যদি কবি নিয়তি তাড়িত ভাবসম্মাসী না হন। শ্রীযুক্ত বহু কখনো কখনো ভাবসম্মাসিনী। কাব্যিক বক্তব্য প্রকাশে সচেষ্ট কিন্তু কবিতার সূক্ষ্ম কাজে যত্নবান নন। কবির মূলধন ধৈর্য্য এবং একাগ্রতা। কিন্তু মূলধনের কিছুটা অভাব আছে।

শ্রীমায়া বহু আমাদের কয়েকটি চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন বা কবিতা পাঠকদের কাছে গৌরবের। অগ্রমেষ, জীবন তৃষ্ণা, দু'পাশে দর্পণ আমাদের ভাল লেগেছে। কবি নিজের লেখার প্রতি বস্ত্র মিলে তাঁর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হয়ত সফল হবে। এজ্ঞা চাই, আমাদের মনে হয়, কনসেন্সেশন অব মাইণ্ড—অন্ততঃ কবিতা লেখার সময়।

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দমোহন সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৭৭

সমকালীন



শুধুই
কেশ তৈল নয়
একটি
কেশ রসায়ন

সাধনা
আমলা

পুষ্টিগ্ৰাসিত আমলকেশদীপ কেশ তৈল



অতুলনীয় গুণাবলীর
জন্য যুগ যুগ ধরে
সুবিদিত



আমলকীই ইহার
প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের
সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে।
কেশপতন ও অকালপকতা রোধ করে
ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোৎপাদনে সহায়তা করে।
মস্তিষ্ক শিথ ও কর্মক্ষম রাখে।



সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

৩৩

বাংলাদেশে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান

দেবকুমার চক্রবর্তী

সনাতনপন্থী হিন্দুগণের মধ্যে অত্যন্তম স্মার্ত সম্প্রদায়ের আরাধ্য পঞ্চ দেবতাগণের যথা শিব, গণপতি, বিষ্ণু, সূর্য এবং কোন শক্তি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠা হইতেই পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থার উৎপত্তি সাধারণতঃ এই ধারণা প্রচলিত আছে। তবে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থার এবং তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবী সমূহের অবস্থানের যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলাদেশ এবং অত্র বাহা দেখা যায় সেগুলি পর্যালোচনা করে ধারণা হয় যে পঞ্চায়তন স্থাপত্য শিল্পমৌলী শুধুমাত্র স্মার্ত পঞ্চোপাসকগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অত্র ধর্মের মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও এই স্থাপত্য মৌলী প্রয়োগ করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থাগুলিই আলোচিত হবে।

স্থাপত্যের স্বসামঞ্জস্যের মানবিক প্রবণতার ফল স্বরূপ বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের পঞ্চ শিখরযুক্ত মন্দিরপরিকল্পনা হইতে সম্ভবতঃ এই পঞ্চায়তন মন্দির স্থাপত্যের উৎপত্তি। কালক্রমে স্মার্ত পঞ্চোপাসকগণের পূজা বৈশিষ্ট্য পঞ্চায়তন দেবায়তনে যথেষ্ট সজ্জিত লাভ করে এই ধরনের স্থাপত্য শিল্পের প্রসারে সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে জৈন নিবেদন মন্দির বা 'চৌমুখ' গুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। মধ্য যুগে জৈন ধর্মাবলম্বীগণের দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র এবং নাতিবৃহৎ চৌমুখগুলি সাধারণতঃ রেখ দেউলের আকারে নির্মিত হইত। এই দেউলগুলির চারিপার্শ্বে চারিটি ছোট ছোট নাতিগভীর কুলদীর (Niche) মধ্যে জৈনদিগের ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ মহাবীরাদি মুখ্য তীর্থাঙ্করগণের লাক্ষন সহ প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়। চারিদিকের চারিটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে উৎকীর্ণ তীর্থাঙ্করগণের প্রতিকৃতি সম্ভবতঃ মূল মন্দিরের চারিপার্শ্বে অবস্থিত চারিটি মন্দিরের

অবস্থানের রীতিকে স্মৃতিত করে সমকালীন মন্দির স্থাপত্যের পরিচয় দেয়। 'চৌমুখ' ভাস্কর্যের মধ্যে মূল মন্দিরটি বা তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্করকে পৃথকভাবে দেখাইবার অস্ববিধা হেতু এইটি প্রদর্শিত হয় নাই।

বাংলাদেশের সম্ভবতঃ প্রাচীনতম পঞ্চায়তন মন্দিরের অস্তিত্ব মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটির নিকটস্থ রাজবাড়ী ডাঙ্গার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ স্বধীররঞ্জন দাস কর্তৃক পরিচালিত খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়। অমলানন্দ ঘোষ সম্পাদিত "Indian Archaeology 1964-65 A Review" শীর্ষক তথ্যপঞ্জী (Cyclostyled Copy) মধ্যে এই স্থানের পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

রাজবাড়ী-ডাঙ্গার পূর্বপ্রান্তে এই পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থার ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরবিজ্ঞান অনুযায়ী ঐ স্থানের তৃতীয় পর্বে (Phase, III) এই মন্দির সংস্থান দ্বিতীয় পর্বের সৌধ সমূহের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দির সংস্থান আয়তাকার প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মধ্যের ত্রিখ মূল মন্দিরের চারিকোণে বর্গাকার চারিটি মন্দির অবস্থিত ছিল জানা যায়। উত্তরদিকে আয়তাকার মণ্ডপ এবং স্তরকি দ্বারা নিবদ্ধ বেদীর চিহ্নও বর্তমান। মন্দির প্রাকারটির পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য ২০.৮৭ মিটার এবং প্রাচীরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে স্তম্বর প্রকোষ্ঠের এবং অলঙ্কৃত বা মণ্ডিত কার্নিশের অস্তিত্ব বর্তমান। চূণের পলস্তারা দ্বারা এই মন্দির প্রাচীরটি আবৃত। মন্দির প্রাচীরের চারিকোণে ২.৫০ বর্গাকার চারিটি দেবায়তনের নিদর্শনও বর্তমান। এই সমস্ত মন্দিরগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত মন্দিরটির অবস্থা মোটামুটি ভালই এবং ইহার চারিদিকে কুলুঙ্গীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটি নির্মাণে অলঙ্কৃত ইষ্টকের ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়তাকার (৭.৮৪ × ৭.০১ মিটার) মূল মন্দিরটি উত্তর দ্বারী এবং তিনদিকে আয়তকের (Projection) বিস্তৃতি হেতু মন্দিরটি 'ত্রিখ' পর্যায়রূপে গণ্য করা যায়। মন্দিরের গর্ভগৃহের আয়তন (৪.৪১ × ৩. ৪ মিটার) এবং মধ্যস্থলে স্তরকি পেষ্টিত ভিত্তির উপর ইষ্টক নির্মিত বেদী বর্তমান। মূল মন্দিরের উত্তর দিকে পরবর্তীকালে এক আয়তাকার (৬.০২ × ৪. ৫৭ মিটার) মণ্ডপ সংযোজিত হয়। আরও পরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এক প্রাচীর নির্মাণ পূর্বক এই মণ্ডপের আয়তন সঙ্কুচিত হয়। এই প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রস্তর নির্মিত স্তম্বের নিম্নাংশের অবস্থিতি খনন কার্যের ফলে উদ্ঘাটিত হয়। এই প্রস্তর খণ্ডটির নিম্নভাগে আয়তাকার খাজকাটার চিহ্ন বর্তমান, এবং ধারণা হয় আদিতে এই খণ্ডটি কোন মূর্তির পাদপীঠ রূপে ব্যবহৃত হইত।

রাজবাড়ীডাঙ্গার স্তরবিজ্ঞান পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থা ঐ স্থানের তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্বে যথা সম্ভব দেবার্চনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পরবর্ত পঞ্চম পর্বে এই সমস্ত সৌধশ্রেণী স্তরকি দ্বারা প্রস্তুত বেদীর দ্বারা আবৃত হয়। গভীর খনন কার্যের ফলে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থার অন্তর্ভুক্ত এলাকায় এই মন্দির নির্মাণের প্রাক পর্বের সৌধ ও প্রাচীরাদির অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থার অভ্যন্তরে কোন দেবমূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। মন্দিরটি তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক

খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় খননকার্য পরিচালক ডঃ দাস এই ধারণা করেন। মন্দির সংলগ্ন এলাকা হইতে বৌদ্ধমূর্তি সমূহ এবং অসংখ্য মূর্তিকা বা প্রস্তর নির্মিত মূদ্রাক্ষের (Seal and Sealings) আবিষ্কার হেতু অনুমিত হয় এই পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থা বৌদ্ধ দেবায়তন রূপে ব্যবহৃত হইত। বুদ্ধগয়ার পঞ্চাশতর যুক্ত মহাবোধি মন্দিরের উল্লেখ ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ মন্দির সংস্থা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হইবার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্তমান। রাজবাড়ী ডাক্তার পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান সম্ভবতঃ এই মহাবোধি মন্দিরের স্মৃতিবহ এক বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি রূপে গণ্য করা যায়। গোড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ককে বৌদ্ধ বিদ্বেরূপে অথবা কেহ কেহ ধারণা পোষণ করেন। সত্যই যদি তিনি বৌদ্ধ প্রত্ন কীর্তি সমূহের ধ্বংস সাধনে বদ্ধ পরিকর থাকিতেন তাহা হইলে তাহার রাজধানী কর্ণ স্তবর্ণের সন্নিকটে অবস্থিত রত্নমুক্তিকা মহাবিহারের কোনই অস্তিত্ব থাকিত না। সাম্প্রতিক কালের খননকার্য গোড়াধিপতি শশাঙ্কের বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি সমূহের অনিষ্টকারীরূপে অপবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আহুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীডাক্তার পঞ্চায়তন মন্দির, সংস্থান সম্ভবতঃ বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মন্দিরের আদর্শে রূপায়িত হ'য়ে বুদ্ধগয়ার সহিত কর্ণ স্তবর্ণের এক যোগসূত্র স্থাপিত করে আমাদের পূর্বোক্ত ধারণাকে আরও স্বদৃঢ় করে।

জৈন পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থানের অবস্থিতি সম্বন্ধে বিবরণী আমরা মেজর জেনারেল আলেক জ্যান্ডার ক্যানিংহাম সাহেবের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা কার্যে সহায়ক জে. ডি. বেগলার সাহেবের বিবরণী হইতে জানিতে পাই। ক্যানিংহামের প্রবর্তিত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার বিবরণীর অষ্টমখণ্ডে (Archaeological Survey of India—Report of a Tour through the Bengal Provinces in 1872-73 Volume VIII by G. D. Beglar শীর্ষক গ্রন্থের ১৮২-১২০ পৃষ্ঠায় (বারাণসী) হইতে ১২৬৬ সালে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত প্রকাশনীতে) বর্তমান পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী থানার অন্তর্গত দেওলিগ্রামের প্রত্নকীর্তি সমূহের বর্ণনার মধ্যে এক পঞ্চায়তন মন্দিরের অবস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পুরুলিয়া রাঢ়ী শাখার রেলপথে অবস্থিত সুইসা রেলস্টেশনের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ পূর্বে এই দেওলি গ্রাম অবস্থিত। মন্দির সমূহের অবস্থান হেতু গ্রামটির দেওলি নামকরণ হইয়াছে ধারণা হয়। বেগলার সাহেব অনুমান করেন মন্দিরগুলি আদিতে জৈন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যের মূল মন্দির মধ্যে 'আকস্মানাথ' নামে এক জৈন মূর্তি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে স্থানীয় হিন্দুগণের দ্বারা মূর্তিটি পূজিত হয়। স্থানীয় জীলোকেদের বন্ধ্যাত্য নিবারণের জন্য এই মূর্তিটির বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূজা অর্চনার বিবরণী বেগলার সাহেবের বর্ণনায় আছে। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত জৈন তীর্থঙ্করগণের উপদ্ভ প্রতিকৃতির ভাষা পুরুষাণ বিশেষের রূপায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জৈন তীর্থঙ্কর গণকে হিন্দুদেবতা শিবকে পারিকল্পনা পূর্বক প্রজ্ঞনন শক্তির প্রতীভূ স্বরূপ গণ্য করে পূজা অর্চনার দৃষ্টান্ত 'বাঁকুড়ার মন্দির' শীর্ষক গ্রন্থে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন।

বেগলার সাহেবের বর্ণনায় জানা যায় যে মন্দিরটি আদিতে বেশ স্থন্দর ও বৃহৎ আকারের ছিল। গত শতাব্দীতেই মন্দিরটির জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মানের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে

আরও জীর্ণ। বেগলার সাহেব মূল মন্দিরের চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দিরের অবস্থান লক্ষ্য করেন। এ সময় চারিটি ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির বর্তমান ছিল। মন্দিরগুলি স্থল দানার বালি পাথরের দ্বারা রেখ দেউল রীতির স্থাপত্য শৈলী অনুসরণে নির্মিত। মূল মন্দিরের উপরিভাগের শিখর বর্তমানে ভগ্ন, প্রায় সমস্তই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডগুলি মন্দিরের প্রবেশ পথের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছে। বেগলার সাহেব এই মন্দির সমীক্ষার পর অনুমান করেন যে এই স্থানের মূল মন্দিরে গর্তগৃহ ব্যতীত অন্তরাল, মহামণ্ডপ একটি অর্দ্ধমণ্ডপ এবং সম্ভবতঃ এক দালান সংযোজিত ছিল। মূল মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটির উচ্চতা তিন ফিট জানা যায়, মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ হরিণের প্রতিকৃতি জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের লাক্ষণ হিসাবে পরিগণিত এবং সেই কারণে মূর্তিটি জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তিরূপে জ্ঞান করা অসমীচীন হইবে না। মুখ্য মূর্তিটির মস্তকের দুইপার্শ্বে দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করগণের তিনটি করিয়া প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে বেগলার সাহেব কিছু উল্লেখ করেন নাই তবে মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটির ভাস্কর্য্য শৈলী এবং মন্দির স্থাপিত্যে অনুসৃত রীতি লক্ষ্য করে অনুমান করা যায় যে এই মন্দির সংস্থান আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

১৪৬৭ শকাব্দ অথবা খৃষ্টীয় ১৫৪৫-৪৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত এক পঞ্চায়তন 'মণ্ডপ' বা 'মঠের' অভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত উয়াড়ী গ্রামে পাওয়া যায়। শ্রীমতী দেবলা মিত্র Epigraphia Indica—Voz X X V প্রতিকায় প্রকাশিত—"Inscriptions From wari, Saka 1467" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মন্দির সংস্থানের প্রতি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ হইতে বর্তমান ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ শ্রীমচাঁদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এই স্থানে এক সমীক্ষাকার্য্য পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষার ফলে উয়াড়ী গ্রামে আদিত্যে এক বৌদ্ধ বিহারের অভিজ্ঞ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

সামান্য উচ্চ প্রস্তর ফলকে মণ্ডিত বেদী বা 'উপনে'র উপর এই বর্ণাকৃতি সৌধ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের ইষ্টক নির্মিত বর্হি প্রাকার ভিতরে এবং বাহিরের দিকে মন্ডপ নীলাভআগ্নেয় শিলা ফলকের (bluish basalt) দ্বারা মণ্ডনের ফলে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। সৌধটির প্রায় ৩ফিট ৬ইঞ্চি বিস্তারের ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর দ্বারা নয়টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মধ্যের প্রকোষ্ঠটির আয়তন সর্ববৃহৎ এবং এটি প্রায় ১১ বর্গফুট পরিমিত। এই প্রকোষ্ঠটি বাকী আটটি প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত।—চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্রগৃহের এবং মুখ্য প্রকোষ্ঠের চারিপার্শ্বে বৃহত্তর আয়তাকার প্রকোষ্ঠের অবস্থান লক্ষণীয়। বৃহত্তর আয়তাকার চারিটি প্রকোষ্ঠ সম্ভবতঃ মূল সৌধ এবং চারিকোণে অবস্থিত চারিটি দেবায়তনের মণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হইত ধারণা হয়। মধ্যের মূল প্রকোষ্ঠের তিনটি প্রবেশ পথ বর্তমান। প্রধান প্রবেশ পথটি পূর্বদিকে অবস্থিত, উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মণ্ডপে গমনাগমনের ক্ষেত্রে এই দুইদিকে দুইটি প্রবেশ দ্বার আছে। দুই পার্শ্বের মণ্ডপ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে বর্হিনির্গমণের পথও আছে। চারিকোণে অবস্থিত চারিটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি হইতে দুই পার্শ্বে অবস্থিত মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ দ্বার লক্ষণীয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠতল আদিত্যে নীলাভ আগ্নেয় শিলা-ফলক দ্বারা মণ্ডিত ছিল, স্থানে স্থানে এই ফলকগুলির অভিজ্ঞ পাওয়া যায়। প্রবেশ পথের চৌকাঠগুলিও

প্রস্তর নির্মিত দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানে মালদহ সংগ্রহশালার রক্ষিত এক শিলালেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। শ্রীমতী মিত্র উপরিউক্ত প্রবন্ধে এই লেখাটির পাঠোদ্ধার করেছেন। তাঁর পাঠোদ্ধার মতে লেখাটি ৬টি পংক্তিতে বিভক্ত, লেখাটি এইরূপ :—

শাকাম্বে লিখ্যমানে মুনিস মল্লভিস্মগুপং শৈল-শাট্টৈর্মুক্তৈঃ নির্মায় ভ (১)

জ্ঞা পুতবিবুধগণং শ্রীমহেন্দ্রোক্ত সাক্ষাত। মধ্যে বিষ্ণুং কুশানোদ্দি (২)

শি দিবসকরং নৈঋতে বিঘ্নরাজং বায়ব্যে শৈলপুত্রীং হর-হরিত্তি স্তূরৈর্বিন্দি (৩)

তং বিশ্বনাথম্ ॥ শ্রীগোবিন্দ মিশ্রম্ ॥ নীলোপলেন ঘটিতো মঠ এব য় (৪)

শ্রু সংঘর্ষবাহুপচিতা কিল নীলমূর্তিঃ। আত্মঘতী বত বৃথৈব কলঙ্ক বাদং (৫)

বিশ্বে বিধৌক্রিয়লভাসি বিভাতি রেখা ॥ শ্রীসত্যাবধানশ্রা (৬) ॥ উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ এই রূপ করা হইয়াছে।

‘অঙ্কশ্রু বামাগতি’ পদ্ধতি অনুসারে লিখিত এই ফলকে দেবায়তন প্রতিষ্ঠা শাকাম্বে [মুনি (৭) রঙ (৬) এবং মল্ল (১৪) অর্থাৎ ১৬৭ অব্দে সম্ভটিত হয় উল্লেখ আছে। ভক্তি অর্থ্য স্বরূপ এবং মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানৈক মহেন্দ্র নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক উৎকৃষ্ট প্রস্তর খণ্ডদ্বারা এই ‘মণ্ডপ’ নির্মাণের কাহিনী লেখ মধ্যে ব্যক্ত। এই মণ্ডপ মধ্যে কতিপয় বিগ্রহ যথা মধ্যস্থলে বিষ্ণু, কুশান্ন বা অগ্নিকোণে দিবাকর বা সূর্য্য, নৈঋত কোণে বিঘ্নরাজ বা গণেশ, বায়ুকোণে শৈল পুত্রী বা পার্বতী এবং হর অর্থাৎ ঈশান কোণে সর্বদেবতাগণের পূজিত বিশ্বনাথের মূর্তির অবস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। শিলালেখের মধ্যে উৎকর্ণে শ্রীসত্যাবধান রচিত আর একটি শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অত্যধিক ঘর্ষণের ফলে সমুজ্জল নীলাভ প্রস্তর দ্বারা এই ‘মঠ’ নির্মিত হয়। মঠের উজ্জলে চল্লের কলঙ্কও নিশ্চিহ্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে এই কবি কল্পনার মাধ্যমে সৌধটির গুণ কীর্ত্তি করা হইয়াছে। উপরিউক্ত শিলালেখটি উয়াড়ী গ্রাম হইতে ১৯৫৮ সালে সংগৃহীত জানা যায়। শিলালেখে উল্লিখিত মূল মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তিটি উয়াড়ী গ্রামের পূর্বে বর্ণিত সৌধ মধ্যে বর্তমানে নাই। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে এই স্থান হইতে জ্ঞানৈক ব্যক্তি এক বিষ্ণু মূর্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গৃহে রাখেন, পরে তাঁহার পরিবারে অঘটন ঘটিলে মূর্তিটি নিকটস্থ এক পুষ্করিণী মধ্যে নিক্ষেপ করেন সম্ভবতঃ এই মূর্তিটির পাদপীঠের অংশটি বর্তমানে উয়াড়ী গ্রামের উপরিউক্ত দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিলম্বমান। লেখমত্রে বর্ণিত অন্ত দেব-দেবীর মূর্তিগুলি বর্তমানে অন্তর্হিত। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব কোণের প্রকোষ্ঠ মধ্যে বৃহৎ অর্থ্য পট্ট সম্বলিত এক শিবলিঙ্গের অবস্থিতি লক্ষণীয়। লেখ মধ্যে বর্ণিত বিশ্বনাথ নামে অভিহিত শিবলিঙ্গরূপে এইটি গণ্য করা চলে। শিলালেখটি দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত সূর্য্য বিগ্রহের জন্ত নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হয়। এই দেবায়তনের ইষ্টক নির্মিত বিভেদ প্রাচীরগুলি স্বন্দররূপে চূণ এবং স্তরকির দ্বারা নির্মিত এবং এখনও বেশ দৃঢ়।

উপরিউক্ত শিলালেখের মাধ্যমে এবং উয়াড়ী গ্রামের প্রত্নকীর্ত্তি সমূহের সমীক্ষার ফলে মধ্যযুগের শেষভাগে বাংলাদেশে স্মার্ত পঞ্চোপাসনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এক পঞ্চায়তন মন্দির

সংস্থানের অবস্থিতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। একই সৌধের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়গণের অর্চিত দেব-দেবী মূর্তির অর্চনা সমকালীন ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সমন্বয়তার সাক্ষ্য দেয়। ভারতের অন্তর্গত উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং রাজস্থানে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান সমূহ যথেষ্ট প্রসিদ্ধ লাভ করিলেও বাংলার ধর্মীয় ইতিহাস রচনা এবং মন্দির স্থাপত্য আলোচনা ক্ষেত্রে এই সমস্ত পঞ্চায়তন দেবায়তনগুলির গুরুত্ব অপরিণীম। উয়াড়ী গ্রামে আদিতে একটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব ছিল এই মত বর্তমান লেখক পোষণ করেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের ফলে স্মার্ত পঞ্চোপাসনা বিশেষ প্রসার লাভ করে। অনুমান করা যায় যে উয়াড়ী গ্রামের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপর এই পঞ্চায়তন বৌদ্ধিটি ১৭৬৭ শকাব্দে বা খ্রীষ্টীয় ১৫৪৫-৪৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার মধ্যে অবস্থিত পাঁচখুপী গ্রামের এক পঞ্চায়তন মন্দিরের প্রতি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত 'বড়কোণার দেউলের' ধ্বংসাবশেষ বা চিবিবে পঞ্চমুখের সমাহাররূপে অভিহিত করে গ্রামটির পাঁচখুপী নামকরণ হয়েছে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শৈলীর অনুসরণে নির্মিত এই গ্রামের ইষ্টক নির্মিত পঞ্চায়তন মন্দিরটি দর্শনীয়। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট মন্দিরটি 'নবরত্ন শিবমন্দির'রূপে খ্যাত। হুউচ ভিত্তি বেদীর উপর মধ্যস্থলে অতুল রেখ দেউল দণ্ডায়মান, মূল মন্দিরের চারিকোণে মূল মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত চারিটি ক্ষুদ্র রেখ দেউলের মধ্যে চারিটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মূল মন্দিরের বহির্ভাগ পঞ্চরথ এবং অভ্যন্তর অষ্ট কোণাকৃতি পূর্বদিকে প্রবেশদ্বার অবস্থিত, অবশিষ্ট সাতটি দেওয়ালের চারিটির উপর ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রলম্বিত প্রকোষ্ঠমধ্যে শিব-লিঙ্গ বিরাজমান। গর্ভগ্রহের কেন্দ্রস্থলে আর একটি শিবলিঙ্গ। মূলমন্দিরের পাঁচটি এবং চারিকোণে অবস্থিত মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত চারিটি শিবলিঙ্গ মোট নয়টি শিবলিঙ্গের অবস্থিত হেতু স্থানীয় জনসাধারণের নিকট মন্দিরটি 'নবরত্ন' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য শৈলী অনুসরণে নির্মিত অলঙ্কৃত মৃৎকলকের দ্বারা এই মন্দিরের সম্মুখভাগ মণ্ডিত। প্রবেশ পথের গিলানের উপরিভাগে রাম রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য উৎকীর্ণ।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলাদেশের পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থানগুলির আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই বিশেষ স্থাপত্য রীতি কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে প্রসার লাভ করেনি। আদিতে এই স্থাপত্য রীতি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ দেবায়তনের প্রতিষ্ঠাকালে অনুসৃত হয়ে জৈন ধর্মালম্বীগণকে এই রীতির প্রতি আকৃষ্ট করে। স্মার্ত 'পঞ্চোপাসক' গণের পূজা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই স্থাপত্য রীতির প্রয়োগ মাত্র একটি ক্ষেত্রে অবগত হওয়া যায়। পরিশেষে সর্বসম্মত শিবের উদ্দেশ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার এক অভিনব রূপায়নের প্রয়োগ পাঁচখুপী গ্রামে দেখা যায়। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে এবং ধর্মীয় ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই পঞ্চায়তন মন্দির স্থাপত্য রীতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এর উল্লেখ পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ভূগোলের উপেক্ষিতা

চিৎর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে ভাগীরথীর দান যেমন অপরিমেয় তেমনি ভূগোলের উপেক্ষিতা সরস্বতীর ভারতের জাতীয় মংগলসাধনায় নিজে থেকে বিলীন করার নিদর্শনও অভুলনীয়। আমরা “মহো অর্ণো” সরস্বতীর কথা ভুলেই গেছি। ভূগোলেও সামান্য একটু এক-আধ জায়গায় উল্লেখ ছাড়া আর বড় বিশেষ কিছু সরস্বতী সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। প্রয়াগতীর্থের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়—প্রয়াগ গংগা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সংগমক্ষেত্র—ত্রিবেণী মহাপুণ্যভূমি। এও কথিত আছে সরস্বতী ত্রিবেণীতে অন্তঃসলিলারূপে বিরাজিত। আমরা ভুলেই গেছি একদিন এই বিরাট নদী-সরস্বতীর উর্ধ্বমালা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলো এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আর্যসভ্যতার প্রসারতালভের পথে বাধক হয়েছিলো। ঋগবেদের যুগে সরস্বতীর উত্তালতরঙ্গ দুঃসাহসী আর্যসন্তানদের মনে ভীতির সঞ্চার করে এবং সভ্যতাগর্বে গর্বিত আর্যদের পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্তরায় হয় এই সরস্বতী। সে সময় সপ্তসিদ্ধুর সভ্যতা দক্ষিণভারতেও বিশেষ প্রসারতা লাভ করতে পারেনি সেখানেও বাধার সৃষ্টি করেছিলো দৃশ্যতী। গংগা সেদিন ছিলো ভৌগোলিক নাম মাত্র। সরস্বতীর তরঙ্গরাজিকে অতিক্রম করে অরণ্যসমাকুল পতিতপাবনী ভাগীরথী তটভূমিতে আর্যদের এসে পৌঁছাবার সাহস হয়নি।

ভূবিজ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে বহু শতাব্দী ধরে এই সরস্বতী নিজে থেকে বিলুপ্ত করেছে। পেছনে ফেলে রেখে গেছে তার আত্মাহুতির করুণ স্মৃতিটুকু—নামাত্ একটু স্মৃতির রেখা আমাদের এই ধরিত্রীর ভূতত্বীয় ইতিহাসেও বা তার মূল্য কতটুকু। সরস্বতী নিজে থেকে বিলুপ্ত করে বিরাট বালুচরে পরিণত হয়েছিলো। দক্ষিণে তার আর্কাইয়াম এবং প্রী-ক্যামব্রিয়ান যুগের রূপান্তরিত শক্ত স্তর, অতীতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা শিস্টর (স্কীষ্টোস) আর্কাইয়ান স্তর যাকে স্তরভেদে ফুটোখ, চেইল ও ডালিং প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মাঝখানে হোল গংগার পলিজ তটভূমি—বেদোত্তর এবং উপনিষদকালের লীলাক্ষেত্র। সরস্বতী ঋগবেদোত্তরকালে বিরাট মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চবিংশতি তাওব্রাক্ষণে (২৫-১০-১) সরস্বতী শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। সরস্বতী শাস্ত্রে দীক্ষিত করার সময় ছাত্রকে বিনাশন তীর্থে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিলো যেখানে সরস্বতী জনকল্যাণে নিজে থেকে বিলীন করেছে (জ-আর.-এ-এস.—১৮৯৩ পৃ ৫১ দ্রষ্টব্য)।

ভূগর্ভস্থ নানা বিচিত্র প্রণালীতে সরস্বতী অন্তর্হিত হয়ে তার উপকূলবর্তী নানা জাতির অভিপ্রাণের (মাইগ্রেশন) ও আর্য সভ্যতার প্রসারতার সহায়ক হয়েছিলো। (ইণ্ডস্. ভ্যালী ইন দি বেদিক পীরিয়ড—রমাপ্রসাদ চন্দ—মেময়ার আর্কিয়োলজিক্যাল সরভে অব ইণ্ডিয়া নং ৩১-দ্রষ্টব্য) সরস্বতীর আত্মদানের মাহাত্ম্য আজ জনসাধারণের কাছে অবিদিত। ভারতের ইতিহাসে সরস্বতীর এই বিরাট বিনাশন ব্রত সাধনের কোন ছায়াপাতই হয়নি। মূর্তিকলার ও দেবদেবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে সরস্বতীর এই আত্মত্যাগকে অমর করে,

রাখবার জন্যেই বেদোত্তরকালে আঁধার কল্পনা করেছিলো সরস্বতীদেবীর রূপ এবং পরবর্তী যুগের মূর্তিকলায় মা সরস্বতী দেখা দিলেন বীণা রঞ্জিতা সুন্দরী নারীরূপে। ভারতীয় পরম্পরায় দেখা গেছে যখনই কোন ত্যাগের উদাহরণকে চিরস্থায়ী করার প্রয়াস করা হয়েছে তখনই এক দেবতা বা দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় দেব-দেবীর মূর্তি সৃষ্টির ইতিহাসে আরো অনেক কথা আছে যেমন ভীতিও একটি দেব-দেবী সৃষ্টির মূল কারণ। বিরাট নদী সরস্বতী অন্তর্হিত হয়ে দেখা দিলেন সরস্বতী দেবীরূপে। নদীর উর্মিমালা ও জলের প্রতীক হলো হংস—দেবীর বাহন। নদীর জলের শুভ্রতা দেখা দিলো দেবীর অংগে। পরবর্তী যুগে বেদাবিচার প্রসারতার প্রতীক হলো দেবীর হাতে পুষ্প এবং দেবজন-বিজ্ঞা অর্থাৎ আর্ষ ও অনার্য কৃষ্টির সংমিশ্রণে যে নৃত্যগীত ও বাজের চরম উৎকর্ষ সাধিত হলো তার প্রতীক হলো দেবীর বীণারঞ্জিত করদ্বয় বলা যেতে পারে সরস্বতী বিনাশনের পর ভারতে আঁধারভাষ্যতার বিকাশকেই প্রতীকরূপে রূপান্তরিত করা হলো সরস্বতীদেবীর মূর্তিতে।

আজ হয়তো ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে লেখা হতো যদি সরস্বতী আত্মগোপন না করতো। মহো-অর্ণ সরস্বতীর উর্মিমালা যদি অক্ষুণ্ণ থাকতো ভারতের মধ্যভাগে, হয়তো পশ্চিমভারতের সাথে পূর্বভারতের সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হতো না। কোথায় রচিত হতো মহাভারতের নাটক? কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতো কুরু-পাণ্ডবের অমর কাহিনী? কুরু-পাঞ্চাল জাতির অভ্যুদয় হতো কোন ক্ষেত্রে? কোন অরণ্যে আরণ্যকের সৃষ্টি হতো? কৃষিপ্রধান আঁধার সভ্যতার কৃষকেরা কোথায় পেতো গংগার উর্বর পলিজভূমি?

পশ্চিম ভারতের জাতিগুলির সিদ্ধদেশে কিম্বা আরো পশ্চিম অঞ্চলে অভিপ্রাণ করা সম্ভব ছিলো না কারণ পশ্চিমে সপ্তসিন্ধুর নদীগুলি ছিলো খরশ্রোতা আশেপাশের জমিগুলো জলসিঞ্চন অভাবে ছিল অল্পবর্ষ, পশ্চিমের আবহাওয়াও ছিলো শুষ্ক ও জীবনযাত্রার প্রতিকূল। তারা চেয়েছিলো পূর্বভারতের উর্বর সমতলভূমি, মন্দ্রশ্রোতা নদনদীর দুইপাশে সুবিস্তৃত সবুজীমায়া, বনভূমির শান্ত-স্নিগ্ধ সুষমা এবং গ্রাম্যজীবনের অল্পকূল ক্ষেত্র। বেদোত্তরযুগে সরস্বতীই ভারতভূমির নূতন ভূগোল রচনায় সাহায্য করে (বেদিক ইণ্ডিয়া-জীনেদ-আ-রাগোজিন দ্রষ্টব্য)।

বেদোত্তর উপনিষদকালে সরস্বতীর তিরোধানের পর উত্তরভারতে একে একে মাথা তুলে দাঁড়ায় ছোটবড় কত প্রদেশ কত জাতি। এক অপূর্ব ভৌগোলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় সেই সময়। সপ্তসিন্ধুর দেশে সীমাবদ্ধ আঁধার সভ্যতা পূর্বাঞ্চলগামী হয় এই সময়, এবং ব্রাহ্মণ সংহিতা ও আরণ্যক-গুলির সৃষ্টি হয় গংগার উপকূলবর্তী ছ'ধারে সুবিস্তৃত বনরাজ্যের মধ্যে। অরণ্যগুলোই পরবর্তীযুগে এক-একটি শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে।

সরস্বতী যে সময় নিজেকে বিনাশ করে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ঘটায় তখন তার উপকূলবর্তী এবং সপ্তসিন্ধুর তটভূমির জাতিগুলি অবাধে পূর্বভারতে অগ্রসর হয় এবং পূর্বভারতের অনার্য জাতিগুলির সাথে সংঘর্ষ ও মিলনের পর রক্তের সংমিশ্রণও ঘটে—বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়। আমাদের উপনিষদ সাহিত্যগুলির কিছু কিছু এই মিশ্রিতজাতির মধ্যে মনীষীব্যক্তিগণের চিন্তাধারার ফল। উদাহরণস্বরূপ ঐতরেয় উপনিষদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপনিষদখানি মহীদাসের দ্বারা রচিত। মহীদাস ছিলেন ইতার পুত্র অর্থাৎ দাসী পুত্র। ব্রাহ্মণ ঋষি যখন শুভ্রাপন্নীর গর্ভজাত

সন্তানকে শিক্ষাদান করলেন না, ইতরা তখন পুত্র মহীদাসকে মাতা বহুস্করার কাছে শিক্ষার জন্য পাঠালেন। ছেলের নামকরণ হোল মহীদাস ঐতরেয়। সর্ববিজ্ঞাবিশারদ হওয়ার পর মহীদাস ঋগবেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখলেন (ক্ষিতিমোহন সেনের “ভারতে সংস্কৃতি” দ্রষ্টব্য।

জাবালীপুত্র সত্যকামের আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এই সূত্রে। সত্যকাম যখন গৌতম হারিদ্ৰমতের কাছে শিক্ষার জন্য উপস্থিত হলেন পিতার নাম বলতে পারলেন না। মাতা জাবালী বললেন “বহু পরিচর্যা” ক’রে সত্যকামকে পেয়েছিলেন। “বহু পরিচর্যা” শব্দের দ্বারা দাসীবৃত্তিকেও ইংগিত করা যেতে পারে (ছাঃ উঃ ৪-৪-৩ থেকে ৫)। বাইহোক সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দেখে গুরু বলেন ‘সত্যকাম ব্রাহ্মণপুত্র এবং শিক্ষাদান করেন। পরে “সত্যকাম উপকোশল কামলারূপের শিক্ষাগুরু হন (বুঃ উঃ ৪-৯-১) এবং বিদেহ জনককেও শিক্ষা দান করেন। এই উদাহরণ থেকেও প্রমাণ হয় উপনিষদকালে বর্ণসংস্কার ঘটে এবং আৰ্য ও অনার্য জাতি সংমিশ্রণের প্রভাব উপনিষদসাহিত্যেও পড়ে।

শুধু তাই নয় আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আৰ্যদের ভারতের পূর্বাভিমুখে অভিপ্রাণের সময় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—গোমতী নদীর উপকূলে নৈমিষারণ্যে নিমিষজাতির বাস ছিলো। নিমিষ অর্থে বিষ্ণু বোঝায়। নৈমিষীয়েরা ছিলো বিষ্ণুর উপাসক। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বিষ্ণু উপাসকদের যজ্ঞের উদ্গাতা হন গ্রাভ মৈত্রেয় বা বক দাল্ভ (ছাঃ উ ১-১২-১, ১-২-১৩) বিষ্ণু সকলের আরাধ্য দেবতা হলেও এই নৈমিষীয়েরা যে আৰ্যসন্তান এ কথার কোনই প্রমাণ নেই। এও একটা উপনিষদকালে আৰ্য-অনার্য সংমিশ্রণের নিদর্শন।

তাছাড়া আৰ্য ও অনার্য কৃষ্টির বিচার করলেও দেখতে পাওয়া যাবে আৰ্যেরা অনার্যদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বহু জিনিষ এবং আচার ব্যবহার। তারমধ্যে নৃত্যগীত বাণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋগবৈদিক আৰ্যরা স্বীকার করে পাঞ্জাবের দক্ষিণ অঞ্চলে অনার্য সভ্যতার অস্তিত্ব (ঋঃ বেঃ ৬-২০-১২)। দেবরাজ ইন্দ্র যুধ ও তুর্ভস্কদের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে গিয়ে নিয়ে আৰ্যসমাজভুক্ত করেন (রায় বাহাদুর আর. পী. চন্দ মেময়ার নং ৩১—এ, এস, ও, আই)।

আৰ্যরা পূর্বভারতে অভিপ্রাণকালে বহু অনার্য জাতির সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বনে জংগলে ও পাহাড় পর্বতের দিকে আৰ্য সৈন্যেরা বিতাড়িত করতো। অনার্য মেয়েরা যারা পালাতে পারতো না বা ধরা পড়ে যেতো এবং বিজেতাদের দাসী হতো। ঋগবেদে দাস বা দাসী শব্দের উল্লেখ বহু জায়গায় পাওয়া যায়। এই অনার্য মেয়েদের সাহায্যেই আৰ্য ও অনার্য দু’টি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়।

নৃত্য-গীত-বাণের চর্চা নিয়ত যুদ্ধ-রত আৰ্যদের মধ্যে কতটা বিকাশ প্রাপ্ত হয় বলা শক্ত কিন্তু ভারতের আৰ্যপূর্ব অনার্য সভ্যতায় এই বিজ্ঞাগুলি সভ্যতার বিশেষ অংগরূপে বর্তমান ছিলো। ঋগবেদের যদিও হুন্দুভি (১-২৮-৫), নাদী, কর্করী অর্থাৎ বাঁশী (২-৪৩-৩) বাণ তারের যন্ত্র এবং আঘাটার অর্থাৎ ঘণ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু মনে হয় এগুলি অনার্যদের কাছ থেকে নেওয়া। কারণ আৰ্যদের অস্ত্র ও ভ্রাম্যমান জীবনের মাঝে সংগীত চর্চার অবকাশ কোথায়? ঋগবেদের সময়েতেও আৰ্যরা যাযাবর। পরবর্তীযুগে উপনিষদকালে “দেবজন বিজ্ঞা”—নৃত্য গীত বাণ

বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতির অংগে পরিণত হয়। উপনিষদকালে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির আরও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে।

বেদোক্ত উপনিষদের যুগে ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রে যে সকল পর্বতমালা নদনদী ও প্রদেশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় তা কতকটা এই প্রকার—উত্তরে হৈমাদ্রী (বৃ: উ: ৩-৮-২) অর্থাৎ হিমালয়। দক্ষিণে কোন পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

নদীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে—সরস্বতী, সিন্ধু, শতদ্রু, পরুক্ষী, গংগা, অসিক্রী, অর্জিকীয়া, এবং যমুনা (ছা: উ: ৩-১২-২, ৬-১০-১; বৃ: উ: ৩-৮-২) কিন্তু সরস্বতী এই সময়ে শ্রোতবিনীকূপে কোথাও বর্ণিত হয়নি (বৃ: উ: ৬-৪-২৭)।

উপনিষদের মধ্যে যে সব প্রদেশ ও অঞ্চলের বর্ণনা আছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উত্তরে গান্ধার দেশ (ছা: উ: ৬-১৪-১, ২) ময় (বৃ: উ: ৩-৩-১৩, ৩-৭১) দক্ষিণে উবীনর এবং বিদর্ভ, পূর্বে কাশী, কুরুপাঞ্চাল প্রদেশ, বিদেহ তাছাড়া মৎস, কোশল প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভূগোল্য উপেক্ষিতা সরস্বতী আজ নেই কিন্তু ভারতের ইতিবৃত্তের অন্তরালে রয়েছে তার অবদান—সংস্কৃতির ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে সে গণমানসের চরম উৎকর্ষ, জাতীয় জীবনে মুছে ফেলেছে সে পূর্ব ও পশ্চিমের ভৌগোলিক ব্যবধান এবং ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী হতে আরম্ভ ক'রে সুসংস্কৃত অসংস্কৃত, সভ্য এবং অর্ধসভ্য সকলকে এক মহামিলনস্থলে আবদ্ধ করেছে এই সরস্বতী। আজ সরস্বতী পূজার মধ্যে যে ত্যাগের মহিমা এবং ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আভাষ না দেখতে পায় তার প্রতি শুধু একটু সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করার নেই।

তুর্কী আমলে বাংলাদেশ

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাগনের শুরু। বিদেশী, বিভাবী ও বিধর্মীজাতি লুটপাটের আশায় এসে রাজ্য দখল করে বসে। ফলে দেশের চিরচরিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে।

ত্রয়োদশের পূর্ব পর্যন্ত বাইরের অনুপ্রবেশ মানে আর্থসভ্যতার বিস্তৃতি। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দেখি, বাঙালীর বলবীৰ্য ছিল। শশাঙ্ক ছিলেন প্রবল প্রতাপাশ্রিত রাজা। ধর্মপালের রাজ্যবিস্তারের লিপ্সা ছিল এবং তা কিছু পরিমাণে সফলও হয়। বাঙালীর বীৰ্যকে অন্ত প্রান্তবাসীরা সম্মুখ করতো।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে দীর্ঘকাল বাঙালী স্বদেশে পরবাসী হয়ে বাস করতে থাকে। ত্রয়োদশ-পূর্বকালের বাঙালীদের সাধারণ স্বভাবটি বোঝা যাবে পরাধীন আমলে তাদের আচরণ থেকে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বারভূঁইয়াদের বিদ্রোহ প্রকারান্তরে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত বিদ্রোহ। আবার তার আগে পতুগীজ সাহায্য মিশ্রিত ছিল। সাধারণ বাঙালীদের বিদ্রোহী স্বভাবের কোন পরিচয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দীতে মেলে না।

রাজানির্ভর জাতি, রাজাই যখন নাই, তখন লড়াই করবে কার হয়ে? রাজা যখন বিদেশী, বিধর্মী, তখন তাকে মেনে চলাই শ্রেয়ঃ। একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কাজ করে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় যে বীৰ্যবন্তার পরিচয় দেন, তা দেশের ইতিহাসে একটি সাময়িক বুদ্ধুদ মাত্র। তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্মই তা সম্ভব হয়েছিল, তাঁর সংগে সংগেই তার অবসান হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান একটি সাময়িক ঘটনামাত্র। নাবালকের অভিভাবকরূপে স্বযোগ বুঝে ক্ষমতা দখল করলেও তাতে বিদ্রোহের বহি জ্বলেনি। হিন্দু রাজ্য স্থাপনের একটা স্বযোগ তাঁর এসেছিল, কিন্তু পূর্বাবধি তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, বা সে জাতীয় কোন পরিকল্পনা নিয়ে উত্তরবঙ্গের হিন্দুপতিগণ গোড়া থেকে অগ্রসর হননি।

বখতিয়ার খিলজী বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন কিন্তু রাজত্ব করবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর প্রথমে দ্বিধা ছিল। একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে দিল্লীর মনদেব আশীর্বাদ নিয়ে রাজত্ব শুরু করলেন কিন্তু কতটুকু রাজ্য? পদ্মার এপারে-ওপারে, বেশীর ভাগই উত্তরবঙ্গের খানিকটা অংশ তাঁর রাজত্ব। তিনি কিন্তু ছটফটে লোক। উত্তর দিয়ে হিমালয় টপকে সরাসরি দেশে ফেরা যায় কিনা উদ্ভাবন করতে গিয়ে সৈন্য ও সম্পদ খোয়ালেন। শেষে নিজের লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ হারালেন। পরবর্তীরা রাজ্যসীমা একটু একটু করে বাড়াতে লাগলেন।

বিদেশে ভিন্নধর্মীদের দেশে রাজত্ব করতে এসে এইসব বিদেশী শাসকদের প্রধান সমস্যা হওয়া উচিত ছিল বিজিত জাতি। তাদের শাসন করতে করতে প্রাণান্ত হবার কথা। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলো না। ইতিহাস বলছে, তাঁদের সমস্যা তাঁরাই। দেশবাসীকে নিয়ে তাঁদের একটুও

চিন্তিত বা বিচলিত হতে হয়নি। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা পালিয়ে যেতে থাকে। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের অনেকখানি তখন কায়স্থ নৃপতি দশরথ দত্তজমাধবের কর্তৃত্বাধীনে, দক্ষিণে পরাক্রমশালী উড়িষ্যার হিন্দুরাজারা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই হিন্দুবেষ্টনীর মধ্যে বয়েছে মুসলমান রাজ্য ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

পারম্পরিক ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মুসলমান নৃপতির সর্ব সময়েই বিচলিত থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসনের পক্ষে এইটিই ছিল তাঁদের প্রধান সমস্যা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দুদের মধ্যেও স্বস্থতার ভাব ফিরে আসে। বাধ্যপ্রজার মতো তারা মুসলমানরাজ্যে শান্তিতে বাস করতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে হিন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়ার ভাবটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। হোসেন শাহর আমলে বহু হিন্দুর প্রাধিকার সুবিদিত।

বাংলার 'মামলুক' বংশের রাজত্বকাল ১২২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই রাজত্বের শেষের দিকে পূর্ববঙ্গেও মুসলমান অধিকার কিছু অংশে বিস্তৃত হয়। বলবন বংশের (১২৮৭—১৩২৮) রাজত্বের শেষের দিকে মুসলমান রাজ্য চারটি সম্পূর্ণবিভাগে পর্ববসিত হয়—লক্ষণাবতী, সাতগাঁও, সোনার গাঁও ও ছাটগাঁও বা চট্টগ্রাম। বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁও ঐশ্বর্যে সমগ্র রাজ্যের রাজধানী লক্ষণাবতীকেও ছাড়িয়ে ওঠে। এই সময় মুসলমান ফকিরদের চেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু মুসলমান হয়। মুসলমান শক্তি ফলতঃ বাড়ে এবং সমাজের বিভিন্নদিকে অনুপ্রবেশ করে। বহু মন্দির ও বিহারের ধ্বংসস্তুপের ওপর মসজিদ ও দরগা তৈরী হয়ে মুসলমান ধর্মকে স্থানে স্থানে দৃঢ়ভিত্তিক করে। অস্ত্রের দ্বারা লব্ধ দেশে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা শুরু হয় ফকিরদের দ্বারা। হিন্দুরা নিষ্ক্রিয়ভাবে এ পরাজয়কেও মেনে নিয়ে পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়।

বাংলার পূর্বে উল্লিখিত চারটি বিভাগ নামে এক রাজত্বের অধীন হলেও কার্যতঃ প্রত্যেকটি শাসনকর্তা প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসন করতেন। শাসনকর্তাদের পারম্পরিক বিরোধ ও শক্তিবৃদ্ধিতে ১৩৪০ খৃঃ থেকে কার্যতঃ বাংলাদেশ দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা কাটিয়ে প্রায় স্বাধীন হয়ে যায়। এ সময়ে মুসলমান রাজত্বের তিনটি ভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরে লক্ষণাবতীতে আলি মবারক স্বাধীন নৃপতি। দক্ষিণে সাতগাঁয়ে ও পূর্বে সোনারগাঁয়ে যথাক্রমে ইলিয়াস শাহই মবারক ও ফকরুদ্দিনকে রাজ্যচ্যুত করে সমগ্র রাজ্যটি দখল করেন এবং এক শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করেন ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে।

১৩২৪ খৃষ্টাব্দে তিরহুত ও মিথিলায় মুসলমানশাসন প্রবর্তিত হলেও বহু শক্তিশালী হিন্দুরাজত্ব তখনও অবশিষ্ট ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ইলিয়াস শাহ সেই সুযোগে পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করলেন। তিনি ১৩৪৬ খৃঃ-তে নেপাল আক্রমণ করে বহু ধনসম্পত্তি স্বয়ম্ভূনাথ মন্দির ধ্বংস করে নিয়ে আসেন। তিনি দক্ষিণে উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিচ্চা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অনেক ধনরত্ন নিয়ে ফিরে আসেন।

ইলিয়াসের সময়েই মুর পর্যটক ইবন বতুতা বাংলা ভ্রমণ করেন। সাতগাঁ তখন গংগা-যমুনার সংগমে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর। তিনি নদীপথে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় সবটাই ভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ থেকে এ সময়কার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এ সময়ে খ্রীষ্টে এক বিখ্যাত মুসলমান ফকির

থাকতেন। অনেক অলৌকিক ক্ষমতার তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে বহু ধর্মাস্তর ঘটে। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে মুসলমান প্রাধাত্যের মূলে তাঁর অবদান অবশ্যই স্মরণীয়।

ইবন বতুতার বর্ণনায় জানা যায়, মুসলমান সাধারণ ফকিরদেরও বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁরা বিনা ভাড়া নদীপথে নৌকায় যেতে পারতেন, এমনিতে খাত্ত পেতেন, কোন সহরে ঢুকলে আধ-দিনার (dinar) দিয়ে সম্মানিত করা হত। হিন্দুদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উৎপন্ন অর্ধেক শুধু হিন্দু বলেই তাদের জরিমানা দিতে হত। বাকি অর্ধেক থেকে খাজনা প্রভৃতি দিয়ে সংসার চালাতে হত। অবশ্য ভালই হত এবং সাত টাকার শস্তই সারা বছর সংসার চলতো। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে হিন্দুরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে দিন কাটাতো।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে আজম শাহর মৃত্যু হলে ইলিয়াস শাহী বংশের উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধে। সৈফুদ্দিন, শিহাবুদ্দিন ও আলাউদ্দিন নামতঃ সিংহাসনে বসলেও রাজা গণেশই এ সময়ে রাজক্ষমতা পরিচালনা করতেন।

দিনাজপুরের প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার গণেশ আজম শাহের সময়েই রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন। তাঁর যেমন বিরাট জমিদারী ছিল, তেমনি ছিল এক শক্তিশালী পদাতিক সৈন্যবাহিনী। মঙ্গোলীয় উপজাতিদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত ছিল। তাঁর কর্মক্ষমতা ও ক্ষমতার গুণে তিনি আজম শাহের সভাসদদের পুরোভাগে ছিলেন। নাবালকদের অভিভাবক হিসেবে তিনি প্রথম শাসনকর্ত্ত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যু ঘটলে তিনিই সিংহাসন গ্রহণ করেন।

গণেশ সম্বন্ধে তথ্যাদি যা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই বিকৃত এবং বিদ্বৈষপ্রসূত। এ সকল থেকে যেটুকু উদ্ধার করা যায়, তাতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষে দুশো বছর রাজত্ব করার পরেও তাঁকে হটানো সম্ভবপর ছিল না। জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শরকির কাছে আত্মসমর্পণ মুসলমানদের তরফ থেকে। গণেশ বিপন্নবোধ করে ফকিরদের সংগে রফা করলেন। কলে বড়ছেলে যহু জালালুদ্দিন হলেন এবং বার বছরের এই ছেলেটির অভিভাবক হয়ে “দল্লুজমর্দন দেব” উপাধি নিয়ে গণেশ হিন্দুরাজ্য প্রবর্তন করেন।

জৌনপুরের স্থলতান ইতিমধ্যে আত্মরক্ষায় অগ্রত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধরাজা গণেশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছেলেকে জাতে তুললেন, কিন্তু ছেলে তাঁর মুসলমানিত্ব তুললেন না। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের মৃত্যু হলে হিন্দুরা কিছুকালের জন্য তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু মুসলমানদের সংগে যোগসাজসে জালালুদ্দিনই স্থলতান হন এবং আবার মুসলমান-রাজত্ব ফিরিয়ে আনেন। রাজা গণেশ বেশিদিন বাঁচলে অথবা জালালুদ্দিনের হিন্দুত্ববোধ থাকলে কি হত বলা যায় না। যহু ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং তাঁর ছেলে সামসুদ্দিন আহমদ ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর ইলিয়াস শাহী বংশ আবার ফিরে আসে।

বিরাট যাগযজ্ঞ করে জালালুদ্দিনকে গণেশ হিন্দু করার চেষ্টা করলেও হিন্দুর গোড়ামি তাঁকে হিন্দু বলে গ্রহণ করেনি। নিরপরাধ কিশোরটি হিন্দুর ঘণার দৃষ্টিতে পড়ে মুসলমানিত্বকেই আঁকড়ে থেকেছে। হিন্দুরা যদি ধর্মীয় গোড়ামির বদলে রাজনীতিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে প্রায়শ্চিত্তের

পর তাঁকে হিন্দু বলে বিনা বিধায় গ্রহণ করতো, তাহলে হয়তো বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস একটু ভিন্নরূপ ধরতে পারতো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় রাজা গণেশ সম্বন্ধে অগ্রাঙ্গ হিন্দু জমিদারদের নিষ্পৃহ আচরণ। তখনও বাংলায় বহু শক্তিশালী হিন্দুজমিদার ছিলেন। দক্ষিণে উড়িষ্যার শক্তিশালী হিন্দুরাজত্ব ছিল। তবু গণেশকে জোনপুরের স্থলতানের ভয়ে কাতর হতে হয়। এর দ্বারা তখনকার হিন্দুসম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধ, জাতীয়বোধের অভাবই প্রমাণিত হয়। ইবন বতুতার বর্ণনায় দেখেছি, হিন্দুসম্প্রদায় মোটেই স্বথে ছিল না। অথচ এ স্বযোগ তারা গ্রহণ করেনি। এ প্রসঙ্গে শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতিটির অবস্থা দেখা যেতে পারে।

শেষ অবস্থায় রাজা লক্ষণ সেন নবদ্বীপে বাস করছিলেন। সৈন্তসামন্ত বিশেষ ছিল না। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেঁরা নগরটির ফটকে কয়েকজন সৈনিক থাকতো শুধু আদায়ের জন্ত। নগরে গতিবিধি ছিল অবাধ। জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন, কঙ্কিঅবতারের আবির্ভাব আসন্ন। তখন দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিক। বখতিয়ার তখন বিহারে লুটতরাজ করছিলেন। লোক পাঠানো হলো বখতিয়ারের চেহারাটি দেখে আসার জন্ত। খর্বাকৃতি, দীর্ঘহস্ত বখতিয়ারের সংগে জ্যোতিষীবর্ণিত কঙ্কির চেহারা মিলে গেল। রাজাকে সবাই উপদেশ দিলে পালিয়ে যাবার। রাজা গেলেন না, কিন্তু অনেকে গেল। সম্ভবতঃ এই সময়েই কবি জয়দেব উড়িষ্যার হিন্দুরাজত্বে চলে আসেন। উড়িষ্যা ও বাংলার সংগে কবির একসঙ্গে যোগ এইভাবেই ঘটে। জয়দেব যে লক্ষণ সেনের সভায় ছিলেন তা ইতিহাসসিদ্ধ, অথচ এই ডামাডোলার পর তাঁর অস্তিত্বের আর প্রমাণ মেলে না। ফলে আজ উড়িষ্যাও কবিকে দাবী করেন ওখানকার বলে।

বাইহোক, লক্ষণ সেন পালালেন না, কিন্তু আত্মরক্ষারও কোন ব্যবস্থা করলেন না। ফলে মুষ্টিমেয় সৈন্ত নিয়ে লুটের উদ্দেশ্যে এসে বখতিয়ার বাংলার সিংহাসন দখল করলেন ১২০১ খৃষ্টাব্দে।

রাজা লক্ষণ সেনের নিষ্পৃহভাব প্রজারাও পেয়েছিল। রাজা শশাঙ্কর আমল থেকে দীর্ঘকাল বিদেশীর আক্রমণের পরিচয় বাঙালী পায়নি। রাজা বদল হ'ত, রাজার ধর্ম পাল্টাতো, কিন্তু প্রজার ধর্মে কেউ হাত দিতো না। দুই লোক অবশ্যই ছিল, দরকারমতো রাজা তাদের শাসন করতেন। দেশে সম্পদ ছিল প্রচুর, ফলে খাওয়ার কষ্ট ছিল না। রাজনীতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না বলে ধর্মের শাখাপ্রশাখা দেশবাসীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়। এর ওপর আবার বল্লালসেনী কৌলীন্তের দাপট আরম্ভ হয়েছে। ফলে সামাজিক কলহ-সংঘর্ষের ঝালমশলায় জীবনপ্রবাহ যুদ্ধমন্ড খাতে বয়ে যাচ্ছিল। সমাজে নানা ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়েছে, ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট। ফলে ভারতে বহিরাগত মুসলমান অনেকদিন ঢুকলেও এবং সে খবর কানে এলেও বাঙালীর চেতনা হয়নি। কলির শেষে ধর্মসংগতভাবেই যবনের আবির্ভাব হয়েছে ধরে নিয়ে তারা নির্লিপ্ত ছিল এবং মুসলমান যুগেও বিধির নির্বন্ধ ভেবে নিয়ে তারা জাতীয়তার জালাবোধ করেনি।

ডক্টর সুকুমার সেনের “মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী” গ্রন্থ থেকে তখনকার দৈবনির্ভরতার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রসঙ্গটি শেষ করছি। শত্রুসৈন্য চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে আত্মরক্ষার জন্ত

করণীয় হল—“আগানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সংগে বেটে তুর্কের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহজ্জহি সাহিবেহি

মশানেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং ফটু স্বাহা ।

আর খেত অপরাজিতার মূল ধুতুরা-পাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক একে সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তাহ'লে সেই তুর্কের শব্দ শুনে ‘ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বমৈশ্রবিজয়ঃ’।”

জীবনানন্দের কবিতা ও সেলুলয়েড

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

আজকে যখন চলচ্চিত্রের ভাষা অনেক বিস্তৃত হচ্ছে, ব্যাপকতর হচ্ছে পূর্বকার কয়েক বৎসরের চিরচরিত অভ্যাস ও অধ্যায়ের নির্মোক খুলে বেরিয়ে আসছে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তমানসিকতা, তখন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও ভাবতে হবে বৈকি ?

পূর্বকার বহুবছরের মতন আজকে কী পরিচালক কী দর্শক কেউই নিছক একটি নিটোল গল্পাংশকে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করাকেই শেষলাভের চূড়ান্ত বলে ভাবছেন না। বেশ কিছু দিন ধরেই লক্ষ্য করছি এদেশে যদিও অতি অল্পমাত্রায়, বিদেশে বেশ দ্রুততালে চলচ্চিত্র নির্মাণের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। আজকে পরিচালকের দৃষ্টি চলে গেছে এমন এক আলোর সন্ধানে, যে এ আলো এ আকাশের নয়, এ সমুদ্রের নয়, এ মাটির নয়, যে আলো আছে তাঁরই মগ্ন চৈতন্যের আধারে লীন হয়ে। এ সন্ধান ভালো কী মন্দ, সে আলোচনা অল্পসময় করা যাবে। দোবণীয় যা' তা হলো আজকে চলচ্চিত্রের দিগন্ত ক্রমশই নোতুন নোতুন সম্ভাবনার স্বর্ণশিল্পের প্রাদর্শে উন্মুক্ত হচ্ছে। সেলুলয়েড মুখর প্রাণবন্ত ভাষায় কথা বলছে।

লুমিয়েলের যুগ, তারও পরে শ্রদ্ধেয় মার্কিন পরিচালক ডি. ডব্লিউ গ্রিফিথের যুগ পিছনে ফেলে আজকে আরও অনেক ধাপ এগিয়ে এসেছে চলচ্চিত্র। কিন্তু গল্পবলার চিরচরিত রীতির হেরফের খুব একটা হয়েছে কী? আখ্যানভাগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু চিত্রকল্প ও মুভের ব্যবহারে একটি গোটা ছবি হয়েছে কী? আমার জানা নেই। হয়তো সন্ধানীরা আরও অনেক খবর দিতে পারবেন। অথচ আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আখ্যানভাগকে গুরুত্ব না দিয়েও উন্নত ধরনের ছবি নির্মাণ করা যেতে পারে। এবারে আমাদের একটু পিছনে ফিরতে হবে তাহলে। নির্বাক যুগের ছবিগুলোর কথা স্মরণ করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ অন্ততম পরিচালক জীসত্যজিৎ রায়ের কথায় বলছি—“অনেক সময়েই দেখা গেছে যে ছবি যদি সাংগীতিকগুণে (অর্থাৎ ছন্দ, গতি, কন্ট্রাস্ট ইত্যাদি গুণে) বিশেষ সমৃদ্ধ হয়, তাহলে সে গুণ বিষয়বস্তুর মামুলিত্ব ছাপিয়ে শিল্পের স্তরে উন্নত হতে পারে”।

তাহলেই কথা হচ্ছে “সাংগীতিকগুণের সমৃদ্ধি।” এবং এইটিই আসল। রেনোয়া ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স Le Refle du Jeu বলে যে প্রখ্যাত ছবিটি তুলেছিলেন তাতে তথাকথিত আখ্যানভাগ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তাসত্ত্বেও সে ছবি ইতিহাস হতে কোন অস্ববিধে হয় নি। জাপানি পরিচালক কুরোসাবায়া, ইয়ামুজিরো ওজু ইত্যাদিরা যে সব ছবি নির্মাণ করেছেন তাতেও এমনই এক প্রত্যয় গড়ে ওঠে। উদাহরণটি আরও হয়তো বাড়ানো যায়। কিন্তু তাতে লাভ কি? আসল কথা যা বলতে হচ্ছে তা হলো সাংগীতিক গুণের সমৃদ্ধিতেই চলচ্চিত্রও মহৎ শিল্পের পর্যায়ে উন্নত হতে পারে। এবং তারজন্য যথার্থ সন্ধান দরকার।

জালুক গদার বলেছেন—“চলচ্চিত্রের মধ্যে সবকিছুকেই আনতে হবে”। তিনি তা

এনেছেন এবং সফলও হয়েছেন। তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য বলে মেনেই এবং তাঁর আপন সৃষ্টির বিশ্বয়কর কৃতিত্বের দিকে দৃকপাত করেই বলছি আজকে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জীবনানন্দ দাশের কবিতাকেও সেলুলয়েডে বিধৃত করবার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এবং তাতে আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হয়তো একটি নোতুন অধ্যায়ের সূচনাও হতে পারে।

বলাইবাছল্য আমার এ রচনার বেশ কিছুদিন পূর্বেই এ ব্যাপারে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশ্রিত তরুণ লেখক শ্রীতপনদেব বসু।

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক পত্রিকার গ্রীষ্ম-বর্ষা ৩য় বর্ষ ১৩৭৫। যুগ্ম সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন—“টুকরো টুকরো চিত্রকল্প পাশাপাশি রেখে আমরা বক্তব্য প্রকাশে সমর্থ। পরিচালক যদি দর্শককে উচ্চস্তরের রস পরিবেশনে সচেষ্ট হন তবে কবি কল্পিত মিশরের মাহুঘীর বৃকের মূর্ত্তোর চিত্রকল্প পরিস্ফুটন করা না করা তার সম্যক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করতে হবে।”

টুকরো টুকরো চিত্রকল্প পাশাপাশি রেখে বক্তব্য যে প্রকাশ করা যায় তার উল্লেখ তিনি ব্যঞ্জনময় ছবি “আউ হাসটি দি বালয়াজারের” কথা সেখানে বলেছেন। শ্রীতপনদেব তাঁর আলোচনার অতি সামান্য পরিসরেই কবি জীবনানন্দের “শিকার” কবিতাটির প্রসঙ্গ তুলেছেন। কবিতাটিতে আছে স্নন্দর প্রকৃতির পরিবেশে প্রখর সতর্কতার সঙ্গে একটি স্নন্দর বাদামী হরিণের বাঁচার প্রয়াস। সব প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক আক্রমণের হাত যদিও বা সে এড়াতে পারে কিন্তু মাহুঘের লোলুপতার কাছে তাকে অবধারিত মৃত্যু বরণ করতেই হলো। কিন্তু সাংকেতিকতার দ্বারা কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পূর্ণ পরিণতির দৃশ্যটি এভাবে ফুটিয়েছেন—

একটা অভূত শব্দ

নদীর জল মচকা ফুলের মতন লাগ।

আগুন জগল আবার—উফলাল হরিণের মাংস

তৈরী হয়ে এল।

নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোন

শিশির ভেজা গন্ধ

সিগারেটের ধোঁয়া

টেরিকাটা কয়েকটি মাহুঘের মাথা

এলোমেলো কয়েকটি বন্দুক—নিষ্পন্দনিরপরাধ ঘুম।

শ্রীতপনদেব বলেছেন এককবিতাটিকে সেলুলয়েডে রূপ দিতে বোলে আমরা বিশেষভাবে মস্তাজের সাহায্য নিতে পারি। শ্রীতপনদেবের কথার সমর্থনে বলা যেতে পারে যে আইজেনষ্টাইন এই মস্তাজের ব্যবহারে চলচ্চিত্রের ভাষাকে কত স্নন্দর, কত সাবলীল করে তুলেছিলেন।

বক্তব্য ঋজু হলেও তার যদি প্রকাশে স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা থাকে তবে তা কাব্যমাধ্যমে অভিব্যক্ত হলেও সেলুলয়েডে নতুন আঙ্গিকে তা প্রকাশিত হতে পারে। প্যালোসিনির মতে চলচ্চিত্রের ভাষা তো কাব্যভাষা।

আর তাই যদি হয় তবে জীবনানন্দের কবিতাতেই তার সমূহ নিকট সীমাবদ্ধ।

কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সাফল্যের উপাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা যার তার কর্ম নয়। প্রসঙ্গতঃ আমি শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী নির্মিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা “দেবতার গ্রাস” ছবিটির কথা বলছি। শ্রীচৌধুরী এই আখ্যানমূলক কবিতাটিকেও অবলীলায় মাঠে মেরেছেন। তিনি বড় বেশি সম্ভায় বাজী মাং করতে চান কিংবা এই ছবির ব্যাপারে তা চেয়েছেন। আসলে দীক্ষিতের মন বা মনন না থাকলে কাব্যকে সেলুলয়েডে ধরা অসম্ভব হয়েই পড়ে। তখন কাব্যের আত্মাকে ছেড়ে দেহকে নিয়েই চলে কাড়াকাড়ি এবং ছবি নির্মিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা’ পায় না মহতের মর্যাদা। রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠকবি জীবনানন্দ। তাঁর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “চিত্ররূপময়”। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর চিত্রগুলিকে বর্ণবহুল বলেছেন।

তাহলেই প্রশ্ন হচ্ছে চলচ্চিত্রে আমরা কি চাই? ঘটনাকে চিত্ররূপের মধ্যেই বর্ণবহুল করে পেতে চাই।

জীবনানন্দের কবিতায় এই বর্ণবহুল চিত্ররূপময় ঘটনার সন্নিবেশ এত বেশিভাবে বিদ্যমান যে তাকে কোন চলচ্চিত্রের বিষয়রূপে ভাবাটাকে আমাদের স্বভাবতই কোন কষ্ট বুলনা বলে মনে হয় না। যেমন ধরা যাক নীচের এই পংক্তিগুলোকে—

আর উত্তল বাতাস এসেছে আকাশে বুক থেকে নেমে
আমার জানার ভিতরে শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎপ্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো !
হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেণ্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে
দিগন্ত প্রাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আভ্রাণে,
মিলনোন্মোক্ত বাগিখর নির্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল
বিরিট সজীব কোমল উচ্ছ্বাসে,
জীবনের হৃদাস্ত নীল মত্ততায় !
আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে ক্ষীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটি দূরদৃষ্টির মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা ছরস্তু শকুনের মতো ॥

উল্লিখিত চিত্র কথাটিকে সেলুলয়েডে বিধৃত করা শক্ত ব্যাপার নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এখানে সিম্বোল ব্যবহার করতে হবে। যেমন এখানে হৃদয় বস্তুটিকে কোন পরিচিত বিষয়ে চিত্র দিয়ে বোঝানো যাবে না। তারজন্ত প্রয়োজন হবে স্বভাবতই কোন স্থানিবাচিত সিম্বোলের। এখন কি ধরণের সিম্বোল ব্যবহৃত হবে তা অবশ্যই চিত্র পরিচালক ঠিক করবেন। কিন্তু সমগ্র চিত্রটিকে একটি লিরিক্যাল অর্থাৎ সাংগীতিক মুহূর্তে যে দান করতেই হবে, সে বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

জীবনানন্দের কবিতার আরও দৃষ্টবহুল চিত্রকল্প লক্ষ্য করা যায়।

যেমন— পৌঁচার ধূসর পাথর উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলমাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আছানো

বুনো হাঁস মাথা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দগুলি তার ;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাদের ক্ষিপ্র ডানা বাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা ।

তার পরে পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ
হাঁসের গায়ের ভ্রাণ—ছ একটা কল্লনার হাঁস

সমগ্র বিষয়টিই সেলুলয়েডে স্থন্দর করে ধরা যেতে পারে । এখানে একসঙ্গে শব্দ, আলো, ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহারের এক অপূর্ব স্বযোগ রয়েছে । তারপর প্রতিটি চিত্রনির্মিতার বা আকর্ষণীয় বিষয় ‘ডিটেল’—তাও এখানে স্থন্দররূপে বিদ্যমান । সমগ্র দৃশ্যপটটি পরিশেষের এই বক্তব্যটি—

মনেপড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অন্ধনিমা সান্ধ্যালের মুখ,
উড়ুক, উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

প্রকৃতির পটভূমিকার একটি নিবিড় ‘শব্দ’ ধরা যেতে পারে । প্রসঙ্গতঃ এই ধরণের সটে যে কত নিপুণতা দেখানো যেতে পারে সম্প্রতি যারা যুগাল সেনের “ভুবন সোম” দেখেছেন তাঁরাই তা’ একবাক্যে স্বীকার করবেন ।

তারপর মনে করা যাক শঙ্খমালা কবিতার এই অংশটুকু—

কাস্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমাতে চাই :
বেতের কলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে সে সে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমাতে সেইখানে—
ধূসর পৌঁচার মতো ডানা মেলে অজ্রাণের অঙ্ককারে
ধানসিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনাল সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে

তোমাতে খুঁজেছি আমি নির্জন পৌঁচার মতো প্রাণে ।

এখানে মাঝে মাঝে লঙসট, তারপর মিক্চার তারপর ক্রোজআপ ইত্যাদির স্থন্দর সমাবেশ ঘটিয়ে একটি প্রায় পরিপূর্ণ নিকোয়েন্স তৈরী করা সম্ভব বলে মনে হয় । তারপর ঐ একই কবিতায়

বিবর্ণ পাখির রক্তে ভরা দেহ, বাঁকা চাঁদ—শিঙের মতন বাঁকা, কড়ির মতন শাদামুখ, হিম হাত, হিঙ্গল কাঠের রঙিন চিতার মতন চোখ, করুণ শব্দের মত হৃদে আর্দ্র স্তন ইত্যাদি প্রতিটি বস্তু চলচ্চিত্রের ক্যানভাসে সুন্দররূপে ধরা যেতে পারে। অবশ্য এই বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়রস দানা বাঁধানোর কাজ হলো ক্যামেরাম্যানের। তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে রসিয়ে বলার চরম দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সিনেমার ভাষা হলো প্রধানতঃ এই ক্যামেরারই ভাষা।

নগ্ননির্জন হাত কবিতাটির এই অংশটুকু—

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
হুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের দলের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাঁচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন শুষ্কতা ও বিষ্ময়।
পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বপ্ন,
রক্তিম সেলামে তরমুজ মদ।
তোমার নগ্ন নির্জন হাত,
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

এই বিষয়টিকে সেলুলয়েডে বিধৃত করতে হলে একটি নৈব্যক্তিক, নিরাবেগ আর মননশীল দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত বিষয়টি পূর্ববেক্ষণ করতে হবে। এখানে ক্লোজআপের চেয়ে মিডসট ও সংঘসটের ব্যবহার বেশি করলে মনে হয় একটি সুন্দর ছবি নির্মিত হবে।

শেষ করলে দেখা যাবে এই সমস্ত কাব্যংশটিতে মনের একটি গতিই বিধৃত। যে গতিতে মন অতীতের কব পরিক্রমা করেছে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় ট্র্যাকিং সট নিলে ভালো হয়। কারণ এখানে গল্পাংশ বলতে তেমন কিছু নেই। মনের অতীত প্রয়াসই এখানে লক্ষ্য। তবে ট্র্যাকিংসট বেলেও খুব দ্রুততালে নয়, ক্যামেরাকে একটু ধুঁথই করে দিতে হবে এক্ষেত্রে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে দোভঙ্কেঙ্কো আমাদের আদর্শ হতে পারেন কারণ তাঁরই ছবিতে চিত্রগুণও কাব্যময়তার এক স্বাভাবিক মিশ্রণ হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতার এমন হাজারও অংশ তুলে দেখানো যায় চলচ্চিত্র সম্ভাবনায় প্রসঙ্গ। বেড়াল কবিতাটিতে চলচ্চিত্রের বিশেষ সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। পরিশেষে যেখানে কবি লিখেছেন :

তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো খাবা দিয়ে লুফে আনলো সে ছড়িয়ে দিল সমস্ত পৃথিবীর ভিতর।

সেখানে “ফ্রিজ”এর ব্যবহার কার্যকরী বলে মনে হয়। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কি ব্যবহার করলে দৃষ্টটি আরও হৃদয়গ্রাহী, আরও স্পষ্ট হবে তা’ বিশেষজ্ঞরাই ভেবে দেখবেন।

জীবনানন্দের কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তথাপি বর্ণনা বহুল ও চিত্রবহুল তাঁর কাব্যাংশের বহুবিধ উপকরণই চলচ্চিত্রের উপাদান হতে পারে। “দুজন” কবিতাটিকে নিয়ে আমার মনে হয় একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের অনাবিল ছবি হয়তো হতে পারে। “আমাকে ভূমি” কবিতাটিও ছবির উপকরণ হিসেবে মন্দ নয়। এখানে বহুলাংশে স্বপার ইম্পোজিশানের স্বযোগ রয়েছে ক্যামেরাম্যানের হাতে।

গোদার তাঁর ছবিতে নানান বিষয়ের মতন আধুনিক কাব্যকেও স্থান করে দিয়েছেন। আধুনিক কাব্যের মধ্যে রিয়ালিটি সম্পর্কে যে একটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে তাইই হয়তো গোদারকে বড় বেশি আকর্ষণ করে থাকে।

জীবনানন্দ আধুনিক কবি। তাঁর কাব্যের রিয়ালিটিবোধ অসামান্য অথচ তাঁর কাব্যের রোমান্টিক মেজাজও আমাদের মনকে দোলা দেয় বড় কম নয়। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটির মধ্যে কবির যে চেতনা ও আবেগ সমৃদ্ধ হয়েছে তা-ও কোন ক্ষমতাবান চিত্রনির্ধেতার হাতে একটি মহৎ ছবির রূপ নিতে পারে বলেই আমার ধারণা। “অভ্রাণের প্রান্তরে” আরেকটি আশ্চর্য চলচ্চিত্র সম্ভাবনাময় কবিতা। হয়তো আরও অনেক দৃষ্টান্তই তোলা যেতে পারে। যেখানে নিম্নলিখিত এই চিত্রকল্পটির মতন আরও সমৃদ্ধ চিত্রকল্পের অনুসন্ধান কষ্টকর নয়—

...হেঁটে চলি...আজ কোনো কথা

নেই আর আমাদের ; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে ; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে ; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুড়ি চূলে বেঁধে গিয়ে নড়ে চড়ে ;
পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জলতানাশ
আলোয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কি রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায় ; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন ;—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
সেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—তাই-ই ঠিক ;—ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বুঝ নিজ বিকাশে নীরব।

লোকদেবতা ও লোকসাহিত্য

অজিতকুমার মিত্র

পল্লী অঞ্চলে সাতটি দেবী ভগ্নি অল্পমত শ্রেণী পূজিত; শাস্ত্রীয় সপ্ত-মাতৃকা থেকে এসেছে নাকি। এই মতের সমর্থনে বলা যায় যে, বাংলাদেশে, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে যে সাতটি লৌকিক দেবীদের পূজা প্রচলিত আছে সেই সব অঞ্চলে সপ্তমাতৃকা পূজার প্রাধান্য ছিল। ইন্দ্রাণী বারাহি প্রভৃতি মূর্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। খৃষ্টানদের মধ্যেও এমন সাত ভগ্নির পূজার কথা জানা যায়। মুসলমানরা ওলাবিবি, মতিবিবি ইত্যাদি সাত বোনের কথা বলেন। দক্ষিণ ভারতের মীণাক্ষি ও তার ছয় বোনের রূপ কল্পিত হয়। কোথাও বা বাস্থলী, রংকিনী ইত্যাদি ছয় ভগ্নির কথা জানতে পারা যায়। অনেক পণ্ডিত বলেন, বৌদ্ধ সহজ যান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের অনেক নারী ধর্মচারিণী ডাকিনী যোগিনী তন্ত্রসাধিকা সপ্ত দেবীরূপে কল্পিত ও পূজিত হত। (১)

বীরভূমের নানা স্থানে সাতবোন পূজার প্রচলন দেখা যায়। মূর্শিদাবাদ, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগণার (বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চল হিসাবে) পাথরচণ্ডী, পায়রাচণ্ডী, বাঘরাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, বারাইচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, সোনাইচণ্ডী প্রভৃতি লোকদেবী জংগলময় পরিবেশে পূজিত হতো বা এখনও তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও বিলুপ্ত হয়নি। এ সব ও ঐ সাত বোনেরই প্রকারভেদ। বীরভূমের অনেক গ্রামে আবার দেখা যায় মনসারা সাত বোন পাশাপাশি সপ্তবিগ্রহরূপে পূজিত। আবার মনসা, শীতলা এমনভাবে সাতটি ব্যাধি নিরাময়ের দেবতার রূপও পরিকল্পিত দেখা যায়। তাই জানা যায় যে, অ-আর্য্য জীবনধারা থেকে ভয়, আপদ, বিপদ, সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বহু দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল। অনেক সময় এক একটি দেবীকে এক একটি রোগের অধিষ্ঠাত্রীও বলা হতো। এইভাবে উপাস্তা দেবীর পরিকল্পনা লৌকিক ধর্ম জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং কালে কালে তা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জীবনধারায় পরিশ্ফুটলাভ করে। কিন্তু এগুলি মূলতঃ অ-আর্য্য দেবতা—মাহুঘের দেবতা। মাহুঘের জীবনে বাঁচার প্রয়োজন হতেই সেই প্রথম যুগে এই সব দেবতাগুলির সৃষ্টি হয়। তারপর যুগের প্রয়োজনে যুগে যুগে তার মধ্যে সেই কালের ধারা ও ধারণা সঞ্চারিত হয়। অনেক সময় এই দেবতাগুলিকে নির্ভেজাল হিন্দু দেবতা বলেও কথিত হয়। কিন্তু আসলে এরা আদি মাহুঘের দেবতা তাই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বা অন্যত্র বহু জাতির মধ্যে এই সব নারীদেবতার রূপ দাবি কল্পিত হয়। কিন্তু মাহুঘ চিরকালই আদিম মাহুঘের মতই ব্যাধি ও প্রকৃতির অকরণতার কাছে দুর্বল। তাই এই শক্তি দেবীর কাছে চিরকাল রূপাপ্রার্থী। সেইজন্য এই সব দেবতাগুলি উত্তরোত্তর স্থপরিকল্পিত হয়েছে। তবুও এদের অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন হয়নি। স্থানবিশেষে, যুগ বিশেষে, দেশ বিশেষে এদের আকৃতি প্রকৃতি ও পূজা পদ্ধতির প্রকারভেদ হয়েছে মাত্র। মানবীয় ভয়, দুর্বলতা, ব্যাধি যেমন মাহুঘ কোনদিন জয় করতে পারবে না তাই এই দেবতার

ক্ষমতা সম্পর্কে কোনদিন মানুষ সন্দেহ হতে পারবে না। নানাভাবে, নানারূপে, তা মানুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। কোন ভাবেই তা লয় হয়ে যাবে না। কেন না দেবী মায়ের পরিকল্পনাও সেইজন্ম। অসহায় শিশু মায়ের কাছ হতেই প্রথমে রক্ষা পেয়েছিল। যন্ত্রণার উপশম পেয়েছিল মায়ের সেবার। তাই মনে হয়, মায়ের রূপে দেবীর প্রথম পরিকল্পনা অ-আর্য্য জনজীবনে একান্ত অবলম্বনীয় হয়ে ওঠে। সুশিক্ষিত আর্য্যগণ প্রথম পুরুষ দেবতার পরিকল্পনা করে। নারী দেবতার পরিকল্পনা করে মানুষ প্রথম ভয় ও বিপদ নিবারণের জন্ম। পুরুষ দেবতা পরিকল্পিত হয় আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্ম। পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারার ব্যত্যয় দেখিনা। (২)

তাই নারী দেবতার কাছে মানুষ ঐহিক সুখ-শান্তি, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে। কামনা করে সন্তানদের সুখে থাকার জন্ম। আদিম মানুষের কল্পনায় পারত্রিক কল্যাণ কামনা ধারণার মধ্যে আসেনি। জীব আর পৃথিবীই ছিল। একমাত্র পৃথিবীকে নির্বিলে ভোগ করার কামনা তাই পরিস্ফুটি লাভ করে। ভালভাবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর ভাল থাকার দুর্ভাবনাতে বাংলার দর্শন তৈরী হয়নি। ভাল করে বাঁচার জন্ম সাধনাই বাংলার প্রকৃত জীবনদর্শন। ক্ষমা, দয়া, মমতায় ঘেরা গার্হস্থ্য ধর্মই এই জীবনের ভিত্তিভূমি। (৩) তাই বাঙালীর জাতীয় জীবনে শংকরের কটুর অদ্বৈতবাদ শুধুমাত্র মোহমদগরের লগুড় চালিয়েছে এ কথা কেউ বলতে পারবে না। শংকরের অদ্বৈতবাদ বাঙালীর জাতীয় ভাবরসে জারিত হল অন্তর্গত মানসলোকে নবধর্মের বন্না বইয়ে দেয়। তাই জাতীয়তা বিকাশের জন্ম কত কত মানুষ বাংলার নব-ভাবের জোয়ার নব ভগীরথের সংঘনিদানে যে মহাভাবের সাগর সংগম সৃষ্টি করে তা যুগ যুগ ধরে বাঙালীকে অমর করে রাখে। এ জাতির মৃত্যু নেই। (৪)

তাই আদি বাঙালী জাতির ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-কল্পনাকে কোনদিন মানুষ ত্যাগ করতে পারেনি। আর্য্য জীবন-ধারা বিশাল জন-গোষ্ঠীকে কুক্ষিগত করবার জন্ম এইসব ধারণা-বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। অপরপক্ষে বাঙালীর জাতীয় মানসিকতা আর্য্যজীবনধারার প্রভাবে প্রভাবিত হলেও আপন বিশিষ্টতা হারাতে চায়নি। তা'ছাড়া এই দেবীর কল্পনা যে আদি পুরুষের ধারণাপ্রসূত তার অনেক নজীর পাওয়া যায়। যেমন অনেক সময় এই দেবীর কাছে বনশূকর বলির প্রথা আছে। অনেক সময় জংগলের মাঝে পাথরের স্তূপে এইসব দেবীর পূজা হয়। কখনও বা দেখা যায় শূর্ণ থাকে এইসব দেবীর মাথায়। শূর্ণ কৃষিজীবী মানুষের হাতের হাতিয়ার। (৫) শস্ত বাড়াইয়ের একান্ত অবলম্বন। তাই কৃষিজীবী জীবনের বিকাশের প্রথম সময় এইসব দেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এ কথা অসংগত নাও হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় ঝাঁটা এইসব দেবতার হাতের হাতিয়ার আদিম মানুষের চিকিৎসা প্রকৃতিতে যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল। এই যন্ত্র পড়ার সময় রোগী বা রোগিনীর গায়ে ঝাঁটার চালনা করা বিশেষ রীতি! অনেক সময় “ঝাঁটা করিয়া বিষ ঝাড়ে তিনবার।” কখনও বা নানা প্রকার দোষ ও অপদেবতার প্রভাব হতে মুক্তি পেতে ঝাঁটার কাঠি নানাপ্রকার উপকরণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। তুফতাক ঝাড়া-ফুকের আমলে জংগলের দেবতা ওস্তাদ-গুণীনের বিশেষ সহায়ক ছিল। এইসব দেবীদের গর্দভ প্রভৃতি বিচিত্র বাহন ও পূজাপদ্ধতির বিচিত্রতা অনেক সময় এই দেবতাগুলিকে অ-আর্য্য

জীবনধারা হতে এসেছে তার সপক্ষে বিশেষ যুক্তির অবতারণা করে। কেন না প্রথম মাহুস বিন্মিত হতে পারলেই দেবীর প্রতি আকৃষ্ট বেনী হতো; তাই এইভাবে রূপ কল্পনা। পূজা পদ্ধতির মধ্যেও নানা প্রকার বিচিত্র রীতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেন মহাশয় তাঁর Folk Literature of Bengal পুস্তকে লিখেছেন : Chandi the goddess, as daughter of a Hadi, “হাড়ির বি চণ্ডী মা” is a familiar line which occurs often the Colophon. We know the Hadis, on olden times, used to perform priestly functions in some of the Kali temples, and they even do so now in some parts of Bengal. [Folk Literature of Bengal ২০-২১ পৃষ্ঠা] বাংলাদেশের বহুস্থানে ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও স্বমত প্রচারের প্রয়াস অনেক সময় এইসব দেবতাদের পূজা ও ভক্তি প্রসার সহায়তা করে। এমনি ছোট ছোট আরও অনেক দেবতা আছে যাদের নাম জানা যায় না “Their names are unknown an non-sanskrit, and the mode of their worship is strange.” (Folk Literature of Bengal ২৪৩ পৃষ্ঠা) (৬)

এই সব দেবতাদের পূজা প্রসার ও ভক্তি উৎস্রেক মানসে নানা প্রকার দেবী মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গল্প-কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। অনেক সময় আবার এই দেবীদের মাহাত্ম্যকথা উপজীব্য করে নানা প্রকার গাথা গীতিকা রচিত ও লোকমুখে গীত হতো। মাহাত্ম্যকথা শুনতো জনসাধারণ। লোকশিক্ষা প্রচার হতো ধর্মাভাবের প্রসার হতো। কিন্তু বীরভূম জেলায় কতকগুলো চণ্ডী-পূজা একস্মত্রে এক উপাখ্যানের মধ্যে এমনভাবে মাহাত্ম্যকথা বিধৃত দেখা যায় যা’ অতীব চমকপ্রদ। এই চণ্ডীদেবী যে সত্যই বাঙালীর আদি অধিবাসীদের দ্বারা পরিকল্পিত ও পূজিত হতো তা’ ধারণা করা অসংগত হবে না। বীরভূম জেলার খয়রাসোল থানার পারামুণ্ডী গ্রামের পায়রাচণ্ডী, দ্বারাজপুৰ থানার বউতরা গ্রামের বাঘরাইচণ্ডী, রাজনগর থানায় শউরী হ’তে আম্জোড়া যাবার রাস্তার ধারে জংগলময় পরিবেশে বারাহিচণ্ডী আর চোরমুড়া গ্রামের দক্ষিণে জংগলের মধ্যে সোনাইচণ্ডী একই ধারণা-বিশ্বাস থেকে এসেছিল তা কল্পনা করা অসংগত নয়। প্রত্যেকটি দেবতাই জংগলময় পরিবেশে পূজিত হয়। ফুলুরা-কালকেতুর লোক-প্রচলিত কাহিনী এবং বেহলা-লখীন্দরের কাহিনী যেমন কবিকঙ্কণ আর কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ ও বিহুপাল প্রভৃতির গাথা কবিতায় বাঙলার জাতীয় কাব্যের রূপ পায় তেমনি এই সব লোক দেবতাব নামে বহু প্রচলিত কথা কাহিনী অনেক সময় স্বভাবকবিদের দ্বারা গাথা গীতিকায় ছন্দবদ্ধ হয়ে মাহাত্ম্যকথা বিস্তার করে আসছে যুগ যুগ ধরে। বর্তমান যুগ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের ভিত্তি-মূল স্তম্ভ হয়ে আসায় এই সব গাথা গীতিকাগুলি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। লোকদেবতা লোক-কথা-গাথা গীতিকায় বিচিত্র ধর্মের দ্বারা প্রবাহিত করেছে যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে। এই সব ইহকালে সুখ-ঐশ্বর্য বিধানের দেবতা মানুষের কাছে পূজা পেয়েছে নিরতিশয় আগ্রহে। বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা এই দেবতাগুলি লৌকিক উপাখ্যানের সম-স্মত্রে গাঁথা। হয়তো আদিম মানুষের প্রচলিত ধারণা কল্পনা লোকমুখে অস্তিত্ব বজায় রেখে আসতে আসতে অনেক সময় হিন্দু দেবতার প্রভাব হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ বলে কীর্তিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

হয়তো বিপন্ন-অস্তিত্ব এই সব দেবতাগুলি বাঙালীর দেবতা। বাংলার জল হাওয়ায় দেশীয় মানুষের বিশ্বাস ধ্যান-ধারণা স্বথ-দুঃখ আশা আকাংখা, কামনা, বাসনা এই সব দেবীর পূজা পত্তন করে। বরং বিশাল জন-গোষ্ঠীকে কুক্ষিগত করে নিতে এই সব দেবতাদের আর্থ-দেবতার টিকিট এঁটে দেওয়া হয় তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রয়োজনে সংস্কৃত মন্ত্র রচিত হয়। কিন্তু অল্পমত শ্রেণী পূজিত এই সব দেবতার বাঙালী মন্ত্রে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে পূজিত হয়ে থাকে। এই সব বাংলা মন্ত্রের স্ত্রেই কোন বিশ্বতকাল হ'তে বাংলাদেশে এই মন্ত্রের প্রচলন হয়। এই মন্ত্রের সংগে শেকড়-বাকর জড়ি-বুড়ি প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস আকর্ষণ করেছিল। এই পূজাগুলি সাধারণতঃ পয়লা মাঘ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় এক দিনের মেলা হয় অনেক জায়গায়। এখন ব্রাহ্মণ পূজারীই পূজা করে থাকে। হয়তো পূজার আসরে জংগল গান গীত হতো। এখন এই রেওয়াজ একেবারেই বন্ধ হতে চলেছে।

কিন্তু এই সব লোক-সাহিত্য একদিন জনতা-সাধারণের মনের খোরাক যুগিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। অনেক সময় এই সব গাথা গীতিকার মধ্যে সমাজের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের ধারণা বিশ্বাস ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা এই সব গাথা গীতিকার মধ্যে বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ এই সব উপাখ্যানগুলি বাংলার মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে লোকমুখে রচিত হয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাই এই গানে অনেক সময় সমাজমনের সর্বৈব প্রতিফলন সামাজিক মানুষের কাছে এই সব সাহিত্যকে অতি প্রিয় করে রাখে। আজ মানুষের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে তাই এই সব গাথা গীতিকাগুলি অবলুপ্তির পথে। বীরভূম জেলার লোকমুখে সংগৃহীত এমনি একটি উপাখ্যান চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য কথা প্রচারমূলক গাথা-গীতিকায় ছন্দ-বন্ধো।*

শুন শুন সর্বজন করি নিবেদন।

চণ্ডিকা-মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন ॥

মায়ে ভজ মায়ে পূজ মায়ে কর সার।

মায়ের প্রসাদে হবে বিপদে উদ্ধার ॥

ধনহীনে ধন পাবে ঘুচিবে দারিদ্র্য।

রাজ্যহীনে রাজ্যপাবে পুত্রহীনে পুত্র ॥

দাসত্ব ঘুচিয়া যাবে প্রভুত্ব পাইবে।

মায়ের অপার লীলা কে তাহা বুঝিবে ॥

এই চণ্ডিকা মাহাত্ম্যে সব পাওয়াই ঐহিক। সাধারণ মানুষের কাছে পারত্রিক কল্যাণ কামনা নিরর্থক চিরদিন। তাই লোক সাহিত্যে জনতা সাধারণের বাসনা কামনা ভয় ভক্তি স্নেহ প্রীতি জলজল করে ওঠে। তাই এ সাহিত্য সাধারণ মানুষের সাহিত্য। এইসব গীতিকায় জনতা-জীবনের অনুভূতির স্বতঃ প্রকাশ এই সাহিত্যিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রেখেছে। অনেক সময় দেখা যায় নানা প্রতিকূলতায় কবিতারূপ হারিয়ে যায় আবার গ্রাম্য কবির কল্পনা চাতুর্যে ও ভাবার কারুকারিতায় অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

চন্দ্রশমীর মায়াবতী নামে স্ত্রী অতি সাধী পতি প্রাণা। অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী।

মায়াবতী স্বামী সহ করয়ে সংসার ।

কিছুদিন পরে হইল গর্ভের সঞ্চার ॥

এমন সময় একজন গণংকার এসে চন্দ্রশর্মাকে বললো, এই গর্ভে তোমার যে সন্তান হবে সেই সন্তানের মুখ দর্শন করলে তোমার মৃত্যু হবে। এখন তোমার যথা কর্তব্য পালন কর।—বলে গণংকার চলে গেল। এই সব কথা শুনে চন্দ্রশর্মা বিচলিত হলো এবং স্ত্রী মায়াবতীর কাছে গিয়ে সব কথা বলেলো।

হেরিলে তনয় তব আমার মরণ ।

আচার্য কহিল ইহা না হবে খণ্ডন ॥

অতএব পুত্র যেই প্রসব হইবে ।

গলায় টিপিয়া তারে সংহার করিবে ॥

ধাত্রী দ্বারা মরা শিশু ফেলাবে স্থানে ।

মোর এই কথা যেন থাকে তব মনে ॥

এত বলি ব্রাহ্মণ বাহির চলি গেল ।

ব্রাহ্মণ মহিষী গৃহে কান্দিতে লাগিল ॥

তবে কিছুদিন পরে সতী মায়াবতী ।

পুত্র এক প্রসবিয়া চিন্তাশ্রিত অতি ॥

কি করিব কোথা যাব ভাবে মনে মন ।

হেনকালে ধাত্রী আসি দিলা দরশন ॥

কহিল কেন মা তব চিন্তাশ্রিত মন ।

মায়াবতী কহে শুন করি নিবেদন ॥

আচার্য বলেছে পুত্র করিলে দর্শন ।

মরিবে ব্রাহ্মণ মোর না হবে খণ্ডন ॥

অতএব ব্রাহ্মণেরে বাঁচাতে হইলে ।

বধিতে হইবে পুত্রে চাপদিয়া গলে ॥

সে কারণে চিন্তাশ্রিত হইয়াছি আমি ।

কি করিব কোথা যাব কহ দেখি তুমি ॥

ধাত্রী কহে কোন চিন্তা না করহ মায়া ।

পুত্র মোর কোলে দাও কিছু ধন দিয়া ॥

পুত্র লয়ে চলে যায় রাত্ৰ নগরেতে ।

কোন চিন্তা না করহ থাকহ গৃহেতে ॥

ধাত্রী কথা মত কর্ম ব্রাহ্মণী করিল ।

ধন পুত্র লয়ে ধাত্রী রাঢ়ে চলে গেল ॥

কিছুক্ষণ পরে যায়া দিল সমাচার ।

মৃত-পুত্র হয়েছিল গর্ভেতে আমার ॥
 বিশ্বাস হইল তাহা বিপ্লবের নন্দনে ।
 গৃহকর্মে চলি গেলা আনন্দিত মনে ॥
 কতদিন পরে এই গুপ্ত সমাচার ।
 প্রকাশ হইল সেই গোড় মাঝার ॥
 ব্রাহ্মণের কানে সেই কথা পৌঁছিল ।
 তেলে আর বেগুণে যেন জলিতে লাগিল ।
 ক্রোধেতে মায়েরে কত করিল গঞ্জনা ।
 মারপিট করে কত কত যে লাঞ্ছনা ॥
 ক্রোধেতে মায়ায়ে লইয়া রাঢ় দেশে ।
 বিক্রয় করিলা তারে বিষ্ণুশর্মা পাশে ॥
 দাসীপনা করে মায়া বিষ্ণুশর্মা ঘরে ।
 স্বামীত্যাগী পুত্রহীনা ব্যথিত অন্তরে ॥
 এ দিকেতে ধাত্রী লইয়া ব্রাহ্মণ নন্দনে ।
 রাঢ় দেশে বাস করে অতীব গোপনে ॥
 দিনে দিনে বাড়ি শিশু কেহই না জানে ।
 দেবীদাস বলি বিপ্র ডাকয়ে নন্দনে ॥
 দেবীদাস হইল যবে দ্বাদশ বৎসর ।
 সেইদিন ধাত্রী কহে সমস্ত খবর ॥
 আমি নহি মাতা তব মাতা মায়াধরী ।
 পিতা তব চল শর্মা গোড়েতে বসতি ॥
 তোমার মাতাকে পিতা বিষ্ণু শর্মা পাশে ।
 বিদায় করিয়া তিনি চলি গেলা দেশে ॥
 শুনিয়া সকল কথা দুঃখিত অন্তরে ।
 মাতার মুক্তি লাগি গেলা বিপ্রঘরে ॥
 বিপ্লবের চরণ ধরি করে নিবেদন ।
 মায়ের মুক্তি কিসে হইবে ব্রাহ্মণ ।
 ব্রাহ্মণ বলিল তবে দেবদাস প্রাতি ।
 অবশ্যই মাতা তব পাইবে মুক্তি ॥
 বাহা চাই তাহা যদি তুমি দেহ আনি ।
 তবে ত হইবে মুক্ত তোমার জননী ॥

বিষ্ণু শর্মার এই কথা শুনে মায়াবতীর পুত্র দেবদাস প্রমাদ গণলো । মায়ের মুক্তির জন্ত
 নিরুপায় পুত্র দেবী চণ্ডিকার উপাসনা করবার মনস্থ করলো ! কেন না বিষ্ণুশর্মা বা' চাইবে তা'

এনে দিতে হলে দেবীর কৃপা চায়। তা' না হলে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। এই কথা ভাবতে ভাবতে পুত্র দেবদাস বনে চলে গেল। এবং গভীর জংগলে খাপদ সংকুল গরিবেশে জীবনের মায়া ত্যাগ করে তপস্রায় বসলো এবং সূদীর্ঘ বারো বছর কঠোর তপস্রা করতে লাগলো। তার তপস্রায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে আবিভূর্তা হলেন। এবং দেবীদাসকে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

দেবী বলে লহ বর বাসনা যা থাকে।
 দেবীদাস বলে দেবী মুক্ত কর মাকে ॥
 ব্রাহ্মণ চাহিবে যাহা তাহা দিতে হবে।
 তবে ত ব্রাহ্মণ মোর মায়ে মুক্তি দিবে ॥
 দেবী বলে শুন পুত্র আমার বচন।
 ব্রাহ্মণ গৃহেতে তুমি করহ গমন ॥
 ব্রাহ্মণ কি চাহে তাহা জানিয়া সত্ত্বরে।
 মনে মনে তাহা তুমি জানাবে আমারে ॥
 যখনই করিবে তুমি আমারে স্মরণ।
 তখনই যাইয়া আমি দিব দরশন ॥
 দেবীদাস এত শুনি করিল গমন।
 ব্রাহ্মণের গৃহে আসি দিল দরশন ॥
 সকাভরে কহে তাকে করিয়া মিনতি।
 এইবার দেহ প্রভু মায়ের মুকতি ॥
 এক বোড়া সরিষা যে দিব ছুড়াইয়া।
 তাহা যদি দিতে পার তুমি কুড়াইয়া ॥
 দেবীদাস এতশুনি দেবীকে স্মরিল।
 পায়রাৰূপেতে দেবী আবিভূর্ত হলো ॥
 দেবীর সাথেতে এল পায়রা অনেক।
 কুড়াইয়া দিল সন্ডে সরিষা যতেক ॥
 এইবার মায়ে মুক্তি দেহ গো ব্রাহ্মণ।
 এতবলি দেবীদাস করে নিবেদন ॥
 ব্রাহ্মণ কহেন বৎস আরও আছে কাজ।
 একসের ব্যস্ত দুষ্ক দিতে হবে আজ ॥
 এতেক শুনিয়া তবে ব্রাহ্মণ কুমার।
 স্মরণ করিল তবে মায়ে পুনর্বার ॥
 বাঘের রূপেতে দেবী হলো আবিভূর্ত।
 সংগে অনিল ব্যস্ত অশ্রুত অশ্রুত ॥

দেবীদাস বলে তবে ব্রাহ্মণের আগে ।
 দোহন করিয়া লহ যত দুগ্ধ লাগে ॥
 এই সব দেখি শুনি কহিল ব্রাহ্মণ ।
 বাঘের দুধেতে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 প্রয়োজন আছে কিছু বলি তব ঠাই ।
 একসের সর্পবিষ আজি মোর চায় ॥
 যদি আনি দিতে পার আমার ত্বরিতে ।
 তোমার মায়ের মূর্তি দিবতো নিশ্চিতে ॥
 এতশুনি দেবীদাস ব্রাহ্মণ বচন
 পুনরায় মায়ে তার করিল স্মরণ ॥
 বারঅহি রূপে মাতা দিল দরশন ।
 দেবীদাস বলে তবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
 লহ লহ ব্রাহ্মণ যত বিষ চায় ।
 বিষ দিতে আসিয়াছে দেবী চণ্ডীকায় ॥
 ব্রাহ্মণ বলিল বিষে নাহি প্রয়োজন ।
 দিলাম তোমার মায়ে মূর্তি এইক্ষণ ॥
 মোর কাছে সেই কিছু স্বর্ণ রতন ।
 দেবীর সোনার মূর্তি করহ গঠন ॥
 মাতা সহ দেবীদাস বিদায় লইয়া ।
 ধাত্রীর গৃহেতে সভে রহিল আসিয়া ॥
 সোনার চণ্ডিকা মূর্তি করিয়া গঠন ।
 পূজা করে সযতনে ব্রাহ্মণ নন্দন ॥
 দেবীর কুপায় তারা মুক্তি লাভিল ।
 মায়ের সোনার মূর্তি তথায় রহিল ॥
 তবে কিছু দিন পরে শুন সমাচার ।
 সোনাই চণ্ডী নামে মাতা ঘোষিল সংসার ॥
 পায়রারূপেতে মাতা অবতীর্ণ হলো ।
 পায়রাচণ্ডী নাম তাই জগতে ঘোষিল ॥
 অবতীর্ণ হলো মাতা বাঘের রূপেতে
 সেই হেতু বাঘরাই চণ্ডী নাম এ জগতে ॥
 বার অহিরূপে মাতা হলো অবতার ।
 বারাহি নামেতে দেবী হইল প্রচার ॥
 এতদূরে চণ্ডিকা মংগল শেষ হলো
 গুরু প্রেমানন্দে সভে হরি হরি বল ॥

এই সব উপাখ্যানগুলি লোক মুখে আপন অস্তিত্ব বজায় করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান যুগ পরিস্থিতিতে এই সব পালা গীতিকাগুলি নিশ্চিহ্ন হ'তে চলেছে। কেন না কৃষিভিত্তিক গ্রামিণ জনতা-জীবনের সামাজিকতা খণ্ড বিচ্ছিন্ন। এই সমাজে ঢুকে গেছে চাষীজীবনে কৃষি ব্যবসায়ীরা, রাজনীতি ব্যবসায়ীরা। তারা সমাজ বিবর্তনের ধারা রুদ্ধ করে এনেছে। সমাজের গতি ধারায় একটা ছন্দ ছিল; ছন্দ ছিলো তাই জীবনে। তাই ছিলো গান।

গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু (২) গাথাগীতিকার ধারা—অজিতকুমার মিত্র, চৈত্র ১৩৭৫ সংহতি (৩) গাথা গীতিকার চিরন্তন বান্ডলা—অজিতকুমার মিত্র (৪) গাথা কথিকার বীরভূম—অজিতকুমার মিত্র, মাসিক চন্দ্রভাগা পত্রিকা ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা (৫) দেবদেবী ও তাদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ। (৬) Folk literature of Bengal—ডঃ দীনেশ সেন।

* উপাখ্যানটি বীরভূম জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের (সিউরী থানা) শ্রীসত্যকিংকর দাসের নিকট সংগৃহীত।

যার তরে আশা পথে, আরোহিয়া মনোরথে,

আগে মোর পরাণ গিয়াছে ॥”

তারপর পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে যুবক চন্দ্রকে সন্মোদন করে আরো অনেক কথা বলেছেন।

কমলাকান্তের জীবনবন্দী (কমলাকান্ত)

‘কমলাকান্তের জীবনবন্দী ১২৮৮ সালের ভাদ্রসংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ সংখ্যাটি ফাল্গুন মাসে বের হয়। তারকনাথ বিশ্বাসের ‘বঙ্গিমবাবুর জীবনকথা’ অনুসারে বলা বলা চলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১২৮৮ সালের ৫ই ফাল্গুন জীবনবন্দী লিখিত হয়। তখন বঙ্গিমচন্দ্র কোলকাতার বাসায়। কাঁঠালপাড়া থেকে পণ্ডিত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারকনাথ বিশ্বাস তাঁর সংগে দেখা করতে আসেন। তাঁরা ‘বঙ্গদর্শনে’ কমলাকান্ত প্রকাশিত না-হওয়ায় ঐ পত্রিকার দুর্ভাবস্থার কথা বললে—“তিনি “বটে” বলিয়া একমনে তামাকু খাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত অবিচলিত, স্থির, গম্ভীর। তাহারই কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষে ঢুকিয়া কি একটা বস্তু পান করিয়া আসিলেন।...আমাদিগকে বিদায় দিয়া লিখিতে বসিলেন।”—তারকনাথ বিশ্বাস : বঙ্গিমবাবুর জীবনকথা।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে কোলকাতায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়। এই সময়ে ‘জীবনবন্দী’ লেখা হয়।

‘কমলাকান্তের জীবনবন্দী’ আদালতী ছাঁচে ঢালা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রচনা, খোশনবীস জুনিয়রের দ্বারা পরিবেশিত। মঙ্গলবার গুরুচরির মামলার সে কমলাকান্তকে সাক্ষী মেনেছে। কিন্তু আদালতে উঠে কমলাকান্তকে উকীল জেরা করতে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়লেন। কমলাকান্ত বিভিন্নভাবে উকীলকেই জেরা করতে আরম্ভ করেছে। কমলাকান্তের বিচিত্র প্রশ্নের দ্বারাই এখানে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে।

জীবনবন্দীতে ব্যঙ্গের খোঁচা তীব্র নয়। তবে আদালতের শপথবাক্য, উকিলের জেরা প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ের উপর বক্রদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে।

কমলাকান্তের জীবনবন্দী বহুবার নাটকীয় হয়ে অভিনীত হয়।

***কমলাকান্তের দপ্তর ও কমলাকান্ত ॥**

“কমলাকান্তের দপ্তর” বঙ্গিমমানসের এক অপূর্ব সৃষ্টি। কি প্রকাশভঙ্গীতে, কি বিষয়বস্তু নির্বাচনে, কি রচনার সাবলীলতায় এই গ্রন্থ অতাবধি বাংলাসাহিত্যে তুলনারহিত। এই গ্রন্থটিকে স্বয়ং বঙ্গিমচন্দ্র যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ব’লে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা’ একান্ত অমূলক নয়। অবশ্য অনেকের মতামত থেকে জানা যায় বঙ্গিম সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলিকেই বিভিন্ন সময়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। বঙ্গিম-পূর্ববর্তীকালে বাংলাপ্রবন্ধকে কেন্দ্র করেই বাংলাগতের বিকাশ হয়েছে বলা চলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গজলেখকগণ নানারকম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। রামমোহনের গল্প যুক্তিতর্কের দ্বারা ‘গ্রানিট’ পাথরের শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে। বিভাসাগরের গল্প রচনা ললিত মধুর হয়ে উঠেছে। অক্ষয় দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকদের হাতে বাংলাপ্রবন্ধের সুনির্দিষ্টরূপ নির্ণীত হয়েছে। ইংরেজী Essay শব্দের অনুকরণে আমরা বাংলায় যাকে প্রবন্ধ বলি, যার মধ্যে স্ফুর্দ

বঙ্কিমযুক্ত একটি ভাবের আলোচনা আছে, তার সার্থক প্রকাশ অক্ষয়কুমারের হাতে। কিন্তু স্বদৃঢ় বঙ্কিমের মধ্যেই বঙ্কিমপূর্ববর্তী বাংলাপ্রবন্ধ আবদ্ধ থাকেনি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবুবিলাস’ ও ‘কলিকাতা কমলালয়’, ঈশ্বরচন্দ্রের ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’, দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কালীপ্রসঙ্গের “হুতোম প্যাঁচার নক্সা” প্রভৃতি বাংলা প্রবন্ধের নবতর সম্ভাবনার স্বরূপ।

কিন্তু তবুও বলা চলে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করলেন। নীরস কথাই কেবলমাত্র প্রবন্ধের বিষয় নয়। সাহিত্যের উচ্চ পর্যায়েও প্রবন্ধের স্থান হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের এই রীতির প্রথম পরীক্ষা করলেন ‘লোকরহস্তে’। এই পর্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দেয় ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এ। ইংরেজীতে প্রবন্ধের অনেক শ্রেণীভাগ আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল personal essay বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের জনক ফরাসী লেখক মন্টেইন। বাংলা সাহিত্যেও প্রবন্ধের বিভিন্ন শ্রেণীকে কখনও রম্যরচনা, কখনও রসরচনা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

মন্টেইন তাঁর প্রবন্ধপুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন—“Reader, myself am the matter of my book”, অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তিনি নিজেই। এই মন্টেইন এই জাতীয় রচনার প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রও কমলাকান্তের ছদ্মনামে নিজেকে গোপন করতে পারেননি, তাঁর কবিনন, দেশপ্রেম—সবই প্রকাশিত হয়েছে দপ্তরের মধ্যে।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—এর আরম্ভ যেমন হঠাৎ, অগ্রগতিও তেমনি অপ্রত্যাশিত। বন্ধুর সংগে বন্ধুর কথোপকথনের মতই হবে এর রচনা ভঙ্গী। কমলাকান্তের রচনাভঙ্গীতেও তেমনি রয়েছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গত্যাত।

সর্বোপরি, উৎকৃষ্ট সাহিত্য যেমন বিষয় থেকে বিষয়ান্তীতের ব্যঞ্জনা দান করে, নিছক প্রবন্ধের মধ্যে যা তুল্ভ, এই জাতীয় রচনার মধ্যে সেই গুণ বিদ্যমান।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যে একরূপ এক দিগন্তের সূচনা করলেন, বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে তাই বহুপ্রসারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন কমলাকান্ত নাম নিয়ে এ জাতীয় রচনায় অবতীর্ণ হলেন তার কারণ হিসাবে অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ‘বঙ্গদর্শনে’র পাতা ভরানোর তাগিদেই এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত করতে হয়েছে। বঙ্কিমসমকালে বঙ্কিমের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারে এমন লেখক খুবই কম ছিল। অথচ ‘বঙ্গদর্শনে’র বিরাট গহ্বর ভরিয়ে তুলতে অনেক লেখারই প্রয়োজন। উপজ্ঞাসও প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই নূতনতর স্বাদ আনয়নের জন্ত তিনি হাস্তকৌতুক, ব্যঙ্গ বিক্রপ মিশ্রিত করে নূতনধরণের রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে লোকরহস্তের দ্বারা নিতান্ত হাস্য রচনাই চলল। কিন্তু বেশিদিন বঙ্কিম এতে তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। কারণ নিছক খেয়াল খুশী চরিতার্থ করার জন্ত বঙ্কিম লেখনীধারণ করেননি। তাই নেশাখোর কমলাকান্তের ছদ্মবেশে সমাজশাসক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে অবতীর্ণ হলেন।

‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত দপ্তরের রচনাগুলি এরূপ :—

১। একা—“কে গায় ওই ?”—ভাদ্র, ১২৮০।

২।	মমুগ্ধ্যফল—	আশ্বিন, ১২৮০।
৩।	ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয়—	কার্তিক, ১২৮০।
৪।	পতঙ্গ—	অগ্রহায়ণ, ১২৮০।
৫।	আমার মন—	মাঘ, ১২৮০।
৬।	চন্দ্রালোকে—	ফাল্গুন, ১২৮০। —অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা।
৭।	বসন্তের কোকিল—	চৈত্র, ১২৮০।
৮।	জ্যোতিলোকের রূপ—	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১। —রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।
৯।	বিবাহ—	আষাঢ়, ১২৮১।
১০।	বড়বাজার—	আশ্বিন, ১২৮১।
১১।	আমার দুর্গোৎসব—	কার্তিক, ১২৮১।
১২।	একটি গীত—	ফাল্গুন, ১২৮১।
১৩।	বিড়াল—	চৈত্র, ১২৮১।
১৪।	মশক—	বৈশাখ, ১২৮২। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা।
১৫।	ঢেঁকি—	বৈশাখ, ১২৮২।
১৬।	কাকাতুয়া—	কার্তিক, ১২৮২।

প্রথম ১৪টির মধ্যে অন্তের লেখা তিনটি প্রবন্ধ বাদ দিয়ে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে “কমলাকান্তের দপ্তরের ১ম খণ্ড” বের হয় এই “প্রথম বারের বিজ্ঞাপন-এ” বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—“কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার মধ্যে “চন্দ্রালোকে,” “মশক” এবং “জ্যোতিলোকের রূপ” এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্যে এই তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে “প্রথম খণ্ড” লেখা হইল”।

তারপর ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ পরিবর্তিত হয়ে ১২৯২ সালে (১৮৮৫ সেপ্টেম্বর) ‘কমলাকান্ত’ নামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—“এই গ্রন্থ কেবল “কমলাকান্তের দপ্তরের” পুনঃ সংস্করণ নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর” ভিন্ন ইহাতে “কমলাকান্তের পত্র” ও “কমলাকান্তের জোবানবন্দী” এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। “চন্দ্রালোকে,” এবং “জ্যোতিলোকের রূপ” এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, এই দুইটি আমার প্রণীত নহে। “চন্দ্রালোকে” আমার প্রিয় স্নহং শ্রীমান বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং “জ্যোতিলোকের রূপ” আমার প্রিয় স্নহং শ্রীমান বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত উহার স্ব স্ব রচনার সঙ্গে এই প্রবন্ধদ্বয় পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায় আমি কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহারা এই দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন সম্ভাবনা

নাই। অতএব, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ঐ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণ ভুক্ত করা গেল।

কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাদ্রিয়া এখন চারিখানি হইয়াছি। “বুড়া বয়সের কথা” যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই তথাপি উহার মর্ম কমলাকান্ত বলিয়া উহাও “কমলাকান্তের পত্র” মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি।

“কমলাকান্তের জীবনবন্দী” সমেত সর্বশুদ্ধ আটটি নূতন পুনর্মুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক বাড়িয়াছে বলিয়াছে এবং অগ্ৰাচ্ছ কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।”

বঙ্কিমের জীবিতকালে ‘কমলাকান্ত’র দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লেখেন—“ঢেকি” শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পূর্বসংস্করণভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।”

কিন্তু ‘কাকাতুয়া’ নিবন্ধটি কোনও সংস্করণে স্থান পায় নি। অথচ কমলাকান্তের রচনা হিসাবে নিবন্ধটির মূল্য অসীম। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে রচনাটির স্থান হওয়াতে ভালই হয়েছে।

কমলাকান্তের দপ্তরের রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর নূতনত্বের জন্ম অনেকেই গ্রন্থটিতে পাশ্চাত্য অনুকরণের ছাপ লক্ষ্য করেছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ‘বাঙলাসাহিত্যে একদিক’ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আছে—“বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’র ভাব ও রীতির উপরে ইংরেজি সাহিত্যের কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এখানে সেখানে বহিঃস্থ যে সকল মিল রহিয়াছে (যেমন ‘কমলাকান্ত চক্রবর্তী’ অতি অস্পষ্টভাবে ইংরেজ রচনাকার এডিসনের গ্রাম্য ভক্তলোক ‘রোজার ডি কভার্লি’কে (Roger de Coverley) স্মরণ করাইতে পারে। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’র গ্রন্থসম্পাদক ও টীকাকার ভীষ্মদেব খোশনবীস স্কটের ‘টেল অব্ মাই ল্যান্ডলর্ড’ (Tales of my Landlord) উপন্যাসের ‘জেডেডিয়াহেলিথ বোথাম’—এর (Jedediahheleish bothum) অনুরূপ। কমলাকান্তের আফিং-এর নেশায় দিবা-স্বপ্ন দেখা ডি কুইন্সি কৃত ‘দি কন্ফেশন্স অফ্ এ্যান্ ইংলিশ ওপিয়াম্-ইটার’ (the Confessions of on English Opium-eater) গ্রন্থ খানিক অস্মরণ করাইতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের ‘Western Influence on Bengali Literature’ গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।) তাহার কথা বাদ দিলেও মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্যও কিছু কিছু মনে আসিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস এবং বিদ্রূপ সমন্বিত। সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি রচনাসাহিত্যের বিশেষ করিয়া এডিসন্ এবং স্টীলের রচনার সমধর্মী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এডিসন্, স্টীন্স প্রভৃতির লেখা যে সকল সাময়িক পত্রে বাহির হইত তাহার ভিতরে প্রধান পত্র ‘স্পেক্টেটর’ (Spectator); ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গ দর্শন’ পত্রিকার নাম সাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয়। এডিসন এবং স্টীন্স একজাতীয় হাস্য-রসাত্মক রচনার প্রচলন করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহারা পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে সকল গলদ দেখা দিয়াছিল তাহার মূঢ় সমালোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরের ভিতরে

অনেকগুলি রচনা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই সকল সাদৃশ্য এবং সাধারণ্য সত্ত্বেও ‘কমলাকান্তের দপ্তরের’ উপরে এই সব পাশ্চাত্য লেখকের প্রভাব আমাদের নিকট অতি গৌণ বলিয়া মনে হয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রচনার ভিতরে যে একটা অনুভূতির তীব্রতা, ভাবের প্রবল আবেগ, চিন্তার গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির সরলতা লক্ষ্য করতে পারি আমাদের বিচারে উপরিউক্ত পাশ্চাত্য লেখকগণের লেখায় তাহা দুর্বল। একটা আদর্শ হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন—নাও গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু সেই আদর্শের ভিত্তিতে যে রূপায়ণ তাহা ইংরেজ লেখকগণের সহিত সাধারণ্যকে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।”

একথাও যেমন সত্য তেমনি অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্তের ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ গ্রন্থের এই মন্তব্যও যথার্থ—
“কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা কতখানি? হায়রে অদৃষ্ট। “মৌলিকতা মৌলিকতা” করিয়া অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে “কমলাকান্ত” প্রথম পাঠ করিবার যখন বিশ্বয়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমাত্রী এক ব্যক্তি বড় গভীরভাবে বলিয়াছিলেন, ওটা De quincey-র Confessions of an English Opium Eater-এর অনুরূপ।” বড় হইয়া বুঝিয়াছি উহা পাণ্ডিত্যের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers এর Sam এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।”

কমলাকান্তের দপ্তরের বিষয়বস্তু যে বাঙালীচিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এটিই এর সর্বপেক্ষা বড় মৌলিকতার প্রমাণ।

দপ্তরের রচনাগুলিকে দু’শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। একশ্রেণীর রচনার বিষয়বস্তু নিতান্তই গৌণ। এই রচনাগুলিই কবিত্বশক্তির সহায়তায় উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—একা, আমার মন, পতঙ্গ, বসন্তের কোকিল, ফুলের বিবাহ, একটি গীত প্রভৃতি।

অন্যশ্রেণীর রচনার বিভিন্ন মতবাদ বা বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতির আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মনুষ্যফল, উদয়দর্শন, বড়বাজার, বিড়াল, ঢেঁকি প্রভৃতি।

দপ্তরের রচনাগুলির প্রাণ হল তার হাস্যরস। এই রচনাগুলিকে লক্ষ্য করেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলাসাহিত্যে গুপ্ত সংস্কৃত হাস্যরসের অবতারণা করেন। ইংরেজীতে হাস্যরসের বহুপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। কোনটি—Humor, কোনটি Wit, কোনটি Pun, আবার কোনটি Satire। বাংলাতেও হাস্যরসের নানা শ্রেণী আছে—রসিকতা, ভাঁড়ামী, ব্যঙ্গবিদ্রূপ। বিভিন্নশ্রেণীর হাস্যরসের মধ্যে Humor-ই শ্রেষ্ঠ। এই হাস্যরসে ব্যঙ্গের তীব্র খোঁচা নেই, আছে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের প্রকাশ। তীক্ষ্ণ হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে বেদনার অশ্রুজল। Humor-এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই, তাই দপ্তরের হাস্যরসকেও Humor-শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। দেশের ও দেশের প্রতি সহানুভূতি বঙ্কিমের মনে যে

ভাবের সৃষ্টি করেছিল তারই প্রকাশ দপ্তরের হস্তরসে। সোজা কথায় লোককে উপদেশ দিলে কেউ শুনতে চায় না, তাই তাঁকে অহিংসেন সেবী কমলাকান্তের ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে হল এবং রঙ্গরসিকতার বক্রপথ ধরতে হল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মূলতঃ কবি, তা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি দপ্তরের অনেক রচনা থেকেও তার প্রকাশ দেখা যায়। দু'একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

“রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী নৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃত্তা স্নন্দরীর নীল বসনের ছায় শীর্ণ-শরীরী নীল-সলিলা তরঙ্গিনী, নৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধা বিমল চন্দ্রকিরণে খ্যাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।” (একা)

“এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর লইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার সমুদ্রে দম্বরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কুলে ফেলিয়া বাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমের কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উজানে সর্প আছে, মনুষ্য হৃদয়ে কেবল আত্মার আছে। এখন জানিয়াছি যে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌলিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাকও হীরকের ছায় উজ্জ্বল, পিতলও স্বর্ণের ছায় ভাস্কর্য, পক্ষও চন্দনের ছায় স্নিগ্ধ, কাংশুও রক্তের ছায় মধুরবাদী।” (একা)

“যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু স্নন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বৈষ, হিংসা ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ভালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, “কু-উ”—কেন না, তুমি সৌন্দর্যশূন্য, পরায়প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপযূপরি বিভ্রান্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া ছলিয়া উঠিল, অমনি স্বগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, “কু-উঃ।” যখনই দেখিবে, অসংখ্য, গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে চলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ভাল হইতে ডাকিয়া বলিও, “কু-উঃ।” যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিগ্ৰহ মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা স্নন্দরীর লাবণ্যের ছায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া হেলিয়া ছলিয়া ডাকিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য অক্ষুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ নীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ “কু-উঃ।” যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী শুক্লশরীরা, স্নন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রার্থ্যের হাস দেখিয়া, ধীরে

ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্গ দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,—যখন দেখিবে যে ভ্রমর রূপ দেখিয়া—“আদরেতে আগুসারি”—কণ্ঠভরা গুণ্ণুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার “কু—উঃ” বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিভাইব।” (বসন্তের কোকিল)

‘স্বামীর দুর্গোৎসব’ এবং ‘একটি গীত’-এর মধ্যে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন। পরাধীনতার বেদনা তিনি সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা ভিক্ষা চাননি, নিজেদের বাহুবলে উদ্ধার করে নিতে পেরেছেন।

পাগল কমলাকান্ত সমগ্র রচনার মধ্যে একটি দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছে। সেই তত্ত্বটি হল মানবপ্রীতি। প্রীতির মস্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র যেন মগ্নের লিখতে বসেছেন।

এমনিভাবে হাস্যরস, কবিত্ব দেশপ্রেম ও দার্শনিকতার মিশ্রণে কমলাকান্ত এক অনবদ্য সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়।

“বঙ্কিমের মৃত্যুর পর কমলাকান্তের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং ঢঙটারও অলুকের হা। বঙ্কিমপার্বদ রাজকৃষ্ণ অক্ষয়চন্দ্র ‘বঙ্গদর্শনে’ এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ‘জ্ঞানানুসারে’ যাহা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ‘প্রবাসী’র প্রথম-দ্বিতীয় বৎসরে (১৩০৮-৯) তাহা কৃতিত্বের সহিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই কমলাকান্তী ঢঙের পুনঃ-প্রবর্তন করেন। চন্দ্রনগরের চারুচন্দ্র রায়ও এই ঢঙে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ‘ব্যঙ্গকৌতুক’ (“কি লিখিব?” প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত) এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ (“একা” প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত) কমলাকান্তী ঢঙ ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে যাহারাই ব্যঙ্গ ও রসিকতার বেসাতি করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই কমলাকান্তের নিকট অল্পবিস্তর ঋণ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে রাজকৃষ্ণই হউক অথবা অক্ষয়চন্দ্রই হউন, আসল কমলাকান্তের নাগাল বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কেহ পান নাই।”

(‘কমলাকান্তের’ ভূমিকা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী)

দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়। শান্তনু দাস। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী। ৪ | ১, আকতার মন্ডলেন।
কলিকাতা-২৭। তিন টাকা ॥

তরুণ কবি শান্তনু দাস কাব্যক্ষেত্রে একেবারে নবাগত নন; স্বল্প সময়ে প্রচুর লিখে তিনি ইতোমধ্যেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবেন। প্রারম্ভে কবি নিজের সম্পর্কে কৈফিয়ৎ রেখেছেন, সমসাময়িক কবি-বন্ধুদের তুলনায় অনেক পরে আমি লিখতে শুরু করেছি। ১৯৬১-৬২ সাল থেকেই আমার প্রথম পর্যায়ের লেখা ইতস্ততঃ প্রকাশিত হয়। এজ্ঞা আমাকে একটু বেশীই বুঝি পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি সাপ্তাহিক, মাসিক, দৈনিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লিখতে হয়েছে এবং লিখতে হয়েছে একটু বেশীই।’ মনে হয়, এ-প্রসঙ্গে কবির একান্ত ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎবাহুল্য মাত্র, এবং তা কাব্যের মেজাজে অল্পধাবনে অল্পকূল আবহাওয়া রচনা করে না; যেহেতু রসিকের আসক্তি রসের প্রতি, স্থষ্টির উৎকর্ষের প্রতি—কোনো ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানগত পরিমাপের প্রতি নয়।

কবি শান্তনু দাসের প্রায় অর্ধ-শতাব্দিক কবিতা সংকলিত হয়েছে ‘দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়’ কাব্যগ্রন্থে। শান্তনু দাসের কবিতায় একটি বিশেষ মনের স্বর ধ্বনিত হয়েছে—মানবহৃদয়ের অন্তরতম চেতনার সাহজিক আবেগকে কবি তাঁর কাব্যধর্মে বিশেষ প্রশ্রয় দেননি; বলা যেতে পারে, বাস্তবের নিবিড় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সামাজিক মঞ্চে কুশীলবদের জীবনাচরণ আলোছায়ায় অন্ধতর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন :

- ক. ‘প্রতিক্ষণ কেন ডাকো গভীর তটিনী এই বাকৈ
প্রাজ্ঞতম বুদ্ধের মতো দুঃখ মাথা নাড়ে ধীরে,
চোখ তুলে তাকাতো পারি না
কেন তুমি ব্যাণ্ড হও অযাচিত নিরুত্তাপ স্ববির হৃদয়ে।’ (নিঃসঙ্গ নায়ক)
- খ. ‘আমি যেন কোথাকার বাউণ্ডলে বেমক্কি আনাড়ী
নিষিক্ত পল্লীর ধারে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনি :
সহনীয় তবু মনে হয়...কিন্তু প্রিয়তমা
কখনো আগুন যদি গনগন আঁচ হয়ে ওঠে
শুকনো খড়ের চালে দাবানল নেভানো যাবে না।’ (সম্রাজ্ঞী আদেশ দিলে)
- কিংবা, ‘অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো, কিন্তু মালুঘ
খাপদের মত আসে, ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যায়
আমাদের পালভাঙ্গা বিবজ্ঞ সভায়,

হাজার হাজার ভিড়ে নতমুখ ক্লাস্ত ক্রীতদাস

কখনো জন্ম নেয়' (সখী সংবাদ : ছপুর)

নগ্ন-নিষ্ঠুর জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগস্থাপন করেই কবি জীবনের অগ্রতর স্বাদ গ্রহণে উৎসুক। এবং স্বথের কথা তিনি সামাজিক অস্থিরতার নোনাঙ্গলের মধ্যেই পরিশেষে আশার দ্বীপ আবিষ্কার করতে তৎপর : 'আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন গড়ি। স্বপ্ন নিয়ে হাটি। আরন্তের আরন্তে কবি আত্মপক্ষ সমর্থনে যে কথা নিবেদন করেছেন কবির মানসিকতা বুঝতে প্রসঙ্গত তার উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আমাদের সামনে ভূমিকা আছে অজস্র কিন্তু তেমন পটভূমিকা নেই। তবু প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়—এই যে প্রাত্যহিক জীবন, পরিবর্তন, এরই আড়ালে বৃষ্টি কাব্যের ফল্গুধারা প্রবহমান। আমাদের প্রতিমুহূর্তে সম্মুখীন হতে হয়েছে এক নগ্ন বাস্তব হতাশা আর বিবাদমগ্ন চেতনার মুখোমুখি, মনে হয়েছে এ পটভূমিকার সঙ্গে আমাদের কোথায় যেন একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে।'

কবি শান্তনু দাসের কবিতা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে রচনার নাটকীয়তার কারণে। তিনি সাবলীল ; বক্তব্যকে দিব্যি সহজে, অনেকটা কাহিনী প্রকাশের মতোই টেনে নিয়ে যায়। বর্তমান সূত্রে তাঁর 'একটু গুলুন মহাশয়', 'সেলাম', 'দেওয়ালে কৃষ্ণপট' (সম্ভবত কৃষ্ণ পট?) 'বোডুসওয়ার ছুটে গেলে', 'সম্রাজ্ঞী আদেশ দিলে', 'সময়' কিংবা 'দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়', ইত্যাদি স্মরণীয়।

'দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়' কাব্যগ্রন্থের দু'টি পর্ব রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের অর্ধাংশ পরিশিষ্টের শিরোনাম 'স্মৃতিময়'। বিশেষত কবির প্রেমময় অভিব্যক্তি আলোচ্য পর্বে স্থানলাভ করেছে। বলা বাহুল্য, লিরিক ব্যঞ্জনাৎ এই পর্বের কবিতাবলী সত্যতায় অপেকাকৃত উজ্জল। বৃষ্টি সীমাহীন হলে উৎসাহী পাঠক মাত্রই কবির সুরেই বলতে 'ভালোবাসবেন যে, বৃষ্টি এলে... | বৃষ্টি-শব্দে ভিজতে ভালো লাগে, | তুমি এলে নিঃসঙ্গ হৃদয়ে | হাজার যোজন পথ হেঁটে যেতে বড় ইচ্ছে হয়।'।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ II আদ্য ১৩৭৭

সমকালীন



SA-2/69

শুধুই
কেশ তৈল নয়
একটি
কেশ রসায়ন

সাধনা
আমলা

সুবাসিত আমলকীকেশ তৈল



অতুলনীয় গুণাবলীর
জন্য যুগ যুগ ধরে
সুবিদিত



আমলকীই ইহার
প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের
সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে।
কেশপতন ও অকালপকতা রোধ করে
ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদগমে সহায়তা করে।
মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।



সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

মিউজিয়মের রূপকল্পনার ইতিহাস

ভারাপদ সাত্তর।

দৃশ্যমান বিষয়ের মাধ্যমে, জ্ঞানের আদিনিকেতনে পৌঁছে দেবার কাজে আজকের বিংশশতাব্দীর মিউজিয়ম গ্রহণ করেছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। দেশ বিদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান আর কারিগরী শিল্প, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ এবং ভূতত্ত্ব প্রভৃতির নিদর্শন নিয়ে আজকের মিউজিয়মের যাত্রা শুরু হয়েছে; উদ্দেশ্যে হয়েছে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তোলা আর সেইসঙ্গে চিত্তবিনোদনের ব্যৱস্থা করা। মিউজিয়মের এই রূপকল্পনার পিছনে একটি দীর্ঘ কাহিনী আত্মগোপন করে আছে যা একান্তই তার উৎপত্তির ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস। বলা যেতে পারে আজকের এই পরিপূর্ণতার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফেলে আসা ইতিহাস।

‘মিউজিয়ম’ কথাটি স্বভাবতই বিদেশী শব্দজাত। কথাটির জন্ম হয়েছে, সেই স্বদূর গ্রীসে। তাই ইংরেজীতে এই ‘মিউজিয়ম’ শব্দটির বৃৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করলে যা দাঁড়ায় তা হোল, আদিতে এটি ছিল গ্রীকদেবী ‘মিউজ’দের বাসস্থল। সুতরাং এ থেকে উৎপত্তি গ্রীক শব্দ ‘মউসিয়ন’—যা ল্যাটিনে ভাষান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘মিউজিয়ম’। কিন্তু যারা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী, তাঁদের কাছে এই ‘মউসা’ কথাটির শব্দতত্ত্ব একান্তই জটিলতার সৃষ্টি করে। পুরাকালের গ্রীক শব্দ ‘মউট-ইয়া’ কথাটির বৃৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করলে এই কথাই অনুমান করতে সাহায্য করে যে, ঐ মিউজরা ছিলেন আসলে পাহাড়ী বনদেবী। কিন্তু গ্রীকদের প্রাচীন সব গ্রন্থে এই শব্দের অর্থ সম্পর্কে তেমন কিছুই পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়নি। শুধুমাত্র গ্রীককবি হোমার আর হেসিয়ড-এর কাব্যেই এই মিউজদের কাজকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় বলা হয়েছে আদিতে মিউজদের আবির্ভাব ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্মৃতিশক্তি বর্ধনের দেবী হিসেবে—যাদের কাছে

প্রাচীনকালের গ্রীক-চারণরা স্মৃতিভ্রষ্টগার হাত থেকে মুক্ত হয়ে তাদের গাথা-কথিকা স্মৃদ্রভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হওয়ার জন্তে প্রার্থনা জানাতো। তাছাড়া এই 'মিউজ' দেবীদের বাদ দিয়ে চারণদের কোন কাজই করার উপায় ছিল না। মিউজদের সংগে বিরুদ্ধতার পরিণাম কি হয়েছিল তা থেস দেশের গীতবাতের শিল্পী থামাইরিসের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শিল্পী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটি মিউজদের বিরুদ্ধে অহংকার জানিয়ে বলেছিল যে সে মিউজদের আশীর্বাদ ছাড়াই স্মধুর গীত-বাতের মধ্যদিয়ে তার নিজস্ব যোগ্যতাকে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে মিউজরা তার দর্পচূর্ণ করার জন্তে এবার তাদের শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হোল। প্রথমেই তার চোখভুটো দিল অন্ধ করে। ফলে এই অন্ধতার জন্তে থামাইরিসের হাতের বাত্বস্ত্র খেমে গেল চিরতরে, আর সেইসঙ্গে মিউজরা তাদের মহৎ দান 'স্মৃতি' আর 'সঙ্গীত' তার মন থেকে কেড়ে নিল। এর পর থেকেই মিউজদের কাছে চারণরা তাই এত শ্রদ্ধাশীল, এত কৃতজ্ঞ।

হোমারের রচিত গ্রীক মহাকাব্য 'অডিসি'তে মিউজরা চারণদের শিক্ষক এবং সেইসঙ্গে উপকারী বন্ধু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। মিউজরা চারণদের ভালবাসতো বলেই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ চারণদের স্মধুর সঙ্গীত উপহার দিতো। অপরদিকে হেসিয়ডের কাব্যে মিউজদের সম্পর্কে আরও রোমাটিক ক'রে বলা হয়েছে যে, গ্রীকদেবতা জিউসের রাজ্য অলিম্পাশ থেকে নেমে আসতো মিউজরা কাব্যের উচ্চাসভূমি এই পৃথিবীর হেলিকন পর্বতের সান্নিধ্যশে—যেখানে তাদের নারীমূলভ কমনীয় পদদ্বয় নৃত্যের তালে তালে নৃপুরুষনি তুলতো আর পবিত্র ঝরণার জলে অবগাহন করে ঐক্যতান সঙ্গীতের লহরী তুলতো। তারপর আবার যখন তারা প্রদোষের অন্ধকারে মিলিয়ে যেত, তখন দেবতাদের উদ্দেশে প্রশংসিত তাদের স্মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসতো। সংখ্যায় এই মিউজরা ছিলেন বিভিন্ন নামের ন'জন। এরা হলেন, ক্যালিয়োপ, ক্লিও, ইরাটো, ইউটারপি, মেলপোমেন, পলিমনিয়া, টার্পসিকোর, থালিয়া এবং উরানিয়া। মহাকবি সেক্সপীয়র মিউজদের সম্পর্কে বলেছেন, 'a particular power and practice of poetry'। মিউজরা ছিলেন জিউস আর মিনিয়োসাই (অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'স্মৃতি') এর কন্যা।

মিউজদের গুণাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা নিজেরা যেমন ভাগবত সঙ্গীত গাইত, তেমনি চারণদের কাজে সহায়তা করার জন্তেও কম সচেষ্ট ছিল না। কবি হেসিয়ড-এর মধ্য দিয়েই মিউজরা প্রকাশ করেছে তাদের সেই স্মধুর সঙ্গীত যাতে বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যত আর অতীতের কাহিনী। অতীতের হোমারের মিউজরা জানিয়েছে তাদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত আর সেইসঙ্গে জানিয়েছে সত্য জিনিষটা কি বা কেমন ক'রে তাকে বর্ণনা করা যায়। এ ছাড়াও মিউজদের আরও এক অবদান হোল তাদের বাগ্মিতা। দেশের রাজসম্প্রদায়রা ছিলেন প্রতিপালক গ্রীক দেবতা জিউসের স্নেহধন্য; সেইজন্যই জিউসের কন্যা মিউজরা ঐসব রাজসম্প্রদায়ের উপরেও করুণা দেখাতেন তাদের স্মধুর ভাষার ডালি উপহার দিয়ে যাতে রাজারা গায়বিচার করার পথে এবং দেশে শান্তির আবহাওয়া বজায় রাখার কাজে অগ্রগামী হতে পারে। তাদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া সেই সঙ্গীত স্বধা দিয়ে পৃথিবীর দুঃখকে ভোলাবার চেষ্টা করতো। দেখা যাচ্ছে হেসিয়ডের সময়ে এই মিউজদের সঙ্গে 'মিনিয়োসাই'-এর সম্পর্কের জন্তে মিউজরা যে সব গুণের

অধিকারিণী হয়েছেন তা হোল, স্মৃতি, শিল্পানুরাগ এবং কাব্যের অনুপ্রেরণা। এরও পরবর্তী সময়ে এগুলির চেয়ে আরও যে ভিন্ন ধরনের মহৎগুণের অধিকারিণী হয়েছে মিউজরা—তা হোল অর্থসম্পদ। উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রীক নরপতি সোলন যখন তার বিখ্যাত কাব্য সঙ্গীত রচনা করেন, তখন তিনি চিরায়ত প্রথামত মিনিয়োসাই ও জিউসকন্যা মিউজদেরও আবাহন করেন; কিন্তু সেই আবাহনের মধ্যে মিউজদের কাছে কাব্যসঙ্গীতের উপহার পাবার প্রার্থনা ছিল না—ছিল পার্থিব সম্পদ অর্জনের এবং মানুষের মধ্যে সুনাম অক্ষুণ্ণের প্রার্থনা। স্মরণ্য এই প্রথম দেখা গেল, মিউজদের কাছে প্রার্থনার ধরণ বদলে যাবার কাহিনী।

প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে। কবিদের অনুপ্রেরণা যোগাবার জগ্গেই সাহিত্যের সঙ্গে মিউজদের সম্পর্ক ছিল খুব বেশী। ফলে দেবী হিসেবে যখন মিউজদের সমাদর তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই পূজার্চনা পাবার অধিকারিণী হয়ে উঠেছিল বলেই গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দির দেখতে পাওয়া গেছে। গ্রীসের হেলিকন পর্বতমালার যে মন্দিরটিতে মিউজদের সবচেয়ে বেশী আধিপত্য ছিল, তা নিয়ে প্রাচীন গ্রীসের থেসপিয়া রাজ্যের জর্নেক এমফিয়ন কমপক্ষে দুটি পুস্তক রচনা করেন। সে সময়ের এথেনবাসীদের মতে তাঁর ঐ রচনার নাম ছিল, “হেলিকনের মিউসিয়ন সম্পর্কে।” এ ছাড়াও খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর স্পার্টান জেনারেল পউসানিয়াস মিউজদের উপাসনা স্থান সম্পর্কে এক বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। অপরদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের দরুনও এই সম্পর্কে কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল, পাথরের একটা লম্বা পাদপীঠ যেখানে একদা থেসপিয়ান দেশবাসী ন’জন মিউজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করছিল। প্রত্যেক মিউজের প্রতিমূর্তির নীচে স্ব স্ব নাম খোদাই করা তো ছিলই উপরন্তু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছোট্ট ছ’লাইনের কবিতাও তার সঙ্গে খোদিত ছিল। এই কবিতার রচয়িতা ছিলেন হোনেটাস—যাকে অগষ্টান কালের লোক বলে ধরা হয়। কথিত পউসানিয়াসের বিবরণ মতে মিউজদের এই প্রতিমূর্তিগুলির রূপদান করেছেন সিকিসোডোটাস। পউসানিয়াস আরও উল্লেখ ক’রেছেন, মিউজদের প্রতিমূর্তির এই সারিতে আরও যাদের মূর্তি ছিল তাদের মধ্যে ডাইয়োনিসাসের মূর্তি থাকে মিউজদের দলের মধ্যে প্রায়ই দেখা যেতো, এ্যাপোলো ও হারসেমের বীণাযন্ত্র লিরা’র জন্তে মুখ্যমান অবস্থার মূর্তি, থামাইরিস আজ অবস্থায় একটি ভগ্ন লিরা হস্তধৃত অবস্থার খোদিত মূর্তি, মকরবাহী এরিয়ন, এবং হেসিয়ড—হাঁটুর উপর রাখা একটি হার্প বাজযন্ত্র ধরে থাকা অবস্থার মূর্তি। এছাড়া ছিল সঙ্গীত সূধা পানে বিভোর বজ্রজন্তু পরিবৃত পাথর এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত অরফিউসের মূর্তি। আজকের চিন্তাধারণায় আমরা যে মিউজিয়মের রূপকল্পনা করি, তা সেকালের গ্রীক দেবী মিউজদের আস্তানা এই ‘মিউসিয়ন’কে দেখে মনে হয় এটি যেন মিউজদের মিউজিয়ম। ‘মিউসিয়ন’ তাই পরে হ’য়ে পড়েছে মিউজিয়ম।

এবারে গ্রীসের সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সে সময় গ্রীসে কাব্য পাঠকে বিধিবৎ শিক্ষার (formal education) একটা অঙ্গ বলে মনে করা হতো। তাছাড়া গ্রীসের যুব সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল কাব্যচর্চা। এই প্রসঙ্গে ‘নাইসিরেটাস’এর কথা স্মরণ করা যাক। নাইসিরেটাসের

পিতার আকাঙ্ক্ষা পূত্র যেন উপযুক্ত মানুষ হিসেব গড়ে উঠতে পারে; তাই তিনি পুত্রকে হোমারের কাব্য মন প্রাণ দিয়ে পড়ার জন্তে বাধ্য করেছিলেন। সক্রিটিসের ছাত্র এবং এথেন্সের বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক এক্সিনোফোন আলত এক সম্মেলনে এই নাইসিরেটাস যোগ দিয়েছিলেন। সখেলানের দিনে হোমারের ইলিয়ড্ ও অভিসি মহাকাব্যের সবটাই মুখস্থ বলার মত ক্ষমতা নাইসিরেটাসের ছিল। এর জন্তে তার কৃতিত্বের গর্ব ছিল খুব। কিন্তু হায় হতভাগ্য নাইসিরেটাস! সক্রিটিস নাইসিরেটাসের এই উত্তম ভঙ্গ করে দিয়ে উক্তি করেছিলেন যে, আবৃত্তিকারকরা মহাকাব্য মুখস্থ বলতে পারে বটে, তবে তারা হোল এই পৃথিবীর এক মহামূর্থ লোক। কবিতা মুখস্থই তারা করেছে কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি। এইভাবেই সক্রিটিস ভৎসনা করে নাইসিরেটাসকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নাইসিরেটাসের উদাহরণ থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় সেকালে গ্রীসে না বুঝে কবিতা মুখস্থ করা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

পুস্তক পাঠ ও কবিতা আবৃত্তির দিকে সে সময় মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্য ছিল একান্তই নীতিমূলক বিষয়। এর মধ্যে ছাত্রদের অতীতের জাতীয় বীরপুরুষদের এবং সেই বীর পুরুষদের চরিত্রের গুণাবলীকে নকল করার চেষ্টা থাকতো। কবিতা মুখস্থ করা তখন এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল যে, যে কোন সময়ে যে কোন জায়গা থেকে তারা আবৃত্তি করতে সক্ষম হতো। প্রায়ই একঘেয়ে পরিশ্রমে কবিতা মুখস্থ করা সে সময়ে স্মৃতি শক্তি বিকাশে একান্তই সহায়ক হবে বলে ধারণা প্রচলিত হয়েছিল এ সম্পর্কে দার্শনিক প্লেটোর 'ল' পুস্তকে এই কবিতা মুখস্থ করার মূল্য সম্পর্কে কঠিন সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

তাহলে মোটামুটিভাবে গ্রীসের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে গ্রীসে কাব্য পাঠ সম্পর্কে সর্বশেষ জ্ঞাত হওয়া গেল। মিউজদের দেশে কবিতা আলোচনা করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি বিশেষ শিক্ষায়তনকে চিহ্নিত করার জন্তই 'মিউজিয়ম' কথাটির প্রচলন। দেখা যাচ্ছে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখার মধ্যেই প্রথম পরিষ্কার ও স্থানদিষ্টভাবে উপরিউক্ত অর্থে মিউজিয়ম কথাটির ব্যবহার হয়েছে বটে, কিন্তু এরও আগে আমরা এই অর্থের ক্রমোন্নতির বিবরণ এরিস্টোফোন এবং ইউরিপিডিসের লেখার মধ্যেও দেখতে পাই। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত এসচিনেস্ এর লেখা থেকেও জানতে পারি যে বিদ্যালয় উৎসবগুলি 'মিউসিয়া' হিসাবে খ্যাত হতো। এ বিষয়ে আরও নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, ড্রাকো ও সোলনের আইনবিধি রচনার সময় এসচিনেস্ প্রসঙ্গত এই প্রথার উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও মাইলটাস শহরে ইউডিমাস সাধারণের শিক্ষার জন্তে অর্থদানের যে বিষয়টি একটি প্রস্তাব ফলকে উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন তা থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় কেমন করে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিউজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনসাধারণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত একটি কমিটির প্রস্তাবমত ঐ তহবিলের আয় চারজন খেলাধুলার শিক্ষক এবং আরও চারজন প্রাথমিক শিক্ষার জন্তে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হতো। প্রতিবৎসর আগ্রহী প্রার্থীরা তাদের প্রতিযোগিতার জন্তে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নাম দিতেন এবং সেইমত একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রার্থীরা গ্রীসের জনপ্রিয়

সভার (Popular assembly) সঙ্গে অপেক্ষামান হারমেস এনাগোনিয়াস দেবতার পুরোহিত এবং মিউজ দেবীদের পুরোহিতদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন। এবারে উৎসব পরিচালনার মূল প্রতিনিধি সমবেত জনতাকে একটি প্রার্থনা সভায় শপথ নেবার জন্তে সমবেত করতো। উপস্থিত জনতাকে শপথ নিতে হোতো এই বলে যে, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্ত সুপারিশ করা হয়েছে এবং অত্যাচারভাবে প্রভাবিত হয়ে কেউ যদি কোন অযোগ্য প্রার্থীকে প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্তে মনোনীত করে থাকেন তাহলে সে এই সত্যতার জন্তে পাপের কলভোগ করবে। এরপর শুরু হোত প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ অল্পাধিক। একে একে উঠে এসে প্রার্থীরা এই বলে শপথ নিতেন যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা কোন নাগরিককে তাদের প্রতিযোগী পদের জন্তে নির্বাচন করার পক্ষে গীড়াপীড়ি করেননি। হারমেস দেবতার পুরোহিতদের পরিচালনায় খেলাধুলার শিক্ষকরা হারমেস দেবতার নামে শপথ বাক্য উচ্চারণ করতেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকরা মিউজ দেবীর পুরোহিতদের ব্যবস্থাপনায় অ্যাপোলো এবং মিউজদের নামে শপথ নিতেন। যা জরিমানা আদায় হোত তা হারমেস ও মিউজের মন্দিরকোষাগারে জমা দেওয়া হোত।

মিউজদের পবিত্র স্থান এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান যে এই মিউজিয়ম এই ধারণা সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে উপবন প্রধান প্লেটোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আকাডেমীতে। সেখানে মিউজ দেবীদের সামনে একটি যজ্ঞদেবী নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে উৎসর্গ এবং উৎসবাদি অর্ঘ্যসমূহ হোত। প্লেটো প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্যের মিউজদের সেবায় উৎসর্গিত 'খিয়াসস' অর্থাৎ 'পবিত্র দল' হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল। এই দলের নিজস্ব নিয়মকানুনও যেমন ছিল তেমনই ছিলো একজন নিজস্ব নেতা বুদ্ধিজীবী তৎপরতাকে কেন্দ্র করেই দলগোষ্ঠির সভ্যরা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। অধ্যয়ন ও গবেষণা, বিশেষ করে গণিত সংক্রান্ত বিষয়ক—এইসব ছিল অ্যাকাডেমীর প্রধান কার্যাবলী। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, উচ্চশিক্ষার জন্তে সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের বীজ এখান থেকেই প্রথম পরিপক্ব হয়েছিল।

কিংবদন্তী যে, এরিস্টটল যখন এথেন্সে এসেছিলেন তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত সাজসরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এরিস্টটল যখন লাইসিয়মে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যখন তিনি প্লেটোর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করেন তার নানাবিধ নতুন কাজের মধ্যে এরিস্টটল তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনলেন মানব সমাজের একান্ত আগ্রহপূর্ণ শিল্পকর্ম বিষয়ক প্রত্যেকটি বিষয়। তাই বোধ হয় ম্যাসিডোনের রাজা ফিলিপ কর্তৃক এই দার্শনিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক হবার জন্তে। সুতরাং ভবিষ্যতে আলেকজান্ডারের সম্পদ এরিস্টটলকে স্বযোগ করে দিল বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার বা প্লেটোর শিক্ষালয়ে এ বিষয় একান্তই অজানিত ছিল। এরিস্টটলের লাইসিয়মের প্রতিষ্ঠানে পদার্থ বিষয়ক গবেষণাকে প্লেটোর 'অ্যাকাডেমী' অপেক্ষা অনেক বিস্তারিত ছিল। সুতরাং নীতিগতভাবে গোটা লাইসিয়মই একটি মিউজিয়মে পরিণত হয়েছিল এবং এরিস্টটল ও তাঁর ছাত্ররা এই মিউজদের সেবায় উৎসর্গিত 'খিয়াসস' নামে একটি পবিত্র দল গঠন করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে

এই মিউজিয়ম ছিল একটি বিশ্বগবেষণা কেন্দ্র এবং এ থেকেই আমরা ভালভাবে বুঝতে পারি আলেকজান্দ্রিয়াতে সেই বিখ্যাত মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার পথ পরবর্তীকালে কিভাবে স্বগম হয়ে পড়ে।

যখন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ দার্শনিক এ্যারিস্টটলকে তাঁর দেশে ছেলের গৃহশিক্ষকের জন্তে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আকর্ষণীয় এবং উপযুক্ত মাহিনা দেবার বদলে মিইজাতে মিউজদের একটা পুঁজাস্থল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন যাতে সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রেরা শান্ত সমাহিত ভাবে পড়াশুনা করতে পারে। গ্রীক জীবনীকার ও দার্শনিক প্লুটার্ক এ সম্পর্কে লিখেছেন যে এ্যারিস্টটল আলেকজাণ্ডাকে শুধু নীতিশাস্ত্রের এবং রাজনীতি ক্ষেত্রের ব্যবহারিক শিক্ষাই দেন নি, তিনি গুঁতত্ব বিষয়ক জ্ঞানের শিক্ষাও তাকে দিয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডারও তার স্বাভাবিক চরিত্রগতভাবে ছিলেন শিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহী এবং পঠন পাঠনে মহাউৎসাহী। তার উৎসাহের জন্তেই এ্যারিস্টটল হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যের এক নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন যেটিকে আলেকজাণ্ডার মনে করতেন সৈনিকদের রণ কৌশল সংক্রান্ত একটি বুনিসাদী সারগ্রন্থ। সেই কারণে প্রাচীন ট্রয় নগরী পরিলম্বনের সময় তিনি অ্যাচিলিসের সমাধিভূমিতে চিরাচরিত প্রথাভঙ্গারী একটি আহুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ করেন।

যেহেতু এ্যারিস্টটলের সাহিত্য শিক্ষার মধ্যে হোমারের কাব্যই ছিল প্রধান তাই আলেকজাণ্ডার সাহিত্য সম্পর্কে খুবই অগ্রবৃত্ত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও ম্যাসিডন বাসীরা ছিলেন গ্রীক এবং তার বিপরীতদিকে তাদের চরিত্রও ছিল বর্বর সংস্কৃতিবিহীন। গ্রীক সাম্রাজ্যের শেষ সীমায় তাদের অবস্থান এত দূরত্বে ছিল যে, খৃঃ পূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতকেও এথেন্সের বৃক্ প্রবাহিত গ্রীক সংস্কৃতির স্বজনশীল শ্রোত তাদের স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে কেউ কোন ভবিষ্যতবাণী করতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য বিজয় অভিযানের পর বিজিত দেশগুলিতে যে হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার হোল—তা শুধু সম্ভব হয়েছিল বিজয়ী বীরের চরিত্রের উপর এ্যারিস্টটলের শিক্ষার প্রভাবের জন্তেই।

শুধু তাই নয় এ্যারিস্টটল আলেকজাণ্ডারকে বিজ্ঞান চেতনা বিষয়ক জ্ঞানদানেও অনুপ্রাণিত করেছিলেন যারা এ্যালান মুরহেডের লেখা নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সেই সুন্দর বিবরণ পড়েছেন সকলেই তার মধ্যে লক্ষ্য করবেন যে নেপোলিয়নের এই অভিযান শুধুমাত্র একটি সামরিক সাহসিক কার্যই ছিল না—এই সুপরিকল্পিত অভিযানটির উদ্দেশ্যই ছিল একান্তই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আলোচনাপ্রসঙ্গে একথা বলা কোন ক্রমেই অতিশয়োক্তি হবে না যে মিশরের ঐ প্রত্নবস্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সর্বপ্রথম গবেষিত হওয়ার সুযোগ যেমন লাভ করেছিল তেমনি বলা যেতে পারে আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে এবং প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলই ছিল এর মূলে। তিনি তার অভিযানের সময় গ্রীক দেশের যা অজ্ঞাত সেই প্রাচ্যের প্রাকৃতিক জগতের বহু অস্বাভাবিক বস্তু সম্পর্কে তদন্ত ও তথ্য নথিবদ্ধ করার জন্তে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন। মধ্য এশিয়ার অক্সাস এবং হিন্দুকুশ পর্যন্ত তার দীর্ঘ পদক্ষেপ, কাশ্মীর ও সিন্ধুর শাখা প্রশাখার ধার ধরে দীর্ঘ অভিযান, সিন্ধুদের সম্মুখভাগ থেকে পারস্ত উপসাগরের উপর পর্যন্ত তার বাহিনীর প্রত্যাবর্তন এবং সব শেষে

বেলুচিস্তানের মরুভূমি দিয়ে মধ্য পারস্যে তাঁর আগমন এগুলি শুধুমাত্র তার সাময়িক শক্তি ও কৌশলেরই পরিচয় দেয়নি—পৃথিবীর মানচিত্রে এই অভিযানকে একটা বিপ্লবাত্মক কাজ হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে।

আলেকজান্ডার যা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং যদি না তেরিশ বছর বয়সে মারা যেতেন, তাহলে তিনি আজকের কল্পনাকেই পাল্টে দিয়ে সবটুকু বাস্তব করে তুলতেন। তিনি ভূমধ্যসাগর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডকে এক সাম্রাজ্যের নিগড়ে বেঁধে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তাহলেও তাঁর তের বছরের রাজত্বের জীবনে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের চেহারাটাকেই যেভাবে পাল্টে দিয়েছিলেন—তা শতাব্দী ধরেও কারো পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তার অস্ত্র শক্তির জোরে সৃষ্ট এই বিশাল সাম্রাজ্যের মাটিতে গ্রীক সভ্যতার বীজ রোপন করার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল—যার ভবিষ্যত পরিণত একটি অভূতপূর্ব সার্বজনীন চরিত্র-গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হতো।

এ হেন আলেকজান্ডার তার এই মানস কল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত হোল, হোমারের স্বপ্নাদিষ্ট-মিশরের নীলনদের পশ্চিম তীরের সেই ভূমিতে খৃঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে আলেকজান্ডার কর্তৃক একটি নগরী প্রতিষ্ঠা। তাই আলেকজান্ডিয়া মূলতঃ গ্রীকদের দ্বারা নির্মিত হওয়ায় তা গ্রীক নগরী হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। হুতরাং গ্রীসের নগর পরিকল্পনার ধাঁচে এখানেও সেইভাবে নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

কিন্তু যদি আলেকজান্ডিয়াকে বস্তুত একটি গ্রীক নগরী বলে ধরা হয়, তাহলে এর বুদ্ধিজীবী জীবনে প্রাধান্য ছিল গ্রীক সংস্কৃতির। আর এই গ্রীক সংস্কৃতি প্রাধান্যের কারণই হোল প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের শিক্ষার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আলেকজান্ডিয়ায় পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সেই বিখ্যাত মিউজিয়ম যার কর্তৃত্বে এই নগরী শাসিত হতো।

আলেকজান্ডিয়ার এই মিউজিয়ম পরিপূর্ণভাবে রূপগ্রহণ করেছিল ১ম টলেমীর দ্বারা যিনি ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের মধ্যে একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন একাধারে একজন ঐতিহাসিক এবং অন্যদিকে বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী। টলেমী আলেকজান্ডারের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এর ফলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আলেকজান্ডারের গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে উৎসাহ, তাঁর বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ এবং মানব সমাজের প্রতি উদার মনোভাব—টলেমীকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ ছাড়া সমগ্র মিশরের ধন দৌলত তার কাছে থাকায় রাজকীয় আড়ম্বর পূর্ণ ভাবে তা ব্যয় করার অধিকারও সে অর্জন করেছিল।

এই জন্মেই আলেকজান্ডিয়ার মিউজিয়ম রাজপৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তীকালে একটি বিরাট গবেষণা কেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছিলো। বলা যেতে পারে এটি হোল এই ধরনের সেই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যা সরকারী আনুকূল্য লাভে একান্তই সক্ষম হয়েছিলো। হেলেনীয় সাম্রাজ্যের সব জায়গা থেকেই পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হতো তার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হবার জন্মে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আনন্দের সঙ্গেই এই আমন্ত্রণ গৃহীত হতো। রাজকোষ থেকে সভ্যদের

যথোপযুক্ত বৃত্তি দেওয়া হোত এবং আহারাতির জন্তে ব্যবস্থা করা হয়েছিল একত্র আহারের একটি সাধারণের রন্ধনশালা। এই সব গুণীজনেরা কোন ক্রমেই কিন্তু মনে করতেন না যে তারা তাদের বক্তৃতা দিয়ে অপরকে বাধিত করছেন। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে ছাত্রেরা সাধারণভাবে ঐসব পণ্ডিতদের কাছে দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছ থেকে বক্তৃতার মধ্যদিয়ে জ্ঞানলাভ করতো। একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ—যা পরবর্তীকালে ক্রমশ পুস্তক বৃদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। মিউজিয়মের এই শিক্ষায়তনে একদিকে যেমন সমালোচনামূলক সাহিত্য লিপিতত্ত্ব এবং দর্শন সংক্রান্ত বিষয়ক গবেষণার কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, অপরদিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞান, গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ভূগোল এবং ঔষধ প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও। এই মিউজিয়মে মিউজদের মূর্তি ও সেই সঙ্গে যজ্ঞবেদীসহ একটি উপসনাস্থলও ছিল। সুতরাং নীতগতভাবে এই গবেষণা কেন্দ্রটি ছিল এ্যারিস্টটলের একটি ‘থিয়োসিস’—অথবা বলা যেতে পারে ‘পবিত্র দল’ যার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত এক পুরোহিত। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ম আজকের মিউজিয়মের পরিপূর্ণ রূপদানের যাত্রা পথে ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

সংক্ষেপে এই হোল, গ্রীসের পটভূমির মিউজিয়মের রূপ কল্পনার সেই ফেলে আসা ইতিহাস—যা একান্তই অজ্ঞাত তথ্যের সংমিশ্রণে চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে।

পেত্রর আদিম ইতিহাস

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[সম্প্রতি পেত্রিতে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল তাতে সরকারী হিসাব মত পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এই ভয়াবহ ঘটনাকে মনে রেখে এই দেশের প্রাচীনতম মানব তৎপরতার বিবরণ এখানে বিবৃত হয়েছে।]

কিছুকাল পূর্বেও ইতিহাস বিষয়ক দৃষ্টিবোধ শুধু খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের বিবরণের উপর নির্ভর করতো। ফলে ‘ইতিহাস’ এর অর্থ হয়ে দাঁড়াতো—কতকগুলি খ্যাতনামা মানুষের জীবনী। জীবনী ভিন্ন ইতিহাস হতে পারে না বা ইতিহাসের মধ্যে থাকবে কোন বিশেষ রাজার রাজত্বের বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা এবং তারিখ। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে এই রকম চিন্তাধারা বিলুপ্ত হতে চলেছে। যদিও তা’ পর্যাপ্ত নয়, তবুও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এদিকে যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছেন। তাঁদের লক্ষ্য পড়েছে সংস্কৃতির সমগ্র অগ্রগতির বিভিন্ন দিকে। সাধারণ মানুষের অগ্রগতির দিকে। আবার ইতিহাস-সম্পর্কীয় প্রাচীন মতবাদ প্রাচীন আমেরিকার ক্ষেত্রে অস্বরণ করা যায় না। এদেশের পৌরাণিক উপাখ্যান ও কিস্কদন্তীগুলি স্পেন কর্তৃক এই দেশ বিজিত হবার সময়ে লিখিত হয়েছিল। সেই সকল উপাখ্যান ও কাহিনীর মধ্য থেকে কোন কোন অঞ্চলের ইতিহাস কিছু পরিমাণে (তাও ইন্কা সাম্রাজ্যের শেষের দিকের) উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে বটে, কিন্তু তার পূর্বের শত-সহস্র বৎসরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী অলিখিত; আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত। তবুও প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই পেত্রর স্বদূর অতীতের ঘটনাবলী জানা আজ আর দুর্লভ নয়।

প্রারম্ভিক কাল (আনুমানিক ৮০০০-১২৫০ খৃঃ পূঃ)—পেত্রর ইতিহাসের প্রারম্ভ যে পিজারো (Pizarro) বা ইন্কা-র যুগ থেকে নয়, তা’ নিশ্চিত। স্বদূর অতীতে যেদিন সর্বপ্রথম কয়েকজন আদিম নরনারী এই ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করলো, সেই দিন থেকেই এই পেত্রর ইতিহাসের শুরু। বর্তমান থেকে প্রায় দশহাজার বৎসর পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয়। সেদিনের সেই মানবগোষ্ঠী ছিল অরণ্যচারী পশুশিকারী। সমুদ্র ও ভূ-খণ্ড থেকে সংগ্রহ করতো জীবজন্তু। এই মানবগোষ্ঠী ছিল এক অতি সাধারণ সংস্কৃতির ধারক। দৈহিক আকৃতির (type) দিক থেকে তাদের সঙ্গে আধুনিক ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ পার্থক্য ছিল। স্বদীর্ঘকাল, প্রায় পাঁচহাজার বৎসর ধরে এই মানবগোষ্ঠীর অগ্রগতি হয়েছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে তারপর যেদিন তাঁরা কৃষির আবিষ্কার অর্থাৎ ফসল ফলাতে আরম্ভ করলো, সেদিন তাদের জীবন হলো সহজতর। আরও সহস্রাধিক বৎসর অতীত হলে সেই মানবগোষ্ঠী সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদানাদির দ্বারা গড়ে তুললো এক চিত্তাকর্ষক সভ্যতা। যাই হোক, আমরা এই সভ্যতার প্রারম্ভিক কালকে দুটি যুগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম, প্রাক-কৃষি যুগ এবং দ্বিতীয়, কৃষির প্রাথমিক যুগ।

প্রাক-কৃষি পর্যায়ের শিকার ও সংগ্রহের যুগ (আনুমানিক ৮০০০-২৫০০ খৃঃ পূঃ)—পেত্রর

এই স্বদীর্ঘকালের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণরূপেই কাল্পনিক। সেই সময়ে সভ্যতার অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত ধীর। এত ধীর যে তারা কখনই বর্তমানের তিরেরা দেল্ ফুয়েগোর আদিম অধিবাসীগণ অপেক্ষা উন্নত হতে পারেনি। এপর্যন্ত কেবলমাত্র প্রাক-কৃষি পর্যায়ের শিকারীযুগের বসতির কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কিছু পার্বত্য অঞ্চলে, কিছু বা উপকূলবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু এইগুলিই যথেষ্ট নয় বার উপর ভিত্তি করে সেই নগণ্য সাংস্কৃতিক যুগের অগ্রগতির মানদণ্ড বিচার করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ সেই সময়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ উপকূলবর্তী মৎস্য শিকারী অপেক্ষা উচ্চতর সংস্কৃতি ভাবপন্ন ছিল। এই যুগে পার্বত্য ভূমিতে বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী বৃষ্টিপাত হতো। সেই অঞ্চল তখন বহল পরিমাণে উদ্ভিদে এবং শিকারী পশুতে পূর্ণ ছিল।

আদিম মানবের উদ্ভব—পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, কতকগুলি নয়নারী এই ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেছিল। কারণ, আমেরিকার মতো বিশাল মহাদেশের কোথাও একটিও আদিম মানবের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। এমন কি, তার নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় বনমালুষের চিহ্নও অনাবিস্কৃত। সেকারণে বলা যায়, আদি মানবের উদ্ভব আমেরিকায় হয়নি।

দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে এশিয়ার মঙ্গোলীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আদিম নিওলিথিক পর্যায়েই এই মঙ্গোলীয় জাতের মানুষ প্রথম আমেরিকায় প্রবেশ করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তারা শেষ হিমযুগের বা তার কিছু পরে বেরিং-প্রণালীর পথে এসে দক্ষিণদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর একটি কথাও চিন্তা করার মতন। পলিনেশিয়ার অধিবাসীদের দেহের আকৃতি (type), তাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আবার পলিনেশিয়ার সঙ্গে আমেরিকারও যথেষ্ট সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য বর্তমান কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে পলিনেশিয়ার অধিবাসীগণ এসেছে মালয় অঞ্চল থেকে। তাও খুব বেশীকাল অতীতে নয়। এদের প্রবাদ বা কিস্বদন্তী থেকে জানা যায়—আমেরিকার উপকূল থেকে হুহাজার মাইল দূরবর্তী পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপে (Eastern Island) তারা বাস করতো। আর এই আমেরিকা, পলিনেশিয়া, মেলনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতকগুলি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক লক্ষণের সাদৃশ্য এতই বেশী এবং নিকটতম যে, তা দেখলে মনে হয় এদের সাংস্কৃতিক উন্নতি সমান্তরালভাবে ঘটেছিল। এও হতে পারে যে, প্রাচ্য-জাত কতকগুলি সাংস্কৃতিক উপাদান আমেরিকায় স্বদীর্ঘকালধরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ সংস্কৃতির উপর তার প্রভাব দৃশ্যতঃ আপেক্ষিকভাবে সামান্যই পড়েছিল। অনুরূপভাবে, আমেরিকার কতকগুলি বিশেষ সাংস্কৃতিক চিহ্ন সম্ভবতঃ পলিনেশিয়া, মালয় বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও পৌঁছেছিল।

স্বদূর অতীতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভুট্টা (Maize) আমেরিকায় নীত হয়েছিল। আসামের নাগা ও অত্র কয়েকটি পার্বত্যজাতি আদিম আকৃতির এক রকম শস্ত বপন করে। সেগুলি পুরাতন ণস্তুগোষ্ঠীর এক আধুনিক সংস্করণ। শুধু তাই-ই নয়, সেগুলি আবার আমেরিকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অতি আদিম ধরণের একরকম শস্তরই অনুরূপ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এশিয়া-জাত এবং আমেরিকার উৎপন্ন একপ্রকার বস্ত্র তুলার সস্তর শ্রেণীই বর্তমানে আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ কর্তৃক উৎপন্ন হয়। পেরুর উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রাক-মৃৎপাত্র-স্তরে সর্বনিম্ন

কৃষির নিদর্শনেও এই তুলার উপস্থিতি থেকে প্রতীতি জন্মায় যে, সেই আদিমযুগে মানুষেই হাতে করে তা প্রশান্তমহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকায় এনেছিল। এই পেরুর সর্বপ্রাচীন কৃষির নিদর্শনে প্রাপ্ত কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে শিম, স্কোয়শ্ ও লাউ। এগুলি নবীন ও প্রাচীন পৃথিবীতে ব্যাপকভাবেই উৎপন্ন হতো।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে চিলির উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রস্তর-হাতিয়ারগুলি সুনিশ্চিতরূপেই Eastern Island থেকে সেখানে এসেছিল। বঙ্কলের পরিচ্ছদ তৈরীর মধ্যেও পলিনেশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার মিল যথেষ্ট রয়েছে। বরন শিল্পে তো বটেই।

বাই হোক, এই দেশত্যাগী আদিম মানুষগুলি শেষ হিমযুগের অন্তিমের আরামদায়ক পরিবেশে আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করলো। সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে জল ভূবার-চাদরে আবদ্ধ হওয়ায় সমুদ্র-পৃষ্ঠ প্রায় তিনশ ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। ফলে স্থগিত করলো একটা চওড়া যোজক বেরিং প্রণালীকে। ক্রমশঃ সেই উদ্বাস্ত মানুষগুলি দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লো। বহু শত-সহস্রাব্দ অতিক্রান্ত হলো তারা পানামা অতিক্রম করে এসে পৌঁছালো পাটাগোনিয়া-তে। তারা সমুদ্রোপকূলবাসী শিকারী, ধীবর এবং খাত্ত-সংগ্রাহক অর্থাৎ প্রস্তর যুগের এক আদিম শিকার দশার সংস্কৃতির মানুষ। প্রস্তর আয়ুধের নির্মাণ-কৌশলে খুব সামান্যই উন্নতি হয়েছে মাত্র। দক্ষিণ আমেরিকায় সর্বপ্রাচীন মানুষের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে আণ্ডিজের পার্বত্য অঞ্চলে, ব্রেজিলের পূর্বাংশের উচ্চভূমিতে এবং দক্ষিণ পাটাগোনিয়ায়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ ছাড়া বনাঞ্চলের আর কোথাও প্রাচীন মানুষের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ্য যে, এই সব বনাঞ্চল সম্পর্কে খুব সামান্যই জ্ঞান আছে। কারণ এ' সব অঞ্চল গহন অরণ্যে বেষ্টিত, মানুষ্য বাসের অযোগ্য। কাজেই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আরম্ভ করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়।

এইভাবে আদিমযুগে সেই মনুষ্যগোষ্ঠী আলাস্কা হতে ক্রমান্বয়ে স্বদীর্ঘপথ অতিক্রম করে তবে পেরুতে উপস্থিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ তারা প্রথমে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করতো। আগুন জালানো এবং ফ্রিট প্রস্তরের ছুরি নির্মাণের পদ্ধতিও তাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। কি করে চাপ দিয়ে ছিল্কা তুলে (Pressure flaking) চাঁচনি এবং প্রক্ষিপ্ত বাণাণ তৈরী করতে হয়, কি করে অস্থিকে কেটে এবং ঘসে ছেদক ও অস্ত্রাস্ত্র যন্ত্র তৈরী করতে হয়—তাও তাদের জ্ঞান। তারা শিকার করতো বর্ষার সাহায্যে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে, তারা ধনুক ব্যবহারের বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই আদিম মানুষ এই বর্ষা আবিষ্কার করেছে বা ব্যবহার করতে শিখেছে। আর, পৃথিবীর আদিম সব অধিবাসীদের মধ্যে যেমন রয়েছে ভূত-প্রেত বিতাড়নের জন্তু ওবা বা চিকিংসক, এদের মধ্যেও সেসব বিদ্যমান। এরা বিশ্বাস করতো—ঋতুমতী নারীর ওপর শয়তানের ভর হয়। তখন তাদের প্রাপ্ত যৌবনা মেয়েদের দ্বারা স্বতন্ত্র করে রাখা হতো। এই সব আদিম চিন্তাধারার ওপরেই আমেরিকায় মেক্সিকো ও পেরুর সভ্যতা একদা গড়ে ওঠে।

বহু সহস্র বৎসর ধরে এই আদিম মানুষের জীবনে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নি যাকে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে নিজেদের আবেষ্টনীর মধ্যে ক্রমশঃ

তাকে পূর্ণ ও উন্নত করে তুলেছিল। কিন্তু একথাও ঠিক, তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের উন্নতি ছাড়া অধিকাংশ আমেরিকার আদিম অধিবাসী-ই আজও অর্থ নৈতিক জীবনে শিকার, মাছধরা এবং খাণ্ড সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এই পর্যায়ে আজও তারা অবস্থান করেছে।

কৃষি হচ্ছে সকল সভ্যতার ভিত্তি। কৃষি আবিষ্কারের পূর্বে শিকারীজীবনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত সময়ের। কারণ, তখন পশুপক্ষী বা মৎস্য শিকার ছিল অনিশ্চিত। মানুষের সমস্ত সময়ই ব্যয় হতো খাণ্ড অন্বেষণে। সে ছিল ষায়াবর। জীবনে সামান্যতম তখন পরোমাত্রায় বিঘ্নমান। কারণ, সৌভাগ্যবান কোন শিকারী কখনই তার ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর খাণ্ডের দাবীকে অস্বীকার করতে পারতো না। তারও ভয় ছিল, খাণ্ড না দিলে অপরেও ক্ষুধার্ত মূর্ত্তে তাকে খাণ্ড দেবেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুধার্ত মানুষ বলপূর্বক খাণ্ড ছিনিয়ে নিতেও পারে। অপরদিকে, কৃষি আবিষ্কারের পর কৃষক এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে নিজেই স্থায়ীভাবে বাসকরে। এইভাবে সে তৈরী করলো তার স্থায়ী বাসগৃহ। পশুকে পোষ মানিয়ে খাণ্ড তালিকায় মাংস সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করলো যেমন। তেমনই—তখন বীজ বপন করে উৎপাদন করলো শস্য। তখন শস্য পদ্ধি হবার পূর্ব পর্যন্ত সে কিছু অবসর সময় পেল। শস্য সংগ্রহের পর আগামী ঋতুতে পুনরায় শস্য উত্তোলনের পূর্বপর্যন্ত সে আরও অবসর সময় পেল। এই অবসর সময়টুকু মানুষ নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক উন্নতির জন্ত নিয়োগ করলো। সৃষ্টি করলো, এইভাবে গ্রাম ও একরকম সমাজব্যবস্থার। সেই মানুষ উৎসব-আদিতে যোগদান করলো মন্দিরাদি নির্মাণ করলো। এইভাবে সৃষ্টি করলো উন্নততর সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান। এই সকল ঘটনা যে পেরুর আদিম ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

যদিও মিশর, মেসোপটেমিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতির মতন পৃথিবীর বড় বড় প্রাচীন সব সভ্যতাগুলি শুধু অঞ্চলে গড়ে ওঠায় জলসেচের ব্যবস্থা বিঘ্নমান ছিল তবুও, আধুনিক আবহ-তত্ত্ববিদদের মতে বৃক্ষবহুল এলাকা পরিষ্কার করে, বিশেষ করে পার্বত্য উপত্যকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কৃষিকার্যের উদ্ভব হয়েছিল। যাই হোক, আনুমানিক পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে আমেরিকার কিছুসংখ্যক ইণ্ডিয়ান মানুষ প্রধানতঃ বন্য অবস্থা থেকে সংগ্রহ করে বুনো ঘাস বা উদ্ভিদের বীজ তাদের গৃহের আশেপাশে ছোটখাটো জমিতে বপন করে কৃষিকার্যের সূচনা করেছিল। সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই এই ব্যবস্থার উদ্ভব বিভিন্ন স্বাধীন দলের মধ্যে কিছু আগে পিছে হয়েছিল। অন্যথায় এই পদ্ধতির হয়তো আগমন হয়েছিল। শস্য সংগ্রহের পরিশ্রম তখন যথেষ্ট কম। শীঘ্রই মানুষগুলো সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেছিল যে, আগাছা পরিষ্কার করে, জমি চাষে, সার দিয়ে এবং কৃষির অগ্রাগ্র পদ্ধতি প্রয়োগে সেই শস্যকে অনেক পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। তারা সম্ভবতঃ এও উপলব্ধি করেছিল যে, কতকগুলি অবিভক্ত উদ্ভিদ (individual plants) অপরাপর অপেক্ষা অনেক বেশী সতেজ এবং অনেক উৎকৃষ্ট শস্য প্রদান করে। তারা নিকৃষ্ট বীজ বা বুনো ঘাস রোপণ করে ক্রমাগত উৎকৃষ্ট বীজের পর্যায়ে নিয়ে যেতে লাগলো। সেই সবশস্যের শ্রেণীও তখন ক্রমে ক্রমে উন্নত হতে লাগলো। একদলের এলাকার শস্য অপেক্ষা অন্যদলের শস্যের শ্রেণী যদি উৎকৃষ্ট হয় তবে প্রয়োজনের তাগিদেই অপরাপর দলে ঐ উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হয়। শীঘ্রই তখন

এই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শস্ত তাদের নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে বিস্তারলাভ করে। পরিশেষে দীর্ঘকালের রোপণ নির্ধারণ ও ধীর ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে, নূতন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সহনশীল হয়ে এবং সেই আদিম বহু বীজের রূপ সম্পূর্ণরূপে বিবর্তিত হয়ে এই শস্ত বর্তমানের আকৃতিতে এসে পৌঁছেছে। আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসী কয়েক সহস্র বৎসর এইভাবে বপন এবং নির্ধারণ দ্বারা খাণ্ড উৎপাদন করেছে। করেছে এইভাবে আমেরিকা জয়ের সময় পর্যন্ত।

আমেরিকার তিনটি প্রধান উৎপন্ন খাণ্ড ভুট্টা, শিম এবং স্কোয়শ্ এইভাবে অবশেষে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম অংশে। একাধিক জলবায়ুতে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলো। আমেরিকার একটি প্রজাতি হিসাবে পরিচিত মিষ্টি আলু, লঙ্কা মরিচ (chilli pepper), মটরগুটী, তামাক প্রভৃতি খাণ্ড সম্ভবতঃ একই কেন্দ্রে দক্ষিণ আমেরিকার উৎপন্ন হয়েছিল। কারণ, সেখানে উপরিউক্ত খাণ্ডের আদিম নিকৃষ্ট প্রজাতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত অতি নিকৃষ্ট ধরণের শস্তের বয়স কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর। কিছুকাল পূর্বে মেক্সিকোর উপত্যকার দুশো ফুট গভীরে উল্লেখযোগ্যভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে পেমা অবস্থায় ভুট্টার গুড়ো। তুষারযুগীয় কালের দিক দিয়ে এই শস্ত কমপক্ষে ষাট হাজার বৎসরের প্রাচীন। এই শস্ত যে বর্তমান শস্তের পূর্বপুরুষ—এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তা নিশ্চিত। কাজেই প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পার হতে এর আগমনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখন ঘোষণা করছেন যে, ভুট্টা আমেরিকারই উদ্ভিদ; এরই পূর্বপুরুষ ঐ বহু ভুট্টা।

বতদূর জানা যায় তাতে একশোর ও অধিক রকম খাণ্ডশস্ত আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা কর্ষণ করতো। অবশ্য এক একটি এক এক অংশে উৎপন্ন হতো। তাদের মধ্যে ত্রিশটিরও অধিক একমাত্র পেঙ্গুতেই জন্মাতো। এদের মধ্যে লাউ, তুলা, মিষ্টি আলু, সম্ভবতঃ কলা, মটরগুটী, নারিকেল প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র প্রাচীন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত খাণ্ড বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিষ। অবশ্য মিষ্টি আলুর আমেরিকাতেই উদ্ভব।

সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে পশুপালন অবস্থাটা কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থার ঠিক পূর্বের অবস্থায় ছিল বলে কল্পিত। যাই হোক, এটা পুরাতন পৃথিবীতে ঘটতে পারে এবং যদিও সেখানে তা অখ্যাত, তবুও সমগ্র আমেরিকার বেলায় তা খাটে না। কেবলমাত্র লামা ও অ্যালপাকার (এক শ্রেণীর মেঘ) মতন বড়বড় উচ্চভূমিবাসী জন্তু ছিল। কৃষি এবং পশুপালনের মধ্যে কে সর্বপ্রথম এই উচ্চভূমি এলাকায় লালিত হয়েছিল, তা বাস্তবপ্রমাণ ভিন্ন বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তারা বর্তমানের মতনই সমসাময়িক ছিল। যাই হোক, এই লামা এবং অ্যালপাকা উভয়েই পেঙ্গুর প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবনে এমন কি, অতি প্রাথমিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিরা উপত্যকায় এক প্রাথমিক কৃষিস্তরে লামার অস্থি পাওয়া গিয়েছে। গৃহপালিত জন্তু যে তাঁর স্বদেশীয় উচ্চভূমি হতে নিশ্চিতরূপে উপকূলে নীত হয়েছিল, এ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যাই হোক, এই অবস্থা পেঙ্গুর উপকূলে সর্বপ্রাচীন কৃষির পর দীর্ঘদিন—প্রায় এক হাজার বৎসর বিদ্যমান ছিল।

আদি কৃষির যুগ—(আনুমানিক ২৫৫০-১২৫০ খ্রীঃ পূঃ)—পেরুতে “আদি চাষীর যুগের প্রমাণে যুগপাত্তের ব্যবহার অল্পপস্থিত। যখন কতকগুলি নতুন উদ্ভিদ খাও, বিশেষ করে ভুট্টার (পরবর্তীকালের প্রধান উৎপন্ন খাও) একই সময়ে প্রচলন হয়েছিল তখনই যুগপাত্ত এবং কৃষি ব্যবস্থার এক বিরাট ও হঠাৎ উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল।

এই যুগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পেরুর উত্তর উপকূলেই সীমাবদ্ধ। এই সময়ের উচ্চভূমির অবস্থা আরও উন্নত বা বেশী প্রতিবন্ধকতা পূর্ণ ছিল কিনা—তাও আমাদের অজ্ঞাত। মূলতঃ, আমরা একটি প্রান্ত থেকেই সব তথ্য পাচ্ছি। অবশ্য উত্তর দিকের উপকূলে তিনটি এবং মধ্যাংশের উপকূলে একটি প্রাক-যুগপাত্ত যুগের প্রান্তের কথা জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে একটি প্রান্তেই ভালভাবে খনন করা হয়েছে স্বীকৃত তথ্য প্রাপ্তির আশায় চিকামা উপত্যকার মুখে, ছয়াকা প্রিয়েটোতে। পেরুতে এইটিই হচ্ছে কালের দিক দিয়ে জ্ঞাত সর্বপ্রাচীন এবং আমেরিকার জ্ঞাত প্রাচীনতম কৃষির প্রান্ত। প্রান্তটি পেরুর উপকূলের সুপ্রাচীন যুগের এক সুন্দর জীবনের ছবিই আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে।

ছয়াকা প্রিয়েটার টিবিয় সর্বনিম্ন স্তরে প্রাপ্ত এবং শিলাগাত্রে অবস্থিত কিছু অঙ্কারের নমুনা রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, তা কমপক্ষে চারহাজার বৎসরের প্রাচীন। সেই সুপ্রাচীনকালে এই চিকামা উপত্যকার মুখের অবস্থা সম্ভবতঃ বর্তমান থেকে কিছু স্বতন্ত্র রকমের ছিল। সম্ভবতঃ নদী তখন আরও বেশী জল বহন করতো। অগভীর জলাশয় এবং বিলও সেখানে বিদ্যমান ছিল। সেখানে আরও বেশী সরস উদ্ভিদ জন্মাতো। অর্থাৎ একটি বিরাট এলাকা কৃষিকাজের জন্য পাওয়া যেত। আর বৃহত্তর পরিমাণে পশুজীবন, বিশেষকরে পক্ষী সেখানে বিদ্যমান ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশের তীরবর্তী অঞ্চলের মতই মাছ ধরে, বুনো গাছপালা সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে অতি সাধারণ কৃষিকাজের মতন অর্থনৈতিক অবস্থার মাধ্যমেই তারা জীবন নির্বাহ করতো। সেই জনসংখ্যা খুব পাতলা হলেও এই অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট বেশী। সেই সময়ে খাওয়ার অধিকাংশই সম্ভবতঃ সংগৃহীত হতো জালের সাহায্যে মাছ ধরে। কারণ, ঐ জায়গা হাতের সহায়তায় মাছ ধরার পক্ষে উপযুক্ত নয়। অবশ্য শেষোক্ত পদ্ধতিতে যে ছোট ছোট মাছ ধরা হতো তা শঙ্খের ছোট ছোট বঁড়ীীর আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে। এই বঁড়ীীগুলি পরিষ্কার জলের ছোট ছোট মাছ ধরার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। মনে হয়, এই মানব-গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনে শিকার, তা সে সমুদ্রের শুভ্রপায়ী জীবই হোক আর স্থলের জন্তুই হোক—খুব অল্প অংশই অধিকার করেছিল। কারণ, কোন অস্ত্রই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এমন কি, কোন স্থলচর জন্তুর অবশেষও পাওয়া যায় নি। কেবলমাত্র জল-সিংহ, গুপ্তক এবং সামুদ্রিক পক্ষীর কয়েকটি অস্থির আবিষ্কার সেগুলি শিকার করা না-ই হয়ে থাকে তবে কোন এক সময়ে সেগুলি নিশ্চয়ই খাওয়া হয়েছিল। অপরদিকে, সাধারণ কৃষিকাজ ছাড়াও সমুদ্রের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে আরম্ভ করেছিল। সেই সময়ে প্রধানতঃ সামুদ্রিক খাওই সংগ্রহ হতো যেমন—মাছ, বিলুক, কঁকড়া, এমন কি জল-শজারুও। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, সেই শঙ্খ তথা বিলুকগুলি বেশ

গভীর জলে বাস করতো। পনের থেকে কুড়ি ফুট জলের গভীরে ভিন্ন খুব কমই ওপরে তাদের পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষগুলি ছিল হৃদয় সাঁতারু।

উপরে বুনো গাছপালার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেগুলি ছিল অতিরিক্ত খাচ্। যেমন ক্যাটটেল (Cat-tail) নামক এক ধরনের উদ্ভিদের শিকড়, রাশ্ (এক শ্রেণীর তৃণ) এবং সেক্স-এর (এক রকমের লতা) মূল এবং বিভিন্ন স্থানীয় বন্যফল।

কৃষির ব্যাপারটাই জটিল। উত্তরকালে প্রধান খাদ্য হিসাবে পরিচিত শস্ত অর্থাৎ ভুট্টার বিলুপ্তি হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিভিন্ন রকমের শিম, লাউ, স্কোয়াশ, লঙ্কামরিচ, তুলা প্রভৃতি চাষ করা হতো। অবশ্য এদের মধ্যে কিছু কিছুর অরণ্যে জন্মানোও অসম্ভব নয়।

তুলাকে এশিয়া আমেরিকার এক সম্বর উদ্ভিদ বলে মনে করা হয়। পলিনেশিয়া থেকেই সম্ভবতঃ লাউ আমেরিকায় এসেছিল। সেই সময়ে মানুষে খাদ্যব্যবস্থাপনায় ছোট উদ্ভিদ প্রস্তরের সাহায্যে, সম্ভবতঃ জলের সঙ্গে মিশ্রিত খাদ্যের মধ্যে সেগুলি ফেলে রাখা করতো। এই পদ্ধতিতেই রাখা করতো যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানরা।

পেরুর সেই আদিম মানুষের ঘরগুলি ছিল ছোট ছোট। একটি প্রকোষ্ঠ এবং ঘরগুলি ভূ-পৃষ্ঠের নীচে প্রায় গর্তের মধ্যে তৈরী। দেওয়ালগুলি ছোট পাথর দিয়ে তৈরী হতো। একটি আদিকৃষির প্রান্তে প্রস্তর দুর্লভ। সেখানে আয়তাকার ইটের দ্বারা ঘর তৈরী হয়েছে। ছাদ তৈরী হতো বৃক্ষকাণ্ডের সাহায্যে। আর স্তম্ভের ওপর থাকতো তিমির অস্থি। সর্বপ্রাচীন কবরগুলি প্রধানতঃ মাটিতেই খনন করা হয়েছিল; কিন্তু কিছুকাল পরে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে ছোট ছোট প্রস্তর দ্বারা আস্তর এবং আচ্ছাদন দিয়ে কবর দেওয়া হয়েছে।

সামান্য বা হস্তশিল্পের নিদর্শন পেরুতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়েছে, তাই-ই সেখানকার মানুষের জীবনের সরলতাকে প্রকাশ করছে। পেরুতে যুৎপাত্র এই পর্যায়ে অনুপস্থিত। এমন কি, প্রতিটি প্রান্তে চাপ দিয়ে ছিল্কা তুলে তৈরী বিভিন্ন প্রস্তর যন্ত্র, ছুরি এবং প্রস্তুত বাণাগ্র ও অনুপস্থিত। কিন্তু এই চাপ দিয়ে ছিল্কা তোলার কৌশলের অনুপস্থিতি খুবই আশ্চর্যজনক। কারণ, এই কৌশল হচ্ছে পুরাতন পৃথিবীর অন্যতম নিদর্শন। খুব হৃদয় ভাবে চাপ দিয়ে ছিল্কা তুলে যন্ত্রপাতি বা আমেরিকায় তৈরী হয়েছে, যাকে বলা হয় পশ্চিমাঞ্চলীয় যুক্তরাষ্ট্রের “যুমা বাণাগ্র” (yuma point)—তা সাড়ে সাড়হাজার বৎসরের প্রাচীন। আর ছুরিকা প্রিয়েটার প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রগুলি হচ্ছে পুরাপ্রস্তরের ধরনের (type)।

এখানে অস্থি দিয়ে তৈরী একমাত্র প্রাপ্ত যন্ত্র হচ্ছে একটি বেধনী এবং একটি কাঠের দাঁড়ের তলার মতন লাঠি—সম্ভবতঃ খননের কাজে ব্যবহৃত হতো। এখানে কোন মালা বা অস্ত্র কোন রকম অলঙ্কার পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র হাজার হাজার প্রাপ্ত জিনিষের মধ্যে ছয়টি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যাতে কেবল অলঙ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। সেগুলি অত্যন্ত সুল। মানুষগুলির যে তখনও রুচি জ্ঞানের বোধ জন্মায় নি, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

পেরুর সেই মানুষগুলি বস্ত্র ছেঁচে বস্ত্র তৈরী করতো। আশ্চর্যের বিষয়ই বটে! কারণ, এ জিনিষটা হচ্ছে বস্ত্র সংস্কৃতিরই একটি উপাদান; আঙুলি এলাকার নয়। যতদূর মনে হয়, তাতে

মাছর ও ঝুড়ি তৈরী করা হতো রাশ্ (Rush) ও খাগড়া পাকিয়ে। কিন্তু, সম্ভবতঃ সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক শিল্প জাত দ্রব্য ছিল বোনা কাপড়। সম্ভবতঃ এই সময়ে উপকূল অঞ্চলে পশম অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত বয়নশিল্পই ছিল তুলার, অল্প কয়েকটি মাত্র স্থানীয় উদ্ভিদের আঁশ থেকে তৈরী। তাদের মধ্যে চার ভাগের তিনভাগই তৈরী হতো বয়ন করে। চতুর্দিকে এই অতি প্রাচীন পদ্ধতিটি বিস্তারলাভ করেছিল। চওড়া বুনানির মাছের জাল ও থলে তৈরীর জন্য কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। এই সব পদ্ধতি পরবর্তীকালে ছিল বটে, তবে সেখানে প্রকৃত বয়নের নিদর্শনও রয়েছে। বিভিন্নযুগে কাজের সন্তোষজনক ফলাফলের কথা চিন্তা করে বয়ন পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। তবে হাত দিয়েই স্বতো পাকানো হতো। কাপড়গুলি হতো ছোট ছোট। চওড়ায় বড়োজোর আট ইঞ্চি, এর বেশী কখনই নয়। আর দৈর্ঘ্যে এর দ্বিগুণ। প্রতিটি খণ্ড কোন রকমে বুনে যুক্ত করা হতো। রঙের মধ্যে কেবল নীল-ই এখানে পাওয়া গিয়েছে।

এই হচ্ছে পেরুর অতি প্রাচীন জাত জনসংখ্যার মোটামুটি চিত্র। তারা ছিল অলসপ্রকৃতির সাধারণ শাস্ত্রশিষ্ট মানুষ। বাস করতো একটা ছোট সমুদ্র দ্বারা সৃষ্ট কর্ণ বোয় মরুতানে। জীবন ধারণ করতো মাছ ধরে এবং কয়েকটি খাদ্যশস্যের উন্নতি করে। ছোট, সাধারণ ও স্থাপত্যহীন ঘর ছিল তাঁদের আশ্রয়স্থল, আর অর্থনৈতিক ও গৃহীজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কাজও করতো। কিছু কলার চর্চায়ও তারা মনোবোগ দিয়েছিল।

প্রমাণ পঞ্জী

BANDELIER, Adolf Francis—The Indians Aboriginal Ruins near Chachapopas, Northern Peru, New York (1907). BENNETT, Wendell C. (Editor)—A Reappraisal of Peruvian Archaeology, Memoir 4, Society for American Archaeology, Menasha (1948). MEANS, Philip Ainsworth—Culture Sequence in the Andean Area., Int. Cong. of Americanists, XIX, p. 236—52, Washington (1917). TELLO, Julio C.—Andean Civilization. Some Problems of Peruvian Archaeology, Int. Cong. of Americanists, Sess. 23 (1928), p. 259—290. New York.

জীবনী ও আত্মজীবনী

মানসী দাশগুপ্ত

কেন লিখি—এ বিষয়ে নানারকম লেখকের নানা মত শোনা যায়, পড়াও যায়, সে অবশ্য কাহিনী কবিতা ইত্যাদি সৃজনীমূলক লেখার বিষয়ে। প্রবন্ধকার অথবা জীবনীকারকে তাঁর লেখার কারণ নিয়ে জবাবদিহি করতে শুনেছি বা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তার কারণ সম্ভবত এই যে সকলেই জানেন এবং মানেন যে এ সব রচনা “লোকশিক্ষার নিমিত্ত”, অথবা নিদেন পক্ষে অপরের জ্ঞানবুদ্ধির জন্ত। অর্থাৎ, এগুলি পড়ে কিছু শেখা বা জানা যায়। আর লেখাপড়া করাই যেহেতু শিখবার, জানবার জন্ত—তাই লিখে কেউ শেখাচ্ছেন বা জানাচ্ছেন কেন—এ প্রশ্ন অচল। এ সব শেখা বা জানা কতদূর মূল্যবান হবে তা অবশ্য নির্ভর করে প্রবন্ধ বা জীবনীকার যে বিষয় নিয়ে লিখেছেন সেটি স্বয়ং কতদূর শিখেছেন, জেনেছেন এবং সে লব্ধবিজ্ঞা ও জ্ঞানকে নিজস্ব মৌলিক চিন্তায় পাক করে অল্পকৈ পরিবেশন করতে শিখেছেন কিনা তার ওপরে। এই পরিবেশনার কথাটি খুব জরুরী কথা। এমনিতে নিজ নিজ সংগ্রহে অল্পস্বল্প বিজ্ঞা, তথ্য, আপ্তবাক্য যা আছে তা আমরা সবাই পারস্পরিক কথোপকথনে, চিঠিতে পত্রে, জেনে না জেনে আদানপ্রদান করি এবং এ বাবদে আমরা প্রত্যেকেই জনশিক্ষার বাহক বলে পরিগণিত হতে পারতাম। তা যে হতে পারিনে সে ঐ প্রাকপ্রণালী না জানায়, যদি হয়ে উঠি সে ঐ প্রণালীর গুণেই।

বাংলার প্রবন্ধশৈলীর ভাষাগত মান এখন অনেক উঠে গেছে যদিও বিষয়গত ব্যাপ্তি এখনো সীমিত। মনে হয়, ও খেদও ঘুচে যাবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন আলোচনা ক্ষেত্রে নানা চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার ভাগ আমরা বাংলা প্রবন্ধে পাবো। ঠিক এই একই কথা জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায় কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সত্যি বলতে কি, জীবনীকারেরা কেন জীবনী লেখেন—এ প্রশ্ন তুললে তার উত্তরে এ কথা সর্বদা বলা যায় না যে তাঁরা তাঁদের চিন্তার ভাগ আমাদের দিচ্ছেন। কখনো কখনো তাঁদের নিয়ে আমরা চিন্তায় পড়ি বটে কিন্তু সে চিন্তার দায় আমাদেরই। জীবনীপাঠের মাধ্যমে বিশুদ্ধ চিন্তার খোরাক খোঁজা হয় না, একেবারে শুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রও জীবনী নয়। আমরা জানি, জীবনী একটি সত্য কাহিনী। ‘সেই সত্য যা রচিবে তুমি’ বলে এখানে লেখককে মুক্ত হস্তের পরোয়ানা দিয়ে দেওয়া হয়নি, এ কাহিনীর সত্যাসত্য পূর্বনির্ধারিত। কোনো এক স্বভাবস্বজিত সত্যঘটনাকে কাহিনীর মধ্য দিয়ে পুনর্পরিবেশনার দায় জীবনীকারের। সেখানে তথ্য যথার্থ ও পক্ষপাতদোষমুক্ত হওয়া যেমন জরুরী, তেমনি জরুরী সংগৃহীত তথ্যচিত্রগুলি মিলিয়ে একটি সমগ্র জীবনকাহিনী গড়ে ওঠা।

সমগ্র জীবনকাহিনী মানে কী? সকলেই জানে প্রতিটি মানুষ জন্মায়, জীবনযাত্রাকালে কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক অভাববোধ এবং এ সমস্ত অভাবের নিবৃত্তির চেষ্টায় সুখদুঃখ আবেগআর্তির আন্দোলন চলে তার জীবদ্দশার প্রতিমুহূর্তে। এই সবগুলি জড়িয়ে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ভাঙে এবং পরিশেষে মৃত্যুতে লয় পায়। কেউ কিছু বেশিদিন

বাঁচে কেউ কিছু কম। কেউ আত্মজ্ঞ আত্মজ্ঞা রেখে যায় কেউ যায় না। তাতে কিছু এসে যায় না। স্বভাবের অব্যর্থ নিয়মে জন্ম থেকে মৃত্যু প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনেই সামগ্রিকতা আনে স্রু থেকে শেষের সম্পূর্ণতা। সেটা ভালো মন্দ সংগত অসংগত যাই হোক না কেন সে লেখা যেহেতু বিধাতার কলম থেকে বেরিয়েছে, সে বাঁকাচোরা কিংবা সাধাসিধা যেমন তেমন করে সারা হলেই সম্পূর্ণ। জীবন যেভাবে সৃষ্টি হয় তা অমনি অনিবার্য। কিন্তু জীবনীচরিত্র তেমন অনিবার্য ঘটনা নয়। জীবন আছে বলেই জীবনী লেখা যাবে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে এ কথা ভেবে এগোনো শক্ত। যেমন তেমন যে কোনো জীবনচরিত্র জীবনী হিসেবে লিখবার ধৈর্য ও সাহস যদিবা কোনো লেখকের হঠাৎ এসে যায়, এর কম জীবনী প্রকাশ করবার মতো সহৃদয় প্রকাশক সহসা সংগ্রহ করা কঠিন।

মোটকথা জীবনী লেখা হয় তাঁদেরই যাঁদের জীবন কোনো না কোনো ভাবে চিহ্নিত ভাস্বর। তাঁরা এমন কিছু দিয়েছেন, করেছেন কিংবা এমন জীবন কাটিয়েছেন যাতে মানুষের মনে তাঁদের নিয়ে কৌতূহল জেগেছে। এই বিশেষ কৌতূহল চরিত্রার্থ করবার কিংবা আরো গভীরতর বিশ্লেষণ জাগিয়ে তোলাবার দায় জীবনীকারের। এই কঠিন দায় শোধ করবার জন্য জীবনচরিত্রে যে সামগ্রিকতা সাধন করতে হয় তার কেন্দ্রে থাকে জাতকের প্রধান সর্বজনজাত ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ তিনি যদি গায়ক হয়ে থাকেন তবে তাঁর গায়কচরিত্রই হবে জীবনকাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর গায়কীবৈদগ্ধের উৎস সন্ধান করে সে উৎসমুখ থেকে নানা বিচিত্র প্রবাহ যেখানে যেমন বয়ে গেছে তার পুরো একটি ছবি জীবনীতে দেখাতে পারলে তাঁর জীবনীকারের চেষ্টা সার্থক হবে। সেই সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা ও গায়কসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কটুকু জীবনীতে ফোটাতে পারলে জীবনের সমগ্র কাহিনীটি আরো গভীর সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। সে কারণে তাঁর গায়কসত্তার বাইরে বাকি জীবনের কথাও বলা হয় প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনমত। তেমনি, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, ধর্মপ্রচারক সকলের বেলাই এমন করে তাঁদের বিশেষ সত্তাটিকে ঘিরে বাকি জীবনের কথা সাজিয়ে সমগ্র কাহিনী গড়তে হয় জীবনীকারদের। জাতক প্রত্যহ দেড়পোয়া দুধ পান করতেন কিনা কিংবা ঠিক কোন চাকরের হাতে পান সাজা না হলে তাঁর মুখে রুচতোনা এ সমস্ত দিনগত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য কোনো কোনো জীবন-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে, আবার কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে এগুলি হয়তো একেবারেই আবশ্যক নেই। আমাদের ভাষায় লিখিত জীবনীতে প্রায়ই এগুলির বাহ্যিক দেখতে পাওয়া যায়, এর কারণ অবশ্য এও হতে পারে যে লেখক দেখাতে চান যে এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন জাতকও পনেরো আনা পাঠকের মতো দৈনন্দিন তুচ্ছতায় জড়িয়ে থাকতো, সে সাধারণের চেয়ে এমন কিছু বেশি তফাৎ তা নয়, তবু সে অসাধারণ। এতে পাঠকের পক্ষে একই কালে জাতককে আপনাতর লোক ভাবা এবং আদর্শ পুরুষ বলে অভিভূত থাকা সহজ, সম্ভব হয়। গাঙ্কীজীকে নিয়ে লেখা কিছু কিছু চরিত্র কথায় লেখকের এই জাতীয় চেষ্টার আভাস মেলে।

জীবনী নানাভাবে লেখা সম্ভব। তিন চারটি শ্রেণী বিভাগ যাতে বাংলা জীবনীসাহিত্যকে মোটামুটি ছ'কে ফেলা যায় সেগুলির কথা বলি।

নৈর্ব্যক্তিক লিখিত :—লেখক নিজেকে আড়ালে রেখেছেন (হয়তো তিনি জাতকের

কালের লোকই নন) জাতকের জীবন কথা বলে যাচ্ছেন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের মতো, ঘটনা পরস্পরায়। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ চরিত্র এজাতীয় রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ভঙ্গীতে বাংলা ভাষায় অনেক জীবনী খুব দক্ষভাবে লেখা হয়েছে।

ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ ভাবিত :-লেখক নিজের উপস্থিতি আদৌ আড়াল করেননি, বিবৃত ঘটনাবলীতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত। এ ধরনের লেখার অনেক ক্ষেত্রে লেখককে যে জাতক কত স্নেহ করতেন এবং সে আত্মার জোরেই যে তিনি এ জীবনী লিখতে অগ্রণী হয়েছেন এ কথা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে। অতঃপর জাতকের মতো জীবনীকারের বিষয়েও পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়ে। শ্রীদ্বীপকুমার রায়ের স্বভাষচন্দ্র বিষয়ক রচনা, শ্রীযুক্তা লাবণ্য দাশ কৃত জীবনানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র, শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের 'উপেন্দ্রকিশোর' ইত্যাদি বিবিধ রচনাকে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজে লেখা উপরিউক্ত রচনারীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নয় আবার সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকও না হওয়াতে এতে তথ্য ও স্মৃতির সমাবেশ ঘটানো সহজ হয়। এ ধরনের লেখার বহুল প্রসারের সম্ভাবনা আমাদের সাহিত্যে আছে।

স্মৃতিচারণ ভাবিত :-ব্যক্তিগত উল্লেখকে আরো একটু প্রাথমিক এবং প্রাসঙ্গিক করে জাতকের জীবনরচনার পরিবর্তে ভাষকের স্মৃতিমহনের পটভূমিকায় জাতকের জীবনের একাংশকে এনে ফেললে জীবনীচিত্রের স্বাদে ও চেহারায় বদল আসে। সেই বদলের নমুনা মিলেছে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি', শ্রীমতী রাণী চন্দ্রের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি অসংখ্য স্মৃতিউদ্ভাসিত জীবন আলেক্য। এ ধরনের স্মৃতিসংলাপী রচনার, বলাই বাহুল্য, জাতকের সমগ্র জীবনকাল বিধৃত হয় না। তাতে এজাতীয় চরিত্রচিত্রণের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না কেননা এ হল জাতককে নিয়ে একটি ছোটো গল্প লেখার মতো, সেইটুকু পরিসরে, সেই বিশেষ অভিজ্ঞতামণ্ডলে তার সম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে কিনা তার ওপরেই এ রচনার সার্থকতা নির্ভর করে। আশীর্বাদিত জাতকদের চরিত্রে যে বিভিন্ন চারিত্র্য ঐশ্বর্য তা নানা মনের নানাস্মৃতির ধ্যানধারণায় আশ্চর্য বৈচিত্র্য বিস্তার করতে পারে—সে বিস্তারের ছবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অদীত জাতকের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে, তাঁকে কাছে পেতে সাহায্য করে।

ইতিপূর্বে বলেছি যে জীবনীতে সাধারণতঃ চিন্তার খোরাক খোঁজা হয়না। কিন্তু জীবনীচিত্রে লেখক তাঁর চিন্তার ভাগ আমাদের দিলে যে তা কতদূর মূল্যবান হতে পারে তার প্রমাণ পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতল্লাহা হিড়ী ও তৎকালীন বংগসমাজ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চারিত্র পূজা' এবং সমতুল্য রচনাতে। অথচ এ জাতীয় রচনা আজ পর্যন্ত অল্পই লেখা হয়েছে। স্মৃতিচারণরীতিও অল্পকাল যাবত প্রসার পেতে সক্ষম করেছে। অর্থাৎ যদিও বাংলাভাষায় অনেক উল্লেখ্য জীবনী লেখা হয়েছে তবু এখনো পর্যন্ত জীবনীরচনার বিভিন্ন সম্ভাব্য পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বাংলাভাষায় জীবনী রচনা একটি অপেক্ষাকৃত অবহেলিত বিষয়। জ্ঞানান্বেষণের এবং জ্ঞানপ্রসারের যে আগ্রহ নিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচনার লিপ্ত হওয়া সম্ভব সে অন্বেষণী আগ্রহ ব্যক্তিজীবনের প্রতি আমাদের সমাজে সহজে অগ্রসর হতে চায় না। মানুষকে নিয়ে আমরা কৌতূহলী কিন্তু আগ্রহী নই। সে কারণে এ কৌতূহলকে কোনো সংগত,

ভদ্র স্বীকৃতি দেওয়া খুব শক্ত হয়ে ওঠে। তখন কারো দিকে লক্ষ্য দিতে হলে সেটা ভক্তি অথবা অনুরূপ কোনো গভীর আবেগের অছিলায় দিতে হয়। ভক্তজন গুরুর জীবনী লিখবেন এতে অসঙ্গতির প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ, ভিন্নভাষায় বলতে গেলে মানুষকে মানুষের সহজ অধিতব্য বিষয় করে তোলার ব্যাপারে আমাদের সামাজিক চিন্তার নানা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বাধা থাকার ফলে জীবনকথা এখানে এখন পর্যন্ত শিশুপাঠ্য আদর্শ প্রবন্ধমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রাবন্ধিক আলোচনার জগতে গৌরবের আসন নিয়ে বসেনি। জীবনী মানেই মহাপুরুষ প্রসংগ—এ কথাটাই অনেকদিন ধরে গ্রাহ্য ছিল। কোনো আশ্চর্য গুণী, জ্ঞানী কি ধার্মিকের বর্ণনা জীবনে মহত্বের বিচার ছাড়াও আরও যে শতসহস্র রঙেরও বৈভবের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ সম্ভব এবং তার জন্য চাই বিনাপক্ষপাত তথ্যালুসন্ধান, এ সব ভাবনা, মনে হয়, দিনে দিনে আমাদের জীবনীকারদের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নানাধরণের জীবনী রচনার চলনও সেইজন্য ক্রমে ক্রমে বেশি দেখা যাচ্ছে। এ বোধ যত বাড়ে যত শীঘ্র বাড়ে ততোই মংগল। কেননা সংসারে আদর্শ তুলে ধরবো বলে জীবনী লিখতে বসলে আদর্শকে তুলে ধরা হয় কিনা জানিনে, কিন্তু যথার্থজীবনী লেখা যে খুব শক্ত হয়ে ওঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবনী লিখতে বসলে প্রত্যেক লেখকের উচিত বারবার “কেন এ জীবনী লিখছি” এই আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেকে বিদ্ধ করা।

আত্মজীবনিকে নাম স্ববাদে জীবনীর সংগে একই গোড়ভুক্ত করা হয় এবং নানাক্ষেত্রে এ দুয়ের প্রকার প্রকরণ মিলে মিশে একই হয়ে যায় কিন্তু রচনা হিসেবে আত্মজীবনীর তুলনা অথ কোনো সাহিত্যিক সংলাপে সম্ভব নয়। আত্মজীবনী জ্ঞাতকের নিজের অস্তিত্বের, নিজের ব্যক্তিত্বের জবাবদিহি। এ জবাববন্দীর জন্য কে জ্ঞাতকে সমন পাঠায়? অনেকক্ষেত্রে প্রকাশক, কৌতুহলী জনসাধারণ, বন্ধুজন। কিন্তু তার চেয়েও ঢের জরুরী, জোরালো সমন আসে মনের ভিতর থেকে, আপনার তাগিদে জ্ঞাতক আপনাকে আপনার আয়নার দেখে নিতে চায়, এবং নিজের চোখে দেখা নিজেকে অপরের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করতে চায়। এর ভিতরে আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপ্রাণা, আত্মপীড়ন ইত্যাদি স্বসংঘাতী যতগুলি মতিবৃত্তি মিশে থাকে থাক, অপরকে যথার্থ জ্ঞানদানের সদিচ্ছা তার ভিতরে প্রধানতম নয়—এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়।

সাধারণভাবে মুখে মুখে এক ধরণের আত্মকাহিনী আমরা সকলেই রচনা করে থাকি। অসংখ্য আত্মজ্ঞান, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জনকে নিভৃত মুহূর্তে নিজের নিজের জীবনের যতো কাহিনী, নিজ নিজ ব্যর্থতা বা সার্থকতার যতো কারণ ব্যাখ্যান আমরা সারা জীবন জুড়ে কথায় কথায় করে দিয়ে যাই সে সমস্ত বাক্যরাশি জড়ো করে লিখে দিলে আমরা অনেকেই বৃহৎ আত্মজীবনীকার বলে বিবেচিত হতে পারতাম। দেবী সরস্বতীকে ধন্যবাদ, ও রকম লিপিকার আমাদের পিছু পিছু ফেরেন না। ফলে, আমাদের মুখে মুখে রচা আত্মচরিত হাওয়ায় হাওয়ার হারিয়ে যায়। আমরা চলে যাই, আমাদের আত্মজীবনও অন্তর্ধান করে। যাদের আত্মজীবনী থেকে যায় এবং প্রসার পায়, তাঁরা পাঁচজনের থেকে জীবনযাত্রা বিধায় স্বতন্ত্র এবং তাদের অন্তর্ধানের বহু পরেই সাধারণত তাদের আত্মজীবনী প্রকাশ করা হয়। এর ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। সে ব্যতিক্রমের উল্লেখ আত্মজীবনী রচনার বিভিন্ন ধারার আলোচনার শেষে প্রসংগক্রমে যথাস্থানে করা হবে।

আত্মজীবনী স্মৃতিচারণমূলক হতে পারে, ধারাবিবরণমূলকও হতে পারে। প্রায়ই এ দুয়ের সম্মিলিত চেহারা আমরা আত্মজীবনীতে দেখতে পাই। এ বৈষম্যের চেয়ে আরো অনেক গ্রাহ্য শ্রেণীবিভাগ খুঁজলে যে পৃথক পৃথক রচনাভঙ্গী মিলবে সেগুলিকে মোটামুটি নিচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। এগুলির ভেদাচহ্ন সর্বত্র সমান স্পষ্ট নয়, এবং আমাদের ভাষায় জীবনীর মতো আত্মজীবনীও দুর্লভদর্শন বলে এর প্রতিটি বিভাগে যথাযোগ্য নমুনা তুলে ধরাও সহজ নয়। তবু মোটামুটি প্রভেদগুলি লক্ষণীয়।

আত্মকেন্দ্রী আত্মজীবনী : লেখক নিজের গল্পই বলছেন, তাঁর দৃষ্টি কাহিনীর সেই কেন্দ্রবিন্দুতেই নিবদ্ধ। জগতের অন্ধ বা কিছু সে কাহিনীতে প্রতিফলিত হচ্ছে তা কেবল সে সব কিছু লেখকের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে বলেই, সংসারে কোনো মাল্লষই সম্পূর্ণ নিঃসামাজিক একক নয় বলেই। শ্রীমতী রাসহৃন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’ আত্মকেন্দ্রী আত্মজীবনীর একটি সুন্দর, করুণ নিদর্শন।

পরিবেশ কেন্দ্রী আত্মজীবনী : লেখক যে সমাজ জগতে এবং জীবনে দিনপাত করেছেন তার আলোয় নিজেকে দেখছেন। তার স্থান কাল, পরিজন পরিবৃত্ত জগত তাঁর রচনার প্রাধান্য পেয়েছে কেবল পটভূমি হিসেবে নয়, তাঁর মূল বক্তব্য বিস্তারেও। এই বিচিত্র আধার বেয়ে তিনি যেভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন সেই-ই তাঁর আত্মপ্রকাশ। তাঁর আত্মপ্রকাশের মূল চিত্রটিকে কেন্দ্র করে পারিপার্শ্বিক কেবল চালচিত্র রচনা করেছে, এমন নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘আত্মচরিত’ এ জাতীয় রচনার একটি প্রধান উদাহরণ।

উপরিউক্ত দু’টি রচনা ভঙ্গীতেই লেখক এসে থামেন যখন তিনি লিখেছেন বর্ণিত ঘটনাবলী সে সময়ের কাছাকাছি এসে গেলে।

কর্মকেন্দ্রী জীবনচিত্র : লেখক তাঁর সবটুকু কথা বলতে বসেননি, বলবার তাঁর সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই। তাঁকে যেন কেউ জিজ্ঞাসা করেছে কী করে এ পথে এলেন আর তিনি তার উত্তর দিচ্ছেন, উত্তর দিতে গিয়ে পথে আসতে কী হলো, কাদের দেখা পেলেন, কাদের হারিয়ে ফেললেন, কতটুকু কাজ শিখলেন, কী শেখা হলো না এই সব ছবিতে রেখা এঁকে বঁকে চলেছে। এমনি করে বাংলা সাহিত্যের স্নিগ্ধতম আত্মচিত্র ঝাঁকা হয়েছে সে আত্মচিত্রলিপির নাম ‘জীবনস্মৃতি’ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে কর্মকেন্দ্রী জীবনীতে লেখক কখন থামবেন এ বিষয়ে কোনো বাধাবোধ নেই। এমনকি যে কোনো ভাবেই লেখা হোক, আত্মজীবনী বাধ্যকতামূলকভাবে অসমাপ্ত। জীবন শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ কাহিনীর জের চলতে পারে না, কেননা মৃত্যুর পরে তো প্রথমপুরুষের ভায়ে আত্মকথা লেখা যায় না। আত্মচরিতে তাই জাতকের জীবন কোথায় শুরু আর কোথায় কখন শেষ এ হিসাব করে কাহিনীর সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা বিচার করা যায়না।

আত্মচরিতে সেরকম সামগ্রিকতা খোঁজাও হয়না। জাতকের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে আত্মকথনের মূল্যবান দলিলগুলিকে সত্যমূল্যে সাগ্রহে গ্রহণ করা হয় জাতকের জীবন বিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে। নিভৃত আত্মকথনের স্বর কিছু অসহ রকমের আন্তরিক, অকপট কঠিন হওয়ায় ভয়ে জাতকের মৃত্যুর পরে অনেকটা সময় দিয়ে আত্মকথা প্রকাশ করা হয়। সাধারণ নিয়ম হলো এই। জীবনস্মৃতি একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম।

‘জীবনস্মৃতি’ রবীন্দ্রনাথ জীবিতাবস্থায় স্বয়ং প্রকাশ করেছিলেন—তঁার জীবনের কঠিনতম শোককে মধুরতম ভাষায় বর্ণনা করে এবং তাঁর কবিতার নানা পর্বাস্তরিক ঘটনাবলীকে এক সমগ্র নিটোল আত্মপ্রকাশের কাহিনীতে রূপান্তরিত করে। কবির দেখায় কবিকে এবং কবির জগতকে দেখলে কেমন দেখায়—রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখালেন। তিনি ছিলেন জাহ্নবীর তাই সে দেখায় আমরা টের পেলামনা যে, কবির চোখে মাল্লখটিকে কেমন দেখায় তা আর আমাদের দেখা হলনা। তবু এ ফাঁকিতে আমাদের ফেলে গেলেও, বলতেই হয় আত্মবর্তার বতটুকু যা স্বাদ বাংলা সাহিত্যে মিলেছে, তা এসেছে ঐ রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েই—জীবনস্মৃতির পথ ধরে। যে মাল্লখকে তার বহিরঙ্গতার ধরাছোঁয়া যায়না, জীবনচরিত যাকে চিত্রিত করতে পারেনা, সেই অন্তরতম স্বজনশীলতাকে এক দুর্লভ জাতকই তাঁর স্বজনী দৃষ্টি দিয়ে দেখে ও দেখিয়ে যেতে পারেন, এ বোধ রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর জীবনস্মৃতির অল্প একটু আভাস দিয়ে।

বিশুদ্ধ আত্মজীবনী, যা স্বার্থ নিভৃত আত্মকথন, যা অল্প কোনো জীবনীকারের ঐতিহাসিকের অনুমানের বিষয় নয় বা আয়ত্তগম্য নয়, এদের কারো ঐকান্তিক সাধনাতেও বা সৃষ্টি হবেনা, সেই অসূর্যস্পষ্ট জীবনদৃষ্টি বাংলা ভাষায় আজো লেখনীর রেখায় ধরা পড়েনি। আত্মজীবনীর নামে আমরা যা পেয়েছি, তা প্রধানতঃ আত্মকাহিনী বা অল্প যেকোনো তীক্ষ্ণদৃষ্টি তদানীন্তন পর্যবেক্ষকের আয়ত্তগম্য হতে পারত। কেবল জাতক স্বয়ং লেখক হয়ে সেখানে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই সে কাহিনীকে জীবন না বলে আত্মজীবনী বলেই হয়। এ ছাড়া আমরা পেয়েছি আত্মচিন্তার ও সাধনার কাহিনী রবীন্দ্রনাথে, দেবেন্দ্রনাথে। বাংলা সাহিত্য এখনো তাই আত্মস্বজনী লেখনীর অপেক্ষায় আছে।

অন্য দৃষ্টিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঠিক একশ বছর আগে ২৪শে জুলাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে কালীপ্রসন্ন তাঁর যৌবন, যশঃ লোভ নিয়ে জীবনে আবিস্কৃত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সমসাময়িক ধনী 'বাবু' যুগের শিকারও হয়েছিলেন। 'একমাত্র সম্ভানের শুভ জন্মলগ্ন উদযাপনের জন্য ধনী পিতা যুগোপযোগী বানিজ্যের নাচের আয়োজন করেছিলেন। আবার সেই সঙ্গে ছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারী শাল বিতরণের অহুষ্ঠান। যুগটাই ছিল এই অর্থহীন contradiction-এর। পাশ্চাত্য অ-সভ্যতার সঙ্গে চিরাচরিত আদিম আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধি মাখান হত আর সেই সঙ্গে থাকত ধর্মভীতি। বিনা পরিশ্রমে নিছক উত্তরাধিকার সূত্রে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া বিপুল ধন সম্পত্তিকেই বাঁধা হত ধর্মের ভারী বাঁধনে। ভাগ্যের সেই চাকা যাতে বিরূপ পথে বাঁক না নেয় তারই এ্যাডভান্স বুকিং করা হত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লোলুপ হাতে। কাশ্মিরী শাল তুলে ফরমাসেসী আশীর্বাদ যোগাড় করে। এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বই কালীপ্রসন্নের জীবন যৌবনের মূল বীজ। তাই নবজাতককেও এই বিলাস ব্যাভিচারের বাবু স্রোতে ভাসান হল। কেউ তার লেখাপড়ার কথা ভাবল না তেমন করে। ধনী পিতার একমাত্র সম্ভান হল আলালের ঘরের ছল। হঠাৎ বাবুয়ানির লালাসিক্ত আমোদে গা ভাসাতে অভ্যস্ত হলেন কিশোর কালীপ্রসন্ন।

উপরন্তু ছ বছর বয়সেই পিতৃহীন কালীপ্রসন্ন অসহায় ভাবে ধনী সৌখিন পিতার পোষা পারিষদের লোলুপ হাতের শিকার হলেন। কিন্তু নাবালকের সম্পত্তির ট্রাস্টি হলেন পিসেমশাই হরচন্দ্র ঘোষ। হরচন্দ্রই নাবালকের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু সে গতানুগতিক স্কুল পাঠশালার শিক্ষা নয়। ধনী জমিদার নন্দনের spoken English শেখার ব্যাপার। অল্পদিকে নাবালক ধনীন্দনের কাঁচা মাথা চিবিয়ে খাবার জন্য উদগ্র উৎসাহী পাকামাথা পারিষদেরা দল বেঁধে হাজির হল। সে যুগে কিশোর স্কুল বয়েরাও সবচেয়ে সহজ নেশা ভাবতেই লেখক হবার নেশা। মাতৃভাষায় বৃৎপত্তি না থাকা সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন যশের লোভে সাহিত্যের সেই বাঁকা পথে পা দিলেন এই বংশানুক্রমে পোষা স্তাবকের টানাটানিতে। তের বছর বয়সে তিনি স্থাপন করলেন বিজ্ঞোৎসাহিনী সভা বা লিটারারী ক্লাব। তার সভাপতি কালীপ্রসন্ন আর এই সব স্তাবকেরা আজীবন সদস্য। তারা কালীপ্রসন্নকে প্রলুব্ধ করলেন 'বঙ্গভাষা' আয়ত্ত করতে গেলে এটা দরকার। সদস্যরা অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—কেউবা 'বয়স্ম'। অন্তত একজন বার প্রতি কালীপ্রসন্নের বিশেষ নজর পড়ার অন্ত্র সদস্যরা বিরক্ত হয়ে ছড়া ছাপিয়েছিল।

বংশগত বাবু 'সভ্যতা' কিন্তু থেমে থাকেনি। চোদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের বিয়ে হল বাগবাজারের বৈদ্যনাথ বসুর কন্যার সঙ্গে। কিছুদিন পর জীবিয়োগ ঘটলে দ্বিতীয় বিবাহ হয় চন্দ্রনাথ বসুর কন্যার সঙ্গে। অল্পদিকে বিজ্ঞোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তখন

সাহিত্য যশ নেশায় ভরপুর। সময়স্বল্প কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সভায় প্রবন্ধ পড়েন। কালীপ্রসন্নও ঐ বয়সেই প্রবন্ধ পড়েন ‘বিজ্ঞাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।’ এই হল বঙ্গভাষায় বুৎপত্তি বিহীন কালীপ্রসন্নের বাল্য রচনা! এই ফরমাসেই প্রবন্ধগুলো প্রকাশের জন্য কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করলেন বিজ্ঞাতীসাহিনী পত্রিকা। বললেন তাঁর বঙ্গভাষায় বুৎপত্তি নেই তবু বিজ্ঞাতীসাহিনী ব্যক্তিব্যবহারে উৎসাহে এ কাজে নেমেছেন। পনের বছরের চঞ্চল কিশোর এসব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন কিনা সন্দেহ, বোধহয় এইসব বিজ্ঞাতীসাহিনী ব্যক্তিব্যবহারেই হাত ছিল এ ব্যাপারে। এঁরা কারা? এরাই সেই পোষা স্তাবকের দল, নামে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল। ধনী রাগী ‘বাবু’ কিশোর কালীপ্রসন্নের নাকি একটা অভূত সখ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের টাকা দিয়ে টিকি কেটে রাখতেন। এই সব টিকি নাকি তিনি জমাতেন সংগ্রহে। এই গুজবটির জ্যোতনা কম নয়। কারণ এরপর দেখা যায় কালীপ্রসন্ন এইসব পণ্ডিতদের দিয়েই মহাভারত অনুবাদ করতে শুরু করেন। এই অনুবাদের চিন্তা অবশ্য প্রথমে এসেছিল বিজ্ঞাতীসাহিনীর মাধ্যমে। কিন্তু একা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার বহু পণ্ডিত দিয়ে করানোর অর্থবল তাঁর ছিল না। এই সময় সাহিত্যযশলোভী ধনী কিশোর কালীপ্রসন্ন তাঁর কাছে আসে বিজ্ঞাতীসাহিনীর বিখ্যাত বিতর্ক বিধবাবিবাহ আন্দোলন নিয়ে। অনুবাদ করা বইয়ের title pageএ লেখক হিসেবে নাম ছাপাতে পারার সাফল্যে ধনী বাবুরা কেউ কেউ এ পথে এসেছেন। তাই বিজ্ঞাতীসাহিনীর তত্ত্বাবধিনী পত্রিকাতে কয়েককর্মী অনুবাদ ছাপানোর পর এ কাজ কালীপ্রসন্নের হাতে দেন। কিন্তু অনুবাদ কর্মের শেষ দেখা শোনা তিনিই করতেন মনে হয়। এমনকি পণ্ডিত নির্বাচনও তাঁর কথা মত হয়েছে। অতীতকৈ বর্ধমানের সাহিত্যযশলোভী মহারাজাও ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করানোর মেতেছেন। তাই আগে কালীপ্রসন্ন মহারাজের প্রতি অনুকূল থাকলেও পরে বীতশ্রদ্ধ হন। সে যাক এইভাবেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্যের সিংহাসনের দিকে গুটি গুটি পা বাড়ান্ছিলেন। সেদিক দিয়ে ১৮৫৬ সালটি তাঁর জীবনে খুবই ঝংগিতপূর্ণ। এই সময়েই তিনি যুগের আরেক হুজুগ নাট্যাভিনয়ে মাতলেন। নাট্যরচনাতেও। বিজ্ঞাতীসাহিনী সভার মুখপত্রটির তখন অকালমৃত্যু হয়েছে—হল বিজ্ঞাতীসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। ভট্টনায়কের বেণীসংহার রামনারায়ণ বিহারত্বের অনুবাদে মঞ্চস্থ হল। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং অভিনয় করলেন। এই সময় কালীপ্রসন্ন নাটকরচনার ব্যাপারে লুপ্ত দৃষ্টিপাত করলেন। বিক্রমোর্বশী নাটক অভিনীতও হল। পরের বছর সাবিত্রী সত্যবান। তার পরের বছর মালতীমাধব। এইসব নাটকাদি রচনার সাহিত্যিক কৃতিত্ব কালীপ্রসন্নের কিনা সন্দেহ আছে। উপরন্তু বিশেষতঃ মৌলিক রচনার কৃতিত্ব যতই কালীপ্রসন্নের কোলে চাপাবার চেষ্টা করছেন অন্ধ অজ্ঞরাগীরা, ততই ব্যর্থ হচ্ছেন। যথা কেউ বলতেন মৌলিক বিধবোদ্ধাহ মৌলিক নাটকটি কালীপ্রসন্নের। কিন্তু পরে জানা গেছে নাটকটি উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের। পুরণো সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন (সংবাদ নয়) এর কাটিং নির্ভর করে কেউ অনুমান করলেন কালীপ্রসন্নবাবু নাটকের রচয়িতা। কিন্তু এ বই কেউ দেখেননি—সমসাময়িক সংবাদপত্রে সমালোচনা পাইনি (পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক)। রচনাটি কালীপ্রসন্নের হলে তখন তাঁর বয়স তের, তখন তিনি সবে বিজ্ঞাতীসাহিনী সভা খুলছেন, বঙ্গভাষায় বুৎপত্তি হয়নি। বাবু নাটক অনাবিস্কৃত নয় তবে অল্প

লেখকের নামে। এইভাবেই বলা হল কালীপ্রসন্নের পিস্তুতো ভাই প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তার বঙ্গাধিপপরাজয়ের ভূমিকায় যেহেতু জানিয়াছেন যে তিনি ভাবছিলেন বইয়ের নাম দেবেন বঙ্গেশবিজয় কিন্তু শুনলেন যে ঐ নামে কালীপ্রসন্নের একটি বইয়ের দুটি ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে তাই নাম বদলে করলেন বঙ্গাধিপা পরাজয়। অতএব কালীপ্রসন্ন বঙ্গেশ বিজয় নামে একটি বই লিখেছিলেন। কেউ বলেন যেহেতু সংবাদপত্রে জানা জানা যাচ্ছে যে আমাদের বলা হয়েছে যে কালীপ্রসন্ন নেপোলিয়নের জীবনী লিখবার জন্য ফরাসী সম্রাটের কাছে আবেদন করেছেন। অতএব...। কিন্তু মূলতঃ এগুলো ইতিহাসগত বিশ্লেষণ নয়, অন্ধভক্তি।

আগেই বলেছি কালীপ্রসন্নের লোভ ছিল নামে। তাই তিনি শুধু বইয়ে নাম ছাপাননি। অনেক সাহিত্যকর্মের প্রসংগেও নাম জড়িয়েছেন। অমিত্রাক্ষর চন্দ্রের জন্য সর্বপ্রথম মাইকেলকে অভিনন্দন জানিয়েছিল বিছোৎসাহিনীসভা। কিন্তু এ প্রীতি বেশিদিন বজায় ছিল না। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ বিদেশীদের স্রবিসার্থে মাইকেলকে দিয়ে একরাতে অল্পবাদ করে লংসাহেবের নামে তিনিই ছাপিয়েছিলেন। এ জন্য আদালতে লংসাহেবের একহাজার টাকা জরিমানাও কালীপ্রসন্নই দিয়েছিলেন। এছাড়া ল্যাংকোশায়ারের দুর্ভিক্ষে অর্থদান, কলকাতার কলের জলের ব্যবস্থা করা এ রকম বহু অভিনব ব্যবস্থায় তিনি অর্থসাহায্য করেছেন। আর সংবাদপত্রের ‘এডিটর’ হবার জন্যও উদার হস্তে অর্থব্যয় করেছেন। নাটকের ব্যাপারে তার অর্থ সাহায্যের কথা আগেই বলেছি। গানবাজনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু এসব কথা কালীপ্রসন্নের প্রচলিত জীবনীতে বড় করেই বলা আছে। আমরা বরং মারুষ কালীপ্রসন্নর ব্যক্তিগত মনের সন্ধান নিতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পিতৃহীন ধনী কিশোরের যে সমস্ত স্বাভাবিক প্রবণতার কথা আমরা জানি কালীপ্রসন্ন সে সব থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অযাচিত অর্থ সাহায্যেও তিনি ‘নামের’ আশায় বহু ক্ষেত্রে বাঁপিয়ে পড়েছেন তার উদ্বেলচিত্ত সত্যতার সন্ধান সমাজের কোণে কোণে ঘুরেছে। কিন্তু তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। কলকাতার পতিতাপল্লীও যাতে বিস্তৃত না হয়—সীমাবদ্ধ হয়, এই আন্দোলনের জন্য তিনি ‘গণস্বাক্ষর’ অভিযান করেছেন সেই আবেদনপত্র লেজিসলেটিভ কাউন্সেলে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু তার প্রথম বোবন সংসমের শিক্ষা পায়নি। উচ্ছলিত অর্থব্যয়ের উজ্জল সন্ধ্যাতেও একটি অভিভাবক তাকে সতর্ক করেনি, একটি ভীষণ প্রদীপের স্নানশিখা তার তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রচুর টাকা স্বখাত সলিলের মত তার তহবিলের দিকে স্বেচ্ছায় বাঁপিয়েছে—বাধাবদ্ধবিহীন বোবন চঞ্চল উদ্গাদনায় অপব্যয়ের সব পথেও তার কিনারা খুঁজে পায়নি।

যুগের এখন মস্ত অস্থখ, তার ওপর কালীপ্রসন্নের ওপরে অভিভাবক নেই—পাশে নেই সঙ্গিনী। সবচেয়ে বড় কথা তাকে অহরহ যন্ত্রণা দিয়েছে কি রেখে গেলাম এই শেষ প্রশ্ন। কুসুমের মত তিনি শিথিল হয়ে গাছের নাচে বারে পড়েছেন ব্যর্থ চাকল্যের স্নানিতে। জীবন যখন অন্তাচলে, বোবনবিকৃতি যখন গোধূলিবেলায় রাঙা, তখন নিঃসন্তান কালীপ্রসন্ন শেষ পাড়ানির কড়ি হিসেবে পোস্তপুত্র নিলেন বিজয়সিংহকে। কিন্তু বন্দরের কাল তখন শেষ—জীবন বোবন ধন মান সবই ক্ষীয়মান স্নান। বার্থতার আত্মসমুদ্রে মগ্ন হয়ে ১৮৭০ সালের চব্বিশে জুলাই একান্ত অপরিচিতের মত বিদায় নিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

কমলাকান্তের পত্র (কমলাকান্ত)

‘কমলাকান্তের পত্র’ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্ত’ গ্রন্থের অংশবিশেষ রূপে ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৫টি পত্র আছে—কি লিখিব? পলিটিক্স, বাঙ্গালির মনুস্মৃতি, বুড়া বয়সের কথা ও কমলাকান্তের বিদায়। পত্রগুলি প্রথমে ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিভাগে নতুনত্ব আনয়ন করা হয়।

“কমলাকান্তের পত্র”—অংশে ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত (পৌষ, ১২৮৪) “কমলাকান্তের পত্র” দুইভাগে বিভক্ত হইয়া “কি লিখিব?” ও “কমলাকান্তের বিদায়” শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। “পলিটিক্স” ও “বাঙ্গালির মনুস্মৃতি” নামক পত্র দুইটিও এই অংশে স্থান পায়। “বুড়া বয়সের কথা” নামক প্রবন্ধটিও পত্রাকারে ইহার সহিত যুক্ত হয়।”

(কমলাকান্তের ভূমিকা—‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ’)।

যদিও এগুলি পত্রাকারে পরিবেশিত হয়েছে তবুও পত্রসাহিত্যের যে রস তা এখানে প্রকাশিত হয়নি। সাধারণভাবে কমলাকান্তের দপ্তরের নতুনতর রূপই বলা চলে এগুলিকে।

কমলাকান্তের বিদায় (কমলাকান্তের পত্র-৫ম সংখ্যা) ॥

১২৮৪ সালের পৌষসংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। কমলাকান্তের পত্রের শেষে স্থান পেলেও রচনাকাল হিসাবে বুড়াবয়সের কথার পরেই এর স্থান। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তর লেখার ইচ্ছা আর ছিল না। তাই তিনি লিখেছেন,—“তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহরব কেহ শুনিবে কি?”

কিন্তু তবুও এখনো মাছুষের মঙ্গলের জন্ত কমলাকান্তের কামার অস্ত্র নাই। তিনি এখনো মাছুষকে ভালবাসেন।

কল্লতরু (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত) ॥

প্রথম প্রকাশ “বঙ্গদর্শন”, পৌষ ১২৮১, পৃ: ৪১৫-২০।

“কল্লতরু। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিং লাইব্রেরী। ১২৮১।” গ্রন্থের সমালোচনা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচুঠাকুর ছদ্মনামে চুটকি রহস্যলেখক হলেও ‘কল্লতরু’ উপন্যাসে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে সমকালের এই লেখকটির বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। ইন্দ্রনাথের গ্রন্থটি জীবনের গভীর স্তরে পৌঁছয়নি। তাই এটিকে বঙ্কিম ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও ‘হতোম প্যাচার নক্সা’ গ্রন্থের সমস্তরে ঝেলে বিচার

করেছেন “তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাকশক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শপ্রিয়তার দ্বয়, মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, যে চতুরের বজ্র দৃষ্টিটুকু, পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা যা ছতোম, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্বস্থানেই মুগ্ধ প্রবাসাদি জলিতেছে। দীনবন্ধুবাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, ছতোমের মত বেলেলাগিরিতে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু তিলাদ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্বদা সহনীয়। “কল্পতরুর” বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।”

লেখকের রচনাচাতুর্য্যের পরিচয় স্বরূপ দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করা আছে।

কংসবধ (কৃষ্ণচরিত্র ৩য়খণ্ড—প্রথম পরিঃ) ॥

কংসবধ বৃত্তান্তটিকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো গ্রন্থে এই ঘটনাটি বর্ণনায় অতিরঞ্জন করা হয়েছে। কংসের অত্যাচারে যাদবগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সমর্থন ছিল কংসহত্যা। তাই এবং কৃষ্ণ বলরাম কংসবধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাকাতুয়া (কমলাকান্তের মন্তর) ॥

‘কাকাতুয়া’ রচনাটি ১২৮৯ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে কোনদিনই গ্রন্থে স্থান দেননি। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ-এর ‘পরিশিষ্টে’ রচনাটি সম্মিলিত আছে।

রচনাটিতে গল্পরসের মাধ্যমে তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। একদিন কমলাকান্ত দেখলে প্রসন্ন গোয়ালিনী একহাতে খাঁচা ও অন্ন হাতে দুধের ভাঁড় নিয়ে উপস্থিত। কমলাকান্তের সঙ্গে প্রসন্নর পাখী সম্পর্কে তর্ক উঠলে, প্রসন্ন কমলাকান্তকে বলল সে কোনদিনই পাখীকে পোষ মানাতে পারবে না। তখন কমলাকান্ত জেদ করে পাখী খুজতে বেরুল। শেষপর্যন্ত এক মুসলমানের বাড়ী থেকে এক কাকাতুয়াকে সংগ্রহ করল। বাড়ীতে এসে কাকাতুয়ার সঙ্গে কথোপকথনে কমলাকান্ত জানতে পারল যে সে আসলে কাকাতুয়া নয়। একালে সে শূকর ছিল, তারপর হল সিংহ এবং শেষে কাকাতুয়ায় পরিণত হল। এমনভাবে পুরাতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সম্ভূত হয়ে কমলাকান্ত কাকাতুয়াকে ছেড়ে দিল। তখন প্রসন্ন এসে সচেতন করে দিল যে তার কাকাতুয়া শিকল কেটে পালিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করলে যে একজন সার্থক ছোটগল্পকার হতে পারতেন, ‘কাকাতুয়া’ রচনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু রচনাটি কোন গ্রন্থে স্থান না পাওয়ার কারণ বোধহয় এর উগ্র আক্রমণাত্মক আলোচনা। কাকাতুয়াকে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। এইসমস্ত পুরাতত্ত্ববিদগণ অসম্ভব উদ্ভট তত্ত্বের আবিষ্কার করতেন। তাই বঙ্কিম দেখেছেন কেমন করে শূকর কাকাতুয়াতে পরিণত হত। এইসব পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদের ধারণা, সবকিছু ভারতীয় জিনিষই

পাশ্চাত্যপ্রভাবজাত। আবার এঁদের অল্পগ্রহপুষ্ট কিছু বাঙালী আছেন, যারা এঁদের আত্মগত্য করে 'বুদ্ধিমান' আখ্যা লাভ করেছিলেন। বঙ্কিম তাঁদের প্রসন্ন গোয়ালিনীকে দিয়ে ঝোঁটের বিদায় করার উপায় গ্রহণ করেছেন।

কাম (বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ) ॥

প্রথম প্রকাশ—প্রচার ১২৯২, আঘাট। এখানে 'কাম' শব্দের প্রচলিত অর্থের বিপরীত কথা বলা হয়েছে। ধর্মের সংগে কামের বিরোধিতা আছে একথা আমরা জানি। কিন্তু বঙ্কিম শাস্ত্র উদ্ধার করে দেখিয়েছেন—কামও ধর্মের একটি অঙ্গ। ধর্মার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির অত্মশীলনই কাম কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য।

কামগীতা (কৃষ্ণচরিত্র ৬ষ্ঠখণ্ড ১১ পরিঃ) ॥

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠির বায়না ধরলেন, তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। কেউই যখন যুধিষ্ঠিরকে নিবৃত্ত করে পারছেন না, তখন কৃষ্ণ বললেন—এর পিছনে কার্য করছে যুধিষ্ঠিরের অহংকার। তিনি নিজে সত্যবাদী ও ধর্মচারী মনে করেন। এও এক ধরণের কামের প্রকাশ। এই কামকে নিবৃত্ত করার যে উপদেশ তাকেই 'কামগীতা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কামিনীর প্রতি উক্তি (বাল্যরচনা—পুঃ অগ্রঃ)

প্রথম প্রকাশ—'সংবাদ প্রভাকর' ১৮ মার্চ ১৮৫৩। প্রথম ছত্র—“অপরূপ দেখ একি, শরীরে তোমার”।

হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক পয়ার ছন্দে রচিত এই কবিতাটিকে 'রূপক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শরীর মধ্যে ষড়ঋতুর কল্লনাই এই রূপকাশ্রয়ী কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু রূপক কোথাও গভীর হয়নি, বহিঃস্থ বর্ণনার সাদৃশ্যমাত্র থেকে গেছে। কবিতার নামের নীচে 'তোমাতে লো ষড় ঋতু' এই নামও দেওয়া আছে।

কালেজীয় কবিতার মারামারি | বিষম “বিচিত্র নাটক” | অর্থাৎ কবিদের মজলিস এবং ঐ নাটক দর্শন। (বাল্যরচনা—পুঃ অগ্রঃ)।

প্রথম প্রকাশ—'সংবাদ প্রভাকর', ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৩। প্রথম ছত্র—“দলমল ঝলমল, | শত দীপ সচঞ্চল, | নিশাযোগে অট্টালিকা মাঝে।”

কবিতারচনার দীর্ঘর গুণের শিষ্টহিসাবে কবিগানের লড়াইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পদার্পণ এই নাটকটির মধ্যে পাওয়া যায়। সংবাদ প্রভাকরের লেখক দ্বারকানাথ অধিকারী এবং দীনবন্ধু মিত্র দু'জনেই কলেজের ছাত্র এবং উভয়ের মধ্যে কবিতার মারামারি হত। বঙ্কিমচন্দ্রও কলেজের ছাত্র—এবং এই মারামারিতে অংশগ্রহণ করলেন। তাই তিনি বলেছেন—শুনিতে পাই প্রভাকরে না কি ছুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটি না কি আবার আশে পাশে কামড়

মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া বাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।”

প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞা, অবিজ্ঞা এবং কুবিজ্ঞার কথা বলেছেন, এবং প্রকারান্তরে দু’জনকে কুবিজ্ঞার সম্ভান বলে অভিহিত করেছেন। তাদের দ্বন্দ্বকে বঙ্কিম অঙ্গীল উপমারদ্বারা বুঝিয়েছেন—

“দুজনের সনে দ্বন্দ্ব, এ আর কেমন
একা গাই দুই বাঁড় সে জালা যেমন ॥”

কোথাও কোথাও অঙ্গীলতার দ্বারা যেমন হস্তরস সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি কোথাও কোথাও খোঁচা অত্যন্ত তীব্রতর। দ্বারকানাথের গ্রামে বাস উপলক্ষে তাঁকে ‘বুনো’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর ভাষাকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

যেমন—

চট্ট

বল দেখি সাদা কেন, ঘরের দেয়াল।
মহা ব্যাধি হয়েছে কি, তোলা গেছে ছাল ॥

বুনো

বুজি বা এ ভায়ে, পারে দোষে চিতাইচে।
কি কাওয়ারে দৈবাৎ, কায়ে হাগাইচে ॥

(অর্থাৎ বুজি বা এটাকে পড়িয়া ধরিয়া চিত্র করিয়াছে, কিম্বা কাককে দই ভাত খাওয়াইয়া।”)

দ্বারকানাথের কবিতাপাঠ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে দিয়েই নিজেকে গালাগালি দিয়েছেন—
“শৃগাল কুকুরে হাগে, দ্বারকার গায়।” আক্রমণের ভঙ্গী তীব্র হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল বিরোধের মীমাংসা।

বিজ্ঞার মুখে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত কবিতা লক্ষ্যে যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণীয়—

মুগ্ধ যদি, প্রকৃতির, মোহন বদন।
সেই মনোমত ভাবে, করে দরশন ॥
সুখ দুখ রিপু রসে, হৃদয় মাঝার।
প্রকৃতির মোহনে, জন্মে যে বিকার ॥
যেই ভাবে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে।
যে ভাবে আপন সনে, হৃদয় সম্ভাষে ॥
যথার্থ কবিতা সেই, সদা মোহময়।
শুধু রাম রাম বলা কবিতা তো নয় ॥”

এ হল সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণ।—এ ধরনের কবিতার গুরু হিসাবে বিহারীলালকেই বঙ্কিমচন্দ্রের বরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি দ্বারকানাথকে পরামর্শ দিলেন—

“সত্য কবিতায় রাখ যতন বিশেষ।
কবি লিপিরে ঠাই, লহ উপদেশ ॥

আশ্রমিক সংঘের রবীন্দ্রনাট্যোৎসব

বাংলাদের স্বকুমার কলার বিকাশ হয়েছে যুগে যুগে। হয়ত এযুগেও নিত্য নূতন আবির্ভাব আমরা দেখতে পাব। তবে আপাততঃ সমকালীন শিল্প আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রোত্তর শিল্পকলার ছাপ এখনও পড়েনি। বোধকরি সেই কারণেই প্রতি বৎসরান্তে রবীন্দ্রসাহিত্য সন্মীত ও নৃত্যনৃত্যানের পক্ষকালব্যাপী পরিবেশনের আসরে এখনও ভিড় হয়। মাত্র কয়েকখানি নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যকে সম্বল করে বারংবার আসরে নামার হুঃসাহসকে অভিনন্দিত হতে দেখে মনে হয় বাংলার শিল্পানুরাগী বিদগ্ধ মানস রবীন্দ্র শিল্পরসপানে এখনও অতৃপ্ত।

এই সকল বাৎসরিক পরিবেশকগণের ভিতরে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ অন্ততম। আলোচ্য বৎসরে রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে আশ্রমিক সংঘ “টোগোর ড্রামা ফেষ্টিভাল” নাম দিয়ে মোট ছয়টি অনুষ্ঠান করেন।

রঙ্গীন ছবি সম্বলিত সুদৃশ্য স্মারকগ্রন্থখানি সুপুষ্ট কলেবর নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। উৎকৃষ্ট কাগজে গ্রন্থটিতে প্রতি নাট্যের সংক্ষিপ্তসার ইংরাজী ও বাংলায় লেখা কুশীলবগণের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়।

অনুষ্ঠানের সমগ্রতা বিচারে সর্বপ্রথম মনে জাগে এধরনের অনুষ্ঠানের সার্থকতা। দর্শক সমাবেশের প্রাচুর্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে বাংলাদেশে এখনও রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই ধারণা নিয়েই প্রতিদিন আসরে যাওয়া যদিও সবগুলি আশানুরূপ প্রশংসার বলে মনে হয়নি।

প্রথমেই বলা যায় সময়ানুবর্তিতার অভাবের কথা। সাতটার আরম্ভের আশ্বাস দিয়ে প্রতিদিন ১৫২০ মিনিট কাল পরে আরম্ভ ও মধ্যকালীন বিরতি “সাত মিনিট” ঘোষণা করে পনের মিনিটকাল বিরতি দেওয়ার মধ্যে কোনও সুসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। বিশেষ করে প্রতিদিন যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

এক “তাসের দেশ” ছাড়া অন্তর্গত অভিনয়ংশ, পরিবেশনে নিতান্তই দুর্বলবোধ হয়েছে। গীতিনাট্য মায়াবর খেলা দেখে বারংবার এই কথাটাই মনে হয়েছে যে পুরুষ অভিনেতার বোধকরি নাট্যের অভিনয়ংশের কথা ভুলেই বসেছিলেন। কিন্তু সত্যসত্যই অভিনয় ভুলে যদি মাইকের সামনে বসে গানগুলি গাইতেন তাহলে বোধকরি “মায়াবর খেলা” অপেক্ষাকৃত উপভোগ্য হত। শ্রীমতী বনানী ঘোষের গানগুলি সে হিসাবে সার্থক। একমাত্রই সূচিত্রা দেবীই যথার্থ অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন যদিও সহশিল্পীগণের ঔদাসীন্যে তাঁর সাবলীলতাও স্থানবিশেষে নিষ্প্রভ প্রতিপন্ন হয়েছে।

সমগ্র নাট্যাংসবের উজ্জ্বলতম অবদান শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষের নৃত্য। বোধকরি অভিনয় মূলক নৃত্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর “ঘরতে ভ্রমর এলো”র নৃত্য রূপায়ন মনে রাখবার মতন। নৃত্য শেষেও ভ্রমরগুঞ্জনের রেশ থেকে যায়। নৃত্য পরিকল্পনায় ও তার রূপায়নে তাঁর ভ্রমরভঙ্গীর চটুল গতিবিধির সার্থক অনুরূতি সত্যিই নয়নাভিরাম। প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়ে ভরতরূত নাট্যাংশে নৃত্য ও নাট্য প্রসঙ্গে নৃত্য কর্মের বৈশিষ্ট্য বিবৃতির সময়ে বড়ঙ্গ ও তার প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের সঞ্চালন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে সেখানে শিরঃ নামক অঙ্গের নেত্র, অধর, নাসা, জ্র, কপোল, চিবুক এই ছয়টি উপাঙ্গ সেখানে শিরঃ স্থির থাকা কালীন এই ছয়টি উপাঙ্গের যে কোন একটি বা সবকয়টি উপাঙ্গের প্রয়োজন মত এককালীন সঞ্চালন সম্ভব, এইরূপ বলা হয়েছে। শ্রীমতী ঘোষের নৃত্য পরিবেশনায় অধরণের বিবৃতির প্রচুর উদাহরণ মেলে। বস্তুতঃ নৃত্যানাট্যশিল্পীদের সাধারণতঃ বিশেষ কোনও নৃত্য প্রকরণ অনুসরণ না করে—যথেষ্ট অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা সুগঠিত দেহযন্ত্রির অংশ বিশেষকে দর্শনীয় করে তুলে ধরবার প্রয়াস অনেক অনুষ্ঠানেই দেখা যায়। শ্রীমতী ঘোষের নৃত্য পরিকল্পনায় তেমন কোনও পরিকল্পনা না থাকলেও নৃত্যবস্তু যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেই কথাটাই উচ্চকণ্ঠে বলার প্রয়োজন আছে।

আগেই বলা হয়েছে অভিনয়শ্রেণী “তাসের দেশ” রসোত্তীর্ণ। অভিনয় মাধ্যমে, কুশীলবগণের সাজসজ্জায় ও মঞ্চপরিকল্পনায় নাট্যবস্তুর বক্তব্য পরিষ্কার ফুটে বেরিয়েছে। স্তবক নৃত্যগুলি (গ্রুপড্যান্স) বেশ অল্পশীলিত বলে মনে হল। একক নৃত্যে শ্রীমতী ঘোষ ছাড়া মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী ও স্মৃতিমিতা মিত্রের নৃত্য ভাল লেগেছে। চন্দ্রোদয় ঘোষের যুবরাজ ও তার বণিক বন্ধুর ভূমিকায় মিহির ঘোষের নৃত্যাভিনয় ও মন্দ হয়নি।

ভানুসিংহের পদাবলী কয়েকটি নাট্যাঙ্গিতির সমষ্টি। “বিভাবানুভাব ব্যাভিচারী ভাব সংযোগে রসনিষ্পত্তির” প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গানগুলি মূল রস শৃঙ্গারের পরিপ্রক্ষিতে চিন্তা, বিপ্রলভ্য ধৃতি ইত্যাদি ব্যাভিচারী ভাবগুলি প্রকৃষ্ট অনুভাব সহকারে নৃত্যমাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আলম্বন বিভাব এক্ষেত্রে রাধা ও কৃষ্ণ হওয়াতে উজ্জ্বল নীলমণি উপস্থাপিত ভক্তিরসকেও কখন বা মূলরস করা হয়। আশ্রমিক সংঘের পরিকল্পনায় ছিল শৃঙ্গার রস। নৃত্যে কৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীমতী কাজরী চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের নৃত্যপরিকল্পনায় বৃন্দাবন কেলীর কয়েকটি কৃষ্ণ ভঙ্গিমা দৃষ্ট সজ্জার পটভূমিকায় অপূর্ব মনে হয়েছে। কয়েকটি স্তবক নৃত্যের সজ্জা পরিকল্পনা উদ্দীপন বিভাবানুগ হয়নি। “গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝ” গানখানির নৃত্যছন্দ কিছুটা স্বেচ্ছাচারিত বলে বোধ হল।

সমগ্র নৃত্যানাট্যগুলির আর একটি উজ্জ্বল অংশ হল গীতাংশের প্রয়োগ। কণ্ঠ সঙ্গীতের স্বনামধন্য মহিলা শিল্পীরা প্রায় সকলেই তাদের স্বনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন যদিও পুরুষ কণ্ঠের গানগুলির কয়েকটি,—বিশেষ করে “মায়ার খেলা” নাট্যে, রীতিমত বেহরো বলে মনে হয়েছে। অভিনেতা বিশেষে মঞ্চে আবির্ভাব মাত্রই দর্শক মধ্যে বিরক্তির গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেছে।

যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগিতা অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়া প্রয়োজন ছিল। একমাত্র তপন দাসের সঙ্গত গানগুলিকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করেছে। তত্ত্বার প্রয়োগ না থাকতে সমগ্র সঙ্গীতাংশের কোনও

ভিত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। এদিক থেকে এবং সঙ্গীতরেশকে ধরে রাখার তাগিদে তত্ত্ব প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যকে কে অস্বীকার করবে?

আশ্রমিক সংঘের মোট ছয়টি অলুষ্ঠানের পাঁচটি দেখবার সৌভাগ্য হল। শেষ অলুষ্ঠান “শ্রামা” দেখা হয়নি। চতুর্থ অধিবেশনে বাল্মীকি প্রতিভা নৃত্যনাট্য নামে অভিহিত হলেও হাশ্রসাত্মক অংশটুকু ভালই লাগল। পঞ্চম অধিবেশনের চিত্রাঙ্গদা বোধকরি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। বিষয়বস্তুর বিচারে “মায়ার খেলার” বিপরীত বলা যেতে পারে। একক নৃত্য ও একক সংগীতের বিচারে “চিত্রাঙ্গদা” সার্থক হয়েছে। শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষের কুরুপা “চিত্রাঙ্গদা” ও শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এক অপূর্ব সংযোগ। বিশেষ করে “রোদনভরা এ বসন্ত” গানখানি শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বহুবার শুনবার পরও শ্রীমতী ঘোষের নৃত্যসহযোগে যেন নতুন করে শুনতে গেল। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে নায়িকার বিশ্রলভ অবস্থার অভিব্যক্তি এই অলুষ্ঠানের প্রথমার্শে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছিল। তবু কয়েকটি স্তবক নৃত্য দুর্বল লেগেছে। সমবেত সংগীতের কয়েক স্থানে বাজনার সংগে গানের সহযোগিতা যথার্থ হয়নি। ধীরোদাত্ত বীর্ষবান নায়ক অর্জুনের ভূমিকায় শ্রীমহির ঘোষের নৃত্যসংযোগ আরও সংযত পৌরুষযুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নৃত্য্যাংশ “শাস্ত্রীয়” কিনা অথবা এই নৃত্যপদ্ধতি স্থায়ী আসনলাভের যোগ্য কিনা এ বিষয়ে অধুনা কিছুটা বাদানুবাদ শোনা যাচ্ছে। আশ্রমিক সংঘের অলুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যথার্থ হবে না। কারণ পুরুষ চরিত্রের নৃত্যগুলি এই অলুষ্ঠানের দুর্বল অংশ। অতীতকালে শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ, কালরী চক্রবর্তী ইত্যাদি আরও কয়েক জন মহিলা শিল্পীর নৃত্য অবশ্যই মনে দাগ রেখে যায়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যপরিকল্পনার জ্ঞান বিশেষ কোনও আলাদা ব্যাকরণ নেই এবং গানের ছন্দের সংগে মিলিয়ে ভাবনৃত্য পরিকল্পনার স্বাধীনতা শিল্পীদের অবশ্যই আছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ভাষায় বাহাকে নৃত্ত বলা হয়েছে সেখানে ভাব-বিভাবাদি প্রকাশের অবকাশ নেই কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে ভাব-বিভাবাদিসহ নৃত্যেরও প্রয়োগ ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনৃত্য শৈক্ষক পদ্ধতি অনুসরণ করে “শাস্ত্রীয়” আখ্যায় ভূষিত হবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই অর্জন করবে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সাহিত্যে শালীনতা ও অশালীনতা প্রবন্ধ : সরোজ আচার্য ॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী ; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২ । দাম ছ'টাকা

সাহিত্যে অশ্লীলতা ও শালীনতা সম্পর্কিত প্রশ্ন ও বিতর্ক আজকের নয়। কোন একটা দেশের সীমারেখার মধ্যেও সীমিত নয়। বহু আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু এ-সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা আজও সম্ভব হয়নি—কোন দেশেই। সাহিত্যে শালীনতার মাপকাঠিও কিছু নেই। কেবল সাধারণ ভাবে অস্বভূত বিষয়টি হল এই “কদর্যতার অশ্লীল কদর্যতা” সৃষ্টি অবশ্যই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। তবে সীমারেখা কোথায় টানা হবে সেই হল সমস্যা। ‘...কিন্তু এও ঠিক যে অশ্লীল ভঙ্গি ও ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি লৌকিক শিষ্টাচার প্রায় সব যুগেই স্বীকৃত।’ (সাহিত্যে শালীনতা)। সাহিত্যে শালীনতা বা অশ্লীলতা জিনিসটি কি? সে-সম্পর্কেও কোন সন্দেহের বড় একটা পাওয়া যায় না। সমস্যাটা আরও জটিল। কেননা, যুগ থেকে যুগে, রুচিভেদের সঙ্গে শালীনতা বোধেরও বদল ঘটেছে। “সাহিত্য রুচি, সামাজিক নীতিবিচার এবং আইনের বিধিনিষেধ সবই বদলায়; গত একশ বছরে এদিক দিয়ে পরিবর্তন হয়েছে যুগান্তকারী : তার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত সাহিত্য ও শিল্পকর্মে শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্পর্কে ব্রিটিশ দণ্ডবিধির আধুনিক কালোপযোগী সংস্কৃত মুক্তবুদ্ধি বিচার ব্যবস্থা” (ঐ)। তবুও বিতর্কের শেষ হয়নি। অনেকের ধারণা সাহিত্যে অশালীনতা সাময়িক ব্যাপার। এই ধারণা পুরোপুরি সত্য না-ও হতে পারে। এ-সম্পর্কে সরোজ বাবুর মত : “এ কেবল তারুণ্য ধর্মের সাময়িক উচ্ছলতা কিংবা বিকারগ্রস্ততাও নয়।...বসনে, ব্যসনে, সাহিত্য-চিন্তায় ও চর্চায় অনাবরণের, স্পষ্টকথনের রীতি এখনও প্রায় বিশ্বব্যাপী। তবুও প্রশ্নটা থেকেই যায়। আসলে শালীনতা বোধের মাপকাঠিটা বিভিন্নকালে বিভিন্ন সমাজে এমন ভাবে বদলে যায় যে, তাকে চিরায়ত বলে ধরে রাখা যায় না। এককালে বা অত্যন্ত অশ্লীল, অন্যকালে তা নিতান্ত নিরামিশ। আবার যৌনতাই অশ্লীলতার একমাত্র নিদর্শন নয়। যৌনতা দর্শনভিত্তিক হলে তা’ রসোত্তীর্ণ এবং শালীন। ফ্রয়েডের ‘মাদাম বোভারি’ যে কারণে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত হয়েছিল সেটা আবার যৌনবর্ণনার আড়ম্বরে পূর্ণ নয়। সেকালের নীতিবাগীশদের বিচারে এমা বোভারির চরিত্র দুর্নীতিগ্রস্ত। অতএব অশ্লীল তবে এটা ঠিক যে, পর্নোগ্রাফীকে চিনে নেওয়া খুব কষ্টকর বা দুঃসাধ্য হয়। সেখানে উপাদান ও উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি সবই কামুকতার উদ্দীপনে ও পরিতৃপ্তির সুলভতম চেষ্টায় নিয়োজিত। এর সবটাই পঙ্কিল, অনাবৃত জাস্তব আচরণের সংকলন। এক্ষেত্রে অবশ্য সাহিত্যিক শালীনতার প্রশ্ন ওঠে না। এর জাতই আলাদা। এবং সেই কারণে সাহিত্যের শালীনতার প্রশ্নটি আরও জটিল। বিদেশী সাহিত্যে, যেখানে ‘সেক্স’ নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি হয়—সেখানেও শ্লীল-অশ্লীল

ভেদাভেদ নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। সাহিত্য থেকে পূর্ণোগ্রাফীকে পৃথক করে রেখেও গ্রন্থ থেকে যায় সাহিত্যে যৌনতার কতটুকু, কীভাবে প্রকাশ করা ভাল কিংবা মন্দ। কেননা সাহিত্যে স্ত্রীল-অঙ্গীলের তর্কটা প্রধানতঃ ‘সেক্স’কে নিয়েই। এবং সবটাই সামাজিক নীতির-নিরিখে বিচার্য। কালোত্তীর্ণ সমাধানে না পৌঁছবার সমস্যাটা সেখানেই। কেননা, “নরনারীর মিলনকামনা সব সাহিত্যেরই প্রাণবন্ত। এ-কামনা যেমন হৃদয়কে আগ্রত করে তেমনই শারীরিক যন্ত্রণা, পুলক চাঞ্চল্য ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত হয়। ‘সেক্সুয়ালিটি’ তথা যৌনতাকে আশ্রয় করে সব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উয়ের হেলেন থেকে লোলিটা কিংবা শকুন্তলা থেকে কুম্ভিনন্দিনী ও কুম্ভিন্দী কাউকেই যৌনতার সম্পর্কিত কল্পনা করা যায় না।” (বিদেশী সাহিত্যে অঙ্গীলতা)। অর্থাৎ ‘শালীনতার বিচারে কোনও নিত্য সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন’।

আমাদের দেশীয় সাহিত্যে শালীনতা ইত্যাদির প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নজির অনেক সময়েই টানা হয়ে থাকে। কিন্তু “পাশ্চাত্য সাহিত্যে অলঙ্কার স্পষ্টবাদিতা স্বাভাবিক এবং মোটামুটি সহনীয় ধারাও আছে। কেন স্বাভাবিকও সহনীয় সেটা বুঝলে আমাদের দেশের সঙ্গে তফাৎটা বোঝা যেতে পারে। অলঙ্কার, স্পষ্টতা যুক্তিগত সাহিত্যিকতা কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যে নয়; জীবনে, সামাজিক আচরণেও অনেকখানি।...কাব্যে, উপন্যাসে, যৌনতা রূপায়ণে স্পষ্টতা, এমন কী অতি স্পষ্টতা তাই পাশ্চাত্য চিন্তাচরিত্রের সঙ্গে অনেকখানি খাপ খায়। আমাদের দেশের সাহিত্যে যথেষ্ট বা যথেষ্ট যৌন স্বাধীনতাবাদীদের নিশ্চয়ই ভাববার আছে এদিকে আমাদের চিন্তাচরিত্রে তফাত কতখানি ও কেন।” (বিদেশী সাহিত্যে অঙ্গীলতা)।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কথা ভাবতেই হবে। এবং “সে-সৌন্দর্য নিশ্চয়ই শুদ্ধ যৌনচিত্র রূপায়ণে নিবদ্ধ নয়।” (এ)। তাই এ সম্পর্কে, রবার্ট বার্নস-এর সঙ্গে একমত হয়ে, লেখক এমনি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : সাহিত্যশিল্পে জীবন সত্যের রূপায়ণে কতগুলি বিষয়ে অতিশয় অলঙ্কার হৃদয়ের অন্তর্ভুক্তিকে অসাড়, প্রস্তরীভূত করে ফেলে, পুঞ্জ পুঞ্জ ক্রন্দ ও কামপীড়ন কল্পনাকে পঙ্খ, হ্রস্ববৃত্তিকে অসাড় করে।...শালীনতার বিচারে সেকালকে ফিরিয়ে আনা যায় না, একথা ঠিক, তবে শালীনতাবোধ সম্পর্কে এখনকার কাল একেবারে অনবহিত, অলঙ্কিত সেটা নিশ্চয়ই সত্য হতে পারে না।” (সাহিত্যে শালীনতা)।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম দু’টি প্রবন্ধে (সাহিত্যে শালীনতা; বিদেশী সাহিত্যে অঙ্গীলতা) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে প্রথমে সাহিত্য ও পূর্ণোগ্রাফীর পার্থক্য এবং পরে সাহিত্যে অঙ্গীলতা প্রকাশ ও শালীনতাবোধের মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

সরোজ আচার্য মশাই-এর এই বইটিতে এছাড়া আরও বারোটি প্রবন্ধ আছে। নব বটতলা শিল্পীর দায়িত্ব, বোহেমিয়ান, বটবংশ পরিচয়, ইংরাজী বাঁচাও!, ইয়ে আজাদী, রবীন্দ্রনাথ : চার অধ্যায়, গরকি ও বাংলাদেশ, সাংবাদিকতা ও কিংবদন্তী, তার অন্ত নেই, সেই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে এবং ভিণ্ডলোমেনি।

‘রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হবার পর সে-সময়ে স্বদেশীদের প্রতি গুরুদেবের মনোভাব সম্পর্কে যেমন ভূগবোবাবুধি গুরু হয়েছিল, তেমনি এক চাপা গুঞ্জনও

উঠেছিল। এ-সম্পর্কে “রবীন্দ্রনাথ : চার অধ্যায়” প্রবন্ধে আচার্য মশাই লিখেছেন, “বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অস্বচ্ছন্দ মনোভাবকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।”

সাহিত্যের ব্যবসায়ীক সাফল্যের সঙ্গে সাহিত্যের রূপভেদের বিষয়টি ফুটে উঠেছে তাঁর ‘নববটতলা’ প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে একালের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে সরোজবাবুর মন্তব্যটি লক্ষ্যণীয় “জীবনের মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হওয়াতেই বোধহয় একালের সাহিত্যে এই নব বটতলার মঞ্চদূর।...পাঠকের উত্তেজনা সৃষ্টি ও কৌতুহল নিবৃত্তিই বোধহয় এ-কালের সাহিত্যিক প্রয়াসের মূল লক্ষ্য। অতএব উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি লিখে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, নব বটতলার নবীন পাঠকগোষ্ঠীর সর্বভূক কচির চাহিদা যতদূর সম্ভব পূরণ করা যায়, এ-কালের সাহিত্যিকদের তাই চেষ্টা। যৌনতাও নিঃসঙ্গতার ক্ষুধা সর্বগ্রাসী, অতএব এ-কালের গল্পে-উপন্যাসে এই ক্ষুধা মিটিবার জন্য অফুরন্ত আয়োজন।” গরকি ও বাংলাদেশ প্রবন্ধটিতে সরোজবাবু স্বন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, পরিবর্তিত সমাজবাদী চিন্তায় বাংলাদেশে গরকির প্রভাব তেমন পড়তে পারেনি। ১৯২৫-২৮ সালে গরকির ‘মা’ সেকালীন তরুণ সম্মানবাদীদের মধ্যে অনেক আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সে-তুলনায় পরবর্তী কালের সমাজে, রাজনৈতিক চিন্তায়, সাহিত্যে, এমন কি শ্রমিক-সংগ্রামেও গরকির প্রভাব তেমন পড়েনি। “বাংলাদেশের তথা ভারতের শ্রমিক মহলে গরকির ‘মা’ অনাদৃত। তার কারণ ‘মা’ নয় বোনাসের দাবি মজুরী বৃদ্ধির বাণী। যে-মৌল রাজনৈতিক লক্ষ্য সচেতনতা গরকির ‘মা’র ছত্রে ছত্রে ভারতের মজুর আন্দোলনে তার স্পন্দন সামান্যই।” অথচ কিছুদিন আগে আমাদের দেশেই গরকির জন্মশতবার্ষিকী অহুষ্ঠিত হলো। লেখকের দর্শন চিন্তা আদর্শ ইত্যাদিকে গ্রহণ না করে, তাঁকে কেবল স্মৃতির পাতায় খচিত করে রাখার জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর যে তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যু সে-কথাটা আমাদের মনে থাকে না। ম্যাকসিম গরকির ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। কেননা, “গত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরে গরকি আমাদের মানসলোকের পুরোভাগ থেকে ক্রমশ অপস্থত হয়েছেন, একেবারে বিস্মৃত নন, কিন্তু অপঠিত প্রায়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে গরকির ‘চেলকাশ’, মাদার’ ‘লোয়ার ডেপথ’ পড়বার যে দুঃসহবিশ্ময় নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের আনন্দ-বেদনা আজ তার কতটুকুই বা আমাদের মনে, বাঙালী পাঠকের মনে টিকে আছে কতটুকুই জাগিয়ে তোলা সম্ভব?” সরোজবাবুর এই উপলব্ধি অসত্য নয়।

কমুনিষ্ট বিশ্বের এককালীন হালচাল, কর্মাদর্শ বিগত-কালের নিরিখে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে “সেই কলঙ্কে নিন্দপক্ষে” প্রবন্ধটিতে। সেই সঙ্গে আজকের কমুনিষ্ট আন্দোলন কেন্দ্রচ্যুত এবং খানিকটা পথভ্রান্তি বলেও আশংকার ইঙ্গিত আছে প্রবন্ধটিতে। সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অনেক পার্থক্য সেকালের তুলনামূলক বিচারে। বিশেষ করে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাক্ষিক সত্যসৃষ্টি করার প্রয়াসই ঘটাচ্ছে বিভ্রাট। তার ফলেই আজ প্রগতিবাদী চিন্তার ভিত্তিমূলে আঘাত লেগেছে। এক বিরাট বিশ্বব্যাপী আদর্শের সংকল্প প্রয়াস এবং সাফল্যের উজ্জল রূপটি অকস্মাৎ ঘানিতে, ধিকারে কলঙ্ককালিমাময়। প্রগতির যে পথ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় সংশয়াতীতভাবে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা যেন আজ চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীর এই সংকটের কারণ বুদ্ধির অভাব নয়; বুদ্ধি এবং

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত ; অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। মূল্য ২'৫০ টাকা।

বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ১'৮০ টাকা।

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির বর্ণনা ও সচিত্র আলোচনা। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ॥ শ্রীশ্রীতিলকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাষা বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিমানের পড়া উচিত। মূল্য ২'৩০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১'৫০ টাকা।

ভারতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের দুর্লভ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। মূল্য ৩'৩০ টাকা।

বাংলা উপন্যাস ॥ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মূল্য ২'০০ টাকা।

প্রাণতত্ত্ব ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীববিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ২'৩০ টাকা।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাদের কোঁতুহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২'৩০ টাকা।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নব্যচিন্তা ও নবনির্মিতির সূচনা ও প্রসার হয়েছিল তাহার সুগ্রন্থিত চিত্র। মূল্য ১'৪০ টাকা।

আহার ও আহাৰ্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্তে কী ধরণের আহার আবশ্যক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। মূল্য ২'৫০ টাকা।

হিন্দুসমাজের গড়ন ॥ শ্রীনির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র-সংবলিত। মূল্য ২'৫০ টাকা।

হিউএনচাঙ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চীনা পরিব্রাজক হিউএনচাঙের ভারত ভ্রমণকথা ; তথ্যবহুল, অথচ উপন্যাসের গায় চিত্তাকর্ষক। মূল্য ২'৫০, শোভন সংস্করণ ৩'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থমালা

কালিকট থেকে পলাশী—শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযানের কাহিনী। ১০টি বিবল মানচিত্র। [৬'৫০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি—ডঃ সূধ্যাংগুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০'০০]

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫'০০]

ভারতের শক্তিসাধনা ও শান্তি-সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫'০০]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগোপযোগী প্রকাশনায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সূর্য রায় অঙ্কিত বহু রঙীন ছবি। [২'০০]

উপনিষদের দর্শন—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭'০০]

রবীন্দ্র-দর্শন—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [২'৫০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের স্মৃতি আলোচনা। [১২'০০]

বাঁকুড়ার মন্দির—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫'০০]

ডেটিনিউ—ডঃ অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ভূমিকা। [৩'০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-২ ॥

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

‘সমকালীন’ প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারন্ত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সভাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

‘সমকালীনে’ প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন ‘প্রবন্ধের পত্রিকা’।

‘সমকালীন’-এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। ছুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের
সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ
ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা ০ বাৎসরিক—২৫০ টাকা
বার্ষিক—৫ টাকা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, প্রবন্ধ
সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ০ বাৎসরিক—৫ টাকা
বার্ষিক—১০ টাকা

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য
নিচের ঠিকানার যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটাস বিন্ডিংস, কলিকাতা—১

বিদগ্ধ দায়িত্ব ০০০

একটি ভাল উপস্থাস বা গল্প
আপনাকে সহজেই
আগ্রহান্বিত করে, একটি
ভাল কবিতা মুহূর্তেই
আপনাকে অনুপ্রাণিত করে,
কিন্তু একটি প্রবন্ধ ?
তার দায়িত্ব অনেক বেশী।
আপনার বিদগ্ধ মনকে
সে ধীরে ধীরে
প্রভাবান্বিত করে, তাকে
বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে উত্তরণ করে'
বিদগ্ধতর করে তোলে।
সাময়িকতায় সে বিশ্বাসী নয়,
চিরন্তনতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

গল্প কবিতা বা উপস্থাস নয়,
বিদগ্ধ ও মননশীল প্রবন্ধাবলী
যদি আপনাকে
আকর্ষণ করে তাহলে
প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা
স ম কালীন
আপনার অবশ্য পাঠ্য।

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭৭

সমকালীন

Magic Moments



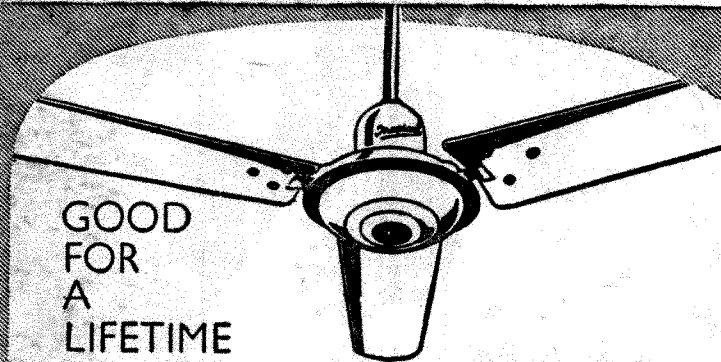
Just a little Magic in a bucket of water. And, wonderful things happen to your washing. Each grain of Magic is power-packed to dissolve instantly in water. A rich active lather works at super-speed. Rinsing is so much faster too. And, your washing ends up Ultra White... Ultra Bright. What more could a housewife wish for!



A TATA PRODUCT

A single wash...your clothes are bright
A single wash...they're Magic White!

CMTM-52-102



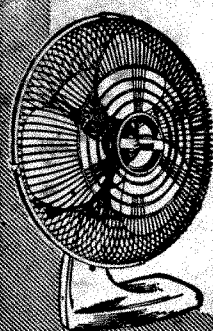
GOOD
FOR
A
LIFETIME

TROPICAL

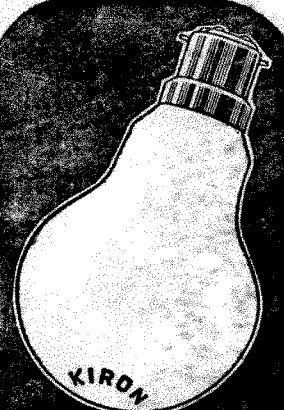
DE LUXE FANS

MANUFACTURED BY
BHARAT ELECTRICAL INDUSTRIES LTD.
 19, RAJENDRANATH MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-1

AGENTS :
THE ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD.
 CALCUTTA • BOMBAY • MADRAS • DELHI • KANPUR



O F-1-68



KIRON

KIRON

LIGHTS BRIGHTER
 LIGHTS LONGER

দাঁড়ায়। কী বীভৎস তার রূপ! বিচ্ছিন্নতার চেহারা কবন্ধ রাক্ষসের মত। রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির আগ্নেয় উগ্রতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন বড়র মূল্যবোধের ‘কথা,’ যেখানে বহুর মধ্যে ঐক্যবোধে আমরা সার্থক। এই মূল্যবোধের তাৎপর্য হোল বড়র পটভূমিকায় নিজেকে দেখবার; অপরকে দেখবার, অপরের দেখাকে সম্মান করবার, তথা বিশ্ববোধে আপনার সত্তাকে উদ্দীপ্ত করবার টান বড় আমির দিকে। এখানে মানুষের অন্তরসত্তা দৈহিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—“এই বোধের শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে-অন্তের আত্মাকে ও অন্তের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।” একে উপনিষদ বলেছেন যুক্তাত্মা হওয়া বুদ্ধদেব বলেছেন ব্রহ্মবিহার। এই মানবসত্য থেকে বখনই আমরা ভ্রষ্ট হই তখনই সর্বনাশ, এখানে আমি আছি, লাভ আছে লোভ আছে। তাই দেখি ব্রাহ্মণ-শূদ্র, প্রভু ভৃত্য, ধনী দরিদ্র ছোট ছোট আমির ঠোকাঠুকিতে সারা পৃথিবী কাতরাচ্ছে।

তাই প্রথম ভাগে এই যেখানে বাস্তব অবস্থা সেখানে আশা আছে কি আমাদের পক্ষে বড় আমিকে স্পর্শ করবার? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছেন, “হাঁ আছে।” কেননা মানুষের মধ্যে নিত্য সত্য স্তূপ রয়েছে। তিনি বলেছেন,—মানুষের একদিক মৃত্যুর অধিকারে, আর একদিক অমৃততে। একদিকে সে ব্যক্তিগত সীমায় আর একদিকে বিশ্বগত বিরাটে।” রবীন্দ্রনাথ কথিত “বিশ্বগত বিরাট”—এর দিকটি হোল নিত্যসত্য। এখানে ভূমা, মহামানবের প্রতিষ্ঠা। একে-আগিয়ে তুলে জীবনবীণার তার ক’টি তার সুরের সংগে বেঁধে নেওয়া মানুষের সাধনা। যে বস্তু সত্য সেই বস্তুই বড়। বড় দূর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয় তার পূর্ণতায়। সূর্যকে আমরা গোল দেখি—দেখি তার সম্পূর্ণতায়। আর তার চাইতে অনেক ছোট পৃথিবী দিগন্তের খণ্ডিত গোলকধাঁধায় আমাদের বুদ্ধির সীমানাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। পৃথিবীর আকার বুঝি সূর্যের আকার দিয়ে। আমাদের অনুভূতির গভীরতায় যে সত্য তা বাস্তব জীবনের নানা টুকরো ঘটনায় খণ্ডিত হয় প্রহেলিকার সৃষ্টি করে। মানুষ ভয় পায়, দিশাহারা হয় এই অসংখ্যের পীড়নে। তাই অন্তরদিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে সারবস্তুকে স্বয়ং সম্পূর্ণতায়—একের ভিতরে। সেই এক সত্য সেই এক ধর্ম—সেই এক শাস্ত্র শ্রেয়োবোধ; সেই এক আত্মার মূর্তি। প্রতিটি মানুষের ভিতরে স্বাভাবিক নিয়মে ঐ মূর্তির আকৃতি রয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—“অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই।” এই আকর্ষণকে বলা হয়েছে আদর্শবোধ, এইটে উপলভ্যমান। এরই প্রেরণায় চাওয়া এবং পাওয়া মিলে গেলেও মানুষ থেমে যায় নি,—বারংবার ব্যক্তিজীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রে নিজের সীমানা ভেঙে পথে বেরিয়েছে। এইটে সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টির অগ্রগতির মৌল প্রেরণা, বাকীগুলো আনুষঙ্গিক মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—“কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি জানত তাহলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত।” ‘রক্তকরবী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঐ মূর্তির এষণা নাটকীয় ঘটনাসন্ধিতে ব্যক্ত করেছেন।

পশুর সংগে মানুষের পার্থক্য এইখানে। পশুর চিত্ত বস্তুতেই আবদ্ধ,—মানুষ দেখেছে দৃষ্ট।

মানুষের হাত মাটির বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, রত হয়েছে অষ্টির কার্বে। এই সহজকে মানুষ সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। যেমন জল মাছের পক্ষে সহজ বলে মাছ তাকে বুঝতে পারে না। তবে তফাৎ এই পশুর পক্ষে সহজকে বুঝবার কোন সম্ভাবনা নেই—মানুষের পক্ষে সেই সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা জন্মেছে অষ্টির ক্ষেত্রে, অষ্টির মূলে রয়েছে আত্মোৎসর্জন, আত্মোৎক্রমণ, ত্যাগের সূত্রে অষ্টি যুক্ত। এই ত্যাগ অর্থ উপকরণ-বহুলতা থেকে মুক্তি। এইটের জন্ম সাধনা করতে হয়, ঐ সাধনার গৌরবে তার গৌরব। পশুর এই সমস্ত বালাই নেই। তাই কবি বলেছেন—মানুষ জন্মেছে নিশ্চেষ্টতার জগৎ থেকে সচেষ্টতার জগতে। প্রতি পদক্ষেপে তার মনুষ্যত্বকে জয় করে নিতে হয়। মানুষের আত্মার পক্ষে প্রকৃতির গর্ভ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এর চাইতে চরম সত্য আর নেই। এইটে বুঝি যখন দেখি মানুষ সমাজ বেঁধেছে ত্যাগের সূত্রে। এই ত্যাগ বাস্তবিকতার দ্বারা খণ্ডিত। এর সীমানা আরেক ধাপ প্রসারিত হলে স্বার্থবুদ্ধিকে সে পেরিয়ে যায়, তখনই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয়। এইটে প্রকৃতির বন্ধনমুক্তি। এখানে আছে আত্মসংগ্রাম। আত্মসংগ্রাম সংস্কার মুক্তির সংগ্রাম। সংস্কারমুক্তি কথাটা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে তার অল্পপূরক বিধিব্যবস্থা। অথচ জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট বিধিব্যবস্থাকে জীবনের চাইতে বেশী মূল্য দিয়ে ফেলে তাকে আঁকড়ে ধরে; করতে চায় শাখত অথচ গতিহীন। হাতে গড়া বস্তুর প্রতি এত মমতা যে তাকে ছাড়তেই চায় না, ধর্মের নামে, দর্শনের নামে মস্ততন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রশক্তির জোরে, দলতন্ত্রের জোরে তাকে কায়ম করতে চায়, নানা অপহৃৎকারী শক্তি বুদ্ধিকে গ্রাস করে ফেলে। এর হাত থেকে মুক্তির জন্ম প্রয়োজন বুদ্ধির উজ্জীবন, চিন্তের জাগরণ, আত্মার পৌরুষ। কিন্তু মনে রাখতে হবে বুদ্ধি মুক্তির সহায়ক, কিন্তু চরম নয়। কেননা, মানুষের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বুদ্ধি আবিল হয়ে উঠে; দ্বিতীয়ত, বুদ্ধির মূলে ক্রিয়াশীল যে কোতুহল সে চারপাশের অসংখ্য অনিশ্চয়তার ভিতর খেঁচি হারিয়ে ফেলে, সভয়ে নিজেকে সংকুচিত করে নিতে চায়। তাই চরমকে, এককে ধারণ করবার যোগ্যতা বুদ্ধির নেই। বুদ্ধির চরিতার্থতা বিজ্ঞানে, আর সত্য প্রকাশ পায় জ্ঞানে। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে বলেছেন,—“কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে—কিন্তু দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে—উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম প্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে।” এই যে মনকে বাহিরে প্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা। জ্ঞানের চরম সার্থকতা নিলিপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতায়। এই জ্ঞান সাধনার পথ কি? এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন সেইটে সাধারণভাবে আলোচনা করে বক্তব্য শেষ করব।

জ্ঞান সাধনার পরিণীলনের উপায় হোল শিক্ষা। শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যক্তিমানসের উৎকর্ষ সাধনার এবং ব্যাপকতর প্রয়োগক্ষেত্রে গণমানসের মানোন্নয়ন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ব্যক্তি যার পরিমণ্ডল রচনা করেছে সমাজ। শিক্ষাকে তিনি ব্যক্তির প্রৈতিব মুক্তি এবং উদ্বোধনের সামগ্রী বলে ঘোষণা করেছেন। যে মুক্তি অর্জন করলে মানুষ তার ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা অপরের নূনতম শ্রেয়োবোধ উদ্দীপনের কাছে আত্মনিয়োগ না করে পারবে না। কাছেই শিক্ষার এই মৌল উদ্দেশ্যের দিক্‌দিকে তার চরম সার্থকতার রূপরেখা প্রতিকলিত।

সমাজ এবং ব্যক্তি আদান-প্রদানের অন্তোন্তসাপেক্ষতায় সম্ভবদ্ধ। সমাজ ব্যক্তির মানসিকতার পূর্ণ পরিচর্যার ব্যবস্থা করবে—এমন কি সমাজ ব্যবস্থার শীর্ষে যারা অধিষ্ঠিত তাঁদের গোষ্ঠী স্বার্থবিরোধী তথ্য এবং তত্ত্বের উপর পক্ষপাতহীন করা সমাজের দায়িত্ব। এইজন্ত শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাসাধনার প্রাস্তদেশে ব্যক্তিমনকে উপনীত করা, নবতর চিন্তায় উদ্দীপ্ত করা। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই প্রসঙ্গে গুরুদায়িত্ব বর্তায়। ব্যক্তি যুগার্জিত সংস্কার প্রচলিত শিক্ষাধারার ভেতর থেকে সারবস্ত্ত আত্মসাৎ করে নবতর যুগ সূচনা করবে,—মুক্তির এষণা ঘোষণা করবে। বাল্মীকি, বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি মনীষীরা প্রাচীন এবং প্রচলিত জ্ঞানসাধনার সিদ্ধিফল আত্মসাৎ করেছেন এবং তারই ভেতর থেকে তাঁরা আয়ত্ত্ব করেছেন অল্পবর্তনকে অতিক্রম করবার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রসারতা। নৈর্ব্যক্তিকতার নিষ্কলুষতা সৃষ্ট যে শক্তি তাই সমাজ সভ্যতাকে মুক্তির তীর্থাভিমুখে সঞ্চলমান রাখে। শিক্ষাব্যবস্থা রচনায় এবং তার সার সংগ্রহে সমাজ এবং শিক্ষার্থীর দায়িত্বের পরিপূর্ণতা এইখানে। শিক্ষার আলোকে সর্বোচ্চ নিলিপ্ততা অর্জন হোল জ্ঞান। এইটে পাণ্ডিত্যের চাইতে গভীর,—ওখানে নবোনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। এই দৃষ্টির সামনে যথার্থমুক্তি উদ্ভাসিত হয়। একেই বলেছি চিন্তের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনব্যাপী কবি অল্পভূতির বেশে এই মুক্তির কথাই বলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন মানুষের সংগ্রাম জ্বলভাবে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির গণ্ডিবদ্ধতা ভাঙবার প্রয়াসে, কিন্তু হৃদয়ভাবে নিজেরই হাতে গড়া প্রকৃতির কারা-কপাটের বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্ররচনাবলী কেবল উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি নয়—গভীর প্রজ্ঞার স্বাক্ষরও পড়েছে, ফলে উচ্চ দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ভারতীয় প্রতিভার বিশেষ বৈশিষ্ট্যই বটে। এই কারণে কবি চরকা আন্দোলনের যান্ত্রিকতা, শিক্ষা বয়কট স্বীকার করেননি, আবার কৃষবিপ্লবের মুক্তির প্রতিশ্রুতিতে উল্লসিত হয়েও যে মুহূর্তে লক্ষ্য করেছেন নতুন যান্ত্রিকতার ঔদ্ধত্যে নতুন আরেক আবদ্ধতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তখন বলেছেন,—“সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালাবার একটা প্রবল প্রয়াস স্পষ্টত্যাঙ্ক, সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অন্ধকূলে করে দেওয়া হয়েছে। এখানে জবরদস্ত লোকের এক নায়কত্ব চলেছে।” লক্ষ্য করতে হবে কবির বিরূপতা মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে নয়—ঐ দর্শনের নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সত্যমূল্য যাচাই করবার পক্ষে বাধাসৃষ্টির বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়ত, মানুষকে ছাঁচে ঢালাই করবার প্রয়াসে সৃষ্টিসত্যের তথা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধিতার সূত্রে মানবসত্যকে হনন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে,—যা চিন্তের মুক্তির পথরোধ করে তার বিরুদ্ধে।

আমরা এতক্ষণ রবীন্দ্রজীবনদর্শনের যে স্বরূপটি আলোচনা করলাম তাকে উপলব্ধি করবার জন্তে বোধও বুদ্ধিকে আবিলতামুক্ত রাখতে হবে। কারণ মানুষ সত্যকে হনন করে দুইটি উপায়ে একটি হচ্ছে সত্যকে নিজের কিংবা দলের অল্পকূলে সেবাদাসী কবে ব্যবহার প্রচেষ্টা, এখানে দলীয় স্বার্থের পরিমাপে, প্রোকাষ্টিয়ান বেডের মাপে সত্যকে ছাঁটাই করা হয়, আর দ্বিতীয়টি হোল দলীয় স্বার্থকে কোঁশলসাধ্য ব্যাখ্যার আশ্রয়ে বিশ্বজনীন বলে ঢালাবার অপেক্ষা। এই দুই বুদ্ধির

অপহৃৎকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, সত্যকে জানবার জ্ঞান জ্ঞানের অল্পশীলন প্রয়োজন, ঐ সত্যকে ধারণ করবার জ্ঞান প্রয়োজন শক্তির, আবার শক্তি যাতে উদগ্র না হয়ে ওঠে সেই জ্ঞান দরকার প্রেমের উজ্জীবন। এক কথায় বলা যেতে পারে বিজ্ঞান এবং জ্ঞান শক্তি ও আত্মবোধ এই দু'য়ের অবিদ্যমানসংবদ্ধতা মানবমুক্তির পথ। রবীন্দ্রনাথ এই পথনির্দেশ করেছেন আমাদের জ্ঞান। অবাস্তবে এইটে কবির অরূপ উপলব্ধি। জীবনকে স্বীকার করে, জীবনের উপর ভর করে থাকা নীচুস্তরের কামনা- লালসার নির্বাসনে আনন্দময় চৈতন্যসংবিদে এর পূর্ণতা। এই পূর্ণতায় জৈবিকতার পরপারে মহামানবের প্রতিষ্ঠা। এ এক রসঘন আনন্দচৈতন্য।

আধুনিক কল্কচ্যুত, মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর যুগে রবীন্দ্রনাথকে নির্ভর সংগে স্মরণ করে তাঁর জীবনবোধে নিজেদের অভিযুক্ত করা ব্যতিরেকে, “নাশপন্থাবিহতে অসন্য”।

বাংলাসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

অধুনা বাংলাভাষা ও সাহিত্য অতিমাত্রায় বিচিত্রবীৰ্য এবং মনোহর। কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্য চিরদিনই এরূপ ছিল না। বহুকাল ধরিয়া বহু কবি সাহিত্যিক সাধনা এবং পরিচর্যা করিয়াই বাংলাসাহিত্যকে বর্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। বর্তমানের পরিবেশে দাঁড়াইয়া তাই বাংলাসাহিত্যের সেইসব ধারক ও পালকদের স্মরণ করিবার যথার্থ মূল্যবোধ ও আবশ্যকতা অল্পভূত হয়। বর্তমানে অতীতের রোমন্থনের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকিয়া থাকে তবে ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিবার কথা অবশ্যই চিন্তনীয়। বাংলাসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিবার প্রাকালে বাংলাভাষায় এক স্থানিচিত মণীষী রাজনারায়ণ বসুর উক্তিকে উদ্ধৃত করিতেছি তিনি একদা বলিয়াছিলেন :—

...গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাংলা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তিস্থান নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি কীর্তন করিতেছে।”

ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি কীর্তন করিয়াই মুখ্যতঃ আবিস্কৃত। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তাঁহারই সাগ্রহে অল্পরোধে তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেকেই এই বিদ্যাসুন্দরকে তাই ফরাসী সাহিত্য বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বাংলাসাহিত্যের আসরে ভারতচন্দ্রের যথার্থ মর্যাদা স্বীকারে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ হইতে অগ্রতঃ দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া গেলে স্পষ্টতই বাংলাসাহিত্যের আসরে ভারতচন্দ্রের মর্যাদা স্বীকৃত হইবার দাবী রাখে। ভারতচন্দ্রের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে নবযুগের অভ্যুদয় অস্বীকার করা যায় না। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের কবি হইলেও তাঁহার অন্নদামঙ্গল বাংলাসাহিত্যে এক অরূপী গ্রন্থরূপে স্বীকৃত।

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র অগ্রাণু মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের হইতে একান্তভাবেই স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যই বাংলাসাহিত্যের আসরে অন্নদামঙ্গলগ্রন্থ এবং ইহার প্রখ্যাত গ্রন্থকার রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে নির্দিষ্ট আসন দান করিয়াছে। ইহাতে ভারতচন্দ্র ভক্তির দিক হইতে অন্নদাকে একবারও নিরীক্ষণ করেন নাই। ভক্তির পাঠ তাঁহার প্রাচীন কবিদের কাছ হইতেই প্রাপ্ত—ইহাতে তাঁহার আপন স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করিতেছি—“তিনি (ভারতচন্দ্র) প্রাচীন কবিদের কাছেই ভক্তির পাঠ নিয়েছিলেন। এহেতু ঐ বিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। কিন্তু ‘মহাকবি’ তাঁকে সত্যিই বলাচলে। এবং এ সম্মানের হেতু তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নয়—তাঁর প্রকাশভঙ্গী, তাঁর অভিনব বাক্চাতুর্য, তাঁর গ্রাম্যতাবর্জিত নবত্ব।”

ভারতচন্দ্র বিদ্যাস্বম্ভরের বিষয়বস্তু সংগ্রহে মুকুন্দরাম, কৃষ্ণরামদাস এবং কিছু কিছু অগাধ্য সাহিত্য ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার সেই স্বললিতভাব ভারতচন্দ্রের কোথাও নাই। কাজেই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের বিষয়বস্তু মোটেও চমকপ্রদ নয়। এবং এ হেন বিষয়বস্তু বিশিষ্ট সাহিত্যরচনা করিয়া ভারতচন্দ্র কোনমতেই বাংলাসাহিত্যের আসরে সত্যমর্যদা লাভ করিতে পারেন না। বলিয়াই একদল সমালোচক মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার এইভাবে কখনই সম্পূর্ণ হইবে না। বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রমথ-চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—“ভারতচন্দ্র ছোট হন, বড় হন,—জাত কবি, স্তবরাং তাঁর অহংএর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দুষিত এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। স্বথের বিষয় সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমালোচকদের কাছে তাঁরাও নিস্তার পেতেন না।”

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী তাঁহার লিখিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “Bharatchandra as a Supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengli language.”

ভারতচন্দ্রের লেখা অত্যন্ত সরস ও সরল। বক্তব্যকে অত্যন্ত সহজ সরল করিয়া প্রকাশ করাতেই ছিল ভারতচন্দ্রের বিশিষ্টতা। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপারে ভারতচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণে তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন, “ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।”

ভারতচন্দ্র সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত বাংলা এবং পার্শ্বভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সকল ভাষার স্বল্প সময়ে তিনি বাংলাভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন। ভাষা ব্যবহারে এবং ভাষাসৃষ্টির আশ্চর্যক্ষমতার জগুই তিনি বাংলাসাহিত্যের আসরে অগ্রণীয হইয়া আছেন। তাঁহার সত্যকার মৌলিকতা এই ভাষা সৃষ্টিতেই। তাঁহার সম্পর্কে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র লিখিয়াছেন। “তিনি শব্দকুশল, ছন্দে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা, অলংকার ব্যবহারে তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর কলহ কোলাহল মুখর বঙ্গদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ঐতিহ্যসারী বিপ্লবী নাগরিক। তিনি গ্রাম্যতামুক্ত, তিনি বিচিত্রভাষী, তিনি বাংলা কবিতার প্রাচীন সুগের শেষ জ্যোতিষ্ক। পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদ, মংগলকাব্যের পরিচিত কাহিনীর পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি, কয়েকটি লৌকিক কাহিনীর উপাদানে রচিত কিছু ছড়া এবং গাথা জাতীর রচনার পঠনপাঠনে ক্লাস্ত বাঙালী যখন নতুন ভাষা এবং নতুন প্রকাশভঙ্গীর প্রতীক্ষায় উন্মূহ হয়েছিল, সেই সময় নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ‘সত্যপীরের গান’ রচয়িতা একটি বালক আশ্রয়প্রার্থী হলেন। কালক্রমে বাঙালীর মুখে তিনিই দিলেন নতুনভাষা। ক্রমশঃ সেই কবির রচনাবলী—বাক্য বাক্যাংশ এবং শ্লোক বাংলাদেশে প্রবাদবাঙ্গলী হয়ে উঠলো। আজ কথায় কথায় আমরা ‘শিবের দক্ষায়ে যাত্রা’র চিত্রের উল্লেখ করি, প্রবচনের মতো তাঁর কবিতার বহু পংক্তি ব্যবহার করে থাকি। বাংলা ছন্দকে তিনিই প্রথম সৌম্যের নিয়মে বাধলেন; পর্বের মধ্যে ধ্বনিসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস এবং

এক বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার নৈপুণ্যের কৃতিত্ব ভাঁরই। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ দাসের পরে এই একজন শব্দকুশল কবির আবির্ভাব হলো। তারপর প্রায় শতাব্দীব্যাপী কবিওয়ারীষ্য বাচালতা।

ভারতচন্দ্রের লেখার প্রসাদগুণ অতিমাত্রায় লক্ষণীয়। প্রথম চৌধুরী বলিয়াছেন, “ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গসরস্বতী একেবারে তরোয়ায় শিখরদশনা” রূপ ধারণ করেছেন। যার অন্তরে বঙ্গভাষা এই প্রাণবন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে তাঁর যে প্রতিভা ছিল সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।.....অমন সরল ও তরলভাষা তাঁর পূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানিনে।

ভারতচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার কাব্যে প্রসাদগুণ থাকিবে এবং তাহা হইবে একান্তভাবেই রসাল। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেই যুগের উপযুক্ত আদিরসাত্মক কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা সেই রস একান্তই অচল। বর্তমানে আদি রসাত্মক অনেক কাব্যই অশ্লীল বলিয়া গণ্য। কিন্তু আদি রসই ছিল সে যুগের কাব্যের রস। কাজেই অশ্লীলতার অপরাধে বা অজুহাতে ভারতচন্দ্রকে অপাংক্ত্যেয় করিয়া দেওয়া সংগত বলিয়া বিবেচ্য নহে। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার মধ্যে যে আঁট আছে তাহা কবীসাহিত্যের অনুরূপ। বাংলাসাহিত্যে দেহতত্ত্বের কাব্যরচনায় ভারতচন্দ্র তাই অনন্ত। তাঁহার অশ্লীলতা গভীর নয়, সহ্য। বাংলাসাহিত্যে আরিস্টোফেনিস ও আনাতোলা ফ্রাঁসের অনুরূপ হাস্যরসের আমদানি করিয়াছেন ভারতচন্দ্র। তাই মাঝে মাঝে তাঁহার অট্টহাসির কাছে অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধিনিষেধের দুর্গভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র তাই অত্যন্ত গোড়াপন্থী সমালোচকদের নিকট বিশেষ অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু হাস্যইতে পারা যে একটি মহৎগুণ তাহা অনেকেই বিস্মৃত আছেন। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাঙলাসাহিত্যে আর কেহ আনয়ন করেন নাই।

বাংলাসাহিত্যে এক যুগসন্ধির কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর হইতে সাহিত্যের গতির দিক পরিবর্তন—উনিশ শতকের সূচনা। ভারতচন্দ্র এই যুগসন্ধির কবি। একদিকে প্রাচীন ধারা অতীতকে নূতন যুগ—এই দুই সমাবেশের কবি হইলেন ভারতচন্দ্র। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে, শিবায়নে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে, কালিকামঙ্গলে নায়কনায়িকার স্বর্ণগমন ইত্যাদি কাহিনী পরিকল্পনায় ভারতচন্দ্র প্রাচীন রীতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যত্র, বিদ্যাসুন্দরের নাগরিকতা স্পষ্ট। ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী রচনায় ভারতচন্দ্র আধুনিকতার পরিচয় দান করিয়াছেন। মানসিংহ পালায় ভারতচন্দ্র যে ঐতিহাসিক কাব্যের ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—তাহাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীগ্রস্ত বলিতে হয়।

ভারতচন্দ্র নারদ ও শিবচরিত্র চিত্রণে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যে যে কল্পলোকের কথা নয়, ইহা যে মানব সমাজেরই প্রতিচ্ছবি—এই বোধ ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলাসাহিত্যে আনয়ন করেন। এই কারণেই তিনি অন্নদা ও শিবকে অত্যন্ত জীবন্ত ও জাগতিক করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বর্গের কল্পলোকের দেবদেবী মানবসংসারের একান্ত আপনজন হইয়া সর্বপ্রথম এমন স্বচ্ছন্দভাবে এক ভারতচন্দ্র ছাড়া বোধকরি আর কাহারও রচনায় ইতিপূর্বে ধরা দেন নাই। স্বার্থতাসত্ত্বেও অন্নদাদেবীর ক্লবধু ও মাতুরূপটি স্পষ্ট হইয়াছে। অন্নদা ও শিবের গার্হস্থ্যচিত্র

বর্ণনার মানবীকরণটি স্বন্দরভাবে ফুটিয়াছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, “নিখাদ নিষ্ফল দাপশিখার জায় মহাষোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ায় মতন চিত্রিত করিয়াছেন।” হীরামালিনী ও ঈশ্বর পাটনীর চরিত্রচিত্রণে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। “আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে”—ভারতচন্দ্রের এই ছত্রটি বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মাতৃহৃদয়ের একটি রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। সন্তানের প্রতি বাঙালী মায়েদের যে ভালবাসা তাহাকে ইতিপূর্বে বাংলাসাহিত্যে এত সহজ ও সরল করিয়া কেহ প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জানিনা ?

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতার আদিগুরু হিসাবে আমরা বিহারীলালকেই শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকি। কিন্তু রোমান্টিক কবিতার যথার্থ সূচনা হয় ভারতচন্দ্রেরই বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এবং বসন্ত, বর্ষা, হাওয়া ইত্যাদি বিষয়ক ছোট কবিতাগুলিতে ভারতচন্দ্রের রোমান্টিক কবি দৃষ্টি লক্ষণীয়।

বাংলাসাহিত্যে ধর্মসম্বন্ধীয় উদার অভেদদৃষ্টি ভারতচন্দ্রই আনয়ন করিয়াছেন। তিনি শিব, বিষ্ণু ও অন্নদাকে অভিন্ন বলিয়া জানিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন—

“অভেদ যে জনভেদ সেই ভক্ত ধীরে।”

সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদেরও ধর্মসম্পর্কে একই দৃষ্টি,—“কালীকৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।”

ভারতচন্দ্র শব্দ, ছন্দ এবং অলঙ্কারে যে সংযম পারিপাট্য এবং পরিমিতবোধের পরিচয় দিয়াছেন পরবর্তীকালে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এমনকি মধুসূদন পর্যন্ত সকলেই তাঁহাকে তাঁহার যোগ্যসমাদর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। রঙ্গলাল লিখিয়াছেন—“কবিতাকেশরী রায়গুণাকরের পর কাব্য লিখিয়া যশ লাভ করা দুঃসাধ্য।” এমনকি মধুসূদন যেভাবে ভারতচন্দ্রের যমক অনুপ্রাণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার উপর ভারতচন্দ্রের এক অপরিণীত প্রভাব পড়িয়াছে। এইরূপ বলা যায়।

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বাক্যবিতণ্ডা এ যাবৎ হইয়া গিয়াছে এবং এখন বহু বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে।

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সার্থক মন্তব্য করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ—“ভারতচন্দ্রের রচনা রাজকণ্ঠের মালার মত, যেমন তার উজ্জলতা, তেমনি তার কারুকার্য।”

আমাদের বাংলা সাহিত্যের এক অরণীয় উত্তরাধিকার হইলেন ভারতচন্দ্র। তাঁহাকে বাদ দিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কখনই সূচনা হইতে পারে না।

বিভূতি মানসের ভূমিকা : দিনলিপি

দীপক চন্দ্র

দিনলিপি এবং চিঠিপত্র প্রত্যেক শিল্পীর মানস মুকুট। মানস সমীক্ষার ক্ষেত্রে এদের মূল্য ও গুরুত্ব অসীম। কেননা, বিভিন্ন অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন তাঁদের মর্মে, কর্মে, ধর্মে, চিন্তায়, ভাবনায়, অনুভূতিতে উপলব্ধিতে যে ছাপ ফেলে তার বিস্তৃত পরিচয় উদ্ঘাটনের পক্ষে এগুলির উপযোগিতা খুবই বেশী। যে মানুষটি ধীরে ধীরে নানা ঘটনায় ও ভাবনায় শিল্পী বা লেখক মানসের অধিকারী হচ্ছে তার নিভৃত পরিচয় দিনলিপির পাতায় অভ্যুজ্জল। জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, জীবনের কলরব কোলাহল যা কিছু তাঁর মনে সাহিত্যসৃষ্টির ডাক আনে, দূর জগতের ইশারায় চঞ্চল বিহ্বল করে—মনের পাপড়িগুলিকে একটি একটি করে মেলে ধরে তারই পরিচয় রয়েছে দিনলিপিতে। দিনলিপি তাই শিল্পীর জীবনবোধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। আত্মপরিচয়জ্ঞাপক রচনার অন্তর্গত।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলি শিল্পী বিভূতিভূষণের মনের ছায়ারগুলি পুরোপুরি খুলে দিতে পেরেছে। স্মৃতির রেখা (রচনাকাল : ২৭শে অক্টোবর ১৯২৪ হইতে ২৬শে এপ্রিল ১৯২৮) ॥ তৃণাসুর (১৯শে জুন ১৯২৯ হইতে জানুয়ারী ১৯৩৯) ॥ উর্মিমুখর (মে ১৯৩৫ হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) ॥ উৎকর্ণ (১১ই অক্টোবর ১৯৪৪ হইতে ?)—ইত্যাদি ডায়েরী গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সে কারণে এগুলি আটপোরে জীবনের কথায় শুধু ভরপুর নয়, এগুলিতে জীবনের সেই তথ্য আছে যা বিভূতিভূষণের জীবনবোধের অল্পগত এবং তার সংগে সংগতিপূর্ণ। এগুলি আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে সারাজীবন ধরে বিভূতিভূষণ যা লিখেছেন তার উৎসের সন্ধান মিলবে এখানে।

তার আগে কতকগুলি সাধারণ কথা বলে নেয়া দরকার। দিনলিপিগুলি যে স্থান বৈচিত্র্যে অভিনব বিভূতিভূষণের স্বীকারোক্তি থেকে তা জানতে পাই। উর্মিমুখরে লেখক বলেছেন : “কত জায়গায় বসেই কত ডায়েরী লিখলুম, ভাগলপুরে, ইসমাইলপুরে, দ্বিরায়ে, আজমবাদ কাছারীতে, কানীতে, রাখা মাইনুসে, নাগপুরে, কলকাতায়।” বলতে পারি, বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য জনপদ দিনলিপিতে ভীড় করেছে চেনা অচেনার রহস্তে।

এত যে বিরাট ভবু তার প্রতি ঔদাসীন্ধ্য ছিল লেখকের। ডায়েরীর মূখবন্ধে লিখেছেন : “পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্ম এগুলি লিখিত হয় নাই। সেজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিষ দেখা যায় যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমার জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহাই একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি। কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের ঐক্য।” তা’হলে দেখা যাচ্ছে, পরিণত বয়সে লেখক ডায়েরীগুলি সম্বন্ধে প্রথম আত্মসচেতন হন।

দিনলিপি রচনায় বিভূতিভূষণ আত্মসচেতন শিল্পী। আপন শিল্পী সত্তার প্রতি আস্থা তাঁর

অগাধ। বিভূতিভূষণের আত্মপ্রত্যয়দৃষ্ট সেই স্বীকারোক্তি পথের পাঁচালী সম্পূর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ হয়। ‘স্মৃতির রেখা’ ২৪শে এপ্রিল ’২৮ তারিখে লিখেছেন—

“আমি জানি আমার কাছে যা মধুর বলে মনে হবে অপরের কাছে তার মাধুর্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—তবু ভবিষ্যতে এই ছত্র কয়টি যদি কেউ পড়ে তবে সে যেন না ভুলে যায় যে জীবনের আনন্দ অতি রহস্যময়—কারো কোনদিনের স্মৃতি তুচ্ছ নয়। তারা যেন মনে রাখেন...। (পৃ ১০৭)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, লেখক নিজের তাঁর কিছু স্মৃতি রেখে যেতে চান পাঠকের অন্তরে।

পরিণত বয়সই সেই কথা জানানোর উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়েছে। বিভূতিভূষণ জানেন, ডায়েরীর পাতাতেই একমাত্র প্রকৃত শিল্পী মান্নবটি প্রত্যক্ষ হতে পারে। “ভৃগুস্করের” ভূমিকায় সেই কথাই বলেছেন :

“আমার জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশী।”

প্রকারান্তরে’ গণমূল্যের প্রত্যাশী লেখক। কিন্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে দারুণ সংশয় মনে। তবু ভরসা করেন “মানব মনের ঐক্য”র জোরেই হয়ত উত্তরে যাবে লেখা। কেননা, এতে অনেক কথা আছে যা শোনানোর মত। আছে অনেক ভাবনা যা অন্তের মনে সঞ্চারিত করা যায়। অনেক চিন্তা আছে অপরের ভাগ দিয়ে যার আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দ ছাড়াও আছে শিল্পীমনের বিভিন্ন আভ্যাক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভূতি মানসের সে পরিচয় এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে।

“আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহুদূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন নদী, বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনা কত অপূর্ব-জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই স্মরণ।” (পৃ ২৮)

অর্থাৎ, বিভূতিভূষণ সারা জীবন ধরে যা ভেবেছেন, লিখেছেন ডায়েরীর মধ্যেই তাকে পেয়েছেন আগে। ভাবানুভূতি ঘনীভূত হলে তারপর গল্পের অবয়ব দিয়েছেন তাকে। এজ্ঞা দেখা যায় দিনলিপির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলেছে তাঁর গল্প উপন্যাস রচনার প্রবাহ। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বিভূতিভূষণের জন্ম ১৮৯৪ সালে আর তাঁর ডায়েরী লেখার আরম্ভকাল ১৯২৪ থেকে। অর্থাৎ, ত্রিশ বছর বয়স থেকে ডায়েরী লেখার সূত্রপাত। সেখান থেকে এই রচনার প্রয়াস রয়েছে অব্যাহত। পক্ষান্তরে, বিভূতিভূষণের লেখক জীবনের স্তরও এইকালে। যদিও বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবনের আকস্মিকতা খুবই বেশী। এজ্ঞা লেখকের প্রস্তুতি ছিল না মোটে। ‘আমি কোনোদিন লিখিনি।...কোনোদিন লেখক হওয়ার স্বপ্নও দেখি না।’ (গল্প লেখার গল্প)। পাঁচুগোপালের ছেলেমানুষীতে বাধ্য হয়ে একদিন তাঁকে গল্পের উপকরণ খুঁজতে

হয়েছিল। আর সেজন্য প্রকৃতিকে ক্ষেত্র নির্বাচন করেছেন : “গ্রাম্য মাঠের ধারে রেল লাইন, তার ওপরে একটা সাঁকো, পেছনেই তালীবন। একটা মজা পুকুর।...স্থলের ছুটির পরে রোজ রোজ সেই রেল লাইনের সাঁকোর ওপর বসে গল্পের প্লট ভাবি, একটু একটু করে লিখি।” (ঐ)। বিভূতিভূষণের সমগ্র শিল্পভাবনার মূলে রয়েছে এই প্রবণতা। চতুর্দিকে সংগে মিশে গিয়ে নিজের মনের মত একটা কিছু রচনা করেছেন। আর প্রকৃতি তাতে সহযোগী হয়েছে বেশী। ভাষা, ভাব ও অল্পভাব হয়েছে তার সরঞ্জাম।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বিভূতিভূষণ প্রকৃতি থেকে আগে উপকরণ আহরণ করেছেন। আর সেই ভাবানুভূতিগুলি ডায়েরীর পৃষ্ঠায় একটি একটি করে জমিয়ে শিল্প সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাই দেখি, “পথের পাঁচালী” আগেই গঠিত হয়েছিল বিভূতিভূষণের মানস জীবন। “স্মৃতির রেখা”য় সেই ইতিহাস সংকলিত। তা হলে দেখা যাচ্ছে, জীবনের বাহ্য ঘটনায় যে জীবনটা গড়ে উঠেছে তার বিচরণ আছে স্বতন্ত্রাধার (ডায়েরীর পৃষ্ঠায়) আর শিল্পীর জীবনদর্শন আছে উপলব্ধি। সুতরাং দিনলিপিগুলি আগে সৃষ্টি হলেও প্রকাশিত হয়েছে উপলব্ধির অনেক পরে। অর্থাৎ উপলব্ধির ভিত্তি পাকা হলে তবেই উপলব্ধি রচিত হয়েছে। এজন্য দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে বসে তিনি উপলব্ধি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। যেমন ধরা যায়, “পথের পাঁচালী”র গ্রাম বাংলার সহজ সরল-অনাড়ম্বর ঘরোয়া জীবনের ছবি এঁকেছেন অরণ্যের নিভৃত নিঃসঙ্গ শান্ত পরিবেশে বসে। আবার আরণ্যকের গভীর গহন অরণ্যের অজানা অশ্রুত এক জীবন সংগীত লোকালয়ের মাঝখানে বসে পরিবেশন করলেন শান্ত কোমল স্বরে। দিনলিপি তাই বিভূতিভূষণের লেখক জীবনী। “ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাস” বলে একে আবার আত্মজীবনীর পংক্তিভুক্ত করা যায়।

দিনলিপিতে সন তারিখের উল্লেখ না থাকার ফলে তার বার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটা সাময়িক অন্তরায় সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কাল পারস্পর্য নির্ণয়ের সমস্যা প্রধান হয়ে ওঠে। যদিও লেখক সামগ্রিকভাবে তার একটা সময় নির্দেশ করেছেন তথাপি বাধা উত্তরণের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। দিনের এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশি যা লেখকের চিন্তা ও অনুভূতিকে নিত্য অনুপ্রাণিত করে তার সাথে শিল্পী মানসের যোগসূত্র (সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে) তার উদ্ভর্তন এবং রূপান্তরের প্রকৃতি ও গতি নির্ণয় করা দুর্লভ হয়ে পড়ে। লেখক কর্তৃক স্থনির্দিষ্ট কাল সীমানা থেকে প্রত্যয়মান হয় যে, দীর্ঘকালের ব্যবধানেও লেখকের ভাবনার কোন বিবর্তন ঘটেনি। কল্পনায় তারা এক ও অবিকল। এমনকি নতুন কোন অভিজ্ঞতার কথাও নেই। দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর সর্বত্রই তার একটা মিল আছে। রচনার গৌরবটা সেইখানেই।

শিল্পমূল্যের বিচারে দিনলিপি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। লেখকের ব্যক্তিসত্তা বিকাশে কিংবা জীবনদর্শন উদ্ঘাটনে দিনলিপি কতখানি আবদানগ্রাহ্য হতে পেরেছে তার পরিচয় উদ্ধার করব।

দিনলিপির সব কয়টি রচনাই বিষয়গৌরবে উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু সৌরভে ভরপুর। ব্যক্তিমনের অনুভূতিতে সুন্দর। আপন মনের সাথে শিল্পী হৃদয়ের নিভূতে আলাপ হয় দেখানে। এর মধ্যে তাই এক ধরনের রস সৃষ্টি হয়েছে—বা-প্রত্যক্ষ দেখাশোনার মধ্যে নেই। ভারহীন সহজ রসই

এর বৈশিষ্ট্য। মনের জ্ঞানলার ধারে বসে লেখক যা প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাকেই তিনি দিনলিপির বিষয়ভুক্ত করেছেন। কোনো বাঁধাধরা প্লট নেই। লেখকমনেও নেই কোন বন্ধন। চিন্তা করে কথা বলার চেষ্টাও নেই। মনের স্বচ্ছন্দ বিহারে স্বতঃস্ফূর্ত।

“প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি ফুটে ওঠে, নির্জন ধ্যানের মধ্য দিয়ে অপূর্ণ আনন্দের মধ্যে দিয়ে।” (তৃণাঙ্কুর—পৃ ৮৩)

কথা বলার বিষয় সব সময় না থাকলেও ব্যক্তিগত অল্পভূতিগুলি আড়িপেতে শুনবার কৌতূহল হয় মনে। অপরপক্ষে ডায়েরীর অংশগুলি কোন একটি বিশেষ দিনের সীমানায় বন্দী না করার ফলে একটা অঞ্চল রূপ লাভ করেছে। সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ দিনের বিভিন্ন অল্পভূতি, উপলব্ধি লেখক তাঁর দিনলিপিতে একটি একটি করে সাজিয়ে একত্রিত করেছেন। ফলে, শিল্পী এবং রচনা উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। রচনাগুলির ভেতর তাই মনের একটা অবিশ্রাম গতি প্রত্যক্ষ করা যায়। বলতে পারি এটাই তার স্বর ও ছন্দ। শুধু তাই নয়, ডায়েরী লেখকের মনের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার অবসরও আছে এখানে। নিজেকে অনেক দূরে নিষ্কেপ করে লেখক যে অসীম আনন্দ উপভোগ করেন, পাঠক স্বাদ পায় তার। “অবকাশের অবকাশত্ব কিছুমাত্র নষ্ট করবে না বরং তাকে রঙিন রসালো করে তুলবে, অথচ তাকে মন দিয়ে পড়বারও খোরাক দেবে।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। মনের এই উৎসাহেই বিভূতিভূষণ প্রকৃতির চিত্রময় বাণী আহরণ করে জ্ঞানের দীনতা এবং দেখার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। আর আমরা পাচ্ছি এমন সব খবর যা লেখককে বুঝতে সাহায্য করে।

স্মৃতির সরণী বেয়ে লেখক অতীতের মধ্যে বার বার ফিরে গেছেন। অতীতের প্রতি লেখকের মোহ দুর্বল। স্মৃতিসূত্র ধরে অতীতের ঘটনাগুলো টেনে এনেছেন বর্তমানের প্রেক্ষাপটে। নবীনতার স্বাদ সৃষ্টি করে লেখক তাকে উপভোগ করেছেন।

“সব যেন পুরাতন বন্ধুর মত আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শ পাঠিয়ে দিল।”

(তৃণাঙ্কুর—পৃ ১০০)

“স্মৃতির রেখা”য় লেখক এই মুগ্ধতার কথা লিখেছেন।

“হারিয়ে যাওয়া গভীরতা মাথানো রহস্য তাদের সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো.....মনের যেখানে তাদের আশ্রম, একদিন কিসে বলা যায় না হঠাৎ সেই তারে যা পড়ে যায়, তখন অতীত মুহূর্তগুলি তাদের অতীত গন্ধে রূপে বর্ণে শব্দে, স্মৃতি-হুঃখে, হাসি অশ্রুতে, আশায় নিরাশায়, মঙ্গল-অমঙ্গলে, সৌন্দর্যে রসে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে মুহূর্তের জন্ত উদয় হয়।...তাদের গন্ধ শব্দ রূপ...মনের মধ্যেই আছে।” (পৃ—১১)।

এই অত্যাশঙ্কিত মূলে আছে লেখক মনের বিচিত্র উপলব্ধি। অতীতের মধ্যেও আছে জীবনের প্রবল গতিবেগ। তাকে অল্পধাবন করতে পারলে জীবন হয় গতিশীল। প্রাণ ধারণের দৈন্যতা অবসান হয়। “স্মৃতির রেখায়” অতীত ও বর্তমানের আলোছায়ায় মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তাকে।

“পথিক বিশ্ব এই অনন্তের মধ্য দিয়েও ঠিক আছে; তার বুকে যুগে যুগে কত বিনষ্ট অবোধ

জীবনের ব্যাখ্যা, কত অতীতের কত বেদনা ভরা বুক তার, যুগ-যুগের বিরহ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্রোহ, সৃষ্টির কত ফুল, কত রহস্য নিয়ে চলে আসছে।” (পৃ—২৪)

গল্প ও উপন্যাসের বহু স্থানে লেখকের এই বিশেষ মানস স্বভাবের পরিচয় নিহিত। “পুঁইমাচা” গল্প তার দৃষ্টান্ত। পুঁই গাছের একটা শ্রুতি ক্ষেত্রিকে সহস্র বিশ্বাসের মধ্যে আবার জীবন্ত করে তোলে। শিল্পমূল্যের বিচারে এই অতীত প্রবণতা লেখক মনের একটি বিশেষ দিক চিহ্ন। “সেই লোভী মেয়েটির লোভের শ্রুতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পৌতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে.....বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি.....সুস্পষ্ট, নধর, প্রবর্তমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।” (পুঁইমাচা)

বস্তুতঃ, বিষয় ও ভাষাতে দিনলিপিগুলি নিঃসংগ মনের বার্তা বহন করে। নির্জন ঘটনা বিরল আকাশে এই নিঃসংগতা স্বদূরের জন্ত ব্যাকুলতা জাগায়। নিঃসংগ মনের উপলব্ধি নিয়ে দিনলিপি বিচিত্র গল্পকাব্যে পরিণত। (পরে তার বিশদ বর্ণনা আছে)। প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা শুধু কল্পনাসমৃদ্ধ নয়, ধ্বনিময়, বিবর্তিমূলক এবং গভীর জীবনতত্ত্বমূলক। কিন্তু এগুলির ভেতর রবীন্দ্রনাথের মত কবিসত্তার ঠিকানা জানার কোন ব্যাকুলতা বা আগ্রহ নেই। আত্মসন্ধানের পরিবর্তে বিভূতিভূষণ আপন মনের ভালো লাগাকে নিজের কাছে কেবলই ব্যক্ত করেছেন। তখন তারা সংবাদ নয় শুধু লেখকের জীবনাদর্শনও বটে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে দিনলিপিগুলি নিঃসন্দেহে আত্মপরিচয়মূলক গ্রন্থ। জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা, শ্রুতি, অল্পভূতি ও উপলব্ধিগুলো লেখক অনাড়ম্বরভাবে বলে গেছেন। ব্যক্তিগত কথায় সমৃদ্ধ তারা। তাঁর লেখার ভেতর চিত্রমুগ্ধতা আছে, স্বদূর লোকের ব্যাকুলতাও আছে তেমনি। ধ্যানের ধনগুলি একটি একটি করে যা তিনি সংগ্রহ করেছেন, ভাষার পৃষ্ঠায় উজ্জল হীরকখণ্ডের মত তাকে অক্ষয় করে রেখেছেন। দিনলিপির পাতায় বিচিত্রের প্রতি লেখকের লুক্কাতার শেষ নেই। অসীম চাইছে সীমার সংগ। “সমস্ত আকাশ ভরা আলোর মহিমা। তুণের শিশির মাঝে খোঁজে নিজ সীমা।”

এইসব আবার বিভূতিভূষণের জীবনচিন্তার একান্ত অঙ্গগামী হয়ে তাঁর সাহিত্যচিন্তা সৃষ্টি করেছে। অসংখ্য ছোট-বড় ভাবনা-চিন্তা জুড়ে একটা সম্পূর্ণ সাহিত্যিক মানসও খুঁজে পাওয়া দুর্লভ হয় না। কেননা, জীবনচিন্তার ভেতর রয়েছে সাহিত্য চিন্তার প্রতিফলন।

“আটকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশী।” (তৃণাজুর—পৃ ৬)

বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্য সাধনার মূলে রয়েছে এই ভাবনা। হৃদয়ের দাবি মানতে গিয়ে অনেক সময় তুচ্ছ হয়েছে শিল্পমূল্য। ছোট গল্পগুলি তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। উপন্যাসেও দুর্লভ্য নয় তা।

সাহিত্য শুধু জগতটাকে কে কি দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। (শ্রুতিররেখা—পৃ ৪১)

‘পথের পাচালী,’ ‘ইছামতী’ সেই অভিজ্ঞতার ফসল। “বর্ণিত নায়ক নায়িকার পিছনে

শিল্পী তার আবালা দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন।” এ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের নিজস্ব বিশ্বাস হল :

“সাহিত্য সৃষ্টি মেকী জিনিস নয়, তার পিছনে যখন সত্যিকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অল্পভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা না থাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না।” (তৃণাকুর—পৃ ৫৭)

অপুর ব্যক্তিসত্তা তাই শিল্পীর জীবনদর্শনের সূত্রে গঠিত। অপু ও লেখক একক সত্তার পরিণত। তৃণাকুরে বিভূতিভূষণ তা স্বীকার করেছেন।

“অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেছি।...সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো।” (পৃ ৬ -)

‘ইচ্ছামতী’র ভবানীচরণ বিভূতিভূষণের এই বিশ্বাসের পূর্ণমূর্তি। তাঁর মানস বিগ্রহ। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে বিভূতিভূষণ রহস্যজগতের যে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছেছিলেন তার বিচিত্র উপলব্ধি ‘ইচ্ছামতী’ উপন্যাসে। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি হল :

“এখন আমি জীবনে দর্শকমাত্র নই, জ্ঞানক অভিনেতাও বটে।” (উৎকর্ণ—পৃ: ২৪৯)

তার সংসার জীবনের বহু ঘটনা ডায়েরীর পাতায় যেমন সমৃদ্ধ ‘ইচ্ছামতীতে’ তেমনি অবিকৃতভাবে স্থান পেছে। ‘ইচ্ছামতী’ স্রষ্টার পরিণত ও প্রগাঢ় চিন্তার ফসল।

নিসর্গের অমৃতধারা থেকে বিভূতিভূষণ যে অল্পভূতিটি লাভ করলেন তা হল জীবন আত্মার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এর আশ্বাদ শুধু এর অল্পভূতিতে। সেই অল্পভূতি যত গাঢ় গভীর হয়, জীবন ততই সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠে।

“গাছপালা প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে যে জীবন তাই হয় স্বথের, পরিপূর্ণ আনন্দের।” তৃণাকুর—পৃ: ৪৬

প্রকৃতি নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অল্পভূতি খোলে। আর তখন শিল্পী চান বিরাটত্বকে। নইলে হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, পূর্ণতার মনুস্বরের উদ্বোধন হয় না। সেই কারণে লেখকের শপথ :

‘মানুষের মনে এই জ্ঞানটা পৌঁছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত।’ (তৃণাকুর—পৃ: ৫৪)

অপু, ভবানীচরণ লেখকের সেই প্রতিচ্ছায়া। তাদের মনের ব্যাপকতা সৃষ্টি করার জন্য দুঃখ-সমৃদ্ধ মনন করে অমৃতের স্বাদ দিয়েছেন জীবনে। দিনলিপি বহুস্থলে সেই জীবনানুভবের পরিচয় লিপিবদ্ধ।

“যে জীবনে অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, ... শিশুপুত্র দুখ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা কর্তে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি (ঐ—পৃ: ৭)।

‘ইচ্ছামতী’ উপন্যাসে এই অভিব্যক্তি আরো ব্যাপ্তি লাভ করেছে। “দুঃখকে বাদ দিয়ে জগতে সুখ নেই, প্রকৃত সুখের অবস্থা গভীর দুঃখের পরে...দুঃখের পর যে সুখ—তার নির্মল ধারায় আত্মার স্নানযাত্রা নিম্পন্ন হয়, জীবনের আনন্দ বিলিয়ে দেয়।” সেই আনন্দ মায়ের বিলাস-বিভূতি

অপু এবং ভবানীচরণ। তারা নিজেদের শিশুপুত্রদের উত্তর জীবনকে দুঃখের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে নিতে চান। বিভূতিভূষণের অল্পখ্যাত মানবত্ব অর্জনের এই আদর্শ অশ্রান্ত উপলক্ষের চরিত্রে পরিস্ফুট। যেমন “আরণ্যকে”র গহনচারী তেওয়ারী, রাজু পাড়ে, মটুকনাথ পণ্ডিত, কুস্তা—এরা সকলেই একান্ত নিঃস্ব। এদের দুঃখবেদনাও নিঃশব্দ। কিন্তু এদের গৌরব যে এরা কেউই দুঃখের দ্বারা অভিভূত নয়। দুঃখোত্তীর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ সুখী ব্যক্তি। সর্বপ্রকার হীনতা ও ক্ষুদ্রতা মুক্ত। বস্তুতঃ বিভূতিভূষণের জীবনবোধে দুঃখ বলে স্বতন্ত্র মনোব্যাপার নেই। প্রত্যক্ষ চেতনায় একটি বিশেষ বর্ণপ্রলেপ দুঃখের মূর্তি ধরে দেখা দেয়।

বিভূতিভূষণের এই মানসিকতার মূলে রয়েছে একধরনের উদার উদাস নির্লিপ্ত প্রসন্নতা। গাঁয়ের শাস্ত্র স্নিগ্ধ ইছামতী নদীটি লেখকের মানসগঠনের সহোদরত্ব দাবী করতে পারে। ইছামতীর ঘোলা জলে অবগাহন করে লেখক মনের সুখ, হৃদয়ের আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আর সেই পরিতৃপ্তির স্ত্রেই গড়ে ওঠেছে মানসজীবন। “স্মৃতির রেখা” থেকে আরম্ভ করে সব দিনলিপিতেই লেখকের এই উপলব্ধি।

“শাস্ত্র, ছোট, স্নিগ্ধ, ইছামতীর দু-পাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটু বন, গাছপালা, গাঙ-শালিকের বাসা, সবুজ ভূগাছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল।...কত পাখী, কত বন ঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসিকান্নার মেলা। এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী ॥” (১লা মার্চ-১৯২২—পৃষ্ঠা ৯১)

ইছামতীর স্রোতের মতই জীবন প্রবাহ অনন্তকালের। জীবন এখানে ইছামতী থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নয়। দূরকালের ভাব ব্যাকুলতা এক অথও বৃহত্তর উপলব্ধি নিয়ে আসে।

“একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্নে, বাবলা বনের ছায়ায় ইছামতীর তীরের বনঝোপের বিহঙ্গ তানের মধ্যে, নীরব শান্তির কোলে এ জীবন দেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূর ক্লীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্তলোক অনন্তকালের পথিক যাত্রী সে—তার বাওয়া আসা ফুরাবে হঠাৎ? (স্মৃতির রেখা—পৃ ৫৭)

ইছামতীর তীরের লেখক যে প্রকৃতিও মানব সংসার দেখলেন—“ইছামতী” উপলক্ষ তারই আলেখ্য। বিভূতিভূষণের মানসধর্ম বিশ্লেষণ করলে মর্তমমতা ও অমর্ত ব্যাকুলতার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ‘ইছামতী’ উপলক্ষে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। “স্মৃতির রেখা”র এই গ্রন্থ পরিকল্পনার একটা আভাস ছিল। রাম জন্মের আগে যেমন রামায়ণ রচনা হয়েছিল তেমনি ইছামতী উপলক্ষ রচনার আগে তার খসড়া শেষ হয়েছিল (১লা মার্চ ১৯২২)। অনুরূপভাবে আরণ্যক রচনার প্রচুর উপকরণ আছে “স্মৃতির রেখা”র। বলা বাহুল্য, লেখকের এই পরিকল্পনা পথের পাঁচালী রচনাকালীন।

কার্যতঃ লেখক কিভাবে তাঁর ধ্যানের রত্নগুলি খুঁজে পেয়েছেন কেমন করে তাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছেন তার বিবিধ পরিচয় আছে দিনলিপিতে। বস্তুতঃ এগুলি দিনলিপির বিষয়ও। স্মরণ্য কেউ যদি বলে বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে ভাবী রচনার উপকরণ সংগ্রহের ইংগিত নেই

তাহলে মিথ্যা কথা বলা হবে।

দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিসত্তার যে রূপটি পাঠকের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে তা হলো তাঁর প্রকৃতির সৌন্দর্য সন্তোষের আনন্দ। বিভূতিভূষণের কাছে Every landscape is as it were, a state of the soul : দিনলিপির চিত্রপটের দিকে তাকালেই এ কথার প্রমাণ মিলবে।

পল্লীর শ্রামশ্রী দেখে মুগ্ধ-তিনি। বিস্তৃত প্রকৃতির সৌন্দর্য ও তার রঙের বাহার দেখে। দিনলিপি জুড়ে অসংখ্য অপরিপাতি ছবি॥ বর্ণে, রঙে, স্বাদে বিচিত্র তারা। প্রত্যেকটি ফ্রেমে আলাদা আলাদা করে বাঁধানো যায়। যেমন স্নিগ্ধ সকাল, ঘন নীল আকাশ, শুষ্ক দুপুর, অপরাহ্নের বিষণ্ণতা, সিঁহুরের মেঘ, পাখীর কাকুলী, শান্ত ধূসর সন্ধ্যা, ছায়াছন্ন বেগুনশীর্ষ, জ্যোৎস্নাভরা রূপময়ী রাত্রি, সৌদাগি ফুল, শিমূল ফুল, কদম গাছ, নদীর জল, নিবিড় অরণ্যানী, অপরূপ মেঘতুপ, বোড়ো, মেঘ, বিকেলের অন্তগামী সূর্য, দুপুরের ঘূষুর ডাক—এ সবই বিভূতিভূষণের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এরা লেখকের অবকাশ মুহূর্তগুলি ভরিয়ে রাখে। লেখকের নিঃসঙ্গ মনোজীবনের একমাত্র সঙ্গী তারা। তাই লেখকের নিজস্ব প্রকৃতি ও মানস গঠন অনুযায়ী তিনি ভালবাসেন স্নান অপরাহ্ন, ক্লান্ত সন্ধ্যার শান্ত শ্রী, জ্যোৎস্নার উদার উদাস রূপ, ইছামতীর দিগন্তলীন বিস্তার—যার তীরে তীরে মাহুঘের কোলাহল, পাখীর কলরব, গাছ-গাছালির শুক্লতা। আর ভালোবাসেন নিশ্চল দুপুর, বিশুদ্ধ সকাল। অরণ্যোপাধ্য যে, শেলীর কাছে নীল সমুদ্র, কালিদাসের কাছে পর্বত যেমন প্রিয় ছিল, বিভূতিভূষণের কাছে তেমনি ছিল গহন অরণ্যের আকর্ষণ। পূর্বেই বলেছি, বিভূতিভূষণের মানসলোকের রহস্যকাঠি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বহুধাব্যাপ্ত। প্রকৃতির সৌন্দর্য বস্তুর স্পর্শেই তাঁর জীবন ধর্মের প্রকাশ।

“দিনরাত এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও যেন আমার আশ মেটে না।”
(উন্মিষমুখর—পৃ ২০)

বিকালের ক্লান্ত বিষণ্ণ রূপ বিভূতিভূষণের কাছে সবচেয়ে ভাবনায় হয়ে উঠেছে। দিনলিপিতে বিকেলের কথা তাই বার বার লিখেছেন। বিকেলটা শিল্পীর হাতে আঁকা এক অপূর্ব অপার্থিব ছবি। ছবি দেখার কাজে লেখক এই সময়টা ব্যস্ত থাকেন।

“মন পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সৌন্দর্যের ভারে চারিধারে চেয়ে এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে, মাহুঘের স্থখ দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে।” (স্মৃতির রেখা)

সত্যিই বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বিকেলবেলা। বিকেলে আছে প্রাচুর্য, আছে অনন্ত বৈচিত্র্য। স্বরভি মাখানো নানা ধরনের পাখী-ডাকা এই মিষ্টি বিকেলগুলো হৃদয়ের রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। সীমাতীত আহ্বান হয় মধুর। কিন্তু বিরটিত্বের অভাব আছে তাতে। কেবল দূর বিসর্পী দিগন্ত, দূরত্বের অনুভূতি একটা অদ্ভুত আনন্দ দেয়। তথাপি বিষণ্ণ সন্ধ্যার আচ্ছন্ন মন কখনও কখনও মৃত্যু ভাবনায় অধীর হয়। কিন্তু স্থায়ী হয় না তা মনে। জমাট বাঁধার আগে আকাশের বর্ণচ্ছটা এক অসীম তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ করে চিত্তলোক। মৃত্যু তখন বিষাদের নয়, বজ্রগায় নয়, আনন্দের আকাশের রঙে পাখীর, কাকুলীতে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। অসীমের প্রতি লেখকের অন্তরের টান তখন আর অব্যক্ত থাকে না।

সন্ধ্যার স্নান আলোয় অরূপের ইসারা ক্রমে গভীর ও নিবিড় হয়ে ওঠে মনের ভেতর। নক্ষত্রখচিত আকাশের অসীম বিশ্ব, চারপাশের নীরব নিম্ভর প্রতিবেশ মনটাকে উন্মাদ করে তোলে। তখন লোকান্তরের সাথে কবি-আত্মার সঙ্গম হয়। কেমন একটা বিষণ্ণভাব সন্ধ্যার সাথে জড়িয়ে আছে। ব্যাপ্তির সাথে মিশে আছে বিষাদের স্বাদ। মনে হয় সৌন্দর্য সম্পর্কে বিপুল জিজ্ঞাসার ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়ার অভূত থেকে এই বিষণ্ণতার জন্ম। তাই সন্ধ্যা বারে বারে বৃহত্তর উপলব্ধি নিয়ে আসে।

“মৃত্যু বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকত তবে জীবনটা একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো— হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন স্ননিপুণ শিল্পশ্রুটি এমন স্নন্দর ব্যবস্থা করেছেন।” (ভৃগুস্মরণ—পৃ ১৮)

দিনাবসানের ক্লান্ত স্নান ছায়া অনতিস্পষ্ট দৃষ্টির মত গভীর সন্ধ্যার মূর্তি। অতীন্দ্রিয় আনন্দবোধ পূর্ণ। বন্ধনমুক্তির প্রবল পিপাসায় আর্ত কবি-মন, লোকান্তর ব্যাপী কল্পনাকে আশ্রয় করে সৌরজগতের এক অনাদি অনাবিস্কৃত রহস্যের অনুসন্ধান ব্যাকুল হয়। বৃহৎ পৃথিবী হতে তখন বিচ্ছিন্ন মনে হয় তাঁকে। লোকান্তর জগতের প্রতি টান হয় প্রবল। মনের মুক্তপক্ষ বিস্তার করে এক অনন্তলোক পরিভ্রমণ করার আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করতে থাকেন।

“...মনে হোল আমি যেন এই জগতের কেউ নই—আমি যেন বহুদূর কোন্ নাক্ষত্রিক শৃঙ্গ পয়ের অজানা জগত থেকে কয়েক দণ্ডের কোতুহলী অতিথির মত পৃথিবীর বৃকে এসেছি...।

...মনে হোল এইমাত্র যেন ইচ্ছামত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূর ব্যোমের গভীর বৃকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নির্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট মিট করে জলছে—ওর চারিপাশে হয়তো আমাদের মত কোন্ এক জগতে অপরাধের বিবর্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাবো কোন্ স্নদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতর জগতের শ্রামলকুঞ্জ বীথিতে! (ভৃগুস্মরণ—পৃ ১৯।

অসীমের প্রতি ধাবমান কবি-মন সৌন্দর্য-স্বধা পানে মত্ত।

আবার জ্যোৎস্নার নির্জন রাত্রি মনকে প্রসারিত করে অনন্ত অসীমের সীমায়। সেজন্ত চেষ্টা করতে হয় না। আপনাআপনি দৃষ্টি প্রসৃত হয়।

“ভগবানের সৌন্দর্য যে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করচি—যেদিকে চাই সেইদিকেই বিরাটত্বের আসন পাতা, সেই মহাশিল্পীর কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে।” (অরণ্য মর্মর—পৃ ৩৬)*

সন্ধ্যার মত গৃঢ় সত্যের রহস্য উন্মোচনের তীব্র ব্যাকুলতা এখানে নেই। বিভূতিমানসে জ্যোৎস্নাকে উপভোগ করার সে ব্যগ্রতা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁকে অনন্তের অভিমুখী করে।

“অনন্ত দেবের বাঁশির তান অনন্ত যুগ মুহূর্ত ছেয়ে ভেসে আসছে—কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে। শুধু আনন্দ দেওয়াই তার লক্ষ্য।” (স্মৃতির রেখা—পৃ ৭৫)

কবি মানসের এই ব্যাকুলতার অবসান হয়নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল অক্ষয়। ইচ্ছামতীতে যে, তা অবিকৃত রয়েছে একথা পূর্বেই বলেছি। পূর্বের অহুভূতি ক্রমে গভীর হয়েছে।

ঐপনিষদিক ধারণায় তা হয়েছে উজ্জল, শাস্ত্রত।

আবার ছপূরের পরিপূর্ণ সূর্যালোকে নীল আকাশ, নিম্নগ্রহ, চারিদিকে সৃষ্টি করে নিঃসীম শূন্যতা। মনের এই শূন্যতা দিয়ে বিভূতিভূষণের রোমান্টিক কবি মন প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-স্পর্শ-গন্ধ স্বাদ গ্রহণ করে। উদার উদাস মুক্ত প্রকৃতির জনহীন প্রান্তর, নির্জন বনভূমি, রূপবিম্ব রসিকের নন্দিত চিত্তের আনন্দস্পন্দনে স্পন্দিত। ছপূরের মধ্যে কোন বিরাত্ত হয়তো নেই, কিন্তু Poetry of life বেশি আছে। ছপূরের সাথে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির ভাবনার একটা সাদৃশ্য আছে। তবে ছপূরের চেয়ে জ্যোৎস্না বেশি অনন্তপ্রসারী। দিকচক্রবালী কল্পনায় সমৃদ্ধ। অপরপক্ষে পরিপূর্ণ সূর্যালোকে ছপূর যেমন উজ্জল জ্যোৎস্নাও তেমনি মিষ্টি আলোর উদ্ভাসিত। মুক্তরূপা প্রকৃতি ছপূরে যেমন রৌদ্রছায়ায় লীলাময়ী, জ্যোৎস্নারাজি তেমনি রূপসী। বিভূতিভূষণ ছপূরে দেখেছেন বিষাদের ছবি আর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে শুনেছেন নক্ষত্র জগতের আহ্বান। আর উভয়ের পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে একই স্বরের কানাকানি।

প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের ঘরকন্নার সম্পর্ক বলে এমন নিবিড় করে অনুভব করতে পারেন। কান পেতে শুনতে পান প্রকৃতির শ্বাসপ্রশ্বাস তার বক্ষস্পন্দন। প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শিল্পী-হৃদয়ের যে আনন্দ সৃষ্টি হয় তা ক্রমশঃ ভগবান উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়। নিসর্গশ্রীতির অগ্রতম পরিণাম অধ্যাত্মভাবনায়। বিভূতিভূষণের উপলব্ধি এইভাবে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা সঞ্চার হয়েছিল।

“ব্রহ্মশক্তি রয়েছে বিশ্বের সবতাত্ত্ব্যে।” (অরণ্য মর্ম—৪২)

অসীমের সাথে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা বিজ্ঞান চেতনা সৃষ্টি করে। এই পর্যায়ে লেখক বিজ্ঞানের তত্ত্বরূপটি ধ্যান করেছেন। কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলাফল বিচার করেন নি।

দর্বাঙ্গই দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির ব্যাপ্তি এবং বিশালতার অনুভবের মধ্যে আছে একটা অদ্ভুত গতির প্রকাশ। চিন্তাগুলি তাই থেমে থাকে না। তারা কেবলই পল্লবিত হয়ে অসীমকে লাভ করতে চায়। এ বিষয় লেখকের ধারণা হল :

“আমি না ভেবে পারিনে যে এই উন্মুক্ত উদার গতিশীল

যাত্রাপথের পথিক যারা নয়—জীবন সম্পদে তারা দীন।”

লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এ। অপরের মতামত স্বীকার করে নেয়ার অপেক্ষায় তা থাকে না। স্তবরাং তার সার্বিক মূল্যায়ন অবাস্তব। তথাপি সাধারণভাবে অসীমত্বের বিন্যাস মনে-প্রাণে একধরণে প্রসন্নতার সৃষ্টি করে। বিভূতিভূষণের উপলব্ধির সার্থকতা সেখানে। এ জাতীয় উপলব্ধিতে লেখক মনে যে এক ধরণের অসীম তৃপ্তি এবং আনন্দ আছে তা তাঁর ভায়েরী থেকে জানতে পারি।

নিখিলের অবিরাম যাত্রাপথকে দেখেছেন লেখক। আর প্রতিবারই নিত্য নতুন করে অনুভব করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করতে পারেন না বলে একটা অভৃষ্টি রয়েছে মনে। তাই বার বার লিখে আয়ত্ত করা তাকে। তবু বিন্যাসের অবসান হয় না। একই কথা বলেছেন

বার বার। তবু বলার নিবৃত্তি নেই। পুনরাবৃত্তি করতে একধরনের অসীম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করছেন। আর প্রতিবারই নতুন করে তাকে উপভোগের আনন্দভোগ করছেন। প্রকৃতির এই ভাললাগার কোন গভীর গূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে পারছেন না বলে একজাতীয় অতৃপ্তিতে মনটা বিষণ্ণ। জার্মান দার্শনিক শেলিং'র (Schelling ভাষায় interpenetrative affinity between man and nature—মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বন্ধন আবিষ্কার করা রোমাটিকতার লক্ষণ। এই হিসাবে বিভূতিভূষণ রোমাটিক ধর্মী। Return to nature বা প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন বিভূতিভূষণের রোমাটিক শিল্পধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস।

সেই যাই হোক, বিভূতিভূষণের রোমাটিক কবি মন শেলীর মত নীলাকাশের অনন্ত মাধুরিমা পানে মত্ত। পৃথিবীর উর্দ্ধলোকে পক্ষ বিস্তার করলে সীমাতীতের অভিমুখে বিরামহীন যাত্রা তার। শেলীর মতই ক্লাস্তিহীন। মর্ত পৃথিবীর বাঁধা থেকে বিচ্ছিন্ন।

“মনে হোল যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা এই মুহূর্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘ ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো।” (তৃণাঙ্কুর—পৃ ৭৪)

কবিকল্পনায় অবিরাম যাত্রা বিশ্বের বিরাট কালস্রোতে প্রবাহমান। “চরৈবেতি, চরৈবেতি—হেথা নয় অত্র কোথা, আর কোনখানে।”—এই ঔপনিষদিক চিন্তাধারা বিভূতিভূষণের মানস আধার। দুঃখের পথ বেয়ে লেখক সে আনন্দধামে পৌছতে চান। আনন্দেন থলু ইমানি সর্কানি ভুতানি জীবন্তি...” অরণ্যের সাহচর্যে এই উপলব্ধি গাঢ় হয়েছে।

“অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েছে এই অরণ্য শান্তির মধ্যে, বেদ অরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েছে এখানে....। অরণ্য মর্মর—পৃ ৪১)

উত্তর জীবনে এই আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, এই কৌতূহল, এই স্বপ্ন, এই জীবনকে Realise করার মতো ক্ষুধা এইটাই ছিল আঁকবার। অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারা তা ছিল প্রভাবিত। জীবনের মধ্যে ভগবান উপলব্ধির এবং সেই ঐক্য উপলব্ধি করা জীবনের সার্থকতা। ‘ইছামতী’তে সেই অভিলাষ প্রবণ হয়েছে। ভবানীচরণ তা স্বীকার করে ও প্রচার করে।

বিভূতিভূষণের মানসভূষণ তার পথিক আত্মা। আত্মসচেতন লেখকের স্বরূপ বিবৃত হল :

আমি জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা। দূর থেকে কোন কোন হৃদয়ে নিত্য নতুন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী আমার পায়ে চলার পথ....।” (তৃণাঙ্কুর—পৃ ৩৩)

বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তা তাই যথার্থই চিরপথিক। পথে চলার অপরিসীম আনন্দে ভরপুর। আর সে অভিজ্ঞতার সংবাদও আছে যত্রতত্র। দেখার বিচিত্রচারিতা, ভৌগোলিক বিশেষত্ব। স্থান-মাহাত্ম্য মানুষ সবই আছে। পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনীতে সচরাচর যা থাকে দিনলিপিতে আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। স্বাদে গন্ধে কোন পার্থক্য নেই। আর উপহার হিসেবে পেয়েছি লেখক মানস। “পথের পাঁচালী”র অপূ লেখকের সেই মানস-সম্পদের উত্তরাধিকারী।

বাংলা দেশের প্রতি লেখকের প্রীতি তুলনাহীন। কবি কল্পনায় সকল দেশের সেরা। বহুদেশ পরিভ্রমণ করে লেখক তুলনামূলকভাবে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, বাংলা দেশ সব

দেশের সেরা।

“রাজ্যমাটি, পাহাড়, শালবন এই আসল ভারতবর্ষের রূপ।” (তৃণাকুর—পৃ ৮৩)

অপর পক্ষে, “বাংলাদেশের...প্রকৃতির...সৌন্দর্য অতুধরণের।...বাংলার সৌন্দর্য more tropical...এখানে বৈচিত্র্য বেশি।...এত সবুজের সমারোহ আর কোথাও দেখিনি—a feast of green...বাংলা দেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লীবধুর মত লাবণ্যময়ী। লাজুক টিপপরা ছোট্ট মুখটি।” (তৃণাকুর—পৃ ৮৭)

এই বিচারে দিনলিপি একদিকে যেমন ভ্রমণ কাহিনী অতুদিকে তেমনি লেখকের মনের দর্পণ হয়ে উঠেছে। মানব মনের বৈরাগ্য, তাঁর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, অসীমের প্রতি আকৃতি, অনন্তকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতা দিনলিপির অন্তর বচন হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিত্বের অনন্তবিকাশ এবং শাস্ত্রত সত্য ও স্বন্দরের উপলব্ধির সাধনায় বিভূতিভূষণের আত্মোৎসর্গ। ধ্যানদৃষ্টির গভীরে একটা আশ্চর্য সঙ্গতির স্বয়ম্ভা অল্পভব করা যায়। প্রেমাস্পদের ব্যক্তিসত্তায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে প্রেমিক যেমন আপনাকে খুঁজে পায় তেমনি বিভূতিভূষণও আপনাকে অধেষণ করেছেন নিসর্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরে। অভিজ্ঞতার মূলে আছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিশ্বাস। বিভূতিভূষণের অল্পভূতিও তেমনি একটা নিজস্ব ব্যাপার। তাই বলে অপরের কাছে মূল্যও তার অকিঞ্চিৎ নয়। কারণ, Love may be defined as any activity which find its end and value in the maintenance and increase of value in another mind.” (Parker—Human values, p. 77).

দিনলিপির ভূমিকায় বিভূতিভূষণের আত্মআবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। বিভূতিভূষণের সারা-জীবনের ভাবনার ইতিহাস গ্রন্থের রয়েছে। দিনলিপি থেকে আগ্রহী পাঠক ও সমালোচক যা জানতে চায়, গ্রহণ করতে চায়, লেখক তা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একেবারে শিল্পী জীবনের জন্মলগ্নে।

“জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম সেইটাই সকলে জানতে চায়।” (স্মৃতির রেখা—পৃ ৪১)

* “অরণ্য মর্মর”—অরণ্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ছিল যে সব রচনায় সেইগুলি সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

হাওড়া জেলার প্রাচীন গ্রন্থ ও ভাষা

রামপ্রসাদ মজুমদার

প্রায় ১০০০ বছর পূর্ব হতে রাঢ় বা দক্ষিণরাঢ়ে ভূরিশ্রেষ্ঠী, পাঠভেদে ভূরিস্থষ্টি ইত্যাদি নামে একটি অঞ্চল ছিল এবং তার খ্যাতির তেজ্ঞে আজও ভূরিস্থট নামে বেঁচে আছে। হাওড়ার জগৎবল্লভ পুর থানায় একাধিক গ্রামের নামের সংগে ঐ নাম যুক্ত, আমতা থানায় ঐ নামে গ্রাম আছে, হুগলী জেলাতেও ঐ নাম বেঁচে। বহু প্রাচীন লেখক বা কবির সংগে ঐ নামটি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। হাওড়ার অল্প অঞ্চল বা গ্রামেও বহু প্রাচীন গ্রন্থকার ছিলেন, বহু অপ্রকাশিত পুঁথিও রয়েছে প্রাচীন মন্দিরাদিতেও লেখা আছে। এই সবের কথা সাধ্যমত বলছি।

বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদকৃত ভাষ্যের ত্রায়কন্দলী টীকার লেখক শ্রীধরাচার্য টীকার শেষে আত্মপরিচয় দেবার সময়ে বলেছেন যে তাঁর পিতা দক্ষিণরাঢ়ে ভূরিশ্রেষ্ঠী নামকস্থানে বাস করতেন ; তিনি টীকা সমাপ্তিকাল শকাব্দায় দিয়েছেন—তখন ১০ম শতাব্দী বৌদ্ধাদি নাস্তিক মতাদি ঐ অঞ্চলে বা অদূরে ব্যাপ্ত—এজ্ঞা দুঃখও করেছেন। এক সংস্কৃতজ্ঞের মতে ঐ অঞ্চল নাকি হাওড়ার কানা নদীর অদূরে (অর্থাৎ উক্ত জগৎবল্লভপুরে)। শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামী কারও কারও অনুমানে পূর্বোক্ত শ্রীধর—অবশ্য স্পষ্ট-প্রমাণ দেখি না। তাঁর বহু পরে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে ভরত-মল্লিক জাতিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষতঃ বৈষ্ণবুল বিষয়ে চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা নামে সংস্কৃত ভাষায় ও ছন্দে ২টি গ্রন্থ লিখেছেন, অগ্ন্যত্র টীকাগ্রন্থাদিও ঐ (১) ভরত মল্লিকের লেখা। যতদূর মনে পড়ে চন্দ্রপ্রভায় তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠীর নাম করেছেন। বহু-সম্পাদিত বিশ্বকোষে তাঁর জীবনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি ঐ রাজ্যের রাজার সভার এক বিশিষ্ট লেখক। ফলে ইনিও হয়ত হাওড়ায় বা নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। উক্ত দুই মনীষী সংস্কৃতে লিখেছেন।

৩০০ বছরের পূর্বেরও মন্দির হাওড়ায় একাধিক। তন্মধ্যে গড়ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দির (থানা উদয়নারায়ণপুর ১৬০৬ শকাব্দ ; (১) বা আমড়া মেলাইচণ্ডীর মন্দির (আমড়া থানা ১০৫৬ সালে নির্মিত ; বা সংস্কৃত ?) প্রাচীনতম মনে হচ্ছে। অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই সংস্কৃত বা মিশ্র-সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বহু শব্দের বানানের মা-বাবা যেন নাই, বহু স্থলে বিভক্তিও নাই, হয়ত অপভ্রংশ ভাষা বা অল্পজ্ঞের জ্ঞানের ফলে ঐরূপ ঘটেছে। মণিনাথ মন্দিরেও ঐ ভাষা। আমতা মন্দিরের লেখার মর্ম প্রকাশিত কিন্তু ভাষার নাম দেওয়া হয়নি ও এখন লিপিটা চুণ-বালিতে বদ্ধপ্রায়। স্থলতানপুরের শিবমন্দিরের (গ্রামপুর থানা শকাব্দ ১৫৮৮ ও সন ১০৭২, বোধ হয় স্থাপনাকাল, পরবর্তী প্রাচীন সংস্কারকাল ১২২৭ সাল) বিভিন্ন প্রাচীন লেখগুলি মিলিয়ে ছোট-বড় ছত্র নিয়ে ২০ ছত্র লেখা আছে, বোধহয় হাওড়ায় বৃহত্তম মন্দিরলেখ, ভাষা উক্ত ধরণের সংস্কৃত। মণিনাথে শ্রীভগবত : বা (রা ?)য়' ও 'দেবনারায়ণ' এই দুটি নাম দেখা যায়। প্রকাশ বা প্রবাদ অনুসারে ভূরিস্থটের বহু রাজার নামে 'নারায়ণ' অংশ ও রাজ বা জমিদারবংশে রায় উপাধি ছিল। উক্ত আমতা মন্দিরে কর্মকার নাম বা উপাধি আছে, ৩য় মন্দিরে প্রাচীনতম অংশে বা পার্শ্বে বহু

নাম, দাস ও দাস—দাস, দাসদত্ত ও ‘—দাসি’ উপাধি ও ১ম সংস্কারের লিপিতে সরকার উপাধি আছে। অতীত বহু ঐরূপ লেখেই স্থাপনিতার নাম আছে।

এইসব হতে ও পরবর্তী সংস্কৃত পুঁথির তালিকা হতে বলা যায় যে হাওড়ার বিবিধ অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হত এবং ঐ ভাষা ব্যবহারে গৌরব বা মাহাত্ম্য সূচিত হত।

এবারে তিন বিখ্যাত বাংলা কবির কথা বলি—

১। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ দাস বা রায়। পুঁথিলেখক আমতা থানার রসপুর বা ফলবাঁশ নিবাসী ও ঐর পুঁথির এক লিপির কাল ২৩।১২।১১৩৩ বঙ্গাব্দ। কবির জন্ম ১৬১৮ খ্রঃপূঃ পূর্বে মনে করা হয়, জন্মস্থানও উক্ত রসপুর-কলিকাতা এবং তাঁর বিখ্যাত কাব্য শিবায়ন,—শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত। কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৬৩ সনে প্রকাশ করেছেন। এর পরিমিষ্ট পৃঃ ৩২৩-৩৩১ হতে সংগ্রহ করে ও সাজিয়ে কতকগুলি প্রয়োগের বিশেষত্ব দেখছি; (প্রসঙ্গতঃ বলি যে রামেশ্বরের শিবায়ণ ও প্রসিদ্ধ)।

(ক) বর্ণানুক্রমে : অমিতা (অমৃত; থাকা অর্থে অছ বা আছ্, ধাতু : আছিলাত, আছিলু; আপুনি (বহবার, মধ্যম পুং); আলুয়াইতে; আন্ড্যাঙ; ‘উ ত (=উচ্চ)’; ওকড়া; কর্যাছিল; কানাঞি; কীর; খাঁড়; য়তকুল্যা; চউড়ি; চউরি; জন্মাল্য; বারা; ক্রিঁহা; টঙ্গি; তিমিঙ্গল; তেঞি, তেঁই, তেঁঞি; তেজ্ঞি; দেহলি; ধমিল্ল (৩ বার); নিরিথলি; পউটি; পহুমা; পাণ্ডুরা (—কুমড়া—পাড়); থিজলি, ভজ্জ, সহাদেই; রস্ম; রাণ্ডি; লংহন; লাই; লেঞ্চে; লেধু; শিঙনী; ওঠম; সন্নাহ (বহবার); সভ (বহবার); ‘সভা (সকল)’ (বহবার); হাথ (বহবার); হনিলে (=হোম করিলে)।

(খ) ৮৮ পৃঃ, ভূঙ্গরাজ তিল গিলা গন্ধমাতৃ মনঃশিলা
মহানারায়ণ তৈল আনি অভ্যর্দিত কৈল।

(গ) ৮৩ পৃঃ পয়ার (?) ও ধূয়ায়—ভাঙ্গি জঙ্গি রঙ্গিয়া শিব নাচিয়া নাচিয়া বুলে।

রচনায় বহু বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে। ‘কর্যা’র যেন অভিশ্রুতি ও ‘জন্মাল’তে যেন অপিনিহিতিতে আসার ব্যাপার; সংস্কৃতে তেন স্থলে বহুবিধ রূপ; জীলিঙ্গে-নীবোগে শিঙনী; পূরণবাচক বর্থে পুনঃ ঐ প্রত্যয় ‘-ম’ যোগ; ‘পহুমা’ শব্দ প্রাকৃত পউমার অরূপ।

এছাড়া কবিরাজী মতের উপাদান ও ঔষধের নাম দেখা যায় ‘রঙ্গিয়া’ শব্দ বিশেষণ বা সমকারক বা ক্রিয়াক্রমে ব্যবহৃত। ক্রিয়া না হলে মূলশব্দ ‘রঙ্গী’ হতে পারে, তাহলে বিবিধ মঙ্গলকাব্যে বণিকদের ভ্রমণপথ বর্ণনায় ‘মৌল্য রঙ্গিনী’র বা রঙ্গিনীদেবীর অর্থ সহজেই শিবানী হতে পারে; চতুরঙ্গের সঙ্গে যোগ না থাকলে চৌ-রঙ্গী শব্দের সঙ্গে ও-এর যোগ থাকতে পারে। এক প্রাচীন তায়দাদ মতে কবির পৌত্র মুকুন্দপ্রসাদের পুত্র বাসুদেব ভূরশীটের রাজা নরনারায়ণ হতে ভূমিলাভ করেন।

২। হরিদেব শর্মা (-১১২৮—৩৬—বঙ্গাব্দ)। ইনি শাখরেল থানায়ও মৌড়ীগ্রাম ও গঙ্গানদীর অদূরে ঝোড়হাটে জন্মান। ঐর লেখা রামমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল ‘হরিদেবের রচনাবলী’ নামে ‘সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থখণ্ড’তে বিখ্যাত্তরতী দ্বারা ১৩৬৭ সনে প্রকাশিত। ইনি রামকৃষ্ণের

পরবর্তী হলেও এঁর গ্রন্থে বানান প্রভৃতির অভুত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

৩। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (খৃঃ ১৭১২—) ইনি ভুরগুটে ও রাজার বংশে জন্মেছেন বলেছেন। এঁর পিতা নরেন্দ্র নরেন্দ্রপুরে, মতাস্তরে বসন্তপুরে বাস করতেন। এই দুটি গ্রামই জগৎ-বল্লভপুর থানায় ও মুন্সিরহাট ষ্টেশন হতে কিছু পশ্চিমে। এদিকের পেঁড়ো গ্রাম, মতাস্তরে এর কিয়দূরে উদয়নারায়ণপুর থানার গড়ভবানীপুরে, মতাস্তরে হুগলীর পাণ্ডুয়ায় ইনি জন্মেন বা ছিলেন। ফলে হাওড়াবাসী হিসাবে কবিকে স্থূলতঃ গণ্য করা যায়। এঁর অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বিশিষ্ট কাব্য। এঁর চন্দোবৈচিত্র্য পূর্বকালের হিসাবে অতুলনীয় বললে বোধহয় দোষের নয়। সংস্কৃত-বাংলা প্রভৃতি মিশ্র ভাষাতেও এঁর বহু রচনা। হান্তরস, বিভাস্তর প্রভৃতিতে প্রচুর আদরস ইনি ফুটিয়েছেন, অনুপ্রাস ও সমকেও তাঁর কাব্য ভরা। এঁর লেখায় আর্বা-ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য। এঁর লেখা হতে ‘খাড়ি-যুড়ি’ (কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যে) পরগণা প্রভৃতি ও ‘মজুমদার’, ‘হোড়’ প্রভৃতি উপাধির নামও পাওয়া যায়।

এবারে দেখা যাচ্ছে যে বিশিষ্ট চারজন লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ভূরিশিষ্ট অঞ্চল বা পরগণার অল্পবিস্তর যোগ রয়েছে; তিনজন বাঙালী কবিই মঙ্গল-কাব্যাদিতে আসক্ত হয়েছেন। নিম্নে উক্ত বা অন্তর্গত পুঁথিতেও ভুরশিটের নাম আছে।

১০টি বা ফরিদপুর সহ ১১টি জেলার ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় হয়েছে, প্রকাশের বিবরণ ঐ পত্রিকায় ৩৪ সংখ্যায় ২৬০ পৃঃতে আছে; হাওড়ার কথা নেই বলে মনে হচ্ছে।

এবারে বটতলায় প্রকাশিত বহু পুঁথির তালিকা দিচ্ছি, উক্ত পত্রিকায় সংখ্যা ২৩। সম্ভবতঃ ১৩২৩ সালে ১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। যারা হাওড়ায় জন্মেছেন বা হুগলীবাসী বললেও গ্রামনামগুলি হাওড়ায় দেখা যায় সেগুলিকে আপাততঃ হাওড়ায় বলে ধরেছি, হাওড়া জেলা আন্দাজ ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল বহু বিষয়ে হুগলীর অধীন ছিল। হা=হাওড়া, হু=হুগলী, ম=মহম্মদ। গ্রামনাম না থাকলে পরোক্ষ প্রমাণে হাওড়ায় ধরছি। উক্ত তালিকায় সন তারিখের হয়ত কিছু ভুল আছে। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যও দিচ্ছি।

১। নেজাম পাগলা—মুন্সী ম, ১১৭৩; ২। পুরনামা—মুন্সী ম খাতের, ১২৭৮, বান্ধব পুর, হা; ৩। একশত ত্রিশ ফরঙ্গ—ম খাতের, ১২৪৬, বান্ধবপুর; ৪—৫। শাহনামা মুন্সী ম খাতের, ১২৮২, তথা বামিনী ভান—ঐ ১২৯৮, গোবিন্দপুর হা; ৬। বেনজীর বদ্রে মুণির—করিমদ্দিন, ১২৭৯, হা; ৭। মেফতাহল লেন্নাত—ম খাতের, ১২৮০, হা; ৮। জৈগুণ—সৈয়দ হামজা, ভুরগুট, হু; ৯। গোলে হরমুজ—ম খাতের ১২৮৯, হা; ১০। তুতিনামা—মুন্সী ম খাতের ১২৮২, হা; ১১। হদমজার খণ্ডরবাড়ী; ম মুন্সী (জঃ ১নং), ১৩১৭ হা; ১২। উম্মর উম্মিয়ার নকল—ম মুন্সী ১৩৮০; ১৩। তবলিগ—উল—ইসলাম বা তোহফা—উল—মোমেলিন—ম দাউদ, ১৩১৫, রামচন্দ্রপুর, হু (ঐ নামে গ্রাম হাওড়ায় আছে); ১৪। সুরত জামাল—ম খরকলা ও জোনাব আলি, ১৩১৬, হা; ১৫-১৮র নাম-কাল ১৫-১৭। জঙ্গে জামাল—মৌলবী শেখ আজহার, ১৩০১; জঙ্গে রসুল, ১৩২০, জঙ্গে হজরত আলি—এ দুটির লেখক মৌলবী আজহার

আলি, খলশানি, হা; ১৮। লজ্জাবতীর পুঁথি আজহার আলী, ১৩২০, হাতহেড়ে, হা।

এবারে অপ্রকাশিত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এদের প্রায় সবই সংস্কৃত-বাংলায়। সংস্কৃতই যেন বেশী।

১। শিবপুর-হাওড়া ময়দান। বিভিন্ন টোল প্রভৃতি বহু ও হাওড়া পণ্ডিত সমাজের তত্ত্বাবধানে ময়দানে এক গ্রন্থাগারে সহস্রাধিক পুঁথি আছে, সবই বোধ হয় সংস্কৃতে।

২। নারিট (আমতা থানায়) ৩মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত ও পরে তাঁর আত্মীয়দের রক্ষায় ৬০৭০টি ছোটবড় পুঁথি ছিল। কিছু নাকি ইতিমধ্যে নষ্ট ও অপহৃত হয়েছে, কয়েকটি ১৫০১২৫০ বৎসর পূর্বের ছিল। বাংলার মধ্যে কৃতিবাসী রামায়ণ, কবি কঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি, সংস্কৃতে মহাভারত, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রন্থ ছিল। অদূরের এক ভট্টাচার্য গৃহে ৬০টি পুঁথি (দর্শনাদি বিষয়ে) ছিল, ধ্বংস হয়েছে।

৩। রেঙাড়া (নাকোল পো: অ: এলাকা ও নাউলের পাশে) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষায় অন্তত: ৩০৪ সের ওজনের বহু পুঁথি আংশিক দেখেছি। মঙ্গলকাব্যাদি বিষয়ে কয়েকটি, একটি ক্ষুদ্র ও ছিন্ন বৈষ্ণবকটাকা; দ্বিজ নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল (যাতে কালীজোড়া, যক্ষীপাড়া ও রাজা রাজনারায়ণের প্রসঙ্গ আছে) ও ধর্মদাস বৈষ্ণবের রায়মঙ্গল আছে। ১৫০ বৎসর পূর্বের কয়েকটি।

৪। আনন্দ নিকেতন মিউজিয়ম নবাসন (বাগনান ষ্টেশন হতে ২১৩ মাইল দূরে) শ্রীভারাপদ সান্তরার প্রচেষ্টায় বহু পুঁথি সংগৃহীত, কতকগুলি হাওড়া জেলা হতে।

৫। নরেন্দ্রপুর (পূর্বোক্ত) এখানে শ্রীমদন বটব্যালদের গৃহে সংস্কৃত মহাভারত ও সংক্ষিপ্তসারের কয়দংশ রচিত আছে।

৬। স্থলতানপুর (পূর্বোক্ত) স্থলত: ১৫০ বৎসর পূর্বের ২টি পুঁথি বর্তমান লেখকের নিকটে আছে।

৭। মনসাডাঙ্গা (বাঁকড়া ষ্টেশনের পাশে), কোন মুসলমানগৃহে মহাভারতের পুঁথি আছে, এতে কিছু বিশেষত্বও আছে।

৮। শালকিয়া—এস্থানবাসী উকিল শ্রীআশাপ্রসন্ন দাসের নিকটে এক বা একাধিক (বিষয় নাকি কাকচরিত্রাদি) পুঁথি আছে।

৯। সামতাবেড়ে—দেউলটি ষ্টেশন হতে কয়দূরে, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের লিখিত পত্রাদির কিছু পাণ্ডুলিপি আছে; ঐ গ্রামে আরও বহু পুঁথি আছে শুনেছি।

মাজু ষ্টেশনের নিকটে ঘোষালবাটি গ্রামের টোলে ও হয়ত অল্পত্রুণ বহু পুরাতন পুঁথি আছে। এই সব পুঁথি হতেও বহুস্থান; নাম ও আঞ্চলিক ভাষার ধরণ কিছুটা জানা যায়।

হাওড়ার বার-ব্রত, ছেলেদের ছড়া প্রভৃতির সঙ্গে পার্শ্ব জেলার প্রচলনের বেশ সাদৃশ্য দেখেছি। ধ্যানাদির রক্ষা বা মাপে, গৃহাদিনির্মাণ বিষয়ে কিছু নূতন শব্দ শোনা যায় যেগুলি হয়ত পার্শ্ব প্রচলিত নয়। যেমন ধানের 'ফাড়ি' (গাদা বা লুপ)। প্রাচীরের 'মুসোটি মারা' (উপরের দেয়ালের পাটি শেষ করা), ইত্যাদি। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'মুঁই' (আমি), 'নারব' (পারব না), হায় (= হ্যা, হয়?), ইত্যাদিতে বোধ হয় অপভ্রংশানি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

কি লিখিব? (কমলাকান্তের পত্র ১ম সংখ্যা) ॥

এই পত্রটিতে কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’র তৎকালীন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় কিছু লেখার কথা বলেছেন। পত্রটির মধ্যে কিছু কাহিনীর সন্ধান আছে। কমলাকান্তের এতদিনের পৃষ্ঠপোষক নসীবাবু মারা যাওয়ায় আক্ষিপের বড় অভাব পড়েছে। একদিন কমলাকান্ত একজোড়া জুতামোড়া ‘বঙ্গদর্শন’ নামক কাগজে কমলাকান্তের লেখা পড়ে বুঝতে পারল যে ভীষ্মদেব খোশনবাস জুয়াচুরি করে তার লেখা বিক্রী করে পরসী আদায় করেছে। তা’করক। বর্তমানে কমলাকান্ত কিছু আক্ষিপ পেলেই ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদককে কিছু লেখা পাঠাতে পারে। সেই লেখা যে কোন বিষয়ে সন্মত করলেই হবে। পলিটিক্স, কাব্য, নাটক, উপন্যাস—সব বিষয়ে লিখতেই কমলাকান্ত দক্ষ। এই প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন রচনার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গও করেছেন। পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ অথচ ভুল তথ্য পরিবেশনকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। সেখানে তিনি নাটকের কথা বলেছেন, সেখানে মাইকেলের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের ছাঁচে ফেলে ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু এ মধুসূদনের কবিপ্রতিভার প্রতি কটাক্ষ বলে গণ্য করা যাবে না। বরং মধুসূদনের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ছিল অপরিণীত। কমলাকান্ত এখানে ‘মেঘনাদবধ’-এর ভুল্য একখানি কাব্য ‘জীমূতনাদবধ’-ও লিখতে পারে বলে মন্তব্য করেছে।

রচনাটি লঘুরসের হলেও, সাহিত্যের কিছু কিছু ক্রটিবিচ্যুতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

কুরুক্ষেত্র (কৃষ্ণচরিত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড) ॥

এই খণ্ডে মোট বারোটি পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল (কৃষ্ণচরিত্র ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ) ॥

এই পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কাজটি নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও পুরাণের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ প্রাচীনগ্রন্থের কালগণনাই নক্ষত্রের অবস্থিতির উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—“বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়।”

কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব (কৃষ্ণচরিত্র ৬ষ্ঠখণ্ড/৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥

যুধিষ্ঠির অর্জুনের শক্তিমানতার নিন্দা করলে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে যান। তখন কৃষ্ণ যে বিভিন্ন ধর্মোপদেশ দান করেন, তা-ই এখানে আলোকিত হয়েছে। সেই উপদেশের মূল কথা হল—“অহিংসা পরম ধর্ম”। অহিংসার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে। সবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপদেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছেন।—

“উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই

ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্মের ভ্রমরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্তিয়া, অনর্থক সাম্যব্যয় ও নিষ্ফল কালতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সংকর্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভাবিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপানি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মত্তমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমোঃ ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপবিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব। (বেহ্মারের কথা ইংলণ্ড গুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ গুনিলে না?)। তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।”

কৃষ্ণ-কর্ণসংবাদ (কৃষ্ণচরিত্র ৫ম খণ্ড/৮ম পরিঃ) ॥

কৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে যোগদানের জ্ঞাত্ব বলেছেন। তার কারণ কৃষ্ণ চান যে অবশ্যম্ভাবী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ হোক। কিন্তু কর্ণ নিজেকে কুন্তীপুত্র জেনেও দুর্যোধনের আশ্রয় ত্যাগ করতে চাইলেন না। এই ঘটনায় কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ কোন উপকরণ পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণচরিত্র (পুস্তকারের অপ্রকাশিত)

প্রথম প্রকাশ—“বঙ্গদর্শন”, চৈত্র ১২৮১, পৃ: ৫৪৭-৫৪।

‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রবন্ধটি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্তবাবু সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত “প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ”র সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। মূল গ্রন্থের আলোচনা অত্যন্ত অল্প। এই সংগ্রহের যে দু’টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিদ্যাপতির কবিতা আছে। বিদ্যাপতির কবিতার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণলীলা। মহাভারতের কৃষ্ণ একরকম ভাগবতের কৃষ্ণ আর একরকম এবং গীতিকাব্যের কৃষ্ণ সম্পূর্ণ অন্তরকম। এই পরিবর্তন সমাজগত পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের সেই পরিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘস্থান ধরে আলোচনা করেছেন।

কৃষ্ণ জরাসন্ধ সংবাদ (কৃষ্ণচরিত্র ৪র্থখণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণ জরাসন্ধকে কেন বধ করেছিলেন, সেই প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের ধর্মপ্রাণতার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেছেন।

কৃষ্ণ প্রয়াণ (পৃ: ৮: ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২শ পরিঃ)

ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর আর কৃষ্ণের ভূমিকা থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক লেখক বিভিন্ন উপদেশ গুনিয়েছেন। কৃষ্ণকথিত এই সমস্ত উপদেশের নাম “অনুগীতা”। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলিকে পরবর্তীকালের প্রাক্ষিপ্ত রচনা বলেছেন। অভিমত্যাগী উত্তরার মৃতপুত্রকে বাঁচানোর জ্ঞাত্ব বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞও বলে মনে করেছেন।

জলছবি ॥ প্রত্যুৎপন্ন যোষ। দু'টাকা।

নিঃশব্দ শব্দা ॥ প্রদীপকুমার রায়চৌধুরী। পূর্বাশা প্রকাশন, ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯।
দু'টাকা।

উপরিউক্ত গ্রন্থ দুটিই কবিতার এবং দু'জন কবিই বাংলা কাব্যের আড়িনায় নবাগত। এবং
যতদূর সম্ভব, দুটি সংকলনই কবিদ্বয়ের প্রথম ফসল।

‘জলছবি’ কাব্যগ্রন্থের কবি মূলত রোমান্টিক। বলা বাহুল্য, জীবনের এক অন্ততর পরিমণ্ডলে
বিচরণেই কবির উৎসাহ সমৃদ্ধিক। গতিমানতাই তরুণ কবি প্রত্যুৎপন্ননের কবিমানসের অন্ততম
ধর্ম; বর্তমান যুগের গতির সূত্রকে কবি অনুভব করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সর্বসমেত তেত্রিশটি
কবিতা ‘জলছবি’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রকরণে এবং চিত্রকল্প রচনায় কবি সব সময়
আধুনিক হতে না পারলেও, বিশেষত যখন নৈসর্গিক অনুভাবনার বিস্তারে নিজেকে প্রকাশ করেন
তখন পাঠককে তিনি কাছে টানেন :

...আমি অজস্র গুহার
শিল্পসম্মোহিত দর্শকের মত।
আমার দু' চোখে
বিস্তৃত বিশ্বের স্বতে
সম্মোহের প্রগত প্রদীপ জেলে
তোমার দ্রুত পরিবর্তমান মুখে
আমারই মনের মানচিত্র দেখি,
অবশেষে সোনালী স্মৃতির অ্যালবামে
সম্মেহ সময়ে সঞ্চয় করি যত জলছবি।’ (জলছবি)

‘পাহারা’, ‘অনন্ত প্রণয়’, ‘জলছবি’ ইত্যাদি কবিতাবলী কবির ঋজু অথচ নতুন অনুভূতির পরিচায়ক।
অযত্নবিশিষ্ট চিত্রকল্প ক্ষেত্রবিশেষে কয়েকটি কবিতায় বিশেষ কোনো অনুভাব প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে।

‘নিঃশব্দ শব্দা’র অধিকাংশ কবিতাই সহজ সুরে রচিত নানা ভাবনার মিলিত উচ্চারণ।
এক অন্ততর সারল্য কবিতাবলীর শরীরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জীবন সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি
মানুষেরই রয়েছে অসীম কোতূহল। তরুণ কবি প্রদীপ রায়চৌধুরীও প্রাথমিক দিনযাপনের বাস্তব
পটভূমির প্রেক্ষিতে জীবন সম্পর্কে এক অব্যবহৃত আপন ভাবনাকে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন
বর্তমান কাব্যসংকলনে। জীবনে অজস্র যজ্ঞা, বিবাদ, ক্লান্তি আছে জেনেও কবি বিশ্বাস করেন,
‘ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি খুঁজে মরে আত্মার কান্না। এক সময় অব্যবহৃত সার্থক মনে হয় কারণ

উপলব্ধি হয় যে হতাশা জীবনের শেষ কথা নয়, এখনো আলোর আভাসে জীবন উদ্ভাসিত হয়। তখন অলুভব করা যায় মুঠো মুঠো আনন্দ রয়েছে আপন মনের অন্তরালে আর সেই মুহূর্তেই মন চায় অসংখ্য মনের ঘাটে সে আনন্দ নিঃস্বার্থভাবে ছড়িয়ে দিতে।' স্বথের কথা, কবি আশাবাদী। দুঃখবেদনার মধ্যেও আলোর আভাসে যে জীবন উদ্ভাসিত হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করেন। মুঠো মুঠো আনন্দের স্বপ্নে কবি মগ্ন :

‘ছিন্ন হোক

হৃদয়ের সমস্ত বিষন্ন বাতাস,

ভরে যাক আনন্দে

আজ অনন্ত আকাশ।’ (মুঠো মুঠো আনন্দ)

‘নিঃশব্দ শব্দ’-র মোট আটত্রিশটি কবিতা গ্রথিত হয়েছে। ‘নিঃশব্দ শব্দ’, ‘লাইলাক’, ‘সোনালী চিন্তা’, ‘সুন্ধতার ভিতর থেকে’, ‘মুঠো মুঠো আনন্দ’, ‘আমার পূর্ণিমার আলো’ ইত্যাদি সাহসিক অলুভবের কারণে পাঠকের ভালো লাগবে। কয়েকটি রচনা ক্ষেত্র বিশেষে চেষ্টাকৃত মনে হতে পারে—এই চেষ্টাকৃত বিষয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য কবিকে ভবিষ্যতে মনোযোগী হতে হবে।

মল্লশঙ্কর দাশগুপ্ত

আমরা যদি একপ্রাণ হই সাফল্য অর্জন আমরা ক'রবোই

.....কেবল সুদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্যে দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক লোকের জ্ঞাত চাকরী এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জ্ঞাত বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকারখানাগুলিকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। শিল্পের প্রসার এবং অর্থনীতির অগ্রগতির পথকে যে-কোনভাবে বাধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের ক্ষতি করা, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ বন্ধ করা। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিল, সে বিপ্লব ছিল—চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব স্বজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসাকে সম্বল করে এবং আইন শৃঙ্খলাকে পায়ে মাড়িয়ে এই পরিবর্তন আনা যাবে না। শৃঙ্খলা, সদিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ পথে এই পরিবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত রাজনীতিক দলের উপরে দেশের জনগণ। অফিসে খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দর তরুণী, সুন্দর সুন্দর শিশু, প্রাণোদীপ্ত তরুণ, সদাসতর্কময় বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এঁরাই হচ্ছেন আমাদের জনগণ। আমাদের নিজেদের সার্থসিদ্ধির জ্ঞাত এই জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়। তাঁদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানের অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠবার কাজে লাগাতে হবে। পথ বিপদসংকুল ; কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বাংলার অমর ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হই তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী



আনন্দে
উদ্ভবে...

ঐতিহাসিক প্রযোজনা..

স্বয়ং মনোব্রজ...

প্রবীণতমমণীয়া
কিনাডেল

বৈষ্ণবজ্ঞান

বৈষ্ণবজ্ঞান, ১ম ও ২য় ভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৭

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

সমকালীন

হিংসায় নয়, প্রেমে

আজ কি ঘটছে ?

বাংলাদেশ আজ আত্মিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এ সংকট দেশজোড়া সংকটের একটা অংশ। মানব-আত্মার সংকট, বাস্তবিকই, বিশ্বজোড়া সংকট।

প্রশ্ন হচ্ছে : হিংসা দিয়ে কি এ কাজ করা সম্ভব ?

বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও, যদি কিছু অধৈর্য লোক, বাড়ীঘর ও অফিস আদালত বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে যদি হিংসা কেন্দ্রে পরিণত করে, এবং আমাদের যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ বিকৃত করে, তাহলে কি একটি সমাজ গঠন সম্ভব ?

মনে হয়, কিছু তরুণের মনে প্রেমের তুলনায় হিংসায় অনেক তাড়াতাড়ি আবির্ভাব ঘটে।

আমরা এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চাই, যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান স্থান থাকিবে, যেখানে কাজ ও সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ থাকবে, এবং যেখানে আমাদের সচেতন প্রেরণা স্বজনশীল ও ঘোঁষ প্রয়াসের প্রতি উদ্ভিষ্ট।

নিরাপত্তাহীনতা ও হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে এই সমস্ত মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব।

অনুকরণের ভেতর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না। আমাদের নিজস্ব স্বজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসা বা বিশৃংখলার ভেতর দিয়ে নয়, কেবল শৃঙ্খলা শুভবুদ্ধি এবং শান্তির ভেতর দিয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।

সব সময়ই আমাদের মনে রাখতে হবে যে জনগণ সমস্ত দলের উর্দে। মাঠে, কারখানায় এবং অফিসে থেটে খাওয়া মানুষ, হৃদয়ী তরুণী, দীপ্তচক্ষু শিশু, প্রাণোচ্ছল তরুণ, সদাসতর্ক বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এরাই সকলে বাংলাদেশের জনগণ।

নিজেদের স্বার্থের জগৎ লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন তাঁদের স্বার্থকে বিপদগ্রস্ত না করি।

আমার মনে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা সঞ্চিত রয়েছে। তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং তাঁদের শক্তি ও স্বজনপ্রতিভার ওপর আমার আস্থা আছে। বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করার জন্য তাঁদের এই সমস্ত করতে হবে। তাঁরা যেন ফাঁকা শ্লোগানসর্বস্ব না হন, যে সমস্ত গুণের ফলে বাংলাদেশ মহান ও আমাদের জাতীয়তাবাদের উৎসে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ধ্বংস করতে চায় তারা যেন তাঁদের বিপথে পরিচালিত করতে না পারে। তাঁরা যেন ভীতিপ্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের সম্মুখে নতিস্বীকার না করেন বরং সাহসের সংগে এগুলিকে প্রতিরোধ করেন। পথ, পদসংকুল। কিন্তু আমরা যদি একাবদ্ধ হই, এবং যদি বাংলাদেশের অমর ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হই, তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী
প্রধান মন্ত্রী

কলকাতা, ১৭ জুলাই, ১৯৭০

বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর

বেতারভাষণ থেকে : আকাশবাণী, কলকাতা।

গঙ্গাধর কবিরাজ

গৌরাজগোপাল সেনগুপ্ত

১২০৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় (১৭৯৮ খৃঃ অঃ) অবিভক্ত বঙ্গের যশোহর জেলায় অবস্থিত মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গঙ্গাধর কবিরাজ অথবা গঙ্গাধর কবিরত্ন নামেই সমধিক পরিচিত। গঙ্গাধরের পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়। ভবানীপ্রসাদ নাটোর রাজপরিবারের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। পিতার প্রবাসকালে মাতা ও মাতামহীর তত্ত্বাবধানে গঙ্গাধরের শৈশব জন্মপল্লীতেই অতিবাহিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় কুলপুরোহিত গোপীকান্ত ঠাকুরের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া ইনি প্রথমে একজন নিকট আত্মীয় নন্দকুমার সেনের নিকট মুঞ্চবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। মুঞ্চবোধ ব্যাকরণে লব্ধ প্রবেশ হইয়া তিনি যশোহর জেলার বারুইখালি গ্রাম নিবাসী রামরত্ন তর্কচূড়ামণির নিকট বিভিন্ন ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন কালেই গঙ্গাধর মুঞ্চবোধ ব্যাকরণের জীভ, কারক, সমাস ও তদ্ধিতের টীকা রচনা আরম্ভ করেন ও অচিরকালের মধ্যে এই টীকা সম্পূর্ণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই গঙ্গাধরের অসাধারণ প্রতিভা তাঁহার অধ্যাপক ও সতীর্থগণের মনে বিশ্বাসের সঞ্চার করিত। গঙ্গাধরের বিজ্ঞাবজ্ঞতা তাঁহার অধ্যাপকদের এতদূর আস্থা ছিল যে তাঁহারা গঙ্গাধরকে অগ্রাণু বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাল্যকালে গঙ্গাধর ব্যাকরণের যে টীকা রচনা করেন, তাহা গঙ্গাধরের পিতা নাটোরে :তাঁহার পরিচিত এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে দেখিতে দেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় এই টীকার রচনানৈপুণ্যে বিস্মিত হইয়া গঙ্গাধরের পিতাকে এই উপদেশ প্রাচীন টীকাটি তিনি কোথা হইতে পাইয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা করেন। গঙ্গাধরের পিতার নিকট উহা তাঁহার বালকপুত্রের রচনা এই উত্তরটি তিনি একটি পরিহাস বলিয়াই মনে

করিয়াছিলেন। সত্যই উহা একটি বালকের রচনা ইহা জানিতে পারিয়া উক্ত পণ্ডিতমহাশয় অতিশয় বিস্মিত হন এবং এই বালক যে কালে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। রামরত্ন তর্কচূড়ামণির নিকট নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নাটোরে আসিয়া আরও কিছুকাল নাটোরের মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট গঙ্গাধর ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের নানা বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গঙ্গাধর রাজশাহীজেলার বৈষ্ণব বেলঘরিয়া গ্রামের কবিরাজ রামকান্ত সেনের নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। সমগ্র বাল্যকাল সংস্কৃতশিক্ষায় অতিবাহিত করিয়া যৌবনে প্রবেশমুখে গঙ্গাধর আয়ুর্বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তীক্ষ্ণধা ও সংস্কৃতজ্ঞ গঙ্গাধর প্রায় তিন বৎসরের মধ্যেই গুরুগৃহে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। আয়ুর্বেদ অধ্যয়নকালে গুরুর আদেশে গঙ্গাধরকে গুরুর প্রতিনিধিস্বরূপে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণকেও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতে হইত। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুর নিকট হইতে 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করিয়া গঙ্গাধর নাটোরে পিতৃসম্মিধানে আসেন। পিতার ইচ্ছা ছিল যে গঙ্গাধর নাটোরেই পৈত্রিক ব্যবসায়ে ব্রতী হইবেন। গঙ্গাধর শৈশব হইতেই অতিশয় স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। গঙ্গাতীরবর্তীস্থানে বাস করিয়া জীবিকা নির্বাহের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কলিকাতার জলবায়ু ও পরিবেশ মনোমত না হওয়ায় গঙ্গাধর বাঙ্গলার এককালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসেন। মুর্শিদাবাদ বা বহরমপুরের শহরের প্রান্তে গঙ্গানদীর অবস্থিতির জন্তই তিনি এই স্থানটি জীবিকার্জন ও বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন করেন। গঙ্গাধর যখন বহরমপুর শহরের সৈদাবাদ পল্লীতে আশ্রয় লইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় এক বিংশতিবৎসর, আমরণ তিনি এই স্থানেই চিকিৎসাব্যবসায়ীরূপে অতিবাহিত করেন। বহরমপুরে আগমনের অভ্যন্তরকালের মধ্যেই, গঙ্গাধর স্মৃতিচিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। কাশিমবাজার রাজপরিবার ও মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের ইংরাজ সিভিল সার্জন পরিত্যক্ত কয়েকটি রোগীকে কঠিন রোগমুক্ত করাতে চিকিৎসকরূপে গঙ্গাধরের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হয়। গঙ্গাধর যে কত দুঃরোগ্য ব্যধিগ্রস্তকে রোগমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় দুঃকর। গঙ্গাধরের জীবদ্দশায় সমগ্র বঙ্গের জনসাধারণ তাঁহাকে আয়ুর্বেদ প্রবর্তক স্বর্গ-বৈষ্ণব ধনস্তরির অবতার বলিয়া মনে করিত। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে গঙ্গাধর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনও লোকমুখে তাঁহার চিকিৎসার নৈপুণ্যের বিষয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ কায়চিকিৎসাই করিয়া থাকেন, শল্যচিকিৎসা তাঁহারা পরিহার করেন যদিও শল্য-চিকিৎসা বিষয়ক সূত্র-সংহিতা আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের অবশ্য অধ্যীতব্য বিষয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ পারদ্বয় গঙ্গাধর প্রয়োজন বোধে শল্য-চিকিৎসার ও প্রয়োগ করিতেন। গঙ্গাধর শুধুমাত্র চিকিৎসা পারদ্বয় ছিলেন না আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করিয়া তিনি আয়ুর্বেদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদের কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন প্রাপ্তব্য গ্রন্থ “চরক-সংহিতা”। প্রাচীনতর চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ অবলম্বনে সূত্র, শারীর, নিদান, বিমান, ইন্দ্রিয়, চিকিৎসা প্রভৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত এই চরকসংহিতা মহর্ষি চরক কর্তৃক রচিত হয়। চরকের জন্মকাল প্রাচীন মতানুসারে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক। আধুনিক

পণ্ডিতেরা মনে করেন চরক খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণরাজ কনিষ্কের সময়ে বর্তমান ছিলেন। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ীগণ রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য চরক-সংহিতার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কালে কালে এই চরক-সংহিতা নানা ভ্রমাদুষ্ট হয় ও দুর্বোধ্য হইয়া যায়। চরকের একটি ভ্রম-প্রমাদ বিহীন পুঁথি কদাচিৎ সন্ধান ছিল। গঙ্গাধরের সময় পর্যন্ত হস্তলিখিত পুঁথিই আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের একমাত্র অবলম্বন ছিল।

অসাধারণ ব্যাকরণ নৈপুণ্য, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র-জ্ঞান ও মনীষার প্রভাবে গঙ্গাধর চরকসংহিতার বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন ও ইহার দুর্বোধ্যতা দূর করিবার মানসে জল্পকল্পতরু নামে যষ্টি সহস্রেরও অধিক সংস্কৃত শ্লোকযুক্ত একটি অত্যন্তম টীকা রচনা করেন। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশীয় বৈজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত ১১শ শতাব্দীতে চরকের যে টীকা রচনা করেন, জল্প-কল্পতরু টীকায় গঙ্গাধর তাহার অসম্পূর্ণতা ও দোষসমূহ আলোচনান্তে সংশোধন করেন। জল্পকল্পতরু টীকা যুক্ত চরক-সংহিতা সম্পাদনায় গঙ্গাধর জীবনের প্রায় বিংশবৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয়গণের মধ্যে ১১শ শতাব্দীতে চক্রপাণি দত্ত ও ষোড়শ শতাব্দীতে শিবদাস সেন ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই চরক সংহিতার টীকা রচনা করিতে সাহসী হন নাই। খৃষ্ট জন্মের প্রথম সহস্র বৎসরের মধ্যেও চরকের টীকা রচয়িতার সংখ্যা অতি নগণ্য। গঙ্গাধরকৃত জল্পকল্পতরু টীকা সহ চরক-সংহিতা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। গঙ্গাধরের জীবদ্দশায় ইহা দুইবার পুনর্মুদ্রিত হয় (১৮৭৮, ১৮৮৩)। ১৯০৮-১০ খৃষ্টাব্দে ইহার আর একটি সংস্করণ গঙ্গাধরের স্মরণীয় শিষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বঙ্গদেশের দান প্রসঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞ-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন “অল্পদিন পূর্বে ও সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গঙ্গাধর চরকের জল্পকল্পতরু টীকায় নিজের অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় দিয়াছেন” (আয়ুর্বেদ পরিচয়, পৃঃ-২৪ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালা, কলিকাতা, ১৩৫১)। আয়ুর্বেদ বিষয়ে গঙ্গাধর বহু পুস্তক রচনা করেন, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়— :

আয়ুর্বেদ পরিভাষা (১৮৬৯, বহরমপুর), ভাস্করোদয়ঃ রোগ বিজ্ঞানম্ (কলিকাতা, ১৯০৯, নাতী-বিজ্ঞানম্ (কলিকাতা, ১৮৯১), পথ্যাপথ্যম্ (বহরমপুর, ১৮৬৯)। (গঙ্গাধর কৃত পথ্যাপথ্যম্ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ তৎপুত্র ধরদীপর রায় কর্তৃক বহরমপুর হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়)।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত গঙ্গাধর আয়ুর্বেদ বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায়। গঙ্গাধরের বহু রচনা অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চিরতরে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাধরের বহরমপুরস্থ বাসভবনে তাঁহার পুঁথি সংগ্রহযোগ্য উত্তরাধিকারী অভাবে বিনষ্ট হইতেছে এবং আর কিছুকাল পরে একেবারেই লুপ্ত হইবে এই উদ্বেগ জনক সংবাদ পাইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ কয় বৎসর পূর্বে গঙ্গাধরের বিধবা পৌত্রবধূর নিকট হইতে গঙ্গাধরের অবশিষ্ট পুঁথিগুলি সংগ্রহ করেন। এইভাবে ৩৭৪ খানি পুঁথি সমন্বিত গঙ্গাধর-সংগ্রহ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লাইব্রেরীর পুঁথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এই পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে প্রায় ১০০ খানি স্বয়ং গঙ্গাধর রচিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, ইহার কিছু কিছু অংশ মুদ্রিত হইয়াছে,

বাকী অংশ অমুদ্রিত। কোন কোন পুস্তকের একাধিক 'কপি'ও আছে। পুঁথিগুলির মধ্যে কোন কোনটির সবগুলি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। গঙ্গাধরের অমূল্য পুস্তক সংগ্রহ চির-বিনষ্টির কবল হইতে উদ্ধার করার জন্য জনসাধারণ বিশেষতঃ যাহারা বিজ্ঞানসাহী তাঁহাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ পুঁথিশালার কর্মীদের প্রাপ্য। গঙ্গাধর রচিত পুঁথি সংগ্রহ তাঁহাদের দ্বারা এ যাবৎ যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে। গঙ্গাধর রচিত আয়ুর্বেদ বিষয়ক যে সকল অমুদ্রিত পুঁথি সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে তাহাদের নাম পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ভৈষজ্য রামায়ণ (সম্পূর্ণ)—৫৩ পৃঃ (২) আগ্নেয়ায়ুর্বেদ সংহিতা (স্বকৃত টীকা সহ)—১২৩ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৩) মধুকোষাখ্য নিদান টীকা ২০৮ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৪) আয়ুর্বেদ সংগ্রহ :—৮৪ পৃঃ খণ্ডিত (৫) অগ্নি প্রোক্তঃ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ—১০৮ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৬) বৈজ্ঞক—পরিভাষা—১৪ পৃঃ সম্পূর্ণ (৭) পঞ্চ-নিদান ব্যাখ্যানম্—২৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৮) পঞ্চ-নিদানম্, স্বকৃত টীকা সহ খণ্ডিত, ৭১ পৃঃ, (৯) গর্ভিণী চিকিৎসা-সম্পূর্ণ (১০) শারীরস্থান নিবন্ধসংগ্রহ, ৮ পৃঃ সম্পূর্ণ (১১) নিদান-গ্রন্থ ব্যাখ্যা—৩১পৃঃ, খণ্ডিত। গঙ্গাধর রচিত রাজবল্লভীয় দ্রব্য-গুণ বিবৃতি, মৃত্যুঞ্জয়-সংহিতা, আরোগ্যভোজ্যম্ ও প্রয়োগটন্দোদয়ম্ প্রভৃতি বৈজ্ঞক গ্রন্থের পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গঙ্গাধর ছাত্রাবস্থাতেই মুঞ্চবোধ ব্যাকরণের মহাবৃত্তি নামীয় একটি টীকা রচনা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই টীকা তাঁহার জীবদ্দশায় মুদ্রিত হয় নাই। সংস্কৃত কলেজ পুঁথিশালায় ইহার দুইখানি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত হইয়াছে এই পুঁথি দুটিতে যথাক্রমে ১২২ পৃঃ ও ৭৬ পৃঃ আছে। সম্পূর্ণ পুস্তকটিকে দশসহস্র শ্লোক ছিল বলিয়া জানা যায়। ব্যাকরণে গঙ্গাধরের যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাহা তাঁহার রচিত সংস্কৃতকলেজ পুঁথিশালায় রক্ষিত নিম্নলিখিতরচনাগুলি হইতে প্রমাণিত হয় :—

(১) ত্রিকাণ্ড শব্দশাসন ব্যাকরণ বৃত্তি ৩৯৮ পৃঃ (সম্পূর্ণ), (২) ত্রিপাঠ ব্যাকরণম্-৪৩১ পৃঃ সম্পূর্ণ (৩) ছন্দোবদ্ধ মুঞ্চবোধ ব্যাকরণ—১৩১ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৪) সিদ্ধরূপং কৌমার ব্যাকরণ—২৬৯পৃঃ, সম্পূর্ণ (৫) ত্রিকাণ্ড ব্যাকরণম্, শ্লোকাঙ্ক বৃত্তিসহ, ৪১০ পৃঃ, সম্পূর্ণ। (৬) পাণিনীয় শব্দানুশাসন—৮ পৃঃ, খণ্ডিত (৭) ক্যাত্যায়ণ বৃত্তি—১ পৃঃ খণ্ডিত (৮) ধাতুপাঠ—২৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৯) ধাতু-প্রকরণঃ—৫ পৃঃ খণ্ডিত (১০) কলাপাখ্য পণ্ডকাব্য—১১ পৃঃ, সম্পূর্ণ (১১) ত্রিকাণ্ড শব্দশাসন ব্যাকরণ বৃত্তি—৩৯৮ পৃঃ, সম্পূর্ণ (১২) অর্থপদ ব্যাকরণম্—৪১ পৃঃ, সম্পূর্ণ (১৩) ধাতুগণ বৃত্তি—১৪২ পৃঃ খণ্ডিত, (১৪) পাণিনি ব্যাকরণম্ বৃত্তি ২৫৩ পৃঃ, সম্পূর্ণ। গঙ্গাধর রচিত ব্যাকরণ বিষয়ক বাদার্থ, শব্দশক্তি প্রভা প্রভৃতি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৈয়াকরণ গঙ্গাধরের ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে গভীর অন্বেষণ ও দক্ষতা ছিল। সংস্কৃত কলেজ পুঁথিশালায় তাঁহার রচিত ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ক এই পুঁথিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) ছন্দোহরুশাসন—৪১ পৃঃ, সম্পূর্ণ। (২) ছন্দসার—৪২ পৃঃ, সম্পূর্ণ।

(৩) আগ্নেয়ালঙ্কারধ্যায়স্ত কাব্যপ্রভা টীকা, ১২৯ পৃঃ, সম্পূর্ণ।

(৪) ছন্দোহরুশাসনে সমমাত্রীয়োধ্যায়—১৮ পৃঃ, সম্পূর্ণ।

(৫) পিঙ্গলোত্তরীত্যা ছন্দোহুশাসন—১৮ পৃঃ, সম্পূর্ণ

(৬) আগ্নেয়ালঙ্কার কোষ বিবেকঃ ত্রয়োদশোধ্যায়—১৬ পৃঃ, সম্পূর্ণ।

(৭) ছন্দোমঞ্জরী—২০ পৃঃ, সম্পূর্ণ। গঙ্গাধর রচিত বিলাসিনী—ছন্দসার ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ১৮৮১ খৃঃ বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

উপনিষদ, গীতা ও ষড়্‌দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গঙ্গাধরের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এই সব শাস্ত্র অবলম্বনে—তাঁহার নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, এই মুদ্রিত পুস্তকগুলিও বর্তমানে দুর্লভ, (১) মহর্ষি কণাদকৃত বৈশেষিকশাসন (বৈশেষিক দর্শন ব্যাখ্যা) মূল স্বকৃত টিকা, বহরমপুর, ১৮৭০ (২) তৈত্তিরীয় উপনিষৎটিকা—বহরমপুর, ১৮৮৪, (৩) কৈবল্যোপনিষদ্ ব্যাখ্যান, বহরমপুর, ১৮৭২ (৪) জ্যাকুস্মাঞ্জলি টিকা ১৮৭৮, (৫) বাজসনেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যান, বহরমপুর, ১৮৭৮ [২ হইতে ৫ সংখ্যক পুস্তক সম্ভবতঃ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগার ভিন্ন কুত্রাপি রক্ষিত নাই। ১ সংখ্যক পুস্তক কলিকাতার জাতীয় পাঠাগারে প্রাপ্তব্য। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে ভরদ্বাজ বৃত্তিভাণ্ড্যসহ গঙ্গাধরকৃত বৈশেষিক দর্শনম্ নামে একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে, উহা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়] কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালার উপরিউক্ত মুদ্রিত পুস্তকের কোন কোনটির পাণ্ডুলিপি ব্যতীত হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গঙ্গাধর রচিত এই পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে—

(১) বিষ্ণু-সংহিতা টীকা (যোগসার সমুচ্চয়, যোগী বাজবল্য সংবাদ)—২৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ
(২) উপনিষদ্যাখ্যা—পৃঃ ২০০০, সম্পূর্ণ (৩) বেদান্ত সর্বস্ব—৬৫ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৪) মিশ্রিত বেদান্ত বাক্যোপনিষদ্ ৫৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৫) কুর্মুদ্রাণোক্ত ঈশ্বরগীতা, ৭৭ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৬) কেনোপনিষদ্ ব্যাখ্যা—৫ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৭) কৈবল্যোপনিষদ্যাখ্যা—১২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৮) মুণ্ডকোপনিষদ্যাখ্যা—৩০ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৯) ঐতরেয় উপনিষদ্যাখ্যা—১২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (১০) মাণ্ডুকোপনিষদ্যাখ্যা—১৫ পৃঃ, সম্পূর্ণ (১১) কঠোপনিষদ্যাখ্যা—৭৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ, (১২) কুস্মাঞ্জলি শোধনী টীকা—৫২ পৃঃ, সম্পূর্ণ, (১৩) কণাদসূত্রভাষ্য—৬ পৃঃ, সম্পূর্ণ (১৪) পাতঞ্জল যোগ দর্শন (স্বকৃত টীকাসহ)—১০৩ পৃঃ, সম্পূর্ণ, (১৫) বস্তু নির্ণয় (ভ্রাম)—৪ পৃঃ, খণ্ডিত, (১৬) রামগীতা—৬ পৃঃ, খণ্ডিত (১৭) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা খণ্ডিত টীকা—৩১পৃঃ (১৮) অহুগীতা—২৪ পৃঃ, খণ্ডিত (১৯) রামগীতাভাষ্য—৪২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২০) ঘট-সিদ্ধান্ত—৩০০ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২১) দেবীভাগবত ব্যাখ্যা—৮ পৃঃ, খণ্ডিত। (২২) নান্তিকান্তিকবাক্যোবাক্য—১৫ পৃঃ, খণ্ডিত (২৩) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্য—১২ পৃঃ সম্পূর্ণ (২৪) ব্রহ্মোপনিষদ্যাখ্যা—১২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২৫) শ্বেতাশ্বতোপনিষদ্যাখ্যা—১২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২৬) প্রশ্নোপনিষদ্যাখ্যা—১২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২৭) বৃহদারণ্যকউপনিষদ্যাখ্যা, ৩০ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২৮) তবলকারোপনিষদ্যাখ্যা—৩০ পৃঃ সম্পূর্ণ (২৯) কাঠকোপনিষদ্যাখ্যা—৩০ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৩০) দুর্গাপূজালোচনা—১২২ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৩১) গায়ত্রীব্যাখ্যানম্—২৩ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৩২) বেদান্ত রহস্য—২০০ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৩৩) শ্রীগৌরচন্দ্রস্বভাবতত্ত্ব বিচারম্—১৩ পৃঃ, খণ্ডিত (৩৪) শারীরিক সূত্র বৃত্তি—২৭ পৃঃ, খণ্ডিত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিভাগগর সংগ্রহে গঙ্গাধর কবিরাজ কৃত শিবমহিম স্তোত্র ব্যাখ্যা নামে মুদ্রিত একটি পুস্তক আছে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী ক্যাটালগে (Vol-2, Part II, 1938)-গঙ্গাধর রচিত হরমহিমস্তব ব্যাখ্যা নামে একটি পুস্তকের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ

এই দুইখানি পুস্তকই মূলতঃ একটি পুস্তক। গঙ্গাধর কৃত হরমহিমস্তব ব্যাখ্যা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই কিছুকালপূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী বৈজ্ঞ সন্তানগণ আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত কতকটা বাধ্যকতামূলকরূপেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন কারণ সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত না থাকিলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চরক, অশ্বত প্রভৃতি পুস্তক অধ্যয়ন করা তৎকালে বঙ্গানুবাদে অভাবে সম্ভব হইত না। বৈজ্ঞ সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ব্যক্তি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন সূত্রেই ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করিতেন। যাহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা অলঙ্কার, সাহিত্য দর্শন, প্রভৃতি বিষয়েও দক্ষতা অর্জন করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালীর দানে যে বিপুল শাস্ত্র-ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে, ইহাতে বৈদ্য-জাতীয় পণ্ডিতদের দান অতি নগণ্য যদিও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে তাঁহাদের কৃতিত্বের নিদর্শনের অভাব নাই। বৈদ্যজাতীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় গঙ্গাধরের দান এই কারণেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিশাস্ত্র গঙ্গাধর বাল্যকালে গুরুর নিকট উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায়রত থাকিয়াও গঙ্গাধর প্রমাদভঞ্জিনী নামে সমগ্র মনুসংহিতার একটি উত্তম টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা সহ মনুসংহিতা ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। (ইং—১৮৮১)। মনুজ দায়ভাগের প্রচলিত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া গঙ্গাধর দোষসন্দর্শনী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, উহা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধরপুত্র ধরণীধর রায় কর্তৃক মনুজ দায়ভাগের গোড়ীভাণ্ড নামে বহরমপুর হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার বৈজ্ঞ সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা যে ব্রাহ্মণদের তুল্য হওয়া উচিত এই বিষয়েও গঙ্গাধর কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন বলিয়া প্রকাশ, ইহার মধ্যে “বৈদ্যতত্ত্ব বিনিশ্চয়” নামে একটি বাঙ্গলা পুস্তিকার উল্লেখ ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী ক্যাটালগে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে গঙ্গাধর বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার মধ্যে নিম্ন লিখিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে—

(১) দায়ভাগ প্রবচন—৬১ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২) পরাশর সংহিতা টিকা—৬৭ পৃঃ, খণ্ডিত (৩) বজ্রবেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি পৃঃ—৫, সম্পূর্ণ। স্মৃতি বিষয়ে গঙ্গাধর লিখিত বৈদ্য হিংসাদি নির্ণয়, গোড়িল গৃহস্থ ভাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যটিকা; স্মৃতি সেতু, ধর্মশাসন প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পুস্তকগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায়না।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রজ্ঞ লোকোত্তর প্রতিভাধারী গঙ্গাধর বিশেষ কবিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। মৌলিক কাব্য রচনাতে ও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। সংস্কৃত কলেজ পুঁথিশালার তাঁহার নিম্নলিখিত সৃষ্টিধর্মী রচনাগুলি রক্ষিত আছে—

(১) সৌরায়ম্ব মহাকাব্য—১১৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ (২) হান্তার্ণব (প্রহসন)—১২ পৃঃ, খণ্ডিত (৩) রাজবিজয় কাব্য—১৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৪) খণ্ড কাব্যানি—২৩ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৫) আনন্দ তরঙ্গিনী স্তব—সম্পূর্ণ (৬) স্তোত্র পুঞ্জাঞ্জলি—৭ পৃঃ সম্পূর্ণ (৭) স্তোত্রানি—৪ পৃঃ, সম্পূর্ণ (৮) লোকালোক পুরুষায় মহাকাব্যম্—১০৫ পৃঃ, খণ্ডিত (৯) শিখণ্ডি প্রাচীনাবনামাখ্যায়িকা—১১ পৃঃ সম্পূর্ণ (১০) রামায়ণ মহানটিকম্—১৭ পৃঃ, খণ্ডিত। গঙ্গাধর চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাকৃষ্ণ বর্ণনম্, দুর্গবধম্, হর্ষোদয়ঃ, গোবর্দ্ধন

বর্ণনাম্ নামে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ কাব্য রচনা করেন। এইগুলি মুদ্রিত হয় নাই, ইহাদের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় নাই। গঙ্গাধর রচিত অমরুশতক ও গীতগোবিন্দের টিকাও সম্পূর্ণাবস্থায় সংস্কৃত কলেজ পুঁথি-শালায় রক্ষিত আছে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী ক্যাটালগে গঙ্গাধরের রচিত মণিকর্ণিকাষ্টক নামেও একটি কাব্য পুস্তকের উল্লেখ আছে (Vol-2, Part II, 1938)।

তন্ত্র ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থও গঙ্গাধর কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু এইগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ ও বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্য সম্বন্ধে গঙ্গাধর রচিত দুইটি বাঙ্গলা পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় কিন্তু এই পুস্তিকাগুলি দুর্লভ। প্রাচীনতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিপক্ষদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বহুবিবাহ রহিত করার স্বপক্ষে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। গঙ্গাধরের পুস্তিকার প্রতিবাদে বিশেষভাবে তাঁহার বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ২য় পুস্তক (কবিরত্ন-প্রকরণ) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবাদ হইতে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে গঙ্গাধর তাঁহার বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্য পুস্তিকায় একথা বলেন নাই যে বহুবিবাহ অনিষ্টজনক সামাজিক কুপ্রথা নহে। গঙ্গাধরের বক্তব্য ইহাই ছিল যে বহু বিবাহ প্রথা নিঃসন্দেহে কুপ্রথা, তবে ইহা অশাস্ত্রীয় নহে। জনসমাজে শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক প্রতিরোধ দ্বারা এই কুপ্রথার অবসান বাঞ্ছনীয়, ইহার জ্ঞান শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘনের ভীতি প্রদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে। বহুবিবাহ প্রথা অশাস্ত্রীয় ঘোষণা করার সমীচীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী কবিরাজ গঙ্গাধরের যখন পত্নী বিয়োগ হয়, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তানের বয়স মাত্র আঠার মাস। এই সময়ে গঙ্গাধরের যৌবন অতিক্রান্ত হয় নাই, অনায়াসেই তিনি অল্প পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন। সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় গঙ্গাধর প্রথমা পত্নী দিগম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। গঙ্গাধর অতিশয় স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। ভাগবতপুরাণ স্বয়ং বেদব্যাস প্রণীত প্রামাণ্য গ্রন্থ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া গঙ্গাধর ভাগবত নির্ণয় নামে দুইটি বাঙ্গলা পুস্তিকা (২য় ও ২য় ভাগ) রচনা ও প্রকাশ করেন (কলিকাতা, ১২৬৪, ১২৬৫) বহু। বৈষ্ণব পণ্ডিত চিত্রাচরিত ধারণার বিরুদ্ধগামী গঙ্গাধরের সিদ্ধান্তে তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠেন ও তাঁহাকে বৈষ্ণব-দেবীরূপে চিত্রিত করেন। রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যমহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে গঙ্গাধরের রচনাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে গঙ্গাধর বিষ্ণু-দেবী ছিলেন না। প্রচলিত ভ্রম নিরসনের জন্তই তিনি ভাগবত নির্ণয় গ্রন্থরচনা করেন। নিজের গ্রন্থাদি মুদ্রণজন্য গঙ্গাধর বহরমপুরে প্রমাদভঞ্জন নামে একটি মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপন করেন। শেষ জীবনে এই প্রেস হইতে তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থমুদ্রিত হইয়াছিল। গঙ্গাধর ৪১ খানি মৌলিক গ্রন্থ ও ৩৪টি সংস্কৃত গ্রন্থের টিকা রচনা করেন।

গঙ্গাধর চিকিৎসা ব্যবসারে প্রচুর ধনোপার্জন করিতেন। এই ধন শুধু বৃহৎ আত্মীয়গোষ্ঠী পোষণেই ব্যয়িত হইত না। তাঁহার গৃহে বহু ছাত্র অবস্থান করিত, ইহাদের শিক্ষা, আশ্রয় ও অন্নদান তাঁহার ব্রত ছিল। ৫০।৬০ জন ছাত্রবাসের জন্য তিনি একটি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন কিন্তু নিজে একটি ছোট বাড়ীতে বাস করিতেন। ছাত্রদের স্তুবিধার জন্য পাচক ও ভূত্যেরও ব্যবস্থা ছিল। বহুছাত্র তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ ব্যতীত অগ্ন্যস্ত্র শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিত

কারণ তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্র পারদর্শী। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাধরের নিকট হইতে নিয়মিত বৃত্তি লাভ করিতেন।

গৃহে সমাগত কোন রোগীর নিকট গঙ্গাধর দর্শনী বা ঔষধের মূল্য গ্রহণ করিতেন না। বহু বিশিষ্ট ধনী পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসকরূপে গঙ্গাধর যে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা এইভাবে ব্যয়িত হইত। দরিদ্র রোগগ্রস্ত জনগণ গঙ্গাধরকে এইজন্ত পিতৃতুল্য পরিভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান করিত। স্বদীর্ঘকাল ধরিয়া বহু ছাত্রকে গঙ্গাধর আয়ুর্বেদ শিক্ষা দান করেন। উত্তরকালের স্বনামধন্য আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, প্রাণাচার্য হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী (কলিকাতা), গণেশ ফৌজদার (মুর্শাদি-মানভূম) প্রভৃতি গঙ্গাধরের অন্তঃবাসী ছিলেন। গঙ্গাধরের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গঙ্গাধর শেষ জীবনে মৃত্যুকষ্ট রোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্বদিনে নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পরদিবস কোন সময়ে কোন বিশেষ মুহূর্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা গঙ্গাধর নির্ধারণ করেন ও শুধুমাত্র গঙ্গাজল পান করিয়া আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে থাকেন। নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বে সজ্ঞানে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্বঘোষিত সময়ের মধ্যেই ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ গঙ্গাগর্ভে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল ৮৭ বৎসর।...আমার চরক এই শেষ কথাটি বলিয়াই গঙ্গাধর প্রাণত্যাগ করেন। প্রচুর ধনোপার্জন করিলেও মৃত্যুকালে তিনি অতি অল্পই সম্পত্তি রাখিয়া যান। গঙ্গাধরের মৃত্যুতে বহু ব্যক্তি আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করেন। দেশবাসিও এই অসাধারণ মনীষীর লোকান্তর গমনে শোকগ্রস্ত হন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্ভীকতা, শিশু-স্নেহ সারল্য, দানশীলতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ “হিন্দু-প্যাট্রিয়ট” পত্রিকা এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে গঙ্গাধর কেবলমাত্র একজন চিকিৎসক শিরোমণিই ছিলেন না, তিনি একজন বহুশ্রুত সংস্কৃতজ্ঞও ছিলেন [“He was not only an ornament to his profession but also a Sanskrit scholar of high reputation”—Hindu Patriot dated 15th June, 1885]। Reis and Rayyet সম্পাদক শত্ৰুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গঙ্গাধরের বিয়োগে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে গঙ্গাধর ছিলেন ভারতের শেষ ঋষি (Last of the Rishis of India)। নির্ভীকতা, সত্যপরায়ণতা সচ্চরিত্রতা, সদাশয়তা ও মনীষার জগৎ লোকমুখে গঙ্গাধর সম্বন্ধে এই কথাটি প্রচলিত ছিল—গঙ্গাধরো বা গঙ্গাধরো বা অর্থাৎ গঙ্গাধর কবিরাজ সাক্ষাৎ গঙ্গাধর বা শিব।

গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের জন্ত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে “গঙ্গাধর মনীষা” নামে একটি মাসিকপত্র কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন ও অ্যাক্সকেশ্বর রায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর ইহার প্রকাশ স্থগিত হয়। গঙ্গাধর-পৌত্র অ্যাক্সকেশ্বর রায় এই শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯১০) গঙ্গাধরের একটি ক্ষুদ্র জীবনী বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া প্রকাশ করেন, ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত বাংলা পুস্তকপঞ্জী হইতে ইহা জানা যায়। গঙ্গাধরের অপ্ৰকাশিত রচনাগুলির প্রতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশেষতঃ গবেষক ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

জন কোম্পানীর এক অখ্যাত বাঙালী কর্মচারী—রামচন্দ্র

নারায়ণ দত্ত

বিদেশী বণিকরা এদেশে এসে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করার সংগে সংগে এক ধরনের কর্মচারীদের প্রয়োজন বড় বেশী অনুভব করতে লাগল—যারা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত দেশের নানা রাজ্য দরবারে তাদের স্বার্থের কথা বলবেন সেই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। যে সব প্রয়োজনে আজকাল বিভিন্ন দেশে ‘অ্যামবাসাডর’ ‘ট্রেডমিশন’ পোষা হয়, অনেকটা সেই কারণে এইসব দিশি কর্মচারীদের মাহিনে দিয়ে রাখত বিদেশী বণিকরা। বলা বাহুল্য, ইংরেজ কোম্পানীরাও বাদ যায়নি। তারা বড়সড় দরবারে নিজের জাতের লোক রাখত, আবার এইসব দিশি প্রতিনিধিদেরও রাখত। এদের বলত ‘ভকিল’। এবং অস্ত্রান্ত সব বেতনভুক্ত চাকুরীদের তুলনায়, এদের বেশ কদর ছিল। কেননা, অবস্থাবিপাকে নবাব বাদশাহদের ঝাল ভো এদেরই ওপর পড়ত। ভকিলদের নূনের মর্বাদা দিয়ে সব ঝক্কি পোয়াতে হ’ত।

তখনকার দিনে একটা মস্ত ঝামেলা ছিল বাঙলা দেশে হুট করতেই নবাবদের নজরানা দিতে হয় দিল্লীর শাহানশার কাছে। আর নবাবেরা এই টাকাটা আদায় করত সাধারণতঃ বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে। নবাবের হুকুমনামা নিয়ে লোকজন আসত বিদেশী বণিকদের কুঠিতে। সবাইকার সেই এক রা। টাকা চাই টাকা। ইংরেজরা বরাবরই একটু এক বগ্গা। এইভাবে টাকা দিতে তারা গররাজী। কাজেই, তাদের গোমস্তা বল, ভকিল বল সব আটক। সতের শ’ একুশ সালে একবার এমনি হামলা করেছিল মুর্শিদকুলি খাঁ। কাশিমবাজারে গোমস্তা কান্ত মুনীকে বেঁধে নিয়ে গেল। ওলন্দাজ ভকিল একটু বেশি মাগ্গি লোক। তাকেও শাসন হ’ল। এমনি ঝামেলার চাকরী ভকিলের। কিন্তু বাঙালীরা তখন এক বিপুল কর্মঘণ্টে মেতেছে। এইসব ঝঞ্জাটের জন্তে পিছিয়ে আসবে এ কখনও সম্ভব ?

সেকালের কোম্পানীর নথিপত্র হাঁটকে দেখা যায়, জন কোম্পানীর এই বিচিত্র ‘সার্ভিসে’ বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা বড় একটা কম ছিল না। মল্লিক পরিবারের অন্ততম উদ্যোগী পুরুষ সন্তোষ মল্লিক ঢাকায় ‘ভকিল’ ছিলেন ইংরেজদের। এ’ছাড়া বেশ কয়েকজন বাঙালী বিভিন্ন নবাবী দরবারে কোম্পানীর ‘এজেন্টের’ কাজ করে গেছে, একেবারে, সেই আদ্যিকালে। আসলে প্রায় কুঠিয়ালই ভালো ফার্সী জানতেন না। অত সব স্থলুক সন্ধান জানে না। কাজেই নবাবের এজলাসে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার দরকার হলে করে কি ? স্বভাবতঃই ঐ ভকিলদের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ?

ভকিলের কাজে কলকাতা কাউন্সিলের হিসেব-পত্তরের খাতায় প্রথম যে নামটি পাওয়া যায় তার নাম লক্ষণ। এর নামে খরচ লেখা হয়েছিল এক টাকা। এটা মনে হয় মাইনে নয়, হাত খরচ বা বকশিশ। কেননা ঐ বছরই পরের মাসে ভকিলের জন্ত খরচ লেখা পাঁচটাকা। এটাই মনে হয় খাস মাইনে। ঐ একই সময়ে রাইটারদের মাইনে ছিল তিন টাকা, কাহারদের এক টাকা।

কাহারবা ঘরবানের কাজ করত। নন্দরাম সেন—সহর কলকাতার প্রথম ব্র্যাক জমিদার—তার মাইনে ছিল দু' টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যয়-কুঠ কোম্পানীর কাছে ভকিলদের কাজের বেশ কদর ছিল। খাতির ছিল। এবং প্রয়োজন ছিল। এই খাতির শশীকলাবৎ উত্তরোত্তর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল—তার প্রমাণ সতেরশ' চার সালে রামচন্দ্রের চাকরী। হুগলীর ফৌজদারের দরবারে তাঁর চাকরী হয় ঐ বছর মার্চ মাসের তেইশে। মাইনে মাসে কুড়ি টাকা। এ'ছাড়া তাঁর ঘোড়ার জন্ত 'এলাউন্স' মঞ্জুর করা হয় পাঁচ টাকা। এবং ডাইনে বামে একটা করে পিণ্ডন রাখতে দেওয়া হয়—সবই কোম্পানীর খরচে।

কিন্তু হঠাৎ জনকোম্পানী এত মোটা মাইনেতে হুগলীর ফৌজদারের দরবারে এই ভকিল নিয়োগ করতেই বা গেল কেন। এককথায় এই প্রশ্নের সহজ জবাব—প্রতিশ্রুতি রক্ষা। কোম্পানীর কর্তারা হুগলীর ফৌজদারকে কথা দিয়ে এসেছিল। কিন্তু ধূমধাড়াকা হঠাৎ এমন কথাই বা কেন দিতে গেল কোম্পানী? কেন আবার—সোজা কথা, চাপে পড়ে। এবং এই চাপ—তাঁদেরই স্বখাত সলিল। এবং এর আদি খুঁজতে গেলে কয়েকটা বছর পেরিয়ে সাতসমুদ্রের তের নদী সাঁতরে আমাদের খাস লণ্ডন শহরে চলে যেতে হবে।

সতেরশ' সাল আসব আসব করছে। সিংহাসনে তখন উইলিয়াম থার্ড—যাঁর নামে কলকাতায় ইংরেজ কেল্লার নাম ফোর্টউইলিয়াম। ফ্রান্সের সঙ্গে তখন জোর লড়াই চলছে। ইংলণ্ডের তখন বিষম টাকার খাতি। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বললে, 'টাকা চাও, দিচ্ছি। সাতলক্ষ পাউণ্ড ধার। সুদ শতকরা চার পাউণ্ড। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে বাপু,—ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারটা পাকা করে দিতে হবে পার্লামেন্টে পাশ করে।' বিধি বাম। এই সময়েই আর একদল ছোটখাট ব্যবসাদার মিলে পাণ্টা চাল চাললে। তারা বললে, 'তারা দেবে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ধার। সুদ শতকরা আট।' কোম্পানীর 'মনোপলি'টা অনেকেই ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া ব্রিটিশ 'ক্রাউনের' তখন বড় টাকার টানাটানি কাজেই, দ্বিতীয় দলই জিতে গেল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থিতি হওয়ার প্রায় একশ' বছর পরে ভারতে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে নতুন ইংরেজ কোম্পানী হল—'ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ।' বোলশ আটানব্বই এর সেদিন পাঁচই সেপ্টেম্বর। খাস ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম হল—লণ্ডন কোম্পানী। তাকেও একেবারে ভাতে মারা হল না। তার মেয়াদ ঠিক হল আরো তিনটে বছর—উনত্রিশে সেপ্টেম্বর সতেরশ' এক।

কিন্তু কোম্পানী ফাঁদা আর ব্যবসা করা তো এক কথা নয়; জাদুবেল একটা নাম পেলে হবে কি, নতুন কোম্পানী ঠেকে শিথলে—প্রাচ্যে ব্যবসা করা অত সহজ বস্তু নয়। নতুন কোম্পানীর তরফ থেকে একটা প্রস্তাব এল লণ্ডন কোম্পানীর সঙ্গে মিলে মিশে ব্যবসা করার। লণ্ডন কোম্পানী তো তেতেই ছিল। তারা নতুন কোম্পানীকে সোজা হাঁকিয়ে দিলে। নতুন কোম্পানী তখন দুটো কাজ করলে। দিল্লীর দরবারে একটা দূত পাঠালে। আর উইলিয়াম। ঠিক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যেমন পাঠিয়েছিল আর টমাস রোকে। আর আর এডওয়ার্ড লিটনটন বলে জন কোম্পানীর এক ছাঁটাই কুঠিয়ালকে প্রেসিডেন্ট করে তিনজন সভ্যের একটা কাউন্সিল

পাঠালে বাংলা দেশে। লিটনটন নরম গরম করে বেশই স্বরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর একটা ফতোয়ায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লেগে গেল। লিটনটন বলে বসলেন—তিনি ছাড়া আর কারওই এখন আর সরকারী ভাবে মুঘলদের সঙ্গে আলোচনা চালান এবং কোম্পানীর নামে ‘দস্তক’ দেওয়ার অধিকার নেই। জন বিয়ার্ড তখন পুরনো কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের বড় কর্তা। তিনি পাণ্টা হুকুম দিলেন—কলকাতার কাউন্সিলের এজিয়ারে যারা বাস করছেন তাঁরা যেন কেউই লিটনটনকে কোনরকম পাতা না দেন—তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেন। ওদিকে বাদশাহ আলমগীরের দরবারে নরিস সাহেব সেজেগুজে গেলেন বটে—সমারোহেরও অভাব হল না, অভাব হল না সন্মতের অভ্যর্থনা, কিন্তু, ঐ পর্যন্ত। ফলে হল না কিছু। ব্যর্থ মনোরথ নরিস মুঘল আমলাতন্ত্রের অলাভচক্রে পড়ে কিছুকাল কয়েদ খাটলেন এবং কি আর করেন, অবশেষে স্বদেশের উদ্দেশে তরী ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু পৌঁছাতে পারলেন না। সেন্ট হেলেনায় দেহ রাখলেন। রোগটা—আমাশা।

ডামাডোলের বাজারে সতেরশ’ এক সাল প্রায় শেষ হয়ে এল। দিল্লীতে বসে বাদশা আলমগীর এই সময়ে একটা সাংঘাতিক হুকুম জারি করলেন। কয়েক বছর যাবৎ স্ত্রাট থেকে মক্কার যাত্রীদের জাহাজের ওপর হুবহুত একটা না একটা আক্রমণ লেগেই ছিল। এর ওপর যখন পুরনো এবং নতুন ইংরেজ কোম্পানী পরস্পর পরস্পরের ওপর জলদহ্যতার অভিযোগ নিয়ে এল, স্ত্রাট পড়লেন মহা ফাঁপড়ে—ভাবলেন এ দুই ব্যাটাকেই গারদে পুরে ফেল। যেখানে যে কুঠীতে যা মাল আছে সব বাজেয়াপ্ত কর।

পরোয়ানা গেল সুবার সুবার। যতদূর মনে হয় অভিজ্ঞ কলকাতা কাউন্সিল এ খবরটা আঁচ করতে পেরেছিল। পাটনা, কাশিমবাজার আর রাজমহল কুঠী থেকে দামী দামী সব মাল সরিয়ে কলকাতায় এনে জমা করা হয়েছিল কাজেই তার গায়ে বিশেষ আঁচ লাগল না। বড়টা নতুন কোম্পানীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাদশার হুকুমে তাদের বাষট্টি হাজার টাকার মাল হল বাজেয়াপ্ত। নতুন কোম্পানী তো ফৌত হবার দাখিল!

কিন্তু এর ফল সবই খারাপ হল না। তা কোনদিন হয় না ছুনিয়ায়। নদীর কূল একদিকে ভাঙলে গড়ে অত্রদিকে। কাজেই এই দুর্দৈবের মধ্যে একটা ভারী ভালো ফল ফললো। দুটো কোম্পানী অনেকটা বাধ্য হয়েই এক হয়ে গেল। তিনটে কাউন্সিল হল—একটা পুরনো যার বড়কর্তা বিয়ার্ড, অপরটা নতুন—যার দণ্ডমুণ্ডের মালিক লিটনটন। তৃতীয়টির নাম যুইনাইটেড কাউন্সিল। এর সভ্য আটজন। ঠিক হল এর দুই প্রবীণ সদস্য রবার্ট হেজেম আর রালফ শ্লেগডন—পালা করে এর প্রেসিডেন্ট হবে। সতেরশ’চার সালের পরলা ফেব্রুয়ারি এই যুইনাইটেড কাউন্সিলের হাতে অস্থস্থ বিয়ার্ড সাহেব ফোর্টের চাবিকাঠি তুলে দিলেন। তেরই মার্চ থেকে এই সংযুক্ত কাউন্সিল ‘দস্তক’ের বা ‘পারমিটে’র ওপর তাদের শীল মোহর দিতে স্বরু করল।

শীলমোহর তো দিতে লাগল কিন্তু তাদের চেনে কে? মানে কে? কূটনৈতিক ভাবে স্বীকার করে কে? এই জরুরী কাজের জন্ত হুগলীর ফৌজদারের দরবারে এই নতুন কাউন্সিলের পরিচয়

পত্র দিয়ে থাকে পাঠান হল—তিনিই রামচন্দ্র। তাঁকে প্রথমেই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তিনি হুগলীর ফৌজদার, বক্সী এবং ওয়াকিনবিশের কাছে ইংরেজদের কাজকর্মদেখার ভকিল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন—এটা সবিনয়ে জ্ঞাপন করেন এবং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি যদি কোম্পানীর খাস কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিলাষ করেন তাও জেনে কাউন্সিলকে অবগত করেন।

সে যাইহোক রামচন্দ্রকে আরও বলা হল, দুটো কোম্পানীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে যেন বলা হয়—দুই কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে এখন একটিমাত্র কোম্পানী চালু করা হয়েছে এবং সব ডিপ্লোম্যাটিকেই ইন্তককাল যা করতে হয়েছে, রামচন্দ্রকেও সে কাজ করতে বলা হয়—হুগলীর খবরাখবর সম্বন্ধে যেন ওয়াকিবহাল হয় কলকাতাতে।

যতদূর জানা যায়, কোম্পানী তাড়াতাড়ি রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলে হুগলীর ফৌজদারের দরবারে তাঁর করণীয় কি তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে। এবং বাবার আগে দরবারের খরচের জগ্রে মবলগ একশ' টাকা দিলে হাতে। যাই হোক, ইংরেজ বহর একদিন ডিউ ভেড়াল হুগলীর ঘাটে। এবং কালক্ষেপ না করে ষোড়ায় চেপে হুগলীতে ফৌজদারের কাছে পরিচয় পত্র পেশ করলেন রামচন্দ্র কিন্তু এ নিয়েও অনেক কথা শুনতে হয় তাঁকে। কেননা রামচন্দ্র নাকি হুগলীর ফৌজদারকে তাঁর পরিচয় পত্রে নিজেকে কোম্পানীর ‘ভকিল’ বলেই শুধু অভিহিত করেন। কলকাতা কাউন্সিল মুখঝাপটা দিয়ে বললে, তা কেন হবে, রামচন্দ্র তাঁদের এজেন্টও বটে। পরিচয়পত্রের এইটুকু শুধরে দিয়ে কাউন্সিল নতুন একটা কাজ চাপিয়ে দিলে—প্রতিটি দরবারে ফৌজদারের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার সারমর্ম কলকাতায় লিখে পাঠাতে হবে রামচন্দ্রকে। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে রামচন্দ্র ‘দুর্গা দুর্গা’ বলে ভালো করেই কাজকর্ম সুরু করলেন। এবং অচিরেই তাঁর কৃতিত্ব সপ্রমাণ করলেন। হুগলীতে বসে তাঁর কানে এল ফৌজদার সাহেব যেন কোথায় যাবেন—তারই তোড়জোড় চলছে। ফৌজদারের নাম মীর ইব্রাহিম। রামচন্দ্র খোঁজ খবর করতে লাগলেন। এবং অচিরেই তাঁর কানে এল তিনি যাবেন বালেশ্বর। সেখানে স্তবে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ রয়েছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন ইব্রাহিম। রামচন্দ্র আর বিলম্ব করলেন না। কলকাতায় জরুরী চিঠি লিখে পাঠালেন—করেছেন কি হুজুরা। শিজী লোক পাঠান সেখানে।

রামচন্দ্র তাঁর ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে আরও একটা খবর পাঠিয়ে থাকবেন,—করেছেন কি, শুধু হাত কি মুখে ওঠে? ইব্রাহিম খাঁ সাহেবকে এখনও কোন ভেট পাঠাননি? কাউন্সিলের কাউকে ইতিমধ্যে পাঠান উচিত ছিল হুগলীর দরবারে সেলাম জানাবার জগ্রে। কাজটা কাঁচা হয়ে যাচ্ছে না কি?

কলকাতা কাউন্সিল রামচন্দ্রের দুটি পরামর্শই মেনে নিল। মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে পাঠালে তাদের জানাশুনার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিপ্লোম্যাট—রাজারাম মল্লিককে। আর হুগলীর ফৌজদারকে বলে পাঠাতে বললে, যে ইংরেজরা তৈরীই আছে। হুজুরের সময় হলেই ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধন্ডা হবে। আর ইংরেজ কুঠীর যে কোন দ্রব্য ফৌজদারের নজরে লাগে—তাই তাঁর প্রীচরণে অর্পণ করে, ইংরেজরা কৃতকৃতার্থ হতে চায়। অবশ্য ইংরেজরা

আগে গাওনার কথা ভাবে, তবে পাওনার কথা কয়। রামচন্দ্রকে কলকাতা কাউন্সিল লিখে দিলে, তিনি যেন ফৌজদারকে মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে ইংরেজদের হয়ে একটু গাইতে বলেন। বলেন যেন, খাঁ সাহেব, আপনার ছোটখাট দুই কর্মচারীদের হাতে ইংরেজদের ব্যবসা যে ভাবে নষ্ট হচ্ছে তা' হজুর বন্ধ করার অবশ্য প্রয়োজন। নয়তো কাজ-কারবার ত বায়। সেইটা বন্ধ করার জন্তে মুর্শিদকুলির দরবার থেকে একটা লকুম জারী করা হয়।

এটা ভরা গ্রীষ্মের কথা। জুন মাস। গ্রীষ্ম গেল। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারায় হুগলীর জলে বান ডেকে গেল। আশ্বিন মাস আসে আসে, সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ রামচন্দ্রের জবাব এসে গেল। রামচন্দ্র জানালেন যে নতুন জন কোম্পানীর যে সব মালপত্র এখনও মুঘল কোবাগারে বাজেরাপ্ত অবস্থায় রয়েছে—সেগুলি উদ্ধার ক'রে ফয়সালা করতে হলে হুগলীর দেওয়ান থেকে মুংসদী—সবাইকেই টাকা খাওয়াতে হবে। নগদ-নারায়ণই দরবার দেবতার একমাত্র অর্থ্য। মোটা মোটা ভেট দিতে হবে এখানে। আগে এরা কোম্পানীর নতুন-পুরানো দুই তরফ থেকেই মোটা টাকা পেয়ে এসেছে। সেই রূপচাঁদ ছাড়া কাজ হবে না। ফেল কড়ি মাথ তেল—এই হচ্ছে দরবারী চাল।

কলকাতা কাউন্সিলে এই নিয়ে জোর মিটিং হয়ে গেল। তারা ওসব পোক্তলোক। এ দেশকে বেশ চেনেন। রামচন্দ্রের যুক্তিটা ফেলতে পারলেন না। কাজেই দেবী না করে সেই মিটিং-এ বসে বসে কর্তার একটা বিরাট তালিকা তৈরী করে ফেললেন। এবং সেই লিষ্টিতে হুগলীর ফৌজদার মীর ইব্রাহিম থেকে শুরু করে' বক্সী খোজা মহম্মদ, কাজী, দারোগা, মুংসদী রামকৃষ্ণ মায় তাদের নামেব মুনসী কাউকেই তিনি বাদ দিলেন না। সর্বসাকুল্যে প্রায় তিনহাজার টাকা ঘুষ দেবার একটা ফিরিস্তি তৈরী করে ফেললেন তাঁরা। এবং শুভশ্রু নীত্বই। তাই দেবী না করে' রামচন্দ্রের নির্দেশমত টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের দুই কর্তা—রাসেল ও নাইটেংগেল তাঁদের নৌকা হুগলীর উদ্দেশে পাড়ি জমিয়ে ফেললে। নীল আকাশের বুকে তখন লঘুপঙ্ক শরতের মেঘ। গঙ্গার ধারে ধারে দিগন্ত-প্রসারী বালিরচড়ায় কোথাও বা কাশের বনের মেলা, কোথাও বা ছায়াঘেরা আমবাগানে দোয়েল পাপিয়ার কলকুজন, মৌমাছির গুঞ্জন, কোথাও বা শুধু ঘাটে ঘাটে স্নানরতা মেয়েদের কলকাকলি।

নৌকা একসময়ে হুগলীর ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। মালপত্র টাকাকড়ি এসে গেল। গরুর গাড়ীতে সে সব বোঝাই করে' সাহেবদের পাক্কীর পিছু পিছু বোড়ায় চেপে রামচন্দ্র উকিল গিয়ে এতেনা দিলেন মীর ইব্রাহিমের প্রাসাদে। এমন কিছু বেশি দূর নয়। গোলঘাটে ইংরেজ কুঠী থেকে এখনকার ব্যাঙেলের দিকে যেতে মাঝপথে পড়ত মুঘল স্তবেদারের সুবিস্তৃত প্রাসাদ। স্বয়ং স্তবেদারকে ইংরেজেরা সেদিন দিয়েছিল সাতাশিগজ বিলিভী ব্রোকেড, দুটো বিলাতী ইম্পাতের তলোয়ার, একজোড়া পিস্তল, একটা বন্দুক, একটা বড় তিরিশ ইঞ্চি আয়না আর একটা ফিণ্ট-ওয়ার—সর্বসাকুল্যে এই সব জিনিষের সেকালের বাজারে দাম পড়েছিল পাঁচশ একচল্লিশটাকা নয়ান্না, সাহেবরা তো দিয়ে থুয়ে হাওশ্রেক করে চলে গেল। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল রাজা রাজী তো খোজা বৈকে বসে। তিন জন বক্সী—বলে বসল তাদের আরও কিছু চাই। বেশি নয়,

এগারশ' সিকা টাকা। ব্যবসা পত্তরের ব্যাপারে এরাই তো সব। রাখিলে রাখিতে পারে, মারিলে মারিতে। কাজেই রামচন্দ্রকে আবার কলকাতায় লিখে পাঠাতে হ'ল। তাতে ঘটনার পুংখানুপুংখ বিবরণই দেননি শুধু পোড় খাওয়া উকিল রামচন্দ্র, বোধ হয় পরামর্শ দিয়ে থাকবেন যে অন্তত কালহরণ। কাজেই টাকাটা দেবার আশা দিয়ে কাজটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। এবং এবারে টাকাটা যেন চুপিচুপি দেওয়া হয়। কাকে পক্ষীতে যেন টের না পায়। নয়ত' ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সবাই 'দেহি' 'দেহি' রব তুলবে। কোম্পানীর বহুটাকা গলে যাবে।

এবং আরও একটা যোদ্ধা পরামর্শ দিয়ে থাকবেন রামচন্দ্র।—সেটাই মনে হয় তাঁর তুরুপের টেক্কা। কিছু না, সাহেবদের সঙ্গে জন দুই তিন গোরা পন্টন যেন আসে হুগলীতে। মুঘলরা যেন বোঝে টাকা দিয়েই শান্তি কেনে না জন কোম্পানী। হকের হিসেব তারা তলোয়ারের ডগায় লিখে ফেলতে পেছ পা নয়! কোম্পানীর সেই আত্মিকালের সভাগুলির বিবরণের কাগজ পত্রে দেখা যাচ্ছে সতেরশ চার সালের ত্রিশে অক্টোবর কলকাতা কাউন্সিলের মিটিং-এ এই ধরনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে জন কোম্পানী। এবং ঠিক হয় উইগার আর রেডশ সাহেব এই টাকা নিয়ে হুগলী যাবেন। সঙ্গে যাবে কে? ত্রিশ জন গোরা পন্টন কোমর বেঁধেছে!

রামচন্দ্রের দৌত্যের সময়ে আর একটা ঘটনার হৃদিশ পাওয়া যায়। হুগলীর ফৌজদারের টাকা খেয়ে একটা লোক—পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে কলকাতায়। কোম্পানী তো জানে না এতশত। যথা নিয়মে আশ্রয় দিলে তাকে। কিন্তু এর কয়দিন পরেই চিঠি এল রামচন্দ্রের। লোকটাকে অবিলম্বে হুগলীতে ফেরৎ দিতে নইলে ফৌজদারকে সামলাানো দায় হবে। জন কোম্পানীকে পলাতকের টাকার জন্তে দায়ী হতে হবে। কাউন্সিল লোকটাকে পাকড়ে নিজেদের পেয়াদা পাইক দিয়ে সোজা হুগলী পাঠিয়ে দিলে। অবশ্য এইভাবে বেশীদিন শান্তি বজায় থাকেনি হুগলীতে। মুর্শিদকুলির আমলে হুগলীতে নতুন ফৌজদার আসে। এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাড় খড়িয়ে ওঠে। টাকার খাঁই বাড়ে হুগলীর মুঘল মহলে। দিশি লোকেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়—ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ রাখ।

অবশ্য ব্যাপারটা সুরু হল খুবই সামান্য ব্যাপার নিয়ে। হুগলীর ফৌজদারের কোষখানায় জন কোম্পানী যথা নিয়মে বৎসরাদিক পেশকামের তিনহাজার টাকা জমা দেয়। ফৌজদার টাকা জমা নিলে ঠিকই কিন্তু রসিদ দেবার বেলায় বললে—পরে দেব। কদিন তাগাদার পর শেষ বলে বললে, ওসব হবে না। টাকা ছাড়ো। এবং টাকা না পেতেই ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধ করে দিলে। কোম্পানী দেখলে ভালো বিপদ। কিন্তু কোন কথা বললে না। দেখা গেল এক প্রসন্ন প্রভাতে কলকাতা থেকে একটা বজরা পাল তুলে দিলে হুগলীর উদ্দেশ্যে। ঝপ ঝপ করে তালে তালে বৈঠা বাইতে লাগল। আর উচ্ছল গঙ্গার জলে পড়ে সেই শব্দ কেমন যেন টেনে বলতে লাগল : হুগলি : হুগলি : হুগলি : হুগলি। ঠিক এমনি নৌকাই গিয়েছিল কয়েকমাস আগেই। তবে এবার তাতে আর টাকা নয়। নাইটেংগেল বলে সেই সাহেব গেল আর গেল ত্রিশজন খাস গোরা পন্টন। এবং কাজ মন্দ হ'ল না। ফৌজদার সাহেব ইংরেজদের ব্যবসার ওপর যতরকম বাধা নিষেধ তুলে নিলে। দুনিয়ার শক্তের ভক্ত কে নয়?

শুধু তাই নয়, ফৌজদার সাহেব স্বয়ং এক হস্তার জন্তে কলকাতা ঘুরে গেলেন। থেকে গেলেন ফৌজদারী বালাখানায় তাঁর আগেকার ফৌজদার জিয়াউদ্দিন যেখানে এসেছিল। তেমনি জাঁকজমক, তেমনি সমারোহ। ইংরেজরা আপ্যায়নের কসর করলে না। ইংরেজদের সাদর অভ্যর্থনায় পরম প্রীত হয়ে গেলেন। তাঁর সম্মানে ইংরেজরা ফোর্টউইলিয়ম থেকে গজার বৃকে নোঙর করা জাহাজ থেকে—দুদাড়ি তোপধ্বনি করলে—এবং তাঁর বিদায় বেলায় বহুবিধ সামগ্রীর একটা বিরাট ভেটের ছাঁদা বেঁধে দিলে।

কিন্তু এই শান্তিও বেশিদিন চলেনি। এই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে থাকে। সতের শ' সাত। মহীউদ্দিন মুহম্মদ আওরঙ্গজেবের দেহান্তের পর মুঘল সিংহাসন নিয়ে কামড়াকামড়ি স্বরূপ হ'ল। এক দিল্লী থেকে অনেক দূরে হুগলীতেও রঙ্গমঞ্চের কুশীলবরা পাণ্টে গেল। মীর ইব্রাহিমের জায়গায় নতুন ফৌজদার এলেন। ইংরেজরা তাকে সেলাম জানিয়ে এল। সওগাত দিয়ে এল। কিন্তু সবই বুথা হ'ল। নতুন ফৌজদার ভিজলেন না। মাস দুই তিনের মধ্যেই তিনি তাঁর রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজদের ভকিলের কাজ বাড়ল। এর কারণটা কি জানতে গেল মুঘল দরবারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন কাজ হ'ল না। মুর্শিদকুলি তখন রাজমহলে। ইংরেজদের মনে বোধকরি উইলিয়ম হেজেসের দৌত্যের ব্যর্থতা মুছে যায়নি। কাজেই তারা আর সে পথে গেল না। কালক্ষেপ করতে লাগল। হুদিনের অপেক্ষা করতে লাগল, গুণটেনে পড়ে থেকে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল ক্রমশঃ। কেন না এই সময়েই হুগলীর ফৌজদার তিনি হুগলীর একজন ইংরেজ এবং জনকোম্পানীর কয়েকজন কালা কর্মচারীকে কয়েদ করে বসলেন। এবং শাসিয়ে বসলেন—দরকার হলে আরও লোককে বন্দী করবেন তিনি। ইংরেজরা এবার সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, ফৌজদার কলকাতা না আক্রমণ করে বসে। কিন্তু আখিরে তাদের ধৈর্যেরই জিত হ'ল। এই বায়েলা আস্তে আস্তে কেটে গেল। মুর্শিদকুলি বা দিল্লীর বাদশা জানতেন এই গরু দুধ দেয়। সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে একেবারে মেরে ফেলা নিবুদ্ভিতারই পরিচয়। কাজেই ইংরেজদের ব্যবসা টিমে পড়লেও চলতে লাগল এবং এক সময়ে বেশ জমজমাট হয়ে উঠল।

কিন্তু এই দুর্বোণের দিনে রামচন্দ্র কি কাজ করেছিলেন জন কোম্পানীতে? বলা শক্ত। সতের শ' চার সালের পর সেকালের জন কোম্পানীর হুগলীর ভকিলের আর নামোল্লেখ নেই। ‘আমাদের ভকিল’, ‘আমাদের ভকিল’ এই ভাবেই বলা হয়েছে বার বার। কিন্তু তা নয়। কেবল সতের শ' সালের কাউন্সিলের মিটিং-এর এক বিবরণীতে রয়েছে—“আওয়ার ভকিল এ্যাট হুগলী বিইং লেটলি ডেড, এগ্রীড—উই ইন্টার টেইন শ্রামস্‌ন্দের সিং টু এ্যাপায়ার এ্যাজ আওয়ার ভকিল এ্যাট হুগলী।” অসার্থ্য হুগলীতে আমাদের ভকিল সম্প্রতি মারা যাওয়ায় ইহা ঠিক করা হয় যে হুগলীতে শ্রামস্‌ন্দের সিংহকে আমাদের নতুন ভকিল হিসাবে নিয়োগ করা বাইতেছে। এমনিতে ত মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রামচন্দ্রের জায়গায় এলেন শ্রামস্‌ন্দের।

কিন্তু তা নয় সতের শ' চৌদ্দ সালে এক রামচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে উকিল করে পাঠান হ'ল।

এতাবৎকাল রামচন্দ্র হয়ত অল্প কোন দরবারে বহাল হয়েছিল কিংবা ছেড়েই দিয়েছিলেন ওকালতি। আবার নতুন করে' আরম্ভ করেন ফিরেফিটি। তবে তার সম্ভাবনা কম। কেননা ওকালতি থেকে সরে এসে তারপরে দুম করে একবার মুর্শিদাবাদের মত শক্ত ঠাঁই-এ তাঁকে ভকিল নিয়োগ করবে ইংরেজ কোম্পানী এটা ত বিশ্বাস হয় না। তবে বাইহোক না কেন, এটা রামচন্দ্রের বড় প্রমোশন কেননা মুর্শিদাবাদই তখন বাঙলার রাজধানী। ইংরেজা যাকে সবচেয়ে বেশী ভয় খেত সেই মুর্শিদকুলি খাঁ তখন সেখানে মুঘল দেওয়ান। এই প্রমোশনের সঙ্গে মাইনে কিন্তু বিশেষ বাড়েনি। দেখা যায় সর্বসাকুল্যে এই চাকরীতে তাঁর মাইনে হয় মাসিক সত্তর টাকা। নগদ চল্লিশ। ছয়জন পালকী বহার কাহার বার টাকা, পাঁচটা প্রতিহারী সাড়ে বার টাকা, একজন মশালচী দু-টাকা ও নিয়ন্ত্রণী চাকরবাকরের জন্তে সাড়ে তিন টাকা।

সতের শ' সাতাব্বদ পর আমরা এক রামচন্দ্রকে আবার বাঙলার সেই যুদ্ধ-বিদ্রোহ পটভূমিকায় বেশ বড় বড় পার্ট করতে দেখি। সিরাজদ্দৌলার বত দোষই থাক, বতই উদ্ভূতচেণ্ড বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যাক, দেখা যাচ্ছে তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর বাঙলার রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল না। সেখানে যে কোটি কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা সোনার পার্ভ, মনিমুক্তা অলঙ্কার জহরৎ ছিল, সেটাতো এখন প্রবাদে দাঁড়িয়েছে।

সিরাজদ্দৌলার এই সব অর্থ ইংরেজরা লুণ্ঠের টাকার মতই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সেত পুরণো খবর। কিন্তু তার চেয়েও বড় খবর হচ্ছে, সিরাজদ্দৌলার নিজের কিছু গুপ্ত ধন ছিল। সেটা জানতেন মীরজাফর আর উমরবেগ। আরও দুজনের চোখে এই রাজকোষ লুকিয়ে রাখা যায়নি। তারা হচ্ছেন ক্লাইভের মুদী নবকৃষ্ণ আর রামচন্দ্র। শোনা যায় যে আর পাঁচকান না হয়, অর্থাৎ ইংরাজরা যাতে জানতে না পারে, কেননা পারলে ত টাকাটা তাদেরই খপ্পরে পড়বে, মীরজাফর এই টাকার কিছু অংশ এঁদের দুজনকে দিয়ে তাদের মুখবন্ধ করেন।

এর ফলে রামচন্দ্রের কি রকম অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছিল, তার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির বহর দেখে একটু আঁচ করতে পারা যায় কি রকম বড় দাঁও ঘেরেছিলেন তিনি এই স্বযোগে। তিনি মাইনে পেতেন প্রথমে ত টাকা কুড়ি। শেষ বেশ বেড়ে হয় বাট। আর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটা এই রকম—নগদ টাকা বাহাত্তর লক্ষ, মণিমুক্তা বিশলক্ষ, জমিদারী আঠার লক্ষ টাকার আশিটা সোনার কলসী, তিনশ'টা রূপার।

রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক এণ্ড রুজ

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রোমাঁ রলঁ তাঁর ভাষ্যরীতে এক জায়গায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড রুজের সম্পর্কে, “রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভক্ত আছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে সম্পূর্ণ বোঝে না। কেউই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটির বেশি দিক বোঝেন না (বা স্বীকার করেন না)। এণ্ড রুজ বোধহয় এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পান (দেখতে চান) কেবল ঋষি, শিক্ষক, দ্রষ্টারূপে—আর তাঁর কবিসত্ত্বকে মানেন না।” (১) রোমাঁ রলঁ যে কিসের ভিত্তিতে এই মন্তব্য করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। বরং এণ্ড রুজ-রবীন্দ্র সম্পর্ক ঠিক এর উল্টো ছিল বলেই আমাদের মনে হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঋষি, শিক্ষক বলে যেমন জানতেন তেমনি জানতেন কবি বলে। সে কবি শুধু ভাবরস সম্ভোগের কবি নন, তাঁর কাব্য মাল্যকে প্রেরণা দেয়, শক্তি দেয় নবজীবনের স্বাদ দেয়—এই ভাবেই এণ্ড রুজ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রকবিতার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক, প্রচারক এবং ব্যাখ্যাতা। নিজে পড়েছেন, পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর বিশ্বসাহিত্য সঞ্চরণশীল মন। সংগ্রামের ক্লান্তি যখন সর্বদ্বন্দ্ব-ব্যাগ্ন, যখন হতাশায় মন আচ্ছন্ন তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে নতুন প্রাণে উদ্দীপ্ত করেছে। বিদেশে চলেছেন, প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই—সঙ্গে নিয়ে চলেছেন ফাল্গুনীর অনুবাদ, পাঠ করছেন নানা সভায়, ব্যাখ্যাত মাল্যকে নব উৎসাহে জাগিয়ে তুলছেন। কখনো সিমলার ইংরাজ রাজপুরুষদের সভায়, কখনো আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণ মাল্যদের কাছে রবীন্দ্র কবি প্রতিভার ব্যাখ্যা করছেন অক্লান্তভাবে। তাই এ প্রশ্ন মনে স্বভাবতঃই জাগে যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে রলঁ লিখেছিলেন যে এণ্ড রুজ রবীন্দ্রনাথের কবিসত্ত্বকে মানেন নি।

রবীন্দ্র-এণ্ড রুজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্মৃতি ১৯১১ সালে। তাঁর মৃত্যুর দিন পর্বন্ত এণ্ড রুজ সেই সম্পর্কের মাধুর্যে আত্মভোলা ছিলেন—রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে জেনে তাঁরই কাছে ছিলেন আত্মনিবেদিত। দীর্ঘ উনত্রিশ বছর কতভাবে কত ধরণে যে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের রস পান করেছেন তার সব তথ্য এখানে ধরে দেওয়া যাবে না, কারণ সে তথ্যের তালিকা বিপুল। কিন্তু এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আমরা পাঠকদের কাছে ধরে দিতে চাই যাতে প্রমাণ করবে যে এণ্ড রুজ সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্বেষণী পাঠক ছিলেন।

এণ্ড রুজের জীবনীতে (২) দেখা যায় যে ছাত্র জীবনে তিনি গ্রীক ল্যাটিন ও ইংরাজী—এই তিন ভাষাতেই কবিতার রস পেতেন, দীর্ঘ কাব্যংশ মুখস্ত করতে পারতেন। ক্লাসিকস-এর রস তিনি নিবিড় ভ্রমরতার সঙ্গে উপভোগ করতেন, কারণ, তাঁর জীবনীতে বলা হচ্ছে, “he how the soul of the poet, and a knowledge of pain beyond his years.” দিল্লীতে সেন্ট ষ্টিফেন্স কলেজে তিনি ইংরাজী শিক্ষক হয়েই এসেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতনেও তিনি নানা সময়ে ইংরাজী কবিতা পড়িয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এক কবিতা পাঠের সভায়। ১৯১২ সালে

হ্যাম্পষ্টেডহীথের কাছে এক পাঁহাড়ে উইলিয়ম রোদেনষ্টিনের বাড়িতে ইয়েটস পড়বেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। বন্ধু নেভিনসন নিয়ে গেলেন এণ্ডরুজকে। গীতাঞ্জলির নানা কবিতা ইয়েটস আবৃত্তি করে গেলেন। সেই কবিতা তাঁকে কি রকম মুগ্ধ করেছিল, তাঁর সমগ্র সত্তাকে কি প্রবল এক আন্দোলনে আলোড়িত করেছিল তাঁর বর্ণনা তিনি নিজেই এক প্রবন্ধে লিখে রেখেছেন : “সেই আলোকিত কক্ষ কবির সান্নিধ্য এবং তাঁর কবিতার সঙ্গীত গুঞ্জরণ থেকে শেষকালে বেরিয়ে এলাম বিলম্বিত সন্ধ্যার গোপলি আলোয় এবং হ্যাম্পষ্টেডহীথের ওপর দিয়ে একা একা হাঁটতে লাগলাম। আকাশে তখন সবে চাঁদ দেখা দিয়েছে—বাতাসে এক মোহময় আবশ। পৃথিবীর উপর ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, পশ্চিম দিগন্তে তখনও সূর্যাস্তকালের রক্তরাগ দৃশ্যমান। এর সমস্ত জ্যোতি যেন এসে পড়েছে আমার ওপর—আর আমি সেই উচ্ছ্বাসের বন্ধুর পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে সত্যি সত্যিই স্থান কাল এবং বহির্বস্তুর চেতনা আমার মধ্যে লোপ পেয়েছিল।...বিশ্বব্যাপী এই নব সৌন্দর্য চেতনার রহস্যলোকে তিনি আমার নিয়ে গেছেন। সেই প্রথম দর্শনের পর থেকেই আমি তাঁর চোখের আলোয় এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি—তাঁর গানের মধ্যে, তাঁর আশ্রম জীবনের মধ্যে।” (৩)

রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য দিয়ে এণ্ডরুজ নতুন করে রূপের জগতকে দেখতে পেয়েছিলেন। কবিতা পাঠ শুনে নিজের আত্মবিহ্বল অবস্থার এমন কোন স্বীকৃতি আর কোন পাঠকের রচনার তো পাইনি। সেই যে স্বরূপ হলো রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদন সে চললো চিরদিন। সংগ্রামী মানুষ দুঃখ ব্যথা আর বেদনার সঙ্গে সেই কবিতার হাতিয়ার নিয়েই লড়েছেন সারা জীবন।

১৯১২ সালেই ইংলণ্ডে যে কজন মুষ্টিমেয় মানুষ রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ইয়েটস, রোদেনষ্টিন ও ট্রেভেলিয়নের সঙ্গে এণ্ডরুজও ছিলেন। নিজে গ্রীক সাহিত্যে অবাধ চলাফেরার অধিকার পেয়েছিলেন এণ্ডরুজ—তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে মালিনী নাটক পাঠ করে জানিয়েছিলেন যে গ্রীক নাটকের সঙ্গে তার মিল আছে। ‘মালিনী’র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে কেবল ট্রেভেলিয়নেরই নাম করছেন। কিন্তু জগদানন্দ রায় মহাশয়কে লেখা তৎকালীন একটি পত্রে (২রা আশ্বিন ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন “মালিনীটা ভালো করে পড়তে গিয়ে তাঁর (ট্রেভেলিয়ান) মনে আবার ধোঁকা লেগে গেছে। ইনি নিজে গ্রীক পৌরাণিক কথা নিয়ে নাটক লিখে থাকেন। আমার এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি সেই গ্রীক সাহিত্যের রস পান। আমাকে এণ্ডরুজ সাহেব বলেছিলেন মালিনী পড়ে তাঁর গ্রীক নাটকের কথা মনে পড়ে। (৪) চিঠির ভঙ্গী থেকে মনে হয় ট্রেভেলিয়নের আগেই এণ্ডরুজ এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরিচয় হবার দিন থেকেই তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা রসধারায় যে নিজেকে অভিভুক্ত করতে পেরেছিলেন তার অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলীতে।

এণ্ডরুজের সঙ্গে পরিচয় হবার অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধ আসন্ন হবার লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের মন এক অজানা পরিস্থিতির আশংকায় উদ্বেল। বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে যে যুগান্ত-চেতনার পূর্বাভাস তা এণ্ডরুজ যেমন করে অনুভব করেছিলেন, আর কেউ তেমন করে করেনি। Letters to friend গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির ভূমিকা

রচনা করতে গিয়ে তিনি এগুলির পশ্চাৎপট স্তম্ভর করে ফুটিয়েছেন। বলাকার ‘সর্বনেশে’ কবিতার সম্বন্ধে এগুরুজ লিখেছেন “যুদ্ধারম্ভের কয়েক দণ্ডাহ পূর্বেই এই আশ্চর্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে যে অকস্মাৎ ধ্বংসের প্লাবন নেমে আসছে তার পূর্বাভাস এতেই আমরা প্রথম পাই।...সেই সময়কার কথা বখন ভাবি ভয়ংকর যুদ্ধে পৃথিবীর জনসমাজ ক্ষতবিক্ষত ছিন্নবিচ্ছিন্ন তখন আমার নিশ্চিতই মনে হয় কবির অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে এই দারুণ সংকটের আবির্ভাব বহু পূর্বেই ছায়াপাত করেছিল।” (৫) ঐ পত্রাবলীর দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকায় এগুরুজ তিনটি কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের বৃত্তিটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল। সে তিনটি কবিতা হলো পাড়ি, (“এটি লেখার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন সেই নির্জন প্রাদ্বনে যে মেয়েটি ধূলার বসে অপেক্ষা করছে সেটি বেলজিয়ামেরই প্রতীক”) শঙ্খ, বাড়ের খেয়া। শেষ কবিতাটি সম্বন্ধে এগুরুজ বললেন, “এর দৃষ্টি যুদ্ধের পরবর্তীকালের দিকে। কারণ বিশ্বাসের যে প্রবল শক্তির প্রকাশ এ কবিতায়—তার প্রয়োজন তখনই যখন পুরাতন পৃথিবীর আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে নতুন সৃষ্টির উপকূলে, নবজীবনের অভিসারে প্রলয় পারাবার নির্ভয়ে পাড়ি দিতে হবে।” (৬)

এই যেমন এগুরুজের রচনায় তেমনি রবীন্দ্রনাথের এগুরুজকে লেখা চিঠির মধ্যে নানা কবিতার উল্লেখ দেখি ক্রমাগত। এই উল্লেখগুলি থেকে বুঝি কবিতার রসে যে পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে খুলে ধরছেন তিনিও কাব্য রসিক। এর যে কত উদাহরণ দেওয়া যায় তার ঠিক নেই। ইয়েটসের ইনিসফ্রা, শেলীর ‘ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড’ প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখেছেন। একাধিক চিঠিতে নিজের গান বা কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছেন। খুষ্টের জন্মদিনে কবিতা লিখে এগুরুজকে উপহার দিচ্ছেন।

কাজের চাপে যখন গানের রেশ মন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন এগুরুজের কাছে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মনের খেদ প্রকাশ করছেন। বাঁশি হাতে নিয়ে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে একদিন স্তব্ধ রচনার কাজে এসেছিলেন, খ্যাতির শাস্তি সেই হাতে স্থল মাষ্টারের দণ্ড ধরিয়ে দিয়েছে। বার বার তিনি বলেছেন সমাজসেবী, দার্শনিক প্রভৃতি পরিচয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই—“যে কবি নিজের আদর্শের কাছে খাঁটি থাকে সে পায় প্রেমের বরণ-মালা। কিন্তু যে কবি সংকর্মের পথে চলে যায়, তার ভাগ্যে ক্ষণিকের প্রশংসা ছাড়া কিছুই জোটে না।”—এই প্রসঙ্গেই কবিতা উদ্ধার করে বলেছেন “যবে কাজ করি প্রভু দেয় মোরে মান। যবে গান করি ভালবাসে ভগবান।” ২৯শে এপ্রিল ১৯২১ খ্রিসবুর্গ থেকে যে চিঠিটি (৭) রবীন্দ্রনাথ এগুরুজকে লেখেন তাতে নিজের মনের ভাব বোঝাতে কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নিজের কথায় বলতে চেয়েছেন যে কসল নিয়ে তো কোনদিনই চিন্তা ছিল না সমস্ত জীবনই ‘আমি কেবল স্বপন করেছি বপন আকাশে।’ এই সব কবিতাংশের উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় যে এর কোনটিই এগুরুজের অপরিচিত ছিল না।

এই সংখ্যা অনেক বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এবার অন্ত প্রসঙ্গে আসি। এগুরুজ ছিলেন মূলত মানব সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সারা পৃথিবী জুড়ে তাকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। তাঁর লেখা থেকে বহু উল্লেখ উদ্ধার করা যেতে পারে যাতে দেখা যাবে যে বিষন্ন মন যখন ক্রান্ত তখন

কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছে।

প্রথমবার যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছেন তখন কোন কোন ভদ্র পরিবারে দেখেছেন ইংরাজী গীতাঞ্জলি, ক্রিস্টে মুন বা শিশুর অলুবাড়। ডারবানে আর্কডিকম তার গৃহে নিয়ে গেলেন এণ্ডরুজকে। অপরিচিত এই গৃহে এণ্ডরুজ টেবিলের উপর আবিষ্কার করলেন ‘গীতাঞ্জলি’। (৮) মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে পরমাত্মায় মনে হল এণ্ডরুজের। নানা বক্তৃতায়, প্রার্থনা ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে লাগলেন। তাঁর নিজের এই ধারণাটা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তার বক্তৃতাগুলির ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে জনসমর্থন বাড়তে শুরু করলো (He himself felt that his lecture on Tagore in the Capetown City Hall, marked the turning of the tide of public opinion in favour of the Indian cause.) (৯)

ইতিপূর্বেই ১৯১৩ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের আলুকল্যে সিমলার রাজভবনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পটভূমি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন এণ্ডরুজ। সেই বোধহয় তাঁর প্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভাষণ।

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে এণ্ডরুজ দ্বিতীয়বারের জন্ম ফিজি যাত্রা করেন। সঙ্গে নিয়ে চললেন রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীয় ইংরাজী অলুবাড় Cycle of spring। এবারের যাত্রার শুধু চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের আন্দোলন করেই নয়, রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রচার করেও তিনি নানা জায়গায় কি রকম কাছে এসেছিলেন মাল্লেশ্বর তা তার একটি চিঠি থেকেই জানা যাবে;—সিডনির এক সভায় ফাল্গুনী নাটক পাঠের কি ফল হয়েছিল তা তাঁরই একটা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে :—

সিডনীতে প্রথমবার এটি পড়া হলো খুব ছোট একটি সমাবেশে; কিন্তু সে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দ্বিতীয়বার পাঠের জন্ম আমাদের অলুবাড় জানানো হলো। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে প্রথমে তা অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমার হয়েছিল; কিন্তু সম্মত হয়েছিলাম বলে এখন কি ভালই লাগছে। অনেক ভালো লোকের সমাবেশ হয়েছিল। আমার খুব মনে হচ্ছিল যদি আপনি নিজে উপস্থিত থেকে পাঠ করতেন এবং অপূর্ব ব্যঙ্গনা, আলোচ্যায়র খেলা এবং স্বরের সৃষ্টি আপনি ইংরাজী পাঠের সময় করেন, তা করতেন। আপনি তো জানেন এসব আমার কণ্ঠে ধরা দেয় না। ...অবশেষে যখন শেষ দৃশ্য এলো তখন আমি এত অভিভূত হয়ে পড়েছি যে তরুণদের গভীর দুঃখের ছুটি গান আমি পড়তেই পারছিলাম না...

গুরুদেব সে কী অপূর্ব; সবটা যখন পড়া হয়ে গেল তখন কী গভীর আনন্দ। মনে হোলো সে আপনারই জয়, আর তাইতেই তো আমার আনন্দ।...

তারা কি বলেছিল তার সব কথা আমি আপনাকে বলতে পারব না, তবু তার কিছু রয়েছে আমার স্মৃতিকে আঁকড়ে। চোখে ভাসছে কয়েকটি মুখ। সবচেয়ে বেশি করে যার কথা মনে পড়ছে তিনি এই শহরে একটি বড় হাসপাতালের মেট্রন—যাঁর ক্লান্ত অবসন্ন মুখকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল তাঁর চোখের গভীর আনন্দ দীপ্তি। অতি সাধারণ কথায় তিনি আমাকে বলেন তিনি কত অবসন্ন বোধ করছিলেন, হাসপাতালের পরিশ্রম তাঁর সাধারণ অতিরিক্ত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু আপনার নাটকটি শুনে তাঁর মনে হল তিনি মনের জোর পেলেন। তিনি আমাকে

জানালেন যে আপনার বইগুলি তাঁর অমূল্য সম্পদ, বিশেষ করে গীতাঞ্জলি।...

আরও একটি মুখ আমার মনে পড়ে। একজন খাকি পোশাক পরা সৈন্য, তার জামার হাতার রেডক্রস লাগানো। ইজিপ্টের রণক্ষেত্রে সে গিয়েছিল—আধাতে প্রায় পজু করে ফেলেছিল তাকে। আপনার বই সে পড়েছে, সঙ্গে রাখে সবসময়ে। খুব সামান্যই সে কথা বলল, কিন্তু যখন সে ধনুবাদ দিল তখন আমার হাতের উপর তার হাতের চাপ আমার মনে দাগ কেটে গেল।”

যে চিঠি থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করলাম তা আরও দীর্ঘ, আরও অনেক সুন্দর অংশ তাতে আছে। আর একটি চিঠিতে ঐ সময়েই ফিজি থেকে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে, “আপনার জন্মে ভালবাসা সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করি যখন আপনি পদ্মার উপর বোটে থাকেন। ঠিক তেমনি ভালবাসি যখন Stray-Birds-এর গানগুলি পড়ি।...ফাল্গুনীও Stray Birds-এর মধ্যেই আপনাকে একান্ত করে পাই, আপনার মধ্যে বা সর্বোত্তম তাকে সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করি।” (১১)

এমনি করে নিজের ভালো লেগেছে আর সেই ভাল লাগাকে অন্তরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এণ্ড রুজ। ১৯২৬ সালে যখন তিনি কেপটাউনে এন্টি-এসিয়াটিক বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত তখনও প্রকাশ্য সভায় তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা করে চলেছেন।

সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে রসগ্রহণের মৌলিক ক্ষমতা ছিল তাঁর, অন্ততর সমালোচক, যতই প্রবীণ আর প্রখ্যাত হোন, তাঁকে প্রভাবিত করতে পারতেন না, তার প্রমাণ আচার্য ব্রজেননাথ শীলের ‘রাজা’ নাটকের সমালোচনা। রাজা নাটকে মাহুশের হৃদয়অভিধাতের চেয়ে রূপকের প্রদ্ব বড় হয়েছে এ সমালোচনা এণ্ড রুজের একেবারেই মনঃপুত হয়নি। ১৯১৪ সালের ১৩ই নভেম্বর এণ্ড রুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন “Brajendra Babu’s criticism astounded me রাজা not human. Allegorical what next? Why! The charactor Of the queen so absorbed me that I could think of nothing else for days. It was a living soul going though an agony of conflict and entering at last in to peace, a soul so living that I knew her intimately and could almost speak with her.” (১২)

এ সমালোচনায় আত্মউদ্বেলতার ক্রটি আছে কিন্তু পাঠক লেখকের হৃদয় এমন এক নিবিড় বন্ধনে একাত্ম হয়েছে যে এর মূল্য ক্রটি সত্ত্বেও অস্বীকার করা যায় না।

নিজে রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে এণ্ড রুজ অনেক সময়েই নানা কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখতে বসলে তাঁর অন্তরের কবিও জেগে উঠতো। সূর্যোদয় দেখে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি অনুভব করেন অন্তরে, নিজের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের গান চিঠিতে পাঠান রবীন্দ্রনাথকে, কখনো বা নিজের ভরা-মন নিয়ে ফাল্গুনীর আলোচনা করেন, নিজের মাকে রবীন্দ্রনাথের crescent moon পাঠানো হয়নি বলে চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। (১৩)

সর্বশেষে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করি। বারবার এণ্ড রুজ বলেছেন যে জীবনে যে কাজেই গেছেন, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ থেকেই সবসময়েই—দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছেন (‘এক

দুর্ভোগের মুহূর্তে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে নিজেই আদর্শের দুঃসাহসিক যাত্রায় পাঠিয়েছিলেন), ফিজিদ্বীপে গেছেন (চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি যে নীতি বিগর্হিত আচরণ করা হত তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই দূরপ্রাচ্যে যাওয়া স্থগিত হওয়ায়, আমরা যখন ফিজি গিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত করতে চাইলাম, তৎক্ষণাৎ তিনি এতে আন্তরিক স্বীকৃতি দিলেন।...যাবার আগে তাই তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি আমাদের উগনিষদের দুটি শ্লোক উপহার দেন।) পাঞ্জাবে গেছেন (১৯১৯ সালে আপনি যখন আমাকে পাঞ্জাবে পাঠিয়েছিলেন, দেশের অবস্থা এখন প্রায় সে রকমই সঙ্গীন) সর্বত্রই গুরুদেবের আশীর্বাদ ছিল মাথায়। কিন্তু যেদিন এইরকম কোন প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ছিলনা সেদিনও তিনি কবির গান থেকে শক্তি পেয়েছেন। চাঁদপুরে যেদিন চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যে কলেরার মডক লেগেছে, যেদিন ট্রেন ষ্টীয়ার বন্ধ হয়ে তারা ঘরে ফিরতে পারছেননা সেদিন সমবেদনার মূর্ত প্রতীক হয়ে এগুরুজ তাদের মধ্যে ছিলেন; সেদিনকার কথা স্মরণ করে লিখেছেন। “would wish to state simply what an inspiration and a blessing during those days of suffering at chandpore the writings of the poet Rabindradath Tagore were to me.”

রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্য পাঠ প্রচার ও ব্যাখ্যা এগুরুজের জীবনের অত্যন্ত মহৎ কর্তব্য ছিল—কর্তব্য তিনি নিপুণভাবে পালন করে গেছেন।

প্রসঙ্গ-সূচী

- ১ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ৩য় ৪র্থ সংখ্যা। দীনবন্ধু এগুরুজ সংখ্যা।
- ২, ২, ১১, ১২, ১৩ Charles Freer Andrews—Sykes and Chaturvedi
- ৩ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ—সি. এফ. এগুরুজ। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। দীনবন্ধু এগুরুজ সংখ্যা।
- ৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা ২৬বর্ষ ৩য় সংখ্যা জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্র পত্রাবলী।
- ৫, ৬, ৭, ৮ রবীন্দ্র এগুরুজ পত্রাবলী-মলিনা রায় কৃত অঙ্কবাদ।
- (১০) ‘প্রিয়তম গুরুদেব’—রবীন্দ্র প্রসঙ্গ দীনবন্ধু এগুরুজ সংখ্যা।
- (১৪) Oppression of the poor. C. F. Andrews.

আত্মজিজ্ঞাসা

মানসী দাশগুপ্ত

আপনাকে জানার জন্য বিভিন্ন দর্শন এবং চিন্তাধারা এদেশে ওদেশে নির্দেশ দিয়েছে। আপনাকে জানাও—এ কথা ঠিক অমন করে কি কেউ বলেছে? বরং “আমাংরে না যেন করি প্রচার” বলে একটি তন্ময় সন্মম তৈরী করার চেষ্টাই সমাজে সমাজে নানাভাবে ও ভাষায় ছড়িয়েছে। তবু আত্মকথা লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে—দেশে দেশে, কালে কালে। কেননা, আপনাকে জানি আর না-ই জানি, নিজেকে নিয়ে কথা বলবার ইচ্ছে মানুষের শিখে নিতে হয় না, অশিক্ষিত সহজাত ও ইচ্ছেকে সামলানোই শক্ত। কাকে নিয়ে কথা বলছি না জেনে এই যে নির্বিচার ভাষণ, এই বলার গুণেই সত্তা তৈরী হয়ে ওঠে। কথার এই এক আশ্চর্য ভূমিকা আছে আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সমষ্টিজীবনেও। যে যেমন মানুষ সে তেমনি কথা বলে না বলে এমন কথা বলাই ভালো : যার যেমন কথা সে তেমনি মানুষ। কথার বাইরে, শব্দের অতীতে সে যে কী, তা তো আমরা জানিনে। আমরা জানি তাকে কথায়; হয় তার নিজের কথায় নয় তাকে নিয়ে অন্যের কথায়। এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কথা কোনো সত্তায় স্থিরে বাজে, কোথাও বেস্থিরে। কেউ এই কথা নিয়ে খেলে যান, কেউ কথার হাটে খেলনা হয়ে হারিয়ে যান। আমাদের কাজ কর্মকাণ্ড এই কথার মূর্তি প্রতিষ্ঠায়।

জাঁ-পল সার্ত তাঁর আত্মকাহিনীর নাম দিয়েছেন ‘কথা’ (১)। পড়া আর লেখার মাঝখানে কথার অসীম রাজত্বে তাঁর লেখকসত্তার পরগণা, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিস্তার। এই আশ্চর্য নির্মোহ কৌতুককঠিন নিভৃত আত্মকাহিনী পড়ে আমাদের কথার জাহ্নবীর রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’র কথা মনে পড়ে যায়। হয়তো কোনো কারণ আছে, হয়তো বা নেই। ‘কথা’ এবং ‘জীবনস্মৃতি’র অল্প কয়েকটি বাহ্যসাদৃশ্য আছে। দুইয়েই লেখক পরিণত বয়সে অর্থযশসমৃদ্ধির আপাত সময়েই নিশ্চিন্ততায় বসে আপন আপন বাল্যের দিকে চেয়ে জীবনপ্রদক্ষিণের কাহিনী ছকে নিচ্ছেন। কাহিনীর অথগুিত উপজীব্য অংশ উভয় ক্ষেত্রেই বাল্যে, অনতিযৌবনে শেষ। পরবর্তীকালের খণ্ডিত, সমঞ্জস উল্লেখ আছে এখানে ওখানে আত্মচিন্তার সূত্র ধরে। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই বাল্যকাহিনীকথা পরিণত বয়সের তত্ত্ববোধে জারিত। নিজের জীবনের মাত্র নয় কি দশ বছর পর্যন্ত কাহিনী পরিবেশন করেই ব্যক্তিত্বকে, জীবনবোধকে কী করে সুসম্পূর্ণ সামগ্রিকতায় প্রকাশ করে দেওয়া যায় তার সুন্দর সুন্দর নিদর্শন হলো ‘কথা’। ও দশ বছরে কেবল দশটি বছর মেলে না, মেলে সার্তকে—তাঁর চেতনা, বেদনা, যন্ত্রণা, কৌতুক—সর্বসমেত। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কিছু কিছু ঘটনাপারম্পর্ষের উল্লেখ আছে এবং কবির পরিণত জীবনদর্শনের দ্বারা সে ঘটনাপারম্পর্ষ সাবলীল, প্রবাহিত। পঁচিশ বছর সময় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল হলেও যে জীবনস্মৃতিতে আমরা স্মৃতিচিত্রশালার পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই তার বেশি কিছু পাইনে—তার কারণ অজ্ঞ।

দুই আত্মকাহিনী এবং নাথকের আপাতমিলের শেষ এইখানেই। যদিও দুজনেই ভিন্ন কারণে

জ্ঞানোন্মেষের প্রথম অধ্যায়ে নিঃসঙ্গ বালকের মতো কালপাত করেছেন, নিঃসঙ্গতার প্রতি তাঁদের মনোভাব অনেকটা পৃথক। সঙ্গ যারা দেয়, সেই অপর—যাতে বহির্জগত ও মানবিকজগত মিলে আছে—তার প্রতি প্রতিক্রিয়াও তাঁদের ভিন্ন। জঁ-পল এক সন্তান বলেই একা। রবীন্দ্রনাথের ভাইবোন আত্মপরিজনের ভিড় এত বেশি যে সে জনতায় হারিয়ে যেতে হয় বলেই তিনি একা। জঁ-পলের বাবা জীবন থেকে সরে গিয়ে তাঁর অল্পপস্থিতির মধ্যে এক ধরণের উপস্থিতির প্রভাব ছড়িয়েছেন ছেলের জীবনে। রবীন্দ্রনাথের বাবা উপস্থিত থেকেও অনধিগম্য, সঙ্গে থাকলেও তিনি যেন তাঁর উদাসীন বৃহৎ ব্যক্তিত্বের আড়ালে থাকেন। মায়েদের তফাত আরো বেশি। এই ভিন্নপ্রভ বালাই কি তাঁদের এমন ভিন্ন করে দিল যার জন্ম তাঁদের উভয়ের বাবা-মাকে দেখার এবং দেখবার ভাষা অন্য, ভাব অন্য, দৃষ্টি অন্য? তা ঠিক নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পার্থক্যেরও বড়ো যে ভিন্নতা এ দুই কথাকারকে ভিন্ন মেজাজ দিয়েছে তাকে বলা হয় কালের ভিন্নতা। সার্ব বড় কঠিনভাবে আধুনিক। আধুনিকতার যে সংজ্ঞা আমি “হলুদ সবুজ সাদা কালো”য় (সমকালীন, কাল্কট ১৩ঃ৬) অন্বেষণ করেছি সেই অর্থে সার্ভের অপ্রতিবিদ্যেয় আধুনিকতা তাঁর আত্মদর্শনে, আত্মজিজ্ঞাসায় নিত্য উপস্থিত। অর্থাৎ, সার্ব আত্মবিশ্লেষী, দ্বিধাবিভগ্ন, প্রত্যয় এবং স্বাতন্ত্র্যস্বী, ঐতিহ্যপ্রশ্নে একান্ত বিমূখ, সমকালীন অস্তিত্বের বিষয়তায় বিষম অথচ ঈষৎ কৌতুকাবিষ্ট। এই কৌতুকাবিষ্টতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও স্বভাবের ফলশ্রুতি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যে চিরকালীন শাস্তিতে সমাহিত। তাঁর সমকালীনতা তাঁর চৈতন্যকে স্পর্শ করেছে, প্রত্যয়ের মূলে নাড়া দেয়নি। চিরকালের সঙ্গে সমকালকে সমন্বিত করার চেষ্টা তাঁর সামাজিক ক্রিয়াকর্মে স্পষ্ট। তাঁর ভাষায় তাঁকে বর্ণনা করলে তিনি একেবারে “দেবতার মতো সহজ”। তাঁর কৌতুকবোধও দেবতার মতো ক্ষমাশীল, প্রশ্রয়স্বিক্ত। দুজনের এই বিষম বৈপরীত্যের জন্মই হয়তো ‘কথা’ ‘জীবনস্মৃতি’র রেশ বয়ে আনে।

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং লেখক হয়ে ওঠা ছাড়াও আরো যে কত কী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এ কথা আমরা সকলেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানি। তাঁর সে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের পটভূমিকা তাঁর পরিপার্শ্ব, পরিবার ইত্যাদির হিসেবে মেলানো যুক্ত নয়। কিন্তু কবি হওয়ার জন্ম তাঁর পারিপার্শ্বিক প্রভাব তো কোন অধিক উপজব করেনি, তবু তিনি কবি হতে গেলেন কেন? কবি হিসেবেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ুক, লেখাতেই চিরজীবী হয়ে থাকুন এমন চেষ্টা তাঁর এলো কেন? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ দেননি—আমাদেরও নয়, নিজেদেরও নয়। কবিতা যেন তাঁর স্বভাবে এসেছে—না এসে উপায় ছিল না বলেই। লেখার জন্ম যেন তাঁকে রাত্রি জাগতে হয়নি, কঠিন লড়াই বাধেনি তাঁর সঙ্গে তাঁর কথার আর তাঁর লেখনীর যেন সমস্তটাই মোলায়েম পেলব অমূলক,—তাঁর হাতপায়ের আঙ্গুলের মতো নিতান্তই তাঁর শোভন, বৃহৎ অবয়বের অঙ্গমাত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেমন তিনি জন্ম নিয়েছেন, তেমনি জীবনদেবতার ইচ্ছা তাঁর লেখনীতে কাব্য হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে—এমনিভাবে কথা তিনি কবিতায় কখনো কখনো বলেছেন। নিজেকে নিয়ে যেমন, নিজের লেখা নিয়েও তেমন কোনো এক কঠিন “কেন” রবীন্দ্রনাথকে জর্জরিত করেছে বলে টের পাওয়া যায়নি। এ সবের ভিতরে একটা কথা আছে—এমনিভাবে তাঁর ভাব। এবং কথা যখন আছে তখন সেটা ভাল কথাই,

কেননা থাকা মাত্রকেই ভাল বলে মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথ হাস্তমুখে সদা প্রস্তুত। এই সহজশোভন স্বাক্ষরিত অভ্যন্তর রবীন্দ্রনাথ “আপন হতে বাইরে” দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে কেমন লাগে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন ‘জীবনস্মৃতি’তে। জীবনের পটে যে ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল, তাঁর সেই নিজস্ব ছবিঘর থেকে সমস্ত আহৃত সর্ব সঞ্জিত চিত্রগুলি যে কত মধুর তা ‘জীবনস্মৃতি’ যে পড়েছে সে-ই জানে। প্রাচীন বটের মতোই কবি হারিয়ে যাওয়া ছোট ছেলেটির কথা স্নেহে সমস্ত মনে রেখেছিলেন, তার ছবি এঁকে দিলেন তাঁর “লেখক জীবনের ধারা” বয়ে। তিনি নিজে এ রচনার কৈফিয়ৎ হিসেবে বলেছেন, “সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে—দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি। ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্য রচনা ও জীবনরচনা ও দুটা একক বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে, আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।”

এ বক্তব্যে যে ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যার সমর্থন আমরা রবীন্দ্রনাথের বাক্য ব্যবহারে ব্যক্তিত্বের অন্ত নানা প্রকাশে বারবার পেয়েছি—তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথের জীবন যে ফুল ফুটিয়ে তুলেছে এবং সে ফুল যে কাব্য এই দুই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ও আত্মস্থ। তাঁর কবিসত্তা নিয়ে তাঁর কোনো বাহ্যিক বিনয়, প্রশ্ন অথবা সমস্যা নেই। বরং একটি স্বজনমূলভ স্নিগ্ধতা তাঁর অবিনয়কে ঘিরে রেখেছে। যেখানে সাহিত্য পূর্বপদচিহ্নহীন, অন্তত চিহ্নগুলি দূরদূরান্তবিস্তৃত, সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই সহজ আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশের বিশেষ মার্ধুর্য এবং মূল্য আছে। সে মূল্য ‘জীবনস্মৃতি’র কেন্দ্রে আছে। এই আত্মগৌরবাসিত স্বজনস্নেহময় কবির গৌরব আমাদেরও গর্বিত, স্বীকৃত করে। বাল্যের ভূত্বারাজতন্ত্র থেকে কালারূপময় মাতৃমঙ্গলের পর্ব পার হয়ে যথার্থ কাব্য রসরাজতন্ত্রের যে নিপুণ, সম্ভ্রান্ত চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত পটভূমিকা এই একটি স্বজনীপ্রতিভার প্রসারকে স্বকুমার সীমার ধরে রেখেছে যথার্থই একটি আঁকা ছবির মতো তা আমাদের স্পর্শ করে। বাংলাদেশের একটি যথার্থ সম্ভ্রান্ত জমিদার বাড়ির চালচিত্র আলো করে দাঁড়িয়েছেন আমাদের রবিঠাকুর, এক অপরূপ আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের ধারাবাহিক পর্যায়ের কিছুদূর স্মৃতিচিত্র মেলে ‘জীবনস্মৃতি’তে। সে সব স্মৃতিচিত্র “সাহিত্যের সামগ্রী”। ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অনাবশ্যক।” স্বচনায় এই সাবধানবাণী প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখতে বলেছেন, কিন্তু যা দেখতে চাচ্ছেন তা প্রকাশ “সাহিত্যের সামগ্রী”—এই কি এ কথার মানে? জীবন—গভীর, অন্তরঙ্গ নিভৃত জীবন, যা জীবনবৃত্তান্ত হিসেবে সম্পূর্ণ ও আবশ্যক বলে তাঁর মনে হতো তা তবে ‘জীবনস্মৃতি’ নয়। এ কথা রবীন্দ্রনাথ না বলে দিলে বুঝতে বিলম্ব ঘটায় কথা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যে বললেন তাতে বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে সম্পূর্ণ ও আবশ্যক জীবনবৃত্তান্ত হওয়া উচিত ছিল ভিন্ন কিছু, বিস্তৃততর কিছু। সে কিছু কী, তা অবশ্য বোঝা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ যে মন নিয়ে জীবনশিল্পচর্চা করেছেন তাতে এই-ই স্বাভাবিক। স্বয়ম্ আবরণের প্রয়োজন সেখানে এত বেশি যে, কোনো কারণেই অনাবৃত ব্যক্তিসত্তায় নিজেকে উপস্থিত করার

কথা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারতেন না। নিজের জীবনের যথার্থ মূল্যায়নের তাগিদেও নয়। ‘জীবনস্মৃতি’তে তাই স্মৃতির নিশানা মেলে, জীবনের নয়। এ কোনো গুহাচিত্র নয় যা অভ্যন্তর থেকে খাঁজে খাঁজে গড়ে উঠেছে। এ সুসজ্জিত ছবিগুলিতে তখনকার অনেক মানুষ আছে, তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতার প্রকাশ আছে, রবীন্দ্রনাথের নানাপ্রকারের চিন্তা ও চেষ্টার কথা আছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে সীমার ভিতরে অসীমের উপলব্ধির সূক্ষ্মা সবই আছে, সাজানো সুন্দর প্রদর্শনীর মতোই। কিন্তু কবিসত্তার কোনো অপপ্রকাশিত সত্যের চেহারা এখানে ছায়া ফেলেনি। নিজেকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বরং তিনি নিজেকে আরো আবৃত করেছেন। প্রেরণাই তাঁকে টেনেছে, ঠেলেছে এ কথাটাকে নানাভাবে বলা ছাড়া আর কোনো বক্তব্যই কোথাও স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। ফলে ‘জীবনস্মৃতি’তে আমরা যা পাই, জীবনী হিসাবে তার মূল্য অল্প।

স্মৃতিচারণের নাম করে প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন অল্প মানুষের আত্মকাহিনীতেও মেলে। প্রদর্শনীর আবরণ থাকা যেমন একদা প্রত্যাশিত ছিল অধুনা আবরণ উন্মোচন তেমনি বেড়ে চলেছে। সেজ্ঞা এগুলির অনেকটাই অনাবৃত। খুব ঝাঁঝালো আলোয় বসে শোবার ঘরের গল্প শোনার মতো বিসদৃশ অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে নানাপ্রকার স্বাদ মেলে সে সব কাহিনীতে। কিন্তু তাতে যথার্থ ঘনিষ্ঠতার স্পর্শ মেলে না। সম্পূর্ণ আবরণও যেমন মানুষকে আড়াল করে, রূঢ় নিরাবরণও তেমনি ভিন্ন পথে অন্তকে ঠেলে দেয় সরিয়ে দেয়। ‘কথা’ এমনই একটি সহজ আত্মগত আত্মভাষণ যা এমনিভাবে কোনো আড়াল খোঁজে না। অথচ ‘কথা’ নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য কীর্তি। এই অসাধ্যসাধনের জন্য সার্ব সমস্ত আগ্রহী জীবনীপাঠকের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন এতে সন্দেহ নেই।

‘কথা’ আমাদের বিনাসাবধানে একব্যাক্যে একেবারে সার্বের জীবনে টেনে নিয়ে যায় যেখানে তিনি নিজেকে নিয়ে নিজের হিসেব মিলিয়ে যাচ্ছেন; আমরা জানবার আগে, বুঝবার আগে তাঁর অকপট আত্মচিন্তার, আত্মস্বজনের সঙ্গী হই। কথার পরে কথায় তিনি জাঁ-পলকে গড়েন, প্রব্ধের পর প্রব্ধে তাকে বিদ্ধ করেন; এমনি তাঁর আত্মনিমগ্ন জীবনজিজ্ঞাসা, মনে হয় না যে তাঁর সম্মুখে আর কেউ আছে, কেউ দেখছে তিনি কী করছেন। তাঁর সমস্ত জবাবদিহি তাঁর নিজের কাছেই। আর তাই তো হওয়া উচিত। কেননা, “আমি মানতে পারিনি যে কোনো ব্যক্তিসত্তা বাইরে থেকে কারো জুটে যায় আর জ্যাডো সেটি রক্ষা পায় কিংবা পূর্বতন কোনো গতির প্রকাশ হয় আত্মার গতিতে। ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় জাত আমি, মুহূর্তে মুহূর্তে জন্মের প্রথম সম্পূর্ণ ঔজ্জল্যে ফিরে গিয়ে বারবার পুনর্জন্ম নিয়েছি। আমার হৃদয়ের অন্তঃস্বপ্নদানে আমি দ্যুতির ক্ষুরণ দেখতে চেয়েছি।” (Words p. 147. স্বঅনুদিত)

আত্মলব্ধ এ সত্তার এই নব নব উন্মেষে উদ্ভাসিত হতে চাওয়া জীবনের পথে তাঁর বিনাটিকিটের যাত্রীর মতো এমন কুণ্ঠা কেন? এর হিসেব কষেছেন সার্ব ‘কথা’য়। নিজের লেখক হয়ে ওঠাকে সার্ব কোনো অনিবার্য প্রেরণসম্প্রদাত ভবিতব্য বলে মানেন নি। ও কেবল তাঁর যাত্রার মাণ্ডল দেবার একরকম চলনসই বন্দোবস্ত। এই যে বই তৈরী করার যত্ন হয়েছে থাকতে হবে তাঁকে চিরকাল, এ ছাড়া যে তাঁর টিকিট কালেক্টরকে দেখানোর মতো কোনো ছাড়পত্র নেই

—এতে তিনি নিজের উপর নিজেই বীতশ্রদ্ধ। এই মাণ্ডল সংগ্রাহের জন্ত তাঁকে তাকাতে শিখতে হয়েছে, দেখতে শিখতে হয়েছে, কথা বেছে-ছেড়ে গড়ে নিতে শিখতে হয়েছে। যে লেখকের অস্তিত্বে আমরা পাঠকেরা লাভবান—তাঁর এই বিচিত্র স্বগতোক্তি এমন এক দৃশ্যপটে তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমাদের সন্মুখে উদ্ঘাটিত করে যেমনটি আর কারো লেখনীর দ্বারা সাধ্য হতো না। তাঁর ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বাল্যজীবন এ দুয়ের স্তর তিনি মেলাতে চেয়েছেন, ছেড়েছেন, ফের মিলিয়েছেন। তাঁর ফরাসী বাবা, যিনি ঠিকমত কটি বছর বাঁচতে পর্যন্ত শেখেন নি, অসময়ে মরে গিয়ে তাঁর জার্মান শ্বশুরকে রাগিয়ে রেখে গেছেন, তাঁর ছোট্ট মা, যাকে মায়ের চেয়ে দিদি ভাবাই সহজ ছিল জঁ-পলের পক্ষে, দাদু দিদিমা থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক, কিশোর বন্ধু, রোগ, শোক, মৃত্যু—সবাই, সব ঘটনাই প্রতিটি অক্ষরে মূর্তি ধরে এ কাহিনীর ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মধ্য দিয়ে জঁ-পল সার্ত—যিনি লেখক বলেই তাঁর স্বাক্ষর রাখবেন—তিনি নিজেকে নিজে গড়ে তুলেছেন, ভরে তুলেছেন বিধাতার মতো নির্ভুল লক্ষ্যে। আমরা পড়ছি আর জানছি যাই তিনি বলুন, যেমনি বলুন, তিনি কথাশিল্পী এতে সন্দেহ নেই। এর তুলনা নেই।

নিজের গৌরব এবং নিজের পরাভবের যে অসীম শক্তি আমাদের উপর চিরকাল নির্ভুল প্রভাব বিস্তার করে রাখে, যার হাত থেকে আমরা কেউ কখনোই ছাড়া পাইনে, বাল্যে তার প্রহার বড় বেশি বাজে। যখন কারো পক্ষেই কোনো মাণ্ডল দেওয়া সম্ভব নয়, যখন সমস্ত গৌরব এবং পরাভবের সমস্ত কার্যকারণ নিজেদের ক্ষমতার সম্পূর্ণই বাইরে, সেই অসহায় বাল্যকালের পরাভবের কাহিনীগুলি আমরা তাই সাধারণত হয় সত্যি ভুলে যাই নয়তো ভুলে থাকি। ওগুলি বলতে গেলে কিছু বাহ্যিক এসে যায়। সার্তের সার্থকতা তাঁর উজ্জ্বল পরাভবকাহিনী বর্ণনায়। চারিদিকে বয়স্ক জটিল মানুষের ভিতরে একটি গৌরবকাণ্ডাল ছোটোছেলের পরাভবের কী প্রচুর আয়োজন। সকলে মতামত দিতে পারে, জানে বোঝে, তার মাঝখানে একা জঁ-পল মানুষ সম্পর্কে দুয়ের কথা, খাবার দাবার নিয়েও মনস্ত্রি করতে না পেরে মরমে মরে যায়। “লুইসবুর্গের বাগানটা, ম্যাসিও সিমোনো, চেষ্টনাট গাছগুলো, কার্লেমামি সন্টার সত্তা আছে, শুধু আমি একটা কেউ না।” এ গল্প এবং এর চেয়ে অনেক যথার্থ পরাভবের কাহিনী বলতে গিয়ে বয়স্ক জঁ-পল না অনাবশ্যক আত্মদরদ দেখিয়েছেন, না করেছেন বাহ্যিক রসিকতা। একদা তাঁকে বড়ো বেশি আদর দেওয়া হয়েছিল। এতদিন ধরে তাঁকে ভাবতে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি ভগবানের আশীর্বাদ যার ফলে এ কথা সত্য নয় জেনেও আজও তিনি না ভেবে পারেন না যে বিশ্বস্ত সবাই যদি তাঁকে সেধে না ডাকে তাঁর জন্মটাই মিথ্যে হয়ে গেছে।

ঠিক এবং ভুলকে যখন ঠিক না ভুল জানার উপায় নেই তখন থেকে অভ্যস্ত বিশ্বাস এবং প্রত্যাশার পথ বেয়ে আমরা এমনি করে তৈরী হই, যা আবার ফিরে পুনরায় গড়ে না নিলে যা হতে পারত জীবনের পাথর তাই হয়ে ওঠে বোঝা। এই তৈরী হওয়ার, ফিরে ফিরে গড়ে ওঠার গল্পই তো জীবনের গল্প। নিজেকে নিয়ে সে গল্প অকপটে বলেছেন জঁ-পল সার্ত। কাউকে তিনি ভালো বলতে চান নি, মন্দও নয়। শুধু যে-যেমন, বিনাসঙ্কোচে, ঢাকাঢাকি না করে খুব সযত্ন বিস্তারে তার যথার্থ চেহারাটি দেখেছেন, দেখিয়েছেন তিনি। নিজেকে ঠিকমতো জানা খুব কঠিন,

পুষ্পপট

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

‘পুষ্পপট’—ফুল সাজান কাপড় বা ফুলতোলা কাপড় এবং ‘চিত্রবিয়ালী’—এই দুইটি কথা সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও ললিত বিস্তরে কয়েক যায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রাচীন বেশভূষায় ফুলতোলা কাপড়ের যে একটি মাহাত্ম্য ছিলো অজন্তা ও বাঘওহার ছবিগুলি একটু বিশ্লেষণের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায় (গ্রীকিতের অজন্তা)। শুধু তাই নয়, কাপড় কেটে, নানা জোড়াতাড়া দিয়ে সেলাই করা হতো এবং তাকে রাঙানো ও তার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করার প্রণালীও জানা ছিলো প্রাচীন ভারতে। বক-জাতকে দেখতে পাই জেতবনে এক ভিক্ষুর এইসব কাজে বিশেষ নৈপুণ্য ছিলো এবং সেইজন্তু অনেকে তাকে চীরব-বর্দ্ধক বলতো। তারপর তখনকার দিনে কাপড়ের থান বোঝাবার জন্য পালি শব্দ ‘শাটক’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে—শাট বা শাটক শব্দ ব্রহ্মধণ্ড বা কাপড়ের থান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হতো, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শাট বা শাটক ‘শাটা’ হয়ে গেলো এখন শাটীর অপভ্রংশ হলো সাড়ী। জীলোক বা ভিক্ষুদের জন্য এই শাটক পুষ্পরঞ্জে রঞ্জিত করার ব্যবস্থাও ছিলো। একবার বারানসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এক দুঃস্থ ব্যক্তির পত্নীর ইচ্ছা হলো কুসুম-পুষ্প-রঞ্জিত একখানি সাড়ী পরে কার্তিকোৎসব দেখতে যাবে এবং স্বামীকে ধরে বসলো যেকোন প্রকারে কুসুম ফুল সংগ্রহ করতেই হবে। জীর অনুরোধ অবহেলা করার সাধ্য পুরুষের কোথায়? বেচারী স্বামী জীর বার বার অনুরোধের চাপে রাজার কুসুম বাসন্তে রাজিতে ফুলচরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় ও পরে শূলবলে প্রাণ হারায় (পুষ্পরক্ত জাতক)।

প্রাচীন ভারতে ফুলতোলা কাপড়ের ব্যবহার মেগাস্থিনীসের বর্ণনাতেও পাওয়া যায় (ষ্ট্রুবো মেগাস্থিনীস)। এবং মনে হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও পুষ্পপটের ব্যবহার ছিলো। চন্দ্রগুপ্ত মোর্যের রাজসভায় ফুলতোলা কাপড় পরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আসতেন এবং সভাসদেরাও পরতেন। বাণের হর্ষচরিতেও ফুলতোলা কাপড় ব্যবহারের উল্লেখ আছে—(অঘনেন সতারাগ-গেনোপকুতেন দ্বিতীয়াঘরেন বিমলপর্যম্বোতেন নেত্রসুত্রনিবেশ শোভিনাধর বাসসা—হর্ষচরিত পৃ-৫৯—বহুবিশ্বকুশিষিত শোভিতাং পবন চলিততনুতরঙ্গাং অতি স্বচ্ছন্দ শুকাং পৃ-৩-১১৪)। প্রাচীন ভারতে ফুলতোলা কাপড় ও রঙ্গীন সাড়ী পরা বেশ প্রচলিত ছিলো এবং তখনকার দিনে সূচীকর্মের এই সূক্ষ্মশিল্পটি বেশ উন্নত স্তরে পৌঁছেছিলো। এখন প্রশ্ন হতে পারে এগুলো ছুঁচ দিয়ে ফুল তোলার কাজ না আজকালকার ছাপাসাড়ীর মত কাপড়ের ওপর থেকে নানা রকম ফুল লতাপাতা ছেপে দেওয়া হয়েছে। দশ থেকে বার শতাব্দীর মধ্যে ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যপূর্ণ খাজুরাহোর মূর্তি, মন্দির এবং বেশভূষায় যে পরিচয় পাওয়া যায় (ডাঃ বিজ্ঞাপ্রকাশ ও খাজুরাহো) তাতে মনে হয় কাপড়ে ফুল তোলার প্রথা ছিলো এবং এগুলো সূক্ষ্ম পাতলা কাপড়ের ওপর করা হতো। পরে মোগলযুগে এই সূচীকর্মকেই বলা হয় “জামদানী”।

এটা অবশ্য বলাকঠিন যে মোগল শিল্পীরা ভারতে এসে এই “জামদানী” শিল্পটি আয়ত্ত্ব করে কিংবা তাদের মধ্যেই এই শিল্পটি ছিলো। সে বহুদিনের কথা কে যে কাকে প্রভাবান্বিত করল এবং তার ঐতিহাসিক প্রমাণ কি—বলা শক্ত। “জামদানী” শব্দটি কিন্তু পারশুভাষা থেকে এসেছে (ঈষ্ট্র্যাসের ইংরাজী-পারশু অভিধানে ‘এই কথাটির অর্থ উল্লেখিত হয়েছে)। “জামদানী” শব্দের দ্বারা স্বক্ষতাের সাড়ী বুনবার সময় মাকু দিয়ে ফুলতোলা সাড়ীকেও বোঝায়। মোগলযুগে পুন্পপট্টের মধ্যে যেখানি সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান হতো সেখানি সস্ত্রাটের জন্ত সুরক্ষিত রাখা হতো এবং তাঁতীদের এই জামদানী শিল্পটি মোগল সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ধীরে ধীরে এই শিল্পটি প্রসারতা লাভ করে বাংলা দেশে ঢাকার ও নদীয়ার, মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়াতে, এবং উত্তর প্রদেশে টাণ্ডা, জায়েস ও বেনারসে—উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চলকে বলা হতো “আউধ”। এই জায়গাগুলি ছাড়া উত্তর প্রদেশের আরও অচ্যুত জেলায় যেমন ফায়জাবাদের টাণ্ডায়, বারাবাঙ্কীর নবাবগঞ্জে, সীতাপুরের বিষ্ণুয়ারী, খেরী ও হরদোইতে পুন্পপট্টের কাজ পুরোদস্তুর চলতে থাকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। টাণ্ডার জামদানীর কাজ প্রথম প্রসারতা লাভ করে আউধের নবাব সাদৎ আলী খাঁর সময় (খৃঃ পূঃ ১৭৯৮—১৮১৪)।

জায়েসে (বায়বেরলীতে এক তাঁতী থাকতো, নাম ছিলো তার ভিখা। নামটা দারিদ্র্যের সাথে এতো ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে মনে হয় বাবা—মা’ই তার নাম রেখেছিলেন ভিখা নয়, লোকের তাকে “ভিখা” বলেই ডাকতো। ভিখা অত্যন্ত গরীব এবং বড় দুঃখী ছিলো। দারিদ্র্য দূর করবার জন্ত ভাগ্য্যেষী যুবক ভাবতে বসলো কিভাবে নিজের অবস্থার একটু পরিবর্তন করা যায়। হাতের কাজে সে ছিলো অদ্বিতীয়। মাল্লের মনই উদ্ভাবনী শক্তির আকর। আজ পর্যন্ত বত কিছু এই জগতে মাল্লের সৃষ্টি ক’রেছে সবই তার মনের খেলা। এই নিজের মনের মধ্যে প্রবেশ করার বৃত্তি আমাদের দেশে ক’মে আসছে এখন আমরা “ডুব দেবো মন কালী ব’লে” রামপ্রসাদী গানটির রেকর্ড শুনেই ক্ষান্ত। ভিখা নিজের মনের মধ্যে ডুব দিলো। ভাবলো যদি নবাবের জন্ত মাথার পাগড়ী ও “কুর্তী”তে (পাঞ্জাবি) সুন্দর ফুলতোলা কিছু একটা বানিয়ে ভেট দিতে পারে হয়তো কিছু মোটা রকমের “ইনাম”—পুরস্কার পেয়ে যাবে। জায়েসে অত্র তাঁতীরাও ছিলো কিন্তু কই তাদের মাথায় তো এই সামান্য জিনিষটা আসেনি। মন-প্রাণ দিয়ে ভিখা তৈরী করলো একজোড়া “পাগড়ী” ও একজোড়া “কুর্তী”, লিখলো তাতে ধর্মের বাণী, কুসুমিত ও পল্লবিত করলো যথা সম্ভব “পাগড়ী” ও “কুর্তীর” কাপড়টাকে। তারপর আউধের নবাব আসফ উদ্দৌলাকে একজোড়া ও অচ্যুত হায়দ্রাবাদের নিজাম সিকন্দর জাঁহাকে ভেট চড়িয়ে এলো। তাঁরা খুসী হয়ে ভিখাকে বহু জমি ও “অসফী” দিলেন। ভিখার অবস্থার পরিবর্তন হলো এবং দুঃখও ঘুচলো। ভিখা কিন্তু জাভ ব্যবসা ছাড়লো না। পরে তারই বংশের মদর বক্স এই জামদানী ও চিকনের ব্যবসা চালিয়ে আসে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার এক প্রদর্শনীতে মদর বক্সের খুব নাম হয় ও অনেক পুরস্কার পায় (আউধ জামদানী—মিঃ এম. সী. পাণ্ডে)।

জামদানী ও চিকনের কাজ যখন সারা উত্তর ভারতে প্রসারতা লাভ করে এবং আউধের শিল্পীরা একের পর এক বিভিন্ন অঞ্চলে এই স্বক্ষ শিল্পের কেন্দ্রগুলি গ’ড়ে তোলে সে সময় “মসলিন”

বা “তনজ্জের” যে ফুল তোলাই হতো তা নয় চুণী, পাম্মা প্রভৃতি মূল্যবান পাথরও বসান হতো এবং কোরাণ শরীফের পারা (প্লোক) কিম্বা বেদের সূত্রও লেখা হতো। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে এই স্ক্রল কারুশিল্পটি মুসলমান আক্রমণের পূর্বেও ভারতবাসীর কাছে ছিলো কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে এই শিল্পে রত ছিলো কাজেই বেদমন্ত্রও কাপড়ের ওপর লেখা পাওয়া গেছে। যখন চুণী, পাম্মা বসান কাপড় তৈরী করা হতো তখন সেই কাপড়খানির নামকরণ করা হতো চুণী পাম্মার সংখ্যা গুণে এবং রকমারি পাথরগুলির নামে—যেমন “পাম্মা হাজারা”—অর্থাৎ জামাদানীর কাজের ওপর এক হাজার “পাম্মা” বসানো আছে। লতার কাজ বেশী থাকলে তাকে বলা হতো “খাড়াবেল” (বেল মানে লতা), “চমেলী বুটি”, “গুলদাউদী” (ক্রীসেনথিমস), “গেন্দা বুটি”, “বেল পতরী বুটি”, “তারাবুটি”, “জালীদার বুটি”, “অসফী বুটি”, “গুলদস্তা বুটি” এবং তাজদার বুটি। এই হোল মোটামুটি পুষ্পপট্টের ইতিহাস।

অতি পুরাতন কাল থেকে চলে আসছে এই পুষ্পপট্টের ব্যবহার। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে ফুলতোলা কাপড় মানুষের বেশভূষায়। আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রভাবে এই প্রাচীন কারু শিল্পটি আজ মরণোন্মুখ—এখন যন্ত্রের দ্বারা ফুল তোলা হয়। বাড়ীতে অভিভাবকগণও পছন্দ করেন না ছেলেমেয়েরা কাপড়ের ওপর ফুল তুলতে শিখুক, পাছে তাদের দৃষ্টি শক্তির অনিষ্ট ঘটে।

‘পরধনে লোভে মত্ত’ রাম শর্মা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৬ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের রামলোচন ঘোষের কুখ্যাতি ছিল মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান হিসেবে। ওয়ারেন হেস্টিংসের পত্নী সেকালের কলকাতার মক্ষিকারানী। মিসেসের চুলের বাধুনী—গাউনের রুল ইত্যাদি ছিল সেকালের মেয়েদের চোখে লেটেস্ট ক্যাশান। মাদাম ইমফফ্‌ই পরে মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংস হয়েছিলেন রামলোচন ঘোষের দোতোয়। রামলোচন যুগ্ম বাজিয়ে ইমফফের অন্তপুরে নারীবেশে প্রবেশ করেছিলেন। মৃত্যুর মালা দিয়ে বউনি হয়েছিল। যে সব কথা প্রমথনাথ মল্লিক মশায়ের ‘কলিকাতার কথা’য় লেখা আছে। মিসেস হেস্টিংস হবার পর মিসেস তখন রামলোচনকেই তার ব্যক্তিগত ব্যবসার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। রামলোচন মিসেসকে বাংলাও শেখাতেন। এদিকে বুদ্ধিমতী মিসেস হেস্টিংস তখন ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসেবে সেকালের কলকাতার সবচেয়ে বড় রেইক্রেট হারমনিজ টার্জান প্রতিষ্ঠা করলেন। লালবাজারের এই রেইক্রেট তখন সাহেব মেয়েদের কফি হাউস। রামলোচন তারই ব্যবস্থাপক। এই টার্জানের বিবিধ বিকৃতি (মিসেস হেস্টিংস সহ) স্থান পেতে লাগল পাগলা সাংবাদিক হিকির সাপ্তাহিক গেজেটে। সে অজ্ঞ কথা। রামলোচন কপাল ফিরিয়ে নিল এই দেওয়ানগিরিতেই—পাথুরিয়াঘাটা ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠা হল এইভাবেই।

রামলোচনের বড়ভাই দেওয়ান রামপ্রসাদের চতুর্থপুরুষ হলেন নবকৃষ্ণ ঘোষ। ১৮৩৭ সালের ২২শে আগষ্ট তার জন্ম—মামার বাড়ীতে—হাটখোলা দত্তবাড়ীতে। আত্মারাম দত্ত নবকৃষ্ণের মায়ের দাছ। নবকৃষ্ণের ঠাকুরদা রামচন্দ্র ছিলেন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কার। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু ধনী ‘বাবু’ নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করার দায়িত্ব না নিয়ে উদ্যোগী বিদেশী পুরুষদের চড়া স্বদে টাকা ধার দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের উত্তর পুরুষ মথুর সেনও ছিলেন এই ধরনের খ্যাতনামা ‘পোন্ধার’ বা ব্যাঙ্কার’। ব্যাঙ্কাররা এই টাকা অল্প স্বদে সংগ্রহ করেন বিভিন্নজনের কাছ থেকে। অর্থাৎ টাকাটা তাদের নিজেদের নয়—সম্ভবত এ থেকেই কথা এসেছে ‘পরের ধনে পোন্ধারি’। পূর্ববর্ণিত মথুর সেনের বাসস্থান ছিল হাটখোলা দত্ত বাড়িরই পাশের গলিতে। গলিতে তার বাগানবাড়িও ছিল, তাই গলির নাম ‘মথুর সেন গার্ডেন লেন’। বন্ধুকে চিঠি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন মথুর সেনের কুঞ্জ পথ।

রামচন্দ্রের পুত্র কৈলাসচন্দ্রকে সেকালের শেরবর্ণ জুলে ভর্তি করা হয়। শেরবর্ণ জুলের খ্যাতি সেকালে প্রচণ্ড। বিশেষতঃ ধনী ‘বাবু’দের পুত্রদের এখানেই ভর্তি করা হত ইংরেজী শিখতে। সমসাময়িক সাহিত্যেও এই জুগটির উল্লেখ আছে। সবচেয়ে সরস বর্ণনা পাব আলালের ঘরে দুলাল উপাখ্যানে। কৈলাস খ্যাতনামা ব্যবসায়ী হলেও ভাল ছবি আঁকতে পারতেন এবং গান-বাজনাতেও আকর্ষণ ছিল। প্রথম জীবনের ব্যবসায় আর্থিক সাফল্য পেলেও কৈলাসের ভাগ্য পরে ঘুরে যায়। তিনি তখন ব্যবসা গুটিয়ে বেমফ্রি বর্জেন অফিসে বড়বাবুর পোটে চাকরিতে

যোগদান করেন।

কৈলাসচন্দ্রের প্রথম সন্তান, কন্যা যৌবনেই মারা যান। তারপর নবকৃষ্ণ ও সবশেষে ভক্তকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণ তিন বছর বয়সেই বাংলা অক্ষর পরিচয় সেরে নেন, কিছুপরেই সেকালের একমাত্র বাংলা টেকসট বই ‘শিষ্টবোধ’ও নবকৃষ্ণের পড়া হয়ে যায়। কিন্তু সেকালে ধনী বংশের নাতি নবকৃষ্ণের পক্ষে বেশিদিন লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। দাদুর আদুরে নবকৃষ্ণ ‘আলালের ঘরে তুলাল’ হয়ে পড়ে। অবাধ্য একগুঁয়ে নবকৃষ্ণের আর লেখাপড়ায় মন নেই। তবু যুগের রীতি অনুযায়ী তাকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করা হল। ১৮২৯ সালের ১লা মার্চ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় গরানহাটা প্লাট। গোরানহাটা বসাকের বাড়ি। দরিদ্র গৌরমোহন আচ্যের লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও তা সফল হয়নি। গৌর আচ্যই এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবন বসাকের কাছারিবাড়িতে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে এ বাড়িতে কিছুদিনের জন্য ছিল হিন্দু স্কুল। পটলভাঙ্গায় হিন্দুস্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরী হবার পর এ বাড়ি থেকে হিন্দু স্কুল উঠে যায় নতুন বাড়িতে। গৌর আচ্য তখন এখানে প্রতিষ্ঠা করেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচ বছর বয়সে ‘কাম্মার জোরে’ এই স্কুলেই ভর্তি হন। গৌর আচ্য এই স্কুলের জন্যই শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে মেদিনীপুরে নৌকাডুবিতে মারা যান।

সে যাক, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হবার পর নবকৃষ্ণকে ইংরেজীতে মাষ্টারমশাই পামার খুবই ভালবাসতেন। নবকৃষ্ণ পোপের কবিতা এত সুন্দর ব্যাখ্যা করতেন যে পামার তাকে ‘ফুদে পোপ’ বলেই ডাকতেন। ছ’ বছর বয়সে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে টাউন হলে নবকৃষ্ণ পোপের কবিতা ‘A dying christian to his soul’ আবৃত্তি করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নবকৃষ্ণকে আবৃত্তি শেখান। কিন্তু নবকৃষ্ণের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি। তের বছর বয়সে চতুর্থ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় নবকৃষ্ণ ভালভাবেই পাশ করে। এমনকি পরীক্ষার খাতা দেখে পরীক্ষক বোর্ডের সেক্রেটারী Dr Muat নবকৃষ্ণকে হাওড়া স্কুলের হেডমাষ্টার করে দিতে চান। কিন্তু নবকৃষ্ণের বয়স কম বলে তার বন্ধুরা বারণ করেন। স্কুলে থাকতেই নবকৃষ্ণ শিক্ষক পামার ক্লাক প্যাট্রিকদের উৎসাহে ইংরেজি গল্প গল্প লিখতেন। প্রকাশার্থ পাঠাতেন হরকরা ও সিটিজেন পত্রিকাতে। পামার সাহেব বলতেন, ‘নবীন (নবকৃষ্ণকে ঐ নামেই ডাকতেন) ইংরেজদের মতই ইংরেজী লিখবে।’

এরপর নবকৃষ্ণ কিছুদিন আইন পড়তে গেলেন। কিন্তু মনে লাগল না। ছেড়ে দিয়ে সরকারী চাকরিতে ঢুকলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি মিলিটারি এ. জি. অফিসে ইনটারভিউ দিতে গেলেন—হাতে একটি রচনা। সঙ্গে সঙ্গেই হল মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি।

ধনী নবকৃষ্ণের পক্ষে নিয়মিত চাকরি করা সম্ভব নয়। ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে তিনি কোর্ট উইলিয়ামের ব্যারাক মাষ্টার অফিসে চাকরি পান। ১৮৬০ সালে অর্ডনান্স ফ্যাকটারির ইনস্পেক্টর জেনারেল অফিসে মাসিক দেড়শ টাকা বেতনে দেশি বড়বাবুর পদে চাকরি পেলেন। ১৮৬৪ সালে ওখানে তিনি হেড এ্যাকউন্ট্যান্ট হলেন—মাইনে মাসে চারশ টাকা। ১৮৬৬ সালে তিনি হেড এ্যাকউন্ট্যান্ট জেনারেলের সহকারী পদে উন্নীত হন।

দশবছর আগেই নবকৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল। একটি ছেলে ও মেয়ে হবার পর তেইশ বছর বয়সে তার পত্নী মারা যান। পঁচিশ বছর বয়সে নবকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিবাহ হয় উমাচরণ মিত্রের দ্বিতীয় কন্যার সঙ্গে। এই বিবাহে নবকৃষ্ণের ছয় কন্যা ও চার পুত্র।

১৮৭১ সালে লিওনার্ডের মৃত্যু হয়। এই সময় নবকৃষ্ণ এ. জি. অফিসে স্ক্রিপারিটেণ্টে। কিন্তু মাস ছাঁটাইয়ের আদেশ তিনি সমর্থন করতে পারেননি বলে মতান্তর হয়। লিওনার্ডের পদে নতুন লোক এলেন ক্যাপটেন কাউপার। তিনি নবকৃষ্ণকে মাসিক সাতশো টাকা মাইনেতে বোম্বাইয়ে বদলি করে দিতে চান। কিন্তু নবকৃষ্ণ নারাজ হন। এরপর ক্যাপটেনের অমৌজ্ঞে নবকৃষ্ণ পদত্যাগ করেন। বহু অহুরোধেও নবকৃষ্ণ পদত্যাগ প্রত্যাখ্যান করেন নি। ১৮৭৮ সালে নবকৃষ্ণকে পেনসন দেওয়া হয়।

উপার্জনের আরও অনেক সূত্র নবকৃষ্ণ পেয়েছিলেন কিন্তু নেন নি। নবকৃষ্ণ মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রদত্ত হিন্দু পেট্রিট পত্রিকার সম্পাদক পদ প্রত্যাখ্যান করেন। কলকাতার এক বিপুল ধনী নবকৃষ্ণকে তার সম্পত্তির ম্যানেজার করতে চান মাসিক এক হাজার টাকা মাইনের কিন্তু নবকৃষ্ণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বর্দ্ধমানের রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর যখন নাবালক ছিলেন তখন তাঁর ‘রাজা’ হবার ব্যাপারে নবকৃষ্ণ তাকে সাহায্য করেন। নতুন রাজা হয়ে বনবিহারী নবকৃষ্ণের বড় জামাই বর্দ্ধমানের সরকারী উকীল সত্যকিন্দ্র সেনের মাধ্যমে প্রস্তাব করেন যে তাঁর নবকৃষ্ণকে নতুন রাজার অভিভাবক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করতে চান মাসিক পাঁচশো টাকা মাইনেয়—নবকৃষ্ণ রাজি না হওয়ায় রাজা তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষাও করেছিলেন। তারপর অবশেষে রামনারায়ণ দত্তকে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়। নবকৃষ্ণের বন্ধুরা নবকৃষ্ণকে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচনের ক্যানভাসিং তাঁর আদর্শ বিরুদ্ধ বলে, না করায় নবকৃষ্ণ নির্বাচনে পরাজিত হন।

১৮৬৮ সালে নবকৃষ্ণের পিতা ১১০নং বেনেটোলা স্ট্রীটে নতুন বাড়ীর জন্ম জমি কিনেন। এরপর নতুন বাড়ি করে ওরা উঠে আসেন। এই সময় নাগাদ নবকৃষ্ণের পিতা মারা যায়। কিন্তু নবকৃষ্ণ একাই একাদ্বর্তী সংসার চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি বাড়ির চোদ্দটি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন—এর মধ্যে সাতটি তার মেয়ে সাতটি ভাইঝি।

নবকৃষ্ণের মা ছিলেন তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। ধনী হাটখোলা দত্তবাড়ির মেয়ে হিসেবে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু নবকৃষ্ণ মাকে এসব কিছু দাবি করতে দেন নি। নবকৃষ্ণের বড় ছেলেও মামার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে কিছু পেয়েছিলেন কিন্তু নবকৃষ্ণ ছেলেকে তা নিতে দেন নি। নবকৃষ্ণ একবার খেলাতচন্দ্র ঘোষকে একটি পুত্র দত্তক দেবার প্রতিক্ষণিত দেন। কিন্তু কার্যত তা তিনি পারেন নি—পুত্রস্নেহ তাকে বাধা দিয়েছে।

নবকৃষ্ণ অবসর গ্রহণের পর সাহিত্য সাধনায় বেশি মন দিলেন। গড়ে তিনি যা লিখেছেন তা অধিকাংশ ইংলিসম্যান, শত্ৰু মুখার্জির রইস ও রায়ত পত্রিকায়, নরেন সেনের ইণ্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত হয়। গ্রেটসম্যানের রবার্ট নাইট নবকৃষ্ণকে তার পত্রিকায় যোগদান করানর বড় ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদাহরণে নবকৃষ্ণকে হিন্দু

প্যাট্রিয়টের সম্পাদক করতে চান। কিন্তু জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী পত্রিকার সম্পাদক হবার কথা নবকৃষ্ণ ঘুণায় প্রত্যাখ্যান করেন।

নবকৃষ্ণের লেখা সংবাদপত্রে পড়বার জ্ঞান পাঠক উদগ্রীব থাকত। উড়িষ্যার ছুঁভিক্ষ নিয়ে লেখা তার এক প্রবন্ধ থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানী ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে প্রকাশ করে। সলস্বেব্রিস মাকুইসের নজরে এই প্রবন্ধ আসায় তিনি তৎক্ষণাৎ উড়িষ্যার জ্ঞান সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। মুখার্জির ম্যাগাজিনে রইস ও রায়তে তার প্রবন্ধ অনেকেই পড়তেন। শত্ৰুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার যখন ত্রিপুরায় যান রইস ও রায়ত পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব কয়েক মাসের জ্ঞান নবকৃষ্ণের ঘাড়ে পড়ে।

১৮৬৮ সালে নবকৃষ্ণ জ্যোতিষ বিজ্ঞান আকৃষ্ট হন। এ সময় তাঁর জীবনে দুর্ঘটনার মিছিল। তিনি জ্যোতিষ বিজ্ঞান তার পড়াশোনা নিয়ে লিখলেন ‘জ্যোতিষ প্রকাশ’।

তবু নবকৃষ্ণ কবি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা ১৮৭৫ সালে যুবরাজের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে। এই ভ্রমণ কলকাতার সমাজ সংস্কৃতিতে বিরাট ছাপ ফেলেছিল। যুবরাজ ভারতীয় ‘জেনানা’ দেখবার জ্ঞান সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বকুলতলার অন্তঃপুরে উপস্থিত হন। মেয়েটা শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে যুবরাজকে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য এই বিতর্কিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন বাজিয়াং কাব্য। গ্রেট ব্রাশনাল থিয়েটার কোম্পানীর ডিরেক্টর অভিনেতা উপেন্দ্রনাথ দাস লিখলেন প্রহসন ‘জগদানন্দ ও যুবরাজ’। সরকার আপত্তি করলেন। প্রহসন নাম পাগটে হল “হুম্মান চরিত্র”। তবু বন্ধ হল না। এরপর ‘নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল’ পাশ করলেন সরকার। অর্থাৎ বিলটির সঙ্গে জড়িয়ে গেল এই ছোট্ট ঘটনাটা।

কিন্তু এই একটি ঘটনার রাজ্য অনুগত নবকৃষ্ণ ঘোষ কবিতা লিখলেন যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানিয়ে। কিন্তু নবকৃষ্ণ স্বভাবে ছিলেন কবি অন্তমনা। জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি নিরামিষ আহার করেছেন স্বল্প স্বাস্থ্যে। তিনি ছিলেন শান্তির উপাসক এজ্ঞাই জী পুত্রের ভবিষ্যৎ, রচনার পাণ্ডুলিপি কোনদিকেই নজর দেন নি। ধর্মবোধ ক্রমশঃ নবকৃষ্ণের মন ছেয়ে ফেলে। রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাকা গোবিন্দচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নবকৃষ্ণের মনে আধ্যাত্মিক ভাবনা রোপন করেন। যদিও তাদের বয়সের ফারাক ছিল খুব, কবি যখন কিশোর গোবিন্দবাবু মধ্যবয়স্ক প্রৌঢ়, তবু তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

নবকৃষ্ণ শেষজীবনে আর্থিক কষ্ট পেয়েছিলেন। মাত্র একশ ত্রিশ টাকা মাসিক পেনসনে তার সংসার চলত। এই টাকা থেকেও তিনি দরিদ্রদেরও দান করতেন। দু’ টাকার খেলনা কিনে শিশুদের দান করতেন। এইভাবে নবকৃষ্ণ দরিদ্র হয়ে পড়েন। গৃহবধূর মূল্যবান অলঙ্কারগুলো বিক্রি হয়ে যেতে থাকে।

১৯১৮ সালের ১লা মার্চ সকাল ৭-৪৫ মিনিটে গঙ্গাতীরে পুত্রকন্যা নাতি নাতিনি পরিবৃত্ত হয়ে নবকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯১৯ সালের ১লা জাহুয়ারি কবি নবকৃষ্ণের ইংরেজি কবিতাগুলো সংকলন করেন দেবেন্দ্রচন্দ্র

মল্লিক। ভূমিকায় তিনি ইংরেজিতে কবির জীবনী প্রকাশ করেন। নবকৃষ্ণ ইংরেজ রাজত্বের বশব্দ ছিলেন যুগোপযোগী হয়ে। লর্ড ক্যানিং থেকে কার্জন পর্যন্ত সব ভাইসরয়ের রাজত্বকে তিনি কবিতায় সংবর্ধনা জানিয়েছেন। যুবরাজ আলবার্টের শুভাগমন উপলক্ষে নবকৃষ্ণ যে কবিতা লিখেছিলেন তারই ছাপান ছ' কপি রাণী ভিক্টোরিয়াকে পাঠান স্বয়ং আলবার্ট—কারণ তাঁর ধারণা ছিল, “রাণী হিন্দু কবির রাজ আভুগত্যের এত স্নন্দর প্রকাশ নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।”

কিন্তু তাই বলে নবকৃষ্ণ উপযুক্ত ক্ষেত্রে শাসনের বিকার বিকৃতিতে প্রতিবাদ জানাতেও ভোলেন নি। তিনি গ্রেস এ্যাক্ট, মিউনিসিপ্যালিটি বিল, সম্মতি আইন, জুরী প্রথা উচ্ছেদ, বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

কবি নবকৃষ্ণের ছদ্মনাম ছিল রামশর্মা। দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেছেন উত্তর কলকাতার ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে জন্মেও কবি প্রকৃতির প্রেমিক ছিলেন। এ ব্যাপারে মল্লিকমশায় রামশর্মাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ সম্বন্ধে একটি টুকরো স্মৃতির কথাও মল্লিকমশায় বলেছেন। কোন উপস্থাসিক নাকি জানালার ফাঁকে পাপিয়া ডাকে বলেছেন—কিন্তু পাপিয়া ডাকে অদৃষ্ট কোন স্থান থেকে। নবকৃষ্ণ এই অনভিজ্ঞের রচনা পড়ে হেসেছিলেন।

রামশর্মা ছিলেন moody কবি। যখন মুড থাকত না কিছুই লিখতেন না, আর মুড এলে অনর্গল লিখতেন। বলা হয় রাজারা গর্বিত কিন্তু নবকৃষ্ণ রাজার চেয়ে বেশি গর্বিত ছিলেন। নবকৃষ্ণ ছিলেন পুরনো স্কুলের। কিন্তু তার বিলিতি বন্ধুও কম ছিল না। বাঙালী বন্ধু বলতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, নরেন্দ্রনাথ সেন ইত্যাদি অনেককেই বোঝাত।

কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা দুটির নাম শিবরাত্রি ও ভগবদ্ গীতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রচনা। ১৯০৩ সালে গ্লাসগো থেকে প্রকাশিত ধর্ম ও সামাজিক প্রগতি সংক্রান্ত পত্রিকা Saint Andrew পত্রিকার সমালোচক বলেছিলেন ‘হিন্দু কবিদের অন্ততম রামশর্মা বাংলার মন্দির ও তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে বেড়ান—উত্তপ্ত সূর্য আর নির্মেষ আকাশের নীচে।’ মল্লিকমশায় বলেছেন শিবরাত্রি ও ভগবদ্ গীতা কবিতা দুটি এডউইন আরনল্ডের লাইট অব এশিয়ার সমতুল্য। বিশেষ করে ভগবদ্ গীতা কবিতাটি তো বটেই।

রামশর্মার কবিতাগুলোর গুরুত্ব অতীত দিয়েও আছে। যেহেতু পত্রপত্রিকায় প্রকাশার্থ, তাই প্রায় সব কবিতাই সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবলম্বনে রচিত। বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বহু সামাজিক ঘটনার ছাপ এখানে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সব মহাপুরুষের মৃত্যু উপলক্ষেই সংবাদপত্রের জ্ঞান নবকৃষ্ণকে ইংরেজি কবিতা রচনা করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন ইত্যাদির পরলোক গমন উপলক্ষে বহু কবিতা ছাড়াও ১৮৭৪ সাল নাগাদ সমাজে আলোড়নকারী ঘটনা তারেকেশ্বরের মোহান্ত এলোবেশী নবীনের ঘটনা অবলম্বনেও নবকৃষ্ণকে ইংরেজি কবিতা লিখতে হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বলবাতার সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব জানতে গেলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নবকৃষ্ণের ইংরেজি কবিতা পড়তে হবেই।

দুর্লভ এক খেলায় আমি। শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ।
কলকাতা-১২। তিন টাকা।

ইদানিং নানা পত্র পত্রিকায় যারা লিখছেন তাঁদের মধ্যে শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নামটি সম্ভবত অনেকেরই পরিচিত। বহুদিন ধরেই শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলা কবিতার পাঠককে স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছেন এবং কয়েকবছরের মধ্যে তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও কয়েকটি। কবির সাম্প্রতিক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলো ‘দুর্লভ এক খেলায় আমি’।

মোট আটচল্লিশটি কবিতা নিয়ে ‘দুর্লভ এক খেলায় আমি’-র গ্রন্থনা রচিত হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন সম্পর্কে তথা প্রেমের অন্তর অন্তরুতিকে তিনি প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন বর্তমান সঙ্কলনে। যদিও সর্বত্র নয়, তবু স্বপ্নের কথা কবির কাব্যভাবনা কোথাও কোথাও আবেশমুগ্ধ; সূক্ষ্ম ও তীব্র আবেগে তা কাব্যশরীরে শ্রীরচনার যত্নশীল : ‘এতো ডাকাডাকি কেন যে বুঝতে পারি না | অথচ কেউ কারো জন্ত অপেক্ষা করে না বলে সময় নেই— | অথচ অন্ধশোকে চোখের পাতা ভেজায়, বুক ফাটায়, কিন্তু | হৃদয় থেকে হৃদয়ের ব্যবধান কতোটুকু জানি ? | এতো ডাকাডাকি কেন যে বুঝতে পারি না’ (সময়, কখনো প্রবাসী করে) কিংবা, ‘প্রথম প্রেমের সংলাপ বড়ো অন্তরঙ্গ যেন মনে হয় | তখন যেন পিপড়ের মতো সিঁড়ি ভাঙে মন, তখন | পরস্পর নাম ধরে ডাকা, গুজব, অরণ্য, নদী, ফুল, | মুগ্ধ করে তুষার্ত হৃদয়।’ (প্রথম প্রেম), কিংবা, একটি দৃশ্যও স্থির থাকে না | এই আলো, স্বপ্ন, দেয়া-নেয়া সব যেন বুদ্ধবুদ্ধ! (অথচ স্মৃতি, কথা বলে) ইত্যাদি।

কবি দুর্লভ এক খেলায় অংশ গ্রহণ করে আছেন। যে খেলা শুরু হয়েছে বহুদিন ধরে অথচ যা চলেছে চলেছে এখনও। বলা বাহুল্য, কবি ঘুরছেন প্রেমেরই সঙ্কলনে অর্থাৎ কবির বিবেচনায় সেটি হলো, ‘ঘুরছি তোমারই রূপ খুঁজে-খুঁজে।’ পরিশেষে কবি অনুভব করেন, আবিষ্কার করেন :

ওমর খৈয়াম হ’তে আরো দূর হোমর-কালিদাসের

সৌন্দর্যের আলোর জগতে

শাস্ত্রত কালির দাগ, আঁধারের পদচিহ্ন মুছে

আমি ঘুরছি যেন তোমারই রূপ খুঁজে খুঁজে।’ (দুর্লভ এক খেলায় আমি)

কবি শৈলেশচন্দ্র বেশ কিছুকাল ধরে লিখছেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান কাব্যগ্রন্থে তিনি জীবন সম্পর্কে অন্তর দর্শনের স্পর্শ রাখতে চেষ্টা করেছেন। উগ্র আধুনিকতার ছলাকলায় তিনি বিশ্বাসী নন—সহজভাবে কথা বলতেই তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু সহজ কথা বলা খুব সহজ নয় বলেই ক্ষেত্রবিশেষে, অভিব্যক্তি প্রকাশে কবির দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করবে। কিন্তু শব্দ চয়নে এবং চিত্রকল্প রচনায় কবির অমনোবোগ মনকে পীড়িত করে। অথচ ‘কুয়াশার ভিতর’; ‘ক্লাউন কিংবা রিং মাস্টার সাজলে’; ‘আভিধানিক’; ‘সময়, কখনো প্রবাসী করে’; ‘কলকাতা’; ‘জলে নামলে’; ‘এখন’; ‘অথচ, স্মৃতিকথা বলে’ কিংবা ‘দীর্ঘতর দুখ, স্মৃতি, ইত্যাদি’ কবির সুপরিণতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফেরায়। নিজের বিষয়ে কবি বলেন, ‘কবিতায় জীবনের প্রত্যেকটি প্রত্যন্তকে চিহ্নিত করা বোধহয় সহজসাধ্য নয় কিন্তু জীবনের নানাবিধ গুণা নামায় বিশ্বাসী আমি।’

ইন্দ্রনীল সেন

বিংশ শতাব্দীর একটি সমস্যা

কে কে শাহ

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার যে আন্দোলন চলছে তাকে যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান আন্দোলন বলা হয় তাহলে ভুল বলা হবে। পরবর্তীটিকে তাহলে বলতে হবে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে উত্তম হয়েছে, কিন্তু পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা চাইছি মানুষ প্রকৃতিদত্ত আনন্দ আরও স্ফূর্ত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে উপভোগ করুক।

পরিবার পরিকল্পনার ধারণাটি নতুন এবং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা রচনা করার সময় যেমন মোট সঙ্গতির হিসেব নিতে হয় এবং জনগণের মধ্যে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টন করতে হয় ঠিক সেইভাবে আমাদেরও দেখতে হবে যাতে আমাদের পরিবার এমনভাবে চালাতে হবে যাতে পরিবারের স্ব্থ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিশাল পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা যদি এইভাবে পরিকল্পনা রচনা করি তাহলে আমাদের পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টি জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করবে। কোনো পরিবার যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্ত সঙ্গতির দিকে নজর না রাখেন এবং পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি কি পেতে পারেন সে বিষয়ে উদাসীন হন তাহলে ক্রমবর্ধমান সমস্যার সংখ্যা যে কোনো পরিকল্পনাকে বাঁচাল করে দিতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার এই জাতীয় প্রচেষ্টা আজ দেশের সীমা ছাড়িয়ে সারা জগতের সমস্যার রূপ নিয়েছে এবং দেয়াল বহু সমাজ ও সরকার সীমিত পরিবারের জ্ঞান আন্দোলন করছেন।

ভারতই প্রথম দেশ যে পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী জাতীয় ও সরকারী ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল পরিবারের প্রতি সামাজিক ও আর্থনৌতিক দায়িত্ব পালন করা। কারণ একটি পরিবারের একটি শিশু জন্মালেই তার জ্ঞান যথোপযুক্ত আশ্রয়, শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও লাভজনক কর্মসংস্থান করতে হবে। অবিলম্বে এই আশ্বাস দিতে না পারলেও সীমিত করায় হানি নেই বিশেষ করে যে পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালন করা যাবে। যে পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর পরে ১৮৫০ সালে জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল সেই পৃথিবীতে এটাই হল উত্তম প্রচেষ্টা। পরবর্তী ৮০ বছরে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল, জনসংখ্যা আরও ১০০ কোটি বেড়ে গেল। অবস্থার আরও অবনতি ঘটল যখন ১৯৬০ সালে ৩০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা আরও ১০০ কোটি বেড়ে গেল। জনসংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ১৬ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটিতে দাঁড়াবে। অথচ পৃথিবীর সঙ্গতি এই হারের অর্ধেক গতিতেও অগ্রসর হচ্ছে না। পৃথিবী আজ

এক আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন, জন্মহারের গতি হ্রাস না পেলে মানুষের বেঁচে থাকাই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিষ্কেপ করার জ্ঞান ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাদের পিতামাতাকে নিশ্চয় ধন্যবাদ দেবে না।

বিগত দিনের স্বল্প বিংশশতাব্দীর মানুষ উপভোগ করতে পারছে না। জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে; ৬৯ বছরে ১ শতাংশ হারে, ৩৫ বছরে ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়েছে। ৩৩ শতাংশ হারে জনসংখ্যা ২০ বছরে দ্বিগুণিত হচ্ছে আর ৪ শতাংশ হারে ১৭ বছরেই জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়। সাংঘাতিক এক বিস্ফোরণকে এড়াতে হলে এই দ্বিগুণিত হার বাড়তে দেওয়া যায় না।

জনসংখ্যার এই দ্রুত বৃদ্ধি মানবজাতির উন্নতিকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা অনুমান করছেন যে ১৯৬৫-৮৩ সালের মধ্যে উন্নতিশীল জাতিগুলির মধ্যে মোট খাদ্যের পরিমাণ ৫ শতাংশ এবং ১৯৬৫-২০০০ সালের মধ্যে ২২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ইউ এন সেক্রেটারি জেনারেল উ থানটের মতে বর্ধিত এই জনবহুলকে খাওয়ার কোন আশাই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না।

৩৪০টি জেলা, ২৬৯০টি শহর এবং আনুমানিক ৫৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পরিকল্পনার সমস্যা জানিয়ে দিতে হবে। বিরাট এই প্রচার করা হচ্ছে নানাভাবে—সংবাদপত্র, পুস্তিকা, সাময়িক পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, পোষ্টার, হোর্ডিং ইত্যাদির সাহায্যে। এ ছাড়া আমাদের কর্মীরাও গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন এবং আরও নানাভাবে সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনার প্রতি নরনারীরা ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছেন। ভবিষ্যৎ বিপদ উপলব্ধি করতে পারেন।

জন্মসংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিবাহের বয়স বাড়ানোর জ্ঞান আমরা চেষ্টা করছি। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর। বড় বড় হাসপাতালগুলিতেও পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জন্মহারের অতিবৃদ্ধির সমস্যা একা ভারতেরই নয়, সারা পৃথিবীর এবং সকলে মিলে যৌথভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের বংশধরেরা আমাদের স্তুতিবাদ করেন, তাঁরা যেন না বলেন যে, তাঁদের আমরা অবহেলা করছি।

মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমানের বাণী

জন বিস্ফোরণের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে দেবার উদ্দেশ্যে আমরা জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ পালনের ব্যবস্থা করেছি।

আমাদের সবুজ বিপ্লব এবং জাতীয় উন্নতির মূল লক্ষ্য হল জনগণের জীবন যাত্রার নান উন্নত করা। কিন্তু যারাই জাতীয় উন্নতির কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁরাই জানেন যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

বিগত দশ বছরে পরিবার পরিকল্পনার প্রচেষ্টাকে জনপ্রিয় করবার জ্ঞান বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে কিন্তু সাফল্যলাভের জ্ঞান দ্রুতগতিতে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতীয় সিগারেট শিল্প

বিচার করুন—বাস্তব ঘটনাবলী আর তার সঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা

ভূমিকা

এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনারা এসেছেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্প্রতি ভারতে সিগারেট শিল্পের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; গোল্ডেন টোব্যাকো কোং যে বিরূপ প্রচারণা চালিয়েছে, বহুলাংশে তারই ফল এটি। ভারতে সিগারেট শিল্পের একটি অগ্রণী কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসেবে আমি মনে করি যে, একপেশে প্রচারণায় বিতৃষ্ণ না হয়ে এই শিল্পটি সম্পর্কে বাস্তব তথ্যাদি যাতে প্রকাশিত হয় তার জন্ত সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের দিক থেকে সচেষ্ট হওয়ার সময় এসে গেছে।

ক। শিল্পের প্রতিনিধিত্ব

১। সিগারেট শিল্পে এখন দশটি কোম্পানি রয়েছে এবং এই দশটি কোম্পানিই ১৯৬৭ সালে গঠিত দি সিগারেট ম্যাক্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য—গোল্ডেন টোব্যাকো কোং তাদেরই একটি।

২। দি ইন্ডিয়ান সিগারেট ম্যাক্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ১৯৭০ সালের ৩রা আগস্টের আগেই গঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আমার যতদূর জানা আছে, আই. সি. এম. এ.-এর প্রবর্তক, প্রধান পরিচালক এবং প্রায় নিঃসঙ্গ সদস্য হচ্ছে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, এবং গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-ই তার অর্থেরও যোগানদার এবং প্রচারণার মঞ্চ হিসেবেই তাকে ব্যবহার করছে; তার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ—বস্তুতঃ এই সবই তার প্রধান কার্যকলাপ থেকেই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিভাত হচ্ছে।

খ। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর অভিযান—তাদের নিজস্ব কাজকর্ম—প্রচারণার মূল কারণ

১। প্রচারণার বিষয়বস্তু :

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর কুৎসামূলক প্রচারণা ব্যবসায়িক বিচারে অসৌজন্যমূলক এবং অধিকাংশ বেআইনী, মানহানিকর ও ক্ষতিকারক। এর ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব ঘটনাবলীর বিকৃতি ও গোপনতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং প্রতারণামূলক সিদ্ধান্ত। দেশের কয়েকজন প্রধান জায়াধিপতির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই অভিযানের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর জ্ঞানম নষ্ট করা এবং জনসাধারণের মনে তার যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তাকে মসীলিপ্ত করা।

২। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং—কাজকর্ম :

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর যুক্তি হচ্ছে, কয়েকটি বড় বড় প্রস্তুতকারক রয়েছে বলে এবং যাদের বিদেশী শেয়ারহোল্ডার রয়েছে তারা আছে বলেই তাদের অগ্রগতি ও উন্নতি হতে পারছে

সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

না। এটিই একটি অথওনীয় প্রমাণ যার থেকে সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও কতৃপক্ষ প্রকৃত ঘটনাবলী অনুমান করতে পারবেন।

(ক) প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীচক্রভূজ নারসে স্বয়ং বলেছেন যে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর শুরু হয়েছিল অতি সামান্য মূলধন নিয়ে অতি সাধারণভাবে।

(খ) সমগ্র শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ ও ১৯৬৮ সালের মধ্যে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর বিক্রয়/উৎপাদন কাজকর্ম (সরকারী পরিসংখ্যান) নিম্নরূপ :—

গোল্ডেনের বিক্রয় :

উৎপাদন—লক্ষ সিগারেট হিসাবে		শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি
১৯৪৮	১৯৬৮/৬৯	গোল্ডেন	সমগ্র শিল্প
৭০০	৮০৪০০	১১৫০০%	২২৫%

(গ) গত দশ বৎসরে সমগ্র শিল্পের তুলনায় গোল্ডেন টোব্যাকোর বিক্রয়/উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :—

গোল্ডেন	সমগ্র শিল্প—	গোল্ডেন—গড়	সমগ্র শিল্প
১০ বৎসরে	১০ বৎসরে	বার্ষিক	বার্ষিক
% বৃদ্ধি	% বৃদ্ধি	% বৃদ্ধি	% বৃদ্ধি
৫২৬.৪%	১১৩.১%	৫২.৬%	১১.৩%

(ঘ) গোল্ডেন নিজেরাই বিজ্ঞাপন দেয়—

(১) কল্লাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়

(২) এই শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী বিক্রীত সিগারেট

(ঙ) গোল্ডেন টোব্যাকোর আর্থিক কাজকর্ম নিম্নরূপ (৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত বৎসর) :—

(কোটি টাকায়)

	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯	মন্তব্য
ইস্কৃত মূলধন				বোনাস
(অর্ডিনারী)	৬০	৬০	১৮০	টাকা: ১২০
নিয়োজিত মূলধন	৭'৪৯	৭'৫৯	৯'০৫	
মোট লাভ	১'৯৩	২'৫০	৩'০৭	
আর্থিক % অনুপাত				এই শিল্পের
আয়ের % মোট লাভ	৭'৮৫	৭'৭৭	৮'১১	সর্বোচ্চ
ইস্কৃত অর্ডিনারী				
মূলধন % মোট				
লাভ	৩২১'০০	৪১৭'০০	১৭১'০০	—ঐ—
মোট ইকুইটিতে				
% মোট লাভ	৭৯'৪২	৮৬'৫০	৮৩'৯২	—ঐ—
নিয়োজিত মূলধনে				
% মোট লাভ	২৮'৫৭	৩৫'৮৪	৩৬'০২	—ঐ—

(চ) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর নিষেদের কথাতেই প্রকাশ, তারা দুটি বড়রকমের সম্প্রদায় ঘটিয়েছে এবং অতি সম্প্রতি তাদের বর্তমানের সম্পূর্ণরূপে কাজে-লাগানো সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির ৫০% এরও ওপর আর একটি বড়রকমের সম্প্রদায় মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর সমৃদ্ধি—শেয়ারহোল্ডার :

আমি এবং সেইসঙ্গে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কামনা করে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং তার সমৃদ্ধি বাড়িয়ে চলুক। বস্তুতঃপক্ষে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলি সব সময়ই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। আমরা কামনা করি, গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর ১৩/১৪টি শেয়ারহোল্ডার (এর মধ্যে ১৩ জনই একটি পরিবারের লোক) স্থায়ী সমৃদ্ধি লাভ করুক।

৪। কাজকর্মের সংক্ষিপ্তসার :

উপরের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত কিংবা তর্কাতীত। এগুলিতে নিঃসন্দেহভাবে ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে বিদেশী শেয়ারহোল্ডারযুক্ত বা বিহীন কোন প্রস্তুতকারকই গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বিল্লিত বা ব্যাহত করেনি।

৯। সিগারেট শিল্পে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর ভূমিকা :

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং দাবী করে যে সিগারেট শিল্পের “দেশীয় ক্ষেত্রে”র স্বার্থ তারাই তুলে ধরেছে। আমি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এবং কতৃপক্ষের স্ববিচারের জন্ত উপস্থাপিত করছি :—

(ক) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং তাদের বিপুল সম্পদে ভারতীয় জনসাধারণকে অঙ্গীদার হতে দেখেনি।

(খ) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং রপ্তানী সম্প্রদায়কে কোন স্বজনীয়মূলক ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

(গ) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং আমদানী প্রতিস্থাপনের উন্নতিবিধানে স্বজনীয়মূলক কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেনি।

(ঘ) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং তামাক-চাষীদের বাস্তব ও লক্ষণীয় সাহায্যদানে কোন ভূমিকাই পালন করেনি।

(ঙ) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং সমষ্টিগত দরকষাকষি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেনি।

৬। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর প্রচারণার মূল কারণসমূহের বিশ্লেষণ :

আমি সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এবং কতৃপক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার জন্ত অনুরোধ জানাবো :—

(ক) শিল্পের পক্ষে যা বাঞ্ছনীয় তার চেয়ে অনেক বেশী চমক-লাগানো হারে বৃদ্ধি ঘটলে একটি কোম্পানি প্রতিযোগিতাকে নিরুদ্ধ করে শিল্পে একচেটিয়া অধিকার লাভ করতে পারে।

(খ) শিল্পের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অজ্ঞান অসংগঠিত প্রস্তুতকারকদের যদি তাদের উৎপাদন বাড়াতে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হতে হয়, তবে তার ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানটির অজ্ঞায় ও অব্যঞ্জিত সুযোগ কোন কোম্পানী নিতে পারে।

(গ) কোন কোম্পানীকেই এ বিষয়টি উপেক্ষা করার সুযোগ দেওয়া যায় না যে, বৃহৎ

সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট কোম্পানির বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যিক ব্যাপার হচ্ছে জনসাধারণের তাতে অংশ গ্রহণ।

(ঘ) কোন কোম্পানিকেই এই বাণিজ্যিক নীতি অবহেলা করতে দেওয়া যায় না যে শেষ পর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের শিল্পে প্রস্তুতকারকের সাফল্য নির্ভর করবে ক্রেতাদের প্রতি পরিসেবার ওপর এবং তাদের অর্থের সর্বোত্তম মূল্যদানের ওপর।

গ। প্রচারণা—তার বৈধতা

এ কথাটি অস্বীকার করা ও ধারণা করে নেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, বিরূপ প্রচারণা নিম্নলিখিত ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে অবশ্য এগুলো থেকে সংবাদপত্র ও জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ ধারণা করে নিতে পারবেন যে এগুলো প্রচারণামূলক কিনা, মিথ্যা কিনা বা আর কিছু কিনা—

প্রচারণা—দফা নং ১

এই প্রচারণা সভ্য
না মিথ্যা

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার আছে বলে

বৈদেশিক মুদ্রার

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা :

১। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলি রপ্তানি শুরু করে সেই ১৯৩৩ সালে। ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ সৃষ্টি হয় ১৯০৮ সালে এবং পুনঃসংগঠিত হয় ১৯২৮ সালে।

২। ১৯৫৮ সাল ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো (এর মধ্যে রয়েছে সহযোগী সংস্থা ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ) বৈদেশিক মুদ্রার আয় থেকে লাভাংশ | লাভ বাবদ প্রদেয় অর্থ বাদ দেবার পর নীট ৬৬.১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৩। যেহেতু ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো নীট বৈদেশিক মুদ্রার আয় (অর্থাৎ লাভাংশ বাদে রপ্তানি আয়) বিকশিত করেছে সেই হেতু তা নিম্নোক্তভাবে বাড়িয়ে চলেছে :

কোটি টাকার

১৯৫৯

১৯৬৯

অর্জিত নীট বৈদেশিক মুদ্রা

টা: ৪.৭০

টা: ৯.৫৬

৪। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কাউকে কোন রকম রয়ালটি, কলা-কৌশল বা সহযোগিতা ফী দেয় না।

প্রচারণা—দফা নং ২

এই প্রচারণা সভ্য
না মিথ্যা

ভারতে সিগারেট শিল্পে একটি বিদেশী

বা অল্প রকম একচেটিয়া রয়েছে

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা :

১। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো আইনের দিক দিয়ে বা বাস্তবিকপক্ষে একচেটিয়া হয়ে ওঠেনি।

২। তিনটি কোম্পানির, যাদের বিদেশী শেয়ারহোল্ডার রয়েছে তাদের পারস্পরিক কোন অংশীদারী নেই।

৩। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর ওয়াজির স্থলতানে কোন অংশীদারী নেই কিংবা ওয়াজির স্থলতানের ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোতে অংশীদারী নেই।

৪। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো এবং ওয়াজির স্থলতানের মধ্যে কোন আস্ত-সংযোগ নেই। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো এবং ওয়াজির স্থলতানের মধ্যে একই ডিরেক্টর বা একই পরিচালকমণ্ডলী নেই। স্বাভাবিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে একই ব্যবস্থাপনা নেই। প্রধান প্রধান দ্বায়াধিপতিগণ এসব কথা স্বীকার করেছেন। এসব কেবল এই কোম্পানিগুলোরই বৈশিষ্ট্য নয়।

প্রচারণা—দফা নং ৩

এই প্রচারণা সভা
না মিথ্যা

আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ডগুলোর বিক্রেতা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা :

১। কোন আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড ভারতে বিক্রীত হয় না, কেবল যেগুলো চোরা পথে আসে সেগুলো ছাড়া, অন্যান্য আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্য যেমন হয়।

২। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যেসব ব্র্যাণ্ড বিক্রী করে তার মালিক তারা নিজেরাই এবং (আইনগতভাবে যেখানেই সম্ভব) ট্রেড মার্ক আইন অনুসারে সেগুলো তাদের নামে রেজিস্টারী-করা, এগুলোর অধিকাংশই কয়েক দশক ধাবৎ নিজেদের অধিকারে রেখে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ব্যবহার করে আসছে।

৩। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি এই সব ব্র্যাণ্ড | ট্রেড মার্ক ব্যবহার করছে বলে ভারতের ভিতরে বা বাইরে কাউকে কোন রয়ালটি, কমিশন বা অন্য কোন পণ্য দেয় না।

প্রচারণা—দফা নং ৪

এই প্রচারণা সভা
না মিথ্যা ?

গত চার দশকে ২০০টি দেশীয় সিগারেট

কোম্পানী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অধিকাংশই

বিলুপ্ত হয়েছে স্বাধীনতার আগে, ছয়টি

স্বাধীনতার পর এবং আর ছয়টি এখন

খুঁড়িয়ে চলছে

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা :

১। ১৯৫১ সালের ইণ্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড রেশুলেশন) অ্যাক্ট চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই শিল্পে কোম্পানিগুলোর কোন রেজিস্ট্রেশন ছিল না। যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা স্বভাবতই বানানো এবং তার উদ্দেশ্য আসল প্রশ্ন গুলিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই শিল্পের মোট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে মাত্র ৫০ কোটি সিগারেটের ধারে-কাছে এবং প্রতি মাসে ৫ কোটি সিগারেটকেও যদি ক্ষুদ্রতম আর্থিক ইউনিট হিসেবে ধরা হয় তবে সেই সময়ে সিগারেট শিল্পে ১০টির বেশী প্রস্তুতকারকের স্থান সম্ভবতঃ দেওয়া যায় না।

২। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো তাদের ৬০ বছরের কাজ-কারবারের মধ্যে একটিও

সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

দেশীয় সংস্থার সঙ্গে মিলিত হয়নি বা যুক্ত হয়নি বা একটির দেশীয় সংস্থা কিনে নেয়নি, এইরকম কোন সংস্থার অবলুপ্তির কারণ হওয়া তো দূরের কথা।

৩। স্বাধীনতার আগে সিগারেট শিল্পে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত মাত্র আটটি দেশীয় কোম্পানি ছিল এবং স্বাধীনতার পরেও সেই আটটি কোম্পানি এখনও আছে এবং তারা ১৯৫১ সালে ইণ্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেশুয়েলেশন) অ্যাক্ট অধীনে রেজিস্টার্ড।

৪। ১৯৬৭/৬৮ সালের দিকে আর একটি ভারতীয় কোম্পানি ব্যবসায় নামে এবং তা বিকাশ লাভ করেছে।

৫। আজ মাত্রটি দেশীয় কোম্পানি সিগারেট শিল্পে কর্মরত আছে।

৬। নিছক একটি আঞ্চলিক কোম্পানি আছে, যেটি একটি মালিকানা সংস্থা, যে নগরীতে এটি আছে তার বাজারের আনুমানিক ২৮% তার অধিকারে। এই কোম্পানির গত তিন বছরে মাত্র একটি শহর এলাকাতেই মোট লগ্নী হচ্ছে—

১৯৬৭/৬৮	১৯৬৮/৬৯	১৯৬৯/৭০
৫৪ লক্ষ	৭২ লক্ষ	৯০ লক্ষ

৭। আর একটি কোম্পানির ইত্বকৃত মূলধন হচ্ছে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা এবং ৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৮ তারিখে যে বছর শেষ হয়েছে সে সময় তার লগ্নী ছিল ১'১৮ কোটি টাকা।

৮। আরও একটি কোম্পানি বিশেষায়িত পণ্যের কারবার করে এবং নিজস্ব দোকান থেকেই সে বিক্রী করে। তার কাজকর্ম অত্যন্ত ভাল এবং কাজকর্মে সন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

৯। আরও একটি কোম্পানি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বেশ ভাল কাজ করেছে; দুর্ভাগ্যবশত: এই সময়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তার ফলে ৩/৪ মাস লকআউট হয়ে যায়। এই কোম্পানির শেষার বাজার-দর ছিল লিখিত মূল্যের ১'৫ গুণ; কাজ সন্তোষজনক না হলে এই রকম দর সম্ভবত: হয় না।

১০। একটি মাত্র কোম্পানি, দুর্ভাগ্যক্রমে যার কাজকর্ম ভাল হয়নি গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর সিগারেটের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় পড়ে তার প্রধান ব্র্যান্ডের সিগারেট বিক্রী করতে পারেনি।

১১। আর একটি কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রধানত: গোল্ডেন টোব্যাকো কোং কর্তৃক তার সঙ্গে সিগারেট প্রস্তুতের ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটানোর ফলে।

১২। সব শেষে হলেও কম উল্লেখ্য নয়—গোল্ডেন টোব্যাকো কোং নিজেস্বাই ৩০শে জুন, ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ তারিখে যে তিনটি বছর শেষ হয়েছে তার মধ্যে যথাক্রমে ১'৯৩ কোটি টাকা, ২'৫০ কোটি টাকা ও ৩'০৭ কোটি টাকার মত মোট মুনাফা অর্জন করেছে।

প্রচারণা—দফা নং ৫

শিল্পের সম্পূর্ণ দেশীয় ক্ষেত্রে প্রচুর

ক্যাপাসিটি অলস পড়ে আছে

বাস্তব ঘটনা :

এইপ্রচারণা সভা

না মিথ্যা ?

মিথ্যা

১। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং ১৯৫৯ সাল থেকেই তিন শিফটে কাজ করেছে এবং তাদের

সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির পূর্ণ সদ্যবহার করছে। ইতিমধ্যেই তারা ছোটো বড় রকমের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে এবং আরও একটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২। আর একটি কোম্পানি যার কাজকর্ম মূলতঃ আঞ্চলিক, প্রতিমাসে আনুমানিক ৪ কোটি সিগারেট প্রস্তুত করে, একটি শহরে ও তার আশেপাশে কোম্পানিটি যে পরিমাণ সিগারেট বিক্রী করতে পারে এই সংখ্যাটি তারই অনুরূপ।

৩। আর একটি কোম্পানি শুধু বিশেষায়িত সিগারেটই প্রস্তুত করে; ক্রেতাদের চাহিদা পূরোপুরি মিটানোর মত সিগারেটই তারা প্রস্তুত করছে।

৪। আর একটি কোম্পানি তিন শিফটের ভিত্তিতে শুধু তার পুরো ক্যাপাসিটির সিগারেটই তৈরী করছে না, বরঞ্চ সরকারী মঞ্জুরী ছাড়াই যে ২৫ পারসেন্ট বেশী তৈরী যে অন্তিমতি দেওয়া আছে তার স্বযোগও তারা নিতে যাচ্ছে।

৫। আর একটি কোম্পানি ১৯৬৩/৬৪ সালে তার পুরো ক্যাপাসিটিকে কাজে লাগাচ্ছে। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কোম্পানিটি তার রেজিষ্টার্ড ক্যাপাসিটির ১১৮ পারসেন্ট সম্প্রসারণ ঘটায় এবং তার বর্ধিত ক্যাপাসিটির সদ্যবহার করে যাচ্ছে। তবে আগেই বলছি, ১৯৬৭ সালের দীর্ঘকালীন লক-আউট তার অগ্রগতি ব্যাহত করে। অনুরুদ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো একে পুনরুজ্জীবনের পথে সাহায্য করেছে।

৬। আর একটি কোম্পানির ক্যাপাসিটি রয়েছে প্রতি মাসে আনুমানিক ৮৪ লক্ষ সিগারেট তৈরীর। তবে গোল্ডেন টোব্যাকোর কোং-এর ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার সামর্থ্য এর নেই।

৭। আর একটি কোম্পানি, যার সঙ্গে সিগারেট তৈরীর ব্যবস্থাপনার অবসান গোল্ডেন টোব্যাকো ঘটিয়ে দিয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় ৪/৫ কোটি সিগারেট উৎপাদনে সক্ষম এবং সম্প্রতি তারা প্রতি মাসে ২/২৥ কোটি সিগারেট তৈরী করছে। অনুরুদ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো এই কোম্পানিটিকে তার পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছে।

প্রচারণা—দফা নং ৬

এই প্রচারণা সভা

বৈদেশিক মূলধন সিগারেট বাজারে মোট

না মিথ্যা ?

মূলধনের ৮০% নিয়ন্ত্রিত করে

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা :

তিনটি কোম্পানি আছে বাদের শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিদেশীরাও আছেন। গত আর্থিক বৎসরে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো ভারতীয়দের যোগদান বাড়িয়ে ২৫.১৮% করেছে এবং আরও বাড়িয়ে একে ৪০% করার অঙ্গীকারও সে করেছে; এই পদ্ধতি চলতে থাকবে। আর একটি কোম্পানির ইতঃপূর্বেই ৩৫% ভারতীয় শেয়ারহোল্ডার রয়েছে এবং সরকারের সঙ্গে তারা একটি প্রস্তাব রেখেছে যার ফলে ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫১% করে এটি পুরোপুরি ভারতীয় কোম্পানি হয়ে উঠবে। তৃতীয় কোম্পানিটিও ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০% করার অঙ্গীকার দিয়েছে। পরিস্থিতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যায় :—

	বর্তমান	অঙ্গীকারবদ্ধ/প্রস্তাবিত
শিল্পে ভারতীয় মূলধনের % অংশ	৪২%	৬০%

সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

ভারতীয় মূলধন দ্বারা ২২% উৎপাদন ৪৭% ৫৮%

অস্বীকার গিয়েছে। পরিস্থিতি সংক্ষেপে নিম্নোক্তমত বিশ্লেষণ করা যায় :—

ভারতীয় মূলধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

% ক্যাপাসিটি ... ৪৭% ৬০%

ভারতীয় মূলধন দ্বারা আহৃত প্রতিদানে

% অংশ ... ৫২% ৬২%

প্রচারণা—দফা নং ৭

এই প্রচারণা সত্য

কয়েকটি কোম্পানির জন্য অপর কয়েকটি

না মিথ্যা?

কোম্পানি সমুদ্র হতে পারছে না

মিথ্যা

বাস্তব ঘটনা :

১। গোড্ডেন টোব্যাকো কোং বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রতিনিধি। ৩০শে জুন তারিখে যে বছর শেষ হয়েছে তাতে তার কাজকর্ম নিম্নোক্তমত ছিল :

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯
মোট মালিকী মূলধন	...	৩'৪৩	৩'৮২
মোট মুনাফা	...	১'৯৩	২'৫০

২। আর একটি কোম্পানি, যাকে মাঝারি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, ৩০শে জুন তারিখে যে বছর শেষ হয়েছে তার মধ্যে তার অবস্থা ছিল :

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৬৭	১৯৬৮
ইকুইটি (ইন্ + রিজার্ভ)	...	১'৩১
মোট মুনাফা	...	০'৮০

আর একটি কোম্পানি যাকে ধরা যায় ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের শিল্প গত তিন বছর তার আয় এবং কেবলমাত্র একটি শহর এলাকাতেই তার সিগারেট বিক্রীর পরিমাণ হচ্ছে :

১৯৬৭/৬৮	১৯৬৮/৬৯	১৯৬৯/৭০
৫৪ লক্ষ	৭২ লক্ষ	৯০ লক্ষ

ঘ। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীগুলোর অবদান

এখন আমি ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান হতে পেরে ভারতীয় হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি।

আমি জানাতে চাই যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীগুলো হচ্ছে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো, দি ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, ক্যালকাটা কোল্ড স্টোরেজ এবং দি দিল্লী অ্যান্ড ওরিয়েন্ট টোব্যাকো কোং ও অল ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং। সাধারণতঃ এই কোম্পানী-গুলোর একটিমাত্র গোটা ব্যবসায়িক কাজকর্ম রয়েছে।

১। আমদানী-রপ্তানী—বৈদেশিক মুদ্রা

(ক) ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীগুলো সেই ১৯৩৩ সাল থেকেই রপ্তানী করে আসছে।

আগেই বলেছি, ১৯৫৯ ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো আমদানী ব্যয় ও বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের লাভাংশ বাদ দেবার পর ৬৬'১৪ কোটি টাকার নীট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। বিপরীত দিকে ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে একা গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-ই দেশের আন্তর্মানিক নীট ১'১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি করেছে।

(খ) ১৯৫৯ সাল ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৯'১৩ কোটি টাকা এবং ১৯৬৮ সাল ও ৩১-৩-১৯৭০ তারিখের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ১০ কোটি টাকা হিসাবে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল মোট ৩১'০৪ কোটি টাকা। ১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালের মধ্যে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে প্রতি বছর ২১ লক্ষ টাকার আমদানীর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে মাত্র ৭ লক্ষ।

(গ) ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর ব্যবসা যেমন বেড়েছে রপ্তানি আরও তেমনি বেড়েছে। নীচের হিসাব থেকেই তা প্রতীয়মান হবে :

(কোটি টাকার হিসেবে)

১৯৫৯

১৯৬৯

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি-

গুলোর রপ্তানি

টাকা ৪'৮১

টাকা ১০'৯৭

রপ্তানি ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যে সাফল্য অর্জন করেছে তার জ্ঞান দায়ী তার বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য।

(ঘ) ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে গড় বার্ষিক আমদানী হিসেবে নিম্নরূপ :

আই-টি-সি

গোল্ডেন

নিম্নস্থ ত্র্যাণ্ডের সিগারেটের

গড় বার্ষিক উৎপাদন—দশ

লক্ষ হিসেবে

২২,৯১৩

৫,৩৪৫

গড় বার্ষিক আমদানী—

লক্ষ টাকার হিসেবে

১৩ লক্ষ টাকা

২১ লক্ষ টাকা

২। ভারতীয় মূলধন ভারতীয় ইকুইটি

শেয়ারহোল্ডার

(কোটি টাকার হিসেবে)

আই-টি-সি

জি-টি-সি

মূল বিনিয়োগ (প্রিমিয়াম

সহ)

৬'০০

০'০৫

মুনাফা থেকে ইন্সরুত

মূলধন/ইন্স

—

১'৭৫

মোট টাকা: ৬'০০

টাকা: ১'৮০

মে ট ভারতীয় ইকুইটি মূলধন টাকা: ৯'১১

টাকা: ৩'৬৭

ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা ২১৪৩০

১৩/১৪

সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

(১) ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর বণ্টিত শেয়ারের সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে ৪০ লক্ষ টাকা। অপরপক্ষে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং তাদের ১৩/১৪ জন শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে সর্বশেষ হিসেবে দেখা যায়, ২৮'৯ লক্ষ টাকা বণ্টন করেছে; এই শেয়ারহোল্ডাররা (একজন বাদে) আবার একই পরিবারভুক্ত। সিগারেট শিল্পের অন্য যে কোন কোম্পানি থেকে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বৃহত্তর পরিমাণে মূলধন বণ্টন করেছে।

(২) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং'এর ১৩/১৪টি শেয়ারহোল্ডারের ৪'৬৭ কোটি টাকার ইকুইটি/মালিকানা রয়েছে।

৩। পরিচালনা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত। ডিরেক্টরদের কারুরই কোন মালিকানা স্বার্থ নেই।

৪। ক্রেতাদের অর্থের মূল্য দেয়—সবরকমের ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্নদের সেবা করে

(ক) এখানে কতকগুলো প্রাসঙ্গিক অঙ্ক দেওয়া হলো :

	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯
আই-টি-সি আয়ের মোট			
মুনাফার %	৫'৫০	৫'৫২	৫'৪০
জি-টি-সি আয়ের মোট			
মুনাফার %	৭'৮৫	৭'৭৭	৮'১১

(খ) প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়টি জ্ঞাতব্য যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর বিক্রয়ের ৪৮'৫% হচ্ছে নিম্নতম মূল্যের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে, অপরপক্ষে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং'এর এই শ্রেণীর বিক্রয়ের হার হচ্ছে মাত্র ১৩'৭%। কাজেই ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ক্রেতাদের অর্থের অধিকতর মূল্য ও সেবা দেয়।

৫। আমদানী প্রতিকল্প

(১) এখানে উৎপাদনের এবং মালমসলা স্প্রেয়ার পার্ট মেশিনারি ইত্যাদি সহ সমস্ত রকমের আমদানীর একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো (লক্ষ টাকার হিসেবে) :

	চলতি উৎপাদন (দশ লক্ষে)	গড় আমদানী ১৯৬১-৬৯	প্রতি দশ লক্ষ সিগা- রেটে আমদানী
ইণ্ডিয়া টোব্যাকো	২৮'৮০০	১৩ লক্ষ	৪৫'১
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং	৮'০০০	২১ লক্ষ	২৬২'৫

(২) ইণ্ডিয়া টোব্যাকো হালে ১২/১৩ কোটি টাকা মূল্যের মালমসলা (তামাক সহ) ব্যবহার করছে এবং মালমসলার মোট আমদানীর পরিমাণ বছরে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। দেশে যেখানে সামান্যতম পরিমাণে কোন কোন জিনিস এখনও পাওয়া যায় না সেখানে দেশীয় প্রস্তুতকারকদের পক্ষে এটি সত্যি উৎসাহব্যঞ্জক।

(৩) মেশিনারি

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো দাবি করতে পারে যে, প্রাথমিক (টোব্যাকো প্রসেসিং) ও মাধ্যমিক (মেকিং/প্যাকিং), উভয় প্রকার মেশিনারি এবং স্পয়ার পার্টস সম্পূর্ণ এই উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে এখন দেশেই পাওয়া যাচ্ছে। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো অর্থ, বিশেষজ্ঞ কারিগরী কলাকৌশল, নিজেদের পেটেন্ট কারিগরী ড্রিং/ব্লু প্রিন্ট দিয়ে, প্ল্যান্টের ভিতরে ও বাইরে পরামর্শাদি দিয়ে, কারিগরী পুস্তিকা, ওয়ার্কশপ মেশিনারি, টুল, জিগ, ফিক্সচার জুগিয়ে, কাঁচা মাল, দক্ষ শ্রমিক, সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং ও ড্রাকটসম্যান ইত্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করেছে। মেশিনারি ছাড়াও এখন ভারতে প্রায় ২০,০০০ দক্ষ স্পয়ার পার্ট প্রস্তুত হচ্ছে এবং এর সবগুলির উপকার শিল্পের প্রত্যেকটি সদস্যের ওপর বর্তাচ্ছে।

(৪) মালমসলা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর সহায়তা কারিগরী কলাকৌশল ও বিশেষায়ণ, গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা, মাল নেওয়ার গ্যারান্টি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা, অর্থের যোগান এবং আরও বহুরূপে আসে; তাদের অগণিত যোগানদার এগুলোর পরীক্ষা করে দেখেছেন। এর ফল হলো : আগে যেসব মালমসলা আমদানী করা হত তার সবগুলি প্যাকেট তৈরীর জন্য বোর্ড ১৯৪৫ সাল থেকেই স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে : সিগারেটের কাগজ পাওয়া যাচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে; অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ১৯৫৪ সাল থেকে; প্যাকেট মোড়বার জন্য স্বচ্ছ ফিল্ম ১৯৫৭ সাল থেকে; মাল পাঠানোর জন্য করগেটেড কার্ডবোর্ড বক্স ১৯৬২ সাল থেকে এবং ফিণ্টার টিপ ১৯৬৩ সাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৫১ সালে যদিও ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোকে ২২'৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী করতে হয়েছিল তবু তাদের মালপত্র আমদানীর মোট বিলের পরিমাণ বার্ষিক ১২/১৩ কোটি টাকার পরিপ্রেক্ষিতে আজ মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। অথচ এগুলোর ব্যবহার এখন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

৬। ক্ষুদ্রায়তন আনুযায়িক শিল্পের বিকাশ

মূল মেশিনারি ও মালপত্রের অনেক অনেক যোগানদার ছাড়াও ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ৪০টি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করেছে।

৭। গবেষণা ও উন্নয়ন

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যেসব গবেষণা করেছে তার শুরু হয় বহুদিন আগে সেই ১৯২৮ সালে—লীফ টোব্যাকোর উন্নতি বিধানই এই গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতার গবেষণা কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয় ১৯৫২ সালে এবং লীফ টোব্যাকোর গবেষণার জন্য রাজমহেন্দ্রীতে একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ১৯৬১ সালে।

গবেষণা কেন্দ্রের কর্মীর মোট সংখ্যা ৫০; এদের মধ্যে অধিকাংশই সায়েন্স গ্রাজুয়েট। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন দক্ষ কৃষিবিজ্ঞানীসহ উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৭।

একমাত্র রিসার্চ লেবরেটরিগুলোতেই বিনিয়ুক্ত স্থায়ী পরিসম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ২৫ লক্ষ টাকার মত এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বছরে যে পৌনঃপুনিক ব্যয় হয় তার পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা বা তারও কিছু বেশী। গবেষণা রপ্তানি : অনেক কয়টি বছর ধরে যে গবেষণা ও কারিগরী-

বিজ্ঞা গড়ে তোলা হয়েছে তার রপ্তানি শুরু করা গিয়েছে, ফলে অতি সামান্য পরিমাণ হলেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আর একটি পথ উন্মুক্ত হয়েছে। গবেষণার কাজকর্ম : এই সকল কাজকর্ম অতি ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সর্বাধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন। এর মধ্যে আছে লীফ টোব্যাকোর গবেষণা, ক্রেতা সম্পর্কিত গবেষণা, উৎপন্ন মালের উন্নতিবিধানের গবেষণা, মালপত্রের উন্নতিবিধানের গবেষণা ও আমদানী প্রতিকল্প গবেষণা ইত্যাদি।

৮। কর্মসংস্থান—কর্মী

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর ১২,০০০ স্থায়ী শ্রমিক আছে, এবং যেহেতু তামাক একটি মরসুমী ফসল সেইহেতু আরও ২৩,০০০ শ্রমিক মরসুমে কাজ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের কর্মীরা তাদের অত্যন্ত মূল্যবান পরিসম্পদ। এদের ট্রেনিং-এর জন্য অনবরত স্বেচ্ছা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাঙ্গালোরে রয়েছে একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, সবগুলি ইউনিটে আছে ট্রেনিং-এর কর্মসূচী এবং মহীশূরের ছনসুরে আছে ট্রেনিং স্কুল।

ফলে, পরিচালকমণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে প্রমোশন-পাওয়া ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মী; এর জন্য ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো গর্বিত। তা ছাড়া, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো স্বস্থ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রভূত প্রদর্শনের বিরোধী, সমষ্টিগত দরকষাকষিকেই এ ব্যাপারে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে। তারা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দেয় এবং তারাই ভারতের প্রথম কোম্পানি যারা নিজেদের ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্থাপন করেছে।

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো নিজেদের ব্যাণ্ডের প্রায় ২৮০,০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদনে ১২,০০০ কর্মী নিয়োগ করেছে; তার তুলনায় গোল্ডেন টোব্যাকো কোং বার্ষিক ৮০,০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদনে আনুমানিক ১,৩৫০ জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করেছে। কাজেই দেখা যাবে যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর তুলনায় গোল্ডেন প্রতি দশ লক্ষ সিগারেটে অনেক কম হারে কর্মী নিয়োগ করে। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর সাধারণ শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরী-হার আছে, শুধু হয় মাসে ৩০ টাকা দিয়ে এবং দক্ষ শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মূল মজুরী ১০৭ টাকা মত : একজন কেরানীর মূল মজুরী মাসিক ৭০ টাকা। গোল্ডেন টোব্যাকোতে কোন ইউনিয়ন নাই।

৯। বৈদেশিক মুদ্রা — সহযোগিতা — কল্যাকৌশল —

রয়ালটি — ট্রেড মার্ক — ব্যাণ্ড

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর কোন বৈদেশিক সহযোগিতার ব্যবস্থাপনা নেই কিংবা নেই কোন কারিগরী কল্যাকৌশল এবং/বা গুডউইলের চুক্তি। কাজেই, কোন অর্থই, তা সে টাকাতেই হোক বা বৈদেশিক মুদ্রাতেই হোক, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কোন রকম রয়ালটি দেয় না; এগুলোর মালিকানা ভারতের ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোরই। প্রত্যেকটি ব্যাণ্ড ভারতেই তৈরী হয় এবং দেশে ব্যবহারের জন্য সরকার সিগারেট আমদানী করতে না দিয়ে সঠিক কাজই করেছে।

১০। কৃষি অর্থনীতি

১৯২০ সালে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ভারতে ভার্জিনিয়া ফ্লু কিওর-করা তামাকের

প্রবর্তন করে, চাষ শুরু করে এবং তারপর দেশে ব্যবহারের জন্ত ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে একক চাবীদের দ্বারা এর চাষের উন্নতিবিধান করে। সুতরাং ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো গ্রাষসঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারে যে, তাদেরই পথপ্রদর্শন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের ফলে ভারত আজ শুধু দেশীয় ব্যবহারের জন্ত তামাকের ব্যাপারে স্বয়ংস্বত্বই হয়নি প্রচুর পরিমাণ তামাক তারা রপ্তানিও করে—দেশের অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে এটি একটি স্থায়ী ও অবিনশ্বর অবদান। তারা আরও যে সব কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে আছে—

(ক) নতুন নতুন এলাকার উন্নয়ন ও সেগুলোর সম্প্রসারণ।

(খ) যোগান দিয়ে, যথা ধারে সার দিয়ে, সাহায্য হিসাবে খাঁটি বীজের ব্যবস্থা করে (হালে বছরে প্রায় ৮,০০০ কেজি—১ কেজি ৪০ হেক্টরের পক্ষে যথেষ্ট), কয়লার সরবরাহ, কীটনাশক দ্রব্যাদির সরবরাহ দিয়ে, গোলার মালপত্র জুগিয়ে, সুদবিহীন ঋণ দিয়ে ও ফসলের বীমা করে সাহায্যদান। এই সব কাজে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো বছরে ৪০ লক্ষের মত টাকা কাজে লাগাচ্ছে।

(গ) সমগ্র মরহুমে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজন দিয়ে কৃষকদের ফিল্ড-সার্ভিস দান। পরিচালকমণ্ডলীর ১০৬ জন সদস্যই লীফ অপারেশনের কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত।

(ঘ) বীজ উৎপাদন, প্ল্যান্ট ব্রীডিং/বাছাই, রোগ নিয়ন্ত্রণ, নতুন নতুন জাতের বিকাশসাধন, নতুন নতুন জাতের প্রবর্তন, সার, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ, কৃষি কাজকর্ম, জমি ও জলের বিশ্লেষণ ইত্যাদি সহ গবেষণা সার্ভিস। তা ছাড়া, কৃষকদের জন্ত একটি বেশ ব্যাপক অ্যাডভাইসরি সার্ভিসেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর যে অবদান রয়েছে তা সরকারী মহলে সুপরিজ্ঞাত, অত্বেরাও তার প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

১১। আন্তর্জাতিক পুরস্কার/জনসাধারণের প্রশংসা

আমি এবিষয়ে গর্বিত যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলোই ভারতীয় সিগারেটের আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছে। ক্রসেলসের ম'দে সিলেকশনে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তাদের তৈরী ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট স্বর্ণপদক এবং ১৯৭০ সালে সিমলা ও উইগসের উভয় সিগারেটই রৌপ্যপদক ও লেব্র সিগারেট ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

আমি এবিষয়েও গর্বিত যে, ভারত ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো যোগ্যভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো তাদের উল্লেখযোগ্য রপ্তানি কাজকর্মের জন্ত ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রক থেকে সার্টিফিকেট অফ মেরিট লাভ করেছে। তাদের রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টস-এর জন্ত এ বছর নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইণ্ডিয়া প্রথম পুরস্কার প্রদান করেছেন।

১২। মুনাফা—সামাজিক দায়িত্ব

এই বছর ৬ই আগস্ট তারিখে অচলিত বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলাম :

“সুতরাং, আমি প্রথমত আপনাদের এই ধারণা থেকে অবশ্যই বিমুক্ত করবো যে, মুনাফার লক্ষ্যই আপনাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের প্রধান প্রেরণা। আমাদের কাজকর্মের প্রকৃত প্রতিদান, অর্থাৎ আমরা আমাদের সংস্থাকে যে স্বদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছি এবং

সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৭

শেয়ারহোল্ডাররা যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার গ্রাহ্যসম্পত্তি পারিতোষিক হিসেবে তাদের যে যথোপযুক্ত প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছি সেই দিক বিচারেই আমরা মূনাফা (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) সম্পর্কে আগ্রহী। আবার আমরা সমগ্র সংস্থাটিরও কল্যাণ সম্পর্কে আগ্রহী, কারণ শিল্প হচ্ছে সমাজের এমন একটি অঙ্গ যার ওপর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে সম্পদকে উৎপাদনমূলক করে সুসংগঠিত আর্থনৌতিক অগ্রগতি সাধনের।”

পার্লামেন্টে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে কোম্পানি সম্পর্কীয় বিষয়াবলীর ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৫৭/৫৮ সালে (এই সালের উদ্বর্তপত্রই প্রাপ্তব্য সবচেয়ে আগেকার) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১০ লক্ষ টাকা, অথচ এই কোম্পানির ৩০-৬-১৯৬৮ সালের উদ্বর্তপত্রে দেখা যায় কোম্পানিটির পরিসম্পদ ছিল ১২.০৪ কোটি টাকা।

এ কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, গোল্ডেন টোব্যাকো কোং-এর ক্রমবর্ধমান কুৎসামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে সেই সময়ে যখন দত্ত লাইসেন্সিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, মনোপলিজ আইন পাস হয়েছে এবং ভারতে বৈদেশিক পুঁজি নিয়োগ সম্পর্কে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি আমার এই একান্ত কামনা প্রকাশ করছি—এবং সর্বপ্রকার বিনয়ের সঙ্গেই আমি তা পুনরায় প্রকাশ করছি যে, বিভিন্নমুখী নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো ভারতের কল্যাণ ও তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতির গ্রাহ্যদর্শতার সঙ্গতি রেখে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের ভূমিকা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাবে। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিগুলো সরকারের আর্থনৌতিক ও শৈল্পিক নীতি অবিচলভাবে সমর্থন করবে।

তবে এবিষয়ে নিশ্চিতি দেওয়া প্রয়োজন যে, আবহাওয়ার সুরোগ নেওয়া হবে না, যেসব দায়িত্ব সরকারের উপর গুস্ত তা অগ্রাহ্য গ্রহণ করবে না, বাণিজ্যিক দুঃসাহসীপনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জগু আমাদের দেশের আর্থনৌতিক অগ্রগতি ও বিকাশকে বিসর্জন দেওয়া হবে না।

গত ৩১শে আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী এ. এন. হাকসারের প্রদত্ত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার।

প্রকাশিত হল

উদ্বাস্ত

শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (আই. সি. এস অবসরপ্রাপ্ত)

পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তরা আজও এদেশে কাতারে কাতারে আসছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলিতেও আগত উদ্বাস্তর প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক তীব্র সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছিল। এই মানুষগুলি পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বারস্থ হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের সমস্যা কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কি ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা ছিল কতটা, উদ্বাস্তরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের জন্তে কি-পথ নিয়েছিল, উদ্বাস্ত নেতারা কি কি চেয়েছিলেন, কেনই-বা ২২-২৩ বছর পরেও উদ্বাস্ত সমস্যার স্তূর্ধু সমাধান হল না—এ সব কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই বইতে। লেখক উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মুখ্যসচিব ও মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন—এ সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ। উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি—বহুলাংশে সে অভাব মেটাবে এই বই। প্রত্যেক সচেতন পাঠকের অবগুপাঠ্য। [দশ টাকা মাত্র]

সাহিত্য সংসদ ॥ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-২

AS YOUR RESPONSIBILITIES INCREASE SO DOES YOUR NEED FOR SAVING :

The future holds uncertainties, responsibilities. Are you prepared to face them ? Start saving now. Save to meet your future needs. Save to face the challenge of tomorrow. Save with the State Bank of India. 2300 branches of the bank and subsidiaries to assist you.

STATE BANK for SERVICE

আমাদের বই পেয়ে ও দিচ্ছে সমান ভূমি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁরই স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ

কবিচিহ্ন ৫০০

(কল্পা অপর্ণাদেবী সম্পাদিত : মালক : মালা : সাগর সংগীত : অন্তর্ধামী : কিশোর-কিশোরী : অপ্ৰকাশিত রচনাবলী প্রভৃতি অনুলেখে প্রণীত ও সমৃদ্ধ গ্রন্থ)

সঙ্গ অফ্ দি সী ৪০০

[বাংলা সাগর সংগীতের অনুবাদ : লেখক এবং শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত দেবনাগরী হরফেও লিখিত]

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত যুতুজয়প্রসাদ গুহ

চলো যাই টাঁদের দেশে ৩৫০

(বহু মনোরম রঙিন ও বিচিত্র ছবিতে ভরপুর)

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দক্ষিণের বারান্দা ৪৭৫

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র এই গ্রন্থের রচয়িতা। গতানুগতিক ধাচে লেখা জীবনী এ নয়—অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ঠাকুর পরিবার তথা একটি বিশেষ যুগের বাঙলা দেশের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে এ গ্রন্থে। বাংলা ভাষায় একখানা নতুন ধরনের বই।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ বিজ্ঞানধর্ম ৪৫০

বিজ্ঞানের নানা বিভাগে লব্ধ জ্ঞান আহরণ করে এবং তা' মন্থন করে নানা বিষয়ে এমন সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন লেখক যা আজকের দিনের প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর চিন্তাকে স্তম্ভবদ্ধ করবে।

সুশীলকুমার নাগ ॥ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম ১০০০

সুধীরচন্দ্র সরকার ॥ বিবিধার্থ অভিধান ৬৫০

শৈল চক্রবর্তী

ছোটদের ক্র্যাফট ২৫০

অহীন্দ্র চৌধুরী

নিজেরে হারিয়ে খুঁজি ২০০০

রাহুল সংকৃত্যায়ন

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর ৬০০

কানাই লামান্ত

রবীন্দ্র প্রতিভা ১০০০

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বক্ষিমচন্দ্র ৫০০

বিমলচন্দ্র সিংহ

বিশ্বপথিক বাঙালী ৫০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ । কার্তিক ১৩৭৭

সমকালীন

প্রাচীন রোম ও মিউজিয়মের রূপকল্পনা

ভারাপদ সাতত্তর

আজকের দিনে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যদি কোন প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু পাওয়া যায় তা সে পাথরের মূর্তিই হোক বা মূর্ত্তাই হোক,—তবে তা মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সংগৃহীত চিত্রকলা বিষয়ক বহু মূল্যবান বস্তুও মিউজিয়মকে সংরক্ষণের জন্য দান করা হয়। এইভাবেই মিউজিয়মে সংগৃহীত হয় বহু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। রোমের ইতিহাসেও একদিন তাই ঘটেছিল। সেখানে প্রাচীনকালে এইসব মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ সংগৃহীত হতো কোন মন্দির বা দেবায়তনে অথবা অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন অট্টালিকায়। সাধারণতঃ এইসব মন্দির দেবায়তনে থাকতো ধর্মীয় মূর্তি, অঙ্কিত চিত্র, এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রদত্ত শিল্পমূল্য সমন্বিত বস্তু সমূহ।

উদাহরণস্বরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, অলিম্পিয়ায় জিউসের মন্দিরে জিউসের মূর্তি এবং এথেন্সের পার্থে নিয়নে বিখ্যাত শিল্পী ফিডিয়াস কর্তৃক নির্মিত এ থেনা পার্থিনোর মূর্তির কথা। দেওয়াল চিত্র সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় থেসিয়াসের মন্দিরে দেওয়ালের গায়ে ‘পলিগনোটাস’ ও ‘মাইকন’-এর আঁকা সেই যুদ্ধ চিত্রটির কথা যার বিষয়বস্তু হোল এথেনিয়াদের সঙ্গে আমাজোনবাসীদের যুদ্ধ সংঘর্ষ। এ ছাড়াও ডাইয়োনাইসাস ইলেনদিরিয়াস-এর এলাকার মধ্যে অবস্থিত দুটো মন্দিরের মধ্যে একটির গর্ভগৃহে আলকমিনেসের স্তম্ভ একটি দেবমূর্তি এবং সেইসঙ্গে একটি দেওয়াল চিত্রও ছিল। ঐ দেওয়াল চিত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ডায়োনাইসাস নিমজ্জিত হিফাইেসটাসকে তুলে এনে অলিম্পাসকে প্রত্যর্পণ করছে, পেনথিয়াসের শাস্তির চিত্র এবং থেসিয়াস কর্তৃক এরিয়াডনিকে নক্সোস দ্বীপে পরিত্যাগ ও তারপরে গ্রীক দেবতা ডাইয়োনাইসাস কর্তৃক

উদ্ধার কার্য।

আজকের জগতে মিউজিয়মে প্রদর্শিত অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে যেমন আগ্রহীল দর্শকরা ভীড় জমান, তেমনি সে সময়েও ভ্রমণকারীরা খেসপিয়া যেত। বিশেষ করে শিল্পী প্রাক্সিটিলেস সৃষ্ট ভাস্কর্য 'ইরসে'র প্রতিমূর্তি দর্শনলাভের জন্মে এবং স্নিডাসেও যেত দর্শকরা, শুধু ঐ একই শিল্পীর রুত এ্যাপরোডিটের মূর্তি দেখার জন্মে—যা ভেনাসের মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

সেকালে অপরূপ মূর্তি ভাস্কর্য দেখার স্পৃহা সম্পর্কে প্রাচীন রোমান সাহিত্যে কিছু কিছু বিবরণ আছে। এর মধ্যে হিরোডাস-এর লেখা একটি গ্রন্থনের চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, কোস দ্বীপে অবস্থিত আঙ্কলিপিয়স মন্দির দর্শনে আগত দুইজন মহিলার কথা। ঐ দুইজন মহিলার মধ্যে যার নাম কোক্কেলি—তিনি এসেছিলেন দেবতার কাছে তার এক অসুস্থ আত্মীয়ের মানত পূরণের জন্মে। নিজের অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি সঙ্গী এনেছিলেন তার বাস্কবী ক্যারো কে। এখানে মানত পূরণের রীতি ছিল নিজের রুতজ্ঞতা জানিয়ে লেখা একটি ফলক দেবতার কাছে নিবেদন করা। এ ক্ষেত্রে শরীর ও স্বাস্থ্যের দেব-দেবীদের কাছে কোক্কেলি তার প্রার্থনা শেষে, বাস্কবীর পরামর্শমত তার নিবেদিত ফলকটি 'হাইজিয়া' দেবীর মূর্তির ডানদিকে রেখে দিল। এই রাখার সময় কোক্কেলি দেখতে পেল অপরূপ সুষমা সমন্বিত আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সুন্দর শিশুর প্রতিমূর্তি—একটি আপেলের দিকে চেয়ে আছে; সে মূর্তির ভাবব্যঞ্জনা এমনই যে, মনে হবে ঐ আপেলটি না পেলে সে বুঝি মারা পড়বে। একটি বুদ্ধ ও শিশু একটি রাজহংসের গলা ধরে আছে; দেখে মনে হবে পাথরের মূর্তি বলে না জানলে আশা করা যেত যে নিশ্চয়ই এরা কথা বলবে। 'ম্যাটিলেস'-এর কল্পা 'ব্যাটালী'র প্রতিমূর্তি দেখে মনে হবে—ঠিক যেন আসলের মতই অবিকল। এ ছাড়া আরও একটি নগ্ন শিশুর সুষমা সমন্বিত প্রতিমূর্তি সেখানে রয়েছে; দেখে মনে হবে তুমি যদি চিমটি কাটো তাহলে বোধহয় তার গায়ে কালো ও নীল দাগ পড়বে। একটি মাল্লুষের অঙ্কিত চিত্রও এখানে ছিল। ছবিতে সে একটি বুধ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; ছবিতে বুধটিকে এমনভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে যে, মনে হবে যে কোন সময় সে আক্রমণ করতে পারে। স্ততরাং প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে, মাল্লুষের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর ধরে যে রুচিবোধ গড়ে উঠেছিল—তার খুব বেশী পরিবর্তন ঘটেনি।

পরবর্তীকালে রোমের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, মন্দির দেবায়তনের ধর্মীয় আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে মিউজিয়ম গড়ে উঠেছে হেলেনীয় নৃপতিদের রাজপ্রাসাদে। সমাজের যারা ছিলেন পরাক্রমশালী বা ধনশালী—তারা এই সব শিল্পবস্তু সংগ্রহের দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সংগ্রহ করার মূলে যে কারণ ছিল তা হোল, তাদের নিজস্ব সভ্যতার একজন দাবীদার বলে যাতে নিজেদের প্রতিপন্ন করা যায় অথবা তারা যা সংগ্রহ করেছেন তা কোন দরিদ্রলোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়—এই ভাব দেখানো। অল্প দিকে বর্বর বা আধা-বর্বর রাজপুত্রেরা এই সব হেলেনীয় শিল্পকলা সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের বর্বরোচিত চরিত্রটিকে হেলেনীয় রঙের আবরণে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতো। স্ততরাং এ থেকে অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, সে সময়ে

হেলেনীয় সভ্যতার মুখোশ ধারণ পরবর্তীকালে প্রকৃত হেলেনীয় সভ্যতার প্রভাবান্বিত হতে সাহায্য করেছে।

রোমান সাহিত্যে প্রথম আমরা দেখতে পাই অলিম্পিক মিউজদের স্তুতি জানানো হয়েছে কবি এন্নিয়াস রচিত ঐতিহাসিক মহাকাব্য ‘এপালস্’-এ। প্রাচীন কবিরা তাদের কাব্যে অনুপ্রেরণার দেবী হিসেবে ইটালীয় দেবী কামিনিয়াকে স্তুতি জানানো। পরবর্তীকালে আবার কামিনিয়ার বদলে অলিম্পিক মিউজদের স্তুতি করা হয়েছে। কিন্তু মিউজদের প্রতি এই স্তুতিবাদ কিভাবে রোমে এল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা যেতে পারে। রোম নগরীতে মিউজদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ধর্মাত্মক পদ্ধতি এনেছিলেন রোমান জেনারেল মার্কাস ফুলভিয়াস নোবেলিয়র—সেই এ্যামব্রাসিয়া নগরী থেকে; যে নগরী পরবর্তীকালে এটোলিয়নদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পরাজিত হয়ে তিনি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই এ্যামব্রাসিয়া নগরী সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এ্যামব্রাসিয়া একদা ছিল রাজকীয় জাঁকজমকে পূর্ণ রাজ্য পাইরাসের রাজধানী। এখান থেকেই কুলভিয়াস ৭৮৫টি ব্রোঞ্জ ও ২৩০টি মার্বেল প্রতিমূর্তি এবং সেইসঙ্গে প্রভূত পরিমাণ সোনা ও রূপো রোমে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুলভিয়াস এই সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে রোমের সার্কাস কামিনিয়াস-এর কাছে একটি মন্দির নির্মাণ করে তা উৎসর্গ করেন মিউজদের অগ্রতম হারকিউলিসকে। মিউজদের প্রধান এই ‘হারকিউলিস’-এর মূর্তি বোধহয় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এই এ্যামব্রাসিয়াতে এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় লিরা বাদনরত হারকিউলিস-এর মূর্তিও তিনি এ্যামব্রাসিয়া থেকে নিয়ে আসেন। উজোগী কুলভিয়াস আরও যা এনেছিলেন তা হোল শিল্পী জিউক্লিস কর্তৃক নির্মিত পোড়ামাটির মিউজদের মূর্তি এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, মিউজদের ঐ মূর্তিগুলিও তাঁর নির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর এই মন্দিরটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর আনীত শত শত ব্রোঞ্জ ও মার্বেলের মূর্তিতে এবং সেই সঙ্গে মিউজদের মূর্তিতে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এইটিই প্রথম মন্দির; অতএব প্রার্থনা উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছাড়াও যাকে বলা যেতে পারে বর্তমান কালের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রীক শিল্পের এক মিউজিয়ম। অতীতকালে আমরা দেখি রোমান কবি ইন্নিয়াস রোমীয় সাহিত্যে প্রথম মিউজদের কথা প্রবর্তন করেন এবং এই কবিও একদা কুলভিয়াসের এই অভিনব অগ্রতম সঙ্গীও ছিলেন। ইন্নিয়াসের পরামর্শ মতই কুলভিয়াস রোমে মিউজদের এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বাইহোক, আলোচনার ক্ষেত্রে এই আমরা প্রথম দেখলাম যে একজন রোমান ভিক্টর গ্রীসের শিল্পসম্পদ লুণ্ঠনের জন্তে হাত বাড়িয়েছেন। ফলে মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহের বাস্তবিক গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চারিত্রিক ব্যবহারও হয়ে পড়েছে বর্বরোচিত। তবে এর অপর একটি দিকও যে আছে, তা পরবর্তী আলোচনায় এলে বোঝা যাবে।

রোমানরা যখন গ্রীক নগরী সিরাকিউজ অধিকার করে তখন বিজয় উৎসব করার জন্তে প্রথম এগিয়ে আসেন জনৈক রোমান, নাম মারসেলাস। তিনি গ্রীক নগরী লুণ্ঠনের সময় যে সব দ্রব্য পেয়েছিলেন তার মধ্যে নিজের জন্তে শুধুমাত্র রেখে দেন একটি ‘এ্যাসট্রোলোব’—যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের

কাজে ব্যবহার করা হোত এবং বাদবাকী লুণ্ঠিত দ্রব্য ‘অনার’ এবং ‘ভাচু’ দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং পোঁটো কাপিনার কাছে একটি মন্দিরও নির্মাণ করে দেন। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, সিসিরোর মত রোমান অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই তাদের গৃহসজ্জার জন্তে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আজকের মিউজিয়াম জগতের কর্মকর্তাদের মতো সংগৃহীত বস্তুর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে কোন কিছু লিখে রাখার আগ্রহ দেখাতেন না। আর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা যে কি সে চিন্তাভাবনার কথা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি আজকের জগতের চাহিদা মত।

রোমের জীবন যাত্রার অসংখ্য সবি তথ্য সংগ্রহ করলে দেখা যায় যে, রোমের যে সব স্মৃতিস্তম্ভ-গুলি গড়ে উঠেছিল, তাতে অসংখ্য ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত থাকতো। স্মৃতিস্তম্ভের এইসব চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকেরা তাদের বংশধরদের কাছে তুলে ধরতো কীভাবে তারা রোমে সম্পদ আহরণ করেছেন এবং রোমের ইতিহাসের এইনব উপকরণ সংরক্ষণের জন্তে কীভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রোম সাম্রাজ্যের স্রুতে ঠিক এই ধরণের এক বিরাট কীর্তিস্তম্ভ গড়ে উঠেছিল যা অগষ্টাসের ফোরাম নামে কথিত। এই অগষ্টাসের ফোরামকে সে সময়ে বিচারের ও অসৎ সমাবেশের স্থান হিসেবে গণ্য করা হত। এই ফোরামকে একটি ঐতিহাসিক মিউজিয়াম হিসেবে আখ্যা দিতে পারা যায় এই জন্তেই যে, সেখানে দৃষ্টান্ত দিয়ে রোমের ইতিহাসকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে যে সব বীর পুরুষদের অবদান রয়েছে সেই এইনিয়স থেকে অগষ্টাস পৃথক রোমান বীরদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ট্রাজনের স্তম্ভও ছিল সত্যিকারের এক চিত্র প্রদর্শনী—যেখানে যে কোন দর্শকই দেখতে পেতো কেমন করে একজন সম্রাট এবং তার সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের সীমা বর্ধিত করার জন্তে প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছে।

এবার রোমের দেবালয়গুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। একজন শিল্পকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই যদি কনকর্ড এর মন্দিরে যেত, তাহলে সে দেখতে পেতো, জিউজিসের আঁকা মার্সিয়াসের চিত্র, নিসিয়াসের অঙ্কিত ‘লাইবার’ চিত্র এবং থিয়োডোরাসের আঁকা ক্যাসেগুর চিত্র ও সর্বোপরি ইউপারানের স্তম্ভ শিশু এ্যাপোলো ও ডায়না সহ লাটোনার প্রতিমূর্তি, নাইসিরেটাস কর্তৃক নিমিত এস কুলাপিয়াস এবং হাইজিয়াস প্রতিমূর্তি, বাটন কর্তৃক স্তম্ভ এ্যাপোলো ও জুনোর প্রতিমূর্তি, পিটন স্তম্ভ মার্স ও ‘মাকুরি’-এর প্রতিমূর্তি এবং হেনিস কর্তৃক সিরেস, জুপিটার এবং মিনার্ডার প্রতিমূর্তি। এ ছাড়াও মনিমুক্তোর উপর খোদাই করা কাজের নিদর্শন দেখতে আগ্রহী হলে তাকে জুলিয়াস সিজারের ফোরামের মধ্যে অবস্থিত ভেনাস জেনিট্রিক্সের মন্দিরে যেতে হবে যেখানে ছটি সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে। এই সঙ্গেই দর্শকের স্বযোগ ঘটবে ‘আর সেসিলাম’-এর কৃত ভেনাস জেনিট্রিক্সের প্রতিমূর্তি এবং টিমোমাকাসের অঙ্কিত চিত্র। ঠিক এরই পাশে যে স্বর্ণনির্মিত ক্লোপেট্রার মূর্তি—যা সিজার এনে রেখেছিল তাও এইসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষিত হোত। সিজারের রাজপ্রাসাদ ‘পলেটিন’-এ অবস্থিত এ্যাপোলোর মন্দিরে প্রবেশ করলে স্কাপাস কৃত এ্যাপোলোর প্রতিমূর্তি, টিমোথিউস কৃত ল্যাটোনার প্রতিমূর্তি এবং এইসঙ্গে মাইরনের স্তম্ভ চারটি ব্রোঞ্জনির্মিত বৃষমূর্তি দর্শকদের নজরে

পড়তো।

সুতরাং এই ধরণের অনেক বস্তুর তালিকা দিয়ে বলা যেতে পারে কীভাবে রোমের রাজপ্রাসাদে ও দেবায়তনগুলিতে সংগৃহীত হয়েছে বিখ্যাত সব শিল্পবস্তুর নিদর্শন, কিন্তু এছাড়াও রোমের সেই বিখ্যাত স্নানাগারটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই স্নানাগারটির প্রসঙ্গ তুললে বলতে হয় যে এটিকে কেন্দ্র করে রোমনগরী এক বিশাল মিউজিয়মে পরিণত হয়েছিল। উদাহরণ দিলে বস্তুটি আরও পরিষ্কার হতে পারে। অগষ্টান যুগে এ্যাগরিপ্পা কর্তৃক নির্মিত এই স্নানাগারের ভিতরের দেওয়ালে বহু দেওয়াল চিত্র ছিল। পরবর্তীকালে কারাকালার এই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব বস্তু পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়েই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফারনিসিয়ানো মিউজিয়ম এবং ধ্বংসস্থল থেকে প্রত্নবস্তুর অল্পসন্ধান করার ঝাঁক রোমে এই সময় থেকেই ব্যাপক শুরু হয়েছিল। আজকের জগতে নেপলস্ মিউজিয়মের দর্শকদের কাছে ভারসি ও হারকিউলেসের বিরাটাকার মূর্তির সারিতে অবস্থিত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে মাত্র দুটি মূর্তি ঐ স্নানাগার থেকে সংগৃহীত। বাদবাকী রোমের রাজপ্রাসাদ ও শহরতলীর প্রাসাদগুলিতেও যে সব সংগ্রহ ছিল তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রোম সম্রাট নীরোর কথা বলা যেতে পারে; তিনি তার গোয়েন্দা হাউসের জন্তে এমন অনেক বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন। এ ছাড়াও রোম সম্রাট ডেসপাউন তার সহযোগী হাডরাইনের সঙ্গে একত্রে যে ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তা রক্ষিত হয়েছিল টিভোলীর কাছে অবস্থিত রাজপ্রাসাদে। রোমে এই সংগ্রহের প্রতি আগ্রহই পরবর্তীকালে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠায় যে রূপ গ্রহণ করেছে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে।

এরও পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে খৃষ্টধর্মের বিজয়পর্বে গীর্জাগুলিকে কেন্দ্র করে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা পরিণতি লাভ করতে শুরু হয়েছে। প্রতিমাপূজক সম্প্রদায়ের ভজনালায়ে যে সব দ্রব্য সামগ্রী ছিল তা বিজয়ী 'ধর্মসম্প্রদায়' সম্প্রদায় এনে রাখলেন গীর্জার অধিকারে। মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার পথ ধীরে ধীরে স্বগম হয়ে উঠলো। এই সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ হল, কনস্টানটাইন দি গ্রেট-এর রাজত্বের সময় রোমের প্রাচীন সেন্টপীটার গীর্জার ভিত্তিস্থাপন এবং কতকগুলি মূল্যবান অলংকার সমন্বিত প্রত্নবস্তু বা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্তও ধ্বংসের হাত থেকে কোন ক্রমে বেঁচে ছিল—তা শেষ পর্যন্ত এই সেন্ট পীটার গীর্জায় সংরক্ষিত হয়েছিল।

এছাড়াও পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, পেটার্ক এবং পপ্‌গিয়ো প্রভৃতি ইটালীর কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের দিকে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং এরই ফলে পরবর্তীকালে ইটালীর ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ও এদের উদাহরণ অনুসরণ করে চলেছেন। তাই বোধহয় রোমের মুক্তিকার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রত্নবস্তুর অল্পসন্ধান শুরু হয়েছে এরপর থেকেই এবং এই ধরণের প্রত্নবস্তুর সন্ধানে আগ্রহী হয়ে ইটালীর নবজাগৃতির সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী র্যাফায়েল পর্যন্ত একটা আড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন প্রাচীন রোম নগরীকে খুঁড়ে বের করার জন্তে। এইভাবেই একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোপের উদ্যোগে প্রত্ন ও শিল্পবস্তু সংগ্রহের সূত্রপাত কীভাবে হচ্ছে আবার পরবর্তী অধ্যায়ে ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ পোপ সিক্সটাস স্বাক্ষরিত এক লিপিতে দেখা যাচ্ছে, রোম থেকে সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি রোমের জনসাধারণকে কেন্দ্র

দেওয়ার জন্তে পোপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এই ভাবেই মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার এই চেতনাবোধ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়েছিল যে, সেই সময়েই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার জাতীয় সংগ্রহশালা (National Museum) স্থাপিত হয়েছিল শুধুমাত্র রাজা-মহারাজাদেরও ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত শিল্পবস্তু থেকে। এই শতাব্দী আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্তে যে, ব্যাপকভাবে প্রত্নসম্পদ অন্বেষণের আগ্রহই পরবর্তীকালে সম্ভব করে তুলেছিল বৈজ্ঞানিক প্রথায় খনন ও উৎখানের দ্বারা পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার। পরিশেষে এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই আমাদের ভাগ্যে পুরস্কার জুটেছে আধুনিক কালের এই মিউজিয়ম—যা শুধু শিল্প ও প্রত্নবস্তুর প্রদর্শন ও সংরক্ষণের স্থান নয়; গ্রন্থাগার জনপ্রিয় বক্তৃতামালা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিউরেটর মিউজিয়মের প্রকাশনা এমনকি খনন ও উৎখানের কার্যাবলী এ সবই তো মিউজিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার এক যথার্থ রূপায়ণ।

লোকশ্রুতির সংস্কৃতি বিশ্লেষণ

গোরাটাদ কুণ্ড

ফোক-লোর মানব ইতিহাসের মত প্রাচীন হলেও, এর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এবং ক্রমবিকাশ হয়ে বিংশ শতাব্দীতে পৃথক সত্ত্বা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ফোক-লোর শব্দের উদ্ভাবক উইলিয়াম থমস 'ফোক' (অর্থ হল লোক, জনসাধারণ জাতি ইত্যাদি) ও 'লোর' (অর্থ হল বিজ্ঞা পাণ্ডিত্য, জ্ঞান প্রভৃতি) দু'টি ইংরাজী শব্দ সংযুক্ত করে ফোক-লোর শব্দটি সৃষ্টি করেন। আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করলে ফোকলোরের অর্থ দাঁড়ায় জনসাধারণের বিজ্ঞতা বা জ্ঞান, লোকদের বিজ্ঞা পাণ্ডিত্য ইত্যাদি।

পূর্বে ইংলণ্ডে ফোকলোরের বিষয়বস্তুকে বলা হত popular antiquities or popular literature." থমস ভিন্ন মত পোষণ করলেন। তিনি বলেন, "...it is more a Lore than a literature, and would be most aptly described by a good Saxon compound, Folklore—the lore of the people. (Thoms, 1846, 862) থমসের এই সংজ্ঞাকে অনেকে মেনে নিতে পারলেন না। যার ফলে 'ফোক-লোর'-কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই বিতর্কের গুরু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দেই ফোক-লোর শব্দটি চালু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একদল 'ফোক'-এর প্রাধান্য দিয়ে ফোকলোরের বর্ণনা করলেন। আরেকদল ব্যাখ্যা করলেন 'লোর'-এর প্রাধান্য দিয়ে। এই সব বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা বিচার করলে দেখা যায় যে 'লোর'-এর প্রাধান্য দেওয়া সংজ্ঞার সংখ্যা 'ফোক'-এর প্রাধান্য দেওয়া ব্যাখ্যার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। ইদানিং কালে দেশে ও বিদেশে 'ফোক-লোর'-এর গবেষণা হলেও, এখনও ফোকলোর বিজ্ঞানীরা তার ব্যাখ্যায় একমত হতে পারেননি।

লোক বা জনসাধারণ যারা ফোকলোরের উপাদান বা উপকরণের সঙ্গে অভ্যস্ত, তাদের বদলে 'ফোক-লোর'-এর উপাদান বা উপকরণ 'লোর'-এর বর্ণনা করা হয় উৎপত্তি প্রচলিত প্রথা ধর্মাহুষ্ঠান, লোক থেকে অল্প লোকে প্রেরণ, সামাজিক অহুষ্ঠান, প্রভৃতি রূপে। প্রথমে শব্দটি কেবল মাত্র ফোক-লোর বিষয়ের অধ্যয়নের কার্যক্ষেত্রের পরিধি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হত। বিজ্ঞানের যেসব শাখা 'ফোক-লোর' উপাদান বা উপকরণের অধ্যয়ন, বিজ্ঞাভাস, গবেষণা ইত্যাদি করে তাদের বর্ণনা দেওয়ার জন্য।

বর্তমান পাশ্চাত্যের বহু দেশের প্রচলিত রীতি, পদ্ধতির মত ভারতবর্ষেও 'ফোক-লোর' শব্দটি উপাদান, উপকরণ প্রভৃতির গবেষণা করা, মনোনিবেশ করা, পরীক্ষা করা ইত্যাদির প্রকাশার্থে চালু। তবু ফোকলোর বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'ফোক-লোর'-এর প্রকৃতি নির্ণয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয়ে সমস্ত ফোকলোর বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত যে, ফোক-লোর পুরুষাত্মক বংশপরম্পরায় মৌখিক ভাবে পরিবাহিত ও প্রচারিত।

এই প্রায় 'সর্ববাদী সম্মত' মতের কিছু অল্পবিধা আছে। প্রথমতঃ, আদিমজাতি ও আধুনিক সভ্যতা সম্পন্ন জাতির শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যা পুরুষাল্লক্রমে মুখে মুখে প্রচারিত ও পরিবাহিত। যেমন দাঁত মাজা, হল চালনা করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, লিখন পদ্ধতিবিহীন আদিম জাতির সংস্কৃতির এমন উপাদান আছে যেগুলি সংস্কৃতির উপাদান ও উপকরণ এবং পুরুষাল্লক্রমে বংশপরম্পরায় মৌখিক পরিবাহিত, প্রচারিত। কিন্তু বহু ফোক-লোর বিজ্ঞানী এইগুলিকে 'ফোক-লোর'-এর উপাদান বা উপকরণ হিসাবে গণ্য করতে চাইবেন না। যথা—ভাষা, বিবাহ, রীতিনীতি, শিকার পদ্ধতি ইত্যাদি। তাহলে পুরুষাল্লক্রমে বংশপরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রবাহিত সব কিছুই ফোক-লোরের আওতায় পড়ে না।

আবার 'ফোক-লোর'-এর এমন অনেক উপাদান বা উপকরণ আছে যা মৌখিক ভাবে ছাড়াও কেবল মাত্র অল্পকরণের মাধ্যমেই পুরুষাল্লক্রমে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। যেমন—নৃত্য, ক্রীড়া, অঙ্গভঙ্গী, আকারইঙ্গিত, ইত্যাদি। অতএব 'ফোক-লোর'-এর উপাদান বা উপকরণ কেবলমাত্র মৌখিক ভাবে নয়, অল্পকরণের মাধ্যমেও পুরুষাল্লক্রমে বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়।

নৃত্যবিদ উইলিয়াম আর বসকনের অভিমত হল যে, সমস্ত ফোক-লোরই মুখে মুখে প্রচার করা হয়, কিন্তু মুখে মুখে প্রচারিত সব কিছুই ফোক-লোর নয়। তিনি ফোক-লোরকে মৌখিক শিল্প-বিজ্ঞা বলেছেন। এবং তার সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে গদ্যাকারে ব্যক্ত প্রবাকাহিনী, লোক-শ্রুতি, ইতিকথা বা ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি হল ফোক-লোর। কিন্তু ফোক-ডান্স ফোক বিলিক প্রভৃতি ফোক-লোর আওতায় পরে না। তিনি আরো বলেছেন যে, লোক-সঙ্গীত ও গীতি নাট্যের কথা ফোক-লোর, কিন্তু সঙ্গীতাংশ নয়। বসকনের এই ব্যাখ্যাকে, অনেক ফোক-লোর বিজ্ঞানী অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে মনে করেন।

ফোক-লোরের উপাদান, উপকরণ হল সেই সব উপকরণ, উপাদান, যেগুলি শিল্পকলা, মানসিক গুণাগুণ, মানসিক গোষ্ঠী মনের প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি বহন করে, গোষ্ঠীর সংস্কৃতির গঠন, ধারণ, প্রকাশ-প্রভৃতির কিছুটা সহায়ক হয় এবং মৌখিক, অল্পকরণ অথবা উভয়ের মাধ্যমেই পুরুষাল্লক্রমে বংশপরম্পরায় অনায়াসে প্রচারিত ও প্রবাহিত হয়।

সহজ সরল ও অনায়াস বোধ্যই হচ্ছে ফোক-লোরের সাধারণ ধর্ম। কারণ এর ভাব ও ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত। এর বাণীবিশ্বাসে তাই অমার্জনা রয়েছে। অলঙ্কারের অভাবও আছে। কখনও কখনও আছে সুলভাও। তবু এর আন্তরিকতায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ লোক-মনের সঞ্চারিত ও প্রবাহমান ভাবধারাই কেবল ফোক-লোর আকারে প্রকাশ লাভ করে থাকে; এবং তা প্রকাশ করার জন্ত লোক তেমন আয়াস প্রয়াসও করে না বাণীবিশ্বাসের জন্ত। অনেকটা যেন যা ভাষা তাই বলার মত।

অনেকের ধারণা ফোক-লোর ইদানিং কালে এবং শহর বা নগরে সৃষ্টি হয় না। এর উৎপত্তি প্রাচীন কালে। বর্তমানে যেসব ফোক-লোর পাওয়া যায়, তা হচ্ছে অতীতে সৃষ্ট ফোক-লোরের ছিটে ফোটার উদ্ভব। এবং শুধু পাওয়া যায় গ্রাম, সহরতলী, পল্লী প্রভৃতি স্থানের

কৃষকাদি অধিবাসীদের কাছে। অচিরেই এই সব বিলুপ্তমান ফোক-লোর বিশ্ব্তির গহবরে লুপ্ত হবে।

এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে আছে যে, এর শহর, নগর প্রভৃতির লোকেদের 'ফোক' হিসাবের স্বীকার করেন না। কৃষক, নিভৃত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী প্রভৃতিরাই এনাদের কাছে 'ফোক'। বস্তুতঃ 'ফোক' হচ্ছে লোক, জনসাধারণ জাতি—সে শহরেই বাস করুক, কিম্বা গ্রাম বা পল্লী অথবা জঙ্গলের অভ্যন্তরে যেখানেই থাকুক আদিম বা আধুনিকের বাছবিচার নেই। এই প্রসঙ্গে Alen Dundes-এর বক্তব্য প্রাধান্য যোগ্য। তিনি বলেছেন,

"The term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is—it could be a common occupation, language, or religion—but what is important is that a group formed for whatever reason will have some traditions which it calls its own."

ফোক-লোর আগেও যেমন সৃষ্টি হয়েছে, এখনও তেমনি সৃষ্টি হয় পাহাড়ী জঙ্গলের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে। শহর নগরও বাদ যায় না। শহর নগরের স্কুল, কলেজ বা বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র গোষ্ঠী মধ্যে যেমন, তেমনি গ্রামাঞ্চল ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যেও বহু ফোক-লোর সৃষ্টি হয় দুর্দে শিক্ষক, অথবা অমনযোগী অধ্যাপক প্রভৃতির নিয়ে। ছাত্র জীবনের স্বথ দুঃখ নিয়েও সৃষ্টি হয় কবিতা, গান, ছড়া প্রভৃতি। যেগুলি ফোক-লোরের আওতায় পড়ে। কারণ এই গল্প, কবিতা, গান প্রভৃতির বেশির ভাগই একদল ছাত্রর কাছ থেকে আরেকদল ছাত্রের কাছে পরিবাহিত ও প্রচারিত হয় মুখে মুখে। বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী প্রভৃতিরও বহু ফোকলোরের উপাদান সৃষ্টি করেন এবং ঐসব মুখে মুখেই পরিবাহিত হয়। শ্রমিক গোষ্ঠীও পিছিয়ে নেই। তারাও সৃষ্টি করছে ফোক-লোরের বহু উপাদান উপকরণ এবং লোক থেকে লোকে প্রচারিতও হচ্ছে মুখে মুখে।

একটা কথা বলা প্রয়োজন যে অনেকেই অনেক কিছু সৃষ্টি করছে; কিন্তু সব কয়টিই ফোক-লোরের মর্যাদা পায় না! যে সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট লোক সমাজ সমাদৃত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, সেইটিই ফোক-লোর রূপে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ ফোক-লোর সৃষ্টির মূলে যেমন সৃষ্টি-মনস্তত্ত্ব আছে তেমনি আছে উপলব্ধি-মনস্তত্ত্ব। এই দুই মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া যখন কোন সৃষ্টিতে সমন্বিত হয়, তখনই সেটি ফোক-লোরের আওতায় আসে। অন্ততঃ বহু সৃষ্টি অচিরেই বিলুপ্ত হয়।

পুরাণকাহিনী, ইতিকথা, লোক-শ্রুতি, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, গীতিনাট্য, লোক-বিশ্বাস, অপভ্রাষা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কৌতুক, অঙ্গীল-ভাষা, জৌড়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি আরো অনেক কিছু একটা বৃহৎ তালিকা আছে, যেগুলিকে ফোক-লোরের উপাদান ও উপকরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য এই তালিকার সব কটিকেই যে সকলে ফোক-লোরের উপাদান বা উপকরণ রূপে স্বীকার করেছেন তা নয়। কিছু কিছু মতান্তর এখন আছে।

ইংরাজী শব্দ ফোক-লোর সর্বপ্রাচীন বলা যায়। ইংলণ্ড, আমেরিকা ছাড়াও ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইটালি, রাশিয়া প্রভৃতি আরো অনেক দেশেও ফোক-লোর শব্দটি চালু। ভারতবর্ষেও

ফোক-লোর শব্দটি চালু থাকলেও স্বদেশীয় পরিভাষায় ফোক-লোরের সদৃশ বা তুল্য শব্দ সৃষ্টির জন্য অনেকে তৎপর হয়েছেন। ‘ফোক-লোর’-এর বঙ্গানুবাদ রূপে ‘লোক-শ্রুতি’ ব্যবহার করেছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘লোক-শ্রুতি’ শব্দটিকে ‘ফোক-লোর’-এর সম্পূর্ণ সদৃশ বা তুল্য মনে করেন না। এমন কি তিনি হিন্দীতে প্রচলিত ‘লোকবর্তা’ শব্দটিকেও ‘লোক-লোর’-এর সম্পূর্ণ সদৃশ মনে করেন না। তাঁর মতে ‘লোক-যান’ শব্দটিই হচ্ছে ফোক-লোর শব্দের সম্পূর্ণ সদৃশ পরিভাষা। লোক-যান শব্দের তাৎপর্য বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, “জনসাধারণের (লোক) মধ্যে যে জীবনযাত্রা (যান) পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞা অথবা কুটুর্ক ছাড়াও পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত।”

লোক-যান শব্দটিকে স্বীকার করে নেওয়া এখন থেকে ফোক-লোর শব্দের পরিবর্তে ‘লোক-যান’ শব্দ ব্যবহার করা হবে। আর ‘লোক-শ্রুতি’ ব্যবহার করা হবে ফোক-টেল-এর পরিভাষা রূপে।

বসওয়েল ও রিভারের মতে ‘লোক-যান’-কে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—
ক্রিয়া বা অঙ্গভঙ্গী ২। বিজ্ঞান ৩। ভাষাবিজ্ঞান ৪। সাহিত্য।

শেষোক্ত শ্রেণীই হল লোক-যানের অভিজ্ঞাত শ্রেণী। এই শ্রেণীর অন্তর্গত হল পুরাকাহিনী, ইতিকথা, লোক-শ্রুতি, মহাকাব্য, নাটক, গাথা, কণ্ঠসঙ্গীত ইত্যাদি। কিন্তু এ সবেরই মূল প্রোথিত অঙ্গশ্রেণীর উপর। ভাষার অবর্তমানে কোনটির যেমন অন্তিম থাকতে পারে না, তেমনি ভাব ধারণা ব্যতিরেকে সবই হয় শূণ্যগর্ভ ও অর্থহীন। ক্রিয়া বা অঙ্গভঙ্গীর অভাবে গান বিশেষতঃ নাটকের সত্তা থাকতে পারে না।

বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতবৃন্দ লোক-যানের শ্রেণী বিভাগ করেই ক্ষান্ত হননি। প্রকৃতগত বৈষম্য লক্ষ্য করে লোক-সাহিত্যের প্রকার ভেদ করেছেন। পুরাকাহিনী ইতিকথা লোক-শ্রুতি হলেও তাদের পৃথক সত্তা স্বীকার করেছেন।

পুরাকাহিনী দেবদেবী ও অস্রাশ্র অলৌকিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত হয়। কি করে পৃথিবী সৃষ্টি হল, কি ভাবে মানুষের উৎপত্তি? প্রথমত মানুষ কে? দুঃখ কষ্ট পৃথিবীতে এল কি করে? এবং বিধি ভ্রমোদ্য বিষয়ের সমাধান মানুষ কল্পনা শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করে পুরাকাহিনীতে বর্ণনা করে, এবং জাতির শ্রদ্ধেয় দেবদেবীর অলৌকিক ক্রিয়া শক্তি সংযুক্ত করে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করে।

ইতিকথা রচিত হয় জাতির কোন বীর অথবা সাধক অবলম্বনে; কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঐতিহাসিক বাস্তবতা অবলম্বনে।

কিন্তু প্রত্যেক জাতির বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এমন কতকগুলি গল্প বা fables আছে যাদের Max Muller-এর ভাষায় বলা যায় untrue or fabulous। গল্প বা fables এর উৎপত্তি বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য, প্রধানতঃ হল জনসাধারণ বা লোকেদের আনন্দ দেওয়া এবং তাদের মনকে আমোদিত করা। এই সমস্ত গল্প বা fables জাতির বা গোষ্ঠীর folk tale বা লোক-শ্রুতি নামে পরিচিত।

লোক-শ্রুতির সম্বন্ধে Macculloch-এর অভিমত, "Folk-tale are the earliest form of romantic and imaginative literature the unwritten fiction of early man and of primitive people in all parts of the world."

অভিধানে (Dev, 1962 P 525) Folk tale-এর-বঙ্গানুবাদ লোক-কথা প্রচলিত থাকলেও Folk-tale-এর তুল্য বা সদৃশ নয়। লোক কথা শব্দে মনে হয়, লোকদের কাছ হইতে কথা অথবা লোকদের জন্ম কথা। অনেকটা যেন রটনা, গুজব বা প্রচার জাতীয়। ফোক-টেল রটনা, গুজব বা প্রচার জাতীয় তো নয়ই, বরং ফোক-টেল এর প্রয়োজন বহুবিধ। এর ভিতর দিগ্নে লোক মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় জাতির সংস্কৃতি এবং শিক্ষা দীক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির প্রভাবে অবদানিত কামনা বাসনা প্রভৃতির প্রতীকের সহায়তায় পরিতৃপ্ত লাভ ইত্যাদি।

'ফোক-টেল' এর সদৃশ যথার্থ বঙ্গানুবাদ হল 'লোক শ্রুতি'। লোক-শ্রুতি ব্যক্ত করার প্রধান উদ্দেশ্য হল লোকদের নিছক আনন্দ দেওয়া ও মনকে আমোদিত করা। এই আনন্দ ও আমোদ পাওয়া যায় কেবলমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে কর্ণ ছাড়া অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ নেই। লোক-সঙ্গীতেও আনন্দ পাওয়া যায় কেবলমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে। তবে সেটা হল ছন্দবদ্ধ। আর লোকশ্রুতি হল গদ্যময়। লোকশ্রুতিতে জাতির কোন দেবদেবী বা অলৌকিক ঘটনার যোগ থাকে না, যোগ থাকে না কোন ঐতিহাসিক পুরুষ, স্থান বা কালের। এই কারণেই পুরা কাহিনী, ইতিকথা প্রভৃতি গণ্যকারে ব্যক্ত ও শ্রুতির দ্বারা আহৃত হলেও লোকশ্রুতি থেকে পৃথক যোদ্ধা কথা লোক-শ্রুতি হল, জনসাধারণের (লোক) শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত সেই সব গদ্যময়, গল্প (শ্রুতি), যেগুলি কেবলমাত্র লোকদের আনন্দ দেওয়া মনকে আমোদিত করার জন্যই বংশপরম্পরায় পুরুষাবলীক্রমে মুখে মুখে প্রচারিত হয়। এবং যার সঙ্গে জাতির আরাধ্য দেবদেবী বা ঐতিহাসিক ঘটনাদির কোন যোগাযোগ থাকে না।

লোকশ্রুতির সংস্কৃতি-বিশ্লেষণ অথবা মনঃসমীক্ষণ, যাই করা হোক না কেন তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল সংশ্লিষ্ট লোকদের আচার, পদ্ধতি, বিশ্বাস, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অপভাষা গালিগালাজ, বিবাহাদির রীতিনীতি, প্রভৃতির সব কিছুর যতদূর সম্ভব বিস্তারিতভাবে জানা। এই কারণেই অতি সংক্ষেপে ভূমিয়া বাইগাদের বিবরণ দেওয়া হল।

নৃত্তবিদদের মতে শ্রেণী বিভাগ করলে ভূমিয়া বাইগারা মুণ্ডা অথবা কুলারিয়ানদের তুল্য। এদের মস্তক চোকা, হনু অনতিরিক্ত উন্নত, উচ্চ নাসিকা, বিস্তৃত নাসারন্ধ্র, দীর্ঘায়ত চোখ। গাত্রবর্ণ উজ্জল গৌর থেকে ঘন কৃষ্ণ। কেশদাম পুরু, লম্বা ও কালো। পুরুষরা তাদের দীর্ঘ কেশকে জড়িয়ে শক্ত করে 'জুড়া' বাঁধে। 'জুড়া' বাম কাঁধের কাছে ঝোলে। তাতে গৌজা থাকে 'চুঙ্গি' (তামাক খাওয়ার জন্য শালপাতার কলকে)। মেয়েদের 'জুড়া' কিন্তু অনেকটা এলো খোঁপার মত আলগা বাঁধা। মেয়েরা 'জুড়া' সাজায় কখন মোতি, মল্লয়া প্রভৃতির ফুলফলে কখন বা গুটির (পুঁতি) মালায়। নাচের সময় পরে ময়ূরের পাখায় প্রস্তুত 'কলগি', লাল সূতার 'লাছা' কিম্বা হলুদে রাঙ্গানো গুকনো ঘাসের ছলদে শিকল 'বিরণ'।

একদল বিজ্ঞানীদের মতে বাইগাভাষা হচ্ছে ছত্রিশগড়ির বিকৃত আকৃতির সঙ্গে গোণ্ডি, বুঙিলি, ও অন্যান্য ভাষার শব্দ, বাগধারা ইত্যাদির মিশ্রিত ভাষা। আরেক দলের মতে বাইগা বুলি হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের হিন্দী আওয়াদি ও গোণ্ডিমিশ্রিত ভাষা।

ভূমিয়া বাইগারা উলঙ্গ নয়। তবে তাদের পোষাক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পুরুষেরা পরে 'ফাটুকু' (লেঙ্গটি)। দেহের উর্দ্ধাংশ সাধারণতঃ উন্মুক্ত থাকলেও গ্রীষ্মে এক পিছোড়ি উড়িয়ান এবং শীতে মোটা কব্বলে আবৃত হয়। মেয়েদের পরিধেয় হল খর্বকায় শাড়ীর মত কাপড়া, বাগড়া, চকধরিয়া, বা মুঙ্গি। কাপড়ের একটা কোণ নিতম্বের নীচে ত্রিভুজাকৃতিতে ঝুলিয়ে অবশিষ্টাংশ মাজায় পেঁচ দিয়ে শাড়ীর মত ডান কাঁধের উপর দিয়ে তুলে দেহে জড়িয়ে নেয়। ব্লাউস, সায়া বা সেমিজের কোন বালাই নেই। শীতের আচ্ছাদন হল পুরুষদের মত এক মোটা কব্বল।

ভূমিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করে যেমন, তেমনি গহনাও তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। গহনা বেশীর ভাগই হয় লোহার, নয় পিতলের, অথবা দস্তার। সোনা বা রূপায় গহনার প্রচলন তো দূরের কথা, ত্রাখেইনি তারা। পুঁতির মালা ও কাঁচের চুড়ির আদর মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ভূমিয়া বাইগাদের মধ্যে ধাতুর বাসনের প্রচলন নেই। তারা কাঁচা শালপাতা একসঙ্গে করে পাতার বোঁটা ও কাঠি গুজে বাটির মত করে 'দোনা' বানায়। ঐ দোনাতেই তারা জল পান করে, তাদের প্রধান খাদ্য গেজ খায়। আগড়িয়া নামের অল্প এক আদিম জাতি তাদের 'কোটি'তে (লোহ আকর গলাবার চুল্লী) লোহ আকর গলান কাঁচা লোহার ভূমিয়া বাইগাদের শিকার, কাঠ কাটা ও আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত লোহার 'টালিয়া' 'ফরসি' ও তীরের কলা তৈরী করে দেয়।

ভূমিয়াদের শিকার এককালে প্রধান উপজীবিকার অন্যতম হলেও বর্তমানে, বাইগাচকের বন, বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায়, শিকার বন্ধ। বেশীর ভাগই গৃহপালিত শূকর, মুরগী বা ইঁদুরের মাংসের উপর এরা নির্ভর করে। এরা কাকের মাংসও খায়। এদের বিশ্বাস কাকের মাংস খেলে বুদ্ধ বয়সেও চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয় না। এরা কিন্তু গরুর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, গরুকে মারা বা স্নান করানর কথাও চিন্তা করতে পারে না। এরা গরুকে মাতৃরূপে ভক্তি করে। গরুকে স্নান না করানর কারণ হিসাবে বলে "মাকে স্নান করালে মার বেইজ্জৎ করা হয়।" এরা গরুকে দিয়ে ধান মাড়ায় না। কারণ হিসাবে বলে যে, ধান মাড়াইয়ের সময় কোন ক্রমে গরুর রক্ত যদি ধানে লেগে যায়, তা'হলে ধান অশুচি হবে তখন আর সেই ধান ব্যবহার করা যাবে না।

ভূমিয়া বাইগাদের প্রধান উপজীবিকা বেঁওর চাষ। অধুনা কিছু কিছু লাদল চাষের প্রচলন হলেও এরা লাদল চাষের অল্পকুলে নয়। লাদল চাষের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের মূলে রয়েছে তাদের চিরচরিত বিশ্বাস যে, লাদল দিয়ে ধরিত্রীমাতাকে চিড়লে ধরিত্রীমাতা রুষ্ট হবেন, এবং বেঁওরে ফলন কমিয়ে দিয়ে তাদের ভুখায় মারবেন।

এমনি ধারা ভূমিয়া বাইগাদের আরো অনেক বিশ্বাস, ধারণা আছে, যা দেখে স্বভাবতঃই

মনে হতে পারে যে এদের লোক যানের উপকরণ, উপাদান ইত্যাদি অত্যন্ত অমার্জিত ও স্থূল ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে আদিম জাতি ও আধুনিক সভ্যতা সম্পন্ন সমতলবাসী উভয়েরই প্রায় সমস্ত বিশ্বাস ধারণা ইত্যাদি মান্নবের দুটি ক্ষুধাকে ঘিরেই আছে। আধুনিক সভ্যজাতি ভাষার আবরণে আবৃত করে রাখতে পারে অমার্জিত স্থূল বাসনা, কামনা ধারণা ইত্যাদিকে। কিন্তু আদিম জাতির ভাষা সাধারণতঃ তেমন সমৃদ্ধ নয়, তাই তাদের ভাব, ধারণা বিশ্বাস ইত্যাদি অমার্জিত অবস্থায় সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ হয়।

ভূমিয়া পুরুষদের একাধিক বিবাহ ও একত্রে সাত আটটি স্ত্রী রাখা অস্বাভাবিক নয়। সংগতিপন্ন ভূমিয়া বাইগারা স্বচ্ছলতা প্রমাণের জন্ত একাধিক বিবাহ করে কিম্বা বউ বানিয়ে নেয়। স্ত্রী সংগ্রহের জন্ত মাতা, মাতৃস্থানীয়া, সহোদরা, মাসভূতো ভগিনী ও সম গড় বা গড়াভিত্তি সম্পন্ন নারী ছাড়া বয়ঃজ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা কুমারী, বিধবা বা সধবার বাছবিচার নেই। ভূমিয়াদের জীবনে ওদের ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে ‘বিহা’ (বিবাহ) একবারই হয়। অগ্ন্যগ্ন্যবায় সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বর কনের উপর কেবলমাত্র তেল হলুদ ছিটিয়ে দিয়ে স্বামী স্ত্রী রূপে স্বীকার করে নেয় গ্রামবাসী। একে ভূমিয়া বাইগারা বউ বানিয়ে নেওয়া (বানই) বলে। ভূমিয়া বাইগাদের বিবাহে কত পণ, যাকে এরা বলে ‘সুক’ দিতে হয়।

সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিকে ভূমিয়া বাইগারা দেবতা হিসাবে মান্য করলেও, তাদের আরাধ্য দেবতা নয়। ওদের আরাধ্য দেবতা হল নারায়ণ দেও, রাতমাই, ছলিদোলা, ভবানী, বায়রওয়ানী, ঠাকুর দেও, খেরমাই, বা মহারানী ও ভীমসেন। এই সব দেবদেবীর নামে ভূমিয়া বাইগারা তাদের অপত্যদের নাম রাখে না। তারা সন্তানদের নাম রাখে জন্ম সময়ের মাস বা বারের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে অথবা মানসিক ও দৈহিক গুণাগুণ লক্ষণ দেখে; কিম্বা জন্মকালীন ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন ডারু (প্রবল বর্ষণ), ভুরী (নদীতে বান এসেছিল) ইত্যাদি।

আহার ও পানীয় ব্যতীত ভূমিয়া বাইগারা সাধারণতঃ জল ব্যবহার করে না। কয়েক বছর আগেও এরা সারা বছরে একদিন ‘ফাগতিহার’-এ (দোল পূর্ণিমা) তারা স্নান করত। আধুনিক কালে ততটা না হলেও, এখন অনেকে মাসে একদিন অর্থাৎ বছরে বারদিনেও স্নান করে না। স্নান না করার যুক্তি হিসাবে বাইগারা বলে যে, স্নান করলে তাদের কৃত পাপ ধোত হয়ে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করবে। ফলে ধরিত্রী মাতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বেঁওরে ফলন কমিয়ে দেবেন।

ভূমিয়া বাইগাদের আমোদ প্রমোদও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। ওদের একক নাচের প্রচলন তেমন নেই। প্রায় সবই সমবেত নাচ। যথা—কর্মা, ঝরপট, বিহা, ইত্যাদি। আর ওদের গান হল কর্মা, ধাড়ি কর্মা, ঝরপট, বিহা, দাদরিয়া প্রভৃতি। নাচের মত কর্মা, বিহা, ঝরপট, প্রভৃতি সাধারণতঃ সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। কিন্তু দাদরিয়া প্রায়ই এককভাবে গাওয়া হয়। উদাহরণ হিসাবে একটি দাদরিয়া গান দেওয়া হল।

“তেল লা চুলার কে নিকারে পাটি

মোলা বোর নিক লাগে দোস্ত।

কেইছে সত্তরো কে ছাতি রে

মোলাবোর নিক লাগে দোস্ত।

[অর্থাৎ, যখন সে তার কেশ তেল দিয়ে আঁচরায় তখন আমার খুব আনন্দ হয় বন্ধু।

আমার প্রেমিকার স্তন কি হৃন্দর, আমার অত্যন্ত আনন্দ হয় বন্ধু।]

ভূমিরা বাইগাদের জীবনযাত্রা বহুবিধ বিশ্বাসে পরিবেষ্টিত। এইসব বিশ্বাস এমনভাবে মিশে আছে তাদের জীবনচক্রের সঙ্গে পৃথক করে দেখা প্রায় অসম্ভব। সমতলবাসী এইসব বিশ্বাসকে কুসংস্কার বা উপধর্ম (superstition) মনে করলেও, ভূমিরা বাইগাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঐ সবই সত্য ও তাদের ধর্মের অঙ্গ।

লোকশ্রুতি (বাইগা ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা)

১। রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ কন্যা—একদেশের রাজপুত্র প্রতিদিন সকালে নদীতে স্নান করার পর, এক গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতো। সেই দেশের এক ব্রাহ্মণ কন্যাও প্রতিদিন সকালে নদীতে স্নানের পর সেই শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতো। এমনি করে তিন বছর কেটে যায়, কিন্তু রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে দেখা হয় না। কখন রাজপুত্র আগে শিবের মাথায় জল ঢেলে চলে যায়, পরে ব্রাহ্মণ কন্যা জল ঢালে। শেষে একদিন উভয়ে একই সময়ে উপস্থিত হয়। তখন কে আগে জল ঢালবে এই নিয়ে রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণকন্যার মধ্যে তর্ক শুরু হয়।

তখন রাজপুত্র বলে, “এসো আমরা বাগড়া না করে ছুঁজনে একসঙ্গে মহাদেবের মাথায় জল ঢালি।” ব্রাহ্মণ কন্যাও রাজপুত্রের কথায় রাজী হয়ে যায়, এবং ছুঁজনে একসঙ্গে মহাদেবের মাথায় জল ঢালে। তারপর রাজপুত্র ঐ ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়ী নিয়ে যায়। রাজা ব্রাহ্মণকন্যাকে মহাদেবের দান মনে করেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ কয়েকদিন ধরে কন্যাকে ঘরে ফিরে আসতে না দেখে, ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েন, এবং কন্যাকে খোঁজ করতে বার হন।

খুঁজতে খুঁজতে গ্যাথেন যে, রাজার বাড়ীতে খুব ধুমধাম করে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে রাজপুত্রের বিয়ে হচ্ছে। অহুসন্ধান করে আরো জানতে পারলেন যে, রাজপুত্রের বিয়ে হচ্ছে তারই কন্যার সঙ্গে। ক্রুদ্ধ মনে তিনি রাজার বাড়ীতে যান। রাজাকে বলেন, “আপনি অত্যাচার করেছেন। আমাকে না জানিয়ে আমার কন্যার সঙ্গে আপনার পুত্রের বিয়ে দিচ্ছেন। আপনাকে পাঁচহাজার টাকা স্বত্ব দিতে হবে জরিমানা হিসেবে।”

রাজা ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখে ভয় পেয়ে যান, এবং তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে দেন। ব্রাহ্মণ পাঁচহাজার টাকা পেয়ে হঠমানে জামাইকে সোনার থালা, বাটি, গেলাস প্রভৃতি নানা বাসন কিনে দেন।

২। বিছা শিখে নাও—পুরাকালে কোন এক শহরে সহরে একজন ছেলে এসে বলতে থাকে, “বিছা শিখে নাও। বিছা শিখে নাও।” রাজা এই খবর পেয়ে গোপনে অহুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, একজন ছেলে তাঁর রাজ্যে বিছা বিক্রয় করছে। রাজা তখন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনেন। সেই ছেলে রাজার কাছে এসে “রাম রাম” বলে অভিবাদন করে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার নাম কি? ছেলেটি উত্তর দেয় “আমার নাম জয়কুমার।”

রাজা তখন জয়কুমারকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কোথা থেকে আসছো?”

জয়কুমার উত্তর দেয়, “আমি মারোয়ার থেকে আসছি।”

রাজা আবার জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি বিত্তা বিক্রয় করছ? আর তার দাম কত?”

জয়কুমার বলে, “আমার কাছে তিনটি বিত্তা আছে। প্রত্যেকটির বিত্তার দাম একশত টাকা। আপনার যদি ইচ্ছা হয় তা’হলে তিনশত টাকা আমাকে দিন আমি তিনটে বিত্তা শিথিয়ে দেব।”

রাজা বলেন, “আগে তোমার বিত্তা শিথিয়ে দাও তারপর তোমাকে টাকা দেব।”

তখন জয়কুমার বলে, “রাজা সাহেব প্রথম বিত্তা হল ‘মরদকো জাগাতো ভালো’—পুরুষের জেগে থাকা ভাল।”

রাজা তখন জয়কুমারকে একশত টাকা দেন। জয়কুমার টাকা নিয়ে বলে, “আমার দ্বিতীয় বিত্তা হল, ‘তিরিয়াকো এম্না ভালো’—এর মানে হল স্ত্রীলোকদের শাসন করা ভালো।”

রাজা তখন জয়কুমারকে আরো একশত টাকা দেন। জয়কুমার টাকা নিয়ে বলে, “আমার তৃতীয় বিত্তা হল, ‘রাজাকো বিবেকি ভালো’—এর মানে হল রাজার সব সময় বিবেচনা করে কাজ করা ভালো।”

রাজা জয়কুমারকে আরো একশত টাকা দেন। জয়কুমার টাকা নিয়ে বলে, “রাজা মহাশয় আমি তিনটে বিত্তা শিথিয়ে তিনশত টাকা পেয়েছি। আপনি সব সময়ে এই তিনটে বিত্তা মনে রাখবেন। এই বলে জয়কুমার রাজাকে অভিবাদন করে চলে যায়।

জয়কুমার চলে গেলে রাজা তখন ভাবেন তিনশত টাকায় তো তিনটে বিত্তা শিখলাম এখন এর পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম বিত্তানুসারে সারা রাত জেগে থাকতে হবে। এইভাবে রাজা সেইদিন রাত্রে না ঘুমিয়ে, নিজের রাজত্বে বেড়াতে লাগলেন। বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন যে, কোথাও রামায়ণ পাঠ হচ্ছে, কোথাও গান বাজনা হচ্ছে, কোথাও ভজন হচ্ছে। এই দেখে রাজার খুব আনন্দ হয়। তিনি বেড়াতে লাগলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর রাজা তাঁর ছেলের মত একজনকে দেখতে পান। রাজা সেই ছেলেটিকে ডাকেন, কিন্তু সেই ছেলেটি রাজাকে দেখে ভয়ে পালাতে থাকে। রাজা তখন রেগে গিয়ে সেই ছেলেকে গুলি করবার জন্য বন্দুক ওঠান। কিন্তু তাঁর মনে পড়ে যে জয়কুমার বলেছিল যে রাজার সব সময় বিবেচনা করে কাজ করা ভাল। এই কথা মনে আসতেই রাজা গুলি না করে বন্দুক নামিয়ে নেন। ঘরে এসে রাজা খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, যে ছেলে তাঁকে দেখে পালিয়েছিল সে তাঁর নিজের ছেলে। তখন রাজা মনে মনে ভাবলেন যে বিত্তা ক্রয়ের একশত টাকা উত্তুল হল। যদি না বিবেচনা করতাম তা’হলে আজ নিজের ছেলেকেই গুলি করে মেরে ফেলতাম।

রাজা পরের দিন রাত্রেও না ঘুমিয়ে আবার ঘুরতে বার হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি দেখলেন যে, একজন বড়ি খুব জোরে জোরে চিংকার করে কঁাদছে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা তুমি কঁাদছ কেন?” বড়ি ছিল অন্ধ, সে রাজাকে চিনতে না পেরে বলে, “বাবা কাল রাণী বাপের বাড়ী যাবে, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, রাজা খন্ডর বাড়ী গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হবে।”

এই কথা শুনে রাজা ভাবলেন যে না ঘুমিয়ে জেগে বেড়ানোর জন্যই তিনি এই খবর জানতে

পারলেন। তাঁর আরেক বিচার মূল্য একশত টাকা উত্তল হল। তারপর রাজা বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা রাজাকে বাঁচাতে হলে কি করতে হবে?”

বুড়ী বলল, “বাবা! রাজা যদি রাণীকে শাসনে রাখতো তাহলে রাণীও বাপের বাড়ী যেত না, আর রাজারও মৃত্যু হত না। এখন রাজা যদি রাণীর বাপের বাড়ী বাওয়া বন্ধ করে তাহলে রাজা বাঁচবে।”

এই কথা শুনে রাজা বাড়ী ফিরে এসে রাণীকে খুব শাসন করেন আর বলেন, “বল বাপের বাড়ী যাবে না।” রাণী তখন রাজার পায়ে পড়ে বলেন, “আমি আর কখনো বাপের বাড়ী যাব না।”

রাজা তখন ভাবেন যে, আজ বিত্তা ক্রয়ের তিনশত টাকা আদায় হয়ে গেল। যদি জয়কুমারের কাছ থেকে বিত্তা না শিখে নিতাম তাহলে আমার মৃত্যু হত। বিত্তা মানুষকে বিপদ সম্পদ থেকে রক্ষা করে।

সংস্কৃতি বিশ্লেষণ

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে অবদমন ক্রিয়া বৃদ্ধি পেলেও মানুষের সহজ প্রবৃত্তি অন্তর্বেগ প্রভৃতি বহু মানসিক গুণ আজও আদিমকালের লোকদের মানসিক গুণেরই মত আছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তন, মিত্র সংস্কৃতির সংস্পর্শের প্রভাবে অলুপকরণ শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ ইত্যাদির ফলে বহু মনুষ্য জাতির সংস্কৃতির বহু উপকরণ বা উপাদানে প্রভৃতির রূপান্তর হয়েছে এবং মৌখিক সাহিত্য ও লিখন সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে অজ্ঞান সাহিত্যের জায় মৌখিক সাহিত্য লোকশ্রুতির বিবর্তন হয়েছে অবশ্যস্বাভাবী। সংস্কৃতি রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা অদল বদল সংযোজন পরিবর্তন-পরিবর্ধন, হলেও লোকশ্রুতি সাবলীল স্থিতি পাথার উপর ভর করে ভেসে চলে অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ-এর দিকে।

সংস্কৃতির ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা বিষয়ে মনোবৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ববিদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও, সকলেই এক বিষয়ে এক মত যে, সংস্কৃতির তিন প্রকার ইন্ড্রিগ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ আছে। (১) চেষ্টিত বা আচরণ—মনুষ্য দেহের যে কোন বিশদ এবং সামাজিকভাবে নির্ধারিত মান অনুযায়ী ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি। (২) জড়দ্রব্য—বিশেষ কোন সংস্কৃতির লোকের দ্বারা সামাজিকভাবে নির্ধারিত ও ব্যবহৃত পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সামগ্রী, বস্তু, পদার্থ ও দ্রব্য প্রভৃতি। (৩) ভাব, ধারণা—সামাজিকভাবে নির্ধারিত চিন্তা, ভাবনা, বিশ্বাস (বাহ্যিক নীতি বা আদর্শ অনুসারে সত্য কিম্বা মিথ্যা) অনুভূতি ও প্রস্ফোভ বা গোষ্ঠীগত লোকের জড়দ্রব্য ও পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত আচরণে অন্তর্নিহিত। ভাব বা ধারণার অন্তর্গত হল বিশ্বাসের পদ্ধতি বা রীতি ও অধিবিজ্ঞা। এ ছাড়াও আছে বিবিধ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা। যেমন—স্বথ, দুঃখ, সৌন্দর্য, ভাষা, জীবের সৃষ্টি, অস্বস্থতা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, নৈতিকতা ও দায়িত্ব; বল ও বল নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক, লোক-বান, লোক-শ্রুতি প্রভৃতি।

সংস্কৃতির উক্ত তিন প্রকার ইন্ড্রিগ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ মানুষের মনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িত। ফলে মানুষের সৃষ্ট সাহিত্যে, মৌখিক-সাহিত্যে, লোক-বান, লোক-শ্রুতি ইত্যাদিতেও প্রতিফলিত হয়।

লোক-শ্রুতি বিশ্লেষণের পূর্বে আরো একটা বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটা হল সংস্কৃতি-রূপান্তর। যুগজীবনের জটিল সমাজ ব্যবস্থা, বিষয় ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করে আধুনিক সংস্কৃতি সমূহের কোন বিশেষ সংস্কৃতিকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলে স্থানির্দিষ্ট করতে বিজ্ঞানীরা অক্ষম। কারণ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলে সংস্কৃতিকে বিচার করা যায় না। ইংরাজ ও ঐসলামিক সংস্কৃতির কোনটি উন্নততর, হিন্দু ও জার্মান সংস্কৃতির কোনটি উৎকৃষ্টতর? জাপান সংস্কৃতি নিকৃষ্টতর মনে করেই কি জাপান অধিবাসী আমেরিকান সংস্কৃতি অল্পকরণে অভ্যস্ত হয়েছে? সংস্কৃতি রূপান্তরের সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

জীবনধারণের প্রয়োজনে অতীতে বহু পরিবর্তন অদল বদল হয়েছে। যার জন্ম একে অস্ত্রের সংস্কৃতির পার্থক্য। এমন কোন দু'টি সংস্কৃতি নেই যারা সম্পূর্ণ সদৃশ বা সমতুল্য। অথও দেশের অথও জাতির মধ্যেও স্থানীয় প্রাদেশিক প্রভাব হেতু স্থানীয় লোকদের সংস্কৃতির কিছু পার্থক্য হয় স্থান ও প্রদেশ অনুসারে। এই কারণেই ভাষা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, ভাব, ধারণা, পোশাক-পরিচ্ছদ, মনোভাব না প্রতিনিয়াস প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃতির উপাদান বা উপকরণের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংস্কৃতির উপাদান বা উপকরণের (১) সামান্য পরিবর্তন ও বিশোধন এবং (২) নতুন প্রথা প্রবর্তন (মৌখিক অথবা অল্পকরণ) এই উভয়বিধ কারণে সংস্কৃতি-রূপান্তর হয়। অনভাবনীয় নতুন জড় দ্রব্যের প্রবর্তন, পরিবর্তন, শোধিত পুরাতন দ্রব্য পুরাতন দ্রব্যের অন্তর্ভাবে ব্যবহার, পুরাতন প্রয়োগ কৌশলের পরিবর্তন, অথবা নতুন কলা কৌশলের প্রবর্তন, সামাজিক আদান প্রদানের নতুন রীতির চলন অথবা পুরাতন রীতির পরিবর্তন বা শোধন, ভাব ধারণা সংস্কার প্রভৃতির মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি বহু রূপান্তর হতে পারে নতুন আবিষ্কার দ্বারা, অথবা অস্ত্রের ভাব, ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতির অল্পকরণের দ্বারা।

অতএব নিজ সংস্কৃতি নিকৃষ্টতর এবং মিত্র সংস্কৃতি উৎকৃষ্ট বা উন্নত মনে করে কোন সংস্কৃতির রূপান্তর (যত সামান্যই হোক) হয় না। গবেষণায় আরো দেখা গিয়েছে যে মিত্র-সংস্কৃতিকে অল্পকরণের ফলে বিশেষ কোন মৌলিক সংস্কৃতির রূপান্তর হলেও, পরিবর্তন সংস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে হয় না। আর যখন রূপান্তর হয় (যত সামান্যই হোক) তখন মানুষের সৃষ্ট সব কিছুর উপরই ঐ রূপান্তরের প্রভাব অল্পবিস্তর বাড়ে। এই কারণেই লোক-শ্রুতি প্রভৃতি মৌখিক সাহিত্যেও রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়।

ভূমিয়া বাইগাদের লোক-শ্রুতিতেও সংস্কৃতি রূপান্তরের প্রভাব স্পষ্ট। ভূমিয়া-বাইগাদের প্রত্যক্ষ বা বাস্তব জীবনে বহু জড়দ্রব্য, ভাব-ধারণা, ইত্যাদির প্রচলন না থাকলেও মিত্র-সংস্কৃতির অল্পকরণে তাদের লোক-শ্রুতিতে সংযোজন এবং স্বীয় সংস্কৃতির প্রচলিত জড়দ্রব্য, ভাব ধারণা আচরণ প্রভৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আগড়িয়া, গুণ্ড প্রভৃতি প্রতিবাসী আদিমজাতির সংস্কৃতি ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ

মারোয়াড় প্রভৃতি দেশের সমতলবাসী অধিবাসীদের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে ভূমিয়া বাইগাদের কিছু সংযোগ আছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা মারোয়াড়বাসীদের সঙ্গে ভূমিয়া বাইগাদের আন্তি একটু বেশী। প্রথমোক্ত দুই দেশের অধিবাসীরা প্রধানত ফরেষ্ট গার্ড ভূমিয়াদের উপর খবরদারি করে সরকারের লক্ষ্য কার্যে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত তর্জন গর্জন করে যার জন্তে ভূমিয়া বাইগারা এদের ভয় করে।

কিন্তু মারোয়াড়বাসীরা সাধারণতঃ ফেরিওয়ালা। ভূমিয়া বাইগারা বলে ‘রোজগাড়ীয়া’। ঘোড়ার পিঠে নানা প্রকারের সামগ্রী চাপিয়ে এই সব ‘রোজগাড়ীয়া’ বাইগাচকের গ্রামে গ্রামে ঘোরে, এবং ভূমিয়া বাইগাদের কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে (প্রধানতঃ) বিনিময় করে। ব্যবসার জন্তই এই সব রোজগাড়ীয়ারদের ব্যবহার ভূমিয়া বাইগাদের সঙ্গে অত্যন্ত হার্দ্য। এই কারণেই ভূমিয়া বাইগারা এদের সঙ্গে যত মনখোলাভাবে মিশতে পারে তেমনটি ফরেষ্ট গার্ডদের সঙ্গে মিশতে পারে না।

পণ্য বিক্রয়কারী ‘রোজগাড়ীয়া’দের দেখেই ভূমিয়া বাইগাদের ধারণা যে, ষারাই বা কিছু বিক্রয় করে, তারাই হল মারোয়াড় দেশের অধিবাসী। ‘বিছা শিখে নাও’এ শোনা যায় যে, বিছা বিক্রয়ী জয়কুমার মারোয়াড় দেশ থেকে আসছে। তাকে কিন্তু রাজা বা রাজার ছেলে বলা হয়নি। কারণ ‘রোজগাড়ীয়া’রা কখনো নিজেকে রাজা বা রাজপুত্র বলে না। এদের কাছে ভূমিয়া বাইগারা আরো জানতে পারে যে, একশত টাকা হচ্ছে অনেক টাকা, এবং একশত টাকা পাঁচ কুড়ি টাকার সমান। হাজার টাকা শত টাকার থেকেও বেশী।

মধ্যে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ভূমিয়া বাইগাদের গাণিতিক সংখ্যা গণনার ক্ষমতা হল কুড়ি পর্যন্ত। তারা বলে, “আমাদের দু’হাতে ও দু’পায়ে মোট কুড়িটা আঙ্গুল আছে। তাই আমরা গুণতে জানি”। আরো একটা কথা হল যে, একটা হাতে ও পায়ে সর্বাধিক পাঁচটা আঙ্গুল থাকায় ভূমিয়া বাইগাদের ধারণায় পাঁচ বা পাঁচের গুণিতক সংখ্যাই হল সর্বাধিক সংখ্যা। এই কারণেই লোক-শ্রুতিতে শোনা যায় যে, রাজপুত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্ডার বিবাহে রাজা কন্যাপণ হিসাবে বাক্ষগকে ‘সুখ’ দিল পাঁচ হাজার টাকা। এক একটি বিছার মূল্য হিসাবে জয়কুমার চাইল একশত টাকা (পাঁচ কুড়ি)।

ভূমিয়া বাইগাদের ‘রোজগাড়ীয়া’রাই বলে যে রাজা ধনাঢ্য ও অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তাঁর পুত্ররাও সেইরূপ। ভূমিয়া বাইগারা ধনাঢ্য ও ক্ষমতাবান লোক বোঝাবার জন্য লোক-শ্রুতির নায়কদের সাধারণতঃ রাজা বা রাজার ছেলে বলেছে।

ভূমিয়া বাইগাদের সহর বা নগর সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। তাদের ধারণা সহর বা নগর তাদের বাইগাচকের মত বন জঙ্গলে পূর্ণ। এবং সেখানেও বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্ত আছে। লোকশ্রুতিতে সহর বা নগর উল্লেখ করার কারণ হল যে, ‘রোজগাড়ীয়া’রা সাধারণতঃ বলে যে ওমুক সহর থেকে আসছি। খুব কমই বলে গ্রাম থেকে আসছি। ভূমিয়া বাইগারাও এদের অনুকরণে গ্রামের পরিবর্তে সহর বা নগর উল্লেখ করেছে। আরো একটা কারণ হল যে, ভূমিয়া বাইগারা ‘রোজগাড়ীয়া’, ফরেষ্ট গার্ড প্রভৃতিদের কাছে শুনেছে যে, সহর বা নগর হল গ্রামের

থেকে অনেক বড় এবং ধনাঢ্য ও ক্ষমতাবান লোকেরাই সেখানে বসবাস করে। অতএব মিত্র-সংস্কৃতির অগ্রকরণের প্রভাব নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ভূমিয়া বাইগাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোন প্রচলন নেই। তাদের সংস্কৃতিতেও বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাও নেই। ইদানিং মধ্যপ্রদেশের বন বিভাগের সৌজন্যে বাইগাচকের সমস্ত গ্রামে না হলেও কয়েকটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ভূমিয়া বাইগাদের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়েছে। তা'হলেও তখন তাদের ধারণা যে, অত্যন্ত পণ্য দ্রব্যের জায় বিদ্যা ক্রয় করতে হয় এবং বিদ্যা ক্রয়ের দাম দিতে হয় টাকা দিয়ে। জয়কুমার বিদ্যার মূল্য হিসাবে তাই টাকা প্রার্থনা করে (ভূমিয়া বাইগা সংস্কৃতির প্রভাবে) কিন্তু লোকশ্রুতিতে শোনা যায় যে জয়কুমার বলে বিদ্যা শিখে নাও। 'শিখে' শব্দটি ব্যবহার করে মিত্র সংস্কৃতির অগ্রকরণে। রোজগাড়ীয়া, ফরেষ্ট গার্ডা যেমন, তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও বলেন বিদ্যা শিখে নাও। ক্রয় (খরিদ) কর বলে না।

লোক-শ্রুতিতে বর্ণিত জড়দ্রব্যও প্রমাণ করে রোজগাড়ীয়া, ফরেষ্টগার্ড প্রভৃতি হিন্দুদের সংস্কৃতির প্রভাব। উক্ত সংস্কৃতির লোকদের কাছেই ভূমিয়া বাইগারা জানতে পারে যে, স্বর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু এবং বর্ণাঢ্য, উচ্চস্তরের লোকেরাই সোনার বাসনাদি ব্যবহার করে। রোজগাড়ীয়া, ফরেষ্টগার্ড প্রভৃতিদের পেতলের খালা, গেলাস, ঘটি ইত্যাদি ধাতুর বাসন ব্যবহার করতে দেখেছে এবং ভূমিয়া বাইগাদের ধাতুর বাসন সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। বাসন মূল্যবান করার জন্যই তারা সোনার বাসন বলেছে।

ব্রাহ্মণ ষোড়শক হিসাবে মেয়ে জামাইকে বাসনাদি দিয়েছে লোক-শ্রুতিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর মূলেও রয়েছে মিত্র সংস্কৃতির প্রভাব। কারণ ভূমিয়া বাইগা সংস্কৃতি অগ্রসারে ধর্মীয় বা সামাজিক রীতির কোন প্রকার বিবাহেই কন্যাপক্ষ বাসনাদি ষোড়শক হিসাবে প্রদান করে না বা প্রদান করার কোন স্বযোগও নেই। (ভূমিয়া বাইগাদের মধ্যে ধাতুর বাসনের প্রচলন এখনও নেই)।

ভূমিয়া বাইগা পুরুষ ও নারী সাধারণত বনে কাঠ কাটতে যাওয়ার নামে অথবা বাজারে দ্রব্য বিক্রী করতে যাওয়ার পথে নতুবা বেঁওরে যাওয়ার রাস্তায় একে অন্নের সঙ্গে পরিচিত হয় ও প্রেমে পড়ে (ভূমিয়া বাইগা ভাষায় মায়ামা ফাঁসিসে)। তারপরই ওরা হয় বিবাহ করে, নয় বউ বানিয়ে নেয়। অর্থাৎ ওদের বিশ্বাস ও আচরণ হল যে, প্রেমে আবদ্ধ হওয়ার জন্ত নিভৃত, নিরালা স্থানের প্রয়োজন। রাজপুত্রের জায় ব্রাহ্মণকন্যাও উচ্চস্তরের। অতএব মিত্র সংস্কৃতির আরাধ্য দেবতা শিবলিঙ্গের ঠাঁই (ফরেষ্ট গার্ড, রোজগাড়ীয়া প্রভৃতিরা কোন নির্জন স্থানে বৃক্ষের তলায় প্রস্তর স্থাপিত করে শিবজ্ঞানে পূজা করে, তার মাথায় জল ঢালে। এই ধর্মীয় ক্রিয়া ভূমিয়া বাইগারা দেখেছে।) যথার্থ স্থান বিবেচনা করেছে। ব্যক্তি ও আরাধ্য দেবতা নির্বাচনে মিত্র-সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও আচরণে ভূমিয়া বাইগা সংস্কৃতির প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়।

ভাব ধারণা জড়দ্রব্য প্রভৃতিতে মিত্র হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও লোকশ্রুতিতে বর্ণিত আচরণে ভূমিয়া সংস্কৃতির প্রভাবই বেশী। অপিচ ভূমিয়া বাইগাদের পুরুষ ও নারী প্রেমাবদ্ধ হলে যদি নারীর দিকে কেউ না থাকে, কিম্বা নারীর দিকের কাউকে নারী জানাতে ইচ্ছুক না হয়,

অথবা নারী যদি গৃহে (স্বামী অথবা বাপের) ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে; তাহলে পুরুষ সেই নারীকে স্বগৃহে নিয়ে যায় এবং স্বীয় সংস্কৃতি প্রচলিত রীতি অনুসারে বিহা (বিবাহ) অথবা বানই (বউ বানিয়ে নেওয়া) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। ভূমিয়া বাইগারা এই আচরণকে উঠাও প্রথা বলে। এই আচরণের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণকন্যা লোকশ্রুতিতে। ব্রাহ্মণকন্যাকে ঘরে নিয়ে এসে রাজপুত্র বিবাহ করে এবং কন্যার পিতা দাবী করায় বরের পিতা কন্যাপণ হিসাবে ‘সুখ’ দেয় পাঁচ হাজার টাকা।

কন্যাপণ এত অধিক দেওয়ার মূলে এই নয় যে, ভূমিয়া বাইগারা ক্রমশঃ ধনী হচ্ছে, অথবা মিত্র সংস্কৃতির কোন প্রভাব আছে। এতে ভূমিয়া বাইগা সংস্কৃতির প্রভাব এবং ওরা যে এক অগ্রিয় প্রথা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অভিলাষী তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভূমিয়া বাইগাদের লোক-শ্রুতিতে মিত্র-সংস্কৃতি, বিশেষ করে সমতলের হিন্দু সংস্কৃতির জড় প্রভাবের প্রভাবই বেশী। ভাব ধারণার উপরও ঐ একই সংস্কৃতির প্রভাব কিছু আছে। কিন্তু আচরণে নিজস্ব ভূমিয়া বাইগা সংস্কৃতির প্রভাবই বেশী, মিত্র সংস্কৃতি এখনও তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

পর্যালোচনা ও উপসংহার

লোক-বানের অভিজ্ঞাত শ্রেণী লোক-সাহিত্য প্রাচীনকালেও যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই সমকালেও সৃষ্টি হয়। এর পরিধি ভৌগোলিক কোন আবেষ্টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, নিবদ্ধ নয় লোক সাহিত্যের কোন একটি উপাদানেও। যেমন সৃষ্টি হচ্ছে নতুন লোক-শ্রুতি, লোক-সঙ্গীত, ইতিকথা ইত্যাদি তেমনই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন লোক-নাট্য বা গণনাট্য। কেন্দ্রি় বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদদের চীনা বিভাগের ডক্টর পিট ভন ডা লুন মালাশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি স্থানের নিরক্ষর ও অশিক্ষিত চীনাড়ের কাছ থেকে বহু চীনা লোক-নাট্য টেপ রেকর্ড করেছেন। তাঁর মতে হল এখনও নতুন গণনাট্য সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে William H. Newell (1968) তাঁর “The Need for Urgent Research in Korea : Shifting cultivation in the mountain areas” নামক প্রবন্ধে লিখেছেন,—“The only person in the world who is fundamentally interested in these plays in the academic world is Dr. Piet van de loon of the Dept. of Chinese in the University of Cambridge and his special interest lies in the fact that the text of some of the plays which he has recorded are similar to manuscript which he has acquired dating from pre-T’ang. He has also discovered that new plays are still being written.” (p. 112).

প্রাচ্যের নিরক্ষর অশিক্ষিত চীনাড়াই যে কেবল লোক সাহিত্যের নতুন উপাদান সৃষ্টি করছে তা নয়। লেখকের মতে সর্বত্রই শিক্ষিত, অশিক্ষিত আপামর জনসাধারণ এখনও লোক সাহিত্যের বহু নতুন উপাদান সৃষ্টি করছে, এবং তা মুখে মুখে প্রচারিতও হচ্ছে। কিন্তু লোকে কয়েকটি কারণে লোক-সাহিত্যের এই সব উপাদানের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয় না। প্রথমতঃ লোকে আনন্দ

বেদনা, হাসি, অশ্রু মায়াবী অতিথিত চলচ্চিত্র, গতি উচ্ছল জীবনের আনন্দবেদনা, আশা, স্বপ্নভঙ্গ প্রভৃতি জীবনের ভাঙ্গাগড়ায় এতই অভিজ্ঞ ও নিষেধ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, এই সব লোক সাহিত্যের উপাদান তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। এই কারণেই এই সব উপাদান নিত্য স্তনেও চির অচেনা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিত ও আধুনিক সভ্য সমাজের লোকেরা লিখন সাহিত্যের রসে এতই মোহিত ও মগ্ন যে, মৌখিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সময় যেমন পায় না, তেমন প্রয়োজনও মনে করে না। এমন কি উচ্চ ধারণা আছে বলে সন্দেহ করারও অবকাশ আছে। তা'হলেও অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকদের মত আজও তারা লোক-সাহিত্যের উপাদানকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে আছে। তার পরিচয় হােমশাই পাওয়া যায় খোস গালগল্লে, নিছক আড্ডায়। এই সব লোক সাহিত্যের উপাদানের স্রষ্টা কিন্তু নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকেরা নয়। শিক্ষিত আধুনিক সভ্য সমাজের লোকেরা।

এর মধ্যে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, লোক সাহিত্যের উপাদান সাধারণতঃ লিখন সাহিত্যের মত বিরাট উপস্থাপন, আলোচ্য বা মহাকাব্য ইত্যাদি হয় না। ছোট গল্পের মত হয়। অনেক সময় এতই ছোট হয় যে, এক বা দুই প্যারাতেই শেষ। কিন্তু তাতে থাকে আমোদ, উপভোগ্য চাতুরী ইত্যাদির উল্লেখ, বা আনন্দ দেয় ও মনকে আমোদিত করে।

লোক-সাহিত্যের উপাদান শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের লোকদের কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও লোকসান বিজ্ঞানীরা এই সব তুচ্ছতমের মধ্যেও মাধবীধারার সন্ধান পান। তাঁদের স্বস্থ সতর্ক ও অনলস মনের কোতুলক যখন নতুন কিছু অনুসন্ধান করে লোকদের কাছে তুলে ধরেন, তখনই লোকদের সত্য রসনাভূতি হয়। লোকেরা লোক সাহিত্যের উপাদানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে।

শিক্ষিতরা তো বটেই, ভারতবর্ষের নিরক্ষর, অশিক্ষিত শ্রমিক, কৃষক, পল্লীবাসী প্রভৃতি জনসাধারণ ছাড়াও আদিম জাতিরাও লোক-সাহিত্যের নতুন উপাদান স্রষ্টা করেছে। ভূমিয়া বাইগাদের আলোচ্য লোকশ্রুতি কয়টি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায়, লোক-শ্রুতি কয়টি খুব প্রাচীন নয়। সংস্কৃতি রূপান্তরের সঙ্গে লোক-শ্রুতিতে বর্ণিত জড়জব্ব, ভাব ধারণা ইত্যাদি সমতলের হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে সংযোগ ইত্যাদি হওয়ার কিছুটা এইরূপ আকৃতি নিয়েছে বলা যায়। তবে কতদিন আগে বা কত বছর আগে এই রূপান্তর হয়েছে আপাততঃ সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে সহচর বা সমান্তরাল ও রৈখিকভাবে ভূমিয়া বাইগা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ হওয়ার প্রভাবও উপেক্ষা করা যায় না।

পৃথিবীর অতীত আদিম ও আধুনিক সভ্যতাসম্পন্ন গোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপাদান উপাখ্যান, পুরাকাহিনী, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়ও স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে যে সর্বত্র সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সহচর বা সমান্তরাল ও রৈখিক ভাবেই হয়েছে এবং ভাবের অখণ্ডতাহেতু প্রায় সব জাতির পুরাকাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে হয় জল থেকে অথবা মাটি মিশ্রিত জল থেকে। ভূমিয়া বাইগাদের পুরাকাহিনীতে শোনা যায় পৃথিবীর স্রষ্টা জল থেকে।

ভূমি়া বাইগাদের বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে সমতলের হিন্দু সংস্কৃতির আট প্রকার বিবাহের অন্ততম ‘আসুর বিবাহ’ পদ্ধতির যথা কল্পাপণ দেওয়া, বর কনের কাপড় গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি মিলের কারণও হল সংস্কৃতির সহচর বা সমান্তরাল ও রৈখিকভাবে ক্রমবিকাশ হওয়া। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব হেতু নয়।

আচার বিচার নিয়েও তুল্য মূল্য বিচার করলে এই একই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন গোবর বা গোময় ভারবর্ষের হিন্দুদের কাছে একটি পবিত্র পদার্থ এবং পবিত্রকরণ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে ইউরোপবাসীদের কাছেও গোবর ছিল পবিত্র বস্তু এবং শুদ্ধিকরণের জন্ত এর প্রচলনও ছিল। Symbolism of the East and West’ গ্রন্থে Aynsby Murry (1900) লিখেছেন—

“Cow-dung as we all know, is a ‘sacred’ object in India, and in very ancient days, at least, it seems to have been so in Europe, for Winckelmann, who wrote in the last century, mentions in his ‘History of Ancient Art’ that pamphos, one of the most ancient Greek poets, describes a statue of zeus as being covered with cow-dung. The German savant imagined this to indicate that the presence of divinity extends to all objects, even the most object. No such error could be committed now, since India is so much better known that it was in his day, and all who have been in the country are aware that cow-dung is commonly employed by the native as a sacred purifier”. (p. 189)

ভূমি়া বাইগাদের মধ্যেও পবিত্র ও শুদ্ধিকরণ বস্তুর অন্ততম পদার্থ হিসাবে গোবরের প্রচলন আছে। গোবর তাদের কাছে এতই পবিত্র যে, বেঁওরে আগুন ধরাবার জন্ত এবং ঘুঁটে পর্বন্ত ব্যবহার করে না।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রবচন বা প্রবাদের তুলনা করলেও এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ হয়েছে সহচর বা সমান্তরাল ও রৈখিকভাবে। যেমন সিংহলী প্রবাদ হল—

“জলন্ত কাঠ দিয়ে বাহাকে মারা হইয়াছে সে জোনাকি দেখে ভয় পায়।”

তেমনি বাংলা; স্পেন, ভূমি়া বাইগা প্রভৃতির প্রবাদ হল যথাক্রমে,

“ঘর পোড়া গরু সিঁচুরে মেঘে ডরায়।” “তপ্ত জলে বালসানো বিড়াল ঠাণ্ডা জলেও ভয় পায়।” “গ্রাম পোড়া গরু বেঁওড়ে আগুন দেখলে ভয় পায়।”

লোক সঙ্গীত, লোক, নৃত্য, উপধর্ম বা কুসংস্কার ইত্যাদি নিয়ে বিচার করলেও এই একই সত্য উপলব্ধি করা যায়।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বস্তু বা প্রপঞ্চর উদ্ভাবন, ক্রমবিকাশ তথা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সমান্তরাল ও রৈখিকভাবে হওয়ার কারণ তত্ত্ব Maccullochs (1905) সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল—

“.....it has been the result of mental processes working out the problem of life in precisely the same way among different people.”

তিনি আরো বলেছেন—“.....similar condition of life, similar environments, similar stage of culture, similar mental and psychic state will almost inevitably work out mental artistic and mechanical products in precisely the same way.”

সংস্কৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ (১) বেষ্টিত বা আচরণ, (২) জড়দ্রব্য ও (৩) ভাব ধারণা ইত্যাদি মানুষের কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, লিপ্সা প্রভৃতি, স্বপ্ন-দুঃখ বোধ এবং বিধেয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিণামে সংস্কৃতির উপাদান রূপান্তর অনুবর্তন হয়। অবদমন ক্রিয়ার সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশ যেমন সব গোষ্ঠীতে একই সঙ্গে হয়নি, তেমনি সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সব গোষ্ঠীতে একসঙ্গে হয়নি। কারো হয়েছে আগে, কারো হয়েছে পরে। এবং তা’ হয়েছে সহচর বা সমান্তরালও রৈখিকভাবে। যদি না হত, তাহলে সকল গোষ্ঠীতে অনুরূপ সংস্কৃতির বস্তুর সন্ধান পাওয়া যেত না। মনঃসমীক্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষণ, স্বপ্ন বিশ্লেষণ প্রভৃতিতেও স্থম্পষ্টভাবে এই তত্ত্বেরই সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। আরো সমর্থন পাওয়া গিয়েছে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত বস্তু, উপকরণ ইত্যাদি প্রতীকের ভাবার্থ, মর্ম প্রভৃতি সব দেশের সংস্কৃতির মধ্যেই সমান এবং সর্ববাদী সম্মত।

লোক-বান অধ্যয়ন, গবেষণা ইত্যাদি অধুনা কিছু প্রাধান্য পেলেও বিস্তারিতভাবে এবং পৃথক সত্তা হিসাবে এর প্রবেশনা অধ্যয়নাদির বেশ কিছু অসুবিধা এখনও আছে। একদল পণ্ডিত এখনও লোকবানকে সাহিত্যের অঙ্গ এবং এর যোগাযোগ সাহিত্য বিভাগের সঙ্গেই মনে করেন। আর এক দল মনে করেন যে, লোকবান সংস্কৃতি নৃতত্ত্বের শাখা এবং এর সংযোগ সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে। এই কারণেই লোকবানকে কোথাও সাহিত্যের বিশেষ পত্র রূপে, কোথাও বা নৃতত্ত্বের বিশেষ পত্র রূপে পড়ান হয়। লোক-বান বিজ্ঞান হিসাবে পৃথকভাবে নয়।

লোক-বান অধ্যয়ন, গবেষণা প্রভৃতিতে বহুবিধ উপকার আছে। জাতির সংস্কৃতি, চিন্তাধারা মানসিক গঠন, আচার ব্যবহার, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি জানা যায়, তেমনি দেশের সংহতি, সহ-অবস্থান, স্বশাসন, বলপ্রয়োগ না করেও প্রশাসন প্রভৃতি চালনা সম্ভব হয়। অন্তর্গত দেশের ও দেশের অগ্রগতির অন্তরায় হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক মুখোপাধ্যায়

আদার ব্যাপারী যে, তারপক্ষে জাহাজের খবর না রাখলেও চলে। বঙ্কিমের পক্ষে তেমনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের। পেশায় তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অবসর সময়ে ছ'চারখানা নভেল লিখেছিলেন, 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানি পত্রিকাও না-হয় কিছুদিন সম্পাদন করেছিলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন, তা' কেমন করে হয়? এ যদি সম্ভব হয়, তাহলে আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজী হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

কয়েকজন যবন পণ্ডিতের সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়ার ফলে বঙ্কিমের জীবনে ঐ অঘটন ঘটে। আর তাছাড়া মহাভারতে ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে অপরিসীম ছিল তাঁর কৌতূহল। এ জাতীয় জিজ্ঞাসার টানা-পোড়েনে পড়ে আদার ব্যাপারী বঙ্কিম পরিণত হয়েছিলেন জাহাজী সওদাগরে। সেকালের হিন্দু পণ্ডিতেরা মহাভারতের যুদ্ধ সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল—ঐ যুদ্ধ হয়েছিল দ্বাপরের শেষে। এবং ঐ সময়টা আনুমানিক পাঁচহাজার বছর আগে। আর একদল যবন পণ্ডিত—লাসেন—ভেবর—মনিয়র উইলিঅমস—পাণ্ডবদের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করতেন না। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদৌ ঘটেছিল কিনা এবং ঘটলে তার আনুমানিক কাল কত, এ নিয়ে ছিল নানান জিজ্ঞাসা। উৎসুক ঐতিহাসিকদের কাছে কৌতূহল ছিল অফুরন্ত।

উনিশ শতকে আমাদের মন ছিল যুক্তিতর্কে বিশ্বাসী। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে কোন সিদ্ধান্তকে যেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে ছিল কঠিনতর। ঐতিহাসিক উপকরণ এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞাননিষ্ঠ আলোচনাকে উড়িয়ে দেবার মত ক্ষমতা আজো আমাদের নেই, সেদিনও ছিল না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আদৌ ঘটেছিল কিনা, এবং ঘটলে কবে ঘটেছিল তার অনুসন্ধান বোধহয় বঙ্কিম বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে পাথর করলেন এবং যেখানে যেখানে ভারত-ইতিহাসের উপকরণ আছে সেগুলিকে তুলে ধরলেন। ফলে, নভেল-লেখক বঙ্কিমের পক্ষে গবেষকের গৌরব অনায়ত্ত রইল না।

রাজতরঙ্গিনী, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ এবং মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাসমূহ থেকে কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ তুলে নিলেন বঙ্কিম। আর এ সব গ্রন্থে বর্ণিত গ্রন্থ-নক্ষত্রের সংস্থান থেকে একটা আনুমানিক কাল হিসাবের চেষ্টা করলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের তেত্রিশ ও চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের কাল সম্পর্কে একটু নির্দেশ পাওয়া যায়। এ শ্লোক দুটিতে বিবৃত আছে,—‘সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদ্ভিত দেখা যায়, এদের সমন্বয়ে যে মঘা নক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে ছিলেন মঘা নক্ষত্রে, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।’

কলির বারোশ বছর এখন থেকে বাদ দেওয়া যাক। গ্রন্থ নক্ষত্রের ইঙ্গিত থেকে ষথার্থ সময় আবিষ্কার করা সম্ভব কিনা বঙ্কিমচন্দ্র বাচাই করে দেখলেন।

সপ্তর্ষি মণ্ডল—সাহেবরা বাক্যে বলেন ‘গ্রেট বিয়ার’—কতকগুলি স্থির নক্ষত্র। মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা। বিষুবের সামান্য একটু গতি ছাড়া আর কোনো গতি নেই। হিন্দুতে এ গতি বৎসরে চুয়ান্ন বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩^৩/_০ অংশ। এইভাবে এ হিসাবে গণনা করলে কোন স্থির তারার পক্ষে এক নক্ষত্র পরিভ্রমণে সময় লাগে এক হাজার বছর। একশ নয়। আরেকটা জটিল জিজ্ঞাসা এর ভিতর লুকিয়ে আছে। সপ্তর্ষি মণ্ডল কখনো কি মঘা নক্ষত্রে থাকতে পারে? মঘা থাকে সিংহ রাশিতে। দ্বাদশ রাশিচক্রের ভেতর। ওদিকে সপ্তর্ষি দ্বাদশ রাশিচক্রের বাইরে। সুতরাং বাইরের জিনিষ ভেতরে আসে কেমন করে! বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়,—‘যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।’

না, বঙ্কিম হাল ছাড়লো না। তিনি আরো পাঁচটা শ্লোক পেরিয়ে গিয়ে এই শ্লোকের একটা বৈজ্ঞানিক অর্থ আবিষ্কার করলেন। পুরাণকার ঋষির ব্যাখ্যাতেই জানতে পারলেন, যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষি যেমন মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় তেমনি ছিলেন পূর্বাষাঢ়ায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এদিকে গণনা করলে দেখা যায়, মঘা থেকে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র। এক এক নক্ষত্রে একশ বছর ধরলে যুধিষ্ঠির থেকে মহাপদ্ম নন্দের সময়ের ব্যবধান হয় এক হাজার বছর। বিষ্ণুপুরাণ আরো পনেরো যোগ করেছে। এদিকে বিষ্ণুপুরাণ থেকেই জানা যায়, নন্দেরা মোট একশ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। আর পরীক্ষিত থেকে চন্দ্রগুপ্ত পর্বন্ত যে সময়ের ব্যবধান তা ঐ নন্দকে ধরেই পাওয়া যেতে পারে। এবং এক হাজার পনেরোর সঙ্গে একশ বছর যোগ করলেই আমরা কুরুক্ষেত্রের কাল থেকে চলে আসতে পারি চন্দ্রগুপ্তে। তিনশ পঁচিশ (?) খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকান্ডারের ভারত আক্রমণ। দশ বছর (?) পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হলেন। তাহলে এগারোশ পনেরোর সঙ্গে তিনশ পনেরো বছর যোগ করা হল। এদের যোগফল, চৌদ্দশ তিরিশ। এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে চৌদ্দশ তিরিশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহাভারতের বিখ্যাত যুদ্ধ অল্পাধিক হয়েছিল।—মৎস্যপুরাণ ও বায়ুপুরাণেও এ তারিখের সমর্থন মেলে। ওখানে এগারোশ পনেরোর জায়গায় আছে এগারোশ পঞ্চাশ। মূল গণনার সঙ্গে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান।

কেবল পুরাণের পথ ধরে নয়, শুধু জ্যোতির্বিদ্যার গণনা দিয়েও যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌঁছান যায়—বঙ্কিম সে বিষয়েও চেষ্টার ক্রটি রাখেন নি।

বছরের ভেতর দুটি দিনে ছমাসের ব্যবধানে দিন রাত্রি যে সমান হয়, এ তথ্য আমাদের জানা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় এর নাম হল, বিষুব। সূর্যের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ এর ফলেই সম্ভব হয়। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর গল্প আছে। তিনি শর শয্যায় শায়িত হয়েছিলেন দক্ষিণাংশে। যেহেতু দক্ষিণাংশে মরলে সদগতির হানি হয়, সে কারণে তিনি মৃত্যুকে বিলম্বিত করলেন উত্তরাংশ পর্যন্ত। এবং প্রাণ ত্যাগের আগে বললেন : ‘মামোহং সমরুপ্রাপ্তো নাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।’

আজ্ঞো আমরা উত্তরাংশ গণনা করি মাঘ মাস থেকে। কিন্তু সত্যি সত্যিই এর আরম্ভ হয় একুশে ডিসেম্বর তারিখে। অর্থাৎ সাতুই বা আটুই পৌষ। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে অয়নবিন্দুরও একটি গতি আছে। সে স্থির নয়। হিন্দু জ্যোতির্বিদরা বলেন যে বছরে সে চুয়ান্ন বিকলা পিছিয়ে

যাচ্ছে। আগে প্রথম ক্রান্তিপাত ধরা হত অগ্নিনি নক্ষত্রে, ফলে বছরও শুরু হত অগ্নি মাসে।

পরে ধীরে ধীরে অয়নচলনের কল্যাণে আকাশের মানচিত্র বদলাতে আরম্ভ করল। সেই বদলে যাওয়া চেহারা ধরে আমরা কালের ব্যবধানটি ধরে ফেলতে পারি। বক্ষিমও সেই করলেন। একশ বাহাত্তর খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতির্বিদ ক্রান্তিপাত থেকে একশ চুয়াত্তর অংশে চিত্রকে দেখেছিলেন। এর প্রায় দু হাজার বছর পরে আঠারোশ দুই খ্রীষ্টাব্দে আরেক বৈজ্ঞানিক ক্রান্তিপাত থেকে চিত্রকে দেখলেন দুশ এক অংশে চারকলা চার বিকলায়। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদরা এ সব তারতম্য দেখে অয়ন চলনের যে গতিবেগ আবিষ্কার করেছেন, তা হল বছরে প্রায় সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা।

পিতামহ ভীষ্ম যে মাঘ মাসের উত্তরায়ণে তনুত্যাগ করেছিলেন তা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে অর্থাৎ সৌর মাঘ মাসের কোন তারিখে তা জানি না। কিন্তু মাঘের যে একেবারে শেষদিনে নয়, তার প্রমাণ—‘মাঘোহয়ং সমমুপ্রাপ্তঃ’। সাতুই পৌষ থেকে উনত্রিশে মাঘ পর্যন্ত রবিস্ফুট বাংলা পঞ্জিকা ধরে গণনা করলে হয়, চুয়াল্লিশ অংশ চার কলা। আর এই ব্যবধানে কাল গুণলে কুরুক্ষেত্রের কাল অন্ততঃ বারোশ তেবটি খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ব্যবধানটা আরেকটু বাড়িয়ে পুরো আটচল্লিশ অংশ নিলে, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পনেরোশ তিরিশে মহাভারতের যুদ্ধ অন্তর্গত হয়েছিল মনে হয়।—এ সব বিচার বিবেচনা করার পর বক্ষিম লিখলেন : ‘ইহা কোনো মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়েছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ ঝাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।’

বক্ষিমচন্দ্রের এ গবেষণা যে একবারে নিরর্থক নয়, তার প্রমাণ আছে ইয়োরোপীয় ভারত তত্ত্ববিদদের তারিখ-সনের হিসাবে। এঁরা অনেকেই ছিলেন বক্ষিমচন্দ্রের সমসাময়িক। কিছু বা আগে পরে। কোলকাতা সাহেব লিখেছিলেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এ যুদ্ধ হয়েছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন এ মতকেই সমর্থন করেন। এলফিনষ্টোনও এ মত মেনে নিয়েছিলেন। উইলফোর্ড সাহেব অনেক গবেষণার পর লিখেছেন খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে এ যুদ্ধ হয়। বক্ষিমের সঙ্গে এ তারিখের ব্যবধান সামান্য। সকলেই প্রায় লক্ষ্যের কাছাকাছি।

এ কালের গবেষণায় যোগেশচন্দ্র রায়বিজ্ঞানিধির অনেক নাম। তিনিও বক্ষিমচন্দ্রের তারিখকে হঠাতে পারেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল আনুমানিক ১৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলেই উল্লেখ করেছেন তিনি। অর্থাৎ বক্ষিমচন্দ্রকেই পুরোপুরি সমর্থন করেছেন।

আদার ব্যাপারীও যে কখনো কখনো জাহাজের সওদাগরী করতে পারেন, বক্ষিমচন্দ্রই তার উজ্জল প্রমাণ। যে কলমে দুর্গেশনন্দিনী লেখা হয়েছে, ঠিক সেই কলমেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করা, এ কি কম গৌরবের কথা!

প্রাচীন ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

দীপকমোহন সেন

ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অল্পভূত হয় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, টাকা পয়সা প্রভৃতির নিরাপত্তা। প্রথমে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অসংখ্য দেশের মত ভারতেও সোনা, টাকা পয়সা এবং অসংখ্য মূল্যবান দ্রব্য মাটির তলায় গর্ত করে রাখা হত। কিন্তু এই পদ্ধতি খুব বেশীদিন কার্যকরী হয় নাই। কারণ এর ফলে টাকা পয়সার নিরাপত্তা খুবই কম ছিল। নতুন উপায়ের কথা সবাই চিন্তা করতে লাগল। মূল্যবান ধনসম্পদের জমা রাখার বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থান পেল। ক্রমশঃ দেখা গেল যে কোন বিশিষ্ট লোকের কাছে ধনদৌলত জমা রাখা উহা মুক্ত করার সহজ প্রথা প্রবর্তিত হল। প্রথমে এই পদ্ধতি নির্ভর করত স্বদের হারের উপর—কিন্তু স্বদেখারের সমাজে নিম্নদনীয় হতে লাগল এবং আসল টাকা উদ্ধার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পর্যবসিত হল। অধিকাংশ লোকের লাভের চেয়ে নিরাপত্তার দিকে অধিক ঝোঁক ছিল। কাজেই দেখা যায় যে, দুটি কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেতে লাগল—প্রথমতঃ স্বদে টাকা খাটান, দ্বিতীয়তঃ ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। অর্থ জমা রাখা বা জমা নেওয়া ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠল।

অর্থ জমা নেওয়া এবং জমা দেওয়ার আইন কাল্পনিক স্মৃতিশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হল। ঋণ এবং ঋণের বিনিময়ে যে কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি নিয়ম কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হল। কোটিল্যের মতে ঋণের নিয়মাবলী উপনিধি অর্থাৎ লগ্নীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (কোটিল্য ৩, ১২)। বৈদেশিক আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্ভোগ এবং দুর্ঘটনার জন্য জমাকারী ব্যক্তি দায়ী হতেন না। বোদ্ধ জাতকে এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোনও ব্যক্তির কাছে অর্থ গচ্ছিত রাখা যায়, তবে এই গচ্ছিত অর্থের আত্মসাৎ আইনতঃ দণ্ডনীয় (জাতক ১, ৩৭৫ ; ২, ১৮১)। জাতকে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি গচ্ছিত অর্থের সহস্র মুদ্রা ধরচ কিংবা আত্মসাৎ করেন, তবে বিনিময়ে আত্মসাৎকারী ব্যক্তিকে সহস্র মুদ্রা পূরণ অথবা নিজের কণ্ঠকে অর্থের মালিকের সঙ্গে ক্ষতিপূরণরূপে বিবাহ দিতে হ'ত (৩, ৩৪২ ; ৬, ৫২১)। অর্থনৈতিক কাঠামো দিনের পর দিন জটিল হতে লাগল। বিভিন্ন সমবায় সমিতি একের পর এক ব্যবস্থা ক্ষেত্রে অর্থের লগ্নী খাটাতে আরম্ভ করল এবং এই লগ্নীর জন্যই এই সংস্থাগুলি সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি বিশেষের গচ্ছিত অর্থের উপর নির্ভরশীল হতে লাগল। ব্যক্তিবিশেষ এই সমবায় সংস্থাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় স্বদ পেতে লাগলেন। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিই ব্যাঙ্কের কার্য নির্বাহ করতে লাগল। সমবায় সংস্থাগুলি শুধু ব্যাঙ্ক হিসাবেই কাজ করত না, অনেক সময় বহু সম্পত্তির অছিগিরির দায়িত্বও তাদের ছিল। মূলধনের অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে গ্রহণ করা হত। এই অর্থ পরিশোধ করার প্রয়োজন হত না। রাজা উষভদাতার জন্য গোবর্দ্ধনের এক তত্ত্ববায় সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে দুই সহস্র কাহাপণ সংগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাসিকগুহার উল্লিখিত আছে যে ঐ অর্থের স্বদের ১২ কাহাপণ ২০ জন সন্ন্যাসীকে বস্ত্র ক্রয় করার জন্য সাহায্য করা হয়। নাসিক গুহার অপর এক শিলালিপিতে কোন এক সমবায় সমিতির ১০০০ কাহাপণ বিনিয়োগের উল্লেখ

আছে। নাসিকের আরও কয়েকটি শিলালিপিতে এই প্রকারের অর্থ বিনিয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অল্পরূপভাবে গোবর্দ্ধনে অগ্রাঙ্ক সমবায় সংস্থাগুলি একাধারে ব্যাঙ্কের কাজ ও অপরদিকে দুঃস্থ এবং পীড়িতদের সাহায্য প্রদান করত। অল্পরূপভাবে কুবাণ আমলের ছবিঙ্কের সময়ে মথুরা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, একসময় সমিতি ৫৫০ পুরাণ গচ্ছিত আমানতের হ্রদ থেকে ১০০ জন ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা করত এবং ক্ষুধার্ত এবং নিঃস্বদেরও সাহায্য করা হত।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলি শুধু টাকাই যে আমানত হিসাবে গ্রহণ করত তা নয়, এই ব্যাঙ্কগুলি স্থাবর সম্পত্তি এমনকি শস্যক্ষেত্রও স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখত। এই জাতীয় ব্যাঙ্ক সম্পত্তির দেখাশোনা এবং তদারক্য করত এবং আয়ের কিছু অংশ হ্রদ হিসাবে প্রদান করত। কোনও এক বৌদ্ধ গুহার শিলালিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে বড়ালিকাতে করঞ্জু এবং বট বৃক্ষের ক্ষেত থেকে আয়ের একাংশ বিনিয়োগ করা হত। অপর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বংশকার এবং কাঁসাকার প্রভৃতি সমবায়ের অর্থ লগ্নী, বিনিয়োগ প্রভৃতির কাজে লাগান হত।

উত্তর ভারতের সমবায় সংস্থাগুলির দক্ষিণভারতের সংস্থাগুলিও ধর্মের কাজে এবং অগ্রাঙ্ক বিষয়ে অর্থদান করত। কাঞ্চি নগরী এবং উহার উপকণ্ঠের তিলি সম্প্রদায়ের সমবায় ব্যাঙ্কের উল্লেখ ২৬১ নং মাদ্রাজ শিলালিপি (১৯০৯) থেকে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতের সমবায় সংস্থাসমূহ যে আমানত গ্রহণ করত সেই আমানত কেবলমাত্র শিল্প সংস্থায় বিনিয়োগ করা হত এবং বহু জনহিতকর কাজে উৎসাহ প্রদান করা হত। অনেক সময় দেখা যায় যে বড় আমানতের অংশ একাধিক ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হত। অনুমান করা হয় যে কোন একটি ব্যাঙ্কে সমুদয় অর্থ রাখার ঝুঁকি অধিকাংশ ব্যক্তি এবং সংস্থা নিতেন না। ফলে, সকলেই অর্থের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে একাধিক ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখতেন।

মথুরা এবং নাসিক শিলালিপি থেকে আমরা হ্রদের হার সম্বন্ধে জানতে পাই। ২০০০ এবং ১০০০ কাহাপণ (মুদ্রা) স্থায়ী আমানতের জন্য যথাক্রমে বাৎসরিক হ্রদের হার শতকরা ১২% এবং ৯% ছিল। মথুরা শিলালিপিতে সম্ভবতঃ নাসিক থেকে হ্রদের হার কিছুটা বেশী ছিল। হ্রদের হার স্থান, কাল এবং একই স্থানে ব্যাঙ্কের স্থায়ীত্ব, নিরাপত্তা এবং কর্মদক্ষতার কথা বিবেচনা করে সরকারী অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া এবং বিনিয়োগ করা হত। বর্তমান যুগের গ্রামাঞ্চলের হ্রদখোর ব্যক্তির যে হারে হ্রদ গ্রহণ করেন, তুলনামূলকভাবে মথুরা এবং নাসিকে শক, কুবাণ আমলের হ্রদের হার অনেক কম দেখা যায়। গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগে হ্রদের হার শতকরা ১৫% ছিল। গুপ্তযুগের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে হ্রদের অর্থের অনেকাংশ ভিক্ষুদিগকে দান করা হত কিন্তু আসল মূলধনের কোন পরিবর্তন হত না। ডি. বি. প্পুন্যর বৈশালী (বসার) থেকে কমপক্ষে ১৬টি সীল পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি সীলে 'শ্রেষ্টিনিগমণ্য' কথাটি বর্তমান এবং ইহা প্রমাণ করে যে ব্যাঙ্কব্যবসা বৈশালীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মজ্জু বৈশালীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে পূর্ব পশ্চিম ভারত অপেক্ষা ব্যাঙ্কব্যবসা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রকূট এবং চোল রাজাদের আমলে সমবায় সংস্থাগুলি ব্যাঙ্কের কাজ নির্বাহ করত। ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখত। হ্রদের হার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ছিল।

ভারতের চিরায়ত নৃত্য

স্বভঙ্গি অধিকারীপ্রামাণিক

ভারতের সংগীত ও কলাশিল্প যেমন বহু প্রাচীনকাল থেকে ঐতিহ্যগতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তেমনি ভারতীয় নৃত্য একইভাবে বিশ্বের দরবারে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পরিশীলিত ভাব-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সংগীত ও শিল্পের মতই ভারতীয় নৃত্য ভারতের প্রচলিত ধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। প্রথম দিকে বিভিন্ন অল্পষ্ঠান ও আসরে মুখ্য উপাদান ছিল এই নৃত্য।

ভারতের চিরায়ত (ক্লাসিক্যাল) নৃত্য বা শৈব ও বৌদ্ধযুগে চরম বিকাশ লাভ করেছিল এবং যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা দেখতে পাই নটরাজ মূর্তির নৃত্যভঙ্গিমায় ও অজস্র গুহার ভিত্তিচিত্রে—উনবিংশ শতাব্দীতে, এই নৃত্য জনসাধারণের চিত্তে থেকে দূরে সরে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং মুষ্টিমেয় দেশীয় বিলাসপ্রিয় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কোন রকমে বিকৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে। নৃত্যকে দেবমন্দিরে ও দেশীয় দরবার থেকে বহিরাঙ্গণে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কখনও দেখা গিয়েছিল, কিন্তু প্রচলিত ধর্ম ও অনুশাসন তাকে আঁটে পুঁটে এমনভাবে বেঁধে রাখা যে তার নড়বার উপায় ছিল না। সীমাবদ্ধ পরিধিতে এই নৃত্য তখন থেকে অনুশাসিত ও অল্পাঙ্কিত হয়ে আসছিল।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দ কুমারস্বামীর রসজ্ঞ দৃষ্টি এদিকে পতিত হয় এবং তাঁরা একাধিক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে জোরালো ভাষায় দক্ষিণ ভারতের এই চিরায়ত নৃত্যের অতুলনীয় সম্পদ রসিক সমাজ তুলে ধরেন। কথাকলি, ভরতনাট্যম ও মোহিনী-নাট্যম সম্বন্ধে ডঃ কুমার স্বামীর অনুশীলন ও গবেষণা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতের চারুকলা, সংগীত, ভাস্কর্য ও নৃত্যশিল্পের প্রতি স্বদেশবাসীকে সচেতন করে তোলেন। নানা প্রতিকূল আবহাওয়া ও সমালোচনা তুচ্ছ করে তিনি একক প্রচেষ্টায় এই নৃত্যধারা গঠনমূলকভাবে পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হন—যার ফলশ্রুতি হিসাব আজ বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী ও অগ্ন্যস্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্ম। তিনি যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় কাজ করেছিলেন তার তাৎক্ষণিক মূল্য বিচার হয়তো হয়নি, কিন্তু একটি অজ্ঞাত অবহেলিত রসলোক উন্মোচিত করে যাওয়ার আজ প্রগতির যুগে জনসাধারণ এই নৃত্যশিল্পকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। নৃত্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শিল্পীরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ভারতীয় চিরায়ত নৃত্যের বিভিন্ন শাখা ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে সহজভাবে সংক্ষেপে এবার আলোচনা করা যাক। উচ্ছাদ্য সংগীতের মূলে যেমন ছয় রাগ, ভারতীয় চিরায়ত নৃত্যেও তেমনি চারটি নৃত্যধারা প্রধান। দক্ষিণ-ভারতের ভরতনাট্যম ও কথাকলি, পূর্বভারতের মণিপুরী এবং উত্তর-ভারতের কথক—এই চারটি স্থনির্দিষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্যধারা যেন সমগ্র ভারতের নৃত্যকলাকে ধারণ করে আছে। এই চারটি নৃত্যধারা মূলতঃ হিন্দুধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং বহু

যুগ ধরে অমিত প্রাণশক্তির জোরে, নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও, প্রায় অবিকৃতরূপে আজও অগ্নান। এই নৃত্যকলাকে পেশারূপে গ্রহণ করে আজও বহু শিল্পী স্বদেশে ও বিদেশে পূজিত হয়ে আছেন।

এই চারটি নৃত্য ধারার মধ্যে ভরতনাট্যম, কথাকলি ও মণিপূরী অবিকৃত রয়ে গেছে বলা যায়। একমাত্র কথক নৃত্যই মুসলমান-যুগে বিভিন্ন মুঘল-দরবারে ঢুকে বেশ কিছুটা রূপান্তর লাভ করেছে।

ভরতনাট্যম

সর্বপ্রায়ে ভরতনাট্যমের কথাই বলা যায়। দক্ষিণ-ভারতের এই নৃত্যকলা তাজোয়ের রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেবমন্দিরে উৎসর্গীত দেবদাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এই নাচ শেখাতেন নাট্টয়ান্ গুরুকুল সম্প্রদায়। তাঁরা বংশ পরম্পরায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই দেবদাসীদের এই নৃত্যশিক্ষা দিতেন। এটিই ছিল তাঁদের একমাত্র পেশা ও জীবিকা। দেবদাসীরা শৈশবকাল থেকেই নৃত্যশিক্ষা করত এবং যতদিন না তারা এই নৃত্যপদ্ধতিতে পারদর্শিনী হয়ে উঠতো ততদিন তাদের কোন প্রকাশস্থানে নাচতে দেওয়া হতো না। নাট্টয়ান্ গুরুরাই বিনা পারিশ্রমিকে দেবদাসীদের নৃত্যশিক্ষা দিতেন এই শর্তে যে যখন তারা নেচে উপার্জন করবে তখন তার উপার্জনের একটা অংশ গুরুকে দিতে হবে। দেবদাসীরা এই শর্তটুকু সততার সঙ্গে সেদিন যেমন রক্ষা করেছিল, আজও তেমনি রক্ষা করে চলেছে, যদিও দেবদাসীদের বর্তমান অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীন ও মুক্ত। গুরুকে পরিত্যাগ বা অস্বীকার করে কখনও তারা কোনো আসরে নৃত্য প্রদর্শন করে না।

প্রথম দিকে ভরতনাট্যম ছিল মন্দিরের দেব-উপাসনা উপলক্ষে পূজা অর্চনাদির পরিপূরক হিসাবে দেবদাসীদের নৃত্য নিবেদন। পরে রাজ-দাক্ষিণ্যে এই নাচ দরবারের আনন্দাচ্ছাদনে প্রবর্তিত হয় ও প্রচলিত হয়ে ওঠে। সেই ভাবেই চলেছে বহুকাল।

ভরতনাট্যম শুধু মেয়েরাই নেচে থাকে, তবু এ অত্যন্ত বলিষ্ঠ নাচ। এ নাচের পদবিক্ষেপ দাঁড়ানোর ভঙ্গি ও হস্ত-সঞ্চালনের মধ্যে যেমন যৌবনোদ্ভূত ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ পায় তেমনি আধ্যাত্মিক অহুসঙ্গও গড়ে ওঠে। তার মধ্যে আদি রসের প্রাধান্য থাকলেও অনাদি রসলোকের দ্বার উন্মোচন করে দেয় এর গুচিতা ও মাধুর্য।

ভরতনাট্যের গৌরচন্দ্রিকা অংশকে বলে ‘আলারিপু’। আলারিপু শব্দটি তেলেগু ভাষা হতে গৃহীত। শব্দটির অর্থ : ফুল দিয়ে সাজানো। নর্তকীরা মাথার উপর দুই হাত জোড়ে স্থাপন করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—এইটি হচ্ছে প্রথম নৃত্যভঙ্গি। তারপর স্ক্রু হয় ‘রেচক’ অর্থাৎ ছন্দের তালে হাত চোখ ও মস্তক একসঙ্গে সঞ্চালন। এর পরবর্তী অংশকে বলে ‘বতিস্বরম্’। বতি অর্থাৎ তালমাত্রা। গুরু মুদ্রাে নানারূপ ছন্দ তোলেন আর নর্তকী তার নৃত্যের মাধ্যমে নানাবিধ বতি ফুটিয়ে তোলেন। এর পরের অধ্যায়কে বলে ‘শব্দম্’। আদিরসাত্মক বা ধর্মবিষয়ক তেলেগু গানের সঙ্গে নাচ স্ক্রু হয়। এতে ছন্দ ও তাল হয় গৌণ, মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় অভিনয়। কঠিন তালের সঙ্গে নর্তকীরা নৃত্য করেন। এরপর আসে ‘বর্ণম্’ যা ভরতনাট্যমের সবচেয়ে দুর্লভ ও সর্বাপেক্ষা

নৃত্যাংশ। তাল ও অভিনয় সমানভাবেই এই নৃত্যাংশে প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই অংশের নাচ এক ঘণ্টার উপর স্থায়ী হয়। ভরতনাট্যমের সবশেষে দেখানো হয় ‘তিলানা’ যার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে পায়ের কাজ। অর্থাৎ ক্রতলয়ে পায়ের বিভিন্ন ধরনের ছন্দ ফুটিয়ে তোলা। ভরতনাট্যমের এই পূর্ণাঙ্গরূপ নাচ দেখতে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে।

কথাকলি

কথাকলির নাচের জন্মভূমি কেরালা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই নাচের প্রথম প্রচলন হয়। নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি, জমকালো পোশাক ও জোরালো বাজনার সঙ্গে এই নাচ অলুপ্তিত হত। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটের সামরী বংশের রাজা মানব দেবরাজ যে ‘কৃষ্ণনাট্য’ নৃত্যের প্রচলন করেন, অনেকের মতে, কথাকলি নাচ তারই কিছু উন্নত সংস্করণ।

এইরূপ কথিত আছে যে কোট্টারাকার রাজা বীর কেরালাবর্মা তাঁর রাজ পরিবারের কোন এক বিবাহের উৎসবে অভিনয় করবার জন্য সামরীরাজকে অলুরোধ করেন তাঁর ‘কৃষ্ণনাট্যম’ দলটিকে পাঠিয়ে দিতে। সামরীরাজ এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে সারা দাক্ষিণাত্যে এমন কোন সমঝদার নেই যে এর রস উপভোগ করতে পারে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে কোট্টারাকার রাজা ‘রামনাট্যম’ নামে একটি নতুন নাট্যের প্রচলন করেন। এই নৃত্যে জমকালো পোশাকের পরিবর্তে পুরণো ধরনের সাদাসিঁদে পোশাক ব্যবহার করা হত। প্রকৃতপক্ষে কোট্টারাকার রাজাই প্রথম কথাকলি প্রচলন করেন। ইনি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পুরোণো লোকনৃত্যকে নতুন পোশাকে সাজিয়ে এবং পুরণো ও নতুন ভাবধারার সংমিশ্রণে এটি গড়ে ওঠে। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র নিয়ে রচিত হয় বলে এর নাম ‘রামনাট্যম’।

কোট্টারাকার পরবর্তী রাজা এই নৃত্যনাট্যের আরও সংস্কার করেন। তিনি চারটি কথাকলি নাটক রচনা করেন এবং নিজে একাধারে নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন।

কথাকলি নৃত্যকে ফুটিয়ে তোলার পেছনে থাকে শিল্পীদের ছয় থেকে দশ বছরের কঠোর সাধনা। সাধারণতঃ বারো থেকে পনেরো বছর বয়সে ‘কলারিতে’ প্রবেশ করতে হয়। অভিনয়ের সময় অভিনেতাদের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যুৎবেগে সঞ্চালিত হতে থাকে। নয়টি বিভিন্ন ভঙ্গিতে মস্তক সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া হয়। এ সময়ে কোন কথা বলা হয় না। কথার বদলে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। হস্ত সঞ্চালন বা মূদ্রা দ্বারাও মনের ভাব প্রকাশিত হয়। এইরূপ ৬৪ প্রকার হস্ত সঞ্চালনের রীতি আছে। কথাকলি নর্তকের চোখ দুটিও সত্যি সত্যি নাচতে থাকে। চোখের ভুরু ও পাতার চালনা খুব তীক্ষ্ণ ও অর্থপূর্ণ। এইরূপ ৬৪ প্রকার হস্ত সঞ্চালনের রীতি আছে। কথাকলি নর্তকের চোখ দুটিও সত্যি সত্যি নাচতে থাকে। চোখের ভুরু ও পাতার চালনা খুব তীক্ষ্ণ ও অর্থপূর্ণ।

আমাদের দেশে ষাট্টিভিনয়ের মতো রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে সারারাত এই পালানৃত্য চলে। শুধু মূদ্রা ও নৃত্যের তালে ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যমেই কাহিনী সুপরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। সংলাপের কোন স্থান এতে নেই। বরং এক কথায় বলা যেতে পারে নৃত্যের মাধ্যমে

এটি মুকাভিনয় মাত্র। এ নৃত্যের আসর বসে খোলা মাঠে সামিয়ানার তলায়, স্থূঁ ও স্থূঁর পরিবেশে। তিনদিক ঘিরে দর্শকদের বসবার স্থান, তাদের সামনে মশালের মতো জ্বলে একটি বৃহৎ স্থূঁয়ের প্রদীপ—এ ছাড়া অত্র কোন আলোর প্রয়োজন হয় না। দুটি লোক পর্দার আড়াল রচনা করে অভিনয়ের পাত্রপাত্রীদের উপস্থিত করে আসরে। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আসরে উপবিষ্ট বাদকদলের মধ্যে থেকে একজন গান গেয়ে নৃত্যাভিনয়ের বিষয়বস্তু বিবৃত করে—যুদ্ধ ও খঞ্জনী বাজতে থাকে স্বচ্ছন্দে। লোক দুটি পর্দা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর পাত্র পাত্রীগণ গানের বিবৃতির সঙ্গে নৃত্যছন্দে তালে তালে অভিনয় করে চলে।

নন্দীকেশর 'অভিনয়দর্পণে' বলেছেন, নাচের সময় নট কণ্ঠের দ্বারা গান করবে, পা দিয়ে তাল দেবে, চোখের দ্বারা ভাব ও হাতের দ্বারা অর্থপ্রকাশ করবে। অঙ্গভঙ্গিই কথাকলির প্রাণস্বরূপ এই অঙ্গভঙ্গি চারপ্রকার। ১. অঙ্গিকাভিনয় ২. বাচিকাভিনয় ৩. সাত্তিকাভিনয়। কথাকলি নর্তকের পোশাক ও রূপসজ্জা যদিচ খুব পুরনো রীতিপুষ্টি ও অদ্ভুত বিচ্ছিন্নমূলক ওথাপি চিত্তাকর্ষক ও নৃত্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক। এর মধ্যে কিছুটা মালয়ালম এবং তিব্বতী প্রভাব দেখা যায়। এ নৃত্যসজ্জায় লাল, সবুজ, হলদে, কালো ও সাদা রঙের পোশাকের বেশি চলন। বিভিন্ন শ্রেণীর নর্তকের জন্য বিভিন্ন ধরনের রূপসজ্জা ব্যবহার হয়। নারী চরিত্রে সজ্জা অপেক্ষাকৃত সরল। কেশবিশ্রাস হবে স্ববিস্তৃত, ভারী এবং বর্ণাঢ্য। চরিত্রগুলো প্রচুর পরিমাণে কেশর, বলয়, বাজুবন্ধ, গুলফবন্ধ ধারণ করে। মুনি ও সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া প্রায় সকলেই ফাঁপানো পোশাক (স্কার্ট) পরেন। রাজা, দেবতা, দানব প্রভৃতি চরিত্রগুলো অদ্ভুত ধরনের পোশাক ব্যবহার করে থাকেন এবং মুখের বর্ণ ও প্রায় তদনুরূপভাবে রঞ্জিত হয়ে থাকে। দেবচরিত্রে যারা রূপদান করেন তাঁরা এক ধরনের বাঁকা কাঠের মুখোস ব্যবহার করেন এবং তাঁদের কাঁধের উপর বিস্তৃত থাকে ভাঁজকরা লাল পদ্মাকৃতি কর্ণহারের মত অদ্ভুত অলংকার। গায়ের উপর শালের মধ্যে ছোট ছোট দর্পণ সন্নিবিষ্ট থাকে, দর্পণগুলি এত উজ্জ্বল যে তাতে মুখ দেখা যায়। তাঁদের মুখমণ্ডল বিচিত্রিত হয়, বিশেষতঃ জয়মূল। মুখের উপর কতগুলো সাদা রেখা চরিত্রাভূগ ভাব বিকাশের সাহায্য করে—এ ধরনের রূপসজ্জার অপর নাম 'চুটি'।

ভাবের দিক থেকে কথাকলি নর্তকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সাত্তিক, রাজসিক ও তামসিক। এই তিনটি মূল ভাবকে অবলম্বন করে কথাকলি নৃত্যে, রূপসজ্জা অনুযায়ী, চরিত্রগুলোকে পাচ্চা, কান্তি, তাড়ি, কারি ও মিলুকু এই পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

(এক.) পাচ্চা চরিত্রে রূপসজ্জার মূল রঙ সবুজ। এই চরিত্রে সাদা চুটির বিপরীত মুখে সবুজ ও তাকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য লাল চোঁট এবং কালো রঙের চোখ ও তুরু আঁকা হয়। কপালে আঁকা হয় চাঁপা রঙের তিলক। এই প্রসাধনে ইন্দ্র, রাম, অর্জুন, কৃষ্ণ, নল প্রভৃতি বীর ও সাত্তিক চরিত্র রূপায়িত হয়। পাচ্চার মূল রস বীর ও শূঁদার।

(দুই) কান্তি চরিত্রে মুখে সবুজ রঙের উররে লাল এবং তাকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য সাদা বর্ডার দেওয়া হয়। নাকে ও কপালে দুটি সোলার বল হিংস্রতাকে প্রকট করে। এই রাবণ, কীচক, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি চরিত্রে ব্যবহার করা হয়। কান্তি চরিত্রের মূল রস বীর ও রোঁদ।

(তিন) তাড়ি চরিত্রে সবচেয়ে উজ্জল ও প্রকট প্রসাধন ব্যবহারের রীতি। চরিত্রের গুণ অল্পাধী লাল, কালো ও সাদা এই তিন প্রকার রূপসজ্জা প্রচলিত। দুঃশাসন, বকাসুর প্রভৃতি চরিত্রের ভয়াল ও শয়তানীরূপ প্রকাশের জন্ত লালতাড়ি এবং ব্যাধ, শিকারী প্রভৃতি চরিত্র প্রকাশের জন্ত কালো তাড়ি ব্যবহৃত হয়। হুমান চরিত্রের জন্ত নির্দিষ্ট সাদা তাড়ি। এর মূল রস বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

চার। কারি চরিত্রের রূপসজ্জার মূল রং কালো। পুতনা, তাড়কা, শূর্ণনখা প্রভৃতি কুটিল চরিত্র প্রকাশের জন্ত এই রূপসজ্জার ব্যবহার। এই চরিত্রের পোশাকের রংও কালো। এর মূল রস রৌদ্র ও বীভৎস।

পাঁচ। মিসুকু চরিত্রের প্রসাধন সম্পূর্ণ স্বভাব। এতে উজ্জল রঙের কিছুই ব্যবহৃত হয় না। জ্যোপদী, দমরন্তী, সাধু প্রভৃতি চরিত্রে এই স্বল্পোজ্জল রূপসজ্জা ব্যবহারের রীতি। এর মূল রস শান্ত ও শূণ্য।

কথক

কথক নৃত্যের উদ্ভব বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। প্রকৃত ইতিহাস যে কী তা নিয়ে নানা মূনির নানা মত। সাধারণভাবে বিচার করলে এ নৃত্যের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে মনে হয় না। কথক নৃত্যের উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজত্ববর্গের সংস্কৃতি ও কুটির উপর দৃষ্টিপাত করা দরকার। সাধারণতঃ প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত। তা সত্ত্বেও হাজার বৎসরব্যাপী ভারতবর্ষে যে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাতে ভারতীয় সংগীতে হিন্দুপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন যে ধারার সংগীত ও নৃত্যকলা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বিশেষ করে ভারতের নাট্য শাস্ত্রে ও নন্দিকেশরের অভিনয় দর্পণে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হোত। ৭১২ খ্রীঃ আরবগণ প্রথম ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে। এতদ্বারাই ভারতে মুসলমানগণের প্রথম প্রবেশ। কিন্তু তারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং প্রভাবান্বিত হয়েছে বলা যায়। এর ১০০ বছর পরে তুর্কিরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এদের উদ্দেশ্য ছিল তরবারির সাহায্যে ধর্মপ্রচার করা, এবং সেই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিল। আরবগণের মধ্যে সুলতান মামুদ বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংস করে বহু নারী ও দেবদাসীদের ধর্মান্তরিত করে নিজদেশে নিয়ে যান। উত্তর-ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির অধঃপতনের সেই প্রথম সূচনা। এরপর তুর্কী দাসগণ রাজত্ব করে। এই সমস্ত তুর্কী সুলতানেরা শিল্প জগতে ভারতীয় শিল্পিগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে, যদিচ ধর্মের ক্ষেত্রে বহু বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে তখন।

অতঃপর মোগলেরা ভারত আক্রমণ করল। তারা শুধু আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হল না— সাহিত্য, শিল্প, সমাজক্ষেত্রে অর্থনীতিতে এবং শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের বিশিষ্ট ভাবধারা বজায় রাখল। তার ফলে পরবর্তীকালে সমগ্র উত্তর-ভারতে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে আকবরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত

সংস্কৃতির একটি নতুন শিল্পধারা প্রবর্তিত হয়। ভারতীয় ও পারস্য সংগীতের মধ্যে আদান-প্রদানের ফলে উত্তর ভারতীয় সংগীত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। নৃত্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই সময় হিন্দু-নৃত্য ও বিদেশী নৃত্যের সংমিশ্রণে একটি নতুন ভারতীয় বর্ণশঙ্কর নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যা থেকে আমরা ঐক্যমিত্তিক প্রভাবের বহু চিহ্ন দেখতে পাই। কথক নৃত্যে যে বিজাতীয় প্রভাব আছে তা এই নৃত্যের আকৃতিগত প্রকাশ হতে বেশ বোঝা যায়। সেলামীর টুকরা ব্যবহার, আমদ প্রচলন, গংভাও বাতলানো প্রভৃতির ভিতরে উর্দু শব্দের বহুল প্রচলন আছে। দ্বিতীয়তঃ কথক নৃত্যের ইতিহাস-সাহিত্যেও দেখি উর্দু ভাষার ব্যবহার। এ নৃত্যের পোশাক-পরিচ্ছদেও উর্দু অর্থাৎ মুসলমানী সংস্কৃতির ছাপ।

সাধারণভাবে কথক নৃত্যের তিনটি ঘরানা প্রচলিত : (১) লখনউ (২) জয়পুর ও বেনারস।

লখনউ ঘরানা : এই ঘরানা প্রবর্তন করেন প্রখ্যাত কথকশিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ। তিনি অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজিদ আলী সাহেবের দরবারে প্রধান নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তখন থেকেই লখনউ ঘরানার সূচনা।

অবশ্য অনেকের মতে ঠাকুরপ্রসাদের পিতা কথকশিল্পী প্রকাশজী নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে যোগ দিয়ে লখনউ ঘরানার সূত্রপাত করেন। যাইহোক, এঁরা ‘রাসধারী’-সম্প্রদায়ের কথক-শিল্পী এবং রাজস্থান থেকে (মতান্তরে এলাহাবাদ থেকে) লখনউয়ে আসেন।

জয়পুর ঘরানা : এ ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী। তিনি শিবভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে শিবতাণ্ডব নৃত্যশিক্ষা করেন। তাঁর পুত্র মানুজী এবং পৌত্র লালুজী ও কানুজীর মাধ্যমে বংশপরম্পরায় শিবতাণ্ডব নৃত্যের এই ঘরানা গড়িয়ে এসেছে। কানুজী বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন ও লাস্ত্র ভাবযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলা-নৃত্য রচনা করেন।

জয়পুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে হরিপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, ইলুমানপ্রসাদ, নারায়ণপ্রসাদ, হুন্দরপ্রসাদ, আমলাল, মোহনলাল প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

বেনারস ঘরানা : বেনারস ঘরানা প্রবর্তন করেন জানকীপ্রসাদ। এই ঘরানার নৃত্যপদ্ধতি লখনউ ঘরানার অনুরূপ।

মণিপুরী

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অবস্থিত ছোট মণিপুর রাজ্যটি স্বরণাভীত কাল থেকেই সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট গৌরবময় স্থানের অধিকারী। সংগীত ও নৃত্যকলায় এ রকম জাতিগত প্রবণতা ভারতের অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। মণিপুরী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ তার নৃত্যকলায় বিধৃত। সমষ্টিগতভাবে এই নৃত্যধারাকে মণিপুরী নর্তন বা ‘মৈ তৈ জগোই’ বলা হয়।

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পামহৈবার রাজত্বকাল থেকেই মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা। এর পূর্বে কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণ রাজা পামহৈবা যখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর পূর্বের সমস্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মণিপুর রাজ্যের কিছু কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় এবং তা থেকেই জানা যায় যে রাজা

পার্মহেবা বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ফলে মণিপুর রাজ্যের ধর্মীয় ও সংস্কৃতি জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। রাজা পার্মহেবা প্রজাদের মধ্যে মৈ তৈ ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনে আগ্রাণ চেষ্টা করেন। গুরু গোস্বামী শান্তিদাস অধিকারীর নির্দেশে মৈ তৈ ধর্ম ও তার ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র বিনষ্ট করা হয়। তিনি মৈ তৈ দেবদেবীদের পূজা, মৈ তৈ ভাষা ও বর্ণমালার প্রচলন নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে, মৈ তৈ শিল্প-সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। তারপর থেকেই মণিপুরী সংগীতে ও নৃত্যকলায় বৈষ্ণব-প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

রাজা পার্মহেবার পৌত্র স্বনাম চিঙসাঙ থাখা অপেক্ষা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ নামে বেশি পরিচিত হলেও, পরে ‘কর্তামহারাজা’ নামে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৭৮৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে মণিপুরী সংস্কৃতির বিকাশের স্বর্ণযুগ বলা যায়। রাজা ভাগ্যচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলা দেশ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুর ভ্রমণে আসেন। ফলে, রামানন্দ ভাবাদর্শের পরিবর্তে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমশ মণিপুরে প্রসার লাভ করে। পরে মৈ তৈ বর্ণমালা মণিপুরে পুনঃ প্রচলিত হয়। মণিপুরী সংগীত ও নৃত্যকলায় তার প্রভাব পড়ে। ফলতঃ চৈতন্য, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের পদাবলী মণিপুরী সংগীত ও নৃত্যে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র যে কেবল বীর ও স্বশাসক ছিলেন তাই নয় তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির অন্ততম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মণিপুরের বিখ্যাত রাসনৃত্যের প্রবর্তক। রাসনৃত্যের প্রচলন সম্পর্কে মণিপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

রাজা ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে মণিপুর রাজ্য ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধে ভাগ্যচন্দ্র পরাজিত হন। পরাজয়ের প্লানিহেতু তিনি বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করে বেড়াতে থাকেন। এইভাবে বেড়াতে বেড়াতে এক সময়ে তিনি আসামের রাজ্যের অতিথি হলেন। তখন মণিপুর রাজ্য হতে আসামের রাজ্যের নিকট এক বড়বন্থমূলক গোপন সংবাদ এল যে আসামরাজ্য সংবাদ পাওয়া মাত্র যদি ভাগ্যচন্দ্রকে হত্যা অথবা রাজ্য হতে বিতাড়িত না করেন তবে তাঁর রাজ্যে বিপদ উপস্থিত হবে। আসামের রাজা নিদারুণ সংকটে পড়লেন। একদিকে তাঁর মান্তবর অতিথির সম্মান এবং অপরদিকে সমস্ত রাজ্যের প্রজাদের নিরাপত্তা। রাজা মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বকোশলে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ভাগ্যচন্দ্রকে বললেন যে তাঁর রাজ্যে এক পাগলা হাতী প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করছে,—বীরশ্রেষ্ঠ ভাগ্যচন্দ্র যদি এই হাতীটাকে মারতে পারেন তবে তিনি বড়ই সম্ভষ্ট হন। ভাগ্যচন্দ্র বুঝতে পারলেন তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বীরত্ব প্রকাশের এই স্বযোগ তিনি নষ্ট করতে চাইলেন না। হাতী শিকারের দিন স্থির করে তাঁকে জানানো হল যে একদিন পরেই এ কাজ করতে হবে। মাত্র একটি দিন সময় ভাগ্যচন্দ্র সারাদিন শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে লাগলেন। সেইদিন রাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং বললেন যে তাঁর ভয়ের কোন কারণ নেই। তৎসহ কয়েকটি নির্দেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

পরদিন ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠমালা নিয়ে হাতীর সামনে উপস্থিত হতেই হাতী এক অদ্ভুত কাণ্ড করল—নমস্কারের ভঙ্গিতে গুঁড় নেড়ে নিজ স্বক্ষে ভুলে নিল

ভাগ্যচন্দ্রকেই! প্রজারা এই দৃশ্য দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল। ভাগ্যচন্দ্র সেই হাতীর পিঠে চড়ে মণিপুর অভিযুখে রওনা হলেন এবং নিজের রাজ্য উদ্ধার করলেন। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত অতঃপর তিনি বিশেষ ব্যগ্র হলেন এবং কেয়ান পর্বত থেকে কাঁঠাল গাছের কাণ্ড এনে শিল্পীকে মূর্তি তৈরী করতে আদেশ দিলেন। শিল্পী জানতেন না শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি কিরূপ। তাই রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্থলিত সংগীতের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করলেন। শিল্পী সেই অপূর্ব বর্ণনা শুনে কাঠের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি গড়ে তুললেন।

মণিপুরে তখন ব্রাহ্মণ জাতি প্রায় ছিল না সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা কিভাবে হবে রাজা এই সমস্যায় পড়লেন। সেদিন রাতেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখা দিলেন স্বপ্নে এবং জানালেন যে, রাজার যে কন্ঠাটি আছে তাকে শ্রীরাধিকা সাজিয়ে দেবমূর্তিটি মণ্ডলীর মধ্যে রেখে রাসনৃত্যের দ্বারাই তাঁর পূজা ও প্রচার হবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রত্যহ রাজ্যে রাজাকে রাসনৃত্য দেখাতে থাকেন এবং পরদিন সকালে রাজা তা কন্ঠাকে শিক্ষা দেন। এইভাবে মণিপুরে রাসনৃত্যের সৃষ্টি হয় ও প্রচার ঘটে।

গুরু স্বরূপানন্দ ও রামানন্দ ঠাকুরের নির্দেশে ভাগ্যচন্দ্র নৃত্যগুরুদের সহযোগিতায় রাসনৃত্যের আঙ্গিকে পোষাক, সংগীত ও অন্যান্য নিয়ম প্রচলন করেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্রই মহারাস বসন্তরাস কুঞ্জরাস ও ভঙ্গিপারেও প্রবর্তন করেন।

উপসংহার

নৃত্যের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই এ নিবন্ধ শেষ করব। যে চারটি নৃত্যের কথা হল, এদের প্রত্যেকটি নিজস্ব ভঙ্গি ও স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। একটির সঙ্গে অপরের তালে, ভঙ্গিতে, মূদ্রার ব্যবহারে পার্থক্য আছে। কথাকলি ও ভরতনাট্য্যেমের আদর্শগত যোগসূত্র থাকলেও ভরতনাট্য্যেমের মত বিচিত্র চন্দ্রবল্ল পদসঞ্চালন কথাকলিতে নেই—কথাকলি বহু জনসমাবেশে অভিনয়প্রধান নাচ। কথক একক নৃত্য। ভরতনাট্য্যেমের মত কথকে মূদ্রাভিনয় নেই, কিন্তু পায়ের কাজে কথক অদ্বিতীয়, চন্দ্রবৈচিত্র্যের নাচ হিসাবে কথক সব নাচের অগ্রণী। মণিপুরী নাচে কোনোটারই আতিশয্য নেই। মূদ্রা বা পায়ের কাজের জটিলতার দিকে না গিয়ে হাত পা দেহ ও মাত্রার একত্র সঞ্চালন একটি অল্প প্রকারের ভঙ্গিমাকে এরা ফুটিয়ে তোলে। গানের ছন্দে তাদের হাত পা মাথা ও দেহ একসঙ্গে দুলে ওঠে, পদাবলীর সুরে সমন্বিত ভাবরসকে দেহের ভঙ্গিমায়া সহজে প্রকাশিত করাই এদের সাধনা। এ নাচে উদ্দামতা নেই—আছে বিকচ-পুষ্পের প্রস্ফুটিত হবার অনায়াস মধুর স্বপ্না।

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

কৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির সংবাদ (কৃ: চ: ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরি:)

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর পঞ্চদশমী সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে তার সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে।

কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা (কৃ: চ ১ম খণ্ড, ৮ম পরি:)

বিভিন্ন গ্রন্থে বহু কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। আবার ইংরাজপণ্ডিতগণ কৃষ্ণচরিত্রকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন, কারণ মহাভারত থেকে কৃষ্ণচরিত্রকে বাদ দিলে কাহিনী ঠিক থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মতকে হাস্তাকর বলে মনে করেন। কৃষ্ণচরিত্র যে ঐতিহাসিক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? (কৃ: চ: ১ম খণ্ড, ২য় পরি:)

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রাচীন গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করবেন তার উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজ পণ্ডিতগণ যেভাবে প্রাচ্যের গুণাবলীকে পাশ্চাত্যের প্রভাবজ্ঞাত বলে মনে করেন তাতে যারা বিশ্বাসী তাঁদের কৃষ্ণচরিত্র না পড়ারই উপদেশ দিয়েছে।

কৃষ্ণের জন্ম কৃ: চ: ২য় খণ্ড/২য় পরি:)

কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের প্রচলিত কাহিনী বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র তার সত্যটুকু নিংড়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কংসের ভয়ে কৃষ্ণকে বহুদেব নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এর মধ্যে কোন দৈবঘটনা নেই।

কৃষ্ণের বহুবিবাহ (কৃ: চ: তৃত্ব খণ্ড/৭ম পরি:) ॥

কৃষ্ণের বহুপত্নীর কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে কৃষ্ণের একাধিক স্ত্রী থাকা অসম্ভব নয়।

কৃষ্ণের বিবাহ (কৃ: চ: ৩য় খণ্ড/৪র্থ পরি:) ॥

কৃষ্ণের প্রথম ভার্য্যা রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেও এর মধ্যে কোন অভ্যাস ছিল না। কারণ রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি মনে মনে অনুরক্তা ছিলেন এবং সেকালের প্রথায় হরণ ব্যাপাটি নিন্দনীয় ছিল না।

কৃষ্ণের মানবিকতা (কৃ: চ: ৪র্থ খণ্ড/৫ম পরি:) ॥

কৃষ্ণের মানবিকতা দেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৃষ্ণের বিভিন্ন মানবিক আচরণের পরিচয় দিয়েছেন।

কৈশোর লীলা (কৃ: চ: ২য় খণ্ড/৬র্থ পরি:) ॥

কৈশোর লীলায় কৃষ্ণের দু'টি আলৌকিক ক্রিয়াকলাপ—কালিয়দমন ও গিরিগোবর্ধনধারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই দু'টি কাহিনীর অসম্ভাব্যতা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করলেও, এর

মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বের এক রূপকের সন্ধান পেয়েছেন।

কোন পথে যাইতেছি? (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম) ॥

প্রথম প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ: ২০০-২০৪।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলির যাবতীয় মতবাদ নির্দিষ্ট মেনে নিতে রাজী নন; অথচ অজ্ঞাত ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি আলোচনার প্রবৃত্তি হয়েছেন।

কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র (লোকরহস্য) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’ কার্তিক ১২৮২, পৃ: ৩১৩—৩১৭।

কিছু কিছু ইংরেজ এদেশে এসে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে ‘স্পেশালিটি’ অর্জন করতেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু আমরা সাদরে গ্রহণ করতাম। এখনো আমাদের দেশে অধিকাংশ সংস্কৃতিকেই যে অনার্যসংস্কৃতির ছাপ দান করার চেষ্টা আছে, তা’ এইসব ইংরেজ স্পেশিয়ালের গবেষণার প্রভাবই সূচিত করে।

এই ইংরেজ ‘স্পেশিয়াল’ ভ্রমলোকটি বাংলাদেশে এসে বাঙালীজাতি সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করেছেন, তাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ বা ‘বেঙ্গল’ নামের তিনি বেশ একটা স্মরণীয় যুক্তি বের করেছেন। বেঙ্গামিন গল নামে কোন এক ইংরেজ প্রথম এদেশ আবিষ্কার করেন, তাই তাঁর নাম অনুসারেই এদেশের নাম হয় বেঙ্গল। আবার Calcuttaতে কাল কাটাৱার কোন অর্থবিদ্যা নেই বলেই এরূপ নাম। এদেশের মানুষ ম্যানচেষ্টরের প্রস্তুত কাপড় পরেন। তাই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন—ইংরেজ আগমনের পূর্বে নিশ্চয়ই এখানকার লোক উলঙ্গ অর্থাৎ অসভ্য ছিল। এমনি এদের বিদেশী প্রভাব বাঙালীর সর্বত্র।

বাঙালী জাতির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অসীম। তাঁর মতে বিভিন্ন জাতিগুলি হল— ১। ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ, ৩। শূত্র, ৪। কুলীন, ৫। বংশজ, ৬। বৈষ্ণব, ৭। শাজ, ৮। রায়, ৯। ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। করাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, ১৫। আসাম গোয়ালপাড়া, ১৬। পারিয়া ডগস্।

বাংলা সাহিত্যেও তাঁর জ্ঞান অসীম। তিনি গোলেস্তান এবং বোস্তান নামে দুখানি বাংলা গ্রন্থ পড়ে বলেছেন—‘যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।’

সংস্কৃত সাহিত্যে এই ‘স্পেশিয়ালের’ অপরিমিত দক্ষতা। তিনি তাই লিখেছেন—‘আত্মানং সত্যং রক্ষ্যে দারৈরপি ধনৈরপি। ইহার অর্থ এই, হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্ত তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।’

এমনিভাবে ‘স্পেশিয়াল’ নামধারী অন্তঃসারশূন্য গবেষকদের বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গবর্ণনে বিদ্ধ করেছেন।

সম্মিহিত কোন ॥ কমল তরফদার । ৫০-এ সেন্টাল রোড, কলি-৩২ । তিন টাকা । মানস প্রকাশনী,

কোন কবিই পূর্বসূরীদের সংস্পর্শকে উপেক্ষা করে কোন কিছু রচনা করতে পারেন না । কবি বা সাহিত্যিক সকলেই স্ব-স্ব চেতনার ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা এবং পরে অন্যান্য সকলের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার আশ্বাদন লাভ করেন । এবং এর ফলে যে নবতম ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় তাকেই নির্ভর করে আপন-আপন মনের উদ্ভূত ভাবগুলোকে ব্যক্ত করেন । এতে যদি কোন পূর্ব-সমৃদ্ধ লেখক বা কবির ছাপ নিজের লেখায় পড়ে তাতে খতিয়ে দেখতে হবে যাকে বলে original vitality অথবা মৌলিক শক্তি, সেটা আছে কিনা । স্বত্বের বিষয় আলোচ্য কবি সে পরীক্ষার ক্ষেত্র বিশেষে উত্তীর্ণ হয়েছেন । ভাইট্যালিটির সম্ভারে তা পাঠক চিত্তকেও নাড়া দেয়, মনকে লা-পালোমার স্বরে-ছন্দে অনুরণিত করে । একটানা পড়ে গেলে মনে হবে কখনও শোনা যাচ্ছে জিং জিং শব্দে স্প্যানিশ গিটারের গুঞ্জন বা ঠাকুরমার কণ্ঠের একটানা মহাভারত পাঠ ; কখনও মনে হবে চোখের সামনে ধূ-ধু প্রান্তর অথবা জনাকীর্ণ আনুষ্ঠানিক সাজসজ্জার ভীড় ।

এই ভাইট্যালিটির পিছনে একটা মহৎ চেতনা কাজ করে । তা হলো সত্যতা । হাডসান এর কথায় : without sincerity no vital work in literature is possible. কমল তরফদারের কবিতায় এই বিশেষ আন্তরিকতার স্পর্শ বর্তমান । যে বুদ্ধিমত্তা, আবেগ ও সৌন্দর্যবোধ নিয়ে কবি তাঁর কবিতাগুলোকে রচনা করেছেন সেগুলো তাদের আলয়ে কবির অন্তর্বেদকে প্রকাশ করেছে । জীবন ও জগতের সমস্তা ও মানুষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যখন অনুভূতিপ্রবণ মনের গভীরে পেরিয়ে ফুটে বেরায় তখনই তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কবিতার রূপ নেয় । কমল তরফদারও এই নিয়মের ভিতর নিজেকে ধরা দিয়েছেন । কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র—সমস্তাগুলোকে অনুভব করেই ক্ষান্ত হয়েছে । মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়ার কোন সচেষ্ট প্রয়াসের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি । না কোন কাল্পনিক জগতে, না বাস্তব জর্জরিত জীবনের কোন এক উপেক্ষিত কোণে । তার কারণ হয়তো এই যে, এই দ্বন্দ্ব বা অস্থিরতা অথবা অনিত্য পদ্বিলে বাঁধা জীবনের নিছক আশ্ফালনের বিরুদ্ধে কবির মন অভিমানমুগ্ধ কবির এই যে উপলব্ধি এর পিছনে নিজের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার কোন আড়ম্বর নেই । এই আন্তরিক উপলব্ধিই তাঁর কবিতাগুলোকে মধুর করে তুলেছে । অবশ্য তাঁর কবিতাগুলোর মধ্যে কোথাও বিশেষ কোন বক্তব্য তিনি রাখেন নি ; এবং সমালোচকদের ভাষায় যাকে বলে ‘সাইটজিষ্ট, (zeitgeist) অথবা সমসাময়িক চেতনা, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে সে চেতনারও তেমন উল্লেখ ঘটেনি ।

মোট একশটি কবিতার সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটিতে পাখি তোমার বাসা, তানজোরের দিকে, কার্বেজ

জলছে, আবক্ষ মৃত্যুর মধ্যে, মরুর প্রেম, পঁচিশে বৈশাখ, দুর্গপথে কবিতাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘পাখি ভোমার বাসা’ কবিতাটির মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কে কবির আন্তরিক দরদ পরিষ্কৃত। ‘তানজোরের দিকে’ কবিতাটি পাঠ করলে একটি প্রসিদ্ধ বেদ-স্তোত্র মনে পড়ে : শৃঙ্খল বিশ্বের অমৃতন্ত পুত্রাঃ। বেদান্ত মতে মানুষ অমৃতের পুত্র আর বাইবেল মতে প্রথম মানুষের পাপের মাঙ্গল্য হিসাবে মানুষের জন্ম। খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী একদল যখন স্ব-পাপের অপরাধ বোধে জর্জরিত তখন স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে ডেকে বলেছেন ওঠো, জাগো, (কারণ যে অমৃতের পুত্র তার আবার অপরাধ কি, শুধু তার আত্ম-চেতনা নানা ভ্রমে আচ্ছন্ন, স্তম্ভ)। গীতার একস্থানে উল্লেখ আছে, মানুষ নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের মিত্র (আত্মৈব হ্যাঅনো বন্ধু আত্মৈব ত্রিপুয়াঅণ) স্তবরাং উদ্ধার প্রাপ্ত হও, নিজেকে অবসাদ গ্রস্থ হতে দিওনা। একই মানুষ জাতির প্রতি উক্ত দুই বিপরীত ধর্মী মতবাদের অভিভেদ অবতারণা কবিতাটির সম্ভার বাড়িয়ে তুলেছে।

অন্ততঃ—

‘হেমলিন বাঁশিওয়ালা ডেকে যায় নিশিটানা সুরে

আমরা খঞ্জ বলে পৌছুতে পারিনা অতদূরে।’ স্মরণীয়।

পরিশেষে, কোন কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ যে বিমূর্ত কাব্য হতে পারে ‘সম্মিহিত কোণে’ তার অনন্ত স্বাক্ষর বর্তমান।

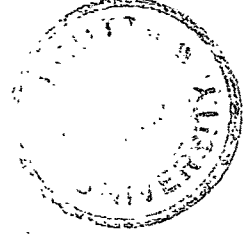
শোভন গুপ্ত

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

সমকালীন



ডঃ শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকর

গৌরাজগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র রাজ্যের কোলাপুর জেলার নরাসোবাটি ওয়াডি নামক স্থানে শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকর জন্মগ্রহণ করেন। কোলাপুর শহরের নিকট হার্লি নামক গ্রামে পিতার তত্ত্বাবধানে শ্রীপাদকৃষ্ণ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মধ্য প্রাথমিক ও হাইস্কুল পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভার্থে শ্রীপাদ কোলাপুরের রাজারাম কলেজে প্রবিষ্ট হন। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি পুণার ডেকান কলেজের বি. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন ও এই কলেজ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ও সংস্কৃতে উচ্চশ্রেণীর ‘অনার্স’ সহ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় সাতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন জগৎ তিনি এই কলেজ হইতে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠের জগৎ একটি বৃত্তিও লাভ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর তিনি রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়েও এম-এ পরীক্ষায় সন্মানে উত্তীর্ণ হন। শ্রীপাদকৃষ্ণের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী শিথিল করেন এবং একই বৎসরে একসঙ্গে দুইটি বিষয়ে শ্রীপাদকে এম-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দান করেন। পরবৎসরও দুইটি পরীক্ষা দানের স্বযোগ শ্রীপাদকৃষ্ণকে দেওয়া হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদ বোম্বাইস্থিত এল্‌ফিনষ্টোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদলাভ করেন। একবৎসর পর তাঁহাকে পুণার ডেকান কলেজের পুঁথি সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদ ডেকান কলেজ পুঁথিশালায় রক্ষিত ব্যাকরণের পুঁথিগুলির বিবরণীমূলক বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেন। চারিটি বিষয়ে এম-এ ডিগ্রীধারী শ্রীপাদ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গ্রীক ও ইউরোপীয় দর্শন বিষয়েও বোম্বাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত তাঁহাকে “কাশীনাথ গ্রন্থক তেলঙ্গ” স্মারক স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। অতঃপর তিনি ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারা’ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন। এই রচনাটি কয়েক বৎসর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (১)। প্রায় ষষ্টিবর্ষ পূর্বে শ্রীপাদ রচিত এই পুস্তকটি সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি প্রকৃতি বিচারে এখনও অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণামূলক রচনাটির জন্ত শ্রীপাদকৃষ্ণকে “বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক” স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ডেকান কলেজ সংস্কৃত পুঁথিমালার অধ্যক্ষ থাকাকালে সংস্কৃতভ্রম্মে শ্রীপাদের খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সময়ে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এইচ. উড্‌স পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। গবেষণা কার্যে সহায়তা করার জন্ত একজন উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞ নির্বাচন করিয়া তাঁহাকে হারভার্ড প্রেরণ করার অনুরোধ পাইয়া ডেকান কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপাদকৃষ্ণকে এই কার্যের উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত করেন। এই কার্যভার পাইয়া শ্রীপাদ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) গমন করেন। অধ্যাপক উড্‌স শ্রীপাদের সহায়তা লাভ করিয়া অচিরকালের মধ্যেই তাঁহার গবেষণা সূহৃৎভাবে সম্পন্ন করতে পারিয়াছিলেন। শ্রীপাদের বিজ্ঞান ও অধ্যবসায়ে প্রীত হইয়া অধ্যাপক উড্‌স হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীপাদের উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ করিয়া দেন। এই সময়ে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক চার্লস রকওয়েল লানম্যান (১৮৫০-১৯৪১)। অধ্যাপক লানম্যান সুপ্রসিদ্ধ হারভার্ড ওরিয়েন্টেল সিরিজ গ্রন্থমালার প্রবর্তক, ইহার নিপুণ সম্পাদনায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪১খানি সংস্কৃত গ্রন্থ সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক লানম্যানের অধীনে ভবভূতি রচিত উত্তর রামচরিত নাটক সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদকৃষ্ণ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের “পি-এইচ-ডি” উপাধি লাভ করেন। শ্রীপাদকৃষ্ণের এই গবেষণাটি এতই উপাদেয় হইয়াছিল যে অধ্যাপক লানম্যান উহা সুবিখ্যাত হারভার্ড গ্রন্থমালার উপযুক্ত মনে করিয়া উহা এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করেন। (২)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীপাদকৃষ্ণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জলপথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কালে তিনি উত্তররাম চরিতের মারাতী অনুবাদও সম্পন্ন করেন। ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

শ্রীপাদকৃষ্ণ মহারাষ্ট্রের দুই সুসন্তান লোকমাণ্য বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের (১৮৩৭-১৯২৫) বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর এই দুই মনীষীর চেষ্টায় শ্রীপাদকৃষ্ণ পুণার ডেকান কলেজে সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপক (প্রোফেসর) নিযুক্ত হন। অষ্টাদশ বর্ষেরও অধিককাল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই কলেজের বিলুপ্তি পর্যন্ত শ্রীপাদকৃষ্ণ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারত বিজ্ঞানস্বর আচার্য রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের অনীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামে পুণানগরীতে ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামে ভারত বিজ্ঞানচর্চার জন্ত যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় শ্রীপাদকৃষ্ণ তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের স্থচনা কাল ১৯১৫ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ইহার প্রধান সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করেন। ১৯২৭ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় তিনি এই পদের দায়িত্ব

বহন করেন। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই প্রধানতঃ শ্রীপাদের অনলস নিঃস্বার্থ সেবায় ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য বিজ্ঞা গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর আয়ু্কালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বৃহত্তম কার্য হইতেছে ভারতবাসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় মানসিক সম্পদ মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণের ১২ খণ্ডে (২৪টি ভাগে) সম্পূর্ণ প্রকাশ। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মরিস্ উইন্টারনিস্ (১৮৬৩-১৯৩৭) তাঁহার জীবনের প্রথম দিকে অক্সফোর্ডে বাস করিতেন। তত্রস্থ বোডলেয়ন লাইব্রেরী এবং লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথিগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুতের সময়ে তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মহাভারতের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সংস্পর্শে আসেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে বিস্তর পাঠভেদ ও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে মহাভারতের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুতের জগু তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে নানা পাঠভেদসম্বল মহাভারতের প্রকৃত রূপটি আবিষ্কার করা হইলেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও সভ্যতা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আহরণ সম্ভব হইবে, ইহার জগু প্রক্ষিপ্ত অংশসমূহ বর্জনের একান্ত প্রয়োজন। এককভাবে এই কাজ সম্ভব নহে বলিয়া তিনি এ বিষয়ে ইউরোপীয় ভারত-বিদসমাজকে বক্তৃতাও প্রবন্ধাদির মাধ্যমে অবহিত করিতে থাকেন। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর ইউরোপের 'ইন্টারন্যাশনেল এসোসিয়েশন্ অফ্ একাডেমিস্' উইন্টারনিস্‌র এই প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ইউরোপের প্রসিদ্ধ ভারত-বিজ্ঞা-চর্চা কেন্দ্রগুলি হইতে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া উইন্টারনিস্ জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ লুডর্স (H. Luders, 1869-19২৪) ও জ্যাকোবির (H. Jacobi, 1850-1937) সহায়তায় এই উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম প্রস্তুত করেন। এই কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হিসাবে জার্মানীর গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুডর্স মহাভারতের মাত্র ৬৭টি শ্লোকসহ একটি আদর্শ প্রস্তুত করেন। অর্থ সংগ্রহের কার্য চলিতে থাকাকালেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয় এবং সময়ানলের অগ্নিতে মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের প্রচেষ্টা ভস্মীভূত হয়।

ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কিছুকালের মধ্যেই (১৯১৯ খৃঃ অঃ) এই প্রতিষ্ঠান দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট যে কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন করেন শ্রীপাদ বেলভেলকর তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। মহাভারত প্রকাশের সূচনাকালে সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক উইন্টারনিস্ বিশ্বভারতীর ভিসিটিং প্রফেসররূপে ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং পুণায় আসিয়া এই কার্যে সহায়তা করেন। বহু বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ১৯২৮ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাভারতের আদি-পর্ব পর্যায়ক্রমে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডঃ বিষ্ণু সীতারাম স্মৃৎটঙ্কর মহাভারতের সম্পাদন কার্যের সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং আদি ও বন পর্বটি সম্পাদন করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ডঃ স্মৃৎটঙ্করের অকাল মৃত্যুর পর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণক স্মৃৎটঙ্করের স্থানে মহাভারতের অবশিষ্ট পর্বগুলির জগু সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করিতে হয়। স্মৃৎটঙ্করের জীবদ্দশায় শ্রীপাদকৃষ্ণ মহাভারতের ভীষ্মপর্ব সম্পাদন করেন। সাধারণ

সম্পাদক রূপে অত্র সম্পাদকগণ সম্পাদিত খণ্ডগুলির পরিশোধন পরিমার্জন ও অহুমোদন কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ভীষণপর্ব ব্যতীত শান্তি, আশ্রমবাসিক, মৌবল, মহাপ্রাস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই কয়টি পর্বও ত্রীপাদ স্বয়ং সম্পাদন করেন। (৩)

মহাভারত প্রকাশস্বরূপ বিরাট যজ্ঞ বর্তমানে যে সুসম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার জন্ম সর্বাধিক কৃতিত্বের দুইজন অধিকারীর মধ্যে একজন ত্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকর। অপরজনের নাম বিষ্ণু সীতারাম স্মথটকর। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রীপাদকৃষ্ণ পুণা ডেকান কলেজের সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপকের কার্য করেন। এই সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি প্রায় দশ বৎসর কাল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা বিভাগ প্রবর্তিত হইলে ত্রীপাদকৃষ্ণ সর্বপ্রথম এই বিভাগের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন (১৯৪৮-৫১)। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ত্রীপাদকৃষ্ণ দণ্ডীকৃত কাব্যদর্শের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ স্বকৃত ইংরাজী অল্লেখ্য সহ প্রকাশ করেন। (৪) এই সংস্করণটির গ্রন্থ এই গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ত্রীপাদকৃষ্ণ একটি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি অধ্যাপক রামচন্দ্র দত্তাশ্রয় রাণাড়ে সম্পাদিত The Creative Period গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। (৫) এই গ্রন্থে ত্রীপাদকৃষ্ণ ভারতের দার্শনিক চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস সবিশেষ নৈপুণ্যের সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ত্রীপাদকৃষ্ণ শ্রীগোপাল বহুমল্লিক স্মারক বক্তৃতামালায় বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে যে বেদান্ত দর্শনের মূল নিহিত আছে ইহা ব্যাখ্যাস্তে এই বক্তৃতামালায় তিনি দর্শনের এই শাখার ক্রম পরিণতি ব্যাখ্যা করেন। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'শ্রীগোপাল বহুমল্লিক ফেলোশিপ লেকচারস'-এর জন্ম আহ্বান করেন। ইহাদের প্রদত্ত ভাষণগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া দর্শনের জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূষ্টির সহায়ক হয়। ত্রীপাদকৃষ্ণ প্রদত্ত শ্রীগোপাল বহুমল্লিক লেকচারস্ এই ভাষণ মালাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। (৬)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বেলভেলকর বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্র এই গ্রন্থের শঙ্করভাষ্যের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ ইংরাজী অল্লেখ্য ও টিকা সহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল। (৭)

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা বেলভেলকরের অতিপ্রিয় অধীতব্য বিষয় ছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি গীতার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। (৮) কিছুদিন পর তিনি বিস্তৃত ভূমিকা সহ গীতার একটি ইংরাজী অল্লেখ্য প্রকাশ করেন। (৯) প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক 'ধ্বন্যালোক' রচয়িতা আনন্দবর্ধন খৃষ্টিয় ৯ম শতাব্দীতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় নামে গীতার একটি টিকা রচনা করেন। শারদা লিপিতে লিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ত্রীপাদ বেলভেলকর এই অপ্রকাশিত পুস্তকটির একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। (১০) ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ত্রীপাদ গীতা বিষয়ে ২৫টি ভাষণ দেন। এই ভাষণগুলিও পুস্তকাকারে গীতার একটি সংস্করণ সহ

প্রকাশিত হয়। (১১) শ্রীপাদ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১২)। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বেলভেলকর চারিটি অপ্রকাশিত উপনিষদ সম্পাদন করিয়া অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন (১৩)।

বর্তমানে অল্ ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টেল কনফারেন্স নামে পরিচিত ভারতীয় প্রাচ্যবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের যে সম্মেলন দুই বৎসর পর পর অনুষ্ঠিত হয় তাহার পূর্ব নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ওরিয়েন্টেল কনফারেন্স। এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক ছিলেন শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকর। প্রাচ্য বিজ্ঞানশীলনের উৎকর্ষ সাধনের অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠানের অরূপ দান আছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে বেলভেলকর বৈদিক শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের বৈদিক ও অবন্তা শাখার জ্ঞাত্ত তিনি সভাপতির পদে বৃত্ত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পাটনা অধিবেশনে শ্রীপাদ বেলভেলকর সম্মেলনের সাধারণ বা মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনগুলিতে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণাবলী বিশেষ ভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়। বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ, লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য (classical Sanskrit Literature), ভাগবদগীতা ও মহাভারত সম্বন্ধে বেলভেলকরের গবেষণা ও মতামত পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদকৃষ্ণকে লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক তাঁহাদের সম্মানিত সদস্য বা 'ফেলো' শ্রেণীভুক্ত করেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকরের পঞ্চ সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার অনুরাগী সতীর্থ ও কৃতীছাত্রগণ তাঁহার নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি ভারতীয় ও বৈদেশিক প্রাচ্যবিদগণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত ভারতবিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ তথ্যপূর্ণ অনেকগুলি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (Dr. S. K. Belvelkar felicitation volume—Varanasi, 1957) বিশ্ববিশ্রুত সুধী ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মহাভারতের শেষ খণ্ডটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ সূচিত হয়। ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষ্যে ডঃ শ্রীপাদ বেলভেলকরকে বিশেষ ভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। ডঃ বেলভেলকর এই সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গের জ্ঞাত্ত ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতিনিয়ত এই প্রতিষ্ঠানের সেবার সুবিধার জ্ঞাত্ত বেলভেলকর পুণাতেই আপনার বাসভবন নির্মাণ করাইয়া সেখানেই বাস করিতেন। বেলভেলকর অতিশয় বিনয়ী প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি বহু ছাত্রকে উচ্চতর গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেন। বেলভেলকরের ছাত্র ও বন্ধুবৎসলতা অতিশয় লক্ষ্যণীয় ছিল।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী পুণায় ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীপাদ বেলভেলকরের দেহান্ত হয়।

(১) An account of the different existing systems of Sanskrit Grammar, Poona, 1915.

(২) Rama's Later History or the Uttara Rama charita, Harvard Oriental Series, Vol. 21, 1915

(৩) মহাভারতম্—ভীষ্ম পর্বন, ১৯৪৭ (vol. 7) ; শান্তিপর্বন, ১৯৪৯-৫৪, vols-13-16 ; আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব, ১৯৫৯—পূর্ণা ।

(৪) কাব্যাদর্শ—দণ্ডী রচিত মূল, ইংরাজী অনুবাদ ও টিকা পূর্ণা ১৯১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৪ ।

(৫) The Creative Period—Ed by Prof R. D. Ranade and Dr. S. K. Belvelkar, History of Indian Philosophy (Vol II of the Series Poona, 1927

(৬) Srigopal Basu Mallik Lectures in Vedanta Philosophy, Calcutta, 1929.

(৭) Brahmasutra with Sankar Bhasya, Ed with Eng. Trans and notes Poona 1923 ; 3rd Edn.—1938

(৮) শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, পূর্ণা, ১৯৪০

(৯) Srimad Bhagabad Gita—Eng, Trans with introduction, Poona, 1945.

(১০) জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়—পূর্ণা, ১৯৪১

(১১) Bhagavada Gita—A Critical Edition and Comparative Study, Poona, 1945.

(১২) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ১৯৬৫

(১৩) Four unpublished minor upanisads—Text with Eng. Trans A. I. O C, Madras 1927.

মালিনী ও রবীন্দ্রনাট্যে গ্রীক প্রভাব প্রসঙ্গ

পুলিন দাশ

একদা কবির মনের মধ্যে যখন ‘মানুষের স্পর্শ’ লেগে ‘বাইরের জানালা খুলে গেল’ সেদিন তাঁর ‘গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উকিরুঁকি’ দেখা দিচ্ছিল। ‘মানুষে মানুষে সশব্দের জালবুনোনিটাই’ তখন বিশেষ ক’রে তাঁর ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। আর এই ঔৎসুক্যের প্রবাহে দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার ধারা।

সেই আদি যুগের রচনা ‘ভগ্নহৃদয়’কে (১৮৮১) অবশ্য নাটক বলে মনে করতে রবীন্দ্রনাথই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী রচনা ‘রুদ্রচণ্ড’ (১৮৮১) তাঁরই কাছে ‘নাটিকা’ আখ্যা পেয়েছিল। অতঃপর ‘বাল্মীকি প্রতিভায়’ (১৮৮১) “একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল”। আর ‘মায়ার খেলা’য় (১৮৮৮) “গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে”। এরই মধ্যে রচিত হয়েছে ‘প্রকৃতির-প্রতিশোধ’ (১৮৮৪)—গানে গাঁথা না হয়ে নাটকরূপে। এরপর ‘একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল আর একটি নাটক রাজা ও রাণী’! ‘লিরিকের প্রাবনে’ কাব্যের জলাভূমি হয়ে ওঠায় ‘রাজা ও রাণী’র (১৮৮৯) নাটক দুর্বল হয়ে পড়েছে; অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) রচনাকালে রাজা ও রাণীর এই ক্রটির কথা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হতে পারেন নি। ‘রাজা ও রাণী’র এই বিচ্যুতিমুক্ত ‘বিসর্জনে’ তাই দেখা গেল নাটককে প্রবল করে তোলার সার্থক প্রয়াস।

‘বিচিত্রের দূত’ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্ন্যস্তর রচনার মত নাটকচর্চাতেও অশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে গেছেন। নাটকে এই বৈচিত্র্য এসেছে দুই পথে—বিষয়ভাবনায় ও আঙ্গিকগঠনে। অনেক সময় মনে হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে একই বিষয় বৃষি বার বার বার ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে। স্বভাবের বিকার ক্ষীত হয়ে উঠে জীবনের রথকে অচল ক’রে তোলে, আবার জীবনমূল্যের বিনিময়ে পথের বাধাকে অপসারিত করে জীবনের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হয়—এই রকম একটা বাণীর নাট্যরূপ যেন তাঁর প্রায় প্রতি নাটকেই দেখা যায়। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই দেখা যাবে বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুটি অপরিবর্তিত যদিও বা থাকে প্রকাশে এবং, বিচারে যে স্বতন্ত্র রূপ পায় তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাটকে। ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে প্রেম ও প্রতাপের যে দ্বন্দ্বরূপ বিক্রম-সুমিত্রার সশব্দের ভিতর দিয়ে উদ্ভিন্ন ‘রক্তকরবী’র রাজার মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও শেষোক্ত নাটকের পটভূমি পৃথক, বিরোধের দিগন্ত প্রসারিত-প্রত্যক্ষ রূপের পরিবর্তে নিগূঢ় ব্যঙ্গনায় তা সংকেতিত। ওই সত্যই আবার ‘বিসর্জন’ নাটকে ভিন্ন রূপাধারে পরিবেশিত। সত্যবোধের সঙ্গে অন্ধবিশ্বাসের বিরোধ এখানে রঘুপতি-গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংহের মধ্যস্থতায় একান্ত বস্তুনিষ্ঠতায় নাট্যায়িত। পরবর্তী সময়ে রচিত নাটকগুলিতে অনুরূপ ভাবনা যেখানে ভাবময়তায় উপস্থাপিত ‘বিসর্জনের’ বৈশিষ্ট্য এই বস্তুময়তায়।

অতীত নাটকের আঙ্গিকচর্চায় রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার তাঁর নাটকের আঙ্গিকবিধির রূপান্তর ঘটিয়েছেন। বিষয়ের বেশবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের আঙ্গিককলারও সমুচিত পরিবর্তন ঘটেছে।

‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’, ‘রাজা ও রাণীর’ ভিতর দিয়ে এসে তাঁর আদিপর্বের নাট্যাঙ্গিকচর্চায় চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে ‘বিসর্জনে’। ‘বিসর্জন’ রচনাসময় পর্বন্ত আঙ্গিকবিধিতে তিনি সেক্সপীয়রের প্রতি আস্থাশীল। সেক্সপীয়রের নাটকের ‘বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত’ তাঁর মনকে তখনো অধিকার করে রেখেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমে যান নি। ‘শারদোৎসব’ (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) প্রভৃতি রচনার ভিতর দিয়ে আঙ্গিকবিধিতে তিনি নতুন পথে যাত্রা শুরু করেন। এই নবযাত্রার পর্বে রচিত ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে সেক্সপীয়রীয় কাঠামোর আভাস থাকলেও কবির ভাবজগতের রূপান্তরের হাত ধরে রূপায়ণকলাও পরিবর্তিত হয়েছে। নাট্যাঙ্গিকে এই পরিবর্তনের চিহ্ন আরও স্পষ্ট হ’য়ে উঠতে থাকে পরবর্তীকালে রচিত নাট্যধারায়। ‘রাজা’ (১৯১০), ‘ভাকঘর’ (১৯১২), ‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৪) প্রভৃতি নাটকের ভিতর দিয়ে ‘মুক্তধারা’ (১৯২৫), ‘রক্তকরবী’তে (১৯২৬) তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। সেক্সপীয়র তো ননই; হাউসটম্যান, মেটারলিঙ্ক-এর সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্যের উপরে এই পর্বের নাট্যাঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

সেক্সপীয়রীয় রীতি বর্জন ও স্বকীয় রীতি অর্জন এ দুয়ের মধ্যবর্তী রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়াসের আর একটি বিশিষ্ট স্তর বর্তমান। ‘মালিনী’ (১৮৯৬) নাটকখানি এই পর্বের অগ্রতম সার্থক ফল। এই পর্বের লেখা নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ওই রচনাগুলির মাধ্যমে তিনি আঙ্গিকগত বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলেছেন। ‘বিদায়-অভিশাপ’ (১৮৯৪), ‘কাহিনী’র (১৯০০) অন্তর্গত নাট্যকবিতায়; ‘হাস্তকৌতুক’ (১৯০৭)-এর সংক্ষিপ্ততম নাট্যরচনায়; গোড়ায় গলদ’ (১৮৯২)-এর তুলনায় ‘বৈকুণ্ঠের খাতার (১৮৯৭) সংক্ষিপ্ত ও সংহতরূপে এই প্রচেষ্টার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এইসব পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় নাট্যাঙ্গিকের অন্বেষণ করে চলেছিলেন। একদিক থেকে এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক আবিষ্কার-প্রয়াসের যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

নাট্যাঙ্গিকবিধির কোন রূপ বিশেষ বা তার বিবর্তন এই পর্বের একাধিক কোন নাটকে প্রযুক্ত হয়নি বটে; তবে এই অন্বেষণ-প্রয়াস-পর্বের নাট্যরচনাগুলির একটি সামগ্রিক লক্ষণ হল রূপনির্গতিতে সংযম ও সংহতি। ‘মালিনী’তে এই লক্ষণ সর্বাধিক পরিষ্কৃত বলে ‘মালিনী’ এই পর্বের প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। আবার এই পর্বটি পূর্ব ও উত্তর পর্বের থেকে স্বতন্ত্র বলে নাট্যাঙ্গিকের দিক থেকে ‘মালিনী’ রবীন্দ্রনাট্যধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিষয়ভাবনায় পূর্বযুগের ‘বিসর্জন’-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরযুগের ‘অচলায়তন’-এর সঙ্গে পরোক্ষ সাদৃশ্য সত্ত্বেও নাট্যরূপে ‘মালিনী’ উভয় রচনা থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের কথা স্মরণে রেখেই ‘মালিনী’র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “বোধ করি এই নাটকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল।”

আলোচ্য পর্বের রচনাগুলি সম্পর্কে একথাও স্মরণীয় যে অন্বেষণের ঈপ্সিত পরিণাম যদিও তখনো সম্পূর্ণভাবে অনায়াস তবু এ যুগের রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার ছাপ এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছেন। রচনাগুলিতে দেশি বা বিদেশি কোনো একটি বা একাধিক নাট্যরূপের সূক্ষ্ম লক্ষণের অস্তিত্ব সত্ত্বেও স্বীকার্য যে এগুলি স্বাতন্ত্র্যবর্জিত প্রতিক্রিয়ায়ণ মাত্র নয়।

‘মালিনী’ যে পর্বের রচনা সেই পর্বে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়াসের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সেক্সপীয়রীয় নাট্যাঙ্গিকবিধির স্পর্শ থেকে দূরচারিতা। এই দূরগামিতার লক্ষণ ‘মালিনী’তেও বর্তমান। সেক্সপীয়রীয় রীতির বাইরে বিশ্বনাটকের পরিণতরূপের দুটি আদর্শক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে সংস্কৃত নাট্যবিধি আর গ্রীক নাট্যকলা। আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব নাট্যবিধির আদর্শ সন্ধানরত। কিন্তু সিদ্ধি যেহেতু তখনও অনর্জিত কাজেই ‘মালিনী’কে দেহধারণের জন্তু আপন প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠিত কোনো একটি নাট্যবিধিকে আশ্রয় করতে হয়েছে। সংস্কৃত নয়, সেক্সপীয়র না—‘মালিনী’ অনেকাংশে গ্রীক নাট্যকলার অনুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ অধিকারী ট্রেভেলিয়ানের দৃষ্টিতে ‘মালিনী’র নাট্যরূপের এই বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়েছিল। ‘মালিনী’র ভূমিকায় একথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“তারপরে একদিন ট্রেভেলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিক্রম দেখেছেন।”

গ্রীক নাট্যকলার সঙ্গে ‘মালিনী’র নাট্যরূপের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে রবীন্দ্রহৃদয় ট্রেভেলিয়ান ‘মালিনী’তে যে গ্রীক নাট্যকলার প্রতিক্রম দেখেছিলেন তার হেতু কেবল বন্ধুপ্রীতির স্তুতি-উপহার-বাসনা নয়; রসজ্ঞের বিচারের ফল।

গ্রীক ট্রাজেডির বিস্তার কয়েক শতাব্দিকাল জুড়ে। স্বল্পখ্যাতদের কথা বাদ দিয়ে শুধু সেই তিনজন অসামান্য নাট্যশিল্পী—আয়সখলস্ (Aeschylus), সোফোক্লস্ (Sophocles) ও এউরিপিদেস্ (Euripides)—এর জীবন পরিধি খৃঃ পূঃ ৫২৫ থেকে খৃঃ পূঃ ৪০৬-এর মধ্যে বিস্তারিত। এই কালসীমার প্রায় সবটুকু জুড়ে এঁদের নাট্যপ্রয়াস অব্যাহত ছিল।

এয়ারিস্টটলের নাট্যসুত্রাবলী গড়ে উঠেছিল প্রধানত এ যুগের গ্রীক নাটকগুলির উপর ভিত্তি করে। প্লট, চরিত্র, সংলাপ ও দৃশ্যপট—এই চতুরঙ্গকে নাট্যদেহের ভিত্তিরূপে স্বীকার করে নিয়ে এয়ারিস্টটলের আলোচনা এগিয়ে গেছে। ‘মালিনী’তে গ্রীকপ্রভাব প্রসঙ্গের আলোচনায় গ্রীক নাটকের এই চতুর্বিধ অঙ্গের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ‘মালিনী’র অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে দেখাই সমীচীন।

প্লটের ভিত্তি কাহিনী। গ্রীক নাটকের প্রায় সমস্ত কাহিনীই গ্রীক পুরাণ থেকে আহৃত। পুনরুজ্জী ও একঘেষেমির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্তু গ্রীক নাট্যকাররা পুরাণ কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য আনতেন কল্পনার আশ্রয়ে পুরাণকাহিনীর কমবেশি পরিবর্তন ঘটিয়ে। মালিনীর নাট্যকাহিনীও গড়ে উঠেছে বোদ্ধ অবদান-এর অন্তর্গত কাহিনীর সঙ্গে স্বপ্নস্মৃতি ও কল্পনার মিশ্রণের ফলে। আদি মধ্য অন্ত্যাবিশিষ্ট একটি স্বনির্দিষ্ট কাহিনীকে কার্যকারণপরম্পরায় অস্থিত হয়ে অব্যাহত গতিতে পরিণামমুখী হয়ে উঠতে দেখা যায় গ্রীক নাটকে। কাহিনীর উপস্থাপনায় অনাবশ্যক বর্ণনাবিস্তার বর্জন করে একেবারে মূল ঘটনার প্রাণকেন্দ্র থেকে নাটকের স্রষ্টা করে দেয়ার রীতিও গ্রীক নাটকের বৈশিষ্ট্য। গ্রীক নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর জালবুজুনি নেই, নেই প্রয়োজনাতিরিক্ত চরিত্রের অহেতুক ভিড়। ঘটনা জাল ফেলতে ফেলতে এগোয় না, ছিপের নোঁকোর মতো জল কেটে লক্ষ্যবিন্দুর দিকে ছুঁবার গতিতে ছুটে চলে। আর এইভাবে সংযত কাহিনীর সংহত প্রকাশে গ্রীক নাটক একটি কঠিন স্বন্দর নিটোলতায় মণ্ডিত হয়ে প্রতিভাত হয়। মালিনীর জীবনের ধর্মের আবির্ভাব

থেকে আরম্ভ করে স্ত্রিয়-র মৃত্যু পর্যন্ত ‘মালিনী’ নাটকের ঘটনা বিস্তারিত গ্রীক নাটকের অনুরূপ লক্ষণ স্পষ্টই চোখে পড়ে।

প্লটের গঠনে গ্রীক নাট্যকারদের বিশেষ প্রবণতাকে স্পষ্ট করে তুলে Haigh লিখেছেন—

“In all the more typical tragedies of the Greeks the tendency is to concentrate the attention, not only on one subject but on a single portion of the subject. A large part of the story is taken for granted, the preliminaries are briefly indicated by allusion or narration, only the supreme crisis is selected for actual representation.” (—Tragic Drama of the Greeks)।

প্লট নির্মাণে গ্রীক নাট্যকারদের অল্পসংখ্যক এই রীতির পরিবর্তন ঘটে রোমান্টিক নাটকে। কার্যকারণশৃঙ্খলা বজায় রেখেও রোমান্টিক নাটক বর্ণাঢ্য-বাসনে আড়ম্বরবহুল প্লটের মস্তুর বিস্তারিত আঁকা। ‘ওথেলো’ নাটকে প্রথম অঙ্ক ভরে ভেনিসে প্রচলিত গোপন বিবাহ প্রথার বর্ণনা চলে। ওথেলোর জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটে এর পর থেকে। এই কাহিনীটিই গ্রীক নাট্যকারের হাতে পড়লে প্রথম অঙ্কে বর্ণিত অংশটুকু হয়তো বর্জিত হত এবং নাটক শুরু হত ওথেলোর জীবনে বিপর্যয়ের ক্ষণ থেকে। আর প্রথম অঙ্কের প্রাসঙ্গিক সংবাদটুকু পরিবেশিত হত কোরাসের জবানীতে না কোন চরিত্রের কোন উক্তি মাধ্যমে। রোমান্টিক নাটকের এই আড়ম্বরবহুলতা ‘বিসর্জন’-এর বিশেষত্ব। উপকাহিনীর সংযোজনে, পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশে, পথচারী নাগরিকদের আনাগোনার ‘বিসর্জনে’ যে বিস্তৃতি এসেছে তার ফলে ‘বিসর্জন’ রোমান্টিক নাটকেরই প্রতিবেশী সন্দেহ নেই। অন্তর্দিকে ‘মালিনী’র কাহিনীবিস্তার যা অনিবার্য নয় তাই বিবর্জিত। স্ত্রিয়-মালিনী-ক্ষেমস্করের জীবননাট্যের শীর্ষবিন্দুটি (the supreme crisis) নির্বাচন করে নিয়ে নাট্যরূপে তাকেই প্রকাশ করা হয়েছে ‘মালিনী’তে। ‘মালিনী’র অবস্থান এ দিক থেকে গ্রীক নাটকেরই এলাকায়।

নাটকে ঐক্যবিশিষ্ট প্রতি গ্রীক নাট্যকারদের যে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা যায় তার মূলে আছে গ্রীক নাটকের এই দৃঢ়পিনাকরূপ। রূপের নিরঙ্কুশতা আর সেইসঙ্গে ভাবের একাগ্রতা বজায় রাখবার জ্ঞান, স্থান, কাল ও ভাবগত ঐক্যের প্রতি মনোযোগ এঁদের তীক্ষ্ণ-সচেতন। মানবচিত্রের করুণাময় সত্যস্বভাব দুঃখদহনের ভিতর দিয়ে মহিমাভাস্বর হয়ে ওঠে,—এই ভাবনাটুকু অনাড়ম্বর স্বজীবিত্যে ‘মালিনী’ নাটকে অথগুরুপে অভিব্যক্ত। নাটকে ভাবের অথগুণতা ও একাগ্রতা বজায় রেখে চলার যে রীতি গ্রীক নাট্যকারদের দ্বারা অল্পসংখ্যক ‘মালিনী’ও সেই বিধির ব্যতিক্রম নয়। নাটকের এই সংহতি ব্যাহত হ’তে পারে এই আশঙ্কায় গ্রীক নাট্যকাররা নাটককে এমনকি অঙ্কে দৃষ্টে বিভাজিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেছেন। গ্রীক নাটকে অঙ্ক বা দৃষ্টবিভাগ নেই। হোরেস্-এর সময় থেকেই নাটকে অঙ্কবিভাগের রীতির উদ্ভব। সেনেকার নাটকের মধ্য দিয়ে একাল অবধি এই রীতির অনুসরণ চলে আসছে। ‘মালিনী’ও অঙ্কে বিভক্ত নয়; চারটি মাত্র দৃষ্টে নাট্যঘটনা উপস্থাপিত। চারটি দৃষ্টেরই ঘটনাস্থল রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দির অভ্যন্তরভাগ। অধিকাংশ গ্রীক নাটকেও যেমন আগামেমনন্ (Agamemnon), রাজা ঈডিপাস্ (King Oedipus), মিডিয়া (Midia), অলসেস্টিস্ (Aeestis) প্রভৃতিতে ঘটনাস্থল রূপে নির্দিষ্ট রাজপ্রাসাদ ও তার সম্মুখবর্তী অঞ্চল।

‘Visually the Greek setting did as a rule represent only one place throughout the action. Very often it was the outside of a palace or a house……’ —(Aristotle’s Poetics : Humphry House)। ভাবগ্রন্থের মত স্থান-গ্রন্থের বিধিও গ্রীকনাটকের প্রায় সমতুল্যভাবেই ‘মালিনী’তে রক্ষিত হয়েছে। অবশিষ্ট কাল-গ্রন্থবিধি অবশ্য গ্রীকনাটকে কখনো খুব দৃঢ়ভাবে অনুসৃত হয় নি। Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts গ্রন্থে S. H. Butcher এ সম্পর্কে জানিয়েছেন—‘……the time limit was ignored in the tragic no less than in the epic action. No strict rule is here laid down……Even in the developed Attic drama several exceptions to the practice are to be found.’ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুচার লিখেছেন—‘In the Eumenides months or year elapse between the opening of the play and the next scene.’ এ্যারিস্টটল উক্ত—‘Tragedy endeavours to keep as for as possible within a single circuit of the sun.’—এই স্বত্রটুর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালের জ্ঞান ক্লাসিকবাদী কবীরা লেখকরা অবশ্য কাল-গ্রন্থকে চব্বিশ-ঘণ্টা সময় সীমার মধ্যে বেঁধে দিয়ে একে নাটকে একটি অবশ্য পালনীয় শর্তরূপে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ‘মালিনী’ এ দিক থেকে গ্রীকনাটকের সমীপবর্তী। কারণ ‘মালিনী’র দ্বিতীয় দৃশ্য ক্ষেমঙ্করের সৈন্ত সংগ্রহার্থে প্রবাস-যাত্রা এবং চতুর্থদৃশ্যে বন্দীক্ষেমঙ্করের পুনরারিভাবের মধ্যে যে কালগত ব্যবধান তাকে কোনোক্রমেই স্বর্ষের একক অয়ণকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ইউরিপিডেস-এর সাপ্লিয়ান্টস্ (Suppliants) নাটকেও অনুরূপভাবে দেখা যায় এথেন্সে সৈন্ত সংগ্রহ, অতঃপর খিবিতে যুদ্ধযাত্রা এবং যুদ্ধজয় করে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সমালোচকদের অভিমত কমপক্ষে অন্তত দশদিন সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

অথও সৌন্দর্যের মহিমাযুক্ত রূপবৈভবের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ ছিল গ্রীকমানসের বৈশিষ্ট্য। এই মানসপ্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছে গ্রীকভাস্কর্যে। গ্রীক নাটকের চরিত্রগুলিতে আছে এই গ্রীকভাস্কর্যের প্রতিক্রিয়ায়। বড় বড় রেখায় অঙ্কিত সেই বিরাট ও বিশ্বয়কর মানবমূর্তিগুলির বীর্ঘবান বিচরণ গ্রীক নাটকে। গ্রীক নাটকের এই চরিত্রলক্ষণ সম্পর্কে Haigh লিখেছেন—‘The heroes and heroines are drawn in broad and general outline and not in minute detail; they resemble types of humanity, rather than separate personalities……’ অতঃপর সেক্সপীয়র অঙ্কিত চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন—‘They have none of the strongly marked personality of Shakespeares men and women. The qualities which they display are broad and elementary qualities, common to whole classes of mankind; the minute traits which reveal the individual are mostly omitted.’ চরিত্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্বল্পবৈচিত্র্যের পরিবর্তে তাদের নির্বিশেষ স্বভাবের বিশালব্যাপ্তিই গ্রীক নাটকের পাঠককে বিস্মিত করে দেয়। এ্যারিস্টটল গ্রীক নাটকের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নাটকীয় চরিত্রের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন—‘The persons of a drama should undoubtedly be typical specimens of humanity, if their pictures are to impress or to instruct.’

গ্রীক নাটকের গৌরবময় যুগেই কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির এই আদর্শের ব্যতিক্রম দেখা দিতে থাকে। এউরিপিদেস্-এর মিডিয়া নাটকে ব্যক্তিত্বের দ্বিধাদীর্ণ স্বরূপের ভিতর দিয়ে চরিত্রের সূক্ষ্মসৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া এউরিপিদেস্-এর নাটকে ক্রীতদাস চরিত্রে মহত্বের বিকাশ এবং পৌরাণিক চরিত্রের অবনমন দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে—“Characters of either sex should be distinguished persons of high estate”—বলে এ্যারিস্টটল যে চরিত্রসংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন তারও লঙ্ঘন এ যুগেই শুরু হ’য়ে গেছে। এউরিপিদেস্-এর নাটক এদিক থেকে যেন পরবর্তী যুগের নাটকের পথপ্রদর্শক। কারণ পরযুগের নাটকে নির্বিশেষ স্বভাব অংকনের পরিবর্তে মাহুত্বের বিশেষ ব্যক্তিরূপচিহ্নের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। কোলরিজ তাঁর *Literaria Biographia*তে চরিত্ররূপ সম্পর্কে যদিও লিখেছিলেন—“Persons of poetry must be clothed with generic attributes, with the common attributes of the class.” তবু Blake-এর সেই মন্তব্য—“To particularise is the great merits”—চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে এই দুই প্রান্তিক মতের মাঝখানেই অবশ্য চরিত্রচিত্রণের আদর্শসীমা নির্দিষ্ট হয়। ‘The most perfect of all styles of character drawing is that which while preserving the type, invests it with distinctive personal feature.’ শ্রেণীরূপের সঙ্গে ব্যক্তিরূপের সমন্বয়ের এই সূক্ষ্মসরূপ সেক্সপীয়র অঙ্কিত চরিত্রের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য।

‘মালিনী’ নাটকের চরিত্র পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ কোন পথ বেছে নিয়েছেন? ‘মালিনী’র মুখ্য চরিত্রগুলির আবাস সমাজের উচ্চশিখরে। মালিনী রাজকন্যা; স্ত্রিয় ক্ষেমঙ্কর সমাজের উচ্চকোটিতে অবস্থিত প্রতাপবান ব্যক্তি। বহিরঙ্গ পরিচয়ে এরা গ্রীকনাটকের পাত্রপাত্রীর সমগোত্রীয় সন্দেহ নেই। অন্তরঙ্গ পরিচয়েও ক্ষেমঙ্করকে অন্তত গ্রীক নাটকের চরিত্রের সমীপবর্তী মনে করাই সম্ভব। উদ্ধত-বীর্য দুর্নিবার-স্বভাব এবং আপন প্রত্যয়ে দৃঢ়নিষ্ঠ ক্ষেমঙ্কর। বহুমুখী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একক সংগ্রামেলিপ্ত তার বজ্রকঠোর ঋজু মূর্তির মধ্যে যে একটি তেজোদৃপ্ত স্রবিশাল মহিমা রয়েছে তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। স্ব-বিশ্বাসে অচপল নিষ্ঠায় ক্ষেমঙ্কর নিজের জীবনের প্রতি যেমন নির্ভীকভাবে নিস্পৃহ বদ্ধহত্যাতেও ঠিক সেই পরিমাণে নিষ্কণ্টভাবে নির্মম। রবীন্দ্রসাহিত্যের তো বটেই, সমগ্র বাংলাসাহিত্যেও ক্ষেমঙ্কর চরিত্র তুলনারহিত। অংশত সূদৃশ রঘুপতির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ক্ষেমঙ্কর চরিত্রের অকপট মহত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হত্যাকারী হয়েও ক্ষেমঙ্কর চরিত্রের যে দৃপ্ত মহিমা বিস্ময় বিচিত্র শ্রদ্ধার উদ্রেক করে রঘুপতি চরিত্রে সেই গৌরব সম্মুখতির একান্ত অভাব!

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রেখায় মাত্র ক্ষেমঙ্করের এই স্মরণীয় মূর্তিকে একে তুলেছেন—রাজদ্রোহী শৃঙ্খলিত ক্ষেমঙ্করকে দেখে বিস্ময়চকিত রাজার প্রায় স্বগতোক্তি—

‘নেত্রাশ্রিত, উর্ধ্বশির, জ্রুকুটির’পরে

ঘনায় রয়েছে ঝড়, হিমাদ্রি শিখরে

স্তম্ভিত শ্রাবণসম।’

আবার প্রতিদ্বন্দী ক্ষেমঙ্করকে দেখে মালিনীর মনে হয়—

‘লোহার শৃঙ্খল

ধিকার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল

ওই অঙ্গপরে। মহত্বের অপমান

মরে অপমানে। ধন্যমানি এ পরাণ

ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।’

মালিনীর এই বিশ্বয় বিমূঢ়তা অনতিবিলম্বেই ভীতিশিহরিত হয়ে ওঠে। তার ‘হৃদয় কাঁপিছে বুকে’ কারণ মালিনীর মনে হচ্ছে—

‘কী যেন পরমা শক্তি আছে ওই মুখে

‘বজ্রসম ভয়ঙ্কর।’

‘ইন্দ্রতুল্য আদিম মহিমায় ভাস্বর ‘ভয়ঙ্কর’ ক্ষেমঙ্কর চারিত্রিক বিস্তারে গ্রীক নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয়।

মালিনী চরিত্র এই নাটকের অত্যন্ত আশ্রয়। কারণ প্রধানত মালিনীর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ নাটকে প্রকাশিত তাঁর মনোভাবকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। নাটকের প্রথম অংশে মালিনীকে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত দেখা গিয়েছিল। নাটকের যে দ্বন্দ্ব তার সূচনা হয় মালিনীর এই কর্মময় উদ্দীপনার মাধ্যমে। এই অংশে মালিনীর সাদৃশ্য সেক্সপীয়রীয় নারীচরিত্রের অন্তত একটি লক্ষণের সঙ্গে। ‘In Shakespeare it is always woman who takes the initiative’—সেক্সপীয়র অঙ্কিত নারীচরিত্রের তৎপরতা প্রসঙ্গে বার্নার্ড শ’ এর এই উক্তির সঙ্গে মালিনীর মিল রয়েছে। তবে নাটকীয় দ্বন্দ্বোৎসারণে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ নারীচরিত্রের অসম্ভাবও নেই গ্রীক নাটকে। ক্লাইটেমনেস্ট্রা (Clytemnestra), ক্যাসান্দ্রা (Cassandra), আটোসা (Atossa), অ্যান্টিগোন (Antigone), মিডিয়া (Media) এমনি অনেক নারীচরিত্র রয়েছে গ্রীক নাটকে যারা নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। নাটকের অগ্রগতির ধারায় পরপর্যায়ে এসে কিন্তু মালিনীর এই উদ্দীপনা অনেকটা অবসর। আপন কক্ষচ্যুত মালিনী তখন স্থপ্রিয়-বিন্দুতে এসে স্থিতিলাভে উদগ্রীব। অতঃপর নাটকের অন্তিম মুহূর্তে এসে প্রিয়হস্তী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমাদানের মধ্যে যে দুঃখ মহিমার প্রকাশ তা মালিনীর মানবধর্মবোধেরই বাস্তবরূপ। সেক্সপীয়রের নাটকের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বোৎক্ষিপ্ত বেদনা-মহিমার সঙ্গে এ তুলনীয় নয়। এই মালিনী রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি।

স্থপ্রিয়র মৃত্যুতে নাটকের বিষয়-উপসংহার। বন্ধুর গোপন কথাকে প্রকাশ করে দিয়ে স্থপ্রিয়-র মনে হয়েছে এর ফলে

‘বন্ধু চিরন্তন

তোমাতে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন।’

নিমজ্জন আশঙ্কায় যে বন্ধুর প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছে স্থপ্রিয় তারই হাতে তার নির্মম মৃত্যুর ঘটনায় ট্রাজিক ভ্রান্তির (Tragic error) সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের ট্রাজিক পরিণতির পূর্বরঙ্গ নাটকের ভিতরকার এই ট্রাজিক ভ্রান্তি। গ্রীক নাটকে চিত্রিত এই ট্রাজিক ভ্রান্তির প্রকারভেদ করে এ্যারিস্টটল একটির নাম দিয়েছিলেন ‘Peripetria’ আর অপরটি ‘Hamartia’। F. L. Lucas তাঁর

Tragedy : Serious Drama in Relation to Aristotles' poetics গ্রন্থে লিখেছেন—“A Peripetria occurs when a course of action intruded to produce a result X, produces the reverse of X. It is the working in blindness to one's own defeat.” ‘Purposes mistook, fallen on the inventor's head’—Horatio-র এই উক্তিতে কিম্বা,—‘মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি ; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে । জান, মানুষ না জেনে এমন করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয় ।’—রক্ত করবীর অধ্যাপকের এই উক্তিতে Peripetria-র লক্ষণ সুন্দরভাবে বর্তমান । আর Luens-এর ব্যাখ্যা অনুসারে Hamartiaতে ঘটে—“Plucking for himself the fruit of his own fault, frailty the cause of Catastrophe”. সুপ্রিয়-র মৃত্যুঘটিত ট্রাজেডির মূলে সুপ্রিয়র প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈপরীত্যজনিত যে ট্রাজিক ভ্রান্তি তা Peripetria-রই লক্ষণাক্রান্ত । তবে রাজা ঈডিপাস কিম্বা ‘ডল্‌স্-হাউস’-এর নোরার Peripetria-র ফলে যে তীব্রতম ট্রাজিক অনুভূতির সঞ্চার হয় সুপ্রিয়-আশ্রিত Peripetria-র স্বাদ তা থেকে কিছুটা ভিন্নতর । রাজা ঈডিপাস কিম্বা নোরার ক্রিয়াকলাপে এমন কোনো বিচ্যুতি নেই তাদের করুণ পরিণাম যার দ্বারা সমর্থিত হতে পারে । তাদের ক্রিয়াকলাপকে বরং সবসময়ই শুভঙ্কর বলে মনে হতে থাকে । কিন্তু পরিণামে দেখা যায় ওই আপাতরমনীয়তার তলে তলে অলক্ষ্যে কখন ট্রাজেডির দেবতা তাঁর অশুভ হস্ত প্রসারিত করেছেন এবং চরমবিচ্ছেদের গভীর অন্ধকারে তাদের ঠেলে দিয়েছেন । সুপ্রিয়র জীবনপরিণাম কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত । ক্ষেমঙ্কর তাকে চরম দণ্ড দিয়েছে বিশ্বাসভঙ্গের ফল হিসাবে । সুপ্রিয়র মৃত্যু পরিণামের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গজনিত স্থলন যে আদৌ জড়িত নয় এমন কথা বলা যায় না । তবে এই বিশ্বাসভঙ্গ স্বার্থপ্রবোধিত নয় ! মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়র হৃদয়দৌর্বল্যের ফলও নয় । বরং বৃহত্তর বোধের আস্থানে সুপ্রিয় বিশ্বাসকে বলি দিয়েছে এমন ধারণার সমর্থন থাকায় সুপ্রিয় কখনো সহানুভূতিবঞ্চিত হয়নি আর তাই সুপ্রিয়র মৃত্যু পোয়েটিক-জাষ্টিস্ জনিত স্থখোৎপাদক না হয়ে গভীর বেদনাবহ হ’তে পেরেছে !

আয়ুসখুলস্-এর নাটকে দেখা যায় ট্রাজিক-ভ্রান্তিকে নীতিবোধের সঙ্গে বিজড়িত করে দেখানোর প্রয়াস । ভ্রান্তিপথে অসদ্ব্যবস্থানকারীর বিপর্যস্ত পরিণাম একে ধর্মের জয়ঘোষণা করে দেখান আয়ুসখুলস্ । অন্তরিক্ত সোফোক্লিস্-এর লক্ষ্য নিছক ধর্মের জয় ঘোষণা নয় । মানুষের স্বভাব একে তোলায় তাঁর আগ্রহ । উভয় নাট্যকারের এই ভিন্ন স্বভাবের উল্লেখ করে H. D. F. Kitts মন্তব্য করেছেন—“Aeschylus was a ‘religious’ dramatist ; Sophocles represented human life at its best and most heroic” (Forms and Meaning in Drama) । সোফোক্লিস্-এর এ্যাটিগোন-এর করুণ পরিণতির মূলে কর্তব্যবোধের প্রতি তার আত্মস্তিক নিষ্ঠা ও মনোযোগ । কর্তব্যানুষ্ঠান অপরাধ নয় । তবু আত্মস্তিকতার গুরুতর মূল্য তাকে দিতে হয়েছে । তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল এই আত্মস্তিকতা । হামলেট-এর নির্বেদও যেমন পাপ নয় ; তার স্বভাব । সুপ্রিয়র-সত্যভঙ্গ ভিন্নতর বোধের অহুরোধের ফল হলেও তার স্বভাব-সমুখিত । সুপ্রিয়র স্বভাব-মুহূর্ত সত্যনিষ্ঠায় তাকে শিথিল করে তুলেছিল । সহজেই সে বিপরীত আস্থানে সাড়া দিতে পেরেছিল । এ আস্থান যে একদিন মৃত্যুর আস্থানরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠবে তখন তা বোঝা যায়নি ।

এ দিক থেকে সভ্যভঙ্গের ঘটনায় একটা ট্রাজিক-ভ্রান্তির অস্তিত্ব রয়েছে। আর এই ভ্রান্তি Hamartia-র লক্ষণাক্রান্ত সন্দেহ নেই। সুপ্রিয়র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ট্রাজিক ভ্রান্তির উভয়রূপকে একে তুলে সুপ্রিয় চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

ধর্মবোধের সংঘাত ‘মালিনী’র বিষয় হলেও চরিত্রচিত্রণে ভালোয়-মন্দয় মেশানো মানবিক স্বভাবকে একে তোলা রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। এদিক থেকে আয়ুস্বলুস্ থেকে সোফোক্লেস্-এর নাটকের সঙ্গে ‘মালিনী’র নৈকট্য। অতঃপর সংলাপপ্রসঙ্গ। ছন্দিত সংলাপ গ্রীকনাটকের সংলাপরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সংলাপের ভাষা অলঙ্কৃত কাব্যময় হ্রস্বলা। হ্রস্ব বেশ চড়া পদায় বাঁধা, কিন্তু সুমিত। গ্রীক নাটকের রচয়িতারা ছিলেন নাট্যকার আর সেইসঙ্গে কবি। তাঁদের রচিত সংলাপ সুন্দরতম কবিতার মর্যাদার অধিষ্ঠিত। তাই বলে কবিধর্মের বশতায় নাট্যকারের নিরাসক্তিকে তাঁরা বর্জন করেছেন এবং ফলত সংলাপ বৈচিত্র্যবর্জিত একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হয়েছে একথা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। বরং জীবনের আবেগমথিত সেই চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে সমুচিতভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন তাঁরা এই উচ্চগ্রামে বাঁধা ছন্দিত ভাষাকে বাহন হিসেবে বরণ করে নিয়ে। ‘Only through the employment of the regular rhythmic pattern we call verse can a poet-playwright hope to have at his command an instrument capable of raising to the highest of his more passionate scenes.’—(World Drama : A Nicole) ভিন্ন প্রসঙ্গে উক্ত হলেও Nicole-এর এই মন্তব্যের মধ্যে গ্রীকনাট্যকারদের সংলাপ-সফলতার উৎস নিহিত। এ্যারিস্টটল সংলাপের আদর্শ-ভাষা স্থপতিতে ষড়বিধ শব্দ প্রয়োগবিধির কথা বর্ণনা করে অতঃপর ‘মেটাফর’-সমৃদ্ধ ভাষার চূড়ান্ত নাট্যোপযোগিতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে—‘The gift of metaphor is the greatest of all’ যেহেতু it implies an inborn eye for likeness’। এই অন্তর্দৃষ্টির অধিকার নিঃসন্দেহে কবির। কবিপ্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার রচিত সংলাপে সেইজন্ম প্রায় সর্বত্রই এই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেক্সপীয়ার রচিত সংলাপ এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’র সংলাপেও সদৃশ লক্ষণ বিদ্যমান। ‘মালিনী’ রচনাকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গ্রহসন ব্যতীত অন্য সব নাটকেই অবশ্য পশু সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। এদিক থেকে একমাত্র “মালিনী”র সংলাপকে গ্রীক নাটকের সংলাপের তুল্য মনে করবার বিশেষ কোন কারণ নেই। ‘মালিনী’র সংলাপের কাব্যধর্ম রবীন্দ্রনাথের অন্ত নাটকেও বিদ্যমান। এর কারণ তাই অত্যাশ্চর্য্য। গ্রীক নাটকের সংলাপের আশ্চর্য্য মাদৃশ ‘মালিনী’র সংলাপকে গ্রীকনাটকের সংলাপের সমধর্মী করে তুলছে।

গ্রীক নাটকের সংলাপরীতির অগ্রতম বৈশিষ্ট্য Stychomythia-র ব্যবহার। ‘Conversation in alternate line’—সংক্ষেপে এই হল Stychomythia-র লক্ষণ। ‘মালিনী’র সংলাপ সর্বাংশে প্রবহমান মিত্রাস্কর পয়ারে রচিত। স্থানবিশেষে ‘মালিনী’তে এই Stychomythia-র অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রীক নাটকে চরম উত্তেজনাময় নাটকীয় মুহূর্তে পাত্রপাত্রীর মুখে এক বিশেষ ধরনের সংলাপ দেখা যায়। একটি চরণের অর্ধাংশ একজন উচ্চারণ করে এবং ততুত্তরে অবশিষ্ট অর্ধাংশ অপরজনের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে চরণ সম্পূর্ণ হয় (—“Half verse flung in response to half verse”)। ‘মালিনী’তে অনুরূপ সংলাপ ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বর্তমান। ছটি তুলনাত্মক দৃষ্টান্ত

গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) Stychomythia—

Media

I love the pain, so thou shalt laugh us more

Jason

Oh, what a womb of sin my children bore !

Media

Sons, did ye parish for your father's shame ?

Jason

How ? It is not my hand that madered them.

—Media : Euripides (Translated by Gr, Murry)

ক্ষেমঙ্কর

বচনান্তে

কে পারে তোমারে বন্ধুবর !

সোমার্চার্য

দূর করে

দাও স্থপ্তিয়েরে। বিপ্রগণ কর ওরে

সভার বাহিরে।

চাক্ৰদত্ত

মোরা নির্বাসন

চাহি রাজকুমারীর।

—দ্বিতীয় দৃশ্য, মালিনী।

(খ) Half verse flung in response to half verse—

Jason

My sons, my own !

Media

Not thin but mine

Jason

Who slew them !

Medio

Yes to torture thee.

Media : Euripides (Translated by Gr, Murray)

সুপ্রিয়
 দেবীতব জয় ।
 ক্ষেমঙ্কর
 এইবার
 ডাকো, ডাকো, ঘাতকেরে ।
 রাজা
 কে আছিল ওরে
 আনু খড়্গ ।

মালিনী
 মহারাজ, ক্ষমো, ক্ষেমঙ্করে
 —চতুর্থদৃশ্য, মালিনী ।

সংলাপরীতির মত নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রেও গ্রীক নাটকে অদ্বৈত রীতির সঙ্গে ‘মালিনী’র সাদৃশ্য দেখা যায় । গ্রীক নাটকের অন্তর্নিহিত সরলতার আদর্শ গ্রীক নাটকের নামেও অভিব্যক্ত । রোম্যান্টিক নাটক নামকরণে সরলতার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকের চিত্রধর্মী পোষাকী নামকরণে উৎসাহী । নামকরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াসের কথা সুবিদিত । ব্যঞ্জনধর্মী ভাবময় নামকরণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত তাঁর প্রায় সকল নাটকেই বিদ্যমান । ‘মালিনী’ এবং তৎপূর্বে ‘চিত্রাঙ্গদা’র নাটকের নাম গ্রীক নাটকের অনাভরণ সরলতার আদর্শের অন্তর্গত । গ্রীক নাটকে মৃত্যু চরিত্রের নামই যেমন প্রায় সর্বত্র নাট্যনাম ‘মালিনী’ও তদনুরূপ ।

ট্র্যাজেডিতে লঘুরসের অবতারণার সমীচীনতা বিতর্কিত বিষয় । ট্র্যাজেডিতে unity of Sentiment বা ভাবৈক্যের উপর একান্ত গুরুত্বদানে আগ্রহী যারা ট্র্যাজেডিতে ‘comic relief’-এর বিরুদ্ধে তাঁদের কঠোর প্রতিবাদ । ‘It (craving for comic relief) springs from a lack of capacity of concentration’ (—T. S. Eliot) । এই হল তাঁদের বক্তব্যের মূল স্তর । কিন্তু ‘Comic relief’ যে ‘unity of Sentiment’-এর পরিপন্থী নয়, পরিপোষকতা করতে পারে সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি তার প্রমাণ । রবীন্দ্রনাথ তাঁর গম্ভীরভাবে অনেক নাটকের পথচারী জনতার দৃশ্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লঘু রসের অবতারণা করেছেন সেক্সপীয়র যেমন তাঁর ট্র্যাজেডিতে ট্র্যাজিক গান্ধীর্ষের সঙ্গে লঘুরসের হালকা হাওয়ার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । অন্তর্দিকে গ্রীক নাট্যকাররা এ্যারিস্টটলের সঙ্কার—‘Tragedy represents an action which is serious’...এই ‘serious’ স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ট্র্যাজেডিতে লঘু রসের অবতারণার পথ বর্জন করে বলেছেন । গ্রীক ট্র্যাজেডির কয়েকটি চরিত্রে যেমন Nurse (chophoroc নাটকে), Ocianus (Prometheus নাটকে), Messenger (Antigone নাটকে) আংশিকভাবে কমিকলক্ষণ বর্তমান সন্দেহ নেই । তবে সমগ্র গ্রীক ট্র্যাজেডির তুলনায় এ নগণ্য । সামগ্রিক বিচারে গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শ ট্র্যাজেডিকে লঘুরসমূলক রাখা । রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যস্ত গম্ভীরভাবে নাটকের সঙ্গে ‘মালিনী’র এখানেও পার্থক্য । লঘুরসের অনন্তিহে ‘মালিনী’ গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ।

নানাদিক থেকে গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে ‘মালিনী’র মিল অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে ‘মালিনী’র নাট্যরূপে অনেকাংশেই গ্রীক ট্রাজেডির রূপলক্ষণ বর্তমান। গ্রীক সাহিত্যে রসজ্ঞ অধিকারী ট্রেভেলিয়ানের ‘মালিনী’র নাট্যরূপ সংক্রান্ত উক্তির যথার্থ্য এখানে। এখনো অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়— তাহলে রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’র নাট্যরূপ কি গ্রীকনাটকের কায়ার ছায়ামাত্র? রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই বলেছেন ‘যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে।’

‘মালিনী’ রবীন্দ্র নাট্যধারার যে পর্যায়ে রচিত আলোচনার সূচনায় দেখা গেছে সেই স্তরটি কবির স্বকীয় নাট্যাঙ্গিক আবিষ্কারের সাধনা-পর্ব। পূর্ণসিদ্ধি তখনো অনধিগত। সেক্সপীয়র স্বেচ্ছাবর্জিত। আর একালের নাট্যবহনের পরীক্ষায় অল্পতীর্ণ বলে সংস্কৃত নাটকের পথ তো বাংলা নাটকের সূচনাপর্বেই বিবর্জিত। গ্রীক নাট্য কবির অভিজ্ঞতার বাইরে বলেও গ্রীক নাটকের তর্জমা পাঠের সংস্কার অবশ্যই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। এই অবস্থায় গ্রীক নাটকের অনুরূপ হয়ে ‘মালিনী’র আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা সমধিক। ‘মালিনী’র নাট্যরূপ সংযত, সংহত...গ্রন্থ ভূমিকায় কবির এই উজ্জ্বলিত তাঁর অগ্ৰাণ্ণ নাটকের সঙ্গে তুলনায় ‘মালিনী’র নাট্যরূপের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকৃত। গ্রীক নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনায় দেখা গেছে নাট্যরূপে ‘মালিনী’ অনেকাংশে গ্রীক নাটকের অনুরূপ।

এ সঙ্গেও স্মরণীয় এবং উল্লেখ্য যে ‘মালিনী’ হুবহু গ্রীকনাটক নয়। সংস্কৃত নাট্যকলার মতো গ্রীক নাট্যকলার পক্ষেও আধুনিক জীবন-নাট্যের ভারবহনে পূর্ণসামর্থ্যের অভাব। গ্রীক নাট্যবিধির ছকের উপর পুরোপুরি একালের নাটক তাই দাঁড়াতে পারে না। আপন প্রয়োজনবশেই তাকে অঞ্চলবিশেষে নিজরূপ রচনা করে তুলতে হয়। প্রতিক্রিপতা সঙ্গেও স্বরূপে বিকাশলাভ ভিন্ন তার সিদ্ধি নেই। ‘মালিনী’কে যদি একটি সার্থক নাটকরূপে গ্রহণ করতে বিধা না থাকে তাহলে সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে গ্রীক নাটকের সদৃশরূপে আত্মপ্রকটনই ‘মালিনী’র নাট্যরূপের শেষ কথা নয়। গ্রীক নাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যকেই বর্জন করেছে এবং সেই শূন্য স্থানগুলিকে আপন বৈশিষ্ট্যে ভরিয়ে নিয়ে ‘মালিনী’ সার্থকতার শিখরে উপনীত হয়েছে।

কোরাস্ গ্রীক ট্রাজেডিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। কোরাস্ গ্রীক নাটকের অলঙ্কার মাত্র নয়। নাটকের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা ঘটে কোরাসের ভূমিকার মাধ্যমে। সাধারণ স্বভাবের মানুষের অনেক ধাপ উচুতে অবস্থান ছিল গ্রীক নাটকের চরিত্রগুলোর। কোরাস তারই এক ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে থেকে নাটকের এইসব বিশালকায় পৌরাণিক মানুষগুলি ও দর্শকের মধ্যে একটা সংযোগসেতু গড়ে দিত। নাট্য পরিণতিতেও কোরাসের ভূমিকা সাহায্যকারীর। কখনো নাট্যকারের মুখপাত্র—দর্শকের স্রবিশেষের জগৎ পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়; বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়; কখনো বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করে জানিয়ে দেয়। এইভাবে নাটক ও দর্শকের মধ্যে চলাচলের পথ সুগম করে তোলে যেমন তেমনি আবার নাটকের চারপাশে একটি মায়াজাল বুনে দিয়ে নাটককে কোরাস বাস্তব জগতের স্পর্শ থেকে কিছুটা দূরবর্তী করে তোলে। নাটকে গীতিরস জমিয়ে তোলে কোরাসদল। সময়ের অগ্রগতির ধারায় কোরাসের এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেকাংশে গোণ হয়ে এসেছিল বটে! এ্যারিস্টফেনিস্-এর অন্তিমপর্বের নাটকে কোরাস সম্পূর্ণ বিবর্জিত। তবু গ্রীক নাটকের সমৃদ্ধিপর্বে কোরাসের ভূমিকা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

গিলবার্ট মারে-র উক্তিটি থেকে বোঝা যায়। ‘In the suppliants of Aeschylus the chorus are really the heroines of the play. They are singing in two-thirds of it. They are present from first to last. (A History of Ancient Greek literature). গ্রীক নাটকের সঙ্গে ‘মালিনী’র খুব বড় রকমের পার্থক্য হল ‘মালিনী’তে কোরাসদল অল্পপস্থিত। কোরাসের মাধ্যমে গ্রীক নাটকের অঞ্চলবিশেষে যেখানে বিবৃতি ও বর্ণনার অথবা আশ্রয় মিলেছিল ‘মালিনী’ সেখানে তার গতিশীল সংলাপের ভিতর দিয়ে নাটকের চলিত স্বভাবকে অব্যাহত রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম প্রকাশ মাধ্যম গানের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তসব নাটকেই করেছেন। ‘মালিনী’ই একমাত্র গানশূন্য। গ্রীকনাটকে যেখানে কোরাসের কণ্ঠে গীতিরস পরিবেশিত হ’ত রবীন্দ্রনাথ নাটকের স্বতন্ত্রভাবে সঙ্গীত সমাবেশ করে হয়তো তা করতে পারতেন। কিন্তু ‘মালিনী’তে দেখা যাচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে গান নেই; কোরাস তো নেই-ই। অথচ গীতিময়তা ‘মালিনী’তে অব্যাহত। গ্রীক নাটক থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র রীতিতে ‘মালিনী’ এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছে।

মহান ভাবাদর্শের উপস্থাপনা গ্রীক নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই আদর্শ ভাবনা গ্রীকদের জীবন বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। মানব জীবনের উপর রহস্যময় নিয়তির অমোঘ শক্তির নির্মম ক্রিয়া গ্রীক জীবনাদর্শে স্বতোসনিক সত্যরূপে প্রতীত। এ হেন নিয়তির নিষ্ঠুর লীলার রূপায়ণ গ্রীক নাট্যকারদের কাছে নাটকের একটি আবশ্যিক অঙ্গরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজা ঐডিপাস-এর করুণতম পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোফোক্লিস-এর ‘ঐডিপাস তু কিং নাটকের কোরাস ঘোষণা করে—‘We must call no one happy who is of mortal race, until he hath crossed life's border, without pain.’ (R. C. Jebb কৃত অনুবাদ থেকে গৃহীত)। কিম্বা এউরিপিদেস-এর ‘মিডিয়া’ নাটকের উপসংহারে কোরাস জানিয়ে দেয়—

Great treasure halls hath Zeus in heaven,
From whence to man strange dooms be given.
Past hope or fear.
And the end men looked for cometh not,
And a path is there where no man thought.
So hath it fallen here.’

শুধু ‘ঐডিপাস তু কিং’ বা ‘মিডিয়া’ কেন প্রায় সমস্ত গ্রীক নাটকেই এইভাবে নিয়তিলীলাকে এঁকে দেখানো হয়েছে এবং তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনসত্যের ইঙ্গিত এর ভিতর দিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের এমন কোন বিশ্বাসের প্রতি আত্মগত্য ছিল না। নিয়তিবিশ্বাস গ্রীক নাটকের প্রসঙ্গ যদিও তবু নাট্যপ্রযুক্তিকেও এর দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হয়েছে। নিয়তিবিশ্বাসের ফলে দেখা যায় গ্রীক নাট্যকাররা ঘটনাবিভ্রাস কৌশলের উপর নাটকে যতোখানি জোর দিয়েছেন চরিত্র-চিত্রণের উপর ততোখানি নয়। অত্যাধিক রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’তে দেখা যায় উভয় পক্ষই সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

নাটকের মঞ্চায়ণ ও মঞ্চসাজল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে অধিকাংশ গ্রীক নাটকই রচিত। এমন কি

অভিনেতা বিশেষের অভিনয় সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে অনেক সময় নাটক লেখা হয়েছে। Peter D. Arnot এই প্রসঙ্গে খুব স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন—‘So parts came to be written with specific actors in mind, and many of them were famous for their representation of one or two roles.’—(Introduction to Greek Theatre)। এর উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুশাসন নিয়ন্ত্রণও নাট্যকারদের স্বাধীন শিল্পীসত্তার অসংবৃত প্রকাশকে ব্যাহত করেছে। The Social History of Art গ্রন্থে Arnold Hauser এ রকমের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন। ‘The aesthetic idealism of the cultured nobility shows itself, above all, in the choice of subjects to be represented.... The punishment of Phrynicers, alleged to have been due to his choosing the recent capture of Militus as a subject of play, was no doubt due to the fact that the treatment of this subject did not confirm to official views.... মঞ্চমনোরঞ্জন, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আত্মগতোর ফলে গ্রীক নাট্যকারদের শিল্পীস্বভাবের স্বাভাব্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারেনি। নাট্যরূপও নিয়ন্ত্রিত হয়েও এ সব বিধিনিষেধের পথ ধরে। এ ধরনের কোনো প্রতিষেধ মালিনী’ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের উপরে ছিল না। মহান আদর্শবাদের পরিবাহী হয়েও ‘মালিনী’ রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। ‘মালিনী’র ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন—‘আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গোঁরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে তুষারপুষ্পের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অল্প মানুষের চিন্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আত্মগতানুকূল সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পেতে পারে। এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা ছুঁখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।’ ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’ এবং আরও আগে ‘নির্বাকের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় এই ভাবের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল এ কথাও জানিয়েছেন। হঠাৎ ‘মালিনী’তে একটির ভাব বাইরে থেকে পাওয়া নয়—রবীন্দ্রনাথেরই আত্মোপলব্ধিজাত জীবনঅনুভব। ‘মালিনী’র মানুষজনও নিয়তিনির্জিত বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়। মঞ্চমায়া ‘মালিনী’কে প্রলুব্ধ করেনি কিম্বা রাষ্ট্রবিধানের আত্মগত্যাও তাকে শিরোধার্য করে নিতে হয়নি। ‘মালিনী’র নাট্যরূপ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীব্যক্তিত্ব তাই নিরঙ্কুশ। শিল্পীসত্তার স্বাধীন বিহারের ফলে সৃষ্ট ‘মালিনী’ তাই অনেকাংশে গ্রীক নাট্যকলার সাদৃশ্য বরণ করে নিয়েও স্বতন্ত্র।

প্রতিভার স্বভাব পথ রচনা ক'রে চলা—অনুকরণ নয়। নাট্যরূপের অনুসন্ধানের পূর্বে রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল এই প্রতিভার পরশ-পাথর। সংযত সংহত প্রকাশে ‘মালিনী’ অনেকাংশে গ্রীক নাটকের অনুরূপতা পেলেও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রীকনাট্যবিধির পথ থেকে সরে এসে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রয়োজনবোধে গ্রীক নাট্যকলার অনেক লক্ষণকে সে বর্জন করেছে,

নতুনবিধি রচনা করে সেইসব শূন্য স্থানগুলিকে পূরণ করে তুলেছে। আর এইভাবে ফলে ওঠা ‘মালিনী’র যে পরিপূর্ণরূপ তাকে তখন আর বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালের কোনো বিশেষ নাট্যরূপের ছায়ামাত্র বলা চলে না। পরিণতিতে একটি অখণ্ডরূপে ‘মালিনী’ দেশ বা কাল বিশেষের পরিচিত নাট্যবিধিকে অতিক্রম করে গেছে। ‘মালিনী’র নাট্যরূপ হয়ে উঠেছে ‘সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।’

গ্রীক নাটকের সঙ্গে আঙ্গিকগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ‘মালিনী’কে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। মালিনী পর্বের রচনা ‘কাহিনী’র অন্তর্গত নরকবাস-এর প্রেতদের ভূমিকার সঙ্গে গ্রীক কোরাসের আংশিক সাদৃশ্যের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক আবিষ্কারের প্রয়াসের এই পর্বে রচিত ‘মালিনী’ই ছিল রবীন্দ্রনাটকের গ্রীক প্রভাবের সম্ভাব্য ক্ষেত্র। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব আঙ্গিককলা উদ্ভাবন করে নিয়ে সেই পথেই নাটক রচনা করেছেন। ‘শারদোৎসব’ থেকে সেই পর্বের সূত্র। ওই নবাবিস্কৃত পথ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজের। গ্রীক প্রভাবপ্রসঙ্গের অনুসন্ধান তাই সেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর।

তিন প্রেমের কবিতা

শকুন্তলা দেবী

একান্ত গভীরভাবে অভিভূত করেছে, হৃদয়কে তার মূল পর্যন্ত সজোরে আলোড়িত ক'রে তুলেছে। অভিভূতাকে রত্নময় করেছে এবং অল্পভূতিতে এক সহনাতীত বিপন্ন বিশ্বয়ের মধ্যে এনে পৌঁছে দিয়েছে—এমন তিনটি মাত্র প্রেমের কবিতাকে বাংলা কাব্য হ'তে নির্বাচন করতে বললে 'স্বপ্ন' 'বনলতা সেন' এবং 'শাস্ত্রী'—এই তিন প্রেমের কবিতার নাম আমি প্রথমেই করি। (১)

প্রেম কবিতার এক শাস্ত্র বিভাব, এবং তিনটি অসামান্য কবিতা আমাদের বোধে শাস্ত্রভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রেম ব্যাপারটি রূপের দিক দিয়ে যাই হোক—গুণের দিক দিয়ে নিশ্চিত রোমান্টিক—সৌন্দর্যবোধে এবং আশ্চর্যবোধে মিলে তাকে আয়ত্তাতীত, সংশয়ে ও বিশ্বাসে মুহূর্তে আন্দোলিত, পরিবর্তনশীল, ক্ষুদ্র, অপার রহস্যময় চুজ্জের, আনন্দঘন এবং বেদনাক্রান্ত করেছে। এই গুণে তিনটি কবিতাই সর্বতোভাবে রোমান্টিক। কিন্তু ক্লাসিকাল পটভূমিকায় রচিত উপলব্ধিতে এবং উপস্থাপনায় পৃথক হ'লেও হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা তিন জনেই ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ 'বিশ্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' এবং 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' প্রস্থান করেছেন। কালিদাস রবীন্দ্রনাথের 'চৈতন্যগুরু'। সংস্কৃত বিশেষতঃ কালিদাসের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষণ্ড'—তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, অপরিচূপ্ত সন্তোষ ক্ষুধায় যন্ত্রণাদায়ক, তীব্র; শিপ্রানদীপার্ববর্তী উজ্জয়িনী তাঁর কামনার অলকাধাম। স্বধীন্দ্রনাথও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিশালী, কালিদাসের বশীভূত, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রবুদ্ধ। 'শাস্ত্রী' কবিতায় স্থানের উল্লেখ না থাকলেও, বর্ণনায় কালিদাসের স্থানমাহাত্ম্য স্পষ্ট ধরা পড়েছে বর্তমানকে পরিত্যাগ ক'রে অতীতে, অতীত, এই যে শরণাগতি, এর মধ্যে পলায়নীচেষ্টা আছে, এমন মনে করতে পারি। বস্তুতঃ যথার্থ রোমান্টিক যিনি—প্রত্যক্ষগোচর ঘটমান বর্তমান সম্পূর্ণভাবে তাঁকে কখনো সন্তুষ্ট করতে পারে না; তাছাড়া, আত্মিক নৈরাশ্যে, বাস্তবের ধূলিধূসরিত নৈমিত্তিক শুষ্কতায়। কল্পনার অকল্পনীয় প্রতিরোধে এ কাল এবং এ কালের জীবন এমনি সংকুচিত এবং বিড়ম্বিত যে একটি বৃহত্তম এবং গভীরতম অল্পভূতিকে ধারণ করবার মতো মহৎ সামর্থ্য এর নেই, তার জন্য ব্যাপকতর ক্ষেত্র আবশ্যক। এ তিন কবিতার স্থানই তাই বর্তমানের বাইরে কিন্তু তাই ব'লে তা অসত্য নয়—another level of truth এখানে বর্তমান—একই সত্য অপর এক দিক দিয়ে প্রকাশিত—এ স্বপ্ন বাস্তব বিমূখ নয়—পরবাস্তব, জীবনকে স্বীকার ক'রে নিয়েই সত্য—'it is the dream which affirms life' (ষ্ট্রিফেন স্পেণ্ডার)। (২)

'স্বপ্ন' এবং 'শাস্ত্রী'র মধ্যে কালের উল্লেখ স্পষ্টই করা হয়েছে। 'স্বপ্নে' 'বসন্তের দিনে' নায়ক মানসিক যুগলায় বেরিয়েছেন। আর, 'শাস্ত্রী'তে তখনও যদিচ 'হানে যুদ্ধ বাতাসে প্রতিধ্বনি' তবুও 'শান্ত বরষা' এবং শ্যামলতা সত্ত্বেও গগন 'স্বর্ণস্বয়ংগ' প্রাপ্ত। 'মাঠে ঘাটে বাটে আরক্ত আগমনী' এবং 'অগোচর প্রতিবেশে' 'শরণ আগত'।

এ ছুটি কালই বাংলাদেশে লক্ষণীয়, বিশিষ্ট, দ্যুতিময় এবং বর্ণাঢ্য ও শস্তপূর্ণ। 'বনলতা সেন'-এর

কালের এইরকম কোনো উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করার চেষ্টা করতে পারি। হেমন্তের সঙ্গে জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতা তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা লক্ষ্য ক'রে এসেছি। এই স্বপ্নায়ু এবং অনাদৃত ঋতুটি নেপথ্যস্থিত এবং বিমর্ষ হ'লেও আন্তর সম্পদে ধনবান। আর, সেই ধনের দিক দিয়ে জীবনের সঙ্গে তার গভীর যোগ। এখানেও 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্রসঞ্চার'—আপেক্ষাশূন্য হেমন্তের ভারাক্রান্ত মাঠকে জীবনের প্রতীক বলে ধ'রে নিতে তবে বাধা কী।

কাল যাই হোক, তিনটিরই প্রতিবেশে অন্ধকার আসন্ন এবং ঘনায়িত। অন্ধকার কালো। কালো রঙের শূণ্যতা নয়, রঙের সন্ন্যাস, সমস্ত রঙকে নিঃশেষে শোষণ করেছে ব'লেই কোনো রঙ তাতে স্বতন্ত্রভাবে গোচর নয়। সেই অর্থে অন্ধকার পূর্ণ। তাই, অমল কুঁড়িকে ভাসিয়ে রাখতে অগাধ জলের মতো অতল অন্ধকার চাই। অন্ধকারের রূপ কেবল মহিম্ন এবং অনেক পরিমাণে আত্মিকই নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু তাৎপর্য যেন জড়িয়ে আছে। আমাদের হৃদয়লোকের যে অংশ আবহমান ঘন তিমিরাবৃত, যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করে না—অন্ধকারের মধ্যে আমাদের সেই ছুরবগাহ রহস্যময় অংশটি যেন অব্যক্তভাবে বায়ুয় হ'য়ে ওঠে। এই অন্ধকারের পরিমণ্ডলে তিন কবি প্রেমের স্থাপনা করেছেন। তবে, ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় এই অন্ধকার তাদের স্থায়িত্ব এবং ঘনতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

'শাখতী'র অন্ধকার 'কৌমুদীজাগরের' সম্ভাবনাময় সন্ধ্যাসংকটের অন্ধকার, ফলে 'কুহেলীকলুষ' 'অবেলার' পলায়মান আলোয় তখনও যে অন্ধকার অস্ফুটভাবে উদ্ভাসিত এবং 'ফসলবিলাসী হওয়ায়' কম্পমান। সন্ধ্যার অন্ধকার—তাই পাংশু, 'কৌমুদীজাগর' আসন্ন তাই অস্থায়ী।

'বনলতা সেন'-এ দিনের আলো সম্পূর্ণভাবে অপসৃত—কিংবা বলা উচিত অপস্রয়মাণ। ঘটনাটি প্রথমাবধি সম্পূর্ণ নয়, ক্রমশঃ সম্পূর্ণ। ডানার থেকে 'রৌদ্রের গল্প' চিলেরা 'মুছে ফেলেছে' এবং 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেছে'—কেবল 'জোনাকির রঙে' সে অন্ধকার তখনও 'ঝিলমিল' করছে। 'গল্পের তরে' 'জোনাকির যে ঝিলমিল রঙ'-এর প্রয়োজন ছিলো, গল্প ফুরোলে, মুখোমুখি অনন্ত নিস্তব্ধতা নিয়ে ব'সে থাকার কাল এলে তখন 'থাকে শুধু অন্ধকার' এবং অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই অন্ধকার নিশ্চিহ্ন, অস্বচ্ছীভেদ এবং সর্বচরাচরকে 'স্বপ্ন' কবিতায় অবলুপ্ত ক'রে দিয়েছে—যেন বিশ্বত্রস্তাও সমস্তকে, যেন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ত্রিকালকে সর্বাংশে গ্রাস ক'রে নিয়েছে। কবিতাটির প্রথম দিকে অন্ধকার হর্ম্যের উপর তখনও যে সন্ধ্যারশিরেখা দেখা গিয়েছিলো, যে রশ্মি অবিলম্বে অন্ধকারে লুপ্ত হলো। তারপর হস্তধৃত দীপশিখা। তাতে একখানি মুখের চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ আলোর অস্পষ্ট বৃত্ত মাত্র রচিত হ'তে পারে—পরে 'দুরন্ত বাতাসে' দ্বারপাশের সেই দীপও কখন নিভে যায় আর এক উত্তাল অন্ধকার এসে সমস্তটাকে এক নিঃশ্বাসে শোষণ ক'রে নেয়—

রজনীর অন্ধকার

উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।

শব্দ কি কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ে সত্য? দর্শনে নয়? যদি তা না হয়, শব্দকে যদি দেখা যায়, তবে শব্দের কি আলো আছে? সম্ভব। 'শাখতী' কবিতা নিঃশব্দ, অন্তত আপত্যতঃ। শুধু 'একটি কথার দ্বিধা

থরথর চূড়ার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু কথাটি অশ্রুত। তবু গোটা কবিতাটি অনাহত শব্দময়। সে শব্দ অন্ধকারের অতল থেকে উঠে আসছে। ধ্বনির সঙ্গে অর্থকে যুক্ত করলেই তবে একটি স্পষ্ট, রূপময়, ইন্দ্রিয়গম্য শব্দ পাওয়া যায়—এ কবিতা সেই অর্থে শব্দহীন কিন্তু নিরাকার ধ্বনি সমগ্রটার মধ্যে ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ হ’তে থাকছে ব’লে এ কবিতা তাই বৃহৎ অর্থে শব্দময়, এ শব্দ আলোময়।

‘বনলতা সেন’-এ কয়েকটি শব্দধ্বনি। সেখানে সন্ধ্যা আসে ‘শিশিরের শব্দের মতো’ সেখানে এক সাধারণ প্রশ্ন অসাধারণ ভঙ্গিতে বায়ুমণ্ডলকে আর্ত ক’রে তোলে—‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’ কিন্তু বাক্যের বাকি অংশটি নিরন্তর কেন—সেটি না পেলে পাদপূরণ যে হয় না। আসলে এ প্রশ্নের উত্তরও এই প্রশ্ন দিয়েই দিতে হবে। কেবল বাক্যের এক অংশে তা ব্যক্ত, অলিখিত অল্প অংশে অব্যক্ত। তারপরেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। অন্ধকারের অতল সমুদ্র চকিতে আলোড়িত হ’য়েই আরও ঘনীভূত এবং নিখর হলো। ‘স্বপ্ন’ কবিতার কুশল প্রশ্নও নিতান্ত পরিচিত হয়েও কী আশ্চর্যভাবে অশ্রুতপূর্ব—‘হে বন্ধু, আছ তো ভালো?’—কিন্তু কণ্ঠোচ্চারিত নয়—‘নীরবে শুধালো শুধু স্কন্ধণ জাঁখি’—‘নিষ্পষ্ট নয়ান’ শব্দময়, শব্দময় নয়ান অশ্রুময় এবং শিশিরের যদি শব্দ থাকে, তবে অশ্রুও কি শব্দ নেই? আর অশ্রুর যদি শব্দ থাকে তবে ‘নিশ্বাসে নিশ্বাস’ মিললে তার কি শব্দ থাকবে না? তাছাড়া তখন ‘মহাকাল মন্দিরের মাঝেও’ ‘গম্ভীর মস্ত্রে সন্ধ্যারতি’ বেজেছিলো—সেই ঘণ্টাধ্বনিতে স্বপ্নের অন্ধকার স্পন্দমান হয়েছিলো, তারপর অকস্মাৎ একসময় ‘আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে’ আর অন্ধকার তীব্রতম হলো। সেই তীব্র অন্ধকার কী দুঃসহ জ্যোতির্ময়।

তিনটি কবিতাতেই প্রেমকে ব্যক্তিগত এবং বিশিষ্ট করার প্রবণতা রয়েছে। প্রেমাস্পদের নামকরণ, কোথাও তার বাসস্থানের উল্লেখ বা আবাসের বিশদ বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতা ধরা পড়ে। স্বপ্নের নায়িকা মালবিকা যদিচ এই মালবিকা সংস্কৃত কাব্যের যে কোনো নারীচরিত্র হ’তে পারে, সেখানে বন্ধিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জনে প্রিয়ার ভবন—তার দ্বারে শঙ্খচক্র ঝাঁকা, তার দুই দ্বারে দুটি নীপতরু পুত্র স্নেহে বর্ধমান, তোরণের শ্বেতস্তম্ভের উপর সিংহের গম্ভীর মূর্তি দস্ত ভরে বসে আছে। সন্ধ্যায় গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি ফিরে আসে, স্বর্গদণ্ডে নিদ্রামগ্ন মম্বর।

‘বনলতা সেন’-এ স্থান এবং পদবী আরো স্পষ্ট হলো—‘নাটোরের বনলতা সেন’।

নায়িকার নামে ‘শাশ্বতী’ কবিতা শিরোনামা পেলো। শাশ্বতী কি কারো নাম? বলতে পারি, শাশ্বতী কারোর নাম নয়—শাশ্বতভাবে যার মধ্য দিয়ে প্রেমকে আত্মদান করা গিয়েছে—সেই অর্থে শাশ্বতী—তবে স্বপ্নের ‘প্রথমা প্রিয়াও’ শাশ্বতী, আর আর যার জন্তে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে ‘বিদর্ভ নগরে, মৌর্য সাম্রাজ্যে চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিদানের মধ্য দিয়ে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা যায়—সেও তবে শাশ্বতী। তবু আমার অল্পমান এতে খণ্ডিত হয় না—যদি বলি, তৃতীয় কবিতায় নায়িকার ব্যক্তিস্বরূপটি তার নামের মধ্য দিয়ে সত্য হ’য়ে উঠেছে মান—বিশেষ্য এবং বিশেষণ এখানে সমধাতুজ, আর সচরাচর তা হয় না বলেই অদ্ভুত লাগছে। তবু, অল্প দুইটির তুলনায় এ কবিতায় নায়িকা নামের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক।

প্রেমের ক্ষেত্রে রূপের প্রসঙ্গ আবশ্যিক না হ’লেও প্রত্যাশিত এবং উল্লেখযোগ্য। এ তিন কবিতাই একদিক থেকে রূপাল্লরূপের পদাবলী—সে রূপ তাদের স্বরূপগত। বর্ণনা কোথাও অবর্ণনীয়

ব্যঞ্জনাময়, কোথাও রূপাহুবাগ রূপোল্লাসে পরিণত।

প্রতীপ অলংকারের মধ্য দিয়ে ‘শাশ্বতী’র রূপ অভিব্যক্ত হ’লো—

‘স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি সম ;

সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে।’

কিন্তু রূপ এখানে কেবল দর্শনময় নয় ভ্রাণময় কেননা, তারই ‘মদমুকুলিত’ ‘দেহসৌরভে’ অনামা কুণ্ডলম অজানায় ওঠে যেতে—এবং গুণোপেতও বটে—

‘ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,

অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে,

অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি,

স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।’

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জন্ম অন্তহীন আকুলতা আমরা বোধ ক’রে থাকি—এ কথা রবীন্দ্রনাথের। ‘স্বপ্ন’ কবিতায় নায়িকার রূপ এবং রূপের রাসবেশের বর্ণনা সংস্কৃত কাব্য হ’তে অবিকল গৃহীত হয়েছে। বর্ণনা ক্লাসিকাল।—

‘মুখে তার লোভরেণু, লীলাপন্ন হাতে,

কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তলুদেহে রক্তাশ্রু, নীবীবন্ধে বাঁধা,

চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।’

(চরণে নূপুরখানি যদি বাজলোই, তবে ‘আধা আধা’ কেন? পুরো বাজলে তার তীক্ষ্ণ নিক্ষেপে স্বপ্নভঙ্গ হ’য়ে যেতে পারে—এই আশঙ্কায় কি?)

আবার

‘অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ, কেশধূপবাস

ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।

প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে

চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।’

‘নগর গুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় ‘প্রতিমার প্রায়’ দণ্ডায়মান নায়িকার এই বর্ণনা চিত্ররসাত্মক—দর্শন, শ্রবণ এবং আভ্রাণের দ্বারা সে রস আন্বাদনীয়। কিন্তু এ রূপ মনের মধ্যে কোন বিশেষ মানবীর ছবিকে এনে দেয়না এবং স্থায়ীভাবে মুদ্রিতও হ’য়ে যায় না। স্বরের অভাব এবং গতানুগতিকতা একে কৃত্রিম এবং অসার্থক করেছে।

‘বনলতা সেন’-এর মধ্যে নায়িকাকে বিশেষ ক’রে তোলবার প্রয়াস সর্বাধিক। অথচ তার রূপের বর্ণনা সংক্ষিপ্ততম—কেবল—

‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।’

আর, ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ’—অথচ এই সামান্ত্রতম আভাস অসামান্তভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেমন ক’রে তাকে ব্যক্ত ক’রে দিলো—ভেবে আমি বরাবর স্তম্ভিত হয়েছি। তার রূপের মাপ

নেই—তাই তা space-এর বহির্ভূত। সকল কালকে আবৃত ক'রে আছে বলেই একই সঙ্গে 'temporal' ও 'timeless'-কালগত এবং কালহীন অনন্ত মহাকাল। তার রূপ ইন্দ্রিয়গত হ'য়েও ইন্দ্রিয়াতীত, মননময়, ধ্যানলভ্য, উপলব্ধিতে সত্য।

প্রকৃতপক্ষে এ রূপ জীবনমরণময় সৃষ্টির রূপ—তাই তার ইয়ত্তা নেই, রূপের সঙ্গীত—তাই তার সৌন্দর্যকে পারাপার ক'রে শেষ করা যায় না। সঙ্গীতের প্রতিভা—তাই তার অগাধ মহিমা—বনলতা সেন আশ্চর্য প্রতিভাময়ী, প্রতিভাময়ী মহিয়সী নারী। নায়িকার দুটি প্রত্যঙ্গের বিশেষ উপস্থাপনা তিনটি কবিতাতেই বর্তমান—কেশ এবং নয়ন।

'স্বপ্নে' 'ধূপবাস'-এর অল্পস্বপ্নবোধ কেন এলো—'কেশধূপবাস'—কেশের চেয়েও তার সুরভিতেই সর্বত্র সেখানে উতলা। ধূপবাস যেন সেখানে চির অভিলষিত স্বপ্নলোকের গন্ধকেই বহন ক'রে নিয়ে এলো—এ বর্ণনা রোমান্টিক এবং সে রোমান্টিকতা স্বদূর অতীতলগ্ন সৌন্দর্যের প্রতি সম্পূর্ণ আকুলতায়।

'বনলতা সেন'-এ 'চুল'—এই লৌকিক, ঘরোয়া এবং চলিত শব্দপ্রয়োগে অলৌকিক অমরাবতীকে জীবনানন্দ অনায়াসে স্বজন ক'রে তুললেন—

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা বর্ণের গাঢ়তায়, বিপুলতায় এবং প্রাচীনতায় মনের মধ্যে বহুকালের চরিতার্থ অচরিতার্থ পুঞ্জীভূত বাসনারাশিকে, মৃত্যু ধ্বংস বিনাশকে, স্মৃতি পথারুঢ় মহৎ সভ্যতার গভীর ভগ্নস্বপ্নকে, আবহমানকাল ব্যাপ্ত অসীম রহস্যকে আর সর্বোপরি এক নিগূঢ় রোমান্টিক নস্টালজিয়াকে নিমেষে মূর্ত ক'রে তুললো।

'শাশ্বতী'তে চুল এলো 'চিকুর' হয়ে—শব্দটি ততো ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু রমণীয় এবং অন্তরঙ্গ। 'ফসল বিলাসী হাওয়া'য় এলোমেলো উত্তরোল 'চিকুরের পাকা ধান' সেখানে বর্তমানকাল বিলম্বী আনন্দঘন, সতেজ, প্রফুল্ল, সবল জীবনের প্রতীক রচনা করলো। নয়নের আকারগত নয়, অল্পভবগত বর্ণনাই 'স্বপ্নে'র মধ্যে মেলে। 'সকরণ আঁখি' সেখানে নীরর প্রশ্নাকুল, 'নিষ্পন্দ নয়ান' অশ্রুতারাতুর। নয়ন নয়, নয়নের ভাবটিই প্রধান এবং সেইভাবে দুঃখ, বিপদ, উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, অসহায়তা, আর প্রেম তো আছেই, প্রভৃতি প্রকাশ পাচ্ছে।

'পাখির (৩) নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' তাকিয়েছিলেন—সেই বিখ্যাত চোখ উদ্ভাস্ত 'সব পাখি' যেখানে ফিরে আসে, সব নদী যেখানে ফিরে আসে, যেখানে পৌঁছলে 'জীবনের সব লেনদেন' ঘুচে যায়, থাকে না।

অপার শান্তি, অগাধ ভরসা, অসীম বিশ্বাস, তত্বপরি এক অপেক্ষমাণ সক্রিয় সহনশীলভাব 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'-এ ত্রোতিত হ'য়ে উঠেছে। এ তুলনা অতুলনীয়—উজ্জল জটিল দ্রবগন্ধবহ (বুদ্ধদেব বসু)।

'শাশ্বতী'র 'আঁখি' 'নিশা'র সঙ্গে উপমিত হয়েছে—কিন্তু এ নিশা 'বিদিশার নিশা' নয়—স্বপ্নালু, নীল। নীল প্রেমের রঙ, স্বপ্নের রঙ, রোমান্সের রঙ। এ আঁখি স্বপ্নাতুর বাস্তববিমুখ নেশাগ্রস্ত উদাসীন এবং সেইজন্য যেন কিছু পরিমাণে নিষ্ঠুর। তার প্রমাণ পরের পংক্তিতে সহজেই মেলে—'কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে'।

'স্বপ্নে' নায়িকা বিশ্বতবাক হ'লেও তার নয়ন বাস্তব—সে বাক্য নয়নের সক্রিয়তায় নিষ্পন্দতায়

অবোর অশ্রুতে স্বাক্ষরিত।

বনলতা-সেন-এর অন্ধকার নিবিড় নয়নে অনির্বচনীয় এক আশ্চর্য বচন মুদ্রিত হ'য়ে ওঠে। আর শাস্ত্রী'র অনিত দৃষ্টি ছুবোধ্য জটিল ছুজ্জের গোপনতায় দর্শনকারীকে বিমূঢ় এবং দিশাহারা করে দেয়—

অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিটির মানে।'

তিন কবিতারই আবলম্বন প্রেম এবং তিনেই তা চূড়ান্তভাবে রসে পরিণত। জাতিস্মর প্রেমচেতনা তিন কবিতারই প্রতিপাত্ত বিষয়।

তুমি আমি এক। কেবল আধারের পার্থক্যেই আমরা আলাদা হ'য়ে আছি। জন্ম জন্মান্তর ধ'রে তোমাকে দেখেই নয়ন ভ'রে আছে তোমাকে শুনেই শ্রবণ ভ'রে আছে তোমাকে ধ'রেই হৃদয় ভ'রে আছে তবু হৃদয়বাসনা পূর্ণ হলো না। জন্মে জন্মে তোমাকেই যেন শতরূপে শতবার ভালোবেসে এসেছি। অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে আমরা দুজনে যুগল প্রেমের স্রোতবাহী হয়ে ভেসে এসেছি—ইত্যাদি। এই যে 'জন্মান্তর সৌহৃদানি' বোধ, একেই জাতিস্মর প্রেম চেতনা বলছি।

বস্তুতঃ প্রেমের তীব্রতা ক্রমে প্রগাঢ় এবং অসহ হ'য়ে উঠলে তার সম্পর্কে এক ধরনের অবিশ্বাস জন্মে। যে বোধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এমনভাবে গ্রাস ক'রে ফেলে। যে কোনো অসম্ভবকেই এমন অক্লেশে সম্ভবপর ক'রে তোলে, তার অপ্রতিরোধ্য প্রচণ্ড আবেগ কি মাত্র একটি জন্মের পথে স্বজন ক'রে তোলা সম্ভব? অসম্ভব। তার পশ্চাতে অনন্ত জন্মের অমর শক্তি নিশ্চিত ক্রিয়াশীল। এ প্রেম অবিনাশী, নব নব ভাবে নিত্য অল্পভুয়মান তাই পরিবর্তনশীল, তথাপি অপরিবর্তনীয়, বেগবান, শক্তিশালী, চিরপ্রবাহিত, ব্যাখ্যার অতীত, শাস্ত্রতভাবে সত্য। এই প্রেমের সন্ধানই কেউ ভ্রাম্যমান পর্যটক, কেউ হাজার বছর ধ'রে পৃথিবীর পথ হেঁটে ক্লান্ত, কারোর বা 'একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা'। 'উদাস আঁখি' পশ্চাতে নিবদ্ধ থাকে।

তিনটিতেই উভয়ের সাক্ষাৎকার আকস্মিক এবং অবিস্মরণীয়। দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে কবি যাকে খুঁজেছেন—হাতে দীপশিখা। হৃদীর্ঘ সোপানের উপরে 'প্রতিমার প্রায়' হেনকালে অকস্মাৎ সে এসে দাঁড়ালো।

হাজার বছর পরে নাটোরের বনলতা সেনের সঙ্গে অকস্মাৎ পাঁচ কবির দেখা হ'য়ে গেলো। আর, আজকের 'শান্ত বরষা' মনে হয় যেন শত জনমের আগে'র আর এক বাদল শেষের রাতকে অকস্মাৎ ঘনিয়ে নিয়ে এলো।

'স্বপ্ন' এবং 'শাস্ত্রী'র মধ্যে দু একটি মুহূ ধরনের সন্তোগলীলার ঈষৎ উল্লেখ পাই; স্বপ্নে—

‘নাহি জানি কখন কী ছলে
স্বকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায় প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো। মুখখানি তার
নতবৃত্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার

নমিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।’

অন্তর, ‘শাস্ত্রী’তে—

‘সে এসে, সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অহুরাগে।’

‘বনলতা সেন’-এ এসব কিছু নেই—সেখানে অন্ধকার ছাড়া যখন আর কিছু থাকে না, তখন তার সঙ্গে মুখোমুখি বসবার সময় আসে—এই পর্যন্ত। প্রেমের প্রকাশ এখানে গভীর, সাত্বিক, সংযত অমল ও ব্যঞ্জনাময়।

তিন কবিতাই সাধারণভাবে বিপ্লবান্ত শৃঙ্গারসূচক। বেদনা এদের আত্মসত্ত্ব সর্বত্র। স্বপ্নে বেদনা, সন্ধানে বেদনা, স্মৃতিচারণও বেদনাময়। কিন্তু এখানেও বেদনার বোধে প্রত্যেকেই পৃথক। প্রথম দুটি কবিতায় প্রাপ্তিজনিত বেদনা। সে কেমন। প্রথমটিতে প্রিয়া বাস্তবগত নয়, স্বপ্নলব্ধ, ছায়াময়। উভয়ে ক্ষণকালের জন্ত স্বপ্নের শিপ্রানদীতটে মিলিত হ’য়েছে বটে, কিন্তু সেই নদীকে বিশ্বাস কী। অমোঘ নিয়তির মতো তা দুই তীরে দুইজনকে নিক্ষেপ ক’রে দিতে পারে এবং অবিলম্বে দেবেও—দুই তীরে দুই কাল, দুই কালে দুই ভাষা—স্বপ্নের ভাষাকে বাস্তবের ভাষায় তর্জমা করা যায় না। তাছাড়া, স্বপ্নে যাকে পাওয়া যায়, স্বপ্নভঙ্গে তাকে হারাবার আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তেই থাকে। এ প্রেমে স্থখ নাই, থাকলেও তা সন্তোষপাতী, অচিরস্থায়ী। তাই, এ প্রেম একদিকে রোমান্টিক প্রেম বিলাস, অন্যদিকে প্রেমবৈচিত্র্য।

‘বনলতা সেন’-এ অবিচ্ছেদ্য অহুসন্ধানের পর পরিশেষে প্রাপ্তি এবং আত্মনিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট হ’য়ে উঠেছে। কিন্তু মহৎ আত্মনিবেদনের অন্তরালেও মহৎ বেদনা থাকে। এ কবিতায় সর্বত্র সেই বেদনাকে অহুভব করেছে।

তৃতীয়টির ক্ষেত্রে বিপরীত ক্রিয়া লক্ষ্য করি। প্রথম দুটিতে মিলনেও স্থখ নাই এবং হুঃখ; তৃতীয়টির ঘটনাতেই বিচ্ছেদ। নায়িকা ‘সে আজ আর কারে ভালবাসে’। তবু মন রাগোজল—এ কি ভাবোন্মাদ? বাহিরের দিক থেকে হারালেও অন্তরের মধ্যে কাউকে সত্যভাবে পেলে তাকে আর হারাবার ভয় থাকে না; তাই?

তিনটি কবিতার ছন্দই ভাবের সঙ্গে প্রগাঢ় সঙ্গতি রেখেছে। ‘শাস্ত্রী’ ছ’ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রচিত। এই ছন্দের প্রত্যেকটি অক্ষর আপন ওজন অহুসারে বিধিমতো মূল্য পায় (এবং অন্তর্থা সচরাচর হয় না) বলে এর চেহারা খুব স্পষ্ট, নির্মল, জোরালো, সতর্ক এবং উত্তম; আর ছয় ছয় মাত্রায় যখন পর্ববিভক্ত হ’তে থাকে, তখন আরও একটি অলক্ষ্য তেজ, দৃঢ়তা, সাহস, গতি ও বেগ তাতে এসে লাগে। অস্বাভাবী তেজস্বী সৈনিকের মতো এই ছন্দের মধ্যে একটা বীর্য আছে। যে পুরুষ কোনো আঘাতেই মুহুমান হয় না—জীবনব্যাপী নির্দয় বিচ্ছেদকেও অগ্রাহ করে—মন প্রাণ হৃদয় যাকে দিলাম, জীবন দিলাম, জীবনাধিক ভালোবাসা দিলাম—তবু সব দিয়েও তার ভালোবাসা পেলাম না কিম্বা পেয়েও হারালাম—বেদনার সেই বিশমণী পাথরকেও অবলীলায় বুকে তুলে নেয়—তার অপ্রতিরোধ্য প্রচণ্ড অথচ অসাধারণ সংযত প্রেমকে এই নিয়মিত ছন্দ ছাড়া আর কে ধারণ করবে!

‘স্বপ্ন’ এবং ‘বনলতা সেন’—দুই-এই তানপ্রধান ছন্দ। কিন্তু গতি ভিন্ন। ‘স্বপ্ন’র গতি অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্ৰ। স্তবক গঠনে আধুনিকতা ও বৈচিত্র্য থাকলেও আট-ছয় মাত্রায় পয়ারের সাবেকি চালই এখানে অক্ষুণ্ণ। কয়েকটি কারণে এর গতি বেগবহুল। যাকে একান্ত চাই—কোথায় সে আছে তাও যদি জানি, তবে চেনা রাস্তা ধ’রে চলতে আর অহবিধা কী—তার উপর রাস্তাটাও চলে গিয়েছে স্বপ্নলোকের মধ্য দিয়ে—স্বপ্নে ভ্রমণে ক্লেশ নেই—আর সেই স্বপ্ন যদি ভালোবাসার হয়, তবে তো স্বপ্নের ভুবনই নন্দনবন—এখানে তাই সন্ধান আছে, শ্রান্তি নেই, প্রেমসী হৃদর কিন্তু অলভ্য নয়, প্রত্যাশা অবিশ্বাস্ত—তবু স্থনিশ্চিত সিদ্ধি। পদে পদে হিল্লোল এসে না লাগবে কেন! কেবল, স্বর ছাড়া ভালোবাসার বাসা তো বাঁধা যায় না, তাই তান। ‘বনলতা সেন’ বাইশমাত্রার মহাপয়ার কবিতা। এর যতি বিলম্বিত, গতি স্তিমিত, বেগ মন্থর। পৃথ্বী এখানে বিপুল, কাল নিরবধি, অনন্ত পথ, অনির্ণয় অন্ধকার। সন্ধান চিরকালের, হতাশা প্রত্যাশা প্রত্যাহার, বাসনা অনির্বাক, সফলতা অনিশ্চিত—দীর্ঘ পদক্ষেপ তাই অবসাদে ক্রমেই ভারাক্রান্ত। বর্তমানকে উজিয়ে হৃদর পশ্চাতে যেতে গভীর প্রবাহ চাই। ‘বনলতা সেন’-এ তানপ্রধান ছন্দ সেই অভিপ্রেত বিশাল প্রবাহ এনে দিয়েছে।

প্রত্যেক কবিতাতেই এমন এক বা একাধিক অংশ থাকে—যেখানে কবির উপলব্ধি চূড়ান্ত সামর্থ্যে প্রকাশিত হ’য়ে থাকে। নাটকে এই তুঙ্গবিন্দুটির নামই Climax; কবিতাতেও এই Climax বা আবেগচূড়া বিন্দুটি বর্তমান—যেখানে পৌছুলে কবির প্রাতিভ বিভূতিতে সমস্ত মন বিস্মিত, বিহ্বল এবং নির্বাক হ’য়ে যাবে। এ তিন কবিতাতেও তেমনি কনকমুকুটিত যে কাঞ্চনজঙ্ঘাগুলি আমি পেয়েছি, সেগুলি একে একে উদ্ধার করে দিলাম।—

(১) হে বন্ধু, আছ তো ভালো? মুখে তার চাহি

কথা বলিবারে গেছ, কথা আর নাহি।

সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দৌহাকার

তুজনে ভাবিছ কভ, মনে নাহি আর।

(২) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পরে

হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর

তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন?

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

(৩) একটি কথার দ্বিধা থর থর চুড়ে

ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী;

একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে।

থামিল কালের চির চঞ্চল গতি;

একটি পণের অমিত প্রগলভতা

মর্ত্যে আনিল ধ্রুব তারকারে ধ’রে;

একটি স্মৃতির মাহুখী দুর্বলতা

প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিলো অকাতরে ।

আর কিছু বলার নেই ।

বাঙলা সাহিত্যের কোথাও দৈন্ত থাকলেও তার কাব্যসম্পদ সংখ্যা এবং সরসতা উভয়তঃই গুণীভূত । এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন । তবু এত বিপুলতা সত্ত্বেও ‘স্বপ্নে’র মতো তীব্র রোমাটিক এবং প্রগাঢ় বাসনাঘন passionate কবিতা অতি অল্পই আমি দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের আর দেখিনি ।

গভীর ক্লাস্তির শেষে নাটোরের বনলতা সেনের নিকট যখন বিশ্রাম মিললো । তার নিবিড়তায়, তার অতলান্তিক অনিশেষ অন্ধকার আবেশে নিমজ্জিত হ’তে হ’তে এমন এক অবোধপূর্ব শান্তি আমি পেয়েছি—যা কদাচিৎই মেলে । আর, শাস্ত্রতীর প্রতিশ্রুতি কী অভাবনীয় বিরাট—মথিত হৃদয়ের মহত্তম শপথ আকাশের পানে অবিচলিত মাথা তুলে কী গভীর বিশ্বাস এবং সাহস এবং নির্ভর থেকে ঘোষণা করলো—

সে ভুলে ভুলুক, কোটি মনুষ্যন্তরে

অমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ।

১। কবি এবং কাব্য যথাক্রমে—রবীন্দ্রনাথ : কল্পনা ।

জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন । স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত : অর্কেস্ট্রা ।

২। ইতিহাসের আশ্রয় সন্ধান পলায়ন ত নয়, দোষেরও নয়—এর সম্যক চেতনা একই সঙ্গে ‘timeless’ ও ‘temporal’কে ধরতে পারে (Eliot) । জীবনানন্দ স্বয়ং এই প্রসঙ্গে বলছেন : ‘মহা বিখলোকে ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটা সঙ্গতিবোধক অপরিহার্য সত্যের মতো ।’

(৩) লক্ষণীয়, ‘স্বপ্ন’ কবিতাতেও পাখি এসেছে—‘স্বকোমল হাতখানি’র সঙ্গে তুলনায় । তবে বিস্তর পার্থক্য—একটিতে হালভাঙা দিশাহারা নাবিকের ক্লাস্ত প্রাণ একজনের চোখে দাঁকুচিনি স্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ আবিষ্কার করে । অত্যাধিক, ভ্রাম্যমাণ পথিকের কাছেই আশ্রয়ের প্রত্যাশা নিয়ে একজনের স্বকোমল হাত কুলায়প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখির মতো তার দক্ষিণ করতল খোঁজে ।

অতন্ত্র সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেন

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

এক একজন লেখক থাকেন যারা বাজার দর বুঝে, পাঠকের মনের দিকে তাকিয়ে, তাদের প্রয়োজনের জুড়ই কলম ধরেন। যখন তাদের চাহিদা থাকে তখন তাঁদের কলম তারই যোগান দিতে সতত কার্যকরী হয়। তারপর তাদের চাহিদা ফুরোলে পরে তাঁরাও যোগান বন্ধ করে দেন এবং এক এক সময় এইসব লেখকদের কর্ণধের ক্ষেত্রটিও যেন ফলনের সম্ভাবনা-হীনতায় একেবারে বন্ধাবদ্ধ প্রাপ্ত হয়। আর একদল লেখক আছেন যারা লিখে থাকেন নিজের তাগিদে, মনের আনন্দে এবং আত্মার অতুভবে। এঁদের কাছে লেখাটা থাকে সাধনার মতন—নিষ্ঠায় নিবিড় হয়ে, দৃঢ়ব্রত থেকে। এঁরা অনন্তকাল ধরে সরস্বতীর দেউল প্রাপ্তনে নৈবেদ্য সাজাতে সাজাতেই দিন কাটান। প্রসাদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, প্রাপ্তির কোন আশা না রেখে কর্ম করে যান। এইসব লেখকেরাই হলেন কর্মযোগী। এঁদের জীবনকালের নীরব ও নিভৃত কর্মকাণ্ডে উত্তরসূরীরা যে উত্তরাধিকারের সত্ত্ব কায়ম করেন তা হয় এমনই স্রষ্টার এবং স্রনিপুণ যে তা থেকে পরবর্তীকালের পাঠক ও লেখক উভয়ত পায় নিশানা নির্দেশ এবং তারও পরবর্তীকালে এই উত্তরাধিকারের সূত্র টেনে চলে। এই সাধককল্প লেখকদের প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালের ভাবী জনতা পথ চলতে প্রভূত সুবিধা লাভে ধন্ত হয়। কিন্তু এ ধরণের সাধকবৃত্ত লেখকদের সংখ্যা এতই স্বল্প যে বারোয়ারীতলার হৈ-চৈর হাটে তাঁদের কোনই নামডাক নেই। তা না থাক, তবুও যথার্থ পাঠকদের কাছে তাঁদের যে মূল্যটুকু আছে তাতেই তাঁদের মহৎ সাধনা। অন্তত কতিপয় সন্ধানীর কাছে যে তাঁরা হীরকদীপ্তি অলঙ্কারের মতন তাতেই তাঁদের আনন্দ।

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ একজন সাধকবৃত্ত লেখক। বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের তুলনা নেই। কিন্তু এই অবদানের কোনটাই স্বল্প মনোরঞ্জনী নয়। বরং সবটাই তাঁর অতন্ত্র সাধনার সিদ্ধিলব্ধ ফল।

শিক্ষাব্রতী মাত্রই স্মরণ করবেন যে বাংলা সাহিত্যের স্রনিশ্চিত কর্ণধের ক্ষেত্রটিকে আমাদের কাছে কী আশ্চর্যরকমভাবে আবিষ্কার করে দেন দীনেশচন্দ্র। গ্রায়গতি রামরত্নের অসম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাশে দীনেশচন্দ্রের লেখা ‘বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামগ্রিক ইতিহাসরূপে যে দুর্গম ও দুর্লভ পথের সন্ধান দিয়েছে তা থেকেই আমরা বাংলা সাহিত্যের ক্রমাভিসারের একটি স্রনির্দিষ্ট পথের ধ্রুব ও নিশ্চিত সন্ধান পেয়েছি। দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে। এর থেকেই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাক্ ও প্রসারের রূপটি সম্পর্কে আমরা একটি বিশিষ্ট ধারণা লাভ করতে পেরেছি। এতে বাংলা সাহিত্যের আদি থেকে উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অতুভব করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিলেন।

শৈশবকাল থেকেই দীনেশচন্দ্র তপস্চার্য। তাই তিনি তথাকথিতের মতন কোন জাগতিক

লাভের প্রতি দৃষ্টিপরায়ণ না হয়ে, বড় চাকরি, বড় খেতাবের প্রতি আসক্ত না হয়ে কবি হতে চেয়েছিলেন নতুবা ঐতিহাসিক। আর সে কাজের স্ববিধার জন্তই বেছে নিয়েছিলেন আজমকালের আচার্যের কর্মকে। কুমিল্লার স্কুলের মাষ্টারি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের কাজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ জীবনকালে কোথাও দীনেশচন্দ্র তাঁর স্বধর্মচ্যুতি ঘটতে দেন নি। আর তাই হয় তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামটি কবি না হয়ে ঐতিহাসিক রূপেই চিহ্নিত হয়ে গেল।

কবিতা লিখলে পরে দীনেশচন্দ্র প্রতিষ্ঠা পেতেন কিনা, সে বিচারের কাল এটা নয়। তাঁর কাছ থেকে কি পাইনি বা কি পেতে পারতাম তারও হিসেবে আমরা বসি নি। তিনি তাঁর সুদীর্ঘকালীন সাধনায় আমাদের কি কি দুর্লভ বস্তু দান করেছেন তারই কথা বিচারকের আসনের থেকে নয় বরং অহুরাগীর ছাতিমছায়া থেকে স্মরণ করেই ধন্য হবো।

দীনেশচন্দ্র বুঝেছিলেন যে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, পুরাণ এবং সংস্কৃতির সাথে যথার্থভাবে পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা আমাদের চিরকালের জন্তই রয়ে গিয়েছে এবং বিদগ্ধ মহলে তার যথার্থ মূল্যায়ণেরও আবশ্যকতা আছে। এ ধরনের মূল্যায়ণের বোধ প্রথম অবশ্য জাগতে দেখেছিলাম আমরা মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে। মাইকেল রামায়ণের যে মূল্যায়ণ করেছেন তারই অনিবার্য প্রকাশ মেঘনাদ বধ কাব্য। দীনেশচন্দ্র সেই মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ করেছেন দেখি তাঁর বরণ্য সৃষ্টি ‘রামায়ণী কথা’তে। গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে একখানি অক্ষয় সংযোজন। বাস্তবিক রামায়ণের এত বড় অসাধারণ ভাস্কর্যচনা আর কেউ অত্যাঁচ করেছেন বলে মনে হয় না। এ গ্রন্থটিরও বিস্তৃত ভূমিকা রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পদ্মপুরাণের এবং মনসামঙ্গলের কথাকে গল্পমাধ্যমে অল্পপম গল্পরূপে ‘বেহুলা’ গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে তাঁর রসিকমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এককালে এই গ্রন্থটি শত শত বাঙালী পাঠকের চিত্ত জয় করেছিল। চাঁদ সদাগরের ঐশ্বর্য ও ট্রাজেডি বর্ণনার নিপুণ কারুকার্যে গ্রন্থখানি সন্ধানী পাঠকের কাছে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে বলেই মনে হয়।

সতী, ফুলরা, জড়ভরত, ধরাড্রোণ ও কুশধ্বজ, মুক্তাচুরি, রাখালের রাজগি, রাগরঙ্গ, কাহ্নপরিবাদ ও শ্রামলী খোঁজা ইত্যাদি এই জাতীয় পৌরাণিক উপাখ্যান। এগুলির উৎস যেখানেই হোক না কেন, দীনেশচন্দ্রের অসামান্য গল্প রচনার কৌশলে এগুলির প্রত্যেকটিই দুর্লভ মনোহারিত্বের কোঠায় পদার্পণ করেছে।

তা ছাড়া, দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির শক্ত বিষয়কে নিয়েও দীনেশচন্দ্র রচনা করেছেন অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস। তাদের রূপ যেমন বিচিত্র আশ্বাদনও তেমনি বিচিত্রতর।

বাংলা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমান রাজশক্তির প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতা যে কতদূর তারও তথ্যযুক্ত প্রামাণিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামান্তরে নানা পরিচিত ও অপরিচিত অঞ্চলে যে সুদীর্ঘকালের কাহিনী ও উপাখ্যান ছড়ানো রয়েছে, তার ভাবনাও ভাবিত করেছিল দীনেশচন্দ্রকে এবং তারই জন্ত তিনি নিশিদিন সুদীর্ঘকাল অহুসন্ধান করে বহু অখ্যাত এবং অনামী কবির রচনা সংকলিত করে প্রকাশ

করেন তাঁর অসামান্য সংকলন-গ্রন্থ ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠকমাত্রই জানেন যে বাংলা কাব্যের স্তূপীর্ষসঞ্চারী আলোর বৃত্তে এর মূল্য কী অসামান্য! মহয়া, মলুয়া, লীলা, সোনাই, কাজলরেখা ও কঙ্কাবতীর মতন সাহসিকা নারীরাই পরবর্তীকালের লেখকদের নারীচরিত্র রচনার পথ দেখিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বীরান্দনা কাব্যের প্রাকরূপ যে এইসব গীতিকার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল এ কথা মানতে আজ আর আমাদের কোন দ্বিধাই নেই। দীনেশচন্দ্র এইসব দুর্লভ কাহিনী সংগ্রহ করে রসপিপাসু বাঙালী পাঠকের কাছে অপূর্ব দিগন্তের দুরার খুলে দিয়েছেন।

গোপীচন্দ্রের গানও এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থ। আরও এই ধরনের সংকলন গ্রন্থ হলো, ছুটিখানের মহাভারত, মাণিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্মমঙ্গল, কানীদাসী মহাভারত, কুন্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, গোবিন্দ দাসের করচা, বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদি।

বৃহৎবঙ্গ এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দীনেশচন্দ্র রচিত দুখানি বৃহৎ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ দুখানির মধ্যে তথ্য সংযোজন ও তত্ত্ব নির্দেশ থেকেই গ্রন্থকারের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশের এবং বাংলা সংস্কৃতির এত সুসংবদ্ধ ইতিহাস প্রাক্ দীনেশচন্দ্র যুগে আর কেউ রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে অবশ্য ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু টয়েনবীর মতন নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে দীনেশচন্দ্র এই যে ইতিহাস রচনা করেছেন তার মূল্য ইতিহাসের পরিখা পার হয়ে সাহিত্যের অসীমলোকেই হয়েছে উদ্ভবিত। তা ছাড়া এক অর্থে মহৎ সাহিত্য মানেই তো ইতিহাস। টলস্টয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পীস, রল্যান্ড জঁ ক্রিস্তভ, ল্যান্সনেসের ইণ্ডিপেন্ডেন্ট পিপল, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গোরা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ কি ইতিহাস নয়?

দীনেশচন্দ্রকে তথাকথিত রসিকসমাজ সম্ভবতঃ সাহিত্যিক স্বীকৃতিদানে স্তম্ভিত হবেন। কেননা তিনি জনপ্রিয় লোককান্ত শিল্পী ছিলেন না। যে কাজ তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাতে কোন সহজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না—মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বসিত প্রীতি নিবেদনও ছিল না। অর্থাগমেরও স্থযোগ তেমন ছিল না।

অনেকেই বলেছেন যে দীনেশচন্দ্র সাহিত্যিক নন। তাঁর রচনায় মৌলিক নেই। কোন নিজস্বের বিভাগ তিনি প্রথর দীপ্ত নন। এ কথা মানা গেল না। কেননা এ ধরনের বক্তাদের অনেকেই দীনেশচন্দ্রের গুটিকতক উল্লেখ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের খোঁজ নেন নি। তাঁরা জানেন না যে দীনেশচন্দ্রও প্রায় সকল সাহিত্যিকের মতনই কাব্যচর্চার ছাড়পত্র হাতে নিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন এবং একাধিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা তিন বন্ধু, গায়ে হলুদ, বৈশাখী, ভয় ভাঙ্গা, দেশমঙ্গল, আলোকে আঁধারে, চাকুরীর বিড়ম্বনা, ওপারের আলো, মামুদের শিবমন্দির, শ্রামল ও কজ্জল তাঁর সাহিত্যিক মনের পরিচয়ে বিধৃত। স্বসাহিত্যিকের প্রতিভাই তাঁর ছিল এবং বিশেষতঃ শিশুসাহিত্যিকের প্রতিভা। তা সত্ত্বেও কেন তিনি লঘুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্র ছেড়ে গবেষণার দুর্গম পথটিকেই বেছে নিয়েছিলেন, তার সন্ধান করলেই আমরা তাঁর অতন্ত্র সাধনার কথা কিছুটা অনুভব করতে পারি।

লঘুসাহিত্যিকের অভাব কোনকালেই কোন দেশে বড় একটা হয় না। তা ছাড়া বাংলা দেশের

জল-হাওয়াতে কবি-সাহিত্যিক মনের পুষ্টি হবার স্থলভ উপাদান তো যত্রতত্র ছড়ানোই রয়েছে। কলম ধরে কিছু না কিছু প্রায় প্রত্যেক বঙ্গসন্তানই রচনা করেছেন এবং ইতরজনের প্রশস্তি লাভে আপনার নির্ধারিত সীমায় হিজ কি হার হাইনেস অনেকেই হয়েছেন এই দেশে। কিন্তু বিপুল পৃথিবী ও নিরবধিকালের দরবারে তাঁদের অবদান কতটুকু রয়েছে সেটাই বিচারের বিষয়। ইতিহাস বড় নিষ্করণ। সময় বড় উদাসীন। তার মুখ থেকে সব সময় শুনতে হবে—

“ঠাই নাই, ঠাই নাই ছোট সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।”

মহাকালের কাছে কারো বড় একটা ঠাই নেই। মহাকাল মানুষকে মূল্য দেয় না। থাকে যদি তবে মূল্য পায় তাঁর রচনা। তাঁর কীর্তি। কীর্তি যন্ত্র সঃ জীবতি।

দীনেশচন্দ্রের এইসব রচনা তাঁকে কীর্তিমান করেছে কিনা, তার বিচার অতি শক্ত কর্ম। তাঁর রচনার মৌল্য কতদূর, সে বিচারের কাল আজও আসে নি। তবে এ কথা বলতে পারি, নিজস্বের গুণুযজলে সফরি হওয়ার চেয়ে জ্ঞানের অতল সিদ্ধিতে ডুবুরি হবার মূল্য নিতান্ত কম নয়। অক্ষম আলাংকারিকের চেয়ে সক্ষম জহরির মূল্য চিরকালই বেশি। তাঁর কাছে সকলেই যায়। যেতে হয়। তাই মনে হয় দীনেশচন্দ্র বাঁচবেন। বাঁচা উচিত।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যসংকলন

ইদানীংকালে বাংলা সাহিত্যে সংকলন গ্রন্থের (কাব্য, নাটক এবং ছোট গল্পের) বহুল প্রচার লক্ষণীয়। কিছু সংখ্যক প্রথিতযশা সাহিত্যিক-কবি এবং নাট্যকার—এই সংকলনকার্য বিশেষ একটি সাহিত্য প্রচেষ্টা বলে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অপরের সাহিত্যকৃতির সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা স্বকৃত সাহিত্য প্রচারণার বিশেষ স্বযোগ না থাকলেও, সংকলন সাহিত্যিক এই প্রচেষ্টার দ্বারা নিজের সাহিত্য রসবোধ ও গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। যেখানে নিজের ঢাক বাজানই এক জাতীয় সাহিত্যিকদের স্বভাবদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে, নিঃস্বার্থভাবে অপরের সাহিত্যকৃতির গ্রন্থনা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। সাহিত্য সমাজে এই ধরনের উত্তমের নিশ্চয়ই বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সে উত্তমের প্রয়োজন ও মূল্য সাহিত্য সৃষ্টির দূর প্রসারিতকালেও ফুরায়না। কারণ দেখা যায়, সব দেশেই বিচ্ছিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থই দেশের সাহিত্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। কালে কালে সংকলন-সাহিত্যিকই এই গুরুদায়িত্বভার নিজের কাঁধে বহন করেন। এবং তা করলে প্রাচীন ও সমসাময়িক সাহিত্য সমাজের কাছে যশস্বী সাহিত্যিকের নিজের ঋণও কতকটা পরিশোধ হয়। কারণ একথা স্বীকার করতেই হবে সে, সাহিত্যিকদের পরস্পরের বোধভাবনার আদান প্রদানের মাধ্যমেই সাহিত্য সাধনা সৌকর্য্যলাভ করে। যে কোন দেশের সাহিত্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই ব্যাপারটা সহজ মত বলে প্রমাণিত হবে। কাজেই ঋণ-তা সে সমকালীন বা পূর্বকালীন যে কোন কালের সাহিত্য স্রষ্টার কাছেই হোক, স্বীকার করতেই হবে। আর তা স্বীকার করলে ঋণ গ্রহীতার বিবেকে একটা কৃতজ্ঞতার দায় থেকেই যায়। সেই দায় শোধ হয় সমকালীন ও প্রাচীন দাতৃ সাহিত্যিকের সাহিত্য কীর্তির সংকলন প্রচারের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের প্রারম্ভিকাল থেকেই অবশ্য সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একদল লোককে এই ধরনের সংকলন প্রকাশে বিশেষভাবে উৎসাহী বলে দেখা গেছে। এঁদের উৎসাহ এবং উত্তোগ আত্মস্বার্থে—সাহিত্যস্বার্থে নয়। এঁরা পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ী। যেন তেন প্রকারেণ কয়েকজন সাহিত্যিকের খণ্ড রচনার একটা মালা গেঁথে, তা সে ঘেঁটু বা কঙ্কে ফুলের হোক না কেন, বিজ্ঞাপন আর কমিশনের প্রলোভনে সাহিত্যের বাজার তথা পাঠক ভোলান। এতে সাহিত্য রসিক বা সাহিত্যস্রষ্টা কারোই লাভ হয় না। শুধু ব্যবসায়ীর পকেট ভরে। কাজেই দেশের খ্যাত এবং অগ্রণী সাহিত্যিক যদি সংসাহিত্য সংকলন, সম্পাদনা ও গ্রন্থনার ভার নেন তবেই দেশের সাহিত্য-সাধনা সার্থক হয় এবং সাহিত্যের সর্বকালীন রূপটি যথাযথ প্রকাশ পায়। আশার কথা ইদানীং কিছু সংখ্যক খ্যাত সাহিত্যিক এ বিষয়ে উৎসাহী হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সংকলন ও সম্পাদনার যে উৎসাহ ইদানীং বাংলা সাহিত্য সমাজে দেখা যাচ্ছে

তা কেবল ইদানীংকালের বোধ না প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যেও এ বোধ ছিল। 'প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্যিক' বলা বোধহয় ঠিক হ'ল না। বরং 'প্রাচীনকালের বাঙালী সাহিত্যিক' বলাই বোধহয় ঠিক। কারণ সে যুগের সংকলন কৃতি উপলক্ষে আমার এই প্রবন্ধ প্রয়াস, সে যুগে বাংলা-ভাষা শিশুর গর্ভবাসকালই শেষ হয়নি বাক্য ক্ষুরণের কথা তো কাকশ্রু: পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা এই বাংলা ভাষা-শিশুর প্রথম অস্পষ্ট ও জড়িত কলকাকলির শব্দার্থ করে, সেই ভাষার উচ্চারণ রীতি-প্রকরণের নাম দিয়েছেন 'অবহট্ট'। 'অবহট্টই' বাংলা ভাষার আদি রূপ। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কথ্য সংস্কৃতের যে রূপ প্রচলিত ছিল তাই ক্রমে প্রাচ্যপ্রাকৃত রূপান্তরিত হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দির আগেই। এই প্রাচ্যপ্রাকৃত কালক্রমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে রূপ ধরেছিল তাকে বলা হয় প্রাচ্য অপভ্রংশ। এই প্রাচ্য অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপই 'অবহট্ট'। এই অবহট্টই পরে (১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) তিনটি আধুনিক আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হয়। পশ্চিমে বিহারী, উত্তর পশ্চিমে মৈথিলী, পূর্বে বাংলা-উড়িয়া। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষা জন্মাবার আগে এদেশে ভিন্ন সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কারণ সংস্কৃত ভাষা ছিল সর্বভারতীয় এবং সংস্কৃত সাহিত্য ছিল সব প্রদেশের সাহিত্যের মূলধন। প্রাকৃতের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা ভালোভাবে হলেও সে নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত। কাজেই প্রাকৃতের সাহিত্য সংকলনের কথা ভাবাও যায় না। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হবার সময়ে এবং তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত (ষোড়শ শতাব্দি পর্যন্ত) উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী লেখক প্রধানভাবে সংস্কৃতেই কবিতা, নাটক ইত্যাদি লিখতেন। এই কালের বাঙালী সাহিত্যিকদের সংস্কৃতের মাধ্যমে সাহিত্য সংকলনকৃতিই আমার প্রবন্ধের মূলকথা।

দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যে বাঙালীর লেখা ছোট বড় অনেক কাব্যের নাম পাওয়া গেছে। এবং এইকালেই সংকলন প্রচেষ্টার কিছু কিছু চিহ্নও পাওয়া গেছে। কোন কোন কাব্যের শ্লোক অল্প কাব্যে উদ্ধৃত হওয়ার প্রমাণও রয়েছে। সংস্কৃতে প্রচলিত নাটক-নাটিকা-প্রহসন ছাড়া অল্প রীতির নাট্য রচনার প্রচেষ্টাও বাংলাদেশে হয়েছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ঐ কালের বাঙালী লেখকরা সংস্কৃত রচনার অভিনব রীতির ধারক ও বাহক বলে প্রশংসা পাবার যোগ্য। সেইকালের সাহিত্যকৃতির সংকলন প্রথাও চালু হয় বলে মনে হয়, অন্ততঃ সেইকালের এবং অনতি পরবর্তীকালের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সংকলন কার্য গবেষকদের হাতে আসে। নতুন রীতির নাট্যরচনার একটি সংকলন গ্রন্থ পাওয়া গেছে-সাগর নন্দরে 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'। (পঞ্চদশ শতাব্দির আগে) তখনকার সাহিত্যিকদের রচনায় বিভিন্ন লেখকদের শ্লোক বিশেষ উদ্ধৃতির প্রথাও বেশ চালু ছিল। তাছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দির আগেই দুটি বড় কবিতা সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ ছিল। এর আগে খণ্ড কবিতা সংকলন কাজে কেউ হাত দেয়নি বলে মনে হয়। প্রাচীনতম—এই বইটির একটিমাত্র খণ্ডিত পুরোণ পুঁথি নেপালে পাওয়া যায়। পুঁথির প্রাপ্ত অংশে বইটির নাম পাওয়া যায়নি। একদা এফ্ ডবল্যু টমাস বইটির সম্পাদন করে নাম দিয়েছিলেন—'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। এর পরে অবশ্য একখণ্ড নতুন ও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়, নাম—'জ্ঞানবিতরত্নকোশ'। এই প্রাচীন পুঁথির লিপি দেখে জানা গেছে যে, পুঁথিটির লিখন খৃষ্টীয় ১২০০ সালের পরে নয়। টমাস সাহেব সংকলয়িতার নাম পান নি। সম্পূর্ণ পুঁথিখানায় নাম পাওয়া গেছে—'বিজ্ঞানকর'। বিজ্ঞানকর সংকলিত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন অনেক

কবিই যেমন, অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারি নন্দী, বহুকল্প, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীধর নন্দী, শ্রীপাশ বর্মা, সংখ্যকী ইত্যাদি। নাম দেখেই চেনা যায় এঁরা বাঙালী। যেমন, মধুশীল, বীৰ্যমিত্র, শ্রীধর্মকর, রতি পাল, বৈষ্ণু ধনু, বন্দ্যো তথাগত, বিনয়দেব, ভ্রমর দেব, লক্ষ্মীধর, ধরণী ধর ইত্যাদি। আর একটি সংকলন গ্রন্থের নাম—‘সদুক্তিকর্ণামৃত’। সংকলন সমাপ্তির তারিখ ১২০৭-ফেব্রুয়ারী, মার্চ। সংকলন কর্তা শ্রীধর দাস। এই ‘সদুক্তিকর্ণামৃতের’ অনেক লেখক বাঙালী। এঁদের মধ্যে আবার কয়েকজন রাজপুত্র, রাজমাত্য ও সাধারণ ব্যক্তি। যেমন লক্ষণ সেন, কেশব সেন, যুবরাজ দিবাকর, বাহুদেব সেন, ধোয়ী (কবিরাজ) উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাহিত্য রচনার যে রীতি প্রবণতা দেখা গেছে তার কিছু ইঙ্গিত এই খণ্ড কবিতাগুলিতে আছে। এইকালের বাঙালী সাহিত্যিকের সংস্কৃত রচনার ভাব ও রীতি পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে পুষ্ট করেছিল।

আরও পাই অমরকোষের সর্বপ্রাচীন টীকাকার সর্বানন্দকে। সংকলন কাজে তাঁরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল বলে প্রমাণ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি ‘টীকাসর্বস্ব’ লিখেছিলেন। জানা অজানা অনেক গ্রন্থ থেকে তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সাহিত্য কল্লতরু শ্রীপোবোকেবের ‘বাসনা মঞ্জরী’ থেকেও সর্বানন্দ তাঁর গ্রন্থে অনেক শ্লোক সংযোজন করেছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন বাঙালী সাহিত্যিকদের ভিতর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগেও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের রীতিমত উৎসাহ ছিল। তাঁদের এই উৎসাহ ও গুণগ্রাহীতার ফলেই তাঁরা তাঁদের যুগের সাহিত্য অল্পভাবনার বাহক হয়ে আছেন পরবর্তী হুদূর কালের মধ্যেও।

বিদ্যুৎ মৈত্র

এপার বাংলা ওপার বাংলা। শংকর। বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড। ৩৩ কলেজ রো,
কলিকাতা-২। দাম : দশ টাকা।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকালে যে দেশটা সবার আগে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতো সেই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের সোনার বাংলার আজ আর সে উজ্জ্বল্য নেই। হারিয়ে গেছে তার বিপুল ঐশ্বর্য, অতুল মহিমা আর অনিন্দিত রূপের লাভণ্য। খণ্ডিত বাংলা শ্রীহীন, অতি দীন তার রূপসজ্জা, চোখে তার গভীর ক্লান্তির কৃশতা। অথও বাংলার কথা আজ রূপকথার মত অবিস্থাস্ত, ইতিহাসের পাতায় জাহ্নবীর রাখা মমির মত প্রাণহীন। ত্রিয়মাণ বাংলা।

মৃত্যুঞ্জয়ী মস্তুর স্পর্শে অকস্মাৎ মৃত বাংলা যেন সজীব হয়ে ওঠে। অতীতের সবকিছু মহিমা নিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে উজ্জ্বল করে আবার স্ববৈশিষ্ট্যে প্রাণময় হয়ে ওঠে বাংলা—অথও বাংলা—অমৃত বাংলা। এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলে মিশে একাকার হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে যাহ্নকরের সোনার কাঠের ছোঁয়ায়। সত্যিই যাহ্নকরের মত ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী শংকর। অতি পরিচিত নাম সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে। অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’। শঙ্কর নিজেও বলেছেন—‘নানা কারণে এই বইটিকে আমার লেখক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করি।’ প্রকৃতই অতি সযত্ন ও সতর্ক পদক্ষেপ শংকরের।

‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ গ্রন্থটি কয়েকটি রচনার সমষ্টি। ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’, ‘চ্যাপেল হিল’, ‘নিউ ইয়র্কের পথে’, ‘নিউ ইয়র্কের ছধ’, ‘বাংলার রবি’, ‘অনেক দূর’ ও ‘জাপানে কয়েকদিন’—এই কয়েকটি রচনা মিলে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করেছে। প্রথম রচনার নামেই গ্রন্থের নামকরণ এবং এই রচনাটিই সবার সেবা ও আকর্ষণীয়। এই রচনাকেই কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর বাঙালীর উত্তেজনা। পরিশিষ্টে সংকলিত সাতাশখানি চিঠি তারই প্রমাণ। এই রচনার উজ্জল্যে গ্রন্থের অন্তর রচনাগুলো একেবারেই স্নান হয়ে গেছে। বিশেষত ‘অনেক দূর’ নামে বহু রচনাটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলেই ভাল হত।

‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ রচনায় পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক অবস্থার কথা, মুখ্যত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথাই শঙ্কর মনোরম ভঙ্গিতে বলেছেন। শঙ্করের এই রমণীয় রচনার জাত নির্ণয় করা সহজ নয়। ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ বক্তব্যে প্রবন্ধ, ঘটনার চমকে নাটক, চরিত্র ও বাচনভঙ্গিতে উপহাস এবং আবেগ-বিহ্বল ভাষা ও শব্দ নির্বাচনে কবিতা হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের প্রায় সব শাখার এমন সর্বজনীন সঙ্গম কদাচিত্ চোখে পড়ে। ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ শঙ্করের এক অপূর্ণ শিল্পকর্মের সার্থক নিদর্শন।

রাজনীতির কূট চক্রান্তে দেশ বিভাগ হয়েছে। বাংলাদেশ ছুঁকরো হয়ে পঙ্খ হয়ে পড়েছে। দুই বাংলার মানুষের মধ্যে আকাশচুম্বী ব্যবধান গড়ে উঠেছে। মনগড়া অনেক ভুল বোঝাবুঝিতে দুই বাংলার মানুষেরা যেন কত অপরিচিত পরস্পরের কাছে। এক নিকষ কালো আবরণ দুই দেশের মানুষের মাঝখানে। এই আবরণ সরিয়ে শঙ্কর দেখেছেন দুই বাংলার মানুষকে। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে দুই বাংলার মানুষের মনকে বা হৃদয়কে রাজনীতি কখনও বিভক্ত করতে পারে না। দু'দেশের বাঙ্গালীর গভীর অন্তর্লোকের ছবি শঙ্কর তাঁর সাহিত্যের ক্যামেরায় নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছেন।

স্বদেশ থেকে দূরে না গেলে বিচ্ছেদ না হলে যেন স্বদেশ সম্পর্কে সত্যকার দৃষ্টি, সত্যকার অনুভূতি জাগ্রত হয় না। এদেশে থেকে দেশের চিন্তা আমরা কদাচিৎ করি। বরং দূরে গেলেই দেশের কথা মন জুড়ে বসে। বিচ্ছেদেই সাধারণত মিলনের সার্থকতা অনুভব করা সম্ভব হয়। শঙ্কর স্বদেশ ছেড়ে নতুন দেশ দেখার লোভে মার্কিন মূলকে পাড়ি দিয়েছেন। মার্কিন দেশের অনেক আশ্চর্য বস্তু দেখেও তাঁর মন ভরে না। মন চলে যায় দূরে বহুদূরে তাঁর ফেলে আসা অতিপরিচিত মাতৃভূমি বাংলার মাটিতে। বিদেশে অর্থাৎ মার্কিন দেশে কয়েকজন পাকিস্তানী অর্থাৎ পূর্ব বাংলার মানুষের সংস্পর্শে এসে অথও বাংলার শাস্ত ছবি এবং দুই বাংলার সাম্প্রতিক হাহাকারের রূপ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পশ্চিম বাংলা থেকে যেন পূর্ব বাংলাতেই অধিক মর্যাদা নিয়ে বেড়ে উঠেছে শঙ্কর সেই আভাষই দিয়েছেন তাঁর রচনায়। পূর্ব বাংলার আজিজ, জিয়ায়ুল, মকবুল আমেদ, বেনেডিক্ট গোমেজের সঙ্গে কয়েকদিন অন্তরঙ্গভাবে মিশে শঙ্কর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর দরদ নিয়ে বিদেশে এর প্রচারে পূর্ববঙ্গের তরুণ তরুণীদের যে দান তা পশ্চিম বাংলার তরুণ-তরুণীদের লজ্জা দেবে। মকবুলকে বলেছেন শঙ্কর : ‘পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী হিসেবে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি লোককে লেকচার দেবার অধিকার আপনাদের আছে। মাতৃভাষার জন্তে আপনারা রক্ত দিয়েছেন—আমরা তো লোভী ব্রাহ্মণের মতো মায়ের সেবার নাম করে শুধু নিয়েই চলেছি।’

দুই বাংলার মানুষ মনেপ্রাণে এক হয়ে অথও বাংলার সংস্কৃতিকে স্খলভাবে গড়ে তুলুক। প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে বর্তমান বাংলার সংস্কৃতির রূপকে উজ্জলতর মহিমায় স্প্রতিষ্ঠিত করার আবেদন করেছেন শঙ্কর দুই বাংলার মানুষের কাছে। মকবুলের কথাকেই শঙ্কর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন : ‘হাঁড়ি আলাদা হয়েছে ঠিক হায়, এখন অন্তত দু’ভাই-এর মধ্যে সন্তাব হোক। এই খাওয়া-খাওয়িতে মরছে কে বুঝছে না? মরছে বাঙ্গালীর গান, বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর আশা।’

শঙ্কর মার্কিন দেশে গিয়ে স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। বিদেশে গিয়ে স্বদেশকে এমনভাবে আবিষ্কার ইতিপূর্বে আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই।

‘চ্যাপেল হিল’ রচনাটিতে মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কথা বলেছেন শঙ্কর বেশ সরস করে। সাংবাদিকদের মত অনেক তথ্য সংগ্রহ করে সাহিত্যিকের মত পরিবেশন করেছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মই চ্যাপেল হিল শহরের সৃষ্টি। ১৭৯১ সাল থেকে এখানে

জ্ঞানচর্চা হচ্ছে। অধ্যাপক হাওয়েল, অধ্যাপক জনসন প্রমুখ শিক্ষাব্রতীদের যে ছবি শঙ্কর তুলে ধরেছেন তা আমাদের দেশের অধ্যাপকদের বৈশিষ্ট্যনিকটা সংকুচিত করবে।

‘নিউ ইয়র্কের পথে’ রচনায় শঙ্কর মার্কিনী সভ্যতার উৎস অতি সংক্ষেপে জানিয়েছেন। মার্কিন দেশকে ‘মেলটিং পট’ বলা যেতে পারে। কয়েকশ বছর ধরে বহু বিভিন্ন দেশের মানুষ ভাগ্যান্বেষণে তাদের বৈশিষ্ট্য দিয়ে ওই দেশে উপস্থিত হয়েছে। তারপর এই ‘কড়াইয়ে সব ধাতু গলে গিয়ে মিশে’ মার্কিনী সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। ইটালিয়ান-আমেরিকান মিষ্টার ফারপো চরিত্রটি মনে রাখার মত।

‘বাংলার রবি’ রচনাটিতে আমেরিকায় সেতারবাদক রবিশঙ্করের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন শঙ্কর। রবিশঙ্কর সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যে রচনাটি সমৃদ্ধ।

‘অনেক দূরে’ রচনাটি গত ১৩৭৬ সালে শারদীয়া ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কিন দেশের পটভূমিতে এই উপন্যাসটি লেখা। শিক্ষাব্যবস্থা-বিবাহব্যবস্থা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমেরিকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথাই এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ঔপন্যাসিক স্বখ্যাত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই উপন্যাসগত কাহিনী বা বক্তব্য গড়ে তুলেছেন। স্বীয় কল্পনার ছিটেকোটা নেই বললেই হয়। ফলে উপন্যাসের স্বাদ ইতিহাসের স্বাদের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

‘জাপানে কয়েকদিন’ রচনাটি রেডিও জাপানের বাংলা প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্থানের ‘অবজারভার’ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি জামাল আমেদের বাংলা ভাষা-প্রেমের কথায় ভরপূর্ণ। জাপানীদের বিচিত্র শিল্পকর্ম ও কর্মনিষ্ঠার প্রসঙ্গ তুলে কাজকর্মে ভারতবর্ষের গাফিলতির কথা বলতেও ভোলেন নি শঙ্কর। ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অগ্ন্যাগ্ন দেশ থেকে কত পিছিয়ে আছে শঙ্কর তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যেই তার ইঙ্গিত করেছেন। অনেক সময় শঙ্করের রঙ্গ-রসিকতা বা গ্লোব-কটাক্ষ বড় মর্যাদাসিক কিন্তু সত্য চিরদিনই একটু শ্রুতিকটু।

‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’র প্রচ্ছদ ও জ্যাকেট শোভন-সুন্দর। গ্রন্থটি বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রকাশন বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

অধীর দে

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৭৭

সমকালীন

কীটসের কবিসত্তা ও সৌন্দর্যবোধ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সৌন্দর্য পূজারী ও প্রেমরসিক কবি হিসেবে কীটসের প্রসিদ্ধি সর্বজনস্বীকৃত। সৌন্দর্যের ধ্যানে ও বিলাসে এবং প্রেমের মুগ্ধতায় তার যা-কিছু কাব্যিক দর্শন-ভাবনার সূত্রপাত। এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই নতুনত্বের দাবী কোরতে পারে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে তার সৌন্দর্য-চেতনা ও প্রেমবোধের ব্যাখ্যায় একটা নতুন অন্তরীণ দিকের প্রতি কিছু আলোকপাত করা যায় কিনা সেটা সম্যক চিন্তার ব্যাপার। অনাবিষ্কৃত কোনো বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোচনার সূত্রে এখানে ১৮১৯ সালে কীটস তার প্রেয়সী Fanny Brawneকে যে পত্র লিখেছেন তার মূল্যবান উক্তির আংশিক উদ্ধৃতি কোরছি :

I have two luxuries to brood over in my walks, your
loveliness and the hour of my death. O that I could
have possession of them both in the same minute.

Letter to Fanny, 25 Jnly, 1819

সাধারণতঃ এ-জাতীয় প্রেমের উষ্ণ উত্তেজনায় যে মন্তব্য করা হ'য়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই তা তেমন গভীরভাবে অনুসৃত হতে দেখি না। প্রেমের আবেশ মুহূর্তে এই মৃত্যুকামনা যেন মনে হয় কবিরই একটা স্বেচ্ছামেজাজের কিছু নিরর্থক অতিশয়োক্তি। কিন্তু যথাযথ দৃষ্টান্তের কল্যাণে দেখানো যেতে পারে কীটসের এ আকাঙ্ক্ষার সারগর্ভ সত্যতা বাস্তবিকই ছিল এবং বিচ্ছিন্ন অজস্রতায় তার এ ছুটি অভিলাষ বিভিন্নস্থানে সক্রিয়ভাবেই কাজ করেছে। এ-ধরনের অভিমতকে প্রমাণ-সাপেক্ষ কোরতে গেলে কিছু অবাধ উদ্ধৃতিরই প্রয়োজন। পত্রাকারে যে বাসনা ব্যক্ত হোলো, তারই ফলশ্রুতি

হিসেবে রচনা কোরলেন ‘সনেট’ ওই একই সালে; নাম দিলেন “টু ফ্যানী”-। এখানে কীটসের স্বপ্ন তার প্রিয়তমার “one thoughted, never-wandering, guileless love” এবং সে প্রাপ্তি অপূর্ণ থাকা তার কাছে একসময়ে মৃত্যুরই নামান্তর বলে মনে হোলো :

Yoursell—your soul—in pity give me all,
Withhold no atom’s atom or I die,
Or living on perhaps, your wretched thrall,
Forget, in the mist of idle misery,
Live’s purposes.

(একদিকে প্রেমার্তির আত্মস্তিতা ও অসহিবৃত্তা, অত্ৰদিকে অপ্রাপ্তিতে মৃত্যুবরণের চরমবাসনা । প্রেমাত্মভবের মাহেন্দ্রক্ষণে মৃত্যুকবলিত হওয়ার এই অপূর্ণ অসাধারণ আকাজ্জ্বল প্রকাশ পেয়েছে অত্ৰ কিছু কবিতাতেও ; যেমন ‘ব্রাইট ষ্টার’ নামক সনেটের শেষপর্বে মুখাবেশের এক চরম লগ্নে মৃত্যুকে মনে হ’য়েছে এক অভিপ্রেত পূর্ণপরিণতি : “Awake for ever in a sweet unrest,/ Still, still, to hear her tender-taken breath,/ And so live ever—or else swoon to death” কিংবা ‘নাইটিংলেস গুড্’-এর এক বিশেষ উপলক্ষের প্রাক্কালে ক’টা পঙ্ক্তির আরো বেশী ত্রোতনা । সংগীতশ্রবণে আত্মগত কবির ধারণা এই মুহূর্তেই বৃষ্টি মরণবরণের শ্রেয়তম মুহূর্ত : “.....for many a time / I have been half in love with easeful Death, / Call’d him soft names in many a mused rhyme, / To take into the air my quiet breath ;/ Now more than ever seems it rich to die” দৃষ্টান্ত পরিবেশনে কিছু কার্পণ্য কোরেও বলা যায় কীটসের কবিসত্তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও এই মৃত্যু-স্পৃহার মধ্যে অন্তরগত কোনো বিরোধই নেই, একে অপরের সম্পূরক ও সম্বন্ধির কারণ ।) ‘হোয়াই ডিড্ আই লাফ্ টু-নাইট’ কবিতায় এ সত্যের স্পষ্টতর রূপ উল্ঘাটন করি : “Verse, Fame and Beauty are intense indeed, / But Death intenser—Death is Life’s high meed” মৃত্যু সম্পর্কে কবির দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ অনাবিল, তার মনোভঙ্গি ততোধিক চেতনাসমৃদ্ধ অথচ সহজ অনায়াস এবং এই স্বত্পর্শ মৃত্যু, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ‘euthanasia’ তার প্রতি কীটসের আজন্ম-দুর্বলতার এ সবই হ’ল নিদর্শন ।

এই মন্ত্রমুগ্ধ কীটস্ শুধু মাত্র সৌন্দর্য রসিকই নন, সৌন্দর্যসাধকও ; ইন্দ্রিয়মুখী প্রেমের সেবক হ’লেও তার মধ্যে উপাসনার গাভীর ছিল । (কীটসের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্ত্রেই হোক বা তার বৈশিষ্ট্য-প্রচার প্রসঙ্গেই হোক, এ কথাটা যেন অকুণ্ঠভাবেই বলতে পারা যায় যে, ইন্দ্রিয়মুখিতা তার কব্যের প্রথম ও শেষ কথা । চিন্তার গভীরতাকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রেমাবেগের প্রাবল্য, উত্তেজনাযুগ্ম জীবনের পেছনে তাই তার চিরকালীন আকুল অন্বেষণ : “O for a life of sensations rather than of thoughts” মহাকবি মিল্টনের মতামুযায়ী কবিতার সর্বযুগীয় সংজ্ঞা হলো যে তা (কবিতা) হবে “simple, sensuous, impassioned ” মনে হয় এই ত্রি-উপাদানে সার্থকভাবে সর্বাদীর্ণ পুষ্ট একমাত্র কীটসেরই কাব্যরীতি ।) অনায়াস সৌন্দর্যের উত্তম আবেগময়তায় তার এক-একটি সৃষ্টি—যেমন অজস্র ‘গুড্’-এর ভাবগাভীরে কিংবা সনেটের শৃঙ্খলিত

রূপ-ঐশ্বর্যে অথবা বর্ণনাধর্মী কাহিনীভিত্তিক কিছু কবিতার উপকরণে (যেমন 'লামিয়া', 'ইসাবেলা', 'দি ইভ অফ সেন্ট অ্যাগনেস', ও 'হাইপিরিয়ন')। আবেগশিহরণের উন্নত উপলব্ধির ও তন্ময়তার জগত নিয়ে চলেছে কীটসের কাব্যসৃষ্টি; তার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বোধকরি কবি ও কবিতা ঐকান্তিকরূপে একা।) বন্ধু Reynoldsকে লিখিত একটি চিঠির কিছু অংশে: "I find I cannot exist without poetry—without eternal poetry—half the day will not do it……" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ উক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে এই যে, কাব্য ও কবিসত্তার মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, অবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন। তেমনই একই গ্রন্থিতে সম্পূর্ণ কীটস ও তার আভিজাত্যে লালিত সৌন্দর্যবোধ।

(আগেই উল্লেখ করেছি, যে কীটস স্পর্শগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গম্য পার্থিব জগতের 'Bard of Passion', তার মধ্যে কেবলি যে সৌন্দর্য্যপ্রেমিকতা ছিল তাই নয়, ছিল সে স্বন্দরের অনুধ্যান ও আরাধনা। সমকালীন স্বগোষ্ঠীয় কবি শেলী-কে লিখিত এক পত্রের একটা মন্তব্যের ওপর কিছু গুরুত্ব দেওয়া যাক: 'My imagination is a monastery, and I am its monk.' কীটসের কবিসত্তার আন্তর উপলব্ধিতে এ এক বিশ্বয়কর উক্তি। সৌন্দর্য, তা মানবিক বা প্রাকৃতিক যাই হোক, তাকে উপাস্ত ও আরাধ্য হিসেবে দেখেছিলেন কবি এবং যোগ্য সমালোচক H. Crump কীটসের সৌন্দর্য্যবোধের উল্লেখে একেই বলছেন 'the existence of the spiritual essence'. স্বন্দরের অগুরুত্বকে হৃদয় দিয়ে অনুভবের প্রগাঢ়তায় তার কাব্যের যেমন সৃষ্টি, তেমনি সময়ান্তরে অনুভব না কোরে স্থির মৌন মেজাজ তাকে নিয়ে সমাহিত হওয়ার এই যে 'priestlike task', তা সম্ভব হোলো শুধুমাত্র কীটসের মতই 'nature's patient, sleepless Hermit'—এর পক্ষে।) 'ওড্ টু সাইকী'-র মধ্যাংশেও এই সাধনাগত সৌন্দর্য-উপলব্ধির অকিঞ্চন: 'Yes, I will be thy priest, and build a fane/In some untrodden region of my mind.' কিংবা পরবর্তী পঙ্ক্তিতে 'And in the midst of this wide quietness/A rosy sanctuary will I dress' ইত্যাদি। অল্প কিছু উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে যে প্রবণতাটুকু স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে তা হল সৌন্দর্যের সঙ্গে কীটসের ঐকান্তিক আত্মীয়তা ও আত্মবিলীনতা। মরণেচ্ছা নিয়ে চেতনার প্রস্তুতিতে উপভোগের উদ্ভাপ তার কাছে ক্রমাগত প্রজ্বলিত হয়েই উঠেছে এবং এ ছয়ের মাঝখানে কোনো সম্ভাব্য বিরোধ না থাকায় সবকিছু একত্রিত হয়ে কীটসের মধ্যে সৌন্দর্যের বেদীপ্রান্তে উৎসর্গিত হবার আর্তিটাই প্রবলতর হয়ে উঠল। হয়ত বা বলা যায়, অকালমৃত্যু অনিবার্য ছিল বলেই তার প্রতি কবির এই সহজাত দৌর্বল্য। আলোচনার এই স্তরে Middleton Murry-র বক্তব্যকেই একটা যথাযোগ্য স্থান দেওয়া যেতে পারে: 'Beauty in all things, this was Keats's great poetic intuition, and revelation of this beauty, the great human purpose to which he dedicated himself and for which he was prepared to die.'

শেষপর্যায়ের আলোচনায় কীটসের সৌন্দর্য-সংবেদন প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখ না থাকলে মনে হবে তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর একাংশই অব্যাখ্যাত রইল এবং তা হল এই যে উপলব্ধির ক্রমউত্তরণের সংগে সংগে তার সৌন্দর্য্যভিলাষ হয়ে উঠেছে সত্য্যবোধ, নিবিড় অনুভবের পরম

বিশ্বাসে সত্য হৃদয় ও হৃদয় সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'ওড্, অন্ এ গ্রীসিয়ান আর্ন'-এ। এই একান্ত সত্য-হৃদয়ের প্রেরণাতেই তার দৃষ্ট ঘোষণা 'For it is the eternal law/That first in Beauty should be first in might.' পত্রাকারে এসবের সমজাতীয় চেতনা আরো স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে। ১৮১৭ সালে বন্ধুবর বেইলী-কে লিখছেন :

'What the Imagination seizes as Beauty must be Truth—whether it existed before or not,—for I have the same idea of all our passions of Love: they are all, in their sublime. creative of essential Beauty.

Letter to Benjamin Bailey' 22 Nov. 1817

কিংবা সত্য ও হৃদয়ের সন্ধি ও ঐক্যস্থাপনে তার অহুভূতি যেন আরো ঘনীভূত হয়েছে ১৮১৯ সালে, বলেন : 'I can never feel certain of any truth but from a clear perception of its beauty.' কীটসের কাব্যিক দৃষ্টিতে তাই অক্ষয় সৌন্দর্য হল শাস্ত সত্যেরই নির্ণায়ক ও স্পর্শমণি এবং এ দুয়ের একীকরণকে আরো অনবদ্য করেছে আনন্দের সম্মেলন। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের ধারায় মুক্ত ভিক্টোরীয় যুগের অগ্রতম কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের (১৮২২-১৮৮৮) মন্তব্যে এ প্রবন্ধের স্তূপ উপসংহার করা চলে :

'To see things in their beauty is to see things
In their truth, and Keats Knew it.....And.
With beauty goes not only truth joy goes with
her also ; and this too Keats saw and said,
As in the first line of his Endymion it stands
Written

'A things of beauty is a joy for ever.'

এ হল কীটসের বাণী-জীবনের জীবনবাণী।

আচার্য যত্নাথ সরকার

গৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গের রাজশাহী জেলার করচমারিয়া গ্রামে যত্নাথের জন্ম হয়। পিতা রাজকুমার সরকার আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রাজকুমার অতিশয় পাঠানুগামী ছিলেন, স্বগ্রহে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট পাঠাগার ছিল। নিজের পাঠাগারের জগৎ বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যত্নাথ পিতার তৃতীয় পুত্র। পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য পাঠশালায় পিতার তত্ত্বাবধানে যত্নাথের বিদ্যারম্ভ হয়। ৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। অল্পকিছুকালের জগৎ যত্নাথ কলিকাতার হেয়ার স্কুল ও সিটি কলেজিয়েট স্কুলেও অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যত্নাথ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজ হইতে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই দুই পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের জগৎ তিনি প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তির অধিকারী হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যত্নাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে ইতিহাস ও ইংরাজী এই উভয় বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লইয়া তিনি ইংরাজীতে এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। এই পরীক্ষায় তিনি শতকরা ৯০ ভাগ ‘মার্কস’ পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ‘রেকর্ড’ স্থাপন করেন। ছাত্রজীবন অন্তে যত্নাথ ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথমে রিপন কলেজে ও পরে বিদ্যাসাগর কলেজে (তৎকালীন নাম মেট্রোপলিটন কলেজ) ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে কার্য করেন। বাল্যে পিতার পাঠাগারে বসিয়া যত্নাথ বহু ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তরে ইতিহাসপ্রীতি জাগ্রত হয়। বি. এ. পাঠকালেও ইতিহাস তাঁহার অত্যন্ত পঠ্য বিষয় ছিল। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর টিপ্পনুলতান সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গলায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। কলেজে অধ্যাপনা কালেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের জগৎ চেষ্টা করিতে থাকেন। তৎকালে এই বৃত্তিলাভের জগৎ একাধিক পরীক্ষা দিতে হইত। এই বৃত্তিলাভের জগৎ শেষ পরীক্ষায় একটি নূতন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতে হইত। যত্নাথ এই পরীক্ষার জগৎ সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন বিষয়টি নির্বাচিত করেন। আওরঙ্গজেবের জীবনী রচনার উপাদানগুলি প্রধানতঃ ফার্সী ভাষাতে লিখিত থাকায় তিনি সময়ে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন ও প্রচুর অর্থব্যয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বডলিয়ন লাইব্রেরী এবং প্যারী, লিসবন, বার্লিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় স্থান হইতে পুঁথিপত্রের অঙ্কলিপি, ফটোকপি প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। দিল্লী, রামপুর, লাহোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মুসলিম শক্তিকেন্দ্রগুলি হইতেও তৎকর্তৃক প্রচুর পুঁথিপত্র ও তথ্য আহৃত হয়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর “আওরঙ্গজেবের সময় ভারত” শীর্ষক তাঁহার গ্রন্থটি ইংরাজীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থা, পথঘাট, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতির বিশদ বিবরণ প্রচুর পরিসংখ্যানসহ সন্নিবিষ্ট হয়। এই নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে

যত্নাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি অর্জন করেন। যত্নাথের প্রথম রচনা এই বহু মূল্যবান গ্রন্থটি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া যত্নাথকে ঐতিহাসিকরূপে বিশ্বসমাজে স্মৃতিষ্ঠিত করে।^১ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পর যত্নাথ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজীর লেকচারার নিযুক্ত হন। এক বৎসর পর তাঁহাকে পাটনা কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে পাটনা যাইতে হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্পকালের জন্ত যত্নাথ কলিকাতায় বদলী হন। এই বৎসরই তিনি পুনরায় পাটনা কলেজে ফিরিয়া যান ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য করেন। ইহার পর দুই বৎসর কালের জন্ত তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুরোধক্রমে বিহার সরকার দুই বৎসরের জন্ত যত্নাথকে এখানে অধ্যাপনার অহুমতি দান করেন। এতদিন যত্নাথ প্রাদেশিক সার্ভিসে অল্প বেতনে কার্য করিতেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যত্নাথকে ভারতীয় এডুকেশন সার্ভিসে (I. E. S.) উন্নীত করা হয়। যত্নাথের মত লব্ধকীর্তি ঐতিহাসিককে যোগ্য সম্মান দানের জন্তই তাঁহাকে I. E. S. পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এই বৎসর তিনি কটকের রাভেনশ কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্যে যোগদান করেন। চার বৎসর এখানে থাকার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যত্নাথ পুনরায় পাটনা কলেজে স্থানান্তরিত হন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যত্নাথ সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড লিটন তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। দুই বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত যত্নাথ এই দায়িত্ব বহন করেন (১৯২৬-২৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার জন্ত অতি কঠোর মনোভাব অবলম্বন করায় স্বার্থায়েষী ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হয় ও তিনি যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্বার্থবাহী দাস-মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি এই অপবাদ প্রচার করিতে থাকে। সুলভ জনপ্রিয়তার মোহে যত্নাথ তাঁহার কর্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই। দৃঢ়হস্তে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতি ও জড়তামুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। সরকারী অনুরোধ সত্ত্বেও যত্নাথ দ্বিতীয়বার এই পদ গ্রহণ করেন নাই। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ—এই ত্রিশ বৎসর কাল যত্নাথ স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চা করিয়া যান। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উচ্চপদে আসীন থাকিলে তাঁহার ইতিহাস সাধনা ব্যাহত হইবে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আওরঙ্গজেবের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যত্নাথ যে নিবন্ধ (থিসিস) প্রস্তুত করেন তাহার জন্ত তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বহু তথ্য, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত উপকরণ তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই উপাদানগুলির ভিত্তিতে তিনি আওরঙ্গজেবের জীবনবৃত্ত লইয়া একটি নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “গ্রীফিথ পুরস্কার” লাভ করেন। আওরঙ্গজেবের জন্মকাল হইতে রাজ্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ কাল পর্যন্ত এই নিবন্ধে আলোচিত হয়। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস লিখিতে লিখিতে তিনি জানিতে পারেন যে জয়পুর

রাজদরবারে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বহু নথিপত্র অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। যত্ননাথ বহু পরিশ্রমে এই কীটদষ্ট জীর্ণ নথিপত্র অধ্যয়ন করিয়া ইহা হইতে এবং অত্যাগত সূত্র হইতে বহু তথ্য আহরণ করেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিচিত্র জীবনী সমগ্রভাবে বিবৃত করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার রচিত আওরঙ্গজেবের জীবনী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।^{১২} ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যত্ননাথ আওরঙ্গজেব সম্বন্ধীয় জনসমাজে প্রচারিত কাহিনীগুলি অপ্রকাশিত ফার্সী পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।^{১৩} ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আওরঙ্গজেবের পাঁচ খণ্ড জীবনী লিখিয়াও যত্ননাথ ক্ষান্ত হন নাই। আওরঙ্গজেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন^{১৪, ১৫}। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া যত্ননাথ অতি উত্তমরূপে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাটনায় অবস্থিত খুদাবক্স ওরিয়েন্টেল পাবলিক লাইব্রেরীর আরবী ও ফার্সী পুস্তক সংগ্রহ তাঁহার এই বিশেষ অধ্যয়নে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ব্যতীত ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় যত্ননাথ ইতিমধ্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাতি, উর্দু, মারাঠি, অসমীয়া ও গুরুমুখী ভাষাতেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। আওরঙ্গজেবের জীবনী রচনা করিবার কালে যত্ননাথের পক্ষে মারাঠা জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে যত্ননাথ মারাঠি ভাষা অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। মারাঠা ও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে তিনি তেরোবার সমগ্র মহারাষ্ট্র ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করেন। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শনের জন্ত ন্যূনপক্ষে চল্লিশবার তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যত্ননাথ সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই মহাশয়ের (১৮৬৫—১৯৫৯) সহিত পরিচিত হন। এই পরিচয় স্মৃতিচরিত্রায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। যত্ননাথ সরদেশাইকে ফার্সী ভাষার নথিপত্রের সন্ধান দিতেন ও তাঁহার নিকট হইতে মারাঠি ভাষার নথিপত্রের সন্ধান লইতেন। ভারতের এই দুই ধুরন্ধর ঐতিহাসিক আজীবন পরস্পরের সহযোগী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠার ইতিহাস সম্বন্ধে যত্ননাথের প্রথম গ্রন্থ ‘শিবাজী’ও তাঁহার সময় প্রকাশিত হয়।^{১৬} ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর বংশধরগণ সম্বন্ধে যত্ননাথ আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।^{১৭} শিবাজী তথা মারাঠা জাতির ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া যত্ননাথকে আটটি ভাষায় লিখিত নথিপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

Willam Irvine নামে একজন পদস্থ রাজকর্মচারী (আই. সি. এস.) Later Moghuls আখ্যায় মুঘল যুগের অন্তিমকালীন ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তক রচনা হইবার পূর্বেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Mr. Irvine-এর সহিত যত্ননাথ পরিচিত ছিলেন। Mr. Irvine এর কন্ঠার অল্পরোধে যত্ননাথ এই অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। যত্ননাথ মূল রচনাটি সম্বন্ধে সংশোধিত করেন এবং স্বয়ং ইহাতে তিনটি অধ্যায় সংযোজন করিয়া গ্রন্থের ঘটনা কাল আরও ৩২ বৎসর অর্থাৎ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কাল পর্যন্ত প্রসারিত করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বিশেষভাবে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ইহার স্তুতি সম্পাদন ও সংযোজনের জন্ত যত্ননাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন।^{১৮} Mr. Irvine-এর গ্রন্থ সম্পাদন করিতে গিয়া

যদুনাথ আওরঙ্গজেবের পরবর্তী কাল সম্বন্ধে ফার্সী, মারাঠি, রাজস্থানী, গুজরাতী ও গুরুমুখী ভাষায় প্রচুর তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহ করেন। এইগুলির সদ্যবহার মানসে তিনি স্বয়ং মুঘল যুগের ভারত, মুঘলদের রাষ্ট্রনীতি ও মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন^{১, ১০, ১১}। যদুনাথ রচিত মুঘল সাম্রাজ্যের পতন^{১২} পুস্তকটির প্রথম খণ্ড ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার শেষ ও চতুর্থ খণ্ডটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই চারি খণ্ড পুস্তকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল হইতে শাহু আলমের কাল পর্যন্ত (১৭০৭—১৮০৩) ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শাহু আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর ‘দেওয়ানি’ প্রাপ্তির সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হয়। এই চারি খণ্ড পুস্তকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, মারাঠাশক্তির অভ্যুদয় ও পতন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান কথাশিল্পী স্তম্ভ কুশলতার সহিত অতি আকর্ষণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যদুনাথের কোন পুস্তকই শুধু তথ্যাবলীর নীরস সঙ্কলনে পর্যবসিত নহে। তাঁহার প্রতিটি পুস্তক ভাষার বিগ্রাস ও আকর্ষণীয়তার গুণে পাঠকের নিকট বিশেষ স্মরণার্থ্য। যদুনাথের লিখনশৈলী গিবন বা মেকলের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হওয়ার জন্য ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল শাসনকালে-বিহার ও ওড়িশার অবস্থা সম্বন্ধেও যদুনাথের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়^{১৩}। এই গ্রন্থে বাংলায় ও বিহারে মারাঠা আক্রমণ ও উপদ্রবের কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মারাঠা ও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনা ব্যতীত যদুনাথ কর্তৃক কয়েকটি মূল্যবান দলিলপত্র ও পুস্তক সম্পাদন এবং অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (১৩—১৬)। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে Indian Aistonical Records Commission গঠন করেন যদুনাথ ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই কমিশনের সূচনাকাল হইতে-১৯৪১ পর্যন্ত তিনি ইহার সদস্য ছিলেন। কয়েকবারই যদুনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির কার্যও পরিচালনা করেন। তাঁহার চেষ্টায় শুধু সরকারী দলিলপত্র সংরক্ষণ নহে ঐতিহাসিক মূল্যযুক্ত, ব্যক্তিবিশেষের মালিকানায় রক্ষিত দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কর্মসূচীও কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়। এই কর্মসূচী গৃহীত হওয়াতে বহু দলিলপত্র সরকারের অধিকারে আসে এবং ঐতিহাসিকদের গবেষণা কার্যে সহায়তা করে। ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের মুদ্রিত কার্যতালিকায় (Proceedings) যদুনাথ লিখিত পাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। [The Missing links in the history of Mughal India from 1658 to 1761, 1920; Shivaji in Madras-Karnatak 1924; Historical Records Relating to Northern India 1700—1817, 1925; The House of Joipur 1929; General De Boigne 1938].

তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার নিমিত্ত দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য যদুনাথ ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সভাপতি রূপে যে সব পরিকল্পনা করেন সেগুলির অধিকাংশই কার্যকরী হয়। একদল যুবককে ইতিহাস চর্চা দিবার জন্য মারাঠা ঐতিহাসিক গোবিন্দ সরদেশাইর সহযোগিতায় তাঁহারই বাসগৃহে পুণার নিকটবর্তী কামসেটে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ একটি ‘পাঠগোষ্ঠী’ (seminor) স্থাপন করেন। এই পাঠগোষ্ঠীতে যদুনাথ ও

সরদেশাই যে সব ছাত্রকে ইতিহাস গবেষণায় দীক্ষিত করেন—ইহাদের শিষ্যরাই বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে আসীন রহিয়াছেন। ভবিষ্যৎ গবেষক ও ছাত্রদের সুবিধার জন্তই মুসলমান শাসনকালের নথি-পত্র, পাণ্ডুলিপি, পুস্তক প্রভৃতির সমবায়ে গঠিত একটি পাঠ্যভবন প্রতিষ্ঠার জন্ত যদুনাথ তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ও উত্তর সাধককে অল্পপ্রেরণা দান করেন। যদুনাথের উৎসাহ ও নির্দেশে মধ্যপ্রদেশের সীতামৌ রাজ্যের কুমার রঘুবীর সিংহ তাঁহার পূর্বপুরুষোপার্জিত বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস গবেষণার জন্ত প্রয়োজনীয় মুদ্রিত পুস্তক, নথি-পত্র ও পাণ্ডুলিপির এক বিরাট সংগ্রহসহ এক পাঠ্যভবন গড়িয়া তুলেন। বর্তমানে ডঃ রঘুবীর সিংহ প্রতিষ্ঠিত সীতামৌস্থিত এই পাঠাগারটি বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্যে এই বিশ্বে অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইদানীং কালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এইরূপ একটি সুসম্পূর্ণ পাঠাগার আর স্থাপিত হয় নাই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয় যদুনাথ তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন নাই। ইতিহাস চর্চাই যদুনাথের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল অল্প কর্মক্ষেত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। স্বদেশী যুগে সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও যদুনাথ একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে বৃটিশ জাতির শাসনে বিশেষতঃ করনীতির পীড়নে ভারতবর্ষ দিনে দিনে ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্গতির কবলে পতিত হইতেছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ এই পুস্তকে বহু পরিশ্রম করিয়া যে সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থিত করেন—বৃটিশ অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরাও তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এই পুস্তকটি জনসমাজে বিশেষতঃ দেশের তরুণগণ কর্তৃক এতদূর আদৃত হয় যে কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার চারিটি সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল (১৭)। বঙ্গলার প্রেমেরঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ ইংরাজীতে একটি অপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধন দিব্য জীবন চিত্রটি বিদেশীয় ভাষায় এত সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত রূপে কেহই এযাবৎ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। ভারত-হিতৈষী দীনবন্ধু চার্লস ফ্রেয়ার এণ্ড্রুজ এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন : “A work of surpassing value, full of human interest from beginning to end”। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ ভিন্ন আখ্যায় প্রচারিত হয় (১৮)। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে যদুনাথ স্বয়ং বৈষ্ণব পরিবারের ধর্মীত্ব পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। উদারপন্থী হইলেও যদুনাথের পিতা রাজকুমার সরকারের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠা প্রবল ছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে যদুনাথ ধর্ম সাধনা করেন নাই কিন্তু ধর্মভাব তাঁহার জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত ছিল। নীতিপরায়ণতাই তাঁহার জীবনের ধর্ম ছিল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই ভাষণগুলি “যুগে যুগে ভারত” নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আর্যদের ভারত আগমনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়ের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচিত হইয়াছে (১৯)। এই স্মরণীয়কালের মধ্যে জাতির উত্থান ও পতনের কারণগুলি তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। নিজের গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও যদুনাথ cambridge History of India নামক অতি প্রামাণ্য আকর গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করেন।

এই গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডের চারটি অধ্যায় তাঁহার দ্বারা রচিত হয় (২০)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ডটিও যদুনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ছাদ্বিশটি অধ্যায়ের মাঝে দশটি অধ্যায় প্রায় দুই শতাব্দিক পৃষ্ঠা ও গ্রন্থপঞ্জী যদুনাথ বহু পরিশ্রমসহ রচনা করেন (২১)। যদুনাথ রচিত অধ্যায়গুলিতে ১৫৫৫ হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের শেষখণ্ডের উপসংহার করিতে গিয়া যদুনাথ লিখিয়াছেন যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ে দেশের সর্বনাশ হইয়াছিল এই ধারণা ঠিক নহে, এই যুগ-সন্ধি দেশকে এক নূতন সম্ভাবনার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এই যুগ-সন্ধি বাঙ্গালীকে জাতীয় ভাবনায় উদ্বীণ করিয়াছিল। অতঃপর বাঙ্গালী জাতি ধীরে ধীরে স্বাধীনতা প্রাপ্তিরূপ একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যের পথিক হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কতৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন ও এই গ্রন্থরচনাকালে বাঙ্গলাদেশ সাম্প্রাদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতিক নেতৃত্বদ্বারা শাসিত হইতেছিল। অকুতোভয় যদুনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি তীব্র ভাষায় বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমালোচনা করেন। বাঙ্গালী হিন্দুলেখক বিশেষতঃ নাট্যকারেরা সিরাজউদ্দৌলাকে যেভাবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা প্রেমিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন তাহারও তিনি নিন্দা করেন। যদুনাথ যখন আওরঙ্গজেব সম্বন্ধীয় গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ রচনা করেন তখন ইংরাজ শাসকদের প্ররসে মুসলিম সাম্প্রাদায়িকতাবাদের অভ্যুদয় হইতেছিল। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সরকারী চাকুরী এই গ্রন্থ প্রকাশে ক্ষুব্ধ হইতে পারে বন্ধুজনের এই সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আওরঙ্গজেবের জীবনী পাঁচখণ্ডে প্রকাশ করেন। আওরঙ্গজেব বহুগুণায়িত পুরুষ ছিলেন, যদুনাথ তাঁহার গ্রন্থে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু গ্রীক নাট্যের নায়ক যেমন এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ধাবমান হয়, আওরঙ্গজেবও তেমনি ভাবে নিজের ও মোগল সাম্রাজ্যের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াও যদুনাথ ইসলাম ধর্মের রক্ষক হিসাবে আওরঙ্গজেবের হিন্দু-প্রজা বিদ্বেষী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। যাহারা আওরঙ্গজেবকে আদর্শ নৃপতি বলিয়া মনে করিতেন যদুনাথের যুক্তিগুলি তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। হিন্দু নিপীড়নের নীতি গ্রহণ করিতে গিয়া আওরঙ্গজেব স্বসম্প্রদায়িকভাবে রাজধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রবলতম প্রতিবন্ধী শিবাজী সম্বন্ধেও যদুনাথের অতিমত প্রণিধান যোগ্য। মারাঠা ঐতিহাসিকেরা অন্ধ জাতীয়তাবাদ প্রণোদিত হইয়া শিবাজীকে অতি মানবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যদুনাথের মতে শিবাজী একজন অনগ্র সাধারণ পুরুষ ছিলেন এবং সমসাময়িক কালে সকলকে ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন যে যুগ যুগান্তের পরাধীনতা শৃঙ্খল হিন্দুজাতির আত্মাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে না। উপযুক্ত নেতৃত্ব পাইলে হিন্দু-জাতির মহিমা আবার আকাশ স্পর্শী হইতে পারে। শিবাজীর লক্ষ্য উচ্চ হইলেও তাঁহার সাফল্য সূচিরস্থায়ী হয় নাই এবং তিনি মারাঠা জাতিকে স্থায়ীভাবে একদৃঢ় সূত্রে বন্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধরগণ এবং পেশোয়ারাও মারাঠা তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর চরিত্রে এক ছুরপনয় কলঙ্ক আরোপ করেন। ইহা হইতেছে শিবাজী কর্তৃক শত্রুসেনাপতি আমন্ত্রিত অতিথি আফজল খাঁকে আলিঙ্গনছলে ‘বাঘনথ’ দ্বারা হত্যা। যদুনাথ তাঁহার গ্রন্থে ইহা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেন যে শিবাজী পূর্ব হইতেই আফজল খাঁর দুর্ভিক্ষবৃত্তে পারিয়া আপংকালে আত্মরক্ষার্থ ‘বাঘনথ’ সহ আফজলকে অভ্যর্থনা করিতে যান। আফজল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গনছলে বক্ষে ধরিয়া নিজের কটিলগ্ন ছুরিকা বাহির করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হওয়া মাত্র, শিবাজী তাঁহার ‘বাঘনথ’ বাহির করিয়া অত্যন্ত আফজলের বুকে বসাইয়া দেন। আফজল খাঁর নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্তই শিবাজী তাঁহাকে হত্যা করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত অপ্ৰকাশিত ফার্সী দলিলের ভিত্তিতেই যদুনাথ শিবাজীর এই কলঙ্কটি স্থালন করিয়াছিলেন। শিবাজীপূর্ববর্তীকালীন মারাঠানায়কদের নিপীড়ন ও অত্যাচার যদুনাথ কর্তৃক তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছিল। মারাঠা জাতির ইতিহাস রচনায় যদুনাথ এই বলিয়া গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে এই জাতির অভ্যুত্থান এক মহৎ সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছিল কিন্তু মারাঠা জাতি নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, চরিত্র শৈথিল্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ত এই স্বর্ণযুগ হেলায় হারাইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি পথে তাহাদেরই প্রাপ্য ছিল। পেশোয়ারদের ইতিহাস গৃহযুদ্ধের এক কলঙ্কিত অধ্যায় মাত্র। পতনের যুগে মারাঠাগণ যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিল, উত্তরভারতের প্রজাগণ তাহার স্বরূপ অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। ইহা মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দু-নিপীড়নের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কমভয়াবহ ছিল বলিলে ভুল করা হইবে।

যদুনাথের মতে মুঘলসাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়ের কালে ভারতীয় সমাজ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছিল। স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্তি, অকর্মণ্যতা এবং অদূরদর্শিতা সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই ছিদ্রপথেই ইংরাজ শাসন এদেশে অল্পবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ শিবাজী সম্বন্ধে আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। (২২) ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের নবাবগণ সম্বন্ধে যদুনাথের একটি গ্রন্থও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। (২৩) ফার্সী ঐতিহাসিকদের বিবরণের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি রচিত।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ—এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া যদুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কালের ইতিহাস স্পষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বহু গ্রন্থ রচনা দ্বারা জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। মুঘল ও মারাঠা শক্তির পতন ও বৃটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের ইতিহাস বিশাল পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত উদ্ঘাটনের জন্ত যদুনাথের কীর্তি চিরস্মরণীয়। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁহাকে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইতে পারে। নিজের মত উপস্থাপনের জন্ত যদুনাথ কখনও অসত্য বা অহুমানের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ব্যক্তিবিশেষ বা কোন বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য বিচারে স্পষ্টকলিত সনাতন নীতি বোধ্য ছিল যদুনাথের একমাত্র মানদণ্ড। নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতেই তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও ইতিহাসের পাত্র পাত্রীদের মূল্যায়ন করিয়া গিয়াছেন। সত্য-সম্মতার গুণেই যদুনাথ বিশ্বের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মণ্ডলীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিতে পারিয়াছিলেন। ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রান্ত হয়। দেশপ্রেমিক যদুনাথ দেশের প্রতিরক্ষার চিন্তায় বিশেষ বিচলিত হন। দেশরক্ষার জন্ত কি কি ব্যবস্থা প্রয়োজন, কেমন করিয়া দেশে উপযুক্ত সংখ্যক সেনানীর স্বশিক্ষণের ব্যবস্থা হইতে পারে এই সব বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করিতে থাকেন। মুঘল ও মারাঠা—এই দুই অতি শক্তিশালী শক্তি কি ভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিদেশীর দ্বারা পদানত হইয়াছে—ইহা তিনি ভারতের যে কোন রাষ্ট্রনায়ক অপেক্ষা অধিকভাবে জানিতেন। দেশবানীকে দেশরক্ষার শিক্ষা দিবার জন্ত যদুনাথ ৮২ বৎসর বয়সে ভারতের সামরিক ইতিহাস নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন, ইহার কয়েকটি অধ্যায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড” সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যদুনাথের মৃত্যুর পর এই রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (২৪)। এই পুস্তকে যদুনাথ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে আলেকজেন্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংঘটিত প্রায় আঠারটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধের যথার্থ বিবরণ দিয়াছেন। এই গ্রন্থে কয়েকটি মানচিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয়দের পরাজয়ের কারণগুলিও তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মারাঠা ও মুঘলদের রণকৌশলও এই গ্রন্থে বিশদভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় যদুনাথের অভীষ্ট এই ছিল যে নবীনভারত অতীতের পরাজয়ের কারণগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর হউক। অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি যেন সর্বতোভাবে পরিহার করা হয়। দেশরক্ষার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ও সমরনীতির ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বিধায় ভারতীয় সময় শিক্ষণ শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি যদুনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাদের আমন্ত্রণে যদুনাথ সমরশিক্ষা শিক্ষণ বিভাগে রণকৌশল সম্বন্ধে কয়েকটি ভাষণ দেন। এই ভাষণগুলি শ্রবণ করিয়া সময়-শিক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ সেনানীগণও এই বিষয়ে যদুনাথের প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যান। একজন অসামরিক ব্যক্তি যিনি কখনও যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই তাঁহার পক্ষে বিশ্বের সকল উল্লেখযোগ্য রণক্ষেত্রে যুযুধান পক্ষগুলি কোন রণনীতি অবলম্বন করিয়াছিল, বিজয়ীপক্ষ কেন সাফল্যলাভ করিয়াছিল, অপর পক্ষ কোন কারণেই বা পরাজয় বরণ করিয়াছিল—এই ব্যাখ্যান উপস্থিত শ্রোতাদের বিস্ময় উদ্বেক করে। শেষ জীবনে তাঁহার আত্মজনের অল্পরোধ করিতেন যেন তাঁহারা তাঁহাদের অন্ততঃ একটি সম্ভানকেও সমরবিদ্যা শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেন। যদুনাথের একটি প্রিয় পোতা সমরশিক্ষা লাভ করিয়া একটি দুর্ঘটনার ফলে অকালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাতে তিনি অতিশয় আঘাত পাইলেও সমরশিক্ষা দান সম্বন্ধে তাঁহার উৎসাহ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। যদুনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত ভারতের ধর্মোতিহাস সংক্রান্ত একটি পুস্তক দর্শনামী নাগা সম্প্রদায়ের ইতিহাস নামে প্রকাশিত হয় (২৫)।

ইংরাজী সাময়িক পত্রে যদুনাথের প্রায় দুইশতটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যেও Modern Review, Bengal past and present, Hindusthan Standard, Statesman, Journal of the Asiatic Society প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যদুনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই যদুনাথ তাঁহার কয়েকটি ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ন রিভিউ

পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের সংখ্যা আঠার। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত যদুনাথ বিশেষ সখ্যতা স্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের প্রয়াসে যে কয়জন মুষ্টিমেয় বিশিষ্ট ব্যক্তি যদুনাথকে সমর্থন করেন—রামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ১৯০৭ হইতে ১৯৫৩ পর্যন্ত যদুনাথ মডার্ন রিভিউ এর জন্ত মোট ষাটটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইতিহাস ব্যতিরিক্ত সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-চিন্তা, স্মরণীয় জীবনী প্রভৃতি এইসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল।

যদুনাথ অন্তের লিখিত অনেকগুলি পুস্তকের সারগর্ভ ভূমিকাও রচনা করেন। ইহার মধ্যে সরদেশাই রচিত বা সম্পাদিত Historical papers relating to Scindia, Marathi Riyasat Paramanand Kabyam-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

যদুনাথ মাতৃভাষা বাঙ্গলার প্রতিও বিশেষ অনুরাগ পোষণ করিতেন। শৈশবকাল হইতেই পিতার প্রভাবে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং উত্তম বাঙ্গলা রচনা অভ্যাস করেন। ১৩০২ হইতে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যদুনাথের প্রায় দুইশতটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে প্রায় ষাটটি প্রবাসী পত্রে অপর প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষ, প্রভাতী, বঙ্গদীপ, দেশ, মাসিক বঙ্গমতী, অলকা, শনিবারের চিঠি, শিক্ষক, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। শিবাজী ও মারাঠাজাতি সম্বন্ধে যদুনাথ বাঙ্গলায় দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (২৬-২৭)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত যদুনাথের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া যদুনাথ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। সভাপতি থাকার সময় এবং অন্তপদে যুক্ত থাকার সময় তিনি নানাভাবে পরিষদের মাধ্যমে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া পণ্ডিতকুলাগ্র গণ্য বর্ষায়ান যদুনাথ বাঙ্গলার বিধ্বং সমাজের কুলপতি স্বরূপ বিরাজ করিতেন। বাঙ্গলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় খ্যাতনামা ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনিই ইতিহাস সাধনায় দীক্ষা দান করেন এবং সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দেন।

কবিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত যদুনাথ গভীর বন্ধুত্ব স্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিতও তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। প্রথম যৌবনে যদুনাথ ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন এবং ইতিহাস সাধনায় তাঁহার আশীর্বাদলাভ করেন।

সুদীর্ঘ জীবনে যদুনাথ দেশ বিদেশের পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক নানা সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্‌ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড নামক সুবিখ্যাত বিদ্বৎসংস্থা যদুনাথকে সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় ইতিহাস পরিষদ যদুনাথকে 'করেসপন্ডিং মেম্বর' রূপে সম্মানিত করেন। বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরাই এই দুইটি সম্মানের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। বোম্বাই-এর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ক্যাম্পবেল স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এই সংস্থা তাঁহাকে সম্মানসূচক 'ফেলো' শ্রেণীভুক্ত করেন। ওয়াশিংটনের আমেরিকান হিস্টোরিক্যাল এসোসিয়েশন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথকে আজীবন সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এশিয়ার

মধ্যে যদুনাথই সর্বপ্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে অনুরূপ ভাবে সম্মানিত করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি 'অনারারী ফেলো' রূপে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথকে সি. আই. ই উপাধি দান করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট (সার) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যদুনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের (Bengal Legislative Assembly) সভ্য ছিলেন।

সরকারী কলেজে অধ্যাপনায় রত থাকার সময়ে চার-পাঁচজন মেধাবী ছাত্রকে যদুনাথ নিজগৃহে আহ্বার ও আশ্রয় দিয়া রাখিতেন ও তাহাদের পাঠের তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কার্যকাল শেষ হইলে তিনি দার্জিলিং-এ বাস করিতে থাকেন। প্রায় তেরো বৎসর তিনি দার্জিলিং-এ বাস করেন। বৃদ্ধ বয়সে দার্জিলিং-এর জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বালীগঞ্জ পল্লীতে (লেক টেরেস) বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদুনাথ এই গৃহে বাস করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় বাসকালেও গবেষক ছাত্রদের নিকট তাঁহার গৃহের দ্বার অব্যাহত ছিল। যদুনাথ অতি সরল, অনাড়ম্বর ও নিয়মিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নিজের আরাম ও স্বাস্থ্যের জন্ত অর্থ ব্যয় করা তাঁহার স্বভাব ও নীতিবিরুদ্ধ ছিল। অথচ দেশ বিদেশ হইতে মূল্যবান পুস্তক পত্রিকা, মূল নথিপত্র অগ্রথায় তাহাদের ফটোকপি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্ত তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বহু অর্থব্যয়ে ও বহুদিনের সঞ্চয়ে তিনি তাঁহার যে ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার আকর্ষণেই গবেষকরা নানা স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইত। যদুনাথ এই সব বহিরাগত গবেষকদের শুধু নিজের পাঠাগারে বসিয়া পাঠের সুযোগ করিয়া দিতেন তাহা নহে, গবেষণার প্রয়োজনীয় সহায়তা ছাড়াও তিনি ইহাদের আহ্বার ও আশ্রয় দিতেন। যদুনাথের সহধর্মিনীর মাতৃমূলভ সেবা-যত্নের আশ্রয় গ্রহণেও তাঁহারা বঞ্চিত হইতেন না। পরিশ্রম, নিয়মাহুর্বাতিতা ও সত্যনিষ্ঠায় ছাত্রদের বিন্দুমাাত্র শৈথিল্য দেখিলে যদুনাথ অতি কঠোর ভাষায় তাঁহাদিগকে শাসন করিতেন, এইজন্য তাঁহার পরিণত বয়স্ক ও পদস্থ অধ্যাপক ছাত্রেরাও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যদুনাথকে সন্ত্রস্তমিশ্রিত ভীতির চক্ষে দেখিতেন। আপাত-কাঠিন্যের আবরণে যদুনাথের হৃদয়ে যে স্নেহ-মায়ী-মমতার ফলস্রাব প্রবাহিত ছিল—অপরিচিত ব্যক্তিরা তাহার সন্ধান না পাইয়া তাঁহাকে দান্তিক, অসামাজিক ও নীরস হৃদয় যুক্ত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত। যদুনাথের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ব্যক্তিরাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত স্নেহধারার সন্ধান রাখিতেন।

যদুনাথ দুর্লভ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র হইলেও যদুনাথ দেশবিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরিণত জীবনেও এইসব বিষয়সংক্রান্ত আধুনিকতম তথ্য ও সংবাদ তাঁহার নখদর্পণে থাকিত। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি সম্বন্ধেও তাঁহার তথ্যাহুসন্ধিষ্টচিত্ত জাগরুক থাকিত। পরিণত বয়সেও যদুনাথের উন্নত ঋজু দেহ, সতেজ বুদ্ধি ও অতন্ত্র অধ্যয়নম্পৃহা পরিচিত ব্যক্তিমাাত্রকেই বিস্মিত করিত।

জীবনসম্ভ্রাম্য যদুনাথকে বহু শোকের আঘাত সহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার দুইটি কুতীপুত্র, এক বিদ্যুী কন্যা, দুই জামাতা ও এক প্রিয় পৌত্রের অকাল বিয়োগ হয়। তাঁহার এক পুত্র ১৯৪৬

এর সাম্প্রদায়িক হান্সামায় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাতগুলির মধ্যেও স্থিতবী যদুনাথ স্থৈর্য হারান নাই। গীতোক্ত নিকাম কর্ণযোগীর মতই তিনি এই দুঃসহ মানসিক অবস্থায় জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্ত লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষের ও সমাজের দোষত্রুটির সমালোচনা করিয়া ও এইগুলি প্রতিকারের উপায় দেখাইয়া এই সময় সংবাদপত্রে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে যদুনাথ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান যে সারাজীবনের পরিশ্রমে ও বিপুল অর্থব্যয়ে গঠিত তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাগারটি যেন তাঁহার মৃত্যুর পরে জাতির জ্ঞান-সাধনার সহায়তার জন্ত কলিকাতাস্থিত জাতীয় পাঠাগারকে হস্তান্তরিত করা হয়।

যদুনাথের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী যদুনাথের মহামূল্যবান বিপুল সংগ্রহটি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২ই মার্চ যদুনাথের সহধর্মিণী কর্তৃক জাতীয় পাঠাগারকে দান করা হয়। মোট ২৫,০০০ সংখ্যক পুস্তকাদি যদুনাথের সংগ্রহভুক্ত ছিল। এই সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইংরাজী, ফারাসী ও পতু গীজ ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক, পুস্তিকা ও সাময়িকপত্র	১৮৩৯
বাঙ্গলা	৭৫
অসমীয়া	৬০
হিন্দী	৪৯
মারাঠি	১৫৫
সংস্কৃত পুস্তক (মুদ্রিত)	২৮
ফার্সী পুস্তক (মুদ্রিত)	১২৪
মানচিত্র (পতু গীজ, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায়)	২০৮
ফারাসী ও মারাঠি পাণ্ডুলিপি	২০
ফার্সী	২১২
ফার্সী পাণ্ডুলিপির ফটো	২৩
ফারাসী ও ইংরাজী অমুদ্রিত নথিপত্র	৬১

ইহা ব্যতীত এই সংগ্রহে যদুনাথের অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি ও তৎকৃত ফারাসী, পতু গীজ, মারাঠি, ফার্সী নথী পত্র সমূহের ইংরাজী অনুবাদও আছে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে যদুনাথ কলিকাতাস্থ তাঁহার স্বগৃহে প্রায় ৮৮ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে বিশেষতঃ তাঁহার শেষ বাসস্থান কলিকাতা নগরীতে গভীর শোকের ছায়াপাত হয়।

(১) India of Aurangzib : Topography, Statistics and Roads, 1901.

(২) History of Aurangzib Vol. I-1912, Vol. II-1912, Vol. III-1916, Vol. IV-1919, Vol. V-1924.

(৩) Anecdotes of Aurangzib and historical Essays-1912. (২য় সংস্করণ—Anecdotes of Aurangzib নামে প্রকাশিত হয়, ১৯২৫)।

- (৪) Short History of Aurangzib—1930.
- (৫) Studies in Aurangzib's reign—1933.
- (৬) Shivaji and his times—1919.
- (৭) House of Shivaji—1940.
- (৮) Later Mughals—By W. Irvine, Ed. and Continued by J. N. Sarkar, in 2 Vols, 1922.
- (৯) Studies in Mughal India—1919.
- (১০) Mughal Administration—1st Series 1920, 2nd Series 1925, Combined Volume 1925 (Patna University Readership Lectures), 4th edn—1952.
- (১১) Fall of the Mughal Empire, Vol. I—1932, Vol. II—1934, Vol. III—1938, Vol. IV—1950.
- (১২) Bihar and Orissa during the fall of the Mughal Empire—1932.
- (১৩) Poona Residency Correspondence, Vol-I—1930, Vol. VIII—1945, Vol-XIV—1949.
- (১৪) Mustad Khan Saqui's Massir-i-Alamgiri (Asiatic Society, R. I Series No—269)—Eng. Trans by J. N. Sarkar—1947.
- (১৫) Ain-i-Akbari (Ed)—1947.
- (১৬) Persian Records of Maratha History (English Trans)—Vol I & II.
- (১৭) Economics of British India—1909.
- (১৮) Chaitanya : his pilgrimages and teachings—1913 (Chaitanya's life and teachings—1922, Third edn.—1932).
- (১৯) India Through the ages—1928 (Sir William Meyer Lectures).
- (২০) Cambridge History of India—Chapters 8, 10, 11 & 13. Vol. IV—1937
- (২১) History of Bengal, Vol. II—1948.
- (২২) Shivaji—A study in leadership—1950.
- (২৩) Nawabs of Bengal—Asiatic Society of Bengal, 1952.
- (২৪) Military History of India with Maps—1960.
- (২৫) A History of Dasnami Naga Sanyasis—Pub in (?)
- (২৬) শিবাজী—পৃঃ ২৬৪, ১৯২৯
- (২৭) মারাঠাজাতীয় বিকাশ—১৯৩৬

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মায়াকানন'

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটক লিখিয়াই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার সর্বশেষ রচনাও বাংলা নাটক। শর্মিষ্ঠা নাটক তাঁহার সর্বপ্রথম বাংলা রচনা। 'মায়াকানন' তাঁহার সর্বশেষ সাহিত্য কার্য।

মৃত্যুর পূর্বে মাইকেল বিশেষ আর্থিক ছরাবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাত্র নয় মাস পূর্বে যখন বিজ্ঞানসাগর মহাশয় চরমপত্র দিয়া জানাইয়া দিলেন যে তাঁহাকে আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই মধুসূদন তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় অন্ন সংস্থান করাই দায়। তাই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত তিনি কিছু কিছু ফরমায়েসী রচনায় হাত দেন।

কোন পরিস্থিতিতে তাঁহাকে ফরমায়েসী রচনায় হাত দিতে হইয়াছিল তাহা চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর(১) তাঁর রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মধুসূদনের পত্নীরও শরীর পূর্ব হইতে ভগ্ন হইয়াছিল; এই সময় তিনিও অতি কঠিনরূপে পীড়িত হইলেন। পতিপত্নী উভয়েই এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, দুইটি অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং তাহার উপর ঋণদাতাদের নিপীড়ন, স্তত্রাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্য এবং ঋণের দ্বারা সংসার নির্বাহ হইতেছিল, ক্রমশ উভয়েই দুশ্রাপ্য হইয়া আসিল। পুনঃ প্রাপ্তির আশা না থাকিলে কয়জন ঋণদান করিতে পারেন? অন্তের প্রদত্ত সাহায্যের উপরই বা কতদিন নির্ভর করা চলে? গৃহসজ্জা, পরিচ্ছদ, ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মধুসূদন দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন; ক্রমশঃ তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন সত্য সত্যই, অন্নভাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া মধুসূদনকে ও তাঁহার পত্নীকে কোন কোন দিন অনাহারে বা অর্ধাশনে থাকিতে হইত। স্বস্থ থাকিলে কোন রূপেই হউক তিনি কিছু না কিছু উপার্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু শয্যাশায়ী হইয়া তিনি আর কি করিবেন? সে অবস্থায় যাহা সম্ভবপর, তিনি তাঁহার ক্রটি করেন নাই। স্বতীশেষ বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষ ও অল্পষ্ঠাতৃগণ এই সময় তাঁহাকে তাঁহাদিগের রঙ্গশালার জন্ত একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায় মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও, তাঁহার শেষ গ্রন্থ মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন।' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, চতুর্থ সং।)

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত (এবং ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) মায়াকাননের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন—

“এই সময় (১৮৭৩ খ্রীঃ মধ্যভাগে) (২) কলিকাতার সুবিখ্যাত সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব), দৌহিড় শরচ্চন্দ্র ঘোষ বেক্সল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদনের নিকট শরচ্চন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাঁহারই অনুরোধে মধুসূদন উক্ত থিয়েটারের জন্ত দুইখানি নাটক (মায়াকানন ও বিধ না ধলুগুণ)

রচনা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। রচনার পরিশ্রমিক অগ্রিম পাওয়াতে মধুসূদনের উপকার হইয়াছিল। রোগশয্যায় মধুসূদন ‘মায়াকাননের’ খসড়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন, বিষ না ধলুগুণ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই মাত্র জানা যায়।”

চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন মায়াকানন সমাপ্ত হয় নাই। মধুসূদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় ইহার প্রকাশন ১৪ই মার্চ ১৮৭৪। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১১৭; আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

মায়াকানন/মাইকেল মধুসূদন দত্ত/প্রণীত।/শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ/ও/শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক/প্রকাশিত।/নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র/কলিকাতা, মাণিকতলা স্ট্রিট নং ১৪৮/সম্বৎ ১২৩০।/

প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন

“বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া “মায়াকানন” নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি “মায়াকানন” নামে এই নাটক ও “বিষ ও ধলুগুণ” নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়ে ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।

নগরীর স্নানমল্ল নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে স্নন্দর অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্তক নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোনক্রমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আত্মোপাস্ত দেখিয়া দিয়াছেন। “বিষ না ধলুগুণ” সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা

শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পৌষ-১২৮০

প্রকাশক।

‘মায়াকানন’ সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

মধুসূদন স্বয়ং মায়াকানন সমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন কিনা এবিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। যোগীন্দ্রনাথের মত নগেন্দ্রনাথ সোমও (মধুসূতি পৃ ৫২৭) বলিয়াছেন মধুসূদন উহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং “মায়াকানন” লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রথম রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়।” অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও লিখিয়াছেন—“the work was not finished when Madhusudan died in 1873 and the fragments were brought out under the name of Mayakanon” (Western Influence on Bengali Literature P P 237-238) অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ডঃ আবুতোষ ভট্টাচার্যও লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণকুমারী রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের প্রকৃত নাট্যকার জীবনের অবসান হয়। নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে

ইহার তের বৎসর পর তিনি “মায়াকানন” নামক আর একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি পরলোকে গমন করেন।” (বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সং, পৃ ১২২)

নগেন্দ্রনাথ সোম ও প্রিয়রঞ্জন সেনের সমালোচনা করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে মায়াকানন স্বয়ং মধুসূদনই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। প্রমাণ হিসাবে তিনি ১২৮০ পৌষ-এর প্রকাশকদের বিজ্ঞপ্তি হইতে এই কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন—“লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং গীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া ইত্যাদি। কিন্তু ব্রজেনবাবুর উদ্ধৃত এই লাইন কয়টির দ্বারা নাটক সমাপ্তির কোন প্রমাণ হয় না। বরং বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলে মনে হয় ভুবনবাবু উহাতে হাত চালাইয়াছেন। বিজ্ঞাপনের শেষে বলা হইয়াছে যে ‘বিষ না ধনুগুণ’ তাহার শীর্ষই সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিবেন। অর্থাৎ একটি তাহার করিয়াছেন অপরটি ভবিষ্যতে করিবেন। ব্রজেনবাবুর এই মত সাম্প্রতিককালে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ও আরো অনেকেই সমর্থন করিয়াছেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ব্রজেনবাবুর যুক্তির অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন।

‘মায়াকানন’ সত্যি সত্যিই যে মধুসূদন সমাপ্ত করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার মত ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪১ মে তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ৩ পত্রের লেখক কৈলাশচন্দ্র বসু মধুসূদনের বন্ধু, গুণগ্রাহী এবং ব্যারিষ্টারী জীবনের কর্মচারী এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভক্ত। কবির মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট হইতে কবির অপ্রকাশিত রচনাবলী পাওয়া গিয়াছে। কৈলাশ বাবু লিখিয়াছেন—

“যে উৎকট রোগে বঙ্গীয় কবিভূষণ মাইকেল মধুসূদন দত্তজ কালধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রোগ-শয্যায় শয়নে থাকিয়া তিনি দুখানি নাটক রচনারম্ভ করেন। দুইখানিই বঙ্গরঙ্গভূমির নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল। প্রথমখানির নাম “মায়াকানন” অপরখানির নাম “বিষ না ধনুগুণ?” মায়াকানন সমাপ্ত হইয়াছিল, বিষ না ধনুগুণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ যুবকদিগের যত্নে সম্প্রতি মায়াকানন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।.....এই নাটক তাঁহার মর্ত্যজীবনের শেষ সম্পূর্ণ গ্রন্থ।”

কৈলাশবাবু মায়াকাননকে মধুসূদনের “মর্ত্যজীবনের শেষ সম্পূর্ণ গ্রন্থ” বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

কি অবস্থায় মধুসূদন নাটকখানি লেখেন চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন—

“যে অবস্থায়, এই সময় মধুসূদনকে দিনপাত করিতে হইত এবং যে অবস্থায় তিনি মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। রোগের যন্ত্রণায়, কখনও কখনও তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন; রক্ত বমনে শরীর মধ্যে মধ্যে অবসর হইয়া আসিত; তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাঁহার দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় লিখাইয়া লইতেন।” (পৃ ৬০২)

যোগীন্দ্রনাথ একটু ভুল করিয়াছেন। মধুসূদন যখন মায়াকানন রচনা করেন সে সময় তাঁহার লেখনী ধারণের ক্ষমতা ছিল না। আর “বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি” এই সময়ে একমাত্র কৈলাশচন্দ্র বসু। মায়াকাননের পাণ্ডুলিপি তাঁহার হস্তে লিখিত। তাই এ বিষয়ে কৈলাশ বাবুর—সাক্ষ্য অধিক

গ্রহণ যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

“এই ‘মায়াকানন’ রচনাকালে কবির পীড়ার আতিশয্য হেতু প্রায় সর্বদাই শয্যাগত থাকিতেন। সেই শয্যাপার্শ্বে লেখনীহস্তে বসিয়া আমি মায়াকানন লিখিতাম। মূৰ্ছমুহুর্তে রক্তবমন হইত; তৎকালে রোগের দুঃসহ জ্বালা দ্বিগুণতর হইত, তথাপি রচনা কার্যে বিরতি ছিল না। বমনকালে অগত্যা লেখনীর বিরাম হইত; অমনি আবার আরম্ভ করিতেন। যখন একটি মনোহর ভাব উপস্থিত হইত তখনই তাহার সেই ব্যাধিক্রিষ্ট মুখকান্তি আনন্দোদ্ভাবিত হইয়া অগ্রেই তাহার পরিচয় প্রদান করিত। আমার আসন্নিক্টি সময়ে যে সকল ভাব মনে মনে সঙ্কলন করিতেন, তাহার লিপি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষিপ্তবৎ থাকিতেন। কোন এক সময়ে আমি গিয়া দেখিয়াছিলাম তিনি উন্নতভাবে ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রথম দর্শনে সে ভাব রোগমূলক লিখা আশঙ্কা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই যখন স্মিতমুখে শীঘ্র শীঘ্র লিখিবার উপকরণ সমস্ত আনিতে কহিলেন তখন সে আশঙ্কার সম্যক নিরাকরণ হইল। পশ্চাৎ এই অংশটি লিখিত হইলে—

“চলো সখি। আমরা এখন যাই; গিয়া দেখি, ইন্দুমতির মনের কি ভাব। আমি শুনেছি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে, অস্ত্র ছলে যায়; আর মনেও করে না যে সে অভাগীর কি দুর্দশা ঘটেছে। কিন্তু সে যেখানেই যায় ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে।

কহিলেন, এতক্ষণে আমি স্থির হইতে পারিলাম। হায়! সেই সময় যদি জানিতে পারিতাম, প্রিয় বন্ধু ততশীঘ্র আমার দিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তাহা হইলে, তাহার জনমনোমোহিনী আকৃতির তদানীন্তন শেষ ছবি সংগ্রহ করণে কখনও অবহেলা করিতাম না।” (মধুসূদন গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষৎ) মায়াকানন পৃ ৪২)। এখন প্রশ্ন হইল “মায়াকানন” কোন সময় এবং কোথায় লিখিত। বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোক্তারা যখন নাট্যশালা স্থাপন করা স্থির করেন তখন মধুসূদন পঞ্চকোটে। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে কবি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার আইন ব্যবসায় প্রবেশ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্ত আর ব্যবসা জমাইতে পারেন নাই। এদিকে শেষ সম্বল বিত্তাঙ্গার মহাশয়ের নিকট হইতে আসিল এক মর্মান্তিক পত্র।

My Dear Dutta,(8)

I have tried my best and am sadly convinced that your case is utterly hopeless one. No exertion of mine, or that of anybody else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch works. I am very unwell and am therefore unable to write.

Yours sincerely

30th Sept '72

Isvar Chandra Sarma

এই চিঠির তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৮৭২)। ইহার পর কোন সময়ে কবি নাট্যকোম্পানীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কারণ বিত্তাঙ্গারের চিঠি পাইয়াই তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করেন,

তখন সব পথ রুদ্ধ।

এদিকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মধুসূদন উত্তরপাড়া যান। উত্তরপাড়ায় কোনপ্রকার সাহিত্য রচনা করিবার মত অবস্থা কবির ছিল না। অথবা উত্তরপাড়ায় তিনি কোন নাটক রচনা করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তাছাড়া কৈলাশবাবু উত্তরপাড়ায় কবির সঙ্গে বাস করিতেন না। বরং উত্তরপাড়া যাইবার পর কবির সঙ্গে কৈলাশবাবুর ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ অবশ্য বন্ধুবিচ্ছেদ নহে। কৈলাশবাবু মধুসূদনের মামলা মোকদ্দমার কার্জকর্ম দেখাশুনায ব্যস্ত থাকিতেন। টাকা পয়সা সংগ্রহের জন্তেও তাঁহাকে এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতে হইত। আবার বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। এই সকল কারণে শেষের কয়েকটি দিন কবির সঙ্গে সবসময় থাকিতে পারেন নাই। তাছাড়া, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে প্রিয়বন্ধু এত শীঘ্র তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। মৃত্যুর মাত্র চারিদিন পূর্বে আলিপুর জেনারেল হাসপাতাল হইতে কবি লিখিতেছেন—

প্রিয়তম কৈলাশ, (৫)

যদি তোমার, তোমার মাইকেলকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে পত্রপাঠ মাত্র এখানে পৌছিবা ইহাতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিবা না। মাইকেল মৃত্যুশয্যা। ২৫শে জুন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

এই পত্র হইতে মনে হয় কৈলাশবাবু তখন কলিকাতার বাহিরে কোথাও ছিলেন।

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ এই ছয় মাসের মধ্যে “মায়াকানন” রচনা আরম্ভ ও শেষ হয়। কবি এই সময়ে বেনেপুকুরের বাসায় ছিলেন। (৬)

গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া স্বত্বাধিকারীদ্বয়ের হস্তে পাণ্ডুলিপি (কৈলাশবাবুর হস্তলিখিত) প্রদান করিয়াই কবি উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলেন মনে হয়। কারণ ঐ বৎসর ১৬ই আগষ্ট ‘মায়াকানন’ের অভিনয় দ্বারা বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন করিবার কথা ছিল। পাণ্ডুলিপি বহুদিন পূর্বে হাতে না আসিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ গান রচনা করিয়া রিহার্শাল দিয়া নতুন বই-এ প্রস্তুত হইতে ৪।৫ মাস সময় প্রয়োজন।

মুক্তিত ‘মায়াকানন’ স্বয়ং মধুসূদনের লেখা না ইহাতে অপরের প্রক্ষেপ আছে ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। মুক্তিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে মনে হয় প্রকাশকদ্বয় মূল পাণ্ডুলিপি অদলবদল করিয়া ছাপাইয়াছেন। তাঁহারা গ্রন্থের স্বত্বাধিকার ক্রয় করিয়াছেন অতএব যে কোন অদলবদল করিবার অধিকার তাহাদের আছে—এরূপ ধারণা স্বত্বাধিকারীদ্বয়ের ছিল। কারণ যে গ্রন্থ মধুসূদন সামান্য কিছুটা মাত্র লিখিয়াছিলেন (বিষ না ধনুর্গণ) সেই গ্রন্থও তাঁহারা সম্পূর্ণ করিয়া প্রচার করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

‘মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ধীরতার সহিত গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর ছিল না। নিজের বিবাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন মাত্র। রঙ্গভূমির অধ্যাক্ষগণ, সেইসকল খণ্ডিত অংশ স্বেচ্ছাক্রমে সংযোজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।’

প্রকাশকদ্বয়ের বিজ্ঞাপন ও যোগীন্দ্রনাথের এই উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া সম্ভবতঃ ডঃ স্কুমার সেন লিখিয়াছেন—

‘মায়াকানন যখন লেখা হয় মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্তি ভগ্নাবশেষ। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই মধুসূদনকে মায়াকানন লিখিতে হয়। রচনা মোটামুটি শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, তবে সংশোধনের প্রয়োজন ছিল।’

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত মায়াকানন নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ‘নাট্যকার মধুসূদন’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

‘এ দেখে মনে হয় কবি নাটকটির সংশোধন ও পরিমার্জনা করে যাবার অবকাশ পাননি। নাটকটি দেখে দিতে গিয়ে সম্পাদক মহাশয় কোথাও যে কিঞ্চিৎ সম্পাদনা করেন নি এ কথা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না।’

পরবর্তীকালে ডঃ গুপ্ত এ বিষয়ে অবশ্য আরো স্পষ্টতর অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্পাদিত মধুসূদন গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

‘কবি নাটকটি শেষ করে গিয়াছিলেন...কিন্তু ভূবন মুখোপাধ্যায়ের হাতের স্পর্শে নাটকের সমাপ্তি অংশে অল্পভব করা যায়। মার্জিত করতে গিয়ে তিনি নিজের লেখা শেষাংশে কিছুটা যুক্ত করেছেন এরূপ ধারণা করবার কারণ আছে।’

এই ধারণার কারণ দেখাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—

‘নাটকের পরবর্তী অংশে ট্রাজেডীর স্বর একেবারে বিনষ্ট হয়েছে। অনাবশ্যক গল্প কথনে নাট্যরূচি বা শিল্পরূচির কিছুমাত্র পরিচয় নেই। ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকটির আত্মোপাস্ত দেখে দিয়েছিলেন বলে প্রকাশক স্বীকার করেছিলেন নাটকের প্রথম সংস্করণে। এই অংশে তাঁর হাতের স্পর্শ থাকা সম্ভব।’

যতীন্দ্র দত্ত ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৮৪) ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২০ লিখিয়াছেন—

‘বেদল থিয়েটারে অভিনীত একটি নতুন নাটক ‘মায়াকানন’। কবির মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকখানি লিখিতে লিখিতে অসম্পূর্ণ রাখিয়া পঞ্চদশ প্লাম্ব হন, নাটকের একটি অঙ্ক কি হইবে ভাবিয়া থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা ব্যাকুল হন, শেষ অঙ্কে কি কি থাকিবে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বুদ্ধিপূর্ণভাবে মৃত্যুশয্যাশায়ী নাট্যকারের মুখ হইতে তাহার স্থলভাব শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। শরৎবাবুর নিকট তাহার মর্গ শ্রবণ করিয়া ভূবনচন্দ্র সেই নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।’

যতীন্দ্রবাবুদের সঙ্গে ভূবনবাবুর বিশেষ হৃদয়তা ছিল এবং হয়ত তিনি কাহিনীটি ভূবনবাবুর মুখেই শুনিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের লেখাটি মধুসূদনের মৃত্যুর ৪৩ বৎসর পর প্রথম প্রকাশিত হয় ‘জন্মভূমি’তে এবং পরে প্রবর্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়। দত্ত মহাশয়ের লেখা পড়িলে মনে হয় মধুসূদন বই শেষ করিবার পূর্বেই মারা যাইবেন জানিতে পারিয়া শরৎবাবু পূর্ব হইতেই সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বতরাং এই তথ্যের উপর আপাততঃ আমরা কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছি না। কিন্তু স্বয়ং ভূবনচন্দ্র তাঁহার ‘মধুবিলাপ’ কাব্যে লিখিয়াছেন যে, কবি নাটকটির ফল না ফলাইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

অর্থাৎ শেষ অঙ্ক বাকি ছিল। এই কাব্যটি মধুসূদন যেদিন মারা যান সেইদিন মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে লিখিত কাব্যটির ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

‘অল্প বৈকালে আলীপুর জেনেরল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।’ রচনার তারিখ ষোলই আষাঢ় ১২৮০।

কাব্যটি ১২৩০ সন্তব (২৫শে জুলাই ১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। ভুবনচন্দ্রের নিজের ভাষায় (৭)—

‘দ্বাদশ স্বজন এক মায়া’র কানন।
বঙ্গরঙ্গভূমি হেতু।
রোপিছিলে তরু
হয়ে আছে পল্লবিত, ধরেনিকো ফল
তায় অকস্মাৎ তুমি ত্যাজিয়ে অকালে
(‘পাণ্ডবের বিজয়’ সহ অপূর্ণ এখনো)
না বলিয়ে না কহিয়ে, জনম সংসার
মায়ায় পলাইলে কবিকুল চূড়া।’

ভুবনচন্দ্রে এই উক্তি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে ইহা বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে ভুবনচন্দ্রের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ভুবনচন্দ্র ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘পরিদর্শক’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘বহুমতী’ ও ‘জগদভূমি’র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহা ছাড়া ‘বিদূষক’ ও ‘পূর্ণশশী’ও সম্পাদনা করেন। গল্প ও পদ্য মিলাইয়া তাঁহার প্রায় পঞ্চাশখানি প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— ‘নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাশ্রোতের মত সমান ভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে।’ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরো লিখিয়াছেন যে, ‘তিনি মাইকেলের সহচর ছিলেন এবং তাঁর অত্যন্তম লিপিকরও ছিলেন। মধুসূদন তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ শ্রীতিলেখনের জন্ত তিনজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন ১৮৫২—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময় ভুবনচন্দ্রের বয়স ১৬—২০ বৎসর। তখন তাঁহার লিপিকর নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কন। ১২ বৎসর বয়সের সময় ভুবনচন্দ্র সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং ক্রমশ তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তখন মেঘনাদবধ কাব্য লইয়া হৈ চৈ চলিতেছে। সম্ভবতঃ কালীপ্রসন্নই ঐ সময় ভুবনচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দেন। মধুসূদন বিলাত হইতে ফিরিবার পর কবির কোন কবিতা তিনি লিখিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। “মায়াকানন” লিখিবার সময় তাহার সহিত কবির কোন যোগাযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি মায়াকাননের কাহিনীটি জানিতেন না, কবির মুখে কিছু শোনেন নাই। শরৎবাবুর মুখে তিনি কবির পরিকল্পনাটি শুনিয়া সংশোধন সংযোজন কার্যে হাত দেন। আর একটি কথা পরিণত বয়সে ভুবনচন্দ্র বহু তরুণ লেখকের লেখা সংশোধন করিয়াদিয়াছেন। কিন্তু ২২ বৎসর বয়স হইতেই অগ্রের লেখায় তিনি হাত চালাইতে অভ্যস্ত। এই সময়েই তিনি মীর ও মশারক হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’ ও বসন্তকুমারী’ সংশোধন করেন। মধুসূদনের ‘মায়াকাননে’র বেলাতেও এই তরুণ সাংবাদিক (বয়স তখন ৩০ বৎসর)

পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন অঙ্ক দৃশ্য ইত্যাদি পরপর সাজাইয়া বড় একটা লিখিতেন না। যখন যে দৃশ্যের ভাব মনে উদয় হইত তখন তাহা লিখাইয়া রাখিতেন। ফলে গ্রন্থ সমাপ্ত হইলেও তাহা খুব ভাল ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া ছাপাখানার বা অভিনয়ের উপযুক্ত করা দরকার। বলা বাহুল্য মায়াকাননের এই কাজটি স্বয়ং মধুসূদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কার্যের জন্তে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা ভুবনচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন মধুসূদনের জীবদ্দশাতেই।* তাছাড়া গানও লিখিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া ভুবনবাবু দেখেন যে শরৎবাবু বর্ণিত পরিকল্পনা অল্পযায়ী বইটি শেষ হয় নাই। তাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে নাটকটি কবি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আসলে, সময়ের অভাব এবং শারীরিক অস্বস্থতা বৃদ্ধি হেতু কবি ঐ ভাবেই নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া স্বত্বাধিকারীর হস্তে পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। তাছাড়া, প্রকাশকদ্বয় কোথাও বলেন নাই যে মধুসূদনের অসমাপ্ত নাটক “মায়াকানন” ভুবনবাবু সমাপ্ত করিয়াছেন। এই সকল কারণে যতীনবাবু ও ভুবনবাবুর তথ্য গ্রহণযোগ্য নহে।

ভুবনবাবু শুধু নাটকটি সংশোধনই করেন নাই, ব্যাপক পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য নাটকটি যাহাতে ভাল চলে। মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া কৈলাশবাবু ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া যান এবং মুদ্রিত সমস্ত কপি অবিলম্বে পুড়াইয়া ফেলার অনুরোধ জানাইয়া সোমপ্রকাশে পত্র লেখেন। তিনি আরো অনুরোধ জানান যে ‘মায়াকানন’ের সমালোচনা প্রসঙ্গে যেন মধুসূদনের নাম যুক্ত করা না হয়। কৈলাশবাবু মূল মায়াকাননের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ছাপা গ্রন্থে সে অংশও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। কৈলাশবাবুর মূল বক্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষীয়েরা ‘মায়াকানন’ যে আকারে বাহির করিয়াছেন, ফলতঃ সে আকার তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হয় নাই। তাঁহারা তাহার কোনও কোনও স্থান পরিবর্তন, কুত্রচ নূতন অংশ সংযোজন করিয়া দিয়া অসহৃদয়তার অবস্থাজ্ঞতার পরন্তু অবিশুদ্ধকারীতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ মহামতিরা যে কি ভাবিয়া এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অস্বাদ্যাদির দুর্বোধ। তাঁহারা যদি আপনাদের জ্ঞান গরিমা প্রদর্শনার্থে এরূপ করিয়া থাকেন, স্বতন্ত্র পুস্তক করিলেই প্রকৃত জ্ঞানীর কাণ্ড হইত। যদি কবির দত্তজর অভাব পূরণার্থে করিয়া থাকেন, সমধিক হুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের শ্রায় পণ্ডিতের হস্তে দত্তজর অভাব পূরণ হয়, দত্তজর কিম্বা সাধারণে এরূপ প্রত্যাশা কখনই করেন না। পরিশেষে, অধ্যক্ষ বাবুদিগকে আমি বহু-ভাবে পরাশ্রম দিতেছি, এবারকার মুদ্রিত পুস্তকগুলি অবিলম্বে ভগ্নসাৎ করিয়া আমার হস্তলিখিত আশঙ্করূপ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অভিনয় করিবেন। পরন্তু এইস্থানে সমাজস্থ জনসাধারণ সন্নিধানে আমার সাহসনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এবারকার “মায়াকানন”ের সমালোচন প্রসঙ্গে মাইকেলের চিরবিজয়িনী ও যশস্বিনী লেখনীকে দিক্কার প্রদান না করেন।”

বলাবাহুল্য, শরৎবাবু বা ভুবনবাবু কৈলাশবাবুর এই পত্রের প্রতিবাদ করতে সাহসী হন নাই।

‘মায়াকানন’ নাটকটি প্রথম কবে রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় ইহা লইয়াও মতভেদ আছে। মধুসূতির রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোম বলিয়াছেন—

‘মধুসূদনের শেষ নাট্যস্বৃতি মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। মধুসূদন তখন ইহলোকে নাই।’

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

‘১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটারে মায়াকানন প্রথম হয়। মধুসূদন মৃত্যুর পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এই নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে লিখিয়াছেন যে, ‘মায়াকানন’ লইয়াই বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভুল।...পর সপ্তাহে (২৫ এপ্রিল) মায়াকাননের দ্বিতীয় অভিনয় হয়।’ (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (চতুর্থ সং) পৃ: ১৩৩। মধুসূদন দত্তের জীবনী, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃ: ২৬)

নগেনবাবুর তথ্যটি যে ভুল সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নাই। আসলে মায়াকাননের অভিনয়ের দ্বারাই বেঙ্গল থিয়েটার উদ্বোধন করার কথা ছিল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। কিন্তু মধুসূদনের মৃত্যু হওয়াতে উহা সম্ভব হয় নাই। এবিষয়ে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উক্তি বিশেষ প্রশিধানযোগ্য : (Indian Stage, Vol. II & III page 230) তিনি লিখিয়াছেন—

‘Michael Madhusudan Dutt wrote Mayakanan for representation in the opening night and the Company purchased this piece and ‘Beesh Ki Dhanurgoon’ from the author, but as the poet’s death marked it as an omen...they postponed it for a future performance and put Sarmistha on the boards for the first night applying all the sale proceeds in aid of the Orphans left helpless by the death of their guide, patron and philosopher Sri Madhudan, the illustrious poet of Bengal.’

ডঃ দাশগুপ্ত ব্রজেনবাবু উল্লিখিত প্রথম অভিনয়ের তারিখটি ভুল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রজেনবাবু পুরাতন ইংলিশম্যান-এর ফাইল মনন করিয়া ‘মায়াকানন’ অভিনয়ের দুইটি তারিখ পাইয়াছেন।

The Bengal Theatre—Next Saturday, Maya Kanan the Enchanted Grove, the posthumous production of the late Michael Madhusudan Dutta, be produced. [The Englishman, 17th April 1874]

Bengal Theatre—This evening Saturday 25 April 1874. For the second time, Maya Kanan or the Enchanted grove. By the late Mr. Michael M. S. Datta. [The Englishman, 25 April 1874]

ডঃ দাশগুপ্তের মতে ‘মায়াকানন’ প্রথম অভিনয়ের তারিখ হইল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন—

‘He (Brojen Babu) must have been misled in not finding a paper with review or mention of performance about the drama earlier.

There was no doubt that soon after ‘Sarmistha’ was staged, Maya Kanan

(Enchanted grove) was put on board. Natyacharya Amrita Bose is very definite that as Maya Kanon was not running well, we took Kamyā Kanon—grove desired for.' The latter drama was staged on 31st December 1873. From a consideration of all dates before us. We come to the conclusion that the first performance of Maya Kanon was held on the 30 Aug. 1873 and that it was repeated now and again.' [Indian Stage Vol II & III page 234]

হেমেন্দ্রবাবুর এই যুক্তি ঠিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ নিজেদের স্বত্ব ক্রয় করা বই থাকিতে রঙ্গশালার অধ্যক্ষগণ কেন তাহা স্বেদীর্ঘ আট মাস ফেলিয়া রাখিবেন। তাছাড়া, ব্রজেনবাবুও কোনদিন এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

মায়াকানন ভাল চলে নাই ঠিক। অথচ মাইকেল যখন 'কানন' ব্যবহার করিয়াছেন তখন বহু 'কানন' যুক্ত নাটক Great National Theatre-এর কর্তাদের নিকট আসিতে লাগিল। চ অবশেষে 'আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যাকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Tale-ই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম।' এই 'কাম্যাকানন' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হয়। সুতরাং 'মায়াকানন' এর পূর্বে কোন সময়ে অভিনীত হইয়াছে।

ব্রজেনবাবু লিখিয়াছেন—(মধুসূদন দত্ত পৃ: ২৪)

'মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা বা মায়াকানন লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শর্মিষ্ঠা অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই এই নাট্যশালায় 'মোহন্তের এ কি কাজ' নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়।

এই একই গ্রন্থে (পৃ: ১৮০) সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের যে তালিকা তিনি দিয়াছেন তাহাতে ৩০শে আগষ্ট (১৮৭৩) কোন বই অভিনয় হইয়াছিল তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। তাছাড়া ব্রজেনবাবুর এ তালিকাও পূর্ণাঙ্গ নহে।

মনে হয় প্রথম দিনের অভিনয়ে 'মায়াকানন' মধুসূদনের মূল বই-ই অভিনীত হইয়াছিল। Great National Theatre 'কাম্যাকানন' অভিনয় করাতে উহাদের জব্দ করিবার জন্ত ভুবনবাবুর দ্বারা মায়াকানন খুব ভাল করিয়া অদলবদল করিয়া এবং সেই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পুনরায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম অভিনয় হয়। এর পর তৃতীয় পর্যায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী আর একবার অভিনয় হয়। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা মায়াকানন জমাইতে পারেন নাই শত চেষ্টা করিয়াও। এই পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত ও অভিনীত মায়াকাননের বিরুদ্ধেই কৈলাশবাবুর অভিযোগ।

মধুসূদনের 'মায়াকানন'ের সহিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত আছে। মধুসূদনই নাকি বেঙ্গল থিয়েটারের উগোক্তাদের অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় করিবার পরামর্শ দেন। এদিক হইতে অনেকেই মধুসূদনের দান স্বীকার করেন। ব্রজেনবাবু লিখিয়াছেন—

'ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্তৃক অভিনীত হইত। মধুসূদনেরই

পরামর্শে এই নতুন নাট্যশালায় সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লইয়াই বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহার রচিত নাটকেই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রী দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।'

এই উক্তির সমর্থনে ব্রজেনবাবু অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন— 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না হইলে কিছুতেই ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎবাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutta (৮উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন।' (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্ধ্যায়, পৃ: ১৩১)

অমৃতলাল তাঁহার ভুবনমোহন স্মৃতিকথায়ও বলিয়াছেন যে 'মাইকেলের পরামর্শে নারী একট্রেস' লওয়া হয়। স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীলোক দ্বারা প্রথম অভিনয়ের গৌরব মাইকেলের 'মায়াকাননের'ই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যস্থ' লিখিয়াছেন— 'অমৃতবাজার লিখেন, সত্যকার স্ত্রীলোক লইয়া নাটক করিবার জন্য কয়েকজন ভদ্রলোক উত্তোগী হইয়াছেন।' মাইকেল আর উমেশবাবু ছাড়া আর কাহারো ছিলেন সঠিক জানা যায় না। তবে অমৃতবাবু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস, গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ছাদাড়), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটুবাবু, প্রিয়নাথ বসু ও অক্ষয়কুমার মজুমদারের নাম করিয়াছেন। যে চারিজন স্ত্রীলোক বাছাই করা হইল তাহারাই হইলেন—জগন্নারীণী, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।

হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন শুধু মধুসূদনই নয়, উমেশ দত্ত ও পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীও (৯) অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সত্যব্রতী সামশ্রমী মাত্র ২২ বছর বয়সে সারা ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া মধুসূদনের পরম স্নহঃ ডঃ রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র তাঁহাকে কানী হইতে আনাইয়া এশিয়াটিক সোসাইটির বৈদিক গ্রন্থাবলীর সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। এই সূত্রে সম্ভবতঃ মধুসূদনের সহিতও তাঁহারও পরিচয় ঘটয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সামশ্রমীর বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। তখন তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভারতের বাহিরে ইউরোপেও গিয়াছে। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার অবশ্য সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিদ্যাসাগরের অনেক সমাজসংস্কারমূলক কার্যে তিনি শাস্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যার সাহায্যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিরোধীরা সাধারণত সামশ্রমী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতেন।

হেমেন্দ্রবাবু আরো লিখিয়াছেন যে মধুসূদনের পরামর্শ চাহিলে মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

'It is very unnatural that men with signs of moustache do appear for females. If you mean theater, you must take actresses. Introduce women and I shall write dramas for you.'

হেমেন্দ্রবাবু মধুসূদনের এই উক্তি কোথায় পাইয়াছেন বলেন নাই। তবে মনে হয় অমৃতবাবুর কথারই এটা একটা পরিবর্তিত রূপ বা তাঁর মুখে এরূপ শুনিয়াছিলেন।

অভিনেত্রী গ্রহণের পক্ষে মধুসূদন সত্যিই পরামর্শ দিয়াছিলেন কিনা এ বিষয়ে মধুসূদনের অব্যবহিত পরে বিতর্কের আভাস পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশে কৈলাশবাবু এই সংবাদ অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—‘রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ যুবকেরা কতকগুলি বেষ্টা লইয়া রসবাপার নির্বাহ করেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাদিগকে সর্বদাই নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব দোষস্থাননার্থে বা আপনাদের মন পুষ্ট করণার্থে কবিবর দত্ত মহাশয়কে ঐ কুৎসিৎ ব্যাপারের প্রবর্তক ও উৎসাহদাতা বলিয়া প্রচার করেন, পরম্পরায় ঐরূপ শুনিতে পাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাঁহারা প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়া, অমলুপ্তের পরিচয় দিতেছেন। এই ঘণাকর, লজ্জাকর এবং সমাজের সমধিক অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্তদের উৎসাহ দেওয়া সহৃদয় মাইকেলের কার্য নহে। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ যুবকগণের মধ্যে কোন কোন বাবু, তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ে প্রস্তাব করিলে, তিনি এই বলিয়াছিলেন ‘বঙ্গীয় সমাজের ভূষণ সহৃদয় চুড়ামণি বহুদর্শী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত এ বিষয়ে সর্বোপরি প্রামাণিক হইবে। অতএব তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত ইত্যাদি। অতবড় আক্ষেপের বিষয় যে, অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া, অপরের স্বন্ধে সেই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। যাহা হাঁক আমি মৃত কবিবরের প্রতিনিধি হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বেষ্টাত্ত নটমণ্ডলীর কথা শুনিয়া দত্তজ মহাশয়কে এ বিষয়ে দোষী না মনে করেন। ফলতঃ উক্ত বিষয়ে তাঁহার মতামত যাহা ছিল, আমি তাহা স্পষ্টবাক্যে নির্দেশ করিয়াছি।’

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে অমৃতলাল বহুর তথ্যের সঙ্গে কৈলাশ বহুর উক্তিই কোন মিল নাই। অমৃতবাবু বলিতেছেন যে মধুসূদনের পরামর্শই অভিনেত্রী লওয়া হয়, আর কৈলাশবাবু বলিতেছেন যে মধুসূদনের পরামর্শ চাওয়া হইলে তিনি বিদ্যাসাগরের অলুপ্তি গ্রহণ করিতে বলেন। এ ঘটনা যে সময়কার তখন প্রায় সকলেই মধুসূদনকে ভাগ করিয়াছেন। তখন একমাত্র নিত্যসঙ্গী কৈলাশবাবু। এ সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবার অমৃতলালকেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাছাড়া কৈলাশবাবুর তথ্যের বঙ্গীয় বঙ্গশালার কেহ কখনো প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বেঙ্গল থিয়েটারের অনেক পূর্বেই বাংলা নাট্যক্ষেত্র জীলোক দ্বারা অভিনয় করাইবার আন্দোলন চলিতেছিল এবং সম্ভবত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামচাঁদ মুখার্জীর অপেরায় সর্বপ্রথম জীলোক লইয়া অভিনয় করা হয়। হাওড়ার গুরিয়েণ্টাল থিয়েটার ও National Liceum ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস (এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের পরিকল্পনা চলিতেছে) জীলোকদ্বারা অভিনয় প্রবর্তন করা হয়। ঐ বৎসর মে মাসে গ্রাণ্ড ইণ্ডিয়া থিয়েটারও জীভূমিকায় সত্যিকার জীলোক দ্বারা “বিজ্ঞানসূত্রের” অভিনয় করায়। বেঙ্গল থিয়েটারে শর্মিষ্ঠার অভিনয় ইহার অনেক পরের ঘটনা। সুতরাং মধুসূদনকে এ বিষয়ে প্রবর্তক বলা সমীচীন হইবে না।

আসল ঘটনা হইল মধুসূদন মনে প্রাণে বিপ্লবী ছিলেন। তিনি ইউরোপের আধুনিকতম থিয়েটার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বেটাছেলেরা গোঁফ কামাইয়া জীভূমিকায় অভিনয় করিবে এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। তাই বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন যখন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলো তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্কারের কথা নিশ্চয়ই

বলিয়াছেন। কারণ তখন এ বিষয়ে এদেশে আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন জানিতেন যে গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা অগ্রণী হইবে না। পতিতাদের লইয়াই অভিনয় করিতে হইবে। ইহার ফলে সমাজে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হইতে পারে। তাই তিনি এই বিষয়ে সমাজ সংস্কারক ও “প্রথম বাঙালী” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে বলেন।

অভিনেত্রী লওয়া সম্বন্ধে যে আপত্তি ও আশংকা ছিল অচিরেই তাহা দেখা দিল। তাহার বহু প্রমাণ ব্রজেনবাবু সংগ্রহ করিয়াছেন (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (চতুর্থ সং) পৃ: ১৩১-৩২ দ্রষ্টব্য।) আমরা নিয়ে তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

শর্মিষ্ঠার অভিনয়ের পর হিন্দু পেট্রিয়ট ১৮-৮-৭৩ তারিখে লিখিলেন—

“...the two actresses, who were professional Women were most successful. We wish this dramatic corps had done without the actresses. It is true that professional women Join the Jattras and natches, but we had hoped that the managers of Bengali theatre would not bring themselves down to the level of the Jattrawallas.”

‘ভারত সংস্কারক’ লেখেন—“অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেঞ্চাও ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, বুঝেই কেবল বেঞ্চাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বঙ্গীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বেঞ্চাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।”

১৮৭৪ খ্রী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ্যারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন—

“বেঙ্গল থিয়েটার সন্ত্রাস্ত বাঙ্গালী সমাজে একটা নূতন জিনিষ। রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু, এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজ-পরিত্যক্ত ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জনসমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কি না তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী এই দুর্কহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের রঙ্গগৃহে কলিকাতার অনেক লোকেই অভিনয় দর্শনার্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। নাট্যকলাভিনয়ের উন্নতি করিতে গিয়া যদি সমাজের একজন লোককেও আমাদের পক্ষে পরিহার করিতে হয় তাহা হইলে সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না।”

সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা করেন ‘মধ্যস্থ’। ১২৮০ সালের ১৪ই ভাদ্র (২৮-৮-৭৩) তারিখের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্পাদক মনোমোহন বসু লেখেন—

“বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়। অথবা বিলাতী ধরণের মেয়ে যাত্রা।.....বিলাতে রঙ্গভূমিতে স্ত্রীর প্রকৃতি স্ত্রীর দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। বঙ্গদেশে দাঁড়ি গৌরধারী (হাজার কামাক) জ্যেষ্ঠা ছেলেরা মেয়ে সাজিয়া কর্কশ স্বরে স্তম্ভুর বামা-স্বরের কার্য্য করিতেছে। ইহা কি তাঁহাদের ত্রায় সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহ হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু কর্তব্য হইল। প্রতিবিধান আর কি, সত্যকার স্ত্রী লইয়া অভিনয়। রব উঠিল “অভিনয় স্বভাবের প্রতিক্রম, পুরুষদ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি প্রদর্শন স্বভাবের প্রতিক্রম না হইয়া স্বভাবের হত্যা করা হয়।” অতএব আন স্ত্রী।.....কিন্তু বোধহয়, বঙ্গীয়

কুলবতী কুল চিরকাল কঠিন নিয়মে অবরোধিতা থাকতে নিতান্ত লাজুক ও মুখচোরা হওয়া সম্ভব বিবেচনায় নবসংস্কারকগণ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছেন। অর্থাৎ অযোগ্য ও অকর্মণ্য ভাবিয়া অকুলবতী জগৎ স্বামিনী বাররমণীতনয়াগণকে লইয়াই স্বভাবানুযায়ী, উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। ইহাতে চতুর্দিকে তাঁহাদের নামে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছে। আমরাও ধন্য ধন্য লিখিলাম, বাস্তবিক তাহা ধন্য রব নয়, ‘বাহবা’ রব। এই সহরময় তাহারা এত বাহবা খাইতেছেন যে উন্নতির চেলা ও সভ্যতার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অন্য কেহ কখনো এত ভোগ করিতে পায় নাই। লোকে কহিতেছে এতদিনে রত্নপূর্ণ বস্ত্র আমার যথার্থ মেয়ে যাত্রায় একদল নামিয়াছে, এতদিনে স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া যাহার যাহা অভিনয়ই তাহা সংস্কৃতি দ্বারা যথার্থ আমোদ উৎপাদন করিবে—এতদিনে অভিনেতৃ বালক ও যুবকগণের মন সমুদ্রস্থ থাকিয়া সকল কর্ম ত্যাগ পূর্বক একাগ্রচিত্তে রত্নভূমির পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইবে—এতদিনে তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা নিশ্চিন্ত হইলেন—এতদিনে বারাদ্ধাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র সমাজে সমাধিকার প্রাপ্ত হইল—এতদিনে বঙ্গীয় দর্শক গণের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় যথার্থ চরিতার্থ হইয়া সমাজের সাধারণ নীতি (কলিকাতার নব ভ্রমের জলের ত্রায়) স্থপবিত্র নবগতিবিশিষ্ট হইয়া উঠিল।

অতঃপর ভক্তি উন্নতির ভক্তগণের মনে মনে আরো কি অভিসন্ধি আছে আমরা তাহাই দেখিবার আশায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। বাঁচিয়া থাকিলে আরো কত কি দেখিতে পাইব। কিন্তু এত অতি সভ্যতার তেজ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা দায়।”

এ ছাড়া সমাজেও যে গুঞ্জন উঠিয়াছিল তাহা কৈলাশবাবুর পত্র হইতে জানা যায়।

স্বয়ং বিভাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় রঙ্গশালার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। (১০) উত্তোক্তারা হয় তাঁহার নিকট যান নাই, না হয় গিয়া অহুমতি পান নাই। আমাদের ধারণা অভিনেত্রী গ্রহণের অহুমতি চাহিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক অভিনেত্রী গ্রহণ করাতে বিভাসাগর মহাশয় বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিসর্জন করেন।

আমলে উত্তোক্তারা গিয়াছিলেন পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর নিকট। তাঁহার অহুমতিও পাইয়াছিলেন। এই সময়ে সামশ্রমীর নিকট যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সামশ্রমীর জীবনীকার লিখিয়াছেন—

‘১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর যখন সরকারী সহায়তায় ‘বহুবিবাহ’ আইন প্রণয়ন দ্বারা উহা রোধ করিতে যত্নবান হইলেন তখন তদ্বিরুদ্ধে আচার্যদের রক্ষণশীল মত গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা উহাতে বাধা দেন...বিভাসাগর মহাশয় আইন প্রণয়নে বিফলপ্রযত্ন হইলেন।’

বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট স্ববিধা করিতে না পারিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের উত্তোক্তারা সামশ্রমীর সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু চারিদিক হইতে যখন লোক ধিকার দিতে আরম্ভ করে তখন রঙ্গশালার অধ্যক্ষরা মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বন্ধে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিজেরা নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করে।

১। ষোণীন্দ্রনাথ এখানে একটু ভুল করিয়াছেন। ঘটনাটি ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নহে, এটা আমলে পঞ্চকোটের চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর হইবে।

২। জুন, ১৮৭৩ খ্রী ২২শে জুন মধুসূদনের মৃত্যু হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইবে।

৩। পত্রটি ১২৮১ সালের ২২শে বৈশাখ (২৪ সংখ্যা) সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল।

“সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র” নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে শ্রীবিনয় ঘোষ উহা সংকলন করিয়াছেন (পৃ পৃ ৬৬৮-৬৭১ দ্রষ্টব্য)। বইটি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হইলেও এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রটির পূর্ণাঙ্গ সদ্যবহার আজ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। বহুকাল পূর্বে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় লোকমুখে পত্রটির বিষয়বস্তুর কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, উহা দেখেন নাই। সম্প্রতি জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে পত্রটির আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে পত্রটির সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল।

৪। প্রিয় দত্ত,

আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি ও আমার দৃঢ় সংস্কার জন্মেছে যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন করার আর কোন আশাই নেই। আমার কোন চেষ্টা অথবা ধনকুবের ছাড়া অন্য কারো প্রাণপণ চেষ্টা আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। জোড়াতালি দিয়ে আর চলবে না। আমি খুব অস্থির তাই বেশি লিখতে পারলাম না।

আপনার বিশ্বাসভাজন

শ্রীদ্বন্দ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

মধুসূদনের কোন, জীবনীকার বিতাসাগরের এই পত্রটির উল্লেখ করেন নাই।

অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন বিতাসাগর যে মাইকেলের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন তাহা বিতাসাগরের ১৮-৩-৬৮ তারিখের পত্র হইতে বোঝা যায়। (দেশ, ১৪ই মাঘ ১৩৬২, পৃ ৯৬৮)। ইহার পরও বিতাসাগর মধুসূদনকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং বিতাসাগর তাহার শেষ কথা মধুসূদনকে জানাইয়াছেন তাহার বর্তমান পত্রে। এইজন্য মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে এই পত্রখানির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

৫। এইটিই কবির প্রাপ্ত সর্বশেষ লেখা। কোন গ্রন্থে এই পত্রটির উল্লেখ নাই। কৈলাশবাবু উহা সোমপ্রকাশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৬। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ‘অমৃতবাজার’ ও ‘মধ্যস্থ’ এই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আয়োজনের কথা প্রথম প্রচার করেন। সতাকার জীলোক লইয়া নাটক করিবার জন্য জনকত ভক্তলোক উত্তোগী হইয়াছেন।

৭। ‘মধুবিলাপ’ (অমিত্রাক্ষর কাব্য) পৃঃ ১২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘বিয়োগ বিলাপ’। উদ্ধৃত অংশটি শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। যতীন দত্ত মহাশয় তাহার প্রবন্ধে সর্বপ্রথম কাব্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন—‘১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে—যেদিন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হয়, সেইদিন ঐক্যগোপাল ভক্ত এবং স্বর্গীয় কবির বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুরোধে দুই ঘণ্টার মধ্যেই ভুবনচন্দ্র একখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেন; ক্ষুদ্র কাব্যের নাম ‘মধুবিলাপ’।’—প্রবর্তক, ভাদ্র ১৩৪৩, পৃঃ ৫৩৯।

*। মধুসূদনের জীবদ্দশাতেই পাণ্ডুলিপি হাতে না পাইলে কবির মৃত্যুর দিন (২২-৬-৭৩)

ভুবনচন্দ্র কি করিয়া লিখিলেন ‘অপূর্ণ এখনো’। তাছাড়া তখনো পাণ্ডুলিপি না পাইলে ১৬ই আগষ্ট অভিনয় হইত কি করিয়া।

৮। এক রাত্রিতে জগদবিখ্যাত হবার আশায় অনেক বালখিল্য নাট্যকার গভীর গণ্ডস্থলে মুকবিয়ানা মাথিয়ে পাণ্ডুলিপি হস্তে, এমন কি কিঞ্চিৎ পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারের জ্ঞান মধুসূদন জীবনের শেষ লেখা “মায়াকানন” লিখে দেহরক্ষা করেছেন জেনে, “সঙ্কেতকানন” বলে একখানি নাটক লিখে আমাদের দিয়েছিলেন এবং আমারও একটি ইঙ্গিতের শেষার্থ না বুঝতে পেরে “কেওড়া কানন” নাটক পর্যন্ত লিখে এনেছিল।” (১৩৩৪ খ্রী মাসিক বহুমতীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা)। এর পরও কানন যুক্ত “আনন্দকানন, নন্দনকানন প্রভৃতি অভিনীত হয়। পুরাতন প্রসঙ্গ (অমৃতলালের স্মৃতিকথা, ২য় পর্যায় পৃ ১৩৪)

৯। ‘From the very beginning Sarat Babu through the suggestion of Michael Madhusudan Dutt, Pandit Satyabrata Samasrami and Mr. O. C. Dutt (Sarat Babu’s brother in law), introduced females in the Bengal Theatre and four actresses were taken.’ P. 229

১০। “Pandit Iswarchandra Vidyasagar, who was one of the patrons and Supporters of Sarat Babu from the time of his Theatre was contemplated, Severed his connection with it at the introduction of females”—Indian Stage vol II-III, by Dr Hemendra Nath Dasgupta p p 279-280,

কথকের কথকতা

সুভদ্রা প্রামাণিক

বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, উচ্চাঙ্গ সংগীত, অজস্র গুহার চিত্রাবলী যেমন ভারতের একেবারে নিজস্ব সম্পদ, ভারতীয় নৃত্যধারাও তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কলা-ফসল। প্রাচীন যুগে এই নৃত্যকলা অপূর্ব মহিমায় প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল ভরতনাট্য নৃত্যপদ্ধতির অন্বেষণে। ভরতনাট্য হচ্ছে ভারতের আদি অবিমিশ্র বিস্তৃত ও শ্রেষ্ঠতম চিরায়ত (ক্লাসিক্যাল) নৃত্য। ভারতীয় মার্গসংগীতে ধ্রুপদের যে স্থান, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে ভরতনাট্য সেই স্থান অধিকার করে আছে। আদিকালে ভরতনাট্য ছিল ধর্মাহুষ্ঠানের অঙ্গ এবং দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দিরগুলি ছিল তার অধিষ্ঠান ও বিকাশক্ষেত্র।

হিন্দুসংগীতের অবিমিশ্র রূপের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় দক্ষিণের কর্ণাটী সংগীতে তেমনি খাঁটি হিন্দু নৃত্যকলার রসরূপেরও সন্ধান মিলবে দক্ষিণ ভারতেই, শুধু ভরতনাট্য নয়, কেরল প্রদেশে উদ্ভাবিত মুখাস-নৃত্যনাট্য কথাকলিতে এবং নিয়মপদ্ধতির দিক দিয়ে ভারতনাট্যের অনুসারী মোহিনীনাট্যে। উত্তর-পূর্ব ভারতে, মণিপুর রাজ্যে, অপূর্ব মনোহর যে নৃত্যকলা বিকাশ হয়ে উঠেছিল স্বকীয় মহিমায় সেটিও প্রভাব-বিমুক্ত রয়ে গেছে অগ্র সংস্কৃতির হাত থেকে। কিন্তু সংগীতে, উত্তর-ভারতের তানসেন প্রমুখ প্রবর্তিত ধারাটি যেমন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণজাত তেমনি নৃত্যকলার ক্ষেত্রেও পর-পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে মোগল যুগে। আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকে যার উদ্ভব, একদা যা ছিল সামাজিকভাবে ধর্মাহুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ, সেই ভাব-রাশ-তাল সমৃদ্ধ হিন্দু নৃত্যকলা উত্তর-ভারতে একটা নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠল সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মোগলদের আমদানি আরবি ফারসি ও তুর্কী সংস্কৃতি ও নৃত্যকলার আঙ্গিকের সংমিশ্রণে। এই অপরা সংস্কৃতির অগ্রপ্রবেশহেতু দেবমন্দিরের কলা পরিণত হল দরবারী কলায়। হিন্দুজাতির ধর্মাহুষ্ঠানের সঙ্গে এই নৃত্যকলার সম্বন্ধ অতঃপর আর রইল না বটে কিন্তু হিন্দু ধর্মাঙ্গ ও ভাবাবেগ তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রইল অবিচ্ছেদ্যভাবে।

সর্বাঙ্গিক সংস্কৃতির সময়ক্ষেত্র ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম এই দুইটি নৃত্যকলার মিশ্রণের ফলে জন্ম নিল নতুন নৃত্যকলা—কথকনৃত্য। এই নৃত্যের অন্তর্গত রাসলীলা পর্বটিতে লোকনৃত্যের বহু উপকরণ নিহিত। অধিকাংশক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনী হচ্ছে এই পর্বের বিষয়বস্তু। কথক নৃত্যের আঙ্গিক নাট্যশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পরিবর্তিত লোকরঙ্গক দরবারী চেহারা এবং মিশ্র-সংস্কৃতির আন্তর রূপ নৃত্যরসিকদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে।

ভরতনাট্যের তালের শৃঙ্খলে আবদ্ধ স্বযম ও অভিনয়ের ভাবৈবশ্বর্ষ, কথাকলির নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত চৌষটি প্রকার ও নাট্যশাস্ত্র-বহির্ভূত অগ্ন্যন্ত বহু মুদ্রা বা হস্তভঙ্গির কলারূপ এবং তার সামগ্রিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের অংশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না কথক নৃত্যে। কারণ কথকে যেটুকু অভিনয় আছে তা একান্তই সীমাবদ্ধ কটি সহজ লীলায়িত অঙ্গভঙ্গি ও ‘পোজের’ মধ্যে।

কথক নৃত্য মহাকাব্য হতে পারত কিন্তু তা হয়নি, বরং বলা যায় এ নৃত্য অনেকটা গীতিকাব্যধর্মী। ভাবের মহোৎকর্ষতা এতে নেই, কিন্তু এর স্বকীয় মাধুর্যটুকু অল্পমম। কথক নৃত্যে শিল্পীর লীলায়িত দেহভঙ্গি, লঘু অথচ দ্রুত পাদকর্ম, গতিবেগ ও লয়ের লীলামাধুরী দর্শকের রসচিত্ত উদ্বেলিত করে। রূপ রস ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী মিলনেই শ্রেষ্ঠ কলার পূর্ণ বিকাশ ও সার্থকতা। কথক নৃত্য রূপের দিক দিয়ে যত নিখুঁত ভাবের দিকে তত গভীর নয়। মনোহর ভঙ্গির দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালনে কথক নৃত্য যতই উন্নত হোক, একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে এ নৃত্য ব্যঞ্জনা-ব্যঞ্জে বড়ই দুর্বল। নাট্যশাস্ত্রে স্থম্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, সমুদয় ভাবকেই প্রকাশ করতে হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভিনয়ের দ্বারা। ‘অভিনয়দর্পণ’ প্রণেতা নন্দিকেশ্বর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: ‘চোখ যেখানে যাবে হাত থাকবে সেইখানে, মন যাবে চোখের এলাকায়, মনের অধিষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হবে ভাব আর ভাবের অল্পগামী হবে রস।’ ভাব ও রসের সার্থক সৃষ্টিতেই শুধু নৃত্যকলা কেন, সব কলারই পরিপূর্ণতা। কিন্তু এদিক দিয়ে কথক নৃত্যের ত্রুটি আছে। এই নৃত্যকর্মে চোখকে যতটা ভুলায় ভাবাবেগকে সেই পরিমাণে উদ্ভুদ্ধ করতে পারে না। কথক নৃত্যে রূপের পিপাসা মেটে কিন্তু অপরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না বলে একটা আক্ষেপ যেন থেকে যায়।

দেশভেদে, কথকনৃত্যের রূপায়ণে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। মূলতঃ লামাশ্রেণীর নৃত্য হলেও এ নৃত্যে প্রচণ্ড দেহভঙ্গি ও দৃঢ় পাদকর্মের প্রচুর অনুলীলন প্রয়োজন। এজন্তে স্বদেশে তো বটেই বিদেশে কথক নৃত্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

নৃত্য হিসাবে ভরতনাট্য ও কথকের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে আজকার দিনে তর্কের ঝড় উঠে থাকে। দুটি নৃত্যই দুই রীতির দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ, বিতর্কটি অমূলক। কারণ এরা প্রত্যেকই নিজ নিজ ঘরানার বিচারে প্রাণশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ভরতনাট্য যেমন কথকনৃত্যও তেমনি ভারতের প্রাণসত্তার মর্মমূল থেকে রস আরোহণ করে পুরিপুষ্ট ও বিকশিত। এই উভয় নৃত্যকলাই বহু গুণীজনের সাধনার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে আজ যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ভরতনাট্য ও কথক নৃত্যের প্রকৃত পার্থক্য, যদি বিচার করতেই হয় তবে, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য সেটি মনে রাখা দরকার। মহাকাব্যের বিরাটত্ব, গাভীর্য ও ভাবসম্পদ গীতিকাব্যে না থাকতে পারে কিন্তু গীতিকাব্যের যে নিজস্ব অনির্বচনীয়তা, ছন্দের মনোহারিতা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মার রূপ সে-ও তো ভাবগ্রাহী রসচিত্তকে কম উদ্ভুদ্ধ করে না! মহাকাব্যের আবেদনে সর্বচিত্ত যেভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে গীতিকাব্যে হয়তো সেভাবে হয় না, কিন্তু তার ললিতস্বর ও ছন্দ কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে যে সাড়া জাগায় তা কী অস্বীকার করা যায়? এই দুই শ্রেণীর নৃত্যের রসবিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত পৃথক। যুগ-প্রভাব থাকা সত্ত্বেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে খেয়াল ঝুঁংরি টপ্পা ইত্যাদি যেমন স্ব স্ব ক্ষেত্রে আজও প্রতিষ্ঠিত তেমনি আরব পারস্ত ও তুর্কিস্থান থেকে আমদানি মুসলিম সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ‘কথক নৃত্য’ জাতিচ্যুত হয়নি, হবার সম্ভাবনাও নেই। কারণ বহিরঙ্গে অর্থাৎ সাজসজ্জায় দরবারী-সংস্কৃতির চটক থাকলেও এর অন্তরসত্তা খাঁটি ভারতীয়।

বক্ষিম উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

ক্রেডপত্র—ক ॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

ধর্মের শব্দের অনেকগুলি অর্থ হয়—যেমন, ইংরেজী Religion-এর প্রতিশব্দ, Morality, নীতি, Virtue প্রকৃতি। এই সমস্ত অর্থ মিলে প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। বক্ষিমের মতে—“হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।”

ক্রেডপত্র—খ ॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

এখানে গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে ‘ধর্ম’ বা ‘Religion’ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধর্ম-শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় বক্ষিমচন্দ্র কোম্‌ত-এর মতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। কোম্‌ত-এর মতটি এই—“Religion, in itself expresses, the state, of perfect unity which is the distinctive mark of man’s existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose,” অর্থাৎ “Religion consists in regulating one’s individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals.” এই মতের ভিত্তিতেই তিনি হিন্দু-ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন।

ক্রেডপত্র—গ ॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ইংরাজী উদ্ধৃতি। অষ্টম অধ্যায়ের সঙ্গে এখানে হার্বার্ট স্পেন্সারের মত দেওয়া হয়েছে।

ক্রেডপত্র—ঘ ॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

এই অধ্যায়ের শিরোনাম—“অহুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ”। জাতিভেদ প্রথা শাস্ত্রসম্মত। কারণ কর্মের বিভাগ থাকলে তার দ্বারা সেই কাজে দক্ষতা জন্মায়। সেই কাজে অহুশীলন করলে জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি পায়।

খাণ্ডবদাহ ॥ কৃঃ কঃ ৪র্থ খণ্ড/৪র্থ পরিঃ ॥

অর্জুন যখন খাণ্ডববন দাহ করেন তখন কৃষ্ণ তাঁর সহায় ছিলেন। এই খাণ্ডববন দাহন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলেই মনে হয়। তবে বক্ষিমচন্দ্র এটুকুই স্বীকার করতে চান—“যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জুন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন।” এই খাণ্ডববনদাহনের সংগে ময়দানব নামে যে অপূর্ব নির্মাতার ঘটনা সংযুক্ত আছে তাকে বক্ষিমচন্দ্র অস্বীকার করতে চাননি।

খতোৎ ॥ (গল্প পঞ্চ বা কবিতাপুস্তক) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪, পৃ ২২-২৪। খতোৎ অর্থাৎ জোনাকিকে অনেকেই অবজ্ঞা করে। কারণ চন্দ্র-সূর্যের তুলনায় তার আলো অত্যন্ত কম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই খতোতের আলোকেই অন্ধকারের দিশারূপে গ্রহণ করেছেন। এই রচনাটিকে ‘কমলাকান্তের দপ্তরের’ পূর্বাভাসরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষতঃ কমলাকান্তের দপ্তরের ‘বসন্তের কোকিল’-এর সঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটির বর্ণনারীতির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।—

“যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অহুভূত করি; মেঘগর্জন শুনিয়া, সর্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জন শ্রবণ করি;—বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জলই প্রেরিত হইয়াছিলাম; কাঁদিবার কথা নাই। আইস, নীরবে জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি।

নাহলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কতবার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি। জ্যোতিষ্মান হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হয়! আমরা খতোৎ! এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না। কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জকিশলয়কৃত অন্ধকার মধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।”

গগন পর্য্যটন ॥ (বিজ্ঞানরহস্য) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, পৌষ ১২৮০। বর্তমান যুগে গগন পর্য্যটন ও তৎসম্বন্ধীয় গবেষণার অত্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু এর সূচনাপর্বের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অজ্ঞাত গগনপর্য্যটনের কোঁতুকপ্রদ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া শৃংখলোক সম্বন্ধে অনেক কথাও বর্ণিত হয়েছে। রচনাটির মধ্যে কোঁতুকরসের স্নিগ্ধ প্রলেপ আছে।

গল্প (বাল্যরচনা : গুঃ অগ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৩শে এপ্রিল ১৮০২। স্বরূ—‘গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী.....’।

অনিত্য বস্তুর প্রতিমানবজীবনের আসক্তি দূর করার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গল্প নিবন্ধটি রচিত। ভাষা অত্যন্ত জটিল, তৎসমবহুল ও দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ। উদাহরণ—‘অম্বুবিশ্বসম জীবনে চন্দ্রাক্ষ সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে, সেসব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরম বিধি প্রিয় পিতা পরাংপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে, তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মৃৎ মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্তেকও বিবেচনা করে না যে, তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরসর প্রতিপালন করিতেছে।

এখন যে দেহ ধূলিকণা পতনে পাষণ্ড প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ স্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দম অস্থিকণা কীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষা, যক্ষ, ভূত-প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক।’

এই গল্প কিভাবে ‘দুর্গেশনন্দিনী’র সাবলীল গল্পে পরিণত হল তার ইতিহাস আবিষ্কার কোঁতুলপ্রদ।

গর্দভ (লোকরহস্য) ॥

প্রঃ প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, আবেণ ১২৮০, পৃঃ ১৮৭-৮৮। ‘গর্দভ’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, মহাশয়সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীতেই যে একধরনের অকর্মণ্য লোক গা ঢাকা দিয়ে দিব্যি নাম কিনছে, তাদের লক্ষ্য করে তীব্র বাক্যবাণ নিষ্ক্ষেপ করেছেন। বিচারক, শিক্ষক, পণ্ডিত, গায়ক—কাউকেই বাদ দেন নি। এমনকি দশরথকে (বিচারবুদ্ধিহীন ভীমরতিগ্রস্ত বলে), যুধিষ্ঠিরকে (দ্রুতক্রীড়ায় সর্বস্ব পণ করার জন্তে) এবং সেনরাজা লক্ষ্মণসেনকে (বঙ্গে মুসলমান অধিকারের জন্তে) গর্দভ আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

এখানে বক্তব্যের ভঙ্গিটি সরাসরি ও অত্যন্ত তীব্র হলেও হতাশ হবার কিছু নেই। বঙ্কিম নিজেদের দলের গর্দভদেরও ছেড়ে দেন নি। তাই প্রথমেই বিচারকের কথা—‘তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ষয় ইত্যন্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকিল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণভৃঙ্গিহ্মখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।’

হে বৃহস্পতি! তখন সেই কাব্যরসে আত্মীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্বস্ব শ্রামকে দাও, শ্রামের সর্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।’

গ্রন্থের উদ্দেশ্য (রুঃ চঃ ১ম খণ্ড/১ম পরিঃ) ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থ রচনার প্রধানতঃ তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত অলৌকিক গালগল্প প্রচলিত তার মিথ্যা প্রতিবাদন। দ্বিতীয়তঃ, ‘ধর্মাদোলনের প্রবলতার এই সময়ে (উনবিংশশতাব্দীতে) কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়।’ তৃতীয়তঃ, ‘ধর্মতত্ত্বে’ তিনি যেসমস্ত উৎকৃষ্ট মানবিক বৃত্তিগুলির উল্লেখ করেছেন তার একমাত্র সামগ্রিক বিকাশ হয়েছে কৃষ্ণচরিত্রে। সুতরাং এই তিনটি দিক থেকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

গ্রাম্যকথা (লোকরহস্য) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘প্রচার’—ভাদ্র ১২৯১, পৃঃ ৬২-৬৮ ও পৌষ ১২৯১, পৃঃ ১৯০—১৯৪।

‘গ্রাম্যকথা’র বঙ্কিমচন্দ্র সরল গল্পের সাহায্যে গ্রামের শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন।

গ্রাম্যকথা-র প্রথম সংখ্যার শিরোনাম—‘পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়’। লেখক একদিন বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্তে এক পাঠশালায় আশ্রয় নিয়ে দেখেন—ভূ ধাতুর উত্তর ক্র প্রত্যয় হয় তা না বলতে পারার জন্য ভৌদার গুরুমশাই প্রহার করলেন। ভৌদার বাড়িতে কারা দেখে তার মা গুরুমশাইকে শিক্ষা দিতে এলেন। তারই রসগ্রাহী বর্ণনা গল্পটিতে। গ্রাম্য পণ্ডিতের বিচার দৌড়

কিরকম তা পণ্ডিতমশায়ের সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে লেখক প্রকাশ করেছেন।

গ্রাম্যকথায় দ্বিতীয় সংখ্যার নাম—‘ধর্ম-শিক্ষা’। তার প্রথম ভাগ হল Theory অর্থাৎ পাঠ। পিতা-পুত্রকে শেখাচ্ছেন—পরস্পরকে মা বলে মনে করবে। কিন্তু ছেলে শিখলো অস্ত্ররকম। দ্বিতীয় ভাগ Practice-এ সে তা প্রয়োগ করেছে। কাদম্বিনী নামে এক স্ত্রীলোককে মা সম্বোধন করে তার ওপর অত্যাচার করেছে, ময়রার দোকানে সন্দেশ লুণ্ঠ করে ‘পরদ্রব্যোষু লোষ্ট্রবৎ’-এর প্রয়োগ করেছে এবং পণ্ডিতমশাইকে মার দিয়ে ‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু’ শিক্ষার প্রয়োগ দেখিয়েছে।

এখানে মুখ্যতঃ গল্পের দ্বারাই হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

গীতিকাব্য (বিবিধ প্রবন্ধ/১ম) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, বৈশাখ ১২৮০।

‘গীতিকাব্য’ প্রবন্ধটির প্রেরণা নবীনচন্দ্র সেনের ‘অবকাশরঙ্গিনী’ কাব্য। এই কাব্যটিতে ২২টি গীতিকবিতা স্থানলাভ করেছে। এই কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতবর্ষে সমস্ত সাহিত্যকেই কাব্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেমন দৃশ্যকাব্য, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য এবং খণ্ড কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র খণ্ডকাব্যের মধ্যেই গীতিকাব্যকে স্থান দিতে চেয়েছেন। গান ও গীতিকাব্যের পার্থক্যের কথাও বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করেছেন। তবে তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে ‘গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; আগে গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্যে।” বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটনমাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।”

গীতিকাব্য কেবলমাত্র স্বতন্ত্রগ্রন্থের বিষয় নয়, নাটকের মধ্যে কোথাও কোথাও গীতিকাব্যোচিত ভাবের প্রকাশ হতে পারে। যেমন ‘উত্তররামচরিতে’ নীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারের মধ্যে গীতিকাব্যের প্রকাশ দেখা যায়।

সামাজিক চুক্তি ॥ জাঁ জাক ৰুশো। অনুবাদক : ননীমাধব চৌধুৰী। সাহিত্য আকাদেমী।
নয়াদিল্লী। ছয় টাকা।

সামাজিক চুক্তি অনুসারে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি একটা প্ৰাচীন মতবাদ। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে এই
মতবাদ বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল।

মানব ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন ৰাষ্ট্ৰ বলে কিছুই ছিল না। 'স্টেট অফ নেচাৰ'
অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক অবস্থায় মানুহ বাস করতো সে সময়। আইন, নিয়ম-কানুন কিছুই ছিল না।
বিশৃঙ্খলা, অৰাজকতা, হিংস্ৰতাৰ শোকে যন্ত্ৰণা থেকে মুক্তি পেতে অতঃপর মানুহ সামাজিক চুক্তি দ্বাৰা
ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টিৰ উপযোগিতা উপলব্ধি করে। মুক্তিৰ অনিৰ্বাণ দীপশিখা জ্বলে তুললেন ইংরেজ দাৰ্শনিক
হবস, লক এবং সেই সঙ্গে ফরাসী দাৰ্শনিক জাঁ জাক ৰুশো—তাঁৰ বিখ্যাত 'সোশাল কন্ট্ৰাক্ট' বা
'সামাজিক চুক্তি' গ্ৰন্থে। স্বভূমিকা সম্বলিত চাৰটি খণ্ডে সামাজিক চুক্তি ৰচিত। এই গ্ৰন্থে ৰুশোৰ
ৰাষ্ট্ৰদৰ্শন ব্যতিৰেকেও ৰাষ্ট্ৰনীতি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদও ব্যক্ত হয়েছে।

প্ৰথম পৰ্বে ৰুশো সামাজিক চুক্তিৰ উপকাৰিতা তৎসহ আদিম সমাজ ব্যবস্থাৰ বিভিন্ন দিক
নিয়ে আলোচনাৰ সূত্ৰপাত করেছেন। দ্বিতীয় পৰ্বে আক্ৰমণ করেছেন স্বৈৰাচাৰী ৰাজতন্ত্ৰকে।
ৰুশো এক্ষেত্ৰে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত ৰাজক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে যুক্তি প্ৰদৰ্শন করেন। স্বৈৰাচাৰী ৰাজতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে
জনগণেৰ চেতনা জাগ্ৰত করার মহান ব্ৰতই এই অংশেৰ প্ৰতিপাত্ত বিষয়। পৰিশেষে, তৃতীয় ও চতুৰ্থ
পৰ্বে ৰুশো সাধাৰণ ভাবে শাসনতন্ত্ৰ ও তাৰ শ্ৰেণীবিভাগ এবং নিৰ্বাচন তৎসহ ভোটপ্ৰদান সম্পৰ্কে
বিশেষ আলোকপাত করেছেন। ৰুশোৰ মতাদৰ্শে ৰাজাৰ কোন স্থান নেই বা কোন বিশেষ ব্যক্তিৰ
হাতেও ক্ষমতা অৰ্পণ করেন নি। ক্ষমতা সমাজেৰ উপৰই অৰ্পিত ছিল। সমাজই সাৰ্বভৌম।
ৰুশোৰ সামাজিক চুক্তিৰ ৰূপৰেখা সে সময় জনগণকে এক অগ্ৰতৰ আদৰ্শে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য
করেছিল। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ প্ৰচাৰলাভেৰ ফল স্বৰূপ ফ্ৰান্সে গুৰু হয়েছিল স্বৈৰাচাৰী
ৰাজতন্ত্ৰেৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম।

ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰেৰ মূলকথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে ৰুশোৰ 'কঁত্ৰা সোসিয়ালে'।
'সামাজিক চুক্তি' বা 'ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰেৰ মূলকথা' গ্ৰন্থটি ৰুশোৰ মহাগ্ৰন্থ 'কঁত্ৰা সোসিয়ালে'ৰই মূল
ফরাসী থেকে বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্ৰীযুক্ত ননীমাধব চৌধুৰী মহাশয় একদা মূলত বাংলা ভাষায়
ৰাষ্ট্ৰদৰ্শনেৰ গ্ৰন্থাদিৰ অভাব দূৰীকৰণে সবুজপত্ৰগোষ্ঠী এবং সেই সঙ্গে প্ৰমথ চৌধুৰীৰ প্ৰেৰণায় বৰ্তমান
'কঁত্ৰা সোসিয়ালে' গ্ৰন্থেৰ অনুবাদে উদ্বুদ্ধ হন। সেই সময়ে অবশ্য স্বল্প সংখ্যায় সেই অনুবাদ প্ৰচাৰেৰ
দায়িত্ব অনুবাদকেই বহন করতে হয়েছিল। এতকাল উক্ত 'সামাজিক চুক্তি' দুপ্ৰাপ্য গ্ৰন্থতালিকাৰই
অন্তত্বুক্ত ছিল। অত্যন্ত সুখের কথা, সাহিত্য আকাদেমী ননীমাধব চৌধুৰী-কৃত 'কঁত্ৰা সোসিয়ালে'ৰ

বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘকালের একটি অভাব মোচন করলেন।

রুশোর 'কঁত্রা সোসিয়াল', বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রদর্শনের এক দুর্লভ ভাষ্য। রাষ্ট্রীয় অধিকার বিষয়ক রুশোর অত্যাশ্চর্য বিপ্লবী চিন্তাধারাও বর্তমান গ্রন্থে সূত্রাকারে সংযোজিত। নিদারুণ প্রযত্নে ননীমাধব চৌধুরী মহাশয় অনুবাদকার্য সমাধা করেছেন—এজন্য তিনি উৎসাহী বাঙালী পাঠকমহলের ধন্যবাদার্থ। গ্রন্থের প্রারম্ভে অসামান্য স্বজনী প্রতিভাশালী জাঁ জাক রুশোর জীবনী ও তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে একটি নান্দীদীর্ঘ মূল্যবান নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। তৎসহ পরিশিষ্টে সংযুক্ত রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদেশী শকাবলীর প্রতিশব্দ গ্রন্থে প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ অনুধাবনে সাধারণ পাঠককে সহায়তা করবে। রুশোর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রচার কামনা করি।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ ১ মাঘ ১৩৭৭

সমকালীন

**EXPORT
QUALITY**



এখন
আপনাদের জন্যও
পাওয়া যাচ্ছে।

সুলেখা®
একসিকিউটিভ কালি

এতে সলভেন্ট এস-১০০ আছে
পার্যাবক হু-রাক, বেডি হু ও জেট রাক
ওয়াশবল রাখল হু, এয়ারব্রু গ্রীন ও স্ফারলেট রেড



Progressive/SW-34

সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থমালা

কালিকট থেকে পলাশী—শ্রীমতীজ্ঞমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযানের কাহিনী। ১০টি বিবল মানচিত্র। [৬'৫০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি—ডঃ সূর্যকান্তবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০'০০]

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫'০০]

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাস্ত্র-সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫'০০]

রামায়ণ কৃতিবাস বিরচিত—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগোপযোগী প্রকাশনায় দীর্ঘমণ্ডিত। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সূর্য রায় অঙ্কিত বহু রঙীন ছবি। [৯'০০]

উপনিষদের দর্শন—শ্রীহরিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭'০০]

রবীন্দ্র-দর্শন—শ্রীহরিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [২'৫০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা—শ্রীহরিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের স্মৃতি আলোচনা। [১২'০০]

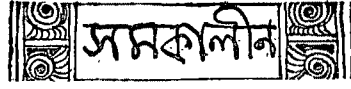
বাঁকুড়ার মন্দির—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫'০০]

ডেটিনিউ—অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ভূমিকা। [৩'০০]

সা হি ত্য সং স দ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৯ ॥

মাঘ
তেরশ' সাতাত্তর



অষ্টাদশ বর্ষ
১০ম সংখ্যা



মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাটাদ ওঝা

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজপুতানার অন্তর্গত শিরোহী নামক দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত রোহেরা নামক গ্রামে গৌরীশঙ্করের জন্ম হয় (বর্তমানে এই দেশীয় রাজ্যটি রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত)। গৌরীশঙ্করের পিতা হীরাটাদ ছিলেন একজন দরিদ্র স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। পৌরোহিত্য করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। গ্রামস্থ পাঠশালায় গৌরীশঙ্করের বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালায় পড়িবার সময় মাত্র ৮ বৎসর বয়সে যজুর্বেদের ৪০টি অধ্যায় ৪০ দিনে কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য ছাত্রদের বিস্মিত করিয়া দেন। বাল্যকালেই তিনি পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন অভি্যাস করেন। গৌরীশঙ্করের অসাধারণ মেধা দেখিয়া তাঁহার পিতা হিতৈষীদের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ বোম্বাই পাঠাইতে মনস্থ করেন। গৌরীশঙ্করের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দরাম এই সময়ে বোম্বাই-এ থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। চতুর্দশ বর্ষীয় গৌরীশঙ্কর স্বগ্রাম হইতে ১৬০ মাইল পদব্রজে আমেদাবাদ আসিয়া বোম্বাইগামী রেলগাড়ীতে উঠেন। তখন রেলপথ এত বিস্তার লাভ করেন নাই। ১৬০ মাইল দূরস্থ আমেদাবাদ রেলস্টেশনটিই ছিল গৌরীশঙ্করের বাসভূমি রোহেরা গ্রাম হইতে নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন। বোম্বাইএ আসিয়া গৌরীশঙ্কর প্রথমে গোব্বলদাস তেজপাল সেমিনারী ও পরে এল্‌ফিনষ্টোন হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যালক্ষী পাঠশালায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিক্ষা করিতে থাকেন, গ্রামে বাসকালেই গৌরীশঙ্কর সংস্কৃত ভাষায় লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৌরীশঙ্কর বোম্বাইএর উইলসন কলেজে প্রবিষ্ট হন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইনও অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময় তিনি গুজরাটি

ভাষা ও উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষার প্রাক্কালে গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ায় গৌরীশঙ্করকে বাধ্য হইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতে হয়। তিনমাস পরে বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করার পর কলেজে সাধারণ শিক্ষা ও আইন অধ্যয়নে তাঁহার স্পৃহা অপনীত হয়। এই সময়ে তিনি বোম্বাইএর এশিয়াটিক সোসাইটির পাঠাগারে বসিয়া গ্রীক ও রোমদেশের ইতিহাস পাঠকালে প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ ভগবানলাল ইন্ডজীর সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইন্ডজীর নির্দেশ অনুযায়ী কিছুকাল অধ্যয়নের পর ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গৌরীশঙ্কর প্রভূত পারদর্শিতা লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি পাঠাগারে রক্ষিত পুঁথিপত্র হইতে রাজপুতনার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি প্রচুর তথ্য আহরণ করেন। ভগবানলাল ইন্ডজীর সাহচর্য পাইয়া গৌরীশঙ্কর প্রাচীন মুদ্রা ও প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারেও সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। এই সময় প্রাচীন লিপিমালার বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, এরূপ কোন পুস্তক ছিল না। এই বাধা সত্ত্বেও প্রচুর অধ্যবসায়ের দ্বারা গৌরীশঙ্কর বহু মুদ্রা ও শিলালেখাদির পাঠোদ্ধার করেন। বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত তাম্রশাসন, আবুপর্বতের শিলালেখমালা, একটি প্রাচীন কুবাণ যুগীয় মূর্তির পাদ-পীঠে উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করিয়া গৌরীশঙ্কর পুরাতত্ত্বজ্ঞ ভগবানলালকে বিস্মিত করেন। শিষ্য গৌরীশঙ্করের পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় এবং বিভিন্ন ভাষা ও ইতিহাসের জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া ভগবানলাল তাঁহাকে দেশের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে কর্ণেল টড রচিত *Annals and Antiquities of Rajasthan* ও *Travels in Western India* পুস্তক দুইখানি গৌরীশঙ্কর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত পুস্তকটি পাঠ করিয়া তিনি রাজপুতনার প্রতিটি অঞ্চল পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উদয়পুরে আসেন। এখানে তাঁহার সহিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমল দাস ও পণ্ডিত মোহনলাল পাণ্ডেয়ের পরিচয় স্থাপিত হয়। ইহাদের মাধ্যমে উদয়পুরের মহারাণা গৌরীশঙ্করের বিশেষ গুণগ্রাহী হইয়া উঠেন ও তিনি গৌরীশঙ্করকে উদয়পুর রাজ্যের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে উদয়পুরে একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হইলে তিনি মহারাণা ফতেসিং কর্তৃক উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উদয়পুর সংগ্রহশালার ভারপ্রাপ্ত হইয়া গৌরীশঙ্কর সমগ্র উদয়পুর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বহুতর প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র রাজপুতানার ইতিহাস রচনার জগুও বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে গৌরীশঙ্করের একটি গ্রন্থ উদয়পুর হইতে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই বিষয় লইয়া ইতিপূর্বে কোন অভ্যন্তরীণ বা ভারতীয় পণ্ডিত পুস্তক রচনা করেন নাই। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত লিপিশুল্লির উদ্ভব, বিবর্তন ও ব্যবহারের বিষয় এই গ্রন্থে তিনি প্রধানতঃ শিলালিপি মালার ভিত্তিতে পুঞ্জীকৃতরূপে আলোচনা করেন। এই পুস্তকের সঙ্গে ৮৪টি চিত্রও প্রদত্ত হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় ধুরন্ধর ভারততত্ত্বজ্ঞগণ এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঋগ্বেদাদি রচনার কালে ভারতবর্ষে কোন বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না, খ্রীষ্ট জন্মের মাত্র কয়েকশত বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মী, খরোষ্টি প্রভৃতি প্রাচীন বর্ণমালাগুলি বৈদেশিক স্বত্রে ভারতে প্রবেশ লাভ করে ইতিপূর্বে প্রচারিত ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতদের এই মতকে গৌরীশঙ্কর দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেন। গৌরীশঙ্করের এই পুস্তক রচনার দুই বৎসর পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে

প্রসিদ্ধ জার্মান ভারততত্ত্বজ্ঞ গেঅর্গ বুল্লার জার্মান ভাষায় এই বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (Indische Palaeographie)। জার্মান ভাষায় রচিত এই পুস্তকটির একটি ইংরাজী অনুবাদ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে Indian Antiquary পত্রিকার পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মী ও খরোষ্টি দুইবিধ প্রাচীন লিপিরই মূলরূপ পাণিনীয় যুগের পূর্বেই ভারতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হয়—বুল্লার তাঁহার গ্রন্থে এই মতটিই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দীভাষায় লিখিত গৌরীশঙ্করের ভারতীয় লিপিমালার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সম্ভবতঃ বুল্লার ও তাঁহার সমসাময়িক ইউরোপীয় ভারততত্ত্বজ্ঞগণ প্রশিধান করিতে পারেন নাই। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর নবলঙ্কতথ্যের ভিত্তিতে এই পুস্তকের একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই উপায়ে গ্রন্থের আর একটি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে (১)। প্রাচীন ভারতীয় লিপি যে সম্পূর্ণরূপে ভারতজাত বর্তমানে সে সম্বন্ধে বিশেষ মতবৈধতা নাই। প্রাচীন ভারতীয় লিপির ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা গৌরীশঙ্করের জীবনের প্রধান কীর্তি।

উদয়পুরে আগমনের পর গৌরীশঙ্কর সমগ্র রাজপুতানার ইতিহাস লিখিতে মনস্থ করেন ও এই উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজপুতানার প্রতি স্থানে গমন করিয়া তথ্য ও মূদ্রা, ক্ষোদিত লিপি, প্রাচীন পুথি, পাণ্ডুলিপি, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে থাকেন। এইটি ছিল তাঁহার কর্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য। প্রথমেই তিনি শোলাস্কী জাতীয় রাজপুতদের ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি বাদামি, কলাগী, ভেঙ্গি, পিঠাপুরম, শ্রীকরম্, বিশাখাপত্তম প্রভৃতি স্থানের শোলাস্কীদের ইতিবৃত্ত বর্ণন করেন। (২) অতঃপর তিনি শিরোহী রাজ্যের ইতিহাস রচনা করেন। শিরোহী রাজ মহারাজা কেশরী সিংজী এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। (৩) পৃথকভাবে এই দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া গৌরীশঙ্কর অতঃপর ছয়খণ্ডে কয়েক সহস্র পৃষ্ঠায় সমগ্র রাজপুতানার ইতিহাস রচনা ও প্রকাশকার্য ১৯২৩ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন করেন। প্রথমখণ্ডে তিনি সাধারণ ভাবে রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও রাজপুতানার ইতিহাস বিবৃত করেন, বাকী খণ্ডগুলিতে রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্যগুলির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয় (উদয়পুর, ডুঙ্গারপুর, বাসওয়াদা, প্রতাপগড়, যোধপুর, বিকানীর প্রভৃতি)। (৪) টডের গ্রন্থ হইতে রাজপুতানার ৭টি মাত্র রাজ্যের ইতিহাস জানিতে পারা যায়। গৌরীশঙ্করের গ্রন্থে রাজপুতানার একুশটি রাজ্যের বিবরণ বিদ্যত হইয়াছে। সমগ্র রাজপুতানার এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে গৌরীশঙ্কর স্রং যান নাই। কোন সম্ভাব্য তথ্য স্মরণে ও তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে দেন নাই।

আজীবন সাধনার ফলে রচিত রাজপুতানার ইতিহাসে গৌরীশঙ্কর কুত্রাপি কল্লনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। দৃঢ় শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে উচ্ছ্বাস হীন ভাষায় তিনি এই ইতিহাস রচনা করেন। ভিসেন্ট শিখ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাঁওয়ার কর প্রভৃতি ধুরন্ধর ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের রচনায় রাজপুত জাতিকে বিদেশাগত বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। গৌরীশঙ্কর তথ্য প্রমাণের দ্বারা এই মতকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে রাজপুতেরা বৈদিক ধর্মাস্রিত ক্ষত্রিয় বংশ জাত, বৈদেশিক শোণিতের কোন মিশ্রণই এই জাতির মধ্যে নাই। দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে তিনি টডের Annals and Antiquities of Rajasthan এর বহু অংশই যে কল্লনা বিলাস তাহা প্রমাণ করেন।

টঙ্ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা চারণ কবিদের প্রদত্ত বিবরণের উপর অত্যধিক নির্ভর করেন। গোবীশঙ্কর তাঁহার রাজপুত জাতির ইতিহাসে ইহাই প্রমাণ করেন যে এই চারণ গাঁথাগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত নয়, চারণ কবিগণ স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষক রাজগৃহদের সম্ভ্রষ্ট বিধানের জ্ঞান এইগুলি রচনা করেন। গোবীশঙ্কর টঙ্ের রাজস্থান গ্রন্থটি হিন্দীতে অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন, এই অনূবাদে তিনি টঙ্ের রচনার ভ্রমগুলি টিকা স্বরূপে সংশোধন করেন। টঙ্ের ভ্রম প্রদর্শন করিলেও পথিকৃৎ ঐতিহাসিকরূপে তাঁহার প্রতি তিনি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। হিন্দী ভাষায় তিনি টঙ্ের একটি জীবনী রচনা করেন। (৬)

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন উদয়পুর পরিদর্শন করিতে আসেন। উদয়পুরের মহারণার ইচ্ছাক্রমে গোবীশঙ্কর লর্ড কার্জনকে উদয়পুর রাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে লইয়া যান। লর্ড কার্জন অতিশয় বিজ্ঞোৎসাহী ছিলেন। ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। উদয়পুর পরিভ্রমণ কালে গোবীশঙ্করের ইতিহাসজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া লর্ড কার্জন তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। আজমীরে সমগ্র রাজপুতানার জ্ঞান একটি পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহশালা স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়া তিনি গোবীশঙ্করকে এই সংগ্রহশালার অধ্যক্ষরূপে মনোনীত করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে যে দরবার অনুষ্ঠিত হয় ভারতের বিশিষ্ট রাজগৃহবর্গের সহিত গোবীশঙ্করকেও তাহাতে যোগদানের জ্ঞান আমন্ত্রণ জানান হয়। লর্ড কার্জনের কার্যকালে আজমীরে সরকারী সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন সম্ভব হয় নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের উত্তরাধিকারী লর্ড মিণ্টোর সময় এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কার্জনের ইচ্ছানুযায়ী গোবীশঙ্করই ভারত সরকার কর্তৃক এই সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯০৮ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গোবীশঙ্কর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই সংগ্রহশালাটিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায় পরিণত করেন। গোবীশঙ্করের অনলস ও সতর্ক সেবায় রাজপুতানার অসংখ্য ঐতিহাসিক সামগ্রী চিরবিলুপ্তির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া এই সংগ্রহশালার শোভা বর্জন করে। এই সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ পদের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়াও এই সময়ের মধ্যে গোবীশঙ্কর তাঁহার রাজপুতানার ইতিহাস রচনা সম্পন্ন করেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গোবীশঙ্কর তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং কর্মদক্ষতার জ্ঞান ভারত সরকার কর্তৃক রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার সংস্কৃত, প্রাকৃত-সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে গভীর ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোবীশঙ্কর এলাহাবাদের হিন্দুস্থানী একাডেমি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে ষোড়শ শতাব্দী কাল পর্যন্ত ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি ভাষণ দান করেন—এইগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (৭) মধ্যকালীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শাসন ব্যবস্থা ও শিল্পকলা ছিল এই ভাষণগুলির উপজীব্য বিষয়। গোবীশঙ্কর হিন্দী ভাষার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৯২০ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বারাণসী হইতে প্রকাশিত নাগরী প্রচারিণী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার রচিত বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। হিন্দী সাহিত্য

সম্মেলন হিন্দী ভাষা চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে “সাহিত্য বাচস্পতি” উপাধি দান করেন।

ইতিপূর্বে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতপুরে অঙ্কিত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্করের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন বিভিন্ন পণ্ডিতদের লিখিত প্রবন্ধাবলীর একটি সংকলন প্রকাশ করেন। “ভারতীয় অল্পশীলন” নামক এই নিবন্ধ সংগ্রহটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, ডঃ হরবিলাস সর্দা, ডঃ হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থের জন্ম এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ বা সংস্কৃত ভাষায় গৌরীশঙ্করের প্রশস্তিস্বরূপ একটি কবিতা রচনা করেন। ইহার একাংশ উদ্ধৃত হইল—

“মহত্তম উপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর পণ্ডিত :

পূজিতো বিদ্বাং বৃন্দে রাজতাং রাজপূজিতঃ ॥

প্রাচীনধর্মচরণাদ্ যশস্বী, প্রাচীন বিজ্ঞাবিমলাশয়াচ্যঃ ।

প্রাচীনলেখার্থবিভাসকোহয়ং জীব্যাচ্চিরং ভারতরত্নভূতঃ ॥

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভারতীয় প্রচাৰিগণসম্মেলনের (All India oriental conference) বরোদা অধিবেশনে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন। এতদ্ব্যতীত দেশ বিদেশের বহু বিদ্বৎ সংস্থাও তাঁহাকে নানারূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর প্রধানতঃ ছয়খণ্ড রাজপুতানার ইতিহাস রচনাতেই ব্যস্ত করেন। এই কার্যের অবসরেও তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। সম্রাট অশোক প্রচারিত শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ও গুহালিপিগুলির হিন্দী ও সংস্কৃত অনুবাদ এবং স্বকৃত ব্যাখ্যা সমন্বিত গৌরীশঙ্করের একটি পুস্তক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে অশোক ব্যতীত তাঁহার পৌত্র দশরথ ও রাজী কারাবিকী প্রচারিত দুইটি শিলালিপিও আলোচিত হয়। এই গ্রন্থে অশোকের রাজ্য, রাজনীতি, রাজ্য-বিস্তার, ধর্মচিন্তা, তদানীন্তন কালীন ভাষা ও আচার বিচার সম্বন্ধে গৌরীশঙ্করের বিচার বিশ্লেষণ সবিশেষ উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হয়। (৮) ইতিপূর্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর “ভারতকে প্রাচীন ইতিহাস কী সামগ্রী” নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার লভ্য উপকরণ কি তাহা আলোচিত হইয়াছিল (৯)।

গৌরীশঙ্কর প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, মূর্তিকলা প্রভৃতি বিষয়েও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। হিন্দী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার কয়েকজন কবির সঠিক সময় নির্ণয় করিয়া তিনি যশস্বী হন। পৃথ্বীরাজ বিজয় নামে একটি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। (১০) চাঁদ কবি রচিত পৃথ্বীরাজ রাসো হিন্দী ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে চাঁদ কবি পৃথ্বীরাজের সভাকবি ছিলেন। গৌরীশঙ্কর সর্বপ্রথম এই মতের অসত্যতা প্রমাণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে চাঁদ কবি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের প্রায় চারিশত বৎসর

পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত প্রায় ৬৬টি প্রবন্ধ উদয়পুরস্থ রাজস্থান বিদ্যাপীঠ হইতে ওঝা নিবন্ধ সংগ্রহ নামে চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। (১১) গৌরীশঙ্করের অধিকাংশ রচনাই হিন্দী ভাষায় লিখিত। ওঝা-নিবন্ধ সংগ্রহের চতুর্থ খণ্ডটিতে মাত্র ৪টি ইংরাজী প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলির বিষয়বস্তু—মহেন্দ্র পালের প্রতাপগঢ়লিপি, সিন্ধুরাজ্যের মৃত্যু, চালুক্য রাজকুমার পালের দানলিপি, চালুক্যরাজ ভীষ্মদেবের দানলিপি, পশ্চিম অঞ্চলীয় ক্ষত্রপ রাজগণ ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটি ভাষণ। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভারত গৌরব মহারাণা প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটি পৃথক জীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। (১২) গৌরীশঙ্কর তাঁহার স্মরণীয় গ্রন্থ ভারতীয় লিপিমালায় দেবনাগরী অক্ষরের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেবনাগরী অক্ষর ও সংখ্যামালা সম্বন্ধেও একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। (১৩) হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরীশঙ্কর একটি বিশেষ গৌরবময় আসনের অধিকারী। গৌরীশঙ্করের অতি উপাদেয় তাৎপর্যপূর্ণ রচনাসমূহের মর্ম গ্রহণের জগু যেকোন পাঠক বা গবেষককে হিন্দী ভাষার শরণ লইতে হইবে। গৌরীশঙ্কর ইংরাজী ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন কিন্তু তিনি বিদেশী ভাষার আশ্রয় লইয়া অধিকতর সাফল্য ও গৌরবলাভের প্রলোভন ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌরীশঙ্করের স্বদেশপ্রেমও উদগ্র ছিল। এই স্বদেশ প্রেমদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি রাজপুত জাতি ও রাজপুতানার ইতিহাস রচনায় জীবনপাত করিয়াছিলেন। রাজপুতানার ইতিহাস সমগ্র ভারত ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়—এই অধ্যায়টি গৌরীশঙ্করের সাধনায় অতি নৈপুণ্যের সহিত উদ্ঘাটিত হইয়াছে ইহা সর্বজন স্বীকৃত।

গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গ্রায় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সরল ব্যবহার ও সদালাপ পরিচিত মাত্রকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়া তিনি স্বীয় জন্মপল্লীতে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল হৃদর পল্লীগ্রামে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১। ভারতীয় লিপিমালা, উদয়পুর, ১৮৯৪; ভারতীয় লিপিমালা (২য় সং) আজমীর, ১৯১৮; ভারতীয় লিপিমালা (৩য় সং) দিল্লী, ১৯৫২। (২) সোলাঙ্কিয়ের কা প্রাচীন ইতিহাস, আজমীর, ১৯০৭।

৩। সিরোহী রাজ্য ইতিহাস, আজমীর, ১৯১১।

৪। রাজপুতানা কা ইতিহাস (Six vols. in several parts) ১৯২৩—১৯৪০।

৫। টাড্ রাজস্থান—বাঁকীপুর।

৬। কর্ণেল জেমস টড—বাঁকীপুর।

৭। মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি—এলাহাবাদ, ১৯২৮; ৩য় সং ১৯৫১।

৮। অশোক কী ধর্মলিপিয়াঁ, বারাণসী, ১৯২৩।

৯। ভারত কে প্রাচীন ইতিহাস কী সামগ্রী, আজমীর, ১৯১১।

১০। পৃথ্বীরাজ বিজয়ম্, আজমীর, ১৯১১।

১১। ওঝা—নিবন্ধ সংগ্রহ (৪ খণ্ড), উদয়পুর, ১৯৫৪।

১২। মহারাণা প্রতাপ সিংহ, আজমীর, ১৯২৯।

১৩। নাগরী অক্ষ আউর অক্ষর, এলাহাবাদ, ১৯২৬।

লোকগীতি ও শ্রীকৃষ্ণ

গুরুপ্রসাদ রায়

লোকসাহিত্যের বিচিত্র ধারায় লোকগীতি বা লোকসংগীত একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছে। সংগীত শাস্ত্রের অভিজাত আসরে লোকগীতির আসন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়। অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ বা মার্গ-সংগীত থেকে লোকগীতিকে আলাদা করে রাখা হয়, শাস্ত্রীয় সংগীত ও লোকসংগীতের মধ্যে মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। লোকসংগীতে সহজ ভাষা ও সরল স্বর, স্বতঃস্ফূর্ততা, স্থানীয় ছাপ, নিসর্গ ও গ্রামীণ প্রতিবেশের প্রতিফলন এবং ভাবের একাত্ম ইত্যাদি একে পৃথকভাবে বিচার্য রূপে পরিগণিত করেছে। এছাড়া বৈশিষ্ট্য হল, শাস্ত্রীয় সংগীত চেষ্টা সত্ত্বেও লোকসংগীতভুক্ত হতে পারে না, অপরপক্ষে লোক গীতিকে কিছু পরিবর্তন করে শাস্ত্রীয় সংগীতের কোটায় ফেলা যায়।

বাংলাদেশ লোকগীতি সম্পদে গৌরবান্বিত। জীবনের অতি তুচ্ছ উপকরণ প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা দর্শন যেমন এর অঙ্গীভূত হয়েছে তেমন অনেক উচ্চ ভাবাদর্শ, মহত্ত্ব ও উচ্চ মানবিকতার গুণাবলীকে কথা ও স্বরের মাধ্যমে মহিমান্বিত করে তুলেছে। বাউল কীর্তন পদাবলী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যেসকল সংগীত শিক্ষিত মার্জিত সমাজে আদৃত হয়, যা কিনা একটা বিশেষ ধারা বক্তব্য ও আদর্শ (ধর্মও হতে পারে) কে পরিস্ফুট ও পরিবেশন করে থাকে, তাকে এককথায় লোকসংগীত আখ্যা দেওয়া চলে না। কারণ এই সমস্ত গীতির মধ্যে কোন না কোন ধর্ম বা আদর্শের কথা এসে পড়েছে। আমরা সেই সমস্ত গীতিকেই লোকগীতিরূপে চিহ্নিত করতে পারি যা কিনা নিরক্ষর লোককবির দল মনের স্বাভাবিক আনন্দ বেদনায়, কাজের তালে বা অভিজ্ঞতার রসে সঞ্জীবিত করে সহজ স্বরে অনাড়ম্বর শব্দে হৃদয়ের কথা প্রকাশ করেছে।

লোকগীতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে অজস্র চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কথাই সর্বোচ্চ স্থান কেড়ে নিয়েছে। বিশেষতঃ বাংলার পল্লী কবির চোখে শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্যময় রসিক রূপটি উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে। তাই বোধহয় বাংলাদেশে “কান্ন ছাড়া গীত নাই”, এ বক্তব্যের বিরুদ্ধতা বোধহয় কেউই করতে চাইবেন না। এমন একটা দিক নেই ক্ষেত্র নেই অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গ নেই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার পদার্পণ ঘটেনি। বাংলার আতুড়ঘর থেকে বিবাহ-বাসর, নৌকাবিলাস থেকে ধান কাটা, অতৃপ্তির থেকে পরিপূর্ণ পাওয়ার আনন্দ-সামিয়ানায় কান্ন-রাধা সমানভাবে চলা ফেরা করে গেছেন।

আমরা এখানে কথকতা, কবিগান, কীর্তন, কৃষ্ণলীলা, ধামালী, কৃষ্ণযাত্রা, গো পূজার গান, গোপীগান, ছোনাছ, পাঁচালীপ্রেম সংগীত, ঝুমুর, পাটুয়া এমনকি বাংলার নিজস্ব বোলান গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাইনা। কারণ উপরিউক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর গীতের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে বর্তমান আছেন। আমরা এখানে শুধু দেখাবার চেষ্টা করবো এগুলোর বহির্ভূত যে অসংখ্য লোকগীতি আছে তাতে কেমনভাবে অসতর্ক রূপে কিংবা প্রয়োজন ছাড়াই শ্রীকৃষ্ণের ছায়া বা কায় উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও সতর্কভাবেই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

গানের মাধুর্য প্রতিমায় কথা একটি উপকরণ মাত্র, স্বরের মায়াদেও গানে পরিণত হয়, কথাও স্বর উভয়ের হরগৌরী মিলনই সার্থক গানের সংজ্ঞা। স্বর বৈশিষ্ট্যের দ্রুপ গানের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, তার শ্রেণী সমাজকে চিহ্নিত করা যায়, আমরা এখানে স্বরের ছায়ায় আলোচনা না তুলে কথার কায়ার প্রসংগান্তরে যেতে চাই। কিন্তু তার আগে যাকে নিয়ে আলোচনা তাঁর সম্বন্ধে ছ-একটা কথা জানার দরকার আছে। পণ্ডিতপ্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

“মহাভারতে পুরাণে তত্ত্ব সর্বত্রই কৃষ্ণের কথা, তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ, কালগণনায় প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে দ্বাপরে কংসকারাগারে দেবকী বসুদেবের পুত্ররূপে এবং গোকুলে নন্দ যশোদার আত্মজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই নন্দাত্মজই সর্বাবতারের আকর...কতকাল পূর্বে বাংলায় কৃষ্ণকথা তথা গোপীকথা প্রচারিত হইয়াছিল কেহ বলিতে পারে নাই। মনে হয় স্মরণাতীতকাল হইতেই বাংলায় শ্রীরাধা কৃষ্ণোপসনা প্রচলিত রহিয়াছে”—বোধহয় বাংলাদেশে কবি জয়দেব সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ লিখে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বচা এনেছিলেন, তারপর বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাসের ভাবধারায় স্থান করে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে অজস্র কবি কৃষ্ণগান রচনা করেন—কৃষ্ণযাত্রা, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য : মধ্যযুগের কাব্যধারায় পথ সিক্ত করে গ্রাম গ্রামান্তরে অজস্র শাখায় প্রসারিত হয়। যে কৃষ্ণলীলা কথা একদিন মার্গ সংগীতভুক্ত ছিল যার পরিচয় পদাবলীতে গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে পাই; কালের স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলো নব আঙ্গিক গ্রহণ করে এবং লৌকিক বা প্রাকৃত গীতের মাধ্যমে জনচিত্ত আপন স্বরে সহজ আনন্দে গেয়ে উঠেছে। তারই স্বাক্ষর আমাদের অজস্র লোকগীতি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সেই রাধাকান্ত মোহন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অজস্র অন্তর্গানে উৎসবে আচারে হাজির থেকেছেন, আমাদের মনের কথা স্বরের লালিত্যে ব্যক্ত করেছেন।

প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় মুসলমান কৃষক সমাজে আলকাপ নামে একপ্রকার গান প্রচলিত আছে। এই সমস্ত নিরক্ষর মুসলমান কবির দল চিরকিশোর কালুকেও তাদের গানের অঙ্গীভূত করতে শঙ্কিত হয়নি। ছ-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কে যেন এসে মন চুরি করিল,
মোহন বাঁশরী স্বরে প্রাণ হরিল।
মাথায় ময়ূর পাখা চলিতে চলন বাঁকা
মোহন বাঁশরী হাতে এসে দিল দেখা
দেখা দিয়ে সে কেন মোরে কাঁদাল ॥

আর এক জায়গায় শোনা যায় সেই যমুনার কথা। বহু কাব্য-কাহিনী অনেক মিলন ব্যাকুলতার সাক্ষী সেই যমুনা—

কে কে যাবি আয়লো, যমুনাতে যাইলো
যমুনার জল বড় ঠাণ্ডা
ঐ যমুনার কালো জলে কৃষ্ণনামের ঢেউ থেলে
তারই তলে ছায়া গো.....

কিন্তু ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ বেশীক্ষণ বৈকুণ্ঠচারী থাকতে পারলেন না, লোক কবির অভিজ্ঞতার রসে সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের আশে পাশের দেখা কোন এক চতুর প্রেমিকের রূপ পরিগ্রহ করেছেন—

কৈ এলো সজনী, আমার প্রাণনাথ না এলো
আসিতে আসিতে কালা পথ ভুলে চলে গেলো
ঘাটের তলায় জলের ঘটা, সিকায় তোলা ছুধের বাটা
পাড়া রইল শীতল পাটি অমনি নিশি ভোর হল ॥

এরপর আমাদের গন্তব্যস্থল হল বাংলার সেই সমস্ত উৎসব মঞ্চে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অবধারিত নয় তবু তাঁর কথা লোককবির কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। রাঢ়ের প্রচলিত টুঙ্গ উৎসব প্রধানতঃ রাঢ়ের শস্তোৎসব বলেই গণ্য করা চলে। এখানে কেমন করে যে যমুনার জল, কালার বাঁশী এসে পৌঁছাল, তার হৃদিশ পাওয়া বেশ দুঃসাধ্য। একটা গানে আছে—

বাঁশি বাজছে বাঁধের আড়ালে
তার কিনারায় যাবো কি করে
শুনলে বাঁশি মন কেমন করে
বাঁশি রাধা রাধা রাত করে।

আর এক স্থানে টুঙ্গকে রাধিকার আসনে বসিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের যন্ত্রণাময় আত্মদিকে লোককবি লৌকিক উপমায় স্থন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

করেছিলাম মানা
বলি টুঙ্গ প্রেমের শশা খেও না।
সামান্য আত্মদ পেয়ে আমার নিষেধ শুনলে না
এখন নাকে মুখে বারছে বারি পাচ্ছ কেমন যন্ত্রণা।

এর সঙ্গে যমুনার জল, যৌবনকাল কালার বাঁশি ইত্যাদি যোগ হয়েছে। অতীতকে উত্তর ও পূর্ববাংলায় লৌকিক শস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে যে লোকগীতি শোনা যায়, তার মধ্যেও কান্ন-রাধার সারা পাই—

কেনে হে রাধা, বিরস মন
ও তোর কানাইয়া যে বাজায় বাঁশি
আরে মুই গেছ যমুনার জলে হেঁচা উঠান মাটি
ছিড়িল গলারই হার, আই মোর ভাঙ্গিল কলসী।

মৈমনসিংগ শ্রীহট্ট জেলায় বসন্তকালীন যে দেবতার উৎসব হয়, তার নাম উত্তমঠাকুর। এই নামের উৎপত্তির ইতিহাস গবেষণার বিষয়। পূজারিণী হল কুমারী দল। পূজা সমাপ্তে পূজিত বৃক্ষমূলে কুমারীরা সমবেত কণ্ঠে গায়—

কুঞ্জের মাঝে কেরে, কুঞ্জের মাঝে কে?
নন্দের ছাইলা কালাচাঁদ কৃষ্ণ আইসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে মনসা রূপান নামে যে ধর্মোৎসব প্রচলিত আছে তার মধ্যেও অসতর্কভাবে শ্রীকৃষ্ণের

পদধ্বনি শোনা যায়। নীলের গাজন বা শিবের গাজন বাংলা দেশের একটি জনপ্রিয় উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে যারই সম্পর্ক থাক বৃন্দাবনচারী শ্রামহুদরের সম্পর্ক নেই। এই উৎসবের মধ্যে এক বিশেষ শ্রেণীর গান শোনা যায়। তাকে বলে অষ্টক। উক্ত গানের আসরে কৃষ্ণ-কানাই নদী, নৌকা ইত্যাদির আগমন কৌতুকপ্রদ। কিন্তু আধ্যাত্মিক পর্যায় ভূক্ত গানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অগ্ররূপে বিরাজিত আছেন। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একটি গানে—

তুই যাইস্ন নারে মন পাহী তু ফির্যা আয়,
ওরে হামহুক নামে পাহী আমার, আয়রে ইন্দির পিজিরায়,
আমার হিদ্ পিজিরায় বৈশা পাহী
কিষ্ট নাম শুনাইয়া কর স্তখী
প্রেমে অঙ্গ জরজর হতল মছুরায়
গোসাই কুইছেন দররে জালে পালা পাহী উইড়্যা গেলে
মনের পাহী বনে গেলে আর নি তারে দরা যায় ॥

বাংলার পশ্চিমপ্রান্তবর্তী অধিবাসীদের বর্ষাকালীন উৎসব, করম—এর মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের আনাগোনা! আদিবাসীরা আমাদের কাছ থেকে প্রভাবিত হয়েছে না আমরাই হয়েছি বলা শক্ত, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ অবশ্য খুব বেশী মেলে না তবুও যত-তত্ন উকি মেরেছে—

সারা বন বুলি বুলি কাছে পুষ্প ফুল তুলি
শ্রামের গলেতে ঐ নদীতে
চল চল চল সখী ফুল তুলিতে
বাঁকা শ্রামকে সাজাবি যে ফুলেতে।

এখন একবার গৃহস্থের বাড়ীর ভেতর পৌছান যাক। সামাজিক আনন্দ-আচার-উৎসবের মধ্যে বিবাহ প্রধান ঘটনা। এই বিবাহের বিবিধ আচারে কৃষ্ণরাধা প্রসঙ্গ বারবার এসে গেছে, তৈল কাপড় উপলক্ষে, জলভরা, পাশা খেলা প্রসঙ্গে, আরো শোনা যায় কনে সাজানোর গানে—

এসেছি এসেছি মোরা রাধাকে সাজাতে
সাজাবো নতুন সাজে অগুরু চন্দনে।

বিবাহের একটি প্রধান আচার হল পাশাখেলা, সারা বাংলাদেশে এই আচারের প্রসার দেখা যায়। এখানেও গানের অভাব নেই! রামসীতার প্রসঙ্গ অগ্রাধিকার পেয়েছে তবু কৃষ্ণরাধিকা একেবারে দূরে থাকেন নি। কৃষ্ণরাধিকার ভাগবতী সম্পর্ক বিলুপ্ত করে লোক কণ্ঠে তাঁদের দাম্পত্য রূপটিই ফুটে উঠেছে।

কি আনন্দ হৈল গো সখি-রসবৃন্দাবনে
শ্রামনাগরে খেলে পাশা মনমোহিনীর সনে,
কিংবা—

শুভক্ষণে খেলেছে পাশা রাই সনে বংশীধারী
চারি পাশে রঙ্গ করে সর্ব সহচরী

আমার মনে এই আশা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলব পাশা
পালাটি হারিলে দেবা কি এই বাক্য কইরাছি আমি
কৃষ্ণ হারলে বংশী দিব, রাধে হারলে হার দিব
এই বাক্য কইরাছি আমি।

নববরবধুর মধ্যে লোককবির দল কৃষ্ণাধিকার মিলন মধুর একাত্মতার ছবিই দেখেছেন। অবশ্য আমাদের দেশের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের ছড়া গান লোকগান রচয়িত্রীগণ বঙ্গনারী সমাজ! স্ত্রী আচারের প্রায় সমস্তটাই শাস্ত্রীয় গণ্ডিকে অতিক্রম করে নারীমনের একটা স্বাভাবিক রূপকে আচারের সক্রিয়তার মধ্যে চিরকাল জীবিত রাখতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূর্ববাংলা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের রমণীকুল, বিবাহ ব্রত ও অগ্নি মাংগলিক ক্রিয়াকর্মে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। হয়তো এর পিছনে নীতিবোধ এবং চতুর নাগর শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের চিত্রগুলোই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে।

কৃষি বাংলার প্রধান শস্যসম্পদ ধন। স্ত্রী পুরুষ সমবেতভাবে ধান উৎপাদনের কাজে যোগ দেয়। ধান রোপনের সময় কৃষাণদের গলায় হরেক রকমের গানের মধ্যে কৃষ্ণের কথাও শোনা যায়। বাইরের জগৎ পুরুষের। নৌকা বাওয়ার মতো সমর্থ কাজেও শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের সারি গানের অন্তর্ভুক্ত বাইচের গানে-সমবেত কণ্ঠের সঙ্গে বৈঠার তালে তালে ভেসে আসে—

বিদায় দেমা, দেমা যশোদে

শ্রাম মাজায়ে দে মা, যাব গোষ্ঠেতে

দে মা বিদায় গোষ্ঠেতে, মোহন বাঁশী দেমা হাতে।

পশ্চিমবঙ্গের যুদ্ধনাচের অধঃপতিত রূপ যে কাটিনাচ তাতেও কালাচাঁদ হাজির আছেন। ছাদ পিটানোর তালে তালে কৃষ্ণের বাঁশী, কদমতলা এবং নিলাজ আখির ইশারায় মন চুরির প্রসঙ্গ একেবারে অবাস্তব নয়—

কদম তলায় দাঁড়ায় কালা বাঁশরী ধরি

হেই হেই বাঁশরী ধরি,

একলা পেলে আখি ঠারী আমরা লাজে মরি

মরি মরি আমরা লাজে মরি।

গীতের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুতঃ লোকগীতির অধিকাংশই নৃত্যের সঙ্গে বা কোন আনুষ্ঠানিক কর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মনে হয় গানের আগেই নাচের জন্ম হয়েছিল। যে সময়ে ভাষা ছিল না স্বর ছিল না তখন মানুষ তার অঙ্গ মুদ্রার সাহায্যেই মনের গোপন কিংবা প্রকাশ্য ভাবটির রূপ দিতে নাচকেই বেছে নিয়েছিল। তাই বোধহয় আমরা নাচ-গান বলি। বাংলাদেশে কাটিনাচের প্রচলন আজ আর নেই বললেই চলে। কিন্তু এক সময়ে ভুঁইয়া রাজাদের নিয়ন্ত্রণে বলিষ্ঠ বাঙ্গালী লেঠেল বরকন্দজরা দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যখন অস্ত্রধারণ করতো, তখন তাদের কর্ম পেশী সঞ্চালনের তালে তালে নাচ ও গান যুক্ত ছিল। এই কাটিনাচকে যুদ্ধনাচ বলে। এই যুদ্ধনাচের শৌর্যশালী বাতাবরণে শ্রীকৃষ্ণের কোমল স্তন্যর ভাবাবেগ মণ্ডিত চরিত্র চিত্রের

উপস্থাপনায় আমরা যথেষ্ট আশ্চর্য হই !

হেরে এলাম তারে, সাকী, হেরে এলাম তারে

এক অঙ্গে কতরূপ নয়নে না ধরে ।

এক সে কালিয়া চাঁদ চন্দনেতে মাখা

আমা হতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা ॥

অপরদিকে পুকলিয়ার আদিবাসীদের নাচের মধ্যেও শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণরাধা আয়ান ঘোষের প্রসংগ—

শুনগো-আয়ান দাদা, কুল কলঙ্কিনী রাধা

কালার সনে বনে বনে করে খেলা,

চল, দেখাই দিব এই বেলা । (পাতানাচ)

আদিবাসীরা কৃষ্ণকে কোথায় এনে হাজির করিয়েছে তার নমুনা পাই অল্প একটা গানে—

সরু কাপড় পরবো না, বধু সায়া না হলে

দে, কালাচাঁদ, সায়া কিনে গাঁয়ের পরবে ।

এ কালাচাঁদ ভাগবৎ পুরাণের নন, মনের মানুষ কোন রসিক নাগর ।

প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট অংশই হল বিরহ । যেখানে বৈরাগ্যের প্রসংগ উঠেছে সেখানে কৃষ্ণকথা স্বন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়ায় যে বৈরাগ্যমূলক লোকগীতি শোনা যায়, যাকে বলে তুয়াগান তার ভেতর এবং সারা বাংলা দেশের বিচ্ছেদী বা বৈরাগী গানের মধ্য দিয়ে শ্রীকান্তপ্রেম কথা অমর হয়ে রয়েছে । এই পর্যায়ের গানগুলো, মার্জিত মনের সৃষ্টি, পদাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসংগ উল্লেখ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের হেঁচর এবং এক শ্রেণীর নৃত্যব্যবসায়িনীদের খেমটি এবং ঝুমুর গানের কথা সহজেই এসে পড়ে । শ্রীকৃষ্ণরাধা বোধহয় এই লোকগীতির মধ্যেই সবচেয়ে বিকৃত রূপে প্রকাশ পেয়েছেন । পুরাণ-ভাগবৎ-এর ছায়া কোথাও চোখে পড়ে না । আমাদের মার্জিত রুচির কাছে শ্রীকৃষ্ণ চিত্র যতই বিকৃত অশ্লীল বলে মনে হোক না কোন, জনমানসের চাহিদা এবং নিরক্ষর সমাজের আনন্দ-খোরাক হিসাবে এগুলোকে তুচ্ছ করে ফেলেও দেওয়া যায় না । আমাদের বিশ্বত হলে চলবে না, এই সমস্ত লোক কবির দল যুগের পর যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের মনে মানবিক আশা আনন্দের, মিলন বিরহের স্মৃতি জাগরিত করে বাংলার সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে । শিক্ষাভিমानी বর্তমান সমাজ যতই তাদের তুচ্ছ অশ্লীল অবজ্ঞায় রূপে বিচার করুক না কেন এরাই সত্যকার শিল্পী-কবি-সমাজ সচেতন মানুষ ।

একটি খেমটি গানে—

জালায়ে আশুন পালায়ে গেলি

পরে নিভায়ে গেলিনারে, কালা

নদীর ধারে বাঁধে বাড়ী কোমর লয়ে আড়াআড়ি

বাঘের সঙ্গে বাঘ চাতুরী বৈষ্ণব সঙ্গে বিবাদ করা

তোমার প্রাণ কেড়ে নিব আপন মনকে বুঝিয়ে নিব

না হয় দুদিন কষ্ট পাবো প্রাণে মরব নারে কালা।

কিছুকাল আগে প্রাপ্ত একটি খেমটি গানে শ্রামকে সরাসরি শাড়ী সায়্য ব্লাউজ এমনকি হিম্মানি পাউডার সাবান কিনে দেবার জন্যে মিনতি জানানো হয়েছে।

লোক সংগীতের আসরে বোধহয় রুমুর গানেই শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক এবং অধঃপতিত রূপটি সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। এই সমস্ত লোক কবির দল, নব-দুর্বাদল বৃন্দাবনচারী, গোপীজন বল্লভ শ্রামকে কিছুতেই ভগবানের মহিমা দিতে পারেনি, তাইতো শুনি—

পায়েতে জরীর জুতা

হাতে মুরলী-বাঁশী, বাজারে যায়রে ও বংশীধারী।

যৌবন পিরীতের কথা তো আছেই, পাঠকগণ লক্ষ্য করুন এই কি সেই শ্রামের রূপ—

চাটি চুটি দিয়ে সঙ্গ করলে হে-ঘরে

ফাকি দিয়ে পালালে আসাম, হে লম্পট শ্রাম

আসাম গেলে প্রাণের কালারে, কালিয়া শ্রাম

ঐ রানী দিল ফুলেরি বাসর কালিয়া শ্রাম ॥

লৌকিক কিংবা অলৌকিক, মার্জিত যে কোন রূপেই হোক না কেন শ্রীকৃষ্ণ বাংলার বিস্তৃত লোকগীতির আসরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে উপস্থিত থাকেননি।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও অত্যাচারিত পঞ্জাব

সোমেন্দ্রনাথ বসু

১৯০৪ সালে ভারতবর্ষে সেন্ট ষ্টিফেন্স কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে এণ্ড্রুজ এসেছিলেন। ১৯১১ সালে ইংলণ্ডের রদেষ্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম দেখলেন, ১৯১৪ সালের জাহ্নয়ারী মাসে গোথেলের নির্দেশে ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে দেখলেন গান্ধীজীকে। এই দশবছরের মধ্যে তাঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। অশিক্ষিত, পেছিয়ে থাকা দেশে খৃষ্টবাণী প্রচার এবং ইংরাজ স্বশাসনের পক্ষ সমর্থনের কর্তব্য নিয়ে যে এণ্ড্রুজ এসেছিলেন তিনি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টান গীর্জার সঙ্গে চাকরীর সম্পর্ক ত্যাগ করলেন আর ভারতবর্ষকে যে ইংরেজ শাসন থেকে একেবারে মুক্ত হতে হবে এই কথা প্রচার করতে লাগলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা দিকে তাঁর অবদান এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আলোচনা করা যাবে না। তাই ১৯১৯ সালের ইংরেজ প্রস্তাবিত রাউলার্ট অ্যাক্ট, পঞ্জাবের অত্যাচার ও রবীন্দ্রনাথের নাইট পদবী ত্যাগ প্রভৃতির মধ্যে তাঁর ভূমিকা কি তাই আলোচনা করছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের স্বদেশী নেতারা ভেবেছিলেন যে সহযোগিতা করার পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ দেশশাসনের কিছু ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। স্বায়ত্তশাসনের দিকে আমরা একধাপ এগিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনা ঘটলো বিপরীত। দেশে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন প্রবল হচ্ছে এই অজ্ঞহাতে ইংরেজ শাসক রাউলার্ট বিল পাশ করতে চললেন। বিনা বিচারে মানুষকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করে রাখার মত আরও অনেক অধিকার এই আইনের মধ্য দিয়ে সরকার নিজের হাতে নিতে তখন ব্যগ্র। এরই বিরুদ্ধে গান্ধীজী দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন, দিল্লীতে হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্ব করতে লাগলেন গৈরিক বসন সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পাঞ্জাবে আশুন জলে উঠলো নেতা কিচলু ও সত্যাপালের গ্রেপ্তার উপলক্ষ্য করে। পাঞ্জাবে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তখন অত্যাচার চলছে, পথে পথে নানা বয়সের পাঞ্জাবীদের খুঁটিতে বেঁধে মেরে চাবকানো হচ্ছে, এরোপ্লেন থেকে মেশিনগান চালিয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু এসব খবর খুব অল্পই তখন পাঞ্জাবের বাইরে যাচ্ছে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের যে সমস্ত বিবৃতি আমরা পত্রিকায় দেখি তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে বিবেকবান ইংরেজ হিসাবেই তিনি এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। ইংরেজ জাতি যে এরকম নৃশংস আচরণ করতে পারে এ তাঁর ধারণার অতীত ছিল। তিনি যে গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় মানুষ, যে ঐতিহ্যকে তিনি ইংরাজের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বলে জানেন এ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মঙ্গলের জন্তেই—এ বিশ্বাস তাঁর কবে চুরমার হয়ে গেছে। আজ তিনি তাঁর কর্তব্য নতুন করে খুঁজে পেলেন—অপমানিত, লাঞ্চিত ভারতবর্ষের পাশে নিজের অস্থগণ পরিচয় ফেলে দিয়ে এণ্ড্রুজ এসে দাঁড়ালেন—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা হিসাবে।

ঐ সময়ে তাঁর প্রথম যে বিবৃতিটি চোখে পড়লো তা হলো ১লা এপ্রিল ১৯১৯ সালে। অমৃত-বাজার পত্রিকায় একটি চিঠি দিয়ে তিনি জানালেন যে রাউলার্ট অ্যাক্টের প্রতি তাঁর বিরোধীতার কথা

সবাই জানেন—my only regret is that I did not make it public before. কেন যে জনসাধারণকে আগে জানাইনি এই ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বললেন ঐ চিঠিতে যে গোয়েন্দাদের ভীতি দিন দিন প্রবল হচ্ছে—যদি রাউলাট বিল পাশ হয় তাহলে গোয়েন্দাবাজীর অত্যাচার আরও প্রবল হবে। “Spying is a ready terror and a dread, but it will become armed with fresh powers of evil, if these Bills are carried into law.”

এরপর ঐ চিঠিতেই এণ্ড্‌জ লিখছেন যে তাঁরই দুটি ছাত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসাবে লাগানো হয়েছিল এবং একজনকে তিনি তো হাতে হাতেই ধরে ফেলেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এই চিঠির উপরে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখলেন ৫ই এপ্রিল।

এণ্ড্‌জের এই চিঠি যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহলে কি রকম ঝড় তুলেছিল তা তখনকার দিনের ‘ষ্টেটসম্যান’, ‘মাদ্রাজ মেল’ প্রভৃতি পত্রিকার পাতা ওল্টালেই জানা যাবে। ষ্টেটসম্যানের এক প্রবন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হল যে এণ্ড্‌জ যা বলেছেন তা সত্য নয়। এণ্ড্‌জ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এবং ২০শে এপ্রিল ১৯১২-এ লেখা এক চিঠিতে ষ্টেটসম্যানেই এর উত্তর দিলেন। তাতে বললেন যে ১৯০৭ সাল থেকেই তাঁর পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে। তখন মিঃ হামফ্রেস দিল্লীর ডেপুটি কমিশনার। কেবলুজ্জে তিনি এণ্ড্‌জের সহপাঠি ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর কাগজপত্র ঘাঁটছে এমনি অবস্থায় একটি লোককে এণ্ড্‌জ ধরে ফেললেন। সে লোকটি স্বীকার করলো যে পুলিশই তাকে পাঠিয়েছে। বন্ধু হামফ্রেসের কাছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠালেন দোষ স্বীকার ও ক্ষমা চাওয়ার দাবী নিয়ে—তারপরের অবস্থা ঐ চিঠিতে লিখছেন—A mounted policeman came back post-haste with the following words in a letter—“My dear Andrews, its nothing to do with me. It's those d-d C. I. D. people! The epithet he used made further apology from himself unnecessary.” ঐ চিঠিতেই এণ্ড্‌জ আরও জানালেন যে গোকুলচাঁদ নামে তাঁরই এক ছাত্র সি. আই. ডি. কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিল সাধারণ ছাত্রদের খবরাখবর পুলিশে সরবরাহ করতে। আর একটি নিজের গোয়েন্দাগিরির জ্ঞাপন পরে অল্পতপ্ত হওয়ায় এণ্ড্‌জ তার নাম প্রকাশ করেন নি।

এই গোয়েন্দাগিরির প্রসঙ্গ বার বার তুলে এণ্ড্‌জ ভারতবর্ষকে সতর্ক করেছেন এবং ইংরেজকেও সতর্ক করেছেন।

২৫শে এপ্রিল ১৯১২-সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় আর একটি চিঠি বেরলো “লীডার” পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ এণ্ড্‌জ লাহোরের পথে সাধারণ মানুষ বেত্রাহত হচ্ছে শুনে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেন নি। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে এই নির্মম বৈজ্ঞানিকতার কাহিনী শুনে লজ্জায় স্থগায় আলোড়িত এণ্ড্‌জ লিখছেন ‘I wish to write at once as one Englishman among many, to express the shame and indignation which such news has brought me.’ মিলিটারী শাসকরা মৃত্যুকেই সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা বলে জানেন—অন্ত কোন ব্যবহারের লাঞ্ছনা যে মানুষের জীবনে কত যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে তা তাদের বোধের বাইরে। এণ্ড্‌জ এই চিঠিতে ভাইসরয়ের কাছে দাবী করলেন, যেন তিনি তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতায় মিলিটারী শাসকদের এই অত্যাচারের শেষ করেন।

ইতিমধ্যে দেশের লোক এগুজের এই সব নির্ভীক উক্তি দেখে অল্পভব করেছেন যে সত্যভাবী এই ইংরেজ আমাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের একজন প্রথম সারির সৈনিক। আমাদের দেশের ছ'টি পত্রিকা—‘দি বেঙ্গলী’, ‘নিউ ইণ্ডিয়া’, ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, ‘দি হিন্দু’, ‘দি লীডার’ ও ‘ইনডিপেন্ডেন্ট’—তাদের প্রতিনিধি করে এগুজ সাহেবকে পাঞ্জাব পাঠাতে চেয়েছিলেন। ৫ই মে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের চীফ সেক্রেটারীকে এই পত্রিকাগুলি জানালেন—“আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা মিষ্টার সি. এফ. এগুজকে পাঞ্জাবে পাঠাতে চাই। উদ্দেশ্য এই যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কাছে পাঞ্জাবের বিশেষ করে, সামরিক শাসনের রিপোর্ট তিনিই পাঠাবেন। বেসরকারী কোন খবরই এ পর্যন্ত বাইরে না আসায় আমরা মনে করি আমাদের প্রতিনিধিকে পাঞ্জাব সরকার সব রকমের স্বযোগ সুবিধা দেবেন। অনুমতি পেলেই মিষ্টার এগুজ লাহোর যাত্রা করবেন।”

পাঞ্জাব সরকার এর উত্তরে জানালেন যে সামরিক শাসকের কাছে অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুযায়ী অনুমতি চাওয়া হলে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, ‘মিঃ এগুজকে পাঞ্জাবে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।’

এগুজ সাহেবের সত্যায় দেশের লোকের যে অবিচল আস্থা আছে, তাঁর চরিত্র যে কোন কলুষের স্পর্শে কলংকিত নয়, সে কথার উদ্দীপ্ত ঘোষণা করে একটি সম্পাদকীয় রচনায় বলা হল—“If everything is well and above board there was not the slightest apprehension from the visit of Mr. Andrews. He is an Englishman and his sterling character precludes the possibility that he would give informations without authentication.”

২১ এপ্রিল ১৯১৯ সালে লাহোরের স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষেরা মিলিত হয়ে এক সভায় কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করলেন। সে প্রস্তাবগুলির মর্মার্থ হলো এই যে (১) প্রত্যেক কলেজের ছাত্রকে রাউল্যাট অ্যাক্টের সারমর্ম জানতে হবে। (২) শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উকীলের সাহায্যে রাউল্যাট অ্যাক্টের মর্মার্থ জেনে ছাত্রদের কাছে প্রচার করতে হবে। সমস্ত পাঞ্জাব যখন এই সভার সিদ্ধান্তে বিশ্বাসে বিভূত তখন এর প্রতিবাদে আবার মুখর হলেন এগুজ। যে সাকুলারে এই প্রস্তাবগুলি সংকলিত হয়েছিল একটি তীক্ষ্ণ সমালোচনা সহ এগুজ সেটি ‘ইণ্ডিপেন্ডেন্ট’ পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। ১৬ই মে ১৯১৯ সালের অমৃতবাজার পত্রিকাতেও এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় থেকে জানা গেল যে এই সাকুলারের প্রতি এগুজের দৃষ্টিই প্রথম আকৃষ্ট হয় এবং তিনিই এটি প্রথম লোকচক্ষে হাজির করেন। তিনি বললেন ‘teachers will be forced to teach and students will be forced to learn what they do not really believe.’ ছাত্রদের মধ্যে যে সংশয় ও অসত্যতার বীজ বপন করা হচ্ছে তার বিষময় ফল ফলবে এ কথাও তিনি বললেন—“lip loyalty will grow rank and fatten itself on deception, while heart loyalty will wither away and die for lack of moisture.” তিনি নিজে ছিলেন শিক্ষক, জোর করে ছাত্রদের উপরে মতামত চাপাতে চেষ্টা করলে তা যে কতদূর মিথ্যায় পরিণত হতে পারে তা তিনি জানতেন।

১২ই মে ভাইসরয়ের সঙ্গে দিল্লীতে যে কথাবার্তা হয় তাতে এগুজ ধরে নিলেন যে পাঞ্জাব যাবার পথে তাঁর কোন বাধা নেই। এই ধারণা অনুযায়ী তিনি ছুটে গেলেন পাঞ্জাবে। ১৪ই মে

‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ খবর দিচ্ছেন যে ১৩ তারিখ সকাল ন’টার সময়ে অমৃতসরে সি এফ. এণ্ডরুজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৩ তারিখ বিকেল পর্যন্ত তাঁকে জেরা করা হয়। প্রশ্নকর্তা তাঁরই পেমব্রোকেবের সহপাঠী। তারপর তাঁকে দিল্লীতে ফেরৎ পাঠানো হলো। ২০শে মে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে আমেদাবাদে।

ওদিকে কলকাতায় ২২শে মে ‘পাঞ্জাব সভা’র অধিবেশন চলেছে। কলকাতার পাঞ্জাবী অধিবাসীরা মিলিত হয়ে কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করলেন। তৃতীয় প্রস্তাবটি হলো এণ্ডরুজকে পাঞ্জাবে যেতে না দেওয়া সম্পর্কে—সে প্রস্তাব সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখছেন—‘The third resolution expressed the sabha’s surprise and indignation at the action taken by the authorities in regard to the projected visit of Mr. C. F. Andrews to the Punjab, thus depriving the people of the country of independent reliable information about the state of affairs in the Province.’

পাঞ্জাবের সেই ঘোর দুর্দিনে ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। নির্ভীক সম্পাদক কালীনাথ রায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখে গ্রেপ্তার হলেন। সং ও সাহসী এই মানুষটিকে সকলেই ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর যখন কারাদণ্ড হল তখন এণ্ডরুজ চুপ করে থাকতে পারলেন না। কালীনাথবাবুর স্বাস্থ্য ছিল দুর্বল। জেলের জীবন তাঁকে আরও পীড়িত করে তুলবে এই আশঙ্কা ছিল সকলেরই মনে। যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না কিন্তু জীবমৃত অবস্থা থেকেও তো কালীনাথ প্রমুখ মানুষদের বাঁচানো যায়। সংবাদপত্রে ২রা জুন ১৯১৯ এণ্ডরুজ সাহেবের চিঠি বেরুলো—“It is impossible to bring back to life those who have been hanged but some at least may be rescued from the living death of transplantation and the sentence of two years’ rigorous imprisonment for one so weak in health as Mr. Kalinath Roy—the honoured and respected editor of ‘Tribune’—may be mitigated if not annulled.” ঐ চিঠিতে আরও একটা প্রস্তাব তিনি করলেন। তিনি বললেন, পাঞ্জাব ট্রাইবুনালে যে সব বিচার-প্রহসন চলছে তার বিরুদ্ধে প্রীতি-কাউন্সিলে আপীল করা উচিত। নিজের নামে, নিজের দায়িত্বে তিনি প্রস্তাব করলেন (in my own name and on my own responsibility) যে প্রত্যেকটি পত্রিকা একটি তহবিল খুলুক যাতে এই সব আপীলের খরচ তোলা যায়। নিজের জাতের নানাবিধ অত্যাচারের জন্য এই আত্মভোলা সাধক যেন প্রতিমুহূর্তে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন। কালীনাথ রায়ের বিচারের রায়ের নকল জোগাড় করে পড়ে ফেলেছেন, যে প্রবন্ধগুলি লেখার জন্য কালীনাথবাবুর শাস্তি সেগুলিও পড়েছেন—তারপর এই ইংরেজ সাধক বলছেন যে কালীনাথের শাস্তি ইংরেজের স্বাধীনতার ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁরই অনবত্ত ভাষা উদ্ধার করি। “I wish to say quite clearly, as an Englishman that the verdict is contrary to all the ideas which I have cherished from my childhood upward of British freedom and justice.” (অমৃতবাজার ৭ই জুন ১৯১৯) ২৭শে জুলাই এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অমল হোমশাইকে লিখছেন “সাহেব খেপে আছে! ও জানে পাঞ্জাবের কালিমা

ইংরেজের কোনদিন মুছবে না।” ১৮ই জুলাইয়ের দৈনিকে ক্ষুর ক্ষুর এণ্ড্‌জের একটি প্রবন্ধ বেরুলো পত্রিকায়—The Punjab Trial। বিচারের নামে যে অত্যাচার প্রহসন দেশ জুড়ে চলছিল তাতে যে নিরপরাধ শান্তিপ্ৰিয় সং নাগরিকদের খুনী গুণ্ডাদের সঙ্গে এক করে দেখা হল সে কথা তিনি বললেন। আর বললেন ‘we must therefore go on insisting that a man of such careful regard for editorial honour and probity shall not be stigmatized all the rest of his life as a criminal.’ প্রীতিকাউসিলে আপীল করে শুধু কালীনাথের মুক্তি নয়, এণ্ড্‌জ চান যে ‘the Indian authorities may be prosecuted for wrongfully condemning an innocent man.’ রচনাটি দীর্ঘ নয় কিন্তু সত্যভাষণে ঔজ্জ্বল্যে উদ্দীপ্ত।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রপক্ষের বিজয় উৎসব পালনের জন্ত ডাক দিলেন ভাইসরয় সারাদেশ যেন ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়, নবলব্ধ শান্তিকে আনন্দ উৎসবে আহ্বান করে। কি নির্মম পরিহাস। যে পাঞ্জাবের তরুণেরা দলে দলে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে সেই পাঞ্জাব রক্তাক্ত লাজ্জিত, ইংরেজের বুটের তলায় নিপীড়িত। ইংরাজ শাসকের এই নির্মম রসিকতার উত্তর কোন ভারতীয় নেতা দেননি। দিয়েছিলেন এণ্ড্‌জ। ৮ই জুলাইয়ের দৈনিকে আবার আর এক চিঠি প্রকাশিত হল। বললেন গীর্জায় গীর্জায় ভগবানের নামে শান্তির কথা বলা হবে, বাণী ও উপদেশ প্রচারিত হবে। প্রার্থনা সংগীত ধ্বনিত হবে—কিন্তু ভারতবর্ষ কি সাড়া দেবে—‘will the heart of India respond to this appeal in God’s name.’ তিনি বললেন এ তো শান্তি নয়, এক ক্ষমতামত্ত গোষ্ঠী আর একটি গোষ্ঠীকে শেষ করে প্রতিহিংসা পালনের আনন্দে অধীর। নিজেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বললেন যে সামরিক শক্তির ছদ্মবেশকে আমরা ভারতবর্ষে মেনে নেবো না, আমরা আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সব সময়েই নত মস্তকে স্বীকার করবো। ‘we are ready in India to bow down to a moral supremacy, but not to this hardly disguised military domination, still recent—in the Punjab.’

ভারতবর্ষের মানুষের বেদনা নিজের মত করে অনুভব করেছিলেন বলেই এণ্ড্‌জ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ফরমায়েসী শান্তির উৎসবে ভারতবর্ষের মন সাড়া দেবে না।

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে একটি কাহিনীর উল্লেখ করতে চাই যা উপন্যাসের মত অথচ সত্য ঘটনা। লিপিবদ্ধ করেছেন এণ্ড্‌জের সহকর্মী স্বর্গতঃ গুরুদয়াল মল্লিক। হাণ্টার কমিশনের কাছে কংগ্রেসের রিপোর্ট দেবার কাজে এণ্ড্‌জ তখন পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে চলেছেন। গুজরানওয়ালার কাছে এক গ্রামে একজনের দেখা মিললো—যুদ্ধে সে ছিল কৃতকর্মী সৈনিক। তাকে রাজদ্রোহের সন্দেহে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। যে ইংরেজকে সে মনে মনে খাতির করতো তার প্রতি ঘৃণায় তার মন ভরে গেছে। এণ্ড্‌জ যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন সেই অত্যাচারিত লাজ্জিত মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছে, ‘চলে যান আমার কিছু বলবার নেই, ইংরেজদের আমি খুব চিনেছি যথেষ্ট হয়েছে আমার।’ অপরিসীম বেদনার ভারে এণ্ড্‌জের আয়ত ছুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছে। সম্মুখে আলিঙ্গনে সেই মানুষটিকে সমাদৃত করে তিনি গুনতে চাইলেন তার লাজ্জনার কাহিনী। পিঠের জামা তুলে নিরপরাধ সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তার কাহিনী শুনিয়েছে। স্তব্ধবাক

এণ্ড্‌জ যেন পাষণ্মূর্তি—তিনি তখন ভাবছেন এ কী করে সম্ভব হলো। একে কী সাহসনা দেবেন। নিজেকে সংযত করে, শাস্ত হয়ে তিনি বললেন ‘গুরু নানক গ্রন্থ সাহেবে ক্ষমা করতে বলেছেন—আমার দেশবাসীর এই পাপের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।’ নতজানু এণ্ড্‌জ সেই পাঞ্জাবীর পদস্পর্শ করে মার্জনা ভিক্ষা করছেন ইংরেজ জাতির জন্য। এর তাৎপর্য কোন ইংরেজ কি আজও ভাল করে ভেবে দেখেছে। বিহ্বল হতচকিত সেই মানুষটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পেছিয়ে গেল, বললো ‘না না এমন কোনো না’—হু-চোখ ভরা কান্নাধারায় বুক ভেসে গেল তার। মনের ভার হালকা করে সে বললে ‘গত ছ’মাসের জালা আজ আনন্দের অশ্রুজলে ধুয়ে গেল আজ আর কোনো নালিশ নেই—আজ আমি আনন্দিত।’

দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন গুরুদয়াল মল্লিক। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল যে এণ্ড্‌জের নামের আত্মক্ষর C. F. A.-র অর্থ হতে পারে Christs Faithful Apostle.

ইতিহাসের পাতা থেকে এণ্ড্‌জের যে সংক্ষিপ্ত কর্মের পরিচয়টুকু উদ্ধার করা গেল এই রকম আরও অনেক জিনিষ ছড়িয়ে আছে। তাঁর আসন্ন শতবার্ষিকীতে এই পরিচয় আরও বিশদভাবে উদ্ঘাটন করতে আমরা যেন আগ্রহী হই।

মুপ্রাচীন বঙ্গভাষার কল্পিত রূপ

রামপ্রসাদ মজুমদার

প্রাচীনতম বঙ্গভাষায় নিদর্শনের কথা বলতে গেলে কবিতা বা কাব্যের কথাই প্রথমে মনে আসে। বহু প্রাচীন ভাষায় তথা বাংলায় আদি রচনা হিসাবে কবিতা বা কাব্যই পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে ১০০০-১১০০ শতকের চর্যাগীতি, তার মাতৃস্থানীয়া বা বা ভগ্নীস্থানীয়া দোহাকোষ, ১৩০০ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড় জোর শূণ্য পূরণ, ময়নামতীর গান প্রভৃতির নাম আমরা করতে পারি, আর গল্পের দিক দিকে ২৩ শত পূর্বের 'মিশনরী' প্রভৃতির লেখা বা প্রাচীন পত্রাদির কথা বলতে পারি। তার পূর্বেও বাঙ্গালী ও বাংলা ও বঙ্গভাষা ছিল, বড় জোর অধিবাসী-স্থান-ভাষার নামভেদ ও প্রকারভেদ থাকতে পারে। প্রাচীনতম বাঙ্গালী লেখক বা কবিরূপে পালিগ্রন্থে বিখ্যাত ও বুদ্ধের শিষ্য (৫ম শঃ খৃঃ পূঃ) বঙ্গীয় খেরো বা বন্দেখ স্ববিয়ের পালিতে লিখিত গাথার কথা বলা যায়। পরে এঁর রচনাংশও উদ্ধৃত করছি। ৯ম শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা ১০ম শতকের হিন্দু দার্শনিক ও বৈশেষিক মতের প্রশস্তপাদভাষ্যের গ্রায়কন্দলী টীকার রচয়িতা শ্রীধরাচার্য, বাঙ্গালী হলেও তাঁদের লেখায় বাঙ্গালীর বা বঙ্গভাষায় বিশেষত্ব আছে কিনা বলা কঠিন। বলা বাহুল্য যে বঙ্গভাষার পূর্বস্তরের যে রূপ, সেইরূপ হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বস্তরেরও, পার্থক্য আঞ্চলিকভাবে ও কৃত্রিম রচনায় থাকতে পারে মাত্র।

বৈদিক সংস্কৃতের (বহুলাংশের) সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত প্রাকৃতের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ও নিয়মের বন্ধন দূত না থাকায় বৈদিক সংস্কৃতকে ভেবঁর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রাচীনতম প্রাকৃতরূপে গণ্য করেছেন। উক্ত কারণে ও প্রাকৃতের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বিবিধ সংজ্ঞামতে ঐ মতের মূল্য দেওয়া যায়। হেমচন্দ্রের (১১০০খ্রীঃ) ব্যাকরণের ৮ মাধ্যাদিতে উক্ত 'আর্য প্রাকৃত' বা অপভ্রংশ খুব সম্ভবতঃ বৈদিক প্রাকৃতের নামান্তর বা রূপান্তর! খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যের প্রথমংশেই এক (স্বদ্ধ বা সংস্কৃত) শব্দের বহু অপভ্রংশের উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন গো বা গোঃ শব্দস্থলে গবী, গোণী; গতিকর্মা শব্দ শবতি (গচ্ছতি) ইত্যাদি। ২য় শতকে সঙ্কলিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ আছে,—এর ৩২এর অধ্যায়ে ধ্রুবা-বিধান প্রকরণে ছন্দঃ আলোচনায় উদাহরণে এমন বহু শ্লোক রয়েছে যা বিশেষ ধরণের প্রাকৃত বা সরল অপভ্রংশ বলে বোধ হয়। দণ্ডীর (৭ম শতক) কাব্যদর্শে অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ আছে। চণ্ডের (১ম শঃ) প্রাকৃত ব্যাকরণে উদ্ধৃত বহু সহজ শ্লোকের সঙ্গে পরবর্তী উক্ত হেমচন্দ্রের প্রাকৃতব্যাকরণাদির শ্লোকের ঐক্য রয়েছে। বাঙ্গালী ক্রমদীপ্তরের (সম্ভবতঃ ১৭ শঃ) সংক্ষিপ্তসার নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের ৮মাধ্যায়ে প্রাকৃতপদে অপভ্রংশ ব্যাকরণ আছে। তৎপূর্বের পুরুষোত্তমের (১১শ শঃ) প্রাকৃতানুশাসন নেপাল হতে সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে, ইনি পূর্বভারতীয় রূপে গণ্য ও ব্যাকরণে বহু অপভ্রংশ শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১১শ শতকের পূর্বে বা পরে কতায়নের বা কাতায়নের পালি ব্যাকরণ ও বহু প্রাকৃত ব্যাকরণ ও গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছে। এই সব কথা ভেবে দেখলে প্রাচীনতর অপভ্রংশকে

প্রাকৃতের ভয়ী বা প্রকারভেদ বলে মনে হবে, আর পরবর্তী অপভ্রংশ (অব হট্ট প্রভৃতি নামেই) — যাকে বাংলা ভাষা প্রভৃতির মাতৃস্বরূপ বলা যায়, প্রাকৃতের কণ্ঠস্থানীয়রূপে গণ্য। বঙ্গে লিখিত বা প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার নমুনা পাওয়া যায় না বলা হয়; হয়ত তা চর্যাকোষ প্রভৃতিতেই রয়েছে। প্রাচীন পিঙ্গল নাগের নামে ছন্দোগ্রন্থ প্রাকৃত পৌঙ্গলম্-এ ১৪শ শতকের হরীর বা হামীর প্রভৃতির নাম থাকলেও এ সঙ্কলন অমূল্য।

নিম্নে আমি প্রাচীন সংস্কৃতাদি হতে উদ্ধৃতি দিয়ে ও মন্তব্য করে দেখাতে চেয়েছি যে বাংলা ভাষার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র অনেকটা দেখান যায়। কিছু নূতনত্ব হয়ত এ বস্তুবো রয়েছে, স্বধীজনেরা বিচার করবেন। এই প্রসঙ্গে এই একটি কথা বলা যায় যে ভাষা ও ছন্দ বিচারে হ্রস্ব-দীর্ঘের আলোচনা আজও অব্যাহত রয়েছে, অক্ষরবৃত্তে বিশেষতঃ মাত্রাবৃত্তে অর্থাৎ মাত্রাছন্দে এদের দোলা বা প্রভাব বেশ বোঝা যায়; কিন্তু বৈদিক উদাত্তাদি স্বরের ব্যবহার নিয়ে পাণিনির আলোচনা ছাড়া লৌকিক সাহিত্যে এদের ব্যবহার নিয়ে কিছু লেখা বা প্রাচীন আলোচনা দেখা যায় না। উদাত্ত স্বর মুখ-তালু প্রভৃতি উচ্চাংশ হতে উচ্চারিত, কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ধরণে ওকে ‘এক্সেস্ট’ অর্থাৎ উচ্চস্বরযুক্ত মনে করা হয়। জোর দিয়ে বলা বা ‘এমফ্যাসিস’-এর চিহ্নও লৌকিক সাহিত্যে লুপ্ত। এই স্বরপ্রভাবগুলিও প্রচ্ছন্নভাবে ‘বানান’ ও উচ্চারণে প্রভাব বিস্তার করে। উদ্ধৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ, গ্রন্থের নাম ও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত চিহ্নের উল্লেখ করছি। (১) চর্যাগীতিপদাবলী ডঃ স্কুয়ার সেন সম্পাদিত, (২) ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, (৩) জয়দেবের গীতগোবিন্দ-বঙ্গমতী সংস্করণ, (৪) প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ‘বিল্লিওথেকা ইণ্ডিকা’ গ্রন্থমালায় এঃ সোঃ প্রকাশিত। এগুলির সংক্ষিপ্ত চিহ্ন যথাক্রমে চ, শ্রী, গ, প্রপ। ছন্দোগ্রন্থমতে ‘পুণ্ড চতুস্পদী’ এই বোধ হয় সাধারণ মত; তবে প্রপ ১।১৫৪-৫এ দৌঅই বা দ্বিপদী ছন্দের সংজ্ঞা ও উদাহরণ আছে। গ-তে ত্রিপদীও দেখি।

প্রাচীন চর্যাগীতির ছন্দ সম্বন্ধে ডঃ সেনের মত এই যে মোটামুটি তিনরকম ছন্দে এগুলিতে রচিত ৩টা অবহট্ট ভাষার প্রভাবে জন্মেছে বটে তবে অবহট্টের হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রাবিষয়ে এগুলিতে বন্ধন তেমন নেই; অধিকাংশ চর্যাগীত বোলমাত্রার পাদাকুলক পজ্‌বাটিকা পদ্বড়ী চউপঙ্গ ছন্দে লেখা। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক গীতিতেই ২।১ ছত্রে পয়ারের গুঞ্জন আছে।

পয়ার শব্দের পূর্বরূপ নিয়ে বহু মতভেদ পদকার, পাদাকুলক ওটি পারসী শব্দ, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে; পর্যায় বা ‘প্রাকৃত’ শব্দের প্রাকৃত রূপ ‘পাইল’র সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই ত? যাই হক না কেন পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রভুত্ব বাংলায় বিশেষভাবে আছে তা সহজেই বোঝা যায়। আমার সহজ দৃষ্টিতে মনে হয় যে পয়ারের এবং সম্ভবতঃ ত্রিপদী ছন্দের কবিতার প্রতি ছত্রে, তাতে ১টি চরণ ধরা হোক বা একাধিক ধরা হোক, সাধারণতঃ ৪টা পর্ব বা বিভাগ দেখা যায়; কোথাও বা এর অর্দ্ধাংশরূপে ২টা বিভাগ দেখা যায় বা করা যায়। গানে যেমন ৪ মাত্রার তালের ও ৩ মাত্রার তালের গুণনীয়করূপে ত্রিতাল, যৎ প্রভৃতি ও একতাল, দাদরা প্রভৃতি ব্যাপক প্রচলিত সেইরূপ কাব্যেও। পয়ার ছন্দঃ সংস্কৃতের অল্পরূপ এমন কি ত্রিষ্টুপ প্রভৃতির মতই ২ বৃহৎ ভাগে বা ৪ ভাগে বিভক্ত ক’রে বেশ পড়া যায় বা আবৃত্তি করা যায়। ছড়া, ব্রতকথা প্রভৃতির সঙ্গে বহু প্রাচীন দোহা প্রভৃতির ছন্দের দোলা এদিক দিয়ে দেখা যায়; বড় জোর অবসর নেবার মত মাত্রা স্বাভাবিক ভাবে পূরণ করে নিতে

হয়। উদাহরণ দিই, এতে ভাগগুলি আমার দেখানো।

অগ্নিমীলে | পুরোহিতং | যজ্ঞস্ত দে | বয়স্বিজম্।

হোতারং র- | ত্ব ধাতমম্ | (-ঋথেদ ১।১।১)

বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার ঐ ত্রিপদা গায়ত্রী মন্ত্রের অক্ষরমাত্রিক বাংলা অনুবাদে দীর্ঘ ত্রিপদীর আভাষ দেখা যায়, আর ১ম দুই চরণে বিশেষতঃ ঐ ধরণের ১৬ অক্ষরের অন্তর্ভূপ্ ছন্দে পয়ারের স্থম্পষ্ট আভাষ দেখা যায়। উক্ত গায়ত্রী ও অন্তর্ভূপের ১ম দুই চরণে ১৬ অক্ষর থাকলেও মাত্রায় পার্থক্য আছে তাছাড়া গায়ত্রীর ২৪ অক্ষর চার চরণে অর্থাৎ ৬×৪ অক্ষরেও রচিত হতে পারে। ১১ অক্ষরের ত্রিষ্টুপ্, ১২ অক্ষরের জগতী ইত্যাদির বহু শাখাভেদ আছে। বেদমন্ত্র বিশেষতঃ লৌকিক কাব্যসাহিত্যে প্রায়ই পূর্বোক্ত তাল বা বিভাগ দেখা যায়; স্বর জটিল করে পড়লে অবশ্য স্মৃতিমার্ধ্যই বড় হয়। বলা বাহুল্য যে একই ছত্র বিভিন্ন স্বরে পড়া যায় বা পাঠিতও হয়। এখন উক্ত ঋকের অক্ষরমাত্রিক অনুবাদ ও গীতা ও চণ্ডী হতে ২ ছত্র নিয়ে ঐরূপ অনুবাদে ভাগের সাদৃশ্য দেখুন

অগ্নি পূজি | পুরোহিতে | যজ্ঞদেব | ঋত্বিকেরে।

হোতা রত্ন | ধারীশ্রেষ্ঠে।

ধর্মক্ষেত্রে | কুরুক্ষেত্রে | সমবেত | যযুংস্বরা।

মদীয় পা | তব আর | কি করিল | হে সজ্জন।

যা দেবী স- | বভূভেতে | শক্তি রূপে | অবস্থিত।

নমঃ তাঁরে | নমঃ তাঁরে | নমঃ তাঁরে | নমঃ নমঃ।

স্বপ্রাচীন গণ্ডের রীতি একটু দেখা যায়। কৃষ্ণ যজুর্বৈদ বা উত্তরীয় সংহিতা (২।৫।১।১) হতে দেখুন:—

বিশ্বরূপো বৈ স্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বশ্রীযোহস্বরাণাং তস্ত ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসন সোমপানং সুরাপানমন্নাদনং... ॥

বাংলায় শব্দানুসারী অনুবাদ:—বিশ্বরূপ (এই?) স্বাষ্ট্র পুরোহিত দেবতাদের ছিল (,) ভাগিনেয় অস্বরদের (,) তার তিন মাথা ছিল সোমপান (—কারী) সুরাপান—(ও) অন্নভোজন... ॥

সংহিতাগুলির কবিতা ও গণ্ডের সঙ্গে ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদের ঐগুলির বহুদিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে। বাংলায় কবিতায় কতকটা ঐভাবে শব্দবিশ্লেষণ চলে তবে গণ্ডে পদ-পারস্পর্যের একটা রীতি বেশ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত, যখন তখন ক্রিয়া প্রভৃতিকে কর্তার পূর্বে বা বিশেষণকে বিশেষ্যের পরে দেওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত কবিতা বা গদ্যাংশের মধ্যে কতকগুলির মধ্যে সাধারণ প্রচলিত অর্থাৎ পাণিনি ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু কতকগুলিতে এই নিয়মের দৃঢ়তা নাই, বরং নিয়মহীনতা বা সাবলীল প্রকাশভঙ্গী দেখা যায়, এইগুলিকেই অপাণিনীয় বা পাণিনিপূর্ব বৈদিকসংস্কৃত বলা হয়। পাণিনি নিজেই ৬৪জন পূর্ব বৈয়াকরণকে ও বহু আঞ্চলিক মতের কথা স্মরণ করেছেন—নানা স্বতন্ত্রের মধ্যে; অতএব এই রীতিরও প্রভাব বৈদিকসাহিত্যে স্থলবিশেষে রয়েছে,—প্রমাণ হিসাবে এই ধরণের পাণিনীয়, অথচ পাণিনির নিজস্ব মতের নয়, এমন রচনা বা শ্লোক ব্রাহ্মণাদিতে উদ্ধৃত

হয়েছে। লাতিন-গ্রীক-জার্মান ইংরাজী প্রভৃতি আৰ্য্যভাষার (অর্থাৎ সংস্কৃত-সম্বন্ধীয়) অন্তর্ভুক্ত হলেও বাংলাভাষার রীতি, প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতের তুলনায় নানাভাবে আরও অনেক দূরে সরে গেছে—অর্থাৎ সাদৃশ্য আরও অল্প। পালি ভাষাকে কেউ কেউ প্রাকৃতের মধ্যে বা প্রাচীন মাগধ প্রাকৃত বলে মনে করেন। সাধারণ প্রচলিত প্রাকৃত হতে পালি কিছুটা ভিন্ন, বরং পূর্ণতা (শব্দ ধাতু প্রভৃতির রূপে) ও প্রয়োগের দিক দিয়ে পালির সঙ্গে সংস্কৃতের অনেক সাদৃশ্য। পালির গন্ত ও পন্তের উদাহরণ অনেকটা সংস্কৃত উদাহরণের মতই ; এইরূপে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রাকৃত ভাষার উদাহরণও ঐরূপ।

প্রথমে বঙ্গীয় খেরোর পালিভাষার গাথা উদ্ধৃত করি। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাপ্ত এঁর কাহিনী ও রচনা স্থলতঃ অবিকৃত থাকলে বুদ্ধের প্রত্যক্ষ শিষ্য হিসাবে এঁর কাল ও রচনা খৃঃ পূঃ—৫ম শতাব্দীর। এঁর রচনা ও প্রসঙ্গ ‘মিলিন্দ-পঞহো’ বা মিলিন্দ প্রশ্নে রয়েছে ; এই বাঙ্গালীর গাথা খের গাথার মহানিপাত (টাকা মতে ‘সত্ততিনিপাত’) অংশে, ১২১২-১২৮১ নং গাথায় ; মোট ৭০ নয় ৭১ ও শেষে কিছু অতিরিক্ত বিবরণ। খের গাথা ১২১২ ও ১২৪৪ নং (নিম্নোক্ত বিভিন্ন অংশে) অল্পষ্টপ্ ছন্দঃ প্রযুক্ত বোধ হচ্ছে, কিছু ক্রুটি আছে) :—

নিক্ থন্তং বত মং সন্তং অগারস্তা অনগারিয়ং ।

বিতক্কা উপধাবন্তি প গ ব্ ভা ক গ্ হতো ইমে ॥১

দি বা বিহারা নিক্খম্ম সম্মদন্তন কম্যতা ।

সাবকো তে মহাবীর পাদে বন্দতি বদ্দিমা ॥৩৩

তুলনামূলক এক ত্রিভাষার উদ্ধৃতি এইস্থলে বিভক্ত করে স্থল বঙ্গানুবাদ সহ দিচ্ছি :—

(সং) যদা দ্বয়ো | ধর্মযোঃ পা | রগো ভব | তি ব্রাহ্মণঃ | ।

অথাস্ত স | কের সংযোগা | অস্তং গচ্ছ | স্তি জানতঃ | ॥

(পা) যদা দ্বয়ে | স্ব ধম্মেহ | পারগু হো | তি ব্রাহ্মণো | ।

অথহস্ স | কের সংযোগা | অথং গচ্ছ | তি জ্ঞানন্তস্ | ।

(প্রা) জদা দোহ | ধম্মে-হ | পারও হো | ই বম্হণো ।

অথ অস্ স | সকের সংযোগা | অথং গচ্ছ | স্তি জানন্তস্ | ॥

(= বাং) যবে দুই | ধর্মেতে পা | রগ হয় | ব্রাহ্মণ | ।

তবে তার | সব সংযোগ | কেটে যায় | ঐ জানীর | ॥

এইটুকুতেই প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলার বেশী মিল দেখা যাচ্ছে ; প্রাকৃতে য স্থানে জ, ন-র প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে। এইখানে ৭৮ খৃঃ-র অশ্বঘোষের ললিতবিস্তর হতে বৌদ্ধ জৈন প্রভাবিত সংস্কৃতমিশ্র এক গাথা ভাষার একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, বুদ্ধ তাঁর সারথিকে দুর্বল পুরুষের অবস্থার কথা বলছেন। এখানে বলে রাখি যে প্রাচীন সংহিতা ও ব্রাহ্মণেও ‘...গাথা নারাসংসী’র—অর্থাৎ গাথা ভাষার ও নরস্তুতিবিষয়ক ভাষার বা ঐরূপ গাথা ভাষার উল্লেখ আছে। এখন বুদ্ধোক্তি :—

কিং সারথে পুরুষ অল্প স্থান

উচ্ছুক মাংস কধির ত্বয় স্নায়ুনকঃ ।...

ভারতের নাট্যশাস্ত্র ৩২-র অধ্যায় হতে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

(১) মধ্যম লঘু (তটিচ্ছন্দঃ ?) ; বোধ হয় চরণে ৩ অক্ষর ; অন্ত্যাহুপ্রাস আছে ; বাংলায় প্রায় অল্পরূপ রূপ :—

শঙ্করঃ শূলভুৎ | পাতু মাং লোককৃৎ ॥

(৭) দুই লঘু—এক গুরু ক্রমে :—

অধিকং বিরহে | মদনো দহজি ॥

(৩-৪) লঘু-গুরু মিলন-ক্রমে ; বোধহয় চরণে ৪ অক্ষর ; অন্ত্যাহুপ্রাস আছে । তুঃ বিজয়া ছন্দঃ, ৬৩ শ্লোক এতে প্রতি চরণে ৩য় স্বর দীর্ঘ, অন্ত্যাহুপ্রাস দেখা যাচ্ছে । যথাক্রমে উদাহরণ :—

(পুনঃ তুঃ ৪ অক্ষরের চরণে ২য় স্বর লঘু হলে প্রতিষ্ঠা ছন্দঃ, শ্লোক ৫৬ ; ১ম দুই লঘু ও পরে দুই গুরু হলে ভ্রমরী ছন্দঃ, ৫৮)

হিমাংস এ বগন্ত এ | অশ্মুংগ ও পবনও ॥৬১

বাংলা অর্থের চরণ বোধ হয় নিম্নরূপ—

হিম-আহ্ন বনান্তেতে | অশ্ম ফেলে পবনেতে ॥

মোরুলও গবন্তও | মেহাগমে সংভন্তও ॥৬৩

(৫-৬) অক্ষরের চরণের ছন্দের সাধারণ নাম স্প্রতিষ্ঠা ; পঙক্তিচ্ছন্দে এর বিগুণ অক্ষর । নিয়ে উদাহরণে পদান্তে গুরু ; বোধ হয় কমলমুখী ছন্দঃ ; চরণে ৫ অক্ষর দেখা যাচ্ছে :—

পবনহও সলিলধরো | ভমই নহে অহিয়সমো ॥৬১

পদের সর্বস্বর দীর্ঘ ; চরণে ৫ অক্ষর ; প্রতিপদে অন্ত্যাহুপ্রাস ; বিহ্যৎভ্রাতা ছন্দ :—

এ এ গজ্জন্তা তোয়ং মুকুন্তা | লোকং ছাদন্তা মেহা সংপত্তা ॥

আদি ও পরের অর্থাৎ শেষের ২টি স্বর দীর্ঘ হলে ভূতলতলী ছন্দঃ, ৫ অক্ষরে চরণ, ৬৭ শ্লোক ।

(৭) ষড়ক্ষর চরণের এক ছন্দের নাম বিমলা, ৪র্থ স্বর লঘু, উদাহরণে ১ম ও ২য়ও লঘু দেখা যাচ্ছে :—

কমলা অরেন্দ্র ; ভমরা ল এ স্বং | মদস্ববহন্তো পবিসেই হতী ॥

(৮) মালা ছন্দে আত্ম, ৪র্থ ও অন্ত্যস্বর গুরু, ১ম পাদে গায়ত্রী (ছয় অক্ষরে) ; ২য় চরণে ৭ অক্ষর দেখা যাচ্ছে :—

বা অধিকারিএ বজ্জিবিগিবাতিএ | এথ মহাগণে কন্দন্দি হখিনী ॥

(৯) উষিক্ ছন্দে $৪ \times ৭ = ২৮$ অক্ষর ২য় ও ৪র্থ চরণে অন্ত্যাহুপ্রাস ; শ্লোক ১২৩—

পণরো পুপ্ফবাহী মদনং দীবষন্তো ।

সিসিরে বাদি কালে মম (তাসং জনেন্তো) ॥ ১২৩

-১৪-শতকে সঙ্কলিত প্রাপ্তে বর্ণবৃত্তের উদাহরণে (বোধ হয় ২১৪৪) সাধারণ ১০ অক্ষর স্থলে ১৩ অক্ষর দেখা যাচ্ছে ; ছত্রের শেষ অক্ষর বাদ দিতে তোটক ছন্দের মত লাগে, ছত্রের শেষে অন্ত্যাহুপ্রাস ; ‘গাছে’ ‘আছে’ শব্দ যেন বাংলা, অগ্রত্রে ঐ শব্দদ্বয় কি দেখা যায় ? অল্পবিস্তর এই সময়ে রচিত শিবমহিমস্তোত্র ও তোটক ছন্দে বোধ হয়, যেমন—প্রভু মীশমনীশমশেষগুণং । প্রাপ—

ণব সংজরি লিজিও চুমহ গাছে ।

পরিভূলিও কেহু ণ আবণ আছে ॥

গাছের স্থলে পাঠভেদ গাচ্ছে ; টীকাকার কৃষ্ণের বংশীধারী টীকায় ‘আছে’ শব্দকে ‘অস্তি’ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

$৮ \times ৪ = ৩২$ অক্ষরের প্রসিদ্ধ অষ্টদ্বিপের কথা পূর্বেই বলেছি ।

ছন্দঃ প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বৈদিক সাহিত্যে ও সম্ভবতঃ ঐ সাহিত্যেও মাত্র গায়ত্রী প্রভৃতি ৭৮টি ছন্দঃ অল্পবিস্তর ব্যবহৃত ত্রিপদী বা চতুষ্পদী গায়ত্রী হতে বড় জোর ১৪×৪ অক্ষরের শকরী বা শর্করী বা ১৫×৪ অক্ষরের অতিশকরী ছন্দঃ। পিঙ্গল নাগ (গ্রীঃ পৃঃ ৭) তাঁর ছন্দঃ সূত্রম্ এ যেন প্রধানতঃ বৈদিক ছন্দঃ বা বৃত্ত নিয়ে ব্যস্ত । প্রায় এই সময়ে সংকলিত নাট্যশাস্ত্র যেন ৪ অক্ষরের চরণ হতে ১২ অক্ষরের চরণ জগতী—এদের সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে প্রচলিত শাখাগুলির আলোচনায় ব্যস্ত । -১২শ-শতকে রচিত বা সংকলিত সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থ ও পালির ‘বৃত্তোদয়’ গ্রন্থ প্রভৃতিতে একাক্ষর ছন্দঃ প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয় চোখে পড়ে নি, তবে ২২ অক্ষরের চরণ আকৃতি ছন্দের ও প্রসঙ্গ দেখি । কিন্তু প্রপ ও তৎপরবর্তী গঙ্গাদাসের (-১৫শ শঃ) সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরীতে খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনাও আছে । একাক্ষর দ্ব্যক্ষর প্রভৃতি চরণের শ্লোক ঐ দুটীতে বাংলা প্রভৃতিতে দেখি নি । এরা বহু প্রাচীন, হয়ত অধুনালুপ্ত—বহু রীতি ও শ্লোক রক্ষা করেছেন বলে মনে হয় । এখানে ছন্দোমঞ্জরীর একাক্ষর ধরণের উদাহরণ—

শ্রী- | স্তে | সা- | স্তাম্ ।

এর বঙ্গার্থ লক্ষ্মী তোমার ছিল । তবে কি শিশুর ‘পা | পা | মা | মা | ।’ বা ‘কে | ঐ | খায় । দই ।’ বা ‘জল | পড়ে | পাতা | নড়ে ।’ প্রভৃতিও পূর্ণাঙ্গ শ্লোক ?

১১ অক্ষরের ছন্দঃ ত্রিষ্টুভের শাখা ইন্দ্রবজ্রাদি এবং ১২ অক্ষরের জগতীর শাখা বংশস্থবিল, তোটকাদি । ১১ অক্ষরের দোতকং সহ পজ্জ্বটিকার বোধ হয় নিকট সম্পর্ক । পজ্জ্বটিকায় প্রতি ধরণে ১৬ মাত্রা, ৯ম স্বর গুরু ; যুগ্মবর্ণে যতি ; মুসলমান যুগ্মরস্তু ১৩শ শতকের পূর্বে এই নাম ব্যবহৃত কি না মনে পড়ে না । -১১শ-র চ ও মধ্যযুগের কোন শঙ্করাচার্যের মোহমুদগরে কিন্তু এর প্রভাব । পালি হতে দোতকং ও মোহমুদগর হতে পজ্জ্বটিকার উদাহরণ (-শেষোক্তে অন্ত্যাহুপ্রাস যেন বৈশিষ্ট্য তবে মাত্রার যেন তারতম্য) । প্রপ ২।১০৫এ দোধক (বোধ হয় দোতক) ও ১।১২৬এ পজ্জ্বলিআ বা পজ্জ্বটিকার উদাহরণ আরও উপভোগ্য হবে আশা করি ; একটু পরেই উদাহরণ দিচ্ছি ।

(পালি) সজ্জন- | মানস- | কণ্ণু বি- | কাশং |

মোহ মূঢ় জ- | হীহি | ধনাগম | তৃষাম্ ।।

কুরু তবু- | বুদ্ধে | মনসি বি- | তৃষাম্ । ॥...

দোহড়িকা ছন্দটীও উল্লেখযোগ্য মনে করি । এর প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চ ও গী-তে আছে মনে করি । এতে অন্ত্যবর্ণ লঘু, ১ম ও ৩য় চরণে ১৩ মাত্রা ও অন্ততঃ ১১ মাত্রা । উদাহরণ দিচ্ছি উক্ত ছন্দোমঞ্জরী হতে ; সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে উদাহরণ ; রাঙ্গি (রাধা) ও কাণ্ডুর প্রসঙ্গ ; যেন বাংলা ভাষার নিকট আত্মীয় ।

রাইদোহড়িপঠণ হুনি | হসিঅ কাণ্ডগোপাল ।।

বিন্দাবন ঘন কুঞ্জঘর | চলিও কমণরসাল | ॥

এতক্ষণ ছন্দে চরণের অক্ষর ও তার মাত্রার ক্রমবৃদ্ধির দিকে সম্ভবমত প্রাকৃত ভাষার উদাহরণের দিকে চোখ রেখেছি। ছন্দেই প্রাচীনতম বঙ্গভাষার নিদর্শন, তাই ছন্দ: নিয়ে এত বলা। গানেরও ছন্দ: বা মধুর প্রবাহ বহুস্থলে থাকে বা থাকতে পারে, কিন্তু তা সাধারণ জ্ঞানের বাইরে। প্রপ সঙ্কলনের ৫১৬ শত বৎসর পূর্বেরও চ ও গর ২১৪ শত বৎসর পূর্বের প্রাকৃত কবিতা একটু দিই। ১ম উদ্ধৃতি খ্রীঃ ৮ম শতকের বাক্‌পতির রচিত গোঁউড়বহো বা গোঁউড়বধ হতে; ২য়টি ৯ম শতকের রাজশেখরের কপূরমঞ্জরী হতে দিচ্ছি। এঁরা সম্ভবতঃ পশ্চিমভারতীয়, শ্লোকছুটি প্রাকৃত বা 'পাউদ' এর প্রশংসায়। দুটির ছন্দের নাম জানি না, তবে ১মটি পূর্বোক্ত 'রাই'-এর এমন কি কালিদাসের 'ঈপিসিচুধি'র মত লাগে, ১ম ছত্রে ১২ ও ২য় ১৮ অক্ষর; আর ২য় শ্লোকে প্রতিছত্রে ২০ অক্ষর। এর পরে দিচ্ছি প্রপ হতে পূর্বোক্ত অল্পসারে দোষক ও পজ্‌বালিয়ার ও এক মাত্রাবৃত্তের উদাহরণ, দোষক বৃত্তছন্দ ও অপরটি মাত্রাছন্দ; ৪র্থটি রাজা বিক্রমের হস্তে গোড় ও ওড়ের পরাজয় কাহিনী বর্ণিত, তবে তার ৩য় চরণে 'গুরু' শব্দটি বাদ দিলে বা দ্রুত পড়লে এই দুই ছন্দের প্রবাহ সাদৃশ্য বোঝা যায়, নানাভাবে যেন প্রাচীন বাংলাভাষার নিকট আত্মীয়; ৫ম উদাহরণও ঐরূপ, যেন চর্চা।

১। (বাক্-) সযলাও ইমং বাথা বিসন্তি এতে য পেন্তি বাযাও।

এন্তি সমুদং চিয় পেন্তি সাযরাও স্থিত জলাইং ॥

আংশিক মর্ম:—এতে (প্রাকৃতে) সকল বাক্য (ভাষা) প্রবেশ করে, এবং এথেকে ভাষাসকল নির্গত হয়। বাংলায় ধরণ যেন: সবগুলি এতে ভাষা প্রবেশ, এ থেকে যায় গো ভাষারা।

২। (রাজ-):—পরুসা সক্তি অবক্কা পাউদেবকো বি হোই স্থইমোরো।

পুরিসমহিলাণং জেতি অমিহন্তরং তেত্তি অমিমাণং ॥

আংশিক মর্ম:—পরুষ সংস্কৃতবন্ধ, প্রাকৃতবন্ধও হয় স্বকুমার। এ যেন সাধারণ মধুর গন্ত।

৩। প্র প: পিংগ | জটাবলি | ঠাবিঅ | গংগা |

ধারিঅ | গাঅরি | জেন অ- | ধংগা | ।

চাংদক- | লা জস্থ | সীমহি | গোক্‌থা |

সো তুহ | সংকর- | দিঙ্জউ | মোক্‌থা | ॥ ১০৫ ॥ দোষক

৪। প্র প: জেগং- | জিঅ গোলা- | হি বই | রাউ |

উদংড | ওডড জস্থ | ভঅ প- | লাউ | ।

গুরুবিক্রম | বিক্রম | জিণিঅ | জুজ্‌বা |

তাকান্ন প- | রক্কম | কোই | বুজ্‌বা | ॥ ১২৬ ॥ পজ্‌বালিআ

৫। প্র প (১১২): আরেরে | বাহহি | কাঙ্ক | গাব |

ছোড়ি | ডগমগ | কুগতিণ | দেহি | ।

তই ইথি | গই-হি | সং তার | দেই |

জো চাহ- | হি | সো লে- | হি | ॥ ৩ ॥ দোহা

এবারে তুলনাত্মকভাবে ভাষা বিশেষতঃ কবিতাংশগুলির বিচার করি। সংস্কৃত ভাষায়

বিশেষতঃ নাটকাদিতে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশেরও প্রভাব যথেষ্ট। ছন্দোগ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বা শ্লোকাদির নিদর্শন। ছন্দোমঞ্জরীকার বোধ হয় বাঙ্গালী, আর ব্যাকরণে বিশেষতঃ পূর্বোক্ত পূর্বভারতীয় পুরুষোত্তম ও ক্রমদীপ্তের ব্যাকরণে নিশ্চয়ই অপভ্রংশ শব্দগুলি অল্পবিস্তর বাঙ্গালীর নিজস্ব (জয়দেবেও হয়ত অপভ্রংশ ছন্দঃপ্রভাব)। প্রতিবেশী প্রাচীন এমন কি অর্বাচীন ভাষার সঙ্গেও সাদৃশ্য—যা বর্তমানের ভাষা দেখে সহজে বোঝা যায় না। যেমন পূর্বে ও কিছুটা বর্তমানেও বিভক্তি মধ্যে ৬ষ্ঠিতে ‘ক’/-সবাকার, পূর্ববঙ্গের আমাগো, মোক; হিন্দী উসকা; ঐরূপে ‘আমার’ প্রভৃতির ‘র’ এর সঙ্গে ২টা আর্থভাষা ইংরাজীর ‘হার’ ‘দেয়ার’ ইত্যাদি ও ফরাসী ‘ল্যর’ এর সাদৃশ্য। ২য়া ও ৪র্থীতে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতিতে বহুস্থলে ‘ক’ বর্ণটি থাকে, যেমন—আমাকে, হাম্কে; পালিতে ২য়া ও ৪র্থীর একরূপ, প্রাকৃতে প্রাকৃতলক্ষণ ২।১৩ হ্রস্ব প্রভৃতি মতে ‘ষষ্ঠীবচতুর্থী’ দেখা যায়, ষষ্ঠীতে ‘ক’ র কথা পূর্বেই বলেছি; সংস্কৃতে চতুর্থীস্থলে কয়েক ক্ষেত্রে ‘বিবক্ষয়া ৬ষ্ঠী’ হয়, বাংলায় ‘তারে’ ‘তাহার’ এই ২-এর মধ্যে ‘র’ আছে।

১১ অক্ষয়ের, ১২ অক্ষরের, ১৬ মাত্রার ছন্দ,—এর পরে ২৬ মাত্রার (ত্রিপদীতে?) ছন্দের দোহা ও চর্চাপদে বেশী, এটা বোধ করি স্বীকৃত। গণনায় ঠিক ২৬ না হলেও মাত্রার প্রভাবে বা বিশেষ নিয়মের প্রয়োগে সংস্কৃতাতি ও প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষার বেশ সাদৃশ্য; ২ বা ৪ ভাগও সহজে করা যায়। দৃষ্টান্ত দিই:

চ: স্ননা | পাস্তর | উহ (ই) ন | দিসই ॥

ভাণ্ডিন | বাসসি | জাস্তে | — | (১)

ড: সেনের মতে ২৬ মাত্রার (১৪+১২) ‘দোহা’ ছন্দে ৩টা চর্চাগীত; তার একটা ও আরেকটা ভেঙ্গে দেখাচ্ছি:

মহারণ- | পানে | মাতেল | রে | ! | তিহুন | সএল | এখী | — | (১)

চ ২৮ নং: উচা | উচা | পাবত | উঁহি | রসই | সবরী | বালী | — | (১)

মোরঙ্গি | পিচ্ছ | পরহিণ | সবরী | গীবত | গুঞ্জরী | মালী | — | (১) ৬

গ-তে যেন ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। একই শ্লোকের বিভিন্ন চরণে অক্ষর বা মাত্রার বৈষম্য, ৩ চরণে ছন্দঃ ইত্যাদি; ঋতিমাধুর্য ও গীতের রীতিও হয়ত এই লেখাকে প্রভাবান্বিত করছে। চ, প্রপ প্রভৃতির মত গ-তে অন্ত্যায়প্রাস বহু। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিই:

১। গ ১৩।১: বদসি | যদি | কিঞ্চিদ্ | অপি | দন্ত- | রুচি- | কোমুদী | ।

এর সঙ্গে পূর্বোক্ত ‘পবণহত’ প্রভৃতির বেশ সাদৃশ্য।

২। গ ৪।১২: সরস ম- | সগমপি | মলয়জ- | পঞ্চম্ | ।

৩। গ ৭।২৩: স্মর-সম- | রোচিত- | বিরচিত- | বেশা |

এই দুটীতে পয়ারের আবেশও লাগে। আবার উক্ত ‘বদসি’র ধরণেই শ্রী (পুথির ৩।১ পৃ):

আয়িলা | দেবের | স্মৃতি- | গুনী | ।

কংসের | আগম | নারদ | মুনী | ॥

৪। গ: ধীর স- | মীরে | স্মৃনা- | ভীরে | বসতি | বনে বন | মালী | — | ।

৫।গ ৫।৮ : রক্তি-সুখ | সারে | গতম'ভি | সারে | মদন ম- | নোহর- | বেশম্ | — | ।
 ৬।গ ৮।১ : অথ কথ- | মপি | যামিনী | বিনীয় | স্বর-শর- | জর্জরি- | তাপি যা | প্রভাতে | ।
 ৭।গ ১২।২ : কিশলয়- | শয়ন- | তলে কুরু | কামিনী | চরণ-ণ- | লিন-বিনি- | বেশম্ | — | ।
 ৮।গ ৭।২২ : সমুদিত- | মদনে | রমণী- | বদনে | চুষনে- | ললিতা- | ধরে | — | ।

শেষোক্ত ৫টার সঙ্গে পূর্বোক্ত 'সুনা', 'উচা', 'মুট' ইত্যাদি কয়েকটি ও পরবর্তী বঙ্গগীতির ও 'চউ'র অনেকটা ধ্বনি-সাদৃশ্য লাগে। সাধনমালায় বঙ্গগীতি নং ২৫৪টি নিম্নরূপ—

কিছে | নিচুআ | বিসাঅ- | গউ | ...

পাঠভেদযুক্ত প্রপ ১।৭৬ ও উক্ত ধরণের (তথা ১।১৫ ও য় দোঅই বা দ্বিপদী ছন্দ :) :—

চউ | লছ | কথবি | পসর | জহিঁ লা সহি | ৭ন্দউ | দউ | জাণ | ।

গুরু | টুটুই | বেলছ | চলই | তং তং | নাম | বিআণ | — | ॥ ৭৬ ॥ দোহা

চর্যায় শৌরসেনী (মথুরাদি স্থলের) প্রাকৃতাদির প্রভাব প্রসঙ্গে ডঃ সেন বলেছেন যে স্মৃতিবিচারে অবহট্টের সঙ্গেই চর্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবহট্ট কথ্যটির মূল অর্থ কি তা ঠিক জানি না, তবে বিজ্ঞাপতির পদাবলীতে ঐ শব্দের এক প্রাচীন প্রয়োগ দেখি ও অর্থ সাধারণী বা মৈথিলী ভাষা। বাংলা প্রভৃতিতে শিশুছড়া, ব্রতকথা, খনার বা ডাকের বচন, প্রবাদ প্রভৃতির ছন্দের, এমন কি কবিতা বা গগলছন্দের মধ্যে প্রাচীন ও কথ্য বাংলা-ভাষা প্রভৃতির রূপ বেশী থাকবে তা আশা করা যায় ; কারণ অস্ত, অল্পজ্ঞ প্রভৃতি বিজ্ঞের লেখা কৃত্রিম ভাষা বা সাধুভাষা আয়ত্ত করে না।

আর প্রবন্ধ বিস্তার না ক'রে কয়েকটি তুলনাত্মক উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। উক্ত কবীর রামানন্দের আশীর্বাদ-জাত বা শিশু ব'লে প্রবাদ এবং তাঁর স্থিতিকাল ১৫শ শতক। দাস-সঙ্কলিত 'ভক্ত কবীর' হতে ৩টি দোহা ভাগ করে তুলনা দেখাচ্ছি :—

চ : হুলি ছুঁহি—পিঠা | ধরণ না | জাএ.....

দোহা : মুষি মুষি | রো রৈ | কবীরকী | মায় | ,

ঐ বারক | কৈসে | জীবহি রঘু- | রায় | ॥

চ : ভণয়ে | হরিণী | ঐ হরিণা | স্খ তো |

(তুঃ পূর্বোক্ত 'অরেয়ে'-প্রপ)

দোহা : কর্হে—। বীর অস | উত্তম | কীহে | ,

আপ জী- | যৈ ওর্- | অনুকো | দৌজৈ | ॥

পূর্বোক্ত 'উচা' প্রভৃতি সহ স্বরাদিসাদৃশ্যে নিম্নের দোহাও উপভোগ্য :—

না মৈ | ধর্মী | নাহী অ- | ধর্মী | , না মৈ | জতী | না কামী | হো | ,

পূর্বোক্ত 'বদসি যদি' ও বিশেষতঃ 'আয়িলা দেবের' সঙ্গে আসামী 'ডাক' (রাষ্ট্র-ভারতী, মে '৬২ হতে ; বোধ হয় শব্দটি বৌদ্ধসূচক) এর বচন,—খনা সম্বন্ধীয় মিহিরের আগমন ও উক্তি,—এর সঙ্গে যথাক্রমে বাংলায় ব্রতকথার ও খনার বচনের একটু অংশ ও পরারের পাঠ সাদৃশ্য।

ডাক : সেদিন | আসিয়া | মিহির | মুনি ।

অতিথি | রূপে | রৈলা | আলুনী ॥...

বাং ব্রতঃ : নীতার | মত | সতী | হব

লক্ষণের | মত | দেওর | পাব |

বাং থনা : কি কর | শব্দর | লেখা- | জোখা | ...

ডাক : না লাগে চা- | উল চকু | না লাগে | জুঁই | ॥

খের এ- | কুঠি দিয়া | তাতে থা | কিম শুই | ॥

পুনশ্চ বাংলা ছড়ার সঙ্গে উড়িয়া ছড়ার সাদৃশ্য :—

আমার | কথাটা | ফুরো- | ল | ।

নটে | গাছটা | মুড়ো | ল | ॥...

মো | কথাটি | সহি- | লা | ।

ফুল গচ্ছটি | মহি | লা | ॥...

এখন দুটি কথা বলতে চাই। (১) মাত্রা, স্বর বা স্বরাঘাতের ক্রমিক বা বিশিষ্ট পরিবর্তন করলে এমনকি সাধারণ গণ্ডও গুছিয়ে বললে তা কবিতা বা গণ্ড কবিতা হবে; আর (২) পদাদি-বিভাগে ‘মার্কামারা’ বা বহু প্রচলিত ছন্দের নাম ঘুরিয়ে বললে বা স্রুতি মার্ধ্য, বজায় রেখে পদ-বিভাগ করলে পয়ারকেও লঘুতর ত্রিপদীতে ও ত্রিপদী প্রভৃতিকেও বিবিধ বৃত্তছন্দে বা মাত্রাছন্দে আনা যেতে পারে। যেমন ধরুন পয়ারের অংশ ত্রিপদী ধরণে সাজাচ্ছি :—

মহাভার- তের কথা

অমৃত সমান ।

অর্থযুক্ত বা অর্থহীন সহজ ও ক্ষুদ্র-মধুর রচনায় কথা ব’লে বা প’ড়ে শিশু বা বালকদের কত আনন্দ। যেমন :—

(১) আগডুম্ | বাগডুম্ | তাড়া- | তাড়ি | ।...

(২) কানা- | মাছি | ভোঁ | ভোঁ | ।...

(৩) আনি | মানি | জানি | নি | ।... ইত্যাদি।

পারসী, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি নানা বিদেশী আর্থ ভাষায় এমনকি দক্ষিণভারতের ভাষায় ও আরবীতেও এমন বহু কবিতা বা শ্লোক আছে যাদের সঙ্গে পূর্বোক্ত বহু ছন্দের যোগ বা সাদৃশ্য দেখান যায়। যেমন ‘টেল্ মি নট্ ইন্...’ সহ উক্ত ‘অরে’ ইত্যাদি; তথা ‘টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট্’, ‘টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিটল্ ষ্টার’ ইত্যাদি।

শেষে বলি, সুপ্রাচীন সাধারণ বঙ্গভাষা তার আত্মীয়াদের সঙ্গে বোধহয় বর্তমানের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর ছিল।

আদিত্য—মধু

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

সীমাবদ্ধ মরজগতে অন্তবানের সাহায্যে অন্তহীনের অহুসন্ধানের প্রয়াস মানুষের জ্ঞানোন্মেষের সাথে চলে এসেছে এবং আজও চলেছে—অসীমকে মানুষ আজও খোঁজে সসীমের মাঝখানে। সৌর পরিবারের আমাদের এই গ্রহটির ওপর দাঁড়িয়ে যখন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র আর যেখানে যা কিছু আছে ছালোকে দোহুল্যমান, নিরীক্ষণ করা যায় তখন মনে হয় যেন আপাতত প্রাচীনমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাথে প্রাণ ও প্রাণীর পরিবেশের কোন যুক্তিসংগত সম্বন্ধ কিছু নেই। আজও যে প্রাণী-জগতের উৎপত্তির জটিল সমস্তার যথাযথ সমাধান হচ্ছে না তার বোধহয় নানা কারণের মধ্যে এক কারণ সৌর পরিবারে জৈব ধর্মের প্রতিকূল পরিস্থিতি। এই পরিবারের এক গ্রহে প্রাণীর সৃষ্টি যেন অবাস্তব অর্থহীন ও অর্থোক্তিক। প্রাণ ও প্রাণী যেন অনাহত এবং অনিমন্ত্রিত অতিথি। আমরা প্রাণধর্মী মানুষ, অন্তান্ত প্রাণধর্মী সাংগোপাংগোদের নিয়ে ঢুকে পড়েছি এই পরিবারের একটি গ্রহে কোন ভূমিকা না করে—বিশ্বপরিকল্পনায় আমরা খাপ খাই না—আমরা উপেক্ষিত। সূর্যের তাপবীকিরণ এতো প্রচণ্ড যে প্রাণ বাঁচতে পারে না, ছালোকে এতো বেশী হিমেল। যে জীবজগতের অল্পকূল পরিবেশের কোন চিহ্নই নেই। ভুলোকের চতুর্দিকে যদি আবাহাওয়া পরিবেষ্টিত না হতো, হয়তো কোন জীবের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না। এখন যখন এসেই পড়েছো বাবা তখন পাত-টেনে বসে যাও—যদি কেড়েকুড়ে কিছু নিতে পারো খেয়ে-দেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, নয়তো এই বিরাট অসীমত্বের মধ্যে তুমি নিতান্ত একা ও নিঃসংগ,—মিলিয়ে যাবে ঐ মহাশূণ্যে কিম্বা উধাও হয়ে যাবে কোন অজানা নিরুদ্ধেশের পথে কেউ বলতে পারে না। মানুষের ভাব ও ভাষা শিল্প, কলা, ধর্ম-কর্ম, আশা, আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুরই সম্বন্ধ নেই সৌর পরিবারের কোন গ্রহের সাথে—যাদের সৃষ্টি করেছে এই সবিতা। পিতৃত্ব বা জননীত্বের দাবী নিয়ে সবিতা যদি আজ বুকচিরে দেখায় মানুষকে তার পিতৃত্বের বা মাতৃত্বের রূপ, খুঁজে পাওয়া যাবে না সেখানে মেহময়ীর মেহশীলতা বা করুণার একটি কণা। কিন্তু সবিতা বলবে—এই দেখ যত গ্রহ আমি সৃষ্টি করেছি তার সব উপাদানগুলোই রয়েছে আমার মাঝে বাস্পাকারে—আমিই তোমাদের প্রসব করেছি। তোমাদের মধ্যে একজন আমারই দেওয়া উপাদানগুলি দিয়ে জীবজগৎ সৃষ্টি করে আজ হয়েছে মাতা বহুধরা। আমার হৃৎপিণ্ডের তাপমাত্রা হতে পারে এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রী ফারেনহাইট, কিন্তু অক্লান্তভাবে তাপ ও রশ্মি তোমাদের বিতরণ করে আসছি যার জন্তে—‘হে ভুলোক! তোমার প্রাণীজগৎকে তুমি বাঁচিয়ে রেখেছো। একদিন আমার এই নিরপেক্ষ দানের পরিসমাপ্তি হবে; আমার যা কিছু আছে তোমাদের বিলিয়ে দিতে দিতে আমি ক্ষয়িষ্ণু,—আমি নিঃস্ব হতে চলেছি। একদিন আমি হবো এই মহাশূণ্যে বিলীন সেদিন হয়তো তোমরাও থাকবে না। কোথায় মিলিয়ে যাবে অসীমের মাঝে এই প্রাণীজগৎ আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না,—সূর্যমুখী সেদিন আর মুখতুলে চাইবে না আমার পানে—বীজাকুর মাথা তুলেই খুঁজবে না আমার দেওয়া আলোর ঢেউকে। পৃথিবী হবে শীতল,

অন্ধকারময় ও নিশ্চল।

আমাদের এই সামান্য একটু-জানা বিশ্ব রচনার ভূমিকায় প্রাণীজগৎ অনাহত অতিথির মত এসে পড়েছে এই পৃথিবীতে জীবকোষগুলিকে বাহন করে। জীবকোষের অপূর্ব কর্মতত্ত্ব নিয়ে এলো প্রাণের বিকাশ—আরম্ভ হয়ে গেলো প্রাণের খেলা আমাদের এই গ্রহটির বুকে—বনে জংগলে, জলে, স্থলে, আকাশে বাতাসে—অপ্রাণ বিশ্বের প্রচ্ছদপটে। মানুষের ক্রমবিকাশ, ইতিহাসের পৃষ্ঠভূমি। দর্শনে উল্লিখিত মানুষের কর্মফল ও কর্মবাদ সেদিন কাকে যে উদ্বেলিত করেছিলো জানি না এবং কোন মানুষ ও কোথায় মানুষ—যার কর্মফলের জগৎ সে বৃক্ষরূপে জন্ম নিয়েছিলো তাও জানা সম্ভব নয়—মানুষই হয় নি—তার আবার কর্মফল! অশেচর্য গতিতে চললো সৃষ্টির লীলা জীবকোষের মাধ্যমে। কিন্তু একনিশ্বাসে যেভাবে কথাগুলি লেখা হলো ঠিক ততটাই ত্বরিতগতিতে জীবজগৎ সৃষ্ট হয় নি—কত সহস্র বছরের ছোট বড় ঘটনা, উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত কত জানা অজানা কাহিনী জড়িয়ে আছে জীবজগৎ সৃষ্টির ইতিহাসের সাথে। সব কিছুই যেন অবিশ্বাসনীয়, অযৌক্তিক, আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয়।

সভ্যতার ইতিহাস এলো অনেক পরে। মানুষ যখন ক্রমবিকাশের পথ ধরে মানুষ হলো নীলাকাশের দিকে মুখ তুলেই দেখেছে আদিত্যকে। সকাল সন্ধ্যায় পূব ও পশ্চিম গগনে মানুষ দেখেছে রঙের মেলা। আদিকাল হতে প্রায় প্রত্যেক দেশেই করেছে সূর্যের পূজা—বোঝেনি হয়তো সেদিন সূর্যের কল্যাণকারী স্পর্শের মাহাত্ম্য—বিজ্ঞেয় করেনি বৈজ্ঞানিকের পরখ-গৃহে সূর্যের রশ্মিছটাকে—ভাবেওনি দিবাকরকে শক্তির সীমাহীন আকররূপে। মানুষ শুধু পূজার অর্ঘ দিয়েছে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে।

ভারতের আর্ষসভ্যতার ও কৃষ্টির ইতিহাসে আমরা সূর্যকে পাই নানারূপে। উপনিষদে মধুবিষ্ণুর মধ্যে আদিত্যকেই বলা হয়েছে মধু—‘অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু (২-১-১)। অর্থাৎ এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীর অন্তর্নিহিত সার বা নির্ধাস হোল এই আদিত্য—মধুরূপে। মধুবিষ্ণু সূর্যোপাসনারই নামান্তর। এই বিষ্ণুর মধ্যে সূর্যকে স্বল্প আত্মার প্রতীকরূপে চিন্তা ও বস্তুর কার্য ও কারণ বিচারের দ্বারা আদি কারণকে অনুসন্ধান করে ধ্যানযুক্ত হওয়ার এক, বিধি। মধুবিষ্ণুর মধ্যে সূর্যের সর্বভূতে প্রভাব একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং এই প্রভাবকেই স্বল্প আত্মার প্রতীকরূপে চিন্তা করলে নাকি মধুজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত হতে পারে (ছাঃ উঃ ৩-১১-৪ শংকর ভাষ্য)। সূত্রাং সূর্যকে যতরকমভাবে সম্ভব, ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আদিত্যই বিশ্বদেব (ছাঃ উঃ ২-২৪-১১) অর্থাৎ এই বিশ্বে যত গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং এই আদিত্যের জগৎই গ্রহলোক উদ্ভাসিত (তৈঃ উঃ ১-৫-১৪), আদিত্যই প্রাণ, (প্রঃ উঃ ১-১-৫) কেন না আদিত্যের রশ্মির প্রভাব এবং তার উদ্ভাপ ব্যতীত কোন প্রাণীর প্রাণধারণ সম্ভব হয় না—আদিত্যের জগৎই প্রাণের কার্য চলতে থাকে। শ্রুতিতে আছে প্রজাপতির নাকি একবার প্রাণ সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। তিনি তপস্বী করলেন এবং এই তপস্বীর দ্বারা তিনি সৃষ্টি করলেন রয়িঃ আর প্রাণ অর্থাৎ জড় ও শক্তি। আদিত্যকে করলেন সমগ্র প্রাণশক্তির আধার (‘পরায়নম্’) (প্রঃ উঃ ১-৮)। আমাদের এই গ্রহে প্রাণের পরশ লাগে বনবীথিকায়,

মানুষের মনে ও প্রাণে—যৌবনভারে দীপ্ত লাগ্নময়ী ধরণীর বুকে। আদিত্যই ঋতুরাজ—আদিত্যর জন্মই বারমাসে ছয় ঋতুর ছন্দ চলতে থাকে—উপনিষদে অবশ্য পাঁচ ঋতুর কথাই বলা হয়েছে (ছাঃ ও বৃঃ উঃ ৩-৯-৫) আদিত্যই সৃষ্টি কর্তা এবং সৌরপরিবারের পিতা ও মাতা। গ্রহ, উপগ্রহ এবং আমাদের এই ধরিত্রীর বুকে সবকিছু প্রসবিত হয়েছে সূর্যের রূপায় তাই সূর্যকে বলা হয়েছে সবিতা (সবিতা—‘প্রসমিতৃয়াং’)।

সূর্যের সাদা আলোয় মিলিয়ে আছে সাত-রঙা আলো এই সপ্তককে উপনিষদে সাতটি হয় অর্থাৎ অশ্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে (“সপ্ত হয় রূপেণ”) এবং সূর্যের গতির সাথে রথচক্রের। আদিত্যের বর্গসপ্তকের মানুষের দেহের ওপর প্রভাব বর্ণিত হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদের নাড়ী খণ্ডের মধ্যে। হয়তো এভাবে বর্ণিত নানা রঙের রশ্মির জৈব ভৌতিক (বায়ো—ফিজিক্স) বিজ্ঞানের সাথে কোনই সম্বন্ধ নেই কিন্তু মানুষের শরীরে সূর্য-রশ্মির প্রভাব যে আছে সে কথা স্বীকার করা হয়েছে অতি প্রাচীনকালেও। আজকের দিনে “বায়ো-ফিজিক্সের” সিদ্ধান্তগুলি দিয়ে তখনকার দিনের কথাগুলিকে বিচার করা চলবে না। আমরা শুধু দেখবো নরদেহে সূর্যের প্রভাব সম্বন্ধে তখনকার সুধীজনরা কি বলতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির চলার ছন্দে যে তাল, মান, লয় আজ বৈজ্ঞানিকের পরথ ধরে ধরা পড়ছে, সেটার অস্তিত্ব যে আগে ছিলো না সবক্ষেত্রে তা নয়। প্রভেদটা হলো অনুমান করার এবং পরথ করার। বৈজ্ঞানিক কোন কিছু দেখার পর অনুমান করে, তারপর পরথ ক’রে দেখে, দেখার পর সে পৌছায় কতকগুলি সিদ্ধান্তে—আবার অনুমানের পালা শুরু হয়ে যায় সেই সিদ্ধান্তগুলির ওপর ভিত্তি করে—আবার পরথ—আবার অনুমান। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় এই প্রণালী চলেছে। পুরাণ সময়েও আজকের মতই প্রকৃতি নিজের খেলা খেলেছে। আজও খেলছে—মানুষ হয়তো কিছু কিছু অনুমানও করেছে কিন্তু পরথ ক’রে দেখেনি। ভারতের কৃষ্টিতে জড়বাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়নি—সব কিছু আত্মা ও ব্রহ্মের জন্তু—মধুবিহার উদ্দেশ্য ও ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা। জড়বাদের উপেক্ষার চরমোৎকর্ষের ফলে আজ আমরা না জড়বাদী না অধ্যাত্মবাদী। কোন কিছু পরথ করে দেখতে শিখিনি—এই দৃষ্টি দিয়ে নাড়ীখণ্ডে বর্ণিত মানব দেহে সূর্যের প্রভাবকে আমরা বিচার করবো।

নাড়ীখণ্ডে সূর্যের বর্গসপ্তকের মধ্যে পাঁচটি বর্ণকে নিয়ে তার প্রভাবের কথা বলা হয়েছে অবশ্য আজকের দিনে বিজ্ঞান বর্ণিত বর্গসপ্তকের মাঝে কিছু কিছু তার প্রভেদ আছে। বলা হয়েছে দেহের হৃৎপিণ্ড হতে যে যে নাড়ীর (আর্টারী ও নার্ভ) উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে কোনটি পিংগল, কোনটি সাদা, নীল, হলদে ও লাল। আজকের দেহ বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো নাড়ীর রং সম্বন্ধে যথার্থ কি পরথ করে বলতে পারবে। নাড়ীখণ্ডের বাস্তবিক প্রতিপাত্ত বিষয় হৃদয়কে আদিত্য নাড়ীগুলিকে রশ্মির প্রাচীররূপে চিন্তা করা। কারণ হৃদয় ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত স্থান এবং আদিত্যকে চিন্তা করতে হবে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে (শংকর ভাষ্য—‘হৃদয়ন্ত পুণ্ডরীকাকারন্ত ব্রহ্মোপাসান স্থানন্ত’)। এইটাই হলো মোটামুটিভাবে মধুবিহার উদ্দেশ্য।

পিংগল বর্ণের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে পিত্তের প্রভাবের জন্তু নাড়ীর রং পিংগল বর্ণ এবং সূর্যের প্রভাবেই দেহের মধ্যে পিত্ত প্রভাবান্বিত হয় এইভাবে সূর্যের নীল বর্ণের প্রভাবে

দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু, সাদা রঙের প্রভাবে কফ, লাল বর্ণের প্রভাবে রক্ত প্রভাবান্বিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে গাঢ় নীল (ইণ্ডিগো) বর্ণেরও উল্লেখ হয়েছে (যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণম্—১-৬-৫)। এই সাতটা রং যা আমরা চোখে দেখি তার দুই প্রান্তে আরো দুটি রং আছে—বেগনি পারের আলো (আল্ট্রা ভায়োলেট রে) আর লাল উজানি আলো (ইনফ্রা রেড রে)। সূর্যের এই আলো দুটি অগ্ন্যস্ত্র আলোর ছটার মতই আমাদের এই গ্রহের প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে প্রভাবান্বিত করছে। আজ বৈজ্ঞানিকের পরখযন্ত্রে ধরা পড়েছে এই দুটির ক্রিয়া। অদৃশ্যভাবে লালউজানি আলো নিয়ে আসে এই পৃথিবীতে উষ্ণ আর বেগনি পারের আলো আনে সঘন (ইণ্টেনসিভ) আলোক রসায়নের প্রক্রিয়া (ফোটো কেমিক্যাল অ্যাকশন)। বিজ্ঞানের পরখ ঘরে আরো ধরা পড়েছে সূর্যরশ্মির ছন্দের নানা খেলা যার নাম দেওয়া হয়েছে ইংরাজীতে—‘ডিয়ুর্গাল রিডম্’ যার বিশদ ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজন নেই কারণ এই লেখাটির উদ্দেশ্য শুধু ভারতের ঋষিরা মধুবিচার মাধ্যমে ব্রহ্মোপাসনার প্রতীকরূপে সূর্যকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং মানবদেহের সাথে সূর্যরশ্মির কতটুকু সম্বন্ধ কিভাবে বুঝেছিলেন তার একটু আভাষ মাত্র দেওয়া।

আমরা চিরদিন সূর্যকে পূজা করে এসেছি—সূর্যকে মধু বলে এসেছি এবং শত-সহস্র বছর ধরে বলে আসছি—ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু কিন্তু কোনদিন বিশ্লেষণ করে দেখি নি সূর্যের কল্যাণময় রূপটিকে—বিরাট শক্তির উৎসটিকে, তার আলোক দ্ব্যতের সংবাদগুলিকে। সমীরের পূর্ণজ্ঞানের প্রচেষ্টার মধ্যেই তো নিহিত রয়েছে অসীর ইংগিত। মানুষ্যের মনগড়া কালের মধ্যে নেই কি সীমাহীন কালের আভাষ?

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

গৌরীদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি (বিবিধপ্রসঙ্গ/২য়) ॥

‘গৌরীদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি’ প্রবন্ধটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ‘রামবল্লভবাবুর ভিক্ষাদান’ প্রথম প্রকাশিত হয়—‘প্রচার’ ১২২১, পৌষ সংখ্যায়। এখানে বাবাজি এবং রামবল্লভবাবুর কথোপকথনের দ্বারা কৃষ্ণ যে অশরীরী নন, তিনিই জগৎশরীরের আত্মা তা প্রমাণ করা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত রূপ কল্পনা করা হয় তারও রূপকমোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাবু এখানে ইংরেজীশিক্ষিত ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর প্রতীক।’ দ্বিতীয় ভাগ—‘পূজাবাড়ীর ভিক্ষা’—প্রচার, ১২২২, বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূজা উপলক্ষে এক জমিদারবাড়িতে বাবাজিকে ছাগমাংস ভোজন করতে দেখে শিষ্য অবাক হল। কিন্তু বাবাজি বৈষ্ণবধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জানান—নিষ্ঠাপালনই বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র নয়, সমদর্শীতাই এর মূলমন্ত্র। তৃতীয় ভাগ—‘রাধাকৃষ্ণ’, প্রথম প্রকাশিত হয়—‘প্রচার’, ১২২২, আষাঢ় সংখ্যায়। এতে রাধা-কৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য নামের ধাতুগত ব্যাখ্যা দেখান হয়েছে। প্রবন্ধটিতে কথোপকথনের ভংগী অল্পসরণ করা এবং যথেষ্ট সরসতার সঞ্চার করা হয়েছে।

ঘটোৎকচ বধ (কৃষ্ণ চঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড/৪র্থ পরিঃ) ॥

ভীমের ঔরসজাত রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করার জন্য কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তিশালী বাণ ‘একাত্মঘাতিনী’ প্রয়োগ করেন। ঘটোৎকচ মারা গেলেও কৃষ্ণ এতে আনন্দিত হন। কারণ ঐ অস্ত্র একবারই ব্যবহার করা চলে এবং কর্ণ সেটি অর্জুনের জন্য তুলে রেখেছিলেন। ঘটোৎকচের প্রতি সেটি ব্যবহারে সেই অস্ত্রের গুণ নষ্ট হল। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ অত্যাশ্চর্য রাক্ষসদের বধে নিজের কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—এখানে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ কোন হাত না থাকলেও তিনি বোঝাতে চাইছেন স্ববুদ্ধির মতই ছুষ্টের বিনাশের জন্য ছবুদ্ধিও ঈশ্বরের প্রেরিত।

চঞ্চল জগৎ (বিজ্ঞানরহস্য) ॥ প্রঃ প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, ১২৮০, ভাদ্র। গতিশীলতাই জগতের নিয়ম। শুধু পৃথিবী নয়, সমগ্র সৌরজগতই গতিশূন্যে আবদ্ধ। সেই গতিরই পরিচয় দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে।

চন্দ্রলোক (বিজ্ঞানরহস্য) ॥ প্রঃ প্রকাশ—‘ভ্রমর’ ১২৮১, চৈত্র। চন্দ্রকে নিয়ে কবিদের যেমন কল্পনার শেষ নেই, তেমনি বৈজ্ঞানিকদেরও গবেষণার অন্ত নেই। বঙ্কিমসাহিত্যে যেমন ‘চন্দ্রলোকে’র সাহিত্যিকরূপ ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ বিদ্যুত, এখানে তেমনি তার বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি পরিবেশিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—‘অতএব স্বথের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা আমরা একপ্রকার বুদ্ধিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়,—বিদীর্ণ, ভয়, ছিন্ন-ভিন্ন, বন্ধুর, দক্ষ, পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, মেঘশূন্য, বৃষ্টিশূন্য,—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উদ্ভিদ, জলন্ত, নরককুণ্ড তুল্য এই চন্দ্রলোক! এইজন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।’

কবিনট জয়দেব ও নটী পদ্মাবতী

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিরিখে জয়দেবের গীতগোবিন্দ মহাকাব্যের পদবাচ্য বলে স্বীকৃত। কিন্তু আসলে গীতগোবিন্দ একখানি গীতিনাট্য। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লে এর মৌলিক নাট্যরূপটি ধরা পড়েই। গীতগোবিন্দকে কবি নিজেই ‘মঙ্গল’ বলেছেন,—‘মঙ্গলমুজ্জলমগীতি’ প্রাচীন বাংলায় প্রাকৃত সাহিত্যকর্মে বিবাহানুষ্ঠানে মঙ্গল গায়িকাদের উল্লেখ আছে মেয়েরা দলবেঁধে মঙ্গল গান গাইছে। গীতগোবিন্দ যে মঙ্গল গানের নিয়মে দলবেঁধে গাওয়া হত তা কবির নিজের উক্তি থেকেই ধরা যায়। কাব্যে দশাবতার বর্ণনা করবার পরেই মঙ্গলাচরণ গানটির শেষে কবি বলেছেন :

তব চরণে প্রণতাবয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদংমঙ্গলমুজ্জলমগীতি ॥

—তোমার চরণে আমরা প্রণাম করছি, প্রণত আমাদের কুশল কর।

শ্রীজয়দেব কবির এই উজ্জলগীতিময় মঙ্গল তোমার (এবং শ্রোতাদের)

যেন আনন্দদায়ক হয়।

কবি জয়দেব এখানে শুধু লেখক নন গায়কও তাই এ প্রার্থনা। গানের ভণিতায় ‘বয়ম’ বহুবচন শব্দটি লক্ষ্যণীয়। ‘বয়ম’ এখানে বহুবচন মানে কবির গীতি নাট্যের গায়ক দল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গল গানে এবং পরবর্তীকালে কীর্তন ও পদাবলীর আসরে মূল পালা আরম্ভ করার আগে মঙ্গলচরণের প্রথা ছিল। আরম্ভের আগে গায়ন বায়ন সকলে মিলে দেবতার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেন। তবে চরণেপ্রণতাবয়মিতি-ব্যাপারটাও তাই। মনে হয় জয়দেবের দলে কবি নিজেই অধিকারী ছিলেন। হয়ত মূল গায়ন ছিলেন পরাশর এবং কবির অগ্গাষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুরা ছিলেন দোহার ও বায়ন। গীতগোবিন্দ পুথির কোন কোন পাঠে কাব্যে শেষের একটি শ্লোকে কবির আত্মপরিচয় আছে। শ্লোকের শেষ চরণে কবি নিজেই তাঁর গীতিনাট্যের দলের পরিচিতি করেছেন এই ভাবে :

পরশরপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিস্বমণ্ড

—শ্রীগীতগোবিন্দের কাব্য মাধুর্য পরাশর এবং প্রিয়

আত্মীয় বন্ধুর কণ্ঠে সোচ্চার হক ॥

পরশর হয়ত গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যের প্রথম ও একজন প্রধান গায়ক ছিলেন। না হলে কবি তাঁর কাব্যের মঙ্গলাচরণ অংশে পরাশরকে এতটা প্রাধান্য দিতেন না। আবার কবি পত্নী পদ্মাবতীর নামও কোন কোন গানের ভণিতায় ও শ্লোকে পাওয়া যায়। এই উল্লেখ থাকায় মনে হয় কবির গীতি নাট্যের দলে পত্নী পদ্মাবতীর ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কবির গীতিনাট্যের দলে পদ্মাবতী নাচতেন। গীতগোবিন্দ কাব্য পাঠকের অনেকেরই ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে গেছে কিংবা অনেকেই

হয়ত ব্যাপারটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। শ্রীগীতগোবিন্দকে মহাকাব্য বলে তার রসাস্বাদনেই ব্যস্ত ছিলেন বা থাকেন। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ যে একটি পরিপূর্ণ গীতিনাট্য এবং মোটামুটি কবির পরিবার পরিজন নিয়েই এই গীতিনাট্যের দলটি চলত তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর কাব্যের মধ্যেই। একটি পদের ভণিতায় কবি জয়দেব নিজেকে ‘পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী’ বলে পরিচয় দিয়েছেন। চরণ চারণ বলতে গায়ন ও বায়নদের চালক আর চক্রবর্তী বলতে অধিকারী বুঝতে হবে। প্রাচীন সংস্কৃতে ‘বন্ধু’ বলতে স্থালক ও বোঝাতে পারে। পরাশর সম্ভবত কবির স্থালক ছিলেন এমত ও কোন কোন গবেষকদের দ্বারা সমর্থিত।

পদ্মাবতী যে গীতগোবিন্দ নৃত্যগীতিনাট্যে নাচতেন সে ইঙ্গিত অল্প জায়গায় পাওয়া গেছে। ষোড়শশতাব্দির মাঝামাঝি প্রাচীন কামরূপের (কোচবিহারের) একজন রাজসভা কবি রাম সরস্বতী এই গীতগোবিন্দকেই আশ্রয় করে একথানা কাব্য লিখেছিলেন। (‘গীতগোবিন্দ’—কালীরামদেবশর্মা সংগৃহীত ১৯২০ সালে প্রকাশিত।)

এই কাব্যে কবি রাম সরস্বতী প্রত্যেক গানের ব্যাখ্যার আগে বলেছেন যে, জয়দেব গান করছেন ও সেই গানের রাগ তাল-অলসারে পদ্মাবতী নাচছেন :

কৃষ্ণের গীতক জয়দেব নিগদতি

রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী

এখানে পদ্মাবতী যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যের একজন নটী ছিলেন সে বিষয়ে খানিকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অবশ্য পদ্মাবতী যে জয়দেবের বিবাহিতা স্ত্রী তাও কবি স্পষ্টভাবে কোথাও বলেন নি। তাঁর কাব্যের মধ্যে একটি পদ ‘পদ্মাবতীরমণ’ এই থেকেই সম্বন্ধটা অনুমান করা হয়। লক্ষণসেনের রাজসভায় সন্ধ্যাকালে নিয়মিত নাচগানের আসর বসত। সেখানে জয়দেব ও পদ্মাবতীর সঙ্গীত কারক হিসাবে স্তুত্যাতি ছিল। পদ্মাবতী জয়দেবের ভারী নাও হতে পারেন। যেমন জয়দেব পদ্মাবতীর তেমনি চণ্ডীদাস রজককণ্ঠা রামীর (নানা নাম পাওয়া যায়—তারার, রামতারার রামী) এবং বিজাপতি লখিমার সম্পর্কও বিতর্কিত। কবিদের সম্পর্কিত কোন নারীই ইতিহাসের নাগালে ধরা দেয় না। অথচ এঁদের সম্পর্কে গল্প সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই চলে আসছে। অধ্যাত্ম ভাবনায় কিংবা যোগাধ্যানের রূপক হিসেবে ব্রাহ্মণ বটুর সঙ্গে ভোমনীর ইঙ্গিত কিংবা চণ্ডালিনীর ব্রাহ্মণ জারের উল্লেখ কোন কোন চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়—‘দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার’।

নাথপন্থীদের পুরনো ছড়ায়ও রজকিনীর রূপক আছে। চণ্ডীদাসের রামীর ব্যাপারটাও বোধ হয় সেইরকম। এক্ষেত্রে কাব্যভাবনায় রজকিনী কবির প্রকৃতি। জয়দেব প্রকৃতি পদ্মাবতী, বিজাপতি প্রকৃতি লখিমা আর চণ্ডীদাসের প্রকৃতি রজকিনী রামী। রাজমহিবী, রজককণ্ঠা ও পদ্মাবতী কেউই ইতিহাসের নাগালে ধরা দেয় না। লখিমা অবশ্য বিজাপতির পদের ভণিতায় আছে কিন্তু রজকিনী রামী শুধু কিংবদন্তী। তেমনি জয়দেবের গীতিনাট্যে পদ্মাবতীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের উল্লেখ থাকলেও তিনি যে জয়দেবের স্ত্রী একথা কোথাও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি। হয়ত পদ্মাবতী জয়দেবের দলে একজন প্রধানা নটী ছিলেন মাত্র। গুণমুগ্ধ কবির কবিতা প্রশংসাধরা হয়ে সাহিত্য ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। গীতগোবিন্দ মহাকাব্যের ভাবাদর্শ সমন্বিত হয়েও পঠন-গায়নের নিয়মাদর্শেও লক্ষ্যে

শেষ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ গীতিনাট্য হয়ে উঠেছে। এবং সেই গীতিনাট্যের অভিনয় সার্থকতায় কবিও কবি পরিজন যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তা তাঁর কাব্যেই প্রকাশ রয়েছে।

আমার প্রবন্ধের নামকরণে গীতগোবিন্দের কাব্যাসৌন্দর্য সাধারণ পাঠক কিছুটা বিভ্রান্ত হবেন ঠিকই। তবু কবি জয়দেবের কাব্যকর্মের রীতি-প্রকরণ পরিচয়ে ব্যাপারটা অল্পলেখ্য থাকা উচিত নয়। হয়ত কবির কাব্যকৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমসাময়িক নাট্যসঙ্গীতের চিত্তরঞ্জন। গীতগোবিন্দ গীতিনাট্য রচনা করে দলবল জুটিয়ে কবি নিজেই নেমে পড়েছিলেন দর্শকদের সামনে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা দেশের অনেক কবি সাহিত্যিকদেরই তা করতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথকে আমরা হাতের কাছেই পাচ্ছি। কোন কোন স্ত্রে এঁদের কবিনট বললে ভুল হয় না নিশ্চয়ই।

বিদ্যুৎ মৈত্র

সংগীতে সুন্দর ॥ ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২২। ১এ, কলেজ-রো, কলিকাতা-২।

‘সংগীতে সুন্দর’ গ্রন্থখানি এডুয়ার্ড হাসলিকের ‘দি বিউটিফুল ইন মিউজিক’-এর বঙ্গানুবাদ। ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, সংগীততত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীদের বড় একটা চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই তাঁর এই অনুবাদ প্রয়াস। বাস্তবিক ভারতীয় সংগীততত্ত্ব বিচার প্রসঙ্গে মৌলিক গবেষকদের বড় একটা একটা সম্মান মেলে না এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাও বিশেষ উৎসাহ লাভ করে না। সুতরাং ‘সংগীতে সুন্দর’ গ্রন্থ নি ভারতীয় সংগীতের উপর নতুন আলোকপাত করতে যে কিছুটা সক্ষম হবে এ কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংগীত চিন্তার মূলে রয়েছে রাগসংগীতের তত্ত্ব। রাগরূপ ও তাঁর বিস্তার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ঘরাণার মতভেদ। তাঁর প্রকাশকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ ভারতীয় সংগীততত্ত্ব বিচারের ভিত্তি রচিত। কিন্তু রাগ-রাগিনীর সৌন্দর্য ঠিক কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল অথবা রাগ-রাগিনীর পার্থক্যটা ঠিক কোন বক্তব্যের উপর নিহিত রয়েছে সেই সম্পর্কে ধারণাগুলি এখনও বেশ ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত নন্দনতত্ত্ব ও চারুশিল্প আলোচনার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল প্লেটো এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য এরিস্টটলকে কেন্দ্র করে। তাঁদের প্রাচীনতম মতবাদ ‘অনুবাদ’ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক ‘কনফিগারেশনিজম’ অর্থাৎ বিমূর্তরূপনির্মিতবাদ ইত্যাদি অনেক ‘ইজম’র আওতায় চারুশিল্পতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সংগীতচিন্তারও নতুন বক্তব্যের শেষ নেই। হাসলিক তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভেই সাবলীল সংগীতচিন্তার একটা হিসেব নিকেশ করে নিয়েছেন।

সকল দেশেই সাধারণ মতবাদ হিসেবে সংগীতের প্রভাব সম্পর্কে একটা অলৌকিক বা অনৈসর্গিক ধারণা বর্তমান। মোটামুটি এ বিষয়ে প্রাচীন মতামতগুলি সহসা খণ্ডিত না করে তাঁর রস সৃষ্টি বা বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে মেনে নিয়েই সংগীতচিন্তার পরিকল্পনা করা হয়েছে। হাসলিকের মৌলিক চিন্তা এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত। সংগীতের বিভিন্ন পদার ব্যবহার—রাগ, তুংখ, আনন্দ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে সক্ষম কি না এর উত্তর দিতে গিয়ে হাসলিক বলেছেন, সে ক্ষমতা সংগীতের নেই। এই সপ্তাধ্যায়ী গ্রন্থখানিতে যুক্তিতর্কের অবতারণা করে তাঁর বক্তব্যের সার তুলে ধরেছেন।

ভাবাবেগ বা রসসৃষ্টির সক্ষমতার স্বপক্ষে নৃত্যনাট্য বা অপেরা এবং কাব্যসংগীতের কথা

অভাবতই মনে উদয় হয়। হাস্যলিক বলেছেন কাব্যসংগীত প্রধানতঃ আবৃত্তিমূলক অর্থাৎ ‘রিসাইটেটিভ’। সংগীত হ্রস্ব সেই ভাষা বা কাব্যের ভাবকে পরিবেশন করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গের রূপ বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। আর নৃত্যনাট্য বা অপেরা না পারে নাট্যাভিনয়ের সমপর্যায়ে পৌছতে না পারে যন্ত্রসংগীতের একক প্রয়োগের সমকক্ষ হতে। কথা, হ্রস্ব ও দেহভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে আবেগ পরিষ্কৃত করবার প্রচেষ্টার ফলে যথার্থ সংগীতের সত্তা যায় হারিয়ে। আবার হ্রস্বের দাবীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নৃত্যছন্দ বা অভিনয় স্রব্ধমার হানি সৃষ্টি করে।

হাস্যলিকের বিবেচনায় কণ্ঠসংগীত বিচার করে আবেগের উৎস খোঁজা ঠিক হবে না। ভারতীয় সংগীতের একটি প্রধান অংশ হল কণ্ঠসংগীত এবং ‘কালোয়তী গানের’ ভাষার উপর রাগসংগীত বিস্তার যে কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় না এ কথা জোর গলায় প্রচার করা যেতে পারে। হাস্যলিক যন্ত্রসংগীতকেই বলেছেন প্রকৃত সংগীত। এদিকে যন্ত্রসংগীত শ্রমসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন, যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগ একক হলে ‘শুষ্ক’ এবং গীতাভ্যুগ ও নৃত্যগীতাভ্যুগ হলে উত্তরোত্তর রক্তিপ্রদ।

নাট্যাশাস্ত্রকার ভরত বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদ্য ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন রাগরাগিনীর ব্যবহার শ্রমসঙ্গে বিভিন্ন প্রহর বিভিন্ন ঋতু এবং বিভিন্ন নিসর্গ রূপ নির্দেশনার ব্যবস্থাও রয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় সংগীত চিন্তা ও হাস্যলিকের সংগীত তত্ত্ব আপাতদৃষ্টে বিপরীত বলে ভাবা স্বাভাবিক।

ভারতীয় সংগীত চিন্তার আপাতবিরোধী মন্তব্যগুলি বলবার পর হাস্যলিক তাঁর নিজস্ব বক্তব্যে পৌছেছেন। প্রচলিত সংগীত চিন্তার নগ্নরূপ সমালোচনা করে হাস্যলিক সংগীতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন সংগীতের বিষয়বস্তু হল তার রূপ, যদিও অত্যাশ্চর্য চারুশিল্পের মত রূপনিরপেক্ষ বস্তু বা বস্তুরনিরপেক্ষ রূপ সংগীতের পক্ষে খাটে না। সংগীতের সৌন্দর্য তাঁর কাছে কেবল ধ্রুপদবিজ্ঞানের স্রব্ধম। স্বতোমধুর ধ্বনির কৌশলপূর্ণ সমন্বয়, স্বরসঙ্গতি ও স্বর-বিরোধ—তাদের দ্বারা ফিরে যাওয়া ও কাছে ফিরে আসা—তাদের ক্রমবর্ধমান ও ক্রমক্ষীয়মান শক্তি। এর সৌন্দর্য যেন স্বরের সাহায্যে ধ্বনির আলপনা। ‘মেলডী’ সংগীত সৌন্দর্যের উৎস বটে তবে ‘হারমনি’ সহযোগ হলেই তবে তার সৌন্দর্য প্রকাশ হয় আর তখনই জন্ম হয় ‘মিউজিক্যাল আইডিয়া’।

উপরিউক্ত উক্তির সঙ্গে রাগ-সংগীতের প্রয়োগ কৌশল ও বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল রয়েছে, যদিও ‘হারমনি’ মোটামুটি রাগ-সংগীতের পরিপন্থী। আসলে ইউরোপীয় ‘মেলডী’ রাগরূপ পরিগ্রহ করবার আগেই ‘হারমনি’র দ্বারা খণ্ডিত হয়। সেই কারণেই বোধ করি ইউরোপীয় সংগীতে—বিশেষ করে যন্ত্রসংগীতে আবেগের স্থান নেই এবং এইখানেই ভারতীয় রাগ-সংগীতের সঙ্গে ইউরোপীয় সংগীতের মূল পার্থক্য বলে মনে হয়।

হাস্যলিকের মতামত ভারতীয় সংগীতে গ্রাহ্য হোক বা না হোক গ্রন্থখানির মূল্য তার চিন্তাধারা ও যুক্তির সারবত্তা দিয়েই যাচাই করা প্রয়োজন। সংগীতের মাদকতার অল্পভূতিতে অভিভূত না হয়ে হাস্যলিক বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অল্পপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই তিনি জোরগলায় বলেছেন পাখীর কাকলি যেমন সংগীত নয় তেমনি বরনার শব্দ বা বাতাসের শব্দও সংগীত নয়। প্রকৃত সংগীত প্রচেষ্টা উদ্ভূত, এর মধ্যে স্বতন্ত্রত্বের কোন অবকাশ নেই।

পরলোকগত ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানির অনুবাদ করেছিলেন তা সার্থক হবে যদি সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়নরত স্নাতকরা এর সদ্যবহার করেন।

বইখানির অনুবাদ প্রসঙ্গে দু-একটি বক্তব্য আছে। ইংরাজী সাংগীতিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ চয়ন কয়েকটি ক্ষেত্রে যথাযথ হয় নি। যেমন 'মেলডী'কে বলা হয়েছে 'রাগ'। 'কর্ডে' স্বরগুচ্ছকে 'বৃন্তচাপ'—এই জ্যামিতিক প্রতিশব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার কোথাও 'কর্ড'কে বলা হয়েছে তন্ত্রী। আর কিছু নয়। তবে এই ধরনের প্রতিশব্দে সাধারণের পক্ষে ভারতীয় সংগীতে হাস্যলিকের যুক্তি প্রয়োগ করার অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর এবং মূল্যও অল্প—মাত্র পাঁচ টাকা।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আবদুলগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ । ফাল্গুন ১৩৭৭

সমকালীন

অলঙ্কার কথা

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

ঠিক কোন্ সময়ে কোন্দেশে অঙ্গসজ্জা বা অস্ত্র কোন কারণে অলঙ্কারের প্রচলন হল তা স্থির নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের দেশে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২৫০০ থেকে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, মিশরে চীনে এবং গ্রীসে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের অঙ্গভরণ ব্যবহার চলছে !

‘অলঙ্কার’ শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থকে পাশ কাটিয়ে আমরা আলোচনা সীমিত করে নিলাম। আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণা প্রধানত দুটি পথ ধরে এসেছে। প্রথম পুরাতত্ত্বের সাহায্যে, দ্বিতীয় সাহিত্যপাঠে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খনন কাজে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের অঙ্গে যে সব অলঙ্কার আছে সেগুলি অর্থাৎ পরোক্ষ ধারণা, যে সব অলঙ্কার সরাসরি পাওয়া গেছে এবং তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মাল্যদানা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ধারণা, ওদিকে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে দেবদেবীর অলঙ্কার বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার অঙ্গভরণ, মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে প্রাগৈতিহাসিককাল পর্যন্ত দীর্ঘদিনের বহুবিধ মূর্তিতে উৎকীর্ণ অলঙ্কার—সব মিলিয়ে অলঙ্কারের ধারা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এছাড়া লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, প্রায় সবকয়টি মঙ্গলকাব্য, পুঁথি ও পটচিত্রণে আঞ্চলিক অলঙ্কারের অনুসন্ধান চলতে পারে।

শুধুমাত্র ধাতু অলঙ্কার, তার মধ্যে আবার স্বর্ণালঙ্কারই একমাত্র অলঙ্কার পদবাচ্য—এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্কার। অলঙ্কারের দীর্ঘ ইতিহাসে এই পর্বটুকু নগণ্য স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য ধাতুশ্রেষ্ঠ হিসাবে, সর্ব ধাতুসার হিসাবে সোনার যে মর্যাদা তা অলঙ্কারের সঙ্গে এক করে ফেললে আলাদা কথা।

ইতিহাস ধারার এই বিষয়ে প্রথম স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, আদিম মানুষ যখন অঙ্গাবরণের ব্যবহার শেখেনি তখনি কিন্তু অলঙ্কার উঠে গেছে তার অঙ্গে। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আয়ুর্বেদ পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষ বিশেষ মণিরত্নকে রোগারোগ্যে ব্যবহারের জ্ঞান পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনো অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ত আঙ্গুলে পরেন শাঁখের আংটি কিংবা বাহুবন্ধ হিসাবে লোহা বা তামার তার ব্যবহার করেন। প্রাচীন বিশ্বাস কান ছেঁদা করলে চোখ ভালো থাকে, সেই ছিদ্রিত কানে পরবর্তীকালে বিচিত্র অলঙ্কার উঠেছে। আজও গ্রামের দিকে কোন কোন দরিদ্র পরিবারে হয়ত শুধুমাত্র কাঁচি গাঁজা থাকে। কানের কথায় একটি প্রাসঙ্গিক পুরাণের গল্প এসে পড়ছে। এখনকার অলঙ্কারজগতে বারাণসীঘরানার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না। সেই বারাণসীর স্নানের ঘাটে নাকি দেবী দুর্গার কানের অলঙ্কার হারিয়ে যায়। হারানো অলঙ্কারের নামানুসারে সেই ঘাটের নাম হয় মণিকর্ণিকা। জড়োয়া ছাড়া আরও একটি পথ ধরে রত্নপ্রস্তর অঙ্গভরণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা এবং কল্যাণকে স্বাগত জানাতে রত্নপ্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিশ্বাসে আমাদের দেশেও বিভিন্ন যুগে একাধিক রত্ন এবং শেষ পর্যন্ত নবরত্ন ব্যবহার ঘটেছে। মানুষের কল্যাণের জ্ঞান সূর্য, শুক্র, কেতু, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র, রাহু বৃহস্পতি ও শনিকে অনুকূল করার জ্ঞান একে ব্যক্তির কোষ্ঠী-ঠিকুজী বিচার করে নয়টি রত্ন কে কোথায় বসবে তার নির্দেশ দিয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র। এর মধ্যে আবার কোন কোন রত্ন নিয়ে নানান জল্পনা দেখা গেছে, কি জানি নীলা ধারণে রাজা হব, না যমরাজের দরবারে সরাসরি হাজির হব! শাস্ত্র বলে, শনিকে কাঁচাতে নীলা হল অমোঘ মহারত্ন। এসব ছাড়া মিশ্রিত ধাতু-অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। অনেক দেবদেবীও তৈরী হয়েছে মিশ্রিত ধাতুর, তার কোনটি পঞ্চধাতু কোনটি বা অষ্টধাতু ইত্যাদি।

তক্ষশীলা ও ব্রহ্মগিরির প্রাপ্ত নমুনা ধরে আমরা আজও অনেক আদিবাসী সমাজে ঠিক সেই সেই প্রাচীন চণ্ডের অলঙ্কারের ব্যবহার দেখতে পাই। পৃথিবীর সবদেশেই তুচ্ছতাক বা যাহুর সঙ্গে মাদুলি আদিযুগের সংস্কৃতি নমুনা। এইসব ইন্দ্রজাল ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ রংও বেছে নেওয়ার প্রথা আছে। অথর্ববেদে নীলের সঙ্গে লালের মিশ্রণকে তাংপর্যপূর্ণ বলা হয়েছে। ওদিকে, হিন্দু ধর্মযাজক লাল আর নীলের মেশানো পোষাক না পরে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন না।

রামায়ণে সীতার অঙ্গে রহবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বর্গকার যদি সোনায় ভেজাল দেয় অথবা তার কারিগরীতে যদি কোন দোষ ধরা পড়ে তাহলে সেই কারিগরের সামাজিক শাস্তি কি হবে মন্ত তা পর্যন্ত বলে গেছেন। পানিনি অলঙ্কারের তালিকা দিয়েছেন, মণিকারের শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় এসেছেন কোটিল্য। মুচ্ছকটিক নাটকে একটি কর্মচঞ্চল গহনার দোকানের ঐ যুগের অতি বিশ্বাসযোগ্য এক ছবি তুলে ধরা হয়েছে। শকুন্তলার আংটির, কালিদাস এবং অন্যান্য কবিদের বর্ণিত পুষ্পালঙ্কারের আকর্ষণ আজও বিন্দুমাত্র কমেনি।

প্রকৃতির দান সত্যিকারের ফুল থেকে স্তব্ধ করে মূল্যবান ধাতু, মণিরত্ন, দ্রব্যমূল্যবান সবকিছুই অঙ্গভরণের জ্ঞান আবহমানকাল ব্যবহার হচ্ছে। প্রাণী দেহের অবশিষ্ট সরাসরি গাত্রচিত্রণ বা রঙ্গোলির মধ্য দিয়েও বহুক্ষেত্রে বিবিধবর্ণের অলঙ্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ইঙ্গিত আরেক গতিপথ খুঁজে পেয়েছে উষ্ণির মধ্যে। এমন কি চৌকশ পটের বহিঃরেখা যে যে মাধ্যমে এখনো

অস্তিত্ব রক্ষা করছে সাম্প্রতিককালের উষ্ণি তার অন্ততম।

আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্যে আদিম সমাজের অনুকরণে কণ্ঠভরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই অভরণ হৃদয়ের কাছাকাছি রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। কারণ, হৃদয় ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। হৃদয় রয়েছে গ্রীবদেশের নিচে, নাভিদেশ থেকে বারো আঙ্গুল ওপরে। পদ্মের মুকুলের মত ঐ হৃদয় নাড়ীগুলো দিয়ে জড়ানো। এখানে ছোট্ট ছেঁদা আছে, সেই ছেঁদার মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

দেবতাদের স্তবগানে তাঁদের রূপবর্ণনাকালে অগণিত অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় (বর্হাপীড়) ময়ূরের পালক দিয়ে শিরশোভনের কথা, (বল্লবীনয়নাস্তোজ মালিনে) পদ্মের মালার কথা বলা হয়েছে, শ্রীরামরহস্যে ‘শঙ্খভূষণ’ উল্লেখিত হয়েছে। চিরকালের ছাইমাথা শিবকে পর্যন্ত রত্ন-আকল্প-উজ্জল-অঙ্গ, মন্দার-পুষ্প পূজিতায়, রঞ্জিত সৎ মুকুটং, মঞ্জীর-পাদ-যুগলায়, ইত্যাদি স্তব করা হয়েছে। দেবীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই যেখানে যত ভালো অলঙ্কার আছে, স্বর্ণময় বস্ত্র থেকে মুক্তামালা সবকিছু পরিয়ে তবে শান্ত হয়েছেন স্তব রচয়িতারা বলা বাহুল্য, এই বর্ণিত বিবিধ অলঙ্কার স্তোত্রকারের মনগড়া ব্যাপার কিছু নয়।

আমরা সাহিত্যে দেবদেবীর অঙ্গে যে অলঙ্কারের বর্ণনা পেয়েছি শিল্পশাস্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সেই কারণে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য ছাড়া বিগ্রহের অঙ্গে ধাতু ও অন্যান্য মূল্যবান অলঙ্কার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত অলঙ্কার নির্মাণকাল ও স্থানের বিশেষ শৈলী দেখা যায়। যেহেতু নির্দেশানুসারে সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অলঙ্কার কোন বিশেষ দেবদেবীর অঙ্গে থাকে না তাই মাল্লবের ব্যবহারের অলঙ্কারেই তার পরিচয় বিধৃত। এ কথা শুধু হিন্দু দেবদেবীর ক্ষেত্রে নয় বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর ‘অভিধান চিন্তামণি’তে যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর কথা বলেছেন তাঁদের অঙ্গভরণ এবং খেতাবরী ২৪ শাসনদেবীর অঙ্গভরণ থেকে শুরু করে বৌদ্ধ অমিত্যভকুল, অশোকভকুল, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধিকুলের ষাবতীয় দেবদেবীর অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জৈন ধনপালের তিলকমঞ্জরী এবং নারদশিল্পের ভৌমিক, ভিত্তি ও প্রস্তরচিত্র প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার সহায়ক।

যে বাংলাদেশের ভূমির প্রাচীনতা সম্পর্কে সেদিন অবধি পণ্ডিতদের স্বিধার অন্ত ছিল না, আজ অল্পসন্ধানের ফলে সেখানেও যেসব প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রাচীন পূর্ব-ভারতীয় অলঙ্কার সম্পর্কিত মোটামুটি একটা চিত্র পরিস্ফুট হয়। চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর (২৪ পৃঃ) মঙ্গলকোট সন্নিহিত অঞ্চল (বর্ধমান) থেকে গুপ্তযুগের কয়েকটি টেরাকোটা যক্ষিণী আমি সংগ্রহ করেছিলাম। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিতে রত্নজালি, হেমমন্ত্র প্রভৃতি স্পষ্ট, কিরীট কুণ্ডলের বিচিত্র সমাহার এদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এ ছাড়া নানান আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিবিধ মাল্যদানা পেয়েছি। মাল্যদানার ছেঁদা সরাসরি নয় এদের প্রচলিত নাম স্টোন বীড্‌স্। আমার পাওয়া মাল্যদানার মধ্যে অ্যাগেট, ক্যালসিজনীয়, গারনেট, জেম্মার ও কোয়ার্টজ রয়েছে। হরিনারায়ণপুরে পেয়েছিলাম অগণিত পোড়ামাটি মাল্যদানা, বড়গুলিকে মাছের জালে ব্যবহৃত গুটি বলে অনুমান হয়। বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদে যে কোন বর্ধায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে অসংখ্য প্রাচীন

মালাদানা ও মধ্যযুগীয় অলঙ্কার পাওয়া সম্ভব বলে মনে করি। সরকারী উত্তম ও অগ্রান্ত প্রচেষ্টায় বাঙলাদেশে পাওয়া যে অলঙ্কার ও মালাদানা আছে তার কথা চিন্তা করলে বিশ্বয়ের মাত্রা আরো বহুগুণ বেড়ে যায়। উড়িষ্যার কথা সবিস্তারে বলেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। ওদিকে পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাজগৃহ, বোধগয়া, বিক্রমশীলা ও নালন্দাতো বিশ্বয়ের শেষ সীমায় নিয়ে যায়।

ভারতীয় নারীমূর্তির প্রাচীনতম নমুনা বোম্ব ও কুল্লীর দক্ষমুক্তিকা থেকে শুরু করে প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি আকর অলঙ্কারের (যুগে যুগে তার অভিধান্তর ঘটলেও) কথা জানতে পারি। (১) রত্নজালি অর্থাৎ রত্নখচিত কেশ আবরক (২) কিরীটকুণ্ডল অর্থাৎ শিরোভূষণ। (৩) হেমমুত্র অর্থাৎ নায়িকার কণ্ঠাভরণ (৪) জনপদবধূর করশোভা বলয় ও আঙ্গুলীয়ক (৫) হেমমেথলা ও কিস্কিনী হল সজ্জিতা ললনার কটিবন্ধ (৬) নাগরিকার পদাভরণ নুপুর।

শিল্পশাস্ত্রে দেবদেবীর আপাদমস্তকের যে বিভাজন আছে তদনুসারে বিবিধ অলঙ্কার যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত অলঙ্কারকে রীতিমতভাবে এইরকম ভাগ করা হয়েছে।

মস্তক থেকে কণ্ঠ : শিরোরত্ন, ললাটিকা, তাড়ক, মূক্তামালা, গ্ৰৈবেয় ও উর্মিকা।

কণ্ঠ থেকে কটি বা নাভিদেশ : প্রালম্বিকা, রত্নমুত্র, উত্তংস, ঝঙ্কমালিকা।

পার্শ্ব ও হস্তালঙ্কার : পার্শ্বোদ্যত, নখোদ্যত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, অঙ্গদ, মণিবন্ধবলয়, শিখাভূষণ ও অঙ্গিকা।

কটিদেশের অলঙ্কার : প্রাগণ্ডবক, ভ্রাস, নাভিপূর, নাভিমালিকা। এছাড়া মাণবক, ললন্তিকা, কটিলয় ও উর্ধ্বতারার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে শৃঙ্খল ব্যবহৃত হত।

সপ্তকী কটিদেশের অলঙ্কার : কাঞ্চী, অষ্টযষ্টিকা, রসনা ও কলাপ।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে মূল্যবান ধাতু বা প্রভালঙ্কার লোকায়ত শিল্প হয়ত তেমন কিছু হুই হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের ব্যবহার উপযোগী অলঙ্কার যে তৈরী হয়নি তা নয়। আমাদের অলঙ্কারধারায় লোকশিল্পীর অবদান স্বল্পমূল্যের অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিনিয়ত অল্পভূত হয়েছে। কাঠের তক্ষণে বিচিত্র সব লৌকিক কণ্ঠাভরণ তৈরী হয়েছে। অভিজাতধর্মেও কদ্রাক্ষ, তুলসী বা ঘুর্ণির দানা এসে গেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যুগে যুগে আমাদের দেশে লোকায়ত সমাজের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একটা স্থানিয়গ্নিত ধর্মীয় অলঙ্কার প্রচলিত ছিল। এই অলঙ্কার থেকে পরবর্তীকালে অনেকগুলি সংস্কারের জন্ম হয়। কিছু কিছু সংস্কারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়ত আমরা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয় না। অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কয়েকটি প্রাচীন বিধিনিষেধ নজরে আসে। বিয়ের আংটি সংক্রান্ত অজস্র বিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালু আছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত অনন্তবিছা বাঙলার নোয়া, মাদ্রাজের থালি, কুর্গের পুঁতিমালা কোন কুমারী বা বিধবার অঙ্গে ওঠা নিষেধ। এই সূত্রে কোন কোন অলঙ্কারের অতীতকথা ও জন্মবৃত্তান্ত এসে পড়ে। লোঁহবলয়কে মেয়েদের বন্দীদশার চিহ্ন বলা ঠিক কি না, ষাটতীয় পদাভরণকে বেড়ি বলা শোভন কি না, বাহুবলয় রোম ও গ্রীসের যোদ্ধাদের ব্যবহার সামগ্রী কি না, আংটির প্রাচীন ব্যবহার নাম মুদ্রা বা পঞ্জাতে সীমাবদ্ধ কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তত্ত্বের পাহাড় তৈরী

হতে পারে। আমরা বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান সমাজেও এর অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। বাদশাহের অনুপস্থিতিতে বেগমের নথ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাড়া সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে অলঙ্কার সম্পর্কিত কয়েকটি সংস্কারও বিধিনিষেধের পর্যায়ে পড়ে।

ভারতবর্ষের সমাজ-আর্থনৈতিক যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসের প্রত্যেকটি মোড় ঘোরার সঙ্গে ছোটবড় রাষ্ট্রযন্ত্র ও ব্যক্তিক অভিক্রটি নতুন নতুন পথ খুঁজেছে। প্রাগৈতিহাসিক, মৌর্য, শুঙ্গ, ও কুষাণের পর গুপ্ত যুগে মোহনমালার ব্যবহারে যেন বলমল করে উঠেছিল। পাল-সেন যুগের কারুকলাও বিশেষ করে তক্ষশিল্লি সারা বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছে। পাঠান যুগের কারুকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় বিদেশীদের লেখা বিবরণে। ইবন বতুতার কথায়, ‘ভোজসভা শেষ হলে রাজপ্রতিনিধিদের সোনার বাটি সোনার কটবন্ধ, সোনার কুঁজো আর সোনার পেয়ালা উপহার দেওয়া হত। সহকারীরা ঐ সমস্ত জিনিসই পেলেন তবে সেসব রূপোর তৈরী।’.....‘তারা পায়ে দেয় সোনালী জরীর কাজ করা চটি।...কানেতে তারা দামী পাথর বসানো সোনার তুল পরে। তাদের গলায় দোলে হার।...হাতের কজ্জী এবং পায়ের গোড়ালিতে তারা সোনার বালা ও মল পরে, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে আংটি পরে।’ গোড়েশ্বর বৃহস্পতি মিশ্রকে ‘রায়মুকুট’ উপাধি দেবার সময় ‘তাকে উজ্জ্বল মণিময় স্বন্দর হার, ছাতিমান ছুটি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙ্গুলের রতনচূড় দিয়েছিলেন।’ বৃন্দাবন দাসের দৃষ্টিতে, ‘কেবল নারীরা নয়, পুরুষেরাও নানারকম অলঙ্কার পরতেন, যেমন—অঙ্গদবলয়, আংটি, নুপুর, কুণ্ডল; এইসব গয়না সোনার তৈরী হত, তার সঙ্গে সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক প্রভৃতি রত্নও গয়নায় ব্যবহৃত হত।’ স্বথময় মুখোপাধ্যায়ের (বাংলার ইতিহাসের ছুশো বছর, পরিশিষ্ট)।

বস্তুত আজ অধিকাংশ মুজিয়ামের অলঙ্কার-সম্বল হল মুঘল অঙ্গভরণ। এখানে আমাদের প্রাচীনধারা পারসিকধারার সঙ্গে মিলে যে প্রবাহ সৃষ্টি করল পরবর্তীকালেও তাকে এতটুকু নান করা যায়নি। পাঠানের পর থেকেই সমরখন্দ ও হীরাটকে আমরা খুব কাছে পেতে থাকি। সৈয়দ আলি বা সামাদ শুধু যে আমাদের চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছিল তা নয় আসলে আমাদের নান্দনিক দৃষ্টির একটা বিরাট পরিবর্তনের সময় তখন এসে গেছে। মুঘল বাদশাহদের অর্থকৌলীত্বের সঙ্গে পারসিক রুচির বিবাহবন্ধনে আমাদের চোখের বিপ্লব পুরোপুরি ঘটে গেল। ক্ষুদ্রচিত্রের কারিগরীতে, দিল্লী আগ্রার প্রাসাদ হর্মে সিদ্দী সৈয়দের জালি কাজে যে দক্ষতা, যে চমক, তারই আরেক দিক মুঘল যুগের অলঙ্কার। এ অলঙ্কারে ধাতু উজ্জ্বল কম ছিল, গঠনশৈলী প্রায় ঐতিহ্যবাহী কিন্তু জড়োয়ার এমন নয়নাভিরাম সমাহার এর আগে পরে কখনো দেখা যায়নি। সর্বোপরি যোগ হল পারসিক মীণাকারি। মুঘলযুগের এই মীণাকারি আমাদের আবহমানকালের অলঙ্কারধারাকে নতুন নতুন পথে চালিত করল। গোড়ের লোটন মসজিদের মীণাকারি শুধু যে আমাদের অঙ্গভরণকে চঞ্চল করল তা নয়, এর চেউ সাগরপারে গিয়েও পড়ল। প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে সাদা মীণার কাজ ইংলণ্ডে চালু হয়েছিল (জয়পুরেও তা চলছিল) কিন্তু পারসিক রংদার মীণাকারি রাণী এ্যানকে অস্থির করে তোলে। দেখতে দেখতে রামধনু মীণা সমগ্র ইংলণ্ডে ধনী সমাজের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। চিত্রকলায় জয়পুর যেমন গুজরাট প্রভাব মুক্ত হয়ে অত্যধিক মুঘলগন্ধী হয়েছিল তেমনি অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কুন্দন

মীণাকারির অঙ্গ থেকে মুঘলগন্ধ আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ প্রভাব লোকায়ত সমাজের ক্ষেত্রে প্রায় অল্পপস্থিত।

মুঘল আমলের মূল ধাতু অলঙ্কার কিন্তু এ দেশের প্রাচীন শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এই কারণে বিচ্ছিন্ন নয়, যে মটিভগুলো প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মন্দিরগাত্রে, দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রীতে ও অজ্ঞাত হাজারো বস্তুতে প্রতিকলিত তার প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। তবু ধর্মীয় অলঙ্কারসমূহসারে যখন শিল্পীকে ফুল-লতা-পাতার কেয়ারির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে তখন কিছু কিছু নতুন মটিভ সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই মটিভের চেউ মসজিদে পড়েছে, হিন্দু মন্দিরে দেখা গেছে, দেখা গেছে প্রতিদিনের ব্যবহার সামগ্রীতে।

মুঘল অলঙ্কারে তাজ আর ঝাপটা প্রথম বালকেই আমাদের চমকিত করেছিল। এই চমক থিতুয়ে দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনের অভিধান্তর ঘটেছে, পরিবর্তন সামান্য কিছু এসেছে ওজনে ও ধাতু ব্যবহারে। মাথায় নতুন করে এল চনক, শিসফুল ও ছোট্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলি। ছোট্টদের মাথায় বোড়া এবং অজ্ঞাতদের হ্রস্ব শোভা পেতে লাগল। কপালে দোঁনি বা দমনি, কুটবি, টীকা, চাঁদ, তাওইট, রুমর, গুছই, বিন্দলি ও বারওয়াটার প্রচলন হল। কানে উঠল গোসওয়াড়া, বাহাহুরি, বাঁম্কা, খুরিদার, মহলিয়ান, পত, তানছুর এবং মোর। নাকের অলঙ্কার নখ, বুলক, লটকান এবং লঙ একেবারে নতুন বস্তু হিসাবে দেখা দিল। দাঁতের ক্ষেত্রেও রেখন অভিনব আনল। হার জাতীয় শ্রেণীতে এল চন্দন, চম্পাকলি, জুগরু, মোহরন, হাউতদিল, হাঁসলি, গলাবন্ধ, ইতরাদন, কান্দি, শিলওয়াটা, লরি (পাঁচ, সাত)—অবশ্য এ সবই প্রাচীনের নতুন অভিধা মাত্র। হাতের গহনায় বাজুবন্ধ, জোঁশন, তাওয়িজ, অনন্ত, ভাওট্টা, এলাচি, কঙ্গন, গোথরা, কারা, চুড়, গজরা প্রভৃতির আকৃতি ধারাহুসারী, তক্ষণকর্মেও পুরনো মটিভ পর্যন্ত রয়ে গেল। আংটির ক্ষেত্রে সামান্য অভিনব দেখা গেল ছল্লা ও আরশিতে। কটিদেশে এল পাহজেব, চঞ্জা, ঘুরু ও জাজিরি। ঔরঙ্গজীবের দরবারের চিকিৎসক ভিনিসবাসী মাছুচি মুঘল অন্তঃপুরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বিবিধ অলঙ্কারের কথাও জানা যায়। শাহজাদীরা চাদরের মত করে গাঁথা মুক্তোর জাল দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। পুরুষেরাও অঙ্গভরণ ব্যবহার থেকে নিরত ছিলেন না। মোহনমালা জড়োয়া বৈচিত্রে এ সময়ে এক নতুন রূপ নিয়েছিল। মাহুঘের অঙ্গ থেকে জড়োয়া এবার এল পরিধেয়ে, জুতোয়, লাঠিতে, ছড়িতে, অস্ত্রের খাপে ও হাতলে, হাতি-ঘোড়ার অঙ্গে ও বেণ্টে, পতাকাতে, পানপাত্রে, আলবোলায়, ফুলদানি ও পিকদানি প্রভৃতিতে। বলা বাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে প্রাচুর্য থেকে এই অলঙ্কার এসেছে, শুধু শিল্পশৃষ্টির তাগিদে নয়।

মুঘল শাসনের অবসানের দিনেও মুঘলপ্রভাব অলঙ্কার ক্ষেত্র থেকে মুছে যায়নি। দেশীয় রাজারা ঐ ধারা অনুসরণ করেছেন, এঁদের পৃষ্ঠপোষণায় জয়পুর ও বারাণসীতে কুন্দল ও গুলাবী শিল্পদক্ষতার চরমে উঠেছে। সামন্তরাজ ও জমিদারশ্রেণী কিছু শিল্পীকে আশ্রয়দান করে আঞ্চলিক এক একটা বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলেন। এইসূত্রে শিল্পীর যে স্থানান্তর ঘটল তাতেও কিছু কিছু মিশ্রিত শৈলীর দেখা পাওয়া যায়। কেউ কেউ অহুমান করেন এই রকম কোন সময়ে গুজরাট থেকে আসা গুজরির কারিগর ঢোকড়রা বৃত্তিচ্যুত হয়ে ঢোকড়ায় পরিণত হয়।

পরবর্তীকালে ইংরেজের প্রভাবে ভারতীয় অলঙ্কারের অনেকগুলি সনাতন ধারণা পরিবর্তিত হয়। নতুন গড়ে ওঠা সহরের রুচিতে ভারি ওজনের অলঙ্কার সম্পর্কে একটা অনাগ্রহ দেখা দেয়। নতুন নাম যেগুলো শোনা গেল তা ঐ আঞ্চলিক মিশ্রণের ফলে জন্ম নিল। মুঘল চিত্রের আঞ্চলিক কলমের মত নতুন ঘরানোর অলঙ্কার এল।

শহর কলকাতাকেও একেকটা অঞ্চল জুড়ে বেনিয়ান ও নব্যাবাদ্যের পৃষ্ঠপোষণায় অলঙ্কারশিল্পী গলিখুঁজিতে গাই পেয়ে গেল। এইভাবে জন্ম নিল হাওড়া মেল, গরাণহাটি মেল, বৌবাজার মেল, বাইরের দিকে ঢাকাই মেল, বিষ্ণুপুরী মেল প্রভৃতি অনেকগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অলঙ্কারশিল্পীর ঘরানা। এদেরই পাশে পাশে সহযোগী শিল্পগুলো গড়ে উঠল। ইংরেজ অভিজাতশ্রেণীর মনোরঞ্জে যে বড় বড় বিপনি দেখা দিল তাতে স্থানীয় নামকরা কারিগররা চাকুরী পেয়ে ঐ রুচির কাজকর্ম করলেন। এইভাবে আবার নতুন মিশ্রণ দেখা দিল।

ইতিমধ্যে গ্রামবাঙলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে। গ্রাম ও শহরের পার্থক্য বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে যে গ্রামের শিল্পী শুধুমাত্র উদরার জন্ত এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। এদের হাতের কাজ, ইংরেজ এনগ্রেভারের কাজ বৃত্তিচ্যুত পটুয়ার রেখাঙ্কন—সব মিলে খাস ইংরেজ, নতুন বাবুসমাজ, বারবণিতা ও কিছু পরিমাণে মধ্যবিত্তদের রুচি তৈরীর পর্ব চলল। এনগ্রেভার রামচাঁদ শেষপর্বন্ত ব্লকের কাজে গেলেন, হয়ত কিছু কিছু পটুয়া ঐ পথ নিয়েছিলেন। কারণ অলংকারে প্রাথমিক রেখাঙ্কন ও রংয়ের নির্দেশ পর্বটি অতি সামান্য অংশ নিয়ে থাকে। মূল কারিগরী ঐ রেখাঙ্কনের ধাতব অহুসরণ, সে ঢালাই হক বা কাটাই-ঠোকাই হক।

এই স্তরেই টায়রা, নেকলেস, ব্রেসলেট, আর্মলেট, পেগেট, ক্রচ প্রভৃতিতে দেখা দিল ফানি পার্কস, ডানিয়েল প্রভৃতি বিদেশী শিল্পীর পরীর চং, নকশীর চুড়ায় পটের সেই চিরাচরিত ফুল-লতা-পাতার কঙ্কা, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের তলাকার সেই সারিবদ্ধ হাঁস এল হাঁহুলি হারে, বাঁকে দেখা গেল গোড়-পাণ্ডুর মসজিদের অনেকগুলি মটীভ, বাঁশবেড়ের অনন্তবাহুদেব মন্দিরের যুগলমূর্তি অবিকৃতভাবে হাজির হল ঠোকাই হারে। ওদিকে মানভাসায় এল আদিবাসীদের জ্যামিতিক চিত্রণ, তেরী বুমকোয় হুগলী মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণ। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে একই রকমের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু বাঙলার অগ্ন্যাত্ত অংশের সঙ্গে কলকাতার কারুশিল্পীর নিয়ত যোগ বড় একটা ঘটতে পারেনি। তা পারলে হয়ত কারিগরীর জেলাগত বৈশিষ্ট্য আজ আর নজরে আসত না। এর পরের পর্বে অর্থাৎ অতি সাম্প্রতিককালে ধাতুমূল্য বৃদ্ধি ও অগ্ন্যাত্ত সরকারী বিধিনিষেধে মণিপুত্রী প্রভৃতি কাজের কদর বেড়েছে। ছেলার ও ঠোকাইকাজের অনেক উঁচুদের শিল্পী বৃত্তিচ্যুতি হয়েছেন এবং বনেদী বিপণির অবলুপ্তি ঘটায় সমগ্রভাবে এই শিল্প অশান্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তবু বলা যায়, অলংকারশিল্প কারুকার্যে একেবারে নিশ্চল বসে নেই এবং শিল্পটীর বর্তমান গতিপ্রকৃতি নিঃসন্দেহে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

একটি হারানো প্রথা : একটি হারানো গান

অজিতকুমার মিত্র

ধর্মনিবন্ধন সমাজ ব্যবস্থার পারস্পরিক সহনশীলতার জন্ম বিশেষ করে বাংলাদেশ শাক্ত প্রভাবিত অঞ্চল বৈষ্ণব প্রভাবিত অঞ্চল শৈব প্রভাবিত অঞ্চল প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাস্থ হয়। যদিও শাক্ত অঞ্চলে বৈষ্ণব আবার বৈষ্ণব অঞ্চলে শৈব প্রভৃতির ধর্মচর্যা অব্যাহত থাকে। যেমন শিব মন্দিরের পাশে কৃষ্ণ মন্দির আবার কালী মন্দিরের গায়ে গৌরান্দ্র মন্দিরের সহাবস্থান বাংলাদেশের বিচিত্র রীতি। তাই কোথাও বৈষ্ণব সাধনার জন্ম নাম কীর্তন, শাক্ত সাহিত্য আলোচনা কিংবা শিবায়ন পাঠ প্রভৃতির ব্যাপকতা ছিল। বলিদান প্রথা, রক্ত চন্দন আর রক্তাঙ্কের মালা এবং রক্তপট্ট পরিধান আর শাক্তবিধির অনুশাসন অনুসরণ কোন কোন অঞ্চলের আচার আচরণ শাক্ত রীতির বহুল প্রসার সাধারণত মত্ত পানের প্রসার আর মাংস ভক্ষণের প্রচলনও দেখা যায়। এমন কি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের মানুষ তারা তারা বলে কাজে কর্মে গমনে সব-যাত্রায় আর শয়নে জাগরণে। আবার কোন কোন অঞ্চলে কালী তারার নাম শোনা যায় মাত্র। ত্রীগৌরান্দ্র অহরহ তাদের শয়নে স্বপনে জাগরণে নিদ্রা ছিঁচি জাগরুক থাকে। হরি হরি ধ্বনি শোনা গেছে অহরহ। আবার শৈব প্রাধান্য অঞ্চলে হর হর মহাদেবের নাম শোনা যায়। কোন অঞ্চলে নিরামিষ ভোজন, গৈরিক বহির্বাস পরিধান প্রভৃতি রীতি জীবন ধারণের ধারাকে হ্রস্ববদ্ধ রাখত। কোথাও ঢাকের বাজ আবার কোন অঞ্চলে খোলের বাজনা প্রধানতম উৎসবের অঙ্গ। কোন কোন অঞ্চলে কালীমন্দিরের প্রাধান্য আবার কোথাও গৌরান্দ্র মন্দিরের বিশেষ প্রতীক সেই সব অঞ্চলের ধর্মমতের প্রভাব সূচিত করে।

অদেখা জীবনের চিন্তা এই জীবনকে সংযত করতো। মানুষের প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষকে স্থখী করবার প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি হয়। এই ভোগের ছুনিয়ায় বাঁচার প্রয়োজনে মানুষ ত্যাগ করতে এতটুকু পরাজুত হয়নি। ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আচরণ আর অহুভূতি যুগে যুগে মানুষকে কঠিন পরিশ্রম করতে শিখিয়েছে। ধর্মবিশ্বাস বেদ পুরাণ উপনিষদ নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়া আচরণ বিধি আর ধর্মীয় প্রলেপে সামাজিক অনুশাসন তপস্চার ধারা নিয়ম বা নানান মত বিভাগ বহু মানুষের নানা বিধিনিষেধে, সম্প্রদায়ে, বাজিতে বাজিতে, জনবিশ্বাসের পর্যায়ে পর্যায়ে জটিল জীবন যন্ত্রণা পাষণ-চাপা ধুকছে। ধর্মে ধর্মে শ্রেণী বিভাগ, মতে মতে শ্রেণী বিভাগ, আচারে, আচরণে, বিধি, মত, ধারণা প্রভৃতি জটিলতার সৃষ্টি করে মানুষের চলার অনিয়মে।

তেমনি সৃষ্ট শ্রমবিভাগের জন্ম জাতি বিভাগের প্রয়োজন মানুষের প্রয়োজনেই নির্দ্বারিত হয়েছিল। মানুষের প্রয়োজনেই যেমন জাতি প্রথা ভাঙ্গার প্রয়োজন হয়েছে তেমনি মানুষের দরকারেই জাতি প্রথাকে হ্রস্ববদ্ধ রাখতে অনেক ভাবতে হয়েছিল। এই প্রথা যতদিন শুধু মাত্র দরকার ছিল ততদিন মানুষ মানুষকে ঘৃণা করেনি। যেদিন থেকে সকলে সকলকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করতে লাগলো তখন থেকে জাতি প্রথা জনতা জীবনে অভিশাপের মত নেমে এলো। শ্রেণী বিভাগের দ্বারা জটিল জীবন-যন্ত্রণা মধু মাত্র পাথরে মাথা কুটে মরতে লাগলো। গ্রাম বাংলার একটা

প্রচলিত কথা আছে—কুলুজী খুলে দেওয়া অর্থাৎ আত্মসম্মতি ইতিহাস বলে দেওয়া। কোষ্ঠী আর কুলুজী একার্থবোধক নয়। কোষ্ঠী কোন মাহুষের ভূত ভবিষ্যৎ জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনা করে। আর লোক-কথায় কুলুজী কোন জাতির ভূত ভবিষ্যৎ জন্ম বৃত্তান্তের কথা বলে। প্রতিটি জাতির উৎস, জাতি মাহাত্ম্য, তাদের শ্রম মর্যাদা প্রভৃতি বিষয় নানা প্রকার উপাখ্যান লোকমুখে প্রচলিত ছিল। কেউ ছোট ছিল না। দেবতা জাতি-চরিত্র আর মনুষ্যত্ব-বোধের জাগরণে ছিল একান্ত সহায়ক। দেবতা সমাজে অতন্ত্র গ্রহরী থেকেছে চিরকাল। দেবতাকে লোকসাহিত্যের গাথা গানে মাহুষ তল্লাহকের মত হেথা থেকে হোথা, হোথা থেকে অল্প কোনখানে কেবল ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। মাহুষ তাই লোকসাহিত্যের নায়ক, দেবতা নয়। লোকসাহিত্যে দেবতা বড় কাঙাল, বড় অসহায়। বড় দুর্বল। মাহুষের মহত্ব দেবতাকে গানিময় করে দেয়।

তাই মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্ম, শ্রম কাতরতা নিরসনের জন্ম প্রত্যেক জাতিকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে অবহিত করার জন্ম সমাজে নানা প্রকার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়েছিল। জাতি বিভাগকে স্বসম্বন্ধ রাখার জন্ম ধর্মই ছিল মাহুষের একান্ত অবলম্বন। আর ধর্মকথা লৌকিক গাথা কথিকায় ভাষার চমৎকারিতার কল্পনামৌর্খ্যে নানা প্রকার বিধি-অনুষ্ঠানে পরিশীলিত হতো। এই ধারা বহুদিন পর্যন্ত বাংলা দেশে অব্যাহত থাকে। এমনকি এক এক দেবতার নামে এক এক জাতির 'পাঠ' বাঁধার প্রয়োজন হয়। সমাজে কুলপুত্র যেমন পারিত্রিক মংগল কামনায় বার্ষিক ট্যাকসের হকদার ছিল যেমন পুরোহিত সংসারে ধর্মীয় পূজা অনুষ্ঠান-ক্রিয়াকর্মের পরিচালনা করতো তেমনি একথা আজ সাধারণ্যে অনবধারিত যে কুলপুরোহিতের জাতি মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রথা এককালে লোক-রচনায় গানে গাথায় পয়্যারে উপাখ্যানে গ্রাম-বাংলার জনতা জীবনে মন্ত্র-মুখর সন্ধ্যা মন্দির করে রাখতো। বৎসরে বিশেষ সময়ে। বিশেষ অনুষ্ঠানে জাতি মাহাত্ম্য কীর্তন করত এই কুলপুরোহিতরা। এরা ছিল সমাজে শ্রমবিভাগে বিপর্যয় না আসার চারণ গ্রহরী।

গ্রামে গ্রামে প্রায় অনেক জাতির কুলপুরোহিত ছিল। বিশেষ অনুসন্ধান জানা যায় যে এই কুলপুরোহিতদের আর কোন জীবিকা ছিল না। শুধুমাত্র গ্রামে গ্রামে এক একজন পুরোহিত এক এক জাতির জাতি মাহাত্ম্য পাঠ কীর্তন আর আলোচনা করে বেড়াতো। এদের খাতায় গ্রামের জাতি বৃদ্ধের নাম লেখা থাকতো। তারপর গ্রামে গেলে প্রত্যেক বাড়ীতে জাতি মাহাত্ম্য পাঠ হতো। শুনতো গ্রামের সব জাতির লোক। বিশেষ জাতির মাহাত্ম্য কথা বর্ণনার সময় তারা তো মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করার পর কুলপুরোহিতকে বার্ষিক দিতো। সংগতিপন্ন লোকরা নতুন ধূতি দিতো আর জাতিগত ব্যবসার উৎপন্ন দিতো কুলপুরোহিতকে অটলভাবে। এইভাবে কুলপুরোহিতের জীবিকা নির্বাহ হতো স্বচ্ছন্দে। শুধুমাত্র বীরভূম জেলায় স্বল্প অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায় যে এই জেলায় গ্রামে গ্রামে তাঁতির কুলপুরোহিত, সদগোপের কুল পুরোহিত, মুচির কুলপুরোহিত এই চারণ গীতিকায় বীরভূমকে মুখর করে রাখতো। এরা সাধারণত জাতিতে ব্রাহ্মণ হতো।

তাঁতি কুলপুরোহিত বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামে এসে প্রতিটি তাঁতির বাড়ীতে বার্ষিক আদায় করতো। সংগে থাকতো তুলোঁট কাগজের বা তালপাতার পুঁথি। গ্রামের তাঁতি পাড়ায় রাত্রে কুলুজী পাঠ হতো। শুনতো সকল লোক। শিবের থেকে নাকি তাঁতি জাতের সৃষ্টি। এরা তাই

শৈব। বাংলা দেশে বহু বিখ্যাত শিব মন্দিরের এক একটা এলাকা বাঁধা থাকতো। সেই এলাকার মধ্যে যত তাঁতি তাঁরা সেই শিবকে বিবাহে ধোল আনা, ঘৃতকর্মে নতুন গামছা আর গাজনে অন্ততঃ পাঁচ ছটাক সরষের তেল দেওয়ার সামাজিক বন্ধনে রীতিবদ্ধ ছিল। অনেক উপাখ্যান থেকে জানা যায় শিবই তাঁতিদের উপাস্ত। শিবের তত্ত্ব বাহক ছিল তারা। তাই শিব তাদের তত্ত্ববায় নাম দিয়ে তত্ত্বজীবী করে দেন। এটা তাদের গৌরবের। কুলপুরোহিতের একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়— শিব তাঁতি জাতের জন্ম দিয়ে বলেছেন—

সম্বৎসর খাও বাপু এক তাঁত বুনে।

কিন্তু তাঁতি করজোড়ে শিবের কাছে মিনতি করে বলছে—

পুত্র পৌত্র আদি তাঁত শিথিবে কেমনে।

রোষেতে কহিল তবে দেব পঞ্চানন।

নিত্য আন বুন খাও শোন বাছাধন ॥

আবার তাঁত তৈরী কেমন করে হলো সে সম্পর্কেও জানা যায়। কেন না শিবই তাঁত যন্ত্র তৈরী করে দেন তাদের জীবিকা নির্ধারণ করে। সমাজে শ্রমের আর জীবিকার মর্যাদা দানের জন্ত এইভাবে নানা প্রকার লৌকিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়।

নদী তীরে ছিল এক তাল বর্জ কাঁড়ি।

তাহা কেটে বিশ্বকর্মা নির্মাইল তাঁড়ি ॥

একটি সংগোপ জাতির ইতিহাস জানা যায় তাদের কুলপুরোহিতের কাছ থেকে। সংগোপ জাতির জন্ম নাকি হলধারী বলরাম থেকে। বলরাম কতকগুলো গরু এনে এদের দিয়ে বলেন, এইগুলি থেকে যা উৎপন্ন হবে তার থেকে জীবন ধারণ কর। তাই বলদ দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করতে আরম্ভ করে তারা। তারা সংগোপ। তারা শুধু মাত্র গাভী ছুঁড়ের ব্যবসায়ে ছানা মাখন বি বিক্রী করে জীবনধারণ করে তারা পল্লব গোপ। এইভাবে জাতি বিগ্ৰাস স্থিরীকৃত হয়।

তেমনি নানা জাতিতত্ত্ব প্রচার জন্ত বহু উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন লোককবির দ্বারা এইসব পয়ারবদ্ধ উপাখ্যান কুলপুরোহিতদের দ্বারা লালিত ও সংরক্ষিত হতো এককালে বাংলাদেশে। মুচিদের মধ্যে চারটি শ্রেণী আছে নাকি। যথা—ধলা, ধসা, উড়ে আর রামদাস। বাঙালী মুচিরা নাকি প্রায়শই রামদাস শ্রেণীভুক্ত। তাদের জিজ্ঞেস করলে বলে, জাতিতে রামদাস। এই রামদাসের বিবরণ অতীব চমকপ্রদ। ভজমাল গ্রন্থে এক রামদাসের চরিত্র কীর্তন করা হয়েছে কিন্তু তাতে কোন জাতি সম্পর্কে কোন রকম আলোকপাত করে না তবে ভক্ত রুইদাস মুচির জীবনকথা ভক্তমাল গ্রন্থের সম্পদ। কিন্তু ভক্তির স্বরূপ বুঝাতে ঐ চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। হয়তো এই রুইদাস মুচির জীবন সত্যিকারের কোন ভক্তের তেমনি রামদাস মুচির জীবন সত্যিকারের কোন মাহুষের জীবনকথা গ্রাম্যালোকগাথায় যার জীবন-কীর্তিত হতো বহুকাল। ভক্তি সমাজজীবনে মাহুষকে মাহুষ হতে সাহায্য করেছে। কেননা এ জীবনের সংস্কার এ জীবনের সম্ভাবের পর জীবনের সঞ্চয়। এই ধারণা সমাজ জীবনকে হৃন্দর হতে সাহায্য করেছে। জাতের হীনতা নীচতার কোন ধারণা ছিল না সেকালে। রুইদাস মুচি হয়ে দেবপূজা করে একথা সেদিন কল্পিত হয়েছিল।

ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি।

তাহাতে রাখিয়া সেবা করায় আপনি ॥ [ভক্তমাল ২১৫ পাতা]

একটু লক্ষ্য করলে আরও আশ্চর্য হতে হয় যে আমাদের দেশে অনেক লৌকিক প্রবাদ আছে যার সংগে একটু অল্পসন্ধান করলে বহু মনোরম গাথা কথিকার থেকে যে সেই সব প্রবাদ প্রবচনের জন্ম তা নির্দ্বারিত হয়। যেমন একটি চলতি প্রবাদ আছে—

মন যদি চাংগা তো কোটরাতে গংগা ॥

এই প্রবাদটি একটু অল্পসন্ধান করলে মুচি রামদাসের জীবনকাহিনীর সংগে সুন্দর কিংবদন্তীযুক্ত হয়ে রামদাসের জীবনকে স্বষমা মণ্ডিত করেছে। যে লোককথা গাথা একদিন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক জীবনকে নিবিড় মহিমাষিত করেছিলো হয়তো তার মধ্যে সুন্দর জনচরিত্র এই সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে মানুষের কণ্ঠে স্বর গান ভাষা আর কথা কাহিনীকে কোনদিন শেষ হয়ে যেতে দেয়নি। বৈষ্ণব ধর্মে তো বারবার বলেছে, মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ পূজে।

হয়তো মুচি সমাজ জীবনে কোন এককালে ঘুণা পায়নি।

মুচিদের কুল পুরোহিতের নিকট সংগৃহীত উপাখ্যান থেকে যে রামদাসের জীবন জানা যায় তার সঙ্গে রুইদাস মুচির জীবনের কোন মিল নেই। তাই মনে হয় হয়তো সত্যিকারের সমাজ-মুখীন সংচরিত্র কীর্তন করার রীতি সেকালে চলিত ছিল।

মুচির কুলপুরোহিতের নিকট সংগৃহীত রামদাসের চরিত্রে লোকশিক্ষামূলক যে কথা জানা যায় তাতে মহুগ্ধকে গৌরবান্বিত করে। কিন্তু সমাজে এক জাতি অপর জাতিকে ঘুণা করতে সবে মাত্র আরম্ভ করেছে তার বিশেষ ছায়া এই সব উপাখ্যানে পাওয়া যায়। তখনই হলো বিষবৃক্ষ রোপন। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে তখনই।

মুচি রামদাসের কথা

পুরাকালে রাঢ় দেশে হরিপুর গ্রামে।

বসবাস করে মুচি রামদাস নামে ॥

পত্নী তার রূপবতী নামেতে পদ্মিনী।

দেহের সৌরভ তার পদ্মপুষ্প জিনি ॥

রতি-শাস্ত্রে যে নারীর প্রশংসা করয়।

সেই সে পদ্মিনী নারী মুচির আলায় ॥

মুচির সৌভাগ্য আর কি দিব তুলনা।

যার তার কপালেতে এ নারী মিলে না ॥

দাম্পত্য জীবন তারা সুখেতে কাটায়।

একমাত্র দুঃখ বড় পুত্র নাহি তায় ॥

একদিন রামদাস চিন্তে মনে মন।

বংশ না রহিল গেল বৃথায় জীবন।

কি করিব কোথা যাব ভেবে নাহি পায়।

ঈশ্বর ভজিব তার নাহিক উপায় ॥
 শাস্ত্রেতে আছে বিধি শূদ্রের কারণ ।
 সেবন করিবে সাধু বৈষ্ণব চরণ ॥
 সে পথ নাহিক আমি অস্পৃশ্য অধম ।
 কেমনে করিব সাধু চরণ সেবন ॥
 অকস্মাৎ একদিন ছপূর বেলায় !
 নগ্নপদে আসে এক বৈষ্ণব গৌসাই ॥
 উত্তপ্ত বালুকা পরে পদ নাহি চলে ।
 ক্লান্ত হয়ে বসিলেন বটবৃক্ষ তলে ॥
 দেখি রামদাস তবে কৃতাজ্জলি হৈয়া ।
 করজোড়ে করে কিছু বিনয় করিয়া ॥
 অস্পৃশ্য চণ্ডাল আমি শোন সারাৎ সার ।
 ধর্ম কর্মে কিছু মোর নাহি অধিকার ॥
 শুনিয়া কহিল তবে বৈষ্ণব গৌসাই ।
 এক উপদেশ তুমি শোন মোর ঠাই ॥
 মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে ।
 শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥
 এই উপদেশ শুনি হইয়া উল্লাস ।
 আপন গৃহেতে গেল মুচি রামদাস ॥
 পরেতে চলিয়া গেল বৈষ্ণব গৌসাই ।
 নারায়ণ শিলা রাখি বৃক্ষের তলায় ॥
 নিশাকালে রামদাসের স্বপ্নাদেশ হলো ।
 বৈষ্ণব গৌসাই মোরে রাখিয়া যে গেল ॥
 বটবৃক্ষ মূলে আমি আছি বিগ্ৰহমান ।
 প্রত্যুষে উঠিয়া কর পূজার বিধান ॥
 পরদিন রামদাস স্নানদান করি ।
 বৃক্ষের তলায় পূজে শিলারূপে হরি ॥
 কিছুদিন পরে এক মন্দির রচিয়া ।
 তথায় স্থাপিল হরি উৎসব করিয়া ॥
 মুচির দেখিয়া পূজা পড়ে গেল সাড়া ।
 কাছে পিঠে মুচিদের যত ছিল পাড়া ॥
 শুনিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সন্তান ।
 ক্রোধেতে হইল সর্ব্ব অগ্নির সমান ॥

শিরোমণি নামে ছিল বিপ্রচূড়ামণি ।
 তাঁর কাছে দ্বিজগণ চলিল তখনি ॥
 শিরোমণি কাছে সবে করে নিবেদন ।
 যত নয় ততোধিক বাহুল্য বচন ॥
 শুনিয়া ব্রাহ্মণ মুখে মুচির কাহিনী ।
 ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলো দ্বিজ চূড়ামণি ॥
 ব্রাহ্মণগণেরে কহে যাও সবে ঘর ।
 বিহিত বিধান আমি কবির সত্ত্বর ॥
 স্তোকবাক্য শুনি সবে শিরোমণি মুখে ।
 দ্বিজেরা আপন গৃহে গেলো মনস্থখে ॥
 ক্রোধে আত্মজ্ঞান হারা হয়ে শিরোমণি ।
 চিন্তিয়া করিল স্থির হরিব রমণী ॥
 পরদিন স্নান করি মুচি রামদাস ।
 কুহুম চয়ন করে হইয়া উল্লাস ॥
 কুহুমাди লয়ে গেল মন্দির ভিতরে ।
 শালগ্রাম পূজে মুচি হরিষ অন্তরে ॥
 পদ্মিনী গৃহেতে করে একাকী রন্ধন ।
 ভাত ডাল শাক আদি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
 হেনকালে শিরোমণি কাম লালসাতে ।
 উপনীত হলো আসি পদ্মিনী সাক্ষাতে ॥
 পদ্মিনীর প্রতি কহে কামুক ব্রাহ্মণ ।
 বাহু প্রসারিয়া মোরে দেহ আলিঙ্গন ॥
 আসিয়াছি তব পাশে শুনলো সুন্দরী ।
 ব্রাহ্মণ হইয়া আজ প্রেমের ভিথারী ।
 রোষেতে পদ্মিনী কহে শোন দুরাচার ।
 ব্রাহ্মণ হইয়া এত নীচ ব্যবহার ॥
 অকথা কুকথা কেন মোরে কহ তুমি ।
 গৃহ হতে দূর হও আসিবেন স্বামী ॥
 হেনকালে শংখধ্বনি মন্দিরে হইল ।
 পদ্মিনী কহিল স্বামী ঐ বুঝি এল ।
 প্রাণভয়ে শিরোমণি কাঁপে থর থরো ।
 পদ্মিনীর পায়ে ধরি বলে রক্ষা কর ॥
 পদ্মিনী চিন্তিত বড় হলো মনে মনে ।

কি উপায়ে রক্ষা করি ব্রাহ্মণ নন্দনে ॥
 পুঁতিগন্ধময় মৃত গো চর্ম যে ছিল ।
 তাহা দিয়া তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণে ঢাকিল ॥
 পূজা সারি রামদাস গৃহেতে আসিয়া ।
 শয়ন কক্ষেতে গেল বিশ্রাম লাগিয়া ॥
 এদিকে পদ্মিনী বিপ্রে ঢাকা খুলি দিল ।
 উপদেশ তরে কিছু বলিতে লাগিল ॥
 বহুক্ষণ রহ ঢাকা দুর্গন্ধ চর্মেতে ।
 বিষয় লাগিল বড় আমার মনেতে ॥
 ব্রাহ্মণ হইলে নাহি পারিতে থাকিতে ।
 জননীর কাছে তুমি জানিবে স্বরিতে ॥
 কাহার ঔরসে জন্ম কেবা তব পিতা ।
 বিশেষ করিয়া জানি তাহার বারতা ॥
 পরেতে করিবে মোর সহিত মেলানি ।
 তোমারে কহিছ আমি এই শেষ বাণী ॥
 অপমানে অভিমানে বিপ্রে নন্দন ।
 আপন গৃহেতে স্বরা করিলা গমন ॥
 জননীকে কহে বিপ্র করি সন্ধান ।
 তিন সত্য করি কহ আমার বচন ॥
 যত্নপি ত্রিসত্য তুমি না কর এখন ।
 অগ্রহ তাজিব আমি এ পাপ জীবন ॥
 পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে জননী তখন ।
 ত্রিসত্য রাখিয়া কহে পুত্রে সন্ধান ॥
 কিবা সত্য বিবরণ জানিবার আছে ।
 বিস্তার করিয়া পুত্র কহ মোর কাছে ॥
 শিরোমণি কহে মাতা কহ সত্য কথা ।
 কাহার ঔরসে জন্ম কেবা মোর পিতা ॥
 জননী কহিল তারে মধুর বচনে ।
 দুঃখ না করিহ বাছা তাহার কারণে ॥
 যেইদিন ঋতুমান করিলাম আমি ।
 সেইদিন গৃহমোর নাহি ছিল স্বামী ॥
 ঋতু রক্ষা হেতু আমি বহুচিন্তা করি ।
 দিনমান পার হলো স্বামী স্বামী স্মরি ॥

স্বামী না আইল মোর গেলো বিভাবরী ।
 শংকর মুচিরে ডাকি খতু রক্ষা করি ॥
 ঋতু রক্ষা না করিলে হয় মহাপাপ ।
 করিও না এর তরে কিছু মনস্তাপ ॥
 গুনিয়া মায়ের বাণী দ্বিজ শিরোমণি ।
 যুগায় লজ্জায় তর বিদরে পরাণী ॥
 গৃহ ত্যাগিয়া দ্বিজ করিল গমন ।
 এ তীর্থ ও তীর্থ করি করেন ভ্রমণ ॥
 এ দিকেতে ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া ।
 রাজার নিকটে সবে নিবেদিল গিয়া ॥
 আপনার রাজ্য মধ্যে দাস মুচিরাম ।
 হইয়া অধম জাতি পূজে শালগ্রাম ॥
 চণ্ডাল হইয়া করে দ্বিজের আচার ।
 অচিরাৎ কর রাজা ইহার বিচার ॥
 রাজা কহে যাও সবে আপন গৃহেতে ।
 গংগাস্নানে যাব আমি কাল ঐ পথে ॥
 আতন্ত সবকিছু দেখিয়া ভাহার ।
 উপযুক্ত শাস্তি দিব করিয়া বিচার ॥
 রাজার আদেশ শুনি যত দ্বিজগণ ।
 নিজ নিজ গৃহে সব করিল গমন ॥
 প্রদিন প্রত্যাষেতে উঠিয়া রাজন ।
 গংগা স্নান করিবারে করয়ে গমন ॥
 সংগেতে লইল ডাকি যত দ্বিজগণে ।
 উপনীত হলো গিয়া মুচির ভবনে ॥
 রাজারে দেখিয়া তবে মুচির কুমার ।
 সসন্মানে জিজ্ঞাসা করয়ে সমাচার ॥
 রাজা কহে মুচি হয়ে কর বিষ্ণুপূজা ।
 প্রদান করিব তার উপযুক্ত সাজা ॥
 আর যাব গংগা স্নানে করিয়াছি মন ।
 সেই হেতু আজ মোর হেথা আগমন ॥
 রামদাস বলে যদি মন হয় চাংগা ।
 চামভিজা জলে হবে আর্বিভূত গংগা ॥
 দেখিতে দেখিতে গংগা আর্বিভূত হলো ।

চামড়ি জলে ছুই বাহ প্রসারিলো ॥
 মুচির করম দেখি সকলে বিস্মিত ।
 পলায় ব্রাহ্মগণ হইয়া লজ্জিত ॥
 রাজা বলে তোর কর্মে হইল সন্তুষ্ট ।
 ব্রাহ্মণে ও দেখি নাই এত একনিষ্ঠ ॥
 সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলা বহু দান ।
 আপন আলয়ে পরে করিলা প্রস্থান ॥
 মুচিরাম দাস কথা সমাপ্ত হইল ।
 জাহ্নবী প্রীতিতে সতে হরি হরি বল ॥

জাতের নামে অনেক বজ্রাতি হয়ে গেছে এদেশে। কিন্তু কুলুজী গ্রামে এককালে রাজাদের বংশ গৌরব, পদমর্যাদা, তাদের স্তাবকতা করে কত স্বভাবকবি জীবিকা অর্জন করে গেছে। কত রাজার সভাকবি দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। জীবিকার তাগিদে, পদমর্যাদার লোভে এও যেমন করেছে এককালে কবিরা তেমনি সমাজে গুণের আদর যাতে বজায় থাকে, সংলোকের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্যও কত গাথা কথা কবিতা রচনা করেছে। তাই কুলুজী গ্রামে যে জীবন কাহিনী পাওয়া যায় সেখানে কোন হীনতা নীচতা নেই। নেই মানুষকে হেয় করে জয়ী হওয়ার কোন কাহিনী। যেদিন থেকে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো তখন হলো মানুষের চরম বিপর্যয়। ঘৃণা হতে যে পাপ জমে উঠলো তাকে যখন আর কোনক্রমেই পশুদস্ত করা গেলো না তখন সেই পাপে মানবতা বিস্মিত হলো! এই সব উপাখ্যান ধারাবাহিক আলোচনা করলে সেই ক্রমবিপর্যয় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তাই বিপর্যস্ত হলো সমাজ। বিস্মিত হলো দেবত্ব। মানুষকে ঘৃণা করা পাপ। সেই পাপে যে কালি জমে উঠলো তার জন্ত নির্মম ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আজ সমাজ, জাতি আর মানুষ।

* তাঁতিদের কুলপুরোহিত—অবিনাশ বাড়ুজ্জে—সাকিম ধানাই বুদ্ধরো—সদর থানা বীরভূম।
 মুচিরের কুলপুরোহিত—বাগাল চক্রবর্তী, সাকিম রায়পুর—সদর থানা বীরভূম। উপাখ্যানগুলি
 এঁদের নিকট সংগৃহীত।

মুচি রামদাসের উপাখ্যান লোককবির লিখিত।

রুইদাস মুচির উপাখ্যান লালদাসজী রচিত ভজমাল গ্রন্থ হ'তে উদ্ধৃত।

বিভাগসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী

বিভাগসাগরের প্রথম জীবনী লেখেন তাঁর ছোট ভাই শঙ্কুচন্দ্র বিহারী। তারপর একে একে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকারের বই বের হয়। চণ্ডীচরণ বিভাগসাগরের অনেকগুলি বাংলা ও ইংরেজী চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। এদের সকলের উপকরণের সাহায্যে স্ববলচন্দ্র মিত্র তাঁর ইংরেজী জীবনী লেখেন। তিনি কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্রও প্রকাশ করেন। এর দীর্ঘদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী রেকর্ড রুম ও সংস্কৃত কলেজ থেকে বিভাগসাগরের অনেকগুলি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধার করেন। এরপর শ্রীবিনয় ঘোষও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পত্র উদ্ধার করেছেন। সর্বশেষ লেখক 'ইন্দ্রমিত্র'ও স্টেট আর্কাইভস ও সংস্কৃত কলেজ থেকে বিভাগসাগরের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধার করেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে বিভাগসাগরের প্রকাশিত ইংরেজী পত্রের সংখ্যা একশও হবে না।

সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী বিভাগসাগরের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ইংরেজী পত্রাবলী ও রিপোর্টগুলির মধ্যে। কিন্তু এসব পত্রাবলীর অধিকাংশই অজ্ঞাত রয়েছে।

সম্প্রতি আমি বিভিন্ন সরকারী সংগ্রহ ও অজ্ঞাত স্থান থেকে বিভাগসাগরের অপ্রকাশিত ছয়শত (৬০০) চিঠি ও ২৫টি রিপোর্ট উদ্ধার করেছি। আরো শতানেক পত্রের সন্ধান পেয়েছি কিন্তু এখনও সব অছলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। এর মধ্যে প্রায় দুশ চিঠি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি বাছাই করে ক্রমশ "সমকালীন" এ প্রকাশ করা হবে। বর্তমান সংকলনে মোট ৪টি অপ্রকাশিত পত্র আছে। এগুলি সবই শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত।

॥ ১ ॥

এই গ্রুপের চিঠিগুলি সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ছাড়া অন্তর্গত বর্ণের হিন্দুদের ভর্তি সংক্রান্ত। বিভাগসাগরের সব চরিতকারই বলেছেন যে বিভাগসাগর প্রথমে কায়স্থদের জন্তে এবং পরে সর্ববর্ণের হিন্দুদের জন্তে সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ চিঠিগুলো থেকে দেখা যাবে বিভাগসাগরের বিরুদ্ধে চরিতকারদের এটা একটা অপপ্রচার। বিভাগসাগর যা করেন নি তারা তাঁকে তাই মাজিয়েছেন।

১৮২৪ খ্রী ষখন সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় তখন নিয়ম করা হ'ল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ছাড়া আর কেউ সেখানে পড়তে পারবেন না। মাঝে মাঝে অন্তর্গত বর্ণের হিন্দুরাও সেখানে ভর্তি হতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি।

১৮৪৫ সালে হিন্দু কলেজের পাঠশালার ছাত্র রামচন্দ্র ঘোষ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবার আবেদন করেন। কলেজের সম্পাদক তখন বাবু রসময় দত্ত। শিক্ষা কাউন্সিলকে এই আবেদন

পত্রটি তিনি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন যে কলেজের মুদ্রিত নিয়মাবলীর ৩৬ ধারা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ও বৈজ ছাড়া অন্য কাউকে ভর্তি করা চলে না। তিনি আরো বললেন যে একজন শূদ্র ভর্তির জন্তে তিনি স্থপারিশ করতে পারবেন না। তাঁর চিঠির কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

The applicant is a Sudra and as there is a great popular prejudice against that class studying Sanscrit and as there is no precedent of a Soodra Caste Student ever being admitted into this Institution, I can not recommend the application to the favorable consideration of the council."

১৮৫০ সালের শেষ ভাগে এরকম আরো একটি ঘটনা ঘটল। সেবারও রসময় বাবু পরিষ্কার জানালেন যে কলেজের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ বৈজ ছাড়া অন্য কাউকে ভর্তি করা যাবে না।

এর কদিন পরেই রসময় বাবু পদত্যাগ করেন এবং বিদ্যাসাগর অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। ১৮৫১ সালের ৭ই জানুয়ারী শিক্ষা কাউন্সিল এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নিজের এবং কলেজের প্রধান অধ্যাপকদের মতামত জানতে চাইলেন।

উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন যে ব্যক্তিগত ভাবে সকল শ্রেণীর শূদ্রদের প্রবেশাধিকার দিতে তিনি ইচ্ছুক, কিন্তু আপাততঃ একমাত্র কায়স্থদের প্রবেশাধিকার দেবার সময় এসেছে। কায়স্থ ছাড়া অন্য শূদ্রদের সম্বন্ধে তিনি বললেন যে তাদের সমাজে স্থান অনেক নিচুতে আর তাদের কোন আভিজাত্যও নেই। তাদের ছেলেদের কলেজে পড়তে দিলে কলেজের ক্ষতি হবে।

কায়স্থদের পক্ষে তিনি বললেন যে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে তাঁদের স্থান খুব উচু। এবং শূদ্রদের শাস্ত্রপাঠ সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বাধানিষেধ আছে বিদ্যাসাগরের মতে কায়স্থদের ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কারণ দেখা গেছে যে গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও তাঁদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আপত্তি করেন না, এবং যারা কায়স্থদের অধ্যাত্মিক গুরু হ'ন সমাজে তাঁদের হেয় জ্ঞান করা হয় না। তাছাড়া কলকাতা ও আসেপাশের অঞ্চলের কায়স্থরা এত সম্ভ্রান্ত যে তারাই সমাজের মাথা বা সমাজপতি।

শাস্ত্রীয় বাধানিষেধ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বললেন যে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়তে পাড়বে না শাস্ত্রে এমন কোন প্রত্যক্ষ বিধিনিষেধ নেই। পক্ষান্তরে ভাগবত পুরাণ থেকে অনেকগুলি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন যে শূদ্ররা শাস্ত্র পড়বার অধিকারী।

বিদ্যাসাগর আর একটি তথ্যের উল্লেখ করলেন ১৮২৮/২৯ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের এক নিকট আত্মীয়কে সংস্কৃত কলেজের গোঁড়া পণ্ডিতরা সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈজ ছাত্রদের সঙ্গে এক সাথে শিক্ষা দিয়েছেন, তখন কিন্তু তাঁদের কোন আপত্তি হয় নি। বিদ্যাসাগর আরো বললেন যে আন্দুলের রাজা পণ্ডিতদের এক সভা ডেকেছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতই বলেছেন কায়স্থরা শূদ্র নয়, তারা ক্ষত্রিয়। এই সব কারণে বিদ্যাসাগর আপাততঃ কায়স্থ ভর্তির পক্ষে স্থপারিশ করলেন।

বিদ্যাসাগরের এই অপ্রকাশিত পত্রটি এখানে প্রথম প্রকাশ করা হল—

No. 702

From : The Principal of the Sanscrit College.

To

Captain F. F. C. Hayes, M. A.

Offg. Secretary, Council of Education.

Dated Fort William 28th March 1851.

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of Secretary Dr. Mouat's letter No. 79 dated the 7th January last, requesting me to report on the subject of any other castes than Brahmanas and Vaidyas, being admitted to the Sanscrit College and to ascertain and submit to the Council the opinion of the Principal Professors of the Institution on the question.

2. In reply I beg leave to state that I see no objection to the admission of other castes than Brahmanas and Vaidyas or in other words, different orders of Shudras, to the Sanscrit College. But as a measure of expediency, I would suggest that at present Kayasthas only be admitted—they from a very respectable portion of the Hindu Community of Bengal. The prohibitions in the Shastras with regard to the Shudras do not apply in their full extent to the Kayasthas. The most orthodox Brahmins do not hesitate to give them instructions and even those Brahmanas who perform the part of spiritual guides to Kayasthas are not held in disrepute, but rather are highly esteemed inspite of the Dictum of Manu, "Let him not give temporal advice to a Shudra ; nor what remains from his table ; nor clarified butter of which part has been offered to Gods, not let him give spiritual counsel to such a man, nor inform him of the legal expiation for his sin".

3. In the days of Manu, the only duty prescribed for a Shudra was to serve the three superior orders, namely Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas—but practice has now so far superseded precept that the Kayasthas, though considered to be of the Shudra class—not only perform almost all the duties of the higher classes, but are virtually the heads of the Religious Societies in Calcutta and its Suburbs.

4. There is no direct prohibition in the Shastras against the Shudras studying Sanscrit literature. The only portions of it, from the perusal of which

they are excluded are the sacred writings. But there are not wanting - authorities which allow this privilege. From certain texts of the Bhagavata Purana clear inferences may be drawn to show that they are privileged to read the above works i. e. acknowledged to be a divine Revelation and to be the essence of all the Upanisads, the most sacred portion of the Vedas.

ইদং ভগবতাপূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপংকজে ।

স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যায় সন্তোষশিতায় ॥

B. XII, Ch. XIII, V. IX.

This (the Bhagavata) was first revealed by Vishnu to Brahma, situated in the Lotus (growing out) of his Naval and afraid of (being from into) the world.

সর্ববেদান্ত সারংহি শ্রীভাগবতমিহতে ।

B. XII, Ch. XIII, V. XIII.

The Bhagavata, is admitted to be the essence of all the Vedantas (Upanishads).

বিপ্রোহরীতাপ্পূ ষাৎ প্রজ্ঞাং রাজতোদধিমেখলাম্ ।

বৈশ্বোনিধিপতিস্ব চ শূদ্রঃ শুদ্ধেত পাতকায় ।

By Studying it (the Bhagavata) a Brahmana obtains wisdom, a Kashtriya territory, a Vaisya Wealth, a Shudra, purification from sin.

5. Very lately a curious occurrences took place in this part of Bengal which to a certain extent, favors the admission of the Kayasthas to this Institution. An opulent Kayastha, the late Raja Rajnarayan Bahadur of Andool attempting to prove that the Kayasthas are Kshatriyas and therefore not subject to the restrictions enjoyed against the Shudras, insisted orthodox Pundits to give this opinion on the subject and a host of them have subscribed in the affirmative.

6. By the existing rules of the Sanscrit College Vaidyas are admitted to it, though Raghunandana, whose works are the sole authority for the prevalent religious observances in Bengal classes them with the Shudras. I can therefore conceive no reason, why Kayasthas, who occupy the highest place amongst the Shudras should be excluded from sharing the boon with their brother—Shudras, the Vaidyas.

ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াণমপি শূদ্রস্বমাহমন্তঃ শনকৈ শু ক্রিয়ালোপাদিমাঃক্ষত্রিয়জাতয়ঃ । বুধলজ্জ গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ । এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদৈশ্চান্যানামপি তথা । এবম্ স্বর্গাদীনামপি ॥

Manu has pronounced that the Kayasths of the present age are become Shudras as "By degrees from the extinction of ceremonies and omission of the study of the Vedas, the Kshatriyas are become Shudras". So from the extinction of ceremonies, the position of the Vaishyas, is the same, and also of the ambasthas, (or Vaidyas) and the like.

7. It would not be irrelevant to state here that in the years 1828 and 1829 during the time of Dr. Wilson, some students of the Hindu College were allowed to study Sanskrit in this Institution, among whom was a Kayastha named Baboo Amritalall Mitter, a near connection of Radhakant Bahadur. who received instructions from our Pundits in Grammar and Literature, passed examinations in these branches and obtained prizes.

8. The reason why I recommend the exclusion of the other orders of Shudras at present, is that they, as a body, are wanting in respectability and stand lower in the scale of social considerations' their admission, therefore, would I fear, prejudice the interests of the Institution.

9. In conclusion, I beg leave to submit the opinion of the Principal Professors of the College on the subject in original with its English translation from which it will be seen that they are averse to this innovation.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant.

ESHWAR CHANDRA SARMA

সংস্কৃত কলেজের প্রধান পণ্ডিতগণ অর্থাৎ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরত শিরোমণি ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ শূদ্র ভর্তির বিরোধিতা করলেন। তাঁদের মূল মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

পণ্ডিতদের মত

“শূদ্রাবিশেষে করণ ইত্যুক্ত করণা পর পর্য্যায়
শূদ্রধর্মিকায়স্থাদিসঙ্করজাতীনাং ব্যাকরণাদি
বেদাঙ্গনামধ্যয়নানুষ্ঠানমত্র পাঠশালিয়ামহচিত মিত্যস্মাকং
মতং মন্যাদিশাস্ত্র বিরুদ্ধত্বাং লোকবিদ্বিষ্টতাত্—
তদর্থমৈবৈতত পাঠশালা স্থাপনা বধো তাদৃশ
ব্যবহারসাদৃষ্টত্বাত্ কাশীস্থ বিদ্যামন্দিরে নবদ্বীপাদি
মহাসমাজপি এতাদৃশ ব্যবহারাভাবাং বেদানামধ্যয়নাদি
নিবেধেন বেদাঙ্গনামধ্যয়ন নিষেধস্তার্থ সিদ্ধত্বাচ্চ

শূদ্রসমানধর্মিকায়স্থ প্রভৃতি সঙ্ঘ জাতিদিগের বেদাদি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন এই পাঠশালায় প্রচলিত হওয়া আমাদেরিগের সম্মত নহে। শূদ্র কর্তৃক বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন মর্মান্বিত নিষিদ্ধ এবং বোধ হয় এই জগত্ই সংস্কৃত পাঠশালার স্থাপনাবধি এ পর্য্যন্ত এখানে এ ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই ও নবদ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজে এবং কাশীস্থ বিদ্যামন্দিরেও এরূপ ব্যবহার নাই।”

পণ্ডিতগণ তাঁদের মন্তব্যের স্বপক্ষে প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়েছিলেন। এখানে তা উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই। তবে বিদ্যাসাগর সেগুলি খণ্ডন না করে অগ্রা যুক্তি দিয়েছিলেন।

এই সংস্কৃত চিঠিটি বিদ্যাসাগর নিজে ইংরেজীতে অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষা কাউন্সিলকে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদের নিদর্শন হিসেবে (অবশ্য এরকম আরো অনেক চিঠি পেয়েছি) এই ইংরেজী (অনুবাদ) চিঠিটি এখানে প্রকাশ করা হল। এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

OPINIONS OF PROFESSORS

We object to allow Kayasthas and other mixed castes, who rank with Shudras to study, in this College, grammar and other Shastras which are allied with the Vedas. The study of the above named Sastras is forbidden by Manu and other Law givers and is contrary to custom. It is probably on this account that from the foundation of the Sanscrit College to the present time this has never been the case, and the practice does not exist at Nuddea and other celebrated Seats of learning, nor in the College at Benares.

AUTHORITY

Manu says “A believer in scripture may receive pure knowledge even from Shudra, a Lesson of the highest virtue even from a Chandala, and a woman bright as a gem, even from the basest family”. The commentator Kulluka Bhatta explains, that by “pure knowledge” is meant the science of charms against poisons and other kinds of knowledge of which the efficacy is evident to the senses. From this it is to be concluded that the Shudra is not privileged to study grammar and the like otherwise he (commentator) would have said grammar and the like”—and the “Science of charms”.

Manu says—A twice born man who not having studied the Veda, applies diligent attention to different study, soon falls even when living to the condition of a Shudra and has descendant after him”. Kulluka Bhatta explains that by a different study “is meant Ethics and the like—By this we learn plainly that Shudras are privileged to study Ethics but not the Sciences intimately connected with the Veda.

Manu says "Let him not give advice to a Shudra, nor what remains from his table ; nor clarified butter of which part has been offered to the Gods, nor let him give spiritual counsel to such a man, nor inform him of the legal expiation for his sin". Kulluka Bhatta explains that 'advice' means temporal advice. By this prohibition of the gift of 'temporal advice' and 'spiritual counsel' to a Sudra the bestowal of instruction in Grammar etc. is prohibited as a matter of course.

Manu says "One who teaches for wages and one who is taught by such a teacher the pupil of a Shudra, and the preceptor of a Shudra and rule speaker and the son of an adulteress born either before or after the death of the husband." Kulluka Bhatta explains that expressions "the pupil of a Shudra and "preceptor of a Sudra" reference is intended to be made to Grammar etc.

Nārada says "A Brahman must never perform the duties of a Shudra nor a Sudra, those of a Brahman. They are respectively sinful for them the highest and the lowest do not suit them.

Manu says "He must never read the Veda with accents and letters well pronounced, nor even in the presence of Shudras nor having begun to read it in the last watch of the night must be though fatigued sleep again." By this prohibition against reading the Veda near a Shudra, a prohibition against his studying is established and consequently a prohibition against his studying the Shudras allied with the Vedas.

Yagnabalka says "even that which is sanctioned by Law must be admitted if it be reprobated by the world and unheavenly.

"A Brahman studying it (the Ramayana) acquires eminent powers of speech, a Kshatriya, royalty, a merchant large profit from trade, and Shudra from hearing it obtains greatness." (Ramayana) from this prohibition against a Sudra studying even the Ramayana, a work unallied with the Vedas established a fortiore.

The great teacher Shri Bullabha in his commentary on the Mugdhobodha says "By introducing the six Syllabled incantation of Shiva commentary with the sacred syllable of Oun, it is intimated (by the author) that woman, Shudras, etc. are not privileged to study the work from its being allied with the Veda."

Joyanarayan Sharma : Bharat Chandra Sharma : Prem Chandra Sharma.

A TRUE COPY

Sd/-ESHWAR CHANDRA SHARMA.

শিক্ষা কাউন্সিল বিদ্যাসাগরের যুক্তি সমর্থন করে বললেন—

“Ordered that the Council concurred in the recommendations of the Principal and Sanction the admission of Kayasthas trusting that the Principal will exercise greatest care and discrimination in admitting none who are not of respectable family and position.” (Council of Education Proceeding dated 9. 7. 1851 No X.)

বিদ্যাসাগর তাঁর কলেজের বাৎসরিক রিপোর্ট-এ বলেছেন যে কলেজে স্থানভাব বশত এই আদেশ সময়মত কার্যকর করা যায়নি। এ কথা ঠিক নয়। ১৮৫২ খৃঃ নতুন ক্লাশ না বাড়িয়েই বিদ্যাসাগর ৪ জন কায়স্থ ছাত্রকে ভর্তি করেছেন। এরা হলেন (১) মাধবচন্দ্র ঘোষ (১৬৭২) (২) যদুনাথ বসু (নং ১৬৮৬) (৩) উদয়কৃষ্ণ দত্ত (নং ১৬৫৭) এবং (৪) সুবলচন্দ্র বোস। আসল কথা গোঁড়া পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরকে বাধা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিটমাট করতে কিছুটা সময় কেটে যায়।

১৮৫৪ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর শিক্ষা কাউন্সিলকে জানানলেন যে সর্বশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের জন্যে সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলে দেয়ার এখন সময় এসেছে।

এ বিষয়ে তাঁর ১০২২ নং চিঠিটি এখানে প্রকাশ করা হ'ল।

From : The Principal Sanscrit College.

To

The Secretary, Council of Education.

Fort William 23rd Nov. 1854.

Sir,

I have the honour to request the favour of your moving the Council to order the admission of boys of all respectable classes of Hindoos in the Sanscrit College. Formerly only the classes, namely Brahmins and Vaidays were allowed to be admitted. In 1851 the Council ordered the admission of Kayasthas also, I beg leave to inform the Council that in my humble opinion the time has arrived for opening the Sanscrit College for all respectable class of Hindoos.

I have etc.

ESHWAR CHANDRA SHARMA.

শিক্ষা কাউন্সিল ১৮৫৪ খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বর এক অস্থমোদন করে বললেন. “Ordered that the Council of Education Sanction the proposition of opening the Sanscrit College to respectable classes of Hindus.”

এ সংবাদ তখনকারদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে শ্রীমাচরণ সেন নামে এক সম্ভ্রান্ত সোনার বেনে তাঁর ছেলেকে ভর্তি করতে এলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি গিয়ে সোজা শিক্ষা অধিকর্তার (তখন শিক্ষা কাউন্সিল উঠে গিয়ে ডি, পি, আই এসেছেন) কাছে এক লিখিত আবেদন করলেন। শিক্ষা অধিকর্তা গর্ভন ইয়ং সাহেব সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য জানতে চাইলেন।

উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন যে সোনার বেনেদের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য নয়। তিনি বললেন হিন্দুদের বর্ণের স্বচীতে এদের স্থান অনেক নীচুতে। তাই এদের ভর্তি করাও সম্ভব হবে না। আর যদি ভর্তি করা হয় তবে গোড়া পণ্ডিতরা এতে ব্যথিত হবেন এবং শিক্ষায়তনের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। পরিশেষে বিদ্যাসাগর বললেন যে এ বিষয়ে তাঁর পক্ষে যতটা সুবিধে দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া হয়েছে এবং আর কিছু করা সম্ভব নয় বলে তিনি দুঃখিত।

তবে ১৮৫৪ সালে এই আদেশটি বিদ্যাসাগর নিলেন কেন? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়স্থের পর কাদের ভর্তি করবেন? এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কোন কাগজপত্র পাইনি। তবে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা অধিকর্তার লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে বিদ্যাসাগর নবগাথ (অর্থাৎ জনচল) দের ভর্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগরের সময় সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের হিন্দু সেখানে পড়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগরের এই চিঠিটি নিয়ে দেওয়া হল—

No 1100

From

The Principal Sanscrit College

To G. Gardan young Esq, Director of Public Instruction

Dated Fort William, the 21st Nov 1855

Sir,

With reference to the Memorial of Baboo Shamacharan Sen forwarded for report under your endorsement No 1289 dated 15 Aug last, I have the honor to remark that up to year 1851 the admissions to the Sanscrit College, were confined to Hindoos of the Bramin and Baidya Cast only. When under order of the late council of Education the privilege of studying in that institution was extended to the Kayasthas the most respectable caste among the Sudras. In the year 1854 this privilege was further extended to all the respectable castes of Hindoos under further orders.

But these orders I regret cannot apply to the people of the caste to which the memorialist belongs nor would it in my humble opinion be expedient at present to admit applicants of that class. It is true that some families of Sonar Baniya of Calcutta are a popular men but in the scale of castes the class stands very low. Admission from that class will I am sure not only shock the prejudice of the

orthodox Puddits of the Institution but materially injure to its popularity as well as respectability. Personally I have always been opposed to the exclusive system as will appear from my former reports to the late Council on the subject of admitting applicants of other castes than Bramans and Baidyas, I would have been glad to admit the son of the memorialist. The greatest latitude that expediency would allow has I belive already been given and I regret that I can not recommend any further extension under present circumstances,

The papers received under your endorsment are herewith returned as required.

I have etc.

ESHWAR CHANDRA SHARMA.

এরপর শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ক্রমাগত আবেদনপত্র আসতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা অধিকর্তা অ্যাটকিনসন সাহেব এই মার্চ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের উপর আদেশ করেন যে এখন থেকে জাতের বিচার না করে সম্ভ্রান্ত যে কোন হিন্দু পরিবারের সম্ভ্রান্তকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হবে। এই আদেশের পাঁচ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। আদেশটি ছোটলাট পরে অনুমোদনও করেন। শিক্ষা অধিকর্তার অপ্রকাশিত এই ঐতিহাসিক হুকুমনামাটি এখানে ছাপা হল।

No. 820

From : W. S. Atkinson,

Director of Public Instruction.

To

E. B. Cowell,

Principal of the Sanskrit College.

Calcutta the 5th March, 1863.

Sir

Complaints have reached me that many pupils of high respectability, who are anxious to send their sons to be educated in the Sanskrit College, are debarred from doing so in consequence of the regulation by which admission is at present restricted to particular castes.

2. It is impossible to regard such complaints with indifference since they are the offspring of a real haedship which with the advance of enlightenment, will naturally be more and more desented as an odious and offensive grievance.

3. There can be no doubt that the time is now ripe for swaping away

exclusive barriers of the description, and I accordingly have to direct that in future the doors of the College shall be open indifferently to the sons of all Hindu families who occupy a respectable position in society irrespective of the caste to which they belong.

4. You will be glad as to notify this order in the College for general information.

I have etc.

W. S. ATKINSON

(No. 82, Proceedings Edn 1863, April page 42)

এই প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে জাত মানতেন না ঠিকই। কিন্তু সকল জাতের হিন্দুদের তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়বার অধিকার দিলেন না। সেখানে দেখালেন সমাজ ও গোঁড়া পণ্ডিতদের। কলকাতা নর্মান স্কুলটি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সেখানে পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সেখানেও তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার দিলেন না। তাঁর নিজের ভাষায় "Those of the lower castes are excluded for the present"। এখানে তাদের প্রবেশাধিকার দিতে ত কোন শাস্ত্রীয় বাধা ছিল না। তারপর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সরকার যখন সারা দেশে 'গণশিক্ষা' প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন বিদ্যাসাগর তাতে বাধা দিয়ে বললেন শ্রমিক শ্রেণীর ছেলেপিলেদের এখন লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ নেই। কারণ লেখাপড়া তাদের কোন কাজে আসে না। তাই তিনি বললেন "At the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale." আপাতত, দৃষ্টিতে মনে হয় বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া আর কেউ শিক্ষিত হোক তা চাইতেন না। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। বিদ্যাসাগর চাইতেন সকলেই শিক্ষিত হোক কিন্তু দেশের সে সময়কার অবস্থায় তাঁর মতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের লেখাপড়া শেখবার সময় আসেনি। অর্থাৎ শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে তিনি দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে বলেছিলেন। তাঁর এই বাধা সৃষ্টির মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জাত ব্যবসা আছে। লেখাপড়া শিখে তাদের আর্দ্র জীবিকার কোন স্ববিধে হবে না, আর তারা এ বিষয়ে আগ্রহীও নয়। উচ্চ তিন বর্ণের লেখাপড়া ছাড়া গতাস্তর ছিল না। তাদের চাকরী করে থেতে হবে। তাই বিদ্যাসাগর লেখাপড়া এই তিন বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন অন্তত যতদিন পর্যন্ত না পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। বিদ্যাসাগর যখন এইধরনের অভিমত পোষণ করতেন তার ১০১৫ বছর পরে নিজের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে সংস্কৃত পড়বার জন্য একজন অব্রাহ্মণকে নিয়োগ করে নিজের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ড

চন্দ্রদূত (বাল্যরচনা—পুস্তক: অপ্রঃ) ॥ প্রথম প্রকাশ—‘সংবাদপ্রভাকর’, ৩০ মার্চ, ১৮৫৩।
প্রথম ছত্র—

“দ্বিধাম যামিনী যায়, আ মরি কি শোভা তায়,
নিরখি নির্মল নদীতীরে।”

মেঘদূতের মত কবি এখানে চন্দ্রকে দূত করে প্রেয়সীর কাছে বার্তা পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন। কবিতাটির প্রথমেই চন্দ্রালোকিত রজনীর ‘সুন্দর বর্ণনা’ আছে। সেই রজনীতে এক বিরহব্যাপ্তার যুবক বসে আছে। যুবকটি—

“নিরখি নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপরি,
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়।
আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি,
পার যেতে ত্রিভুবনময় ॥
তাই বলি শশধর, আমার বচন ধর,
যাও সেই মোহিনীর কাছে।
যার তরে আশা পথে, আরোহিয়া মনোরথে,
আগে মোর পেরাণ গিয়াছে ॥”

তারপর পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে যুবক চন্দ্রকে সম্বোধন করে আরো অনেক কথা বলেছে।
চন্দ্রালোকে (কমঃ দপ্তর ৬ষ্ঠ সংখ্যা) ॥

এটি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনা নয়; বঙ্কিমভাবধারার লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা। রচনাটি প্রথমে ১২৮০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হয়। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’র প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এটি গ্রহণ করতেননি। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এটি অল্প কোথাও প্রকাশ না করায় বঙ্কিম দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে লেখকের মনে যে উচ্ছ্বাস এবং চিন্তার জাগরণ হয়েছে তাই-ই প্রকাশ করেছেন রচনাটিতে। চন্দ্রালোকিত রজনীতে প্রাচীন কাব্যের নায়িকাদের অভিনায়ের কথা আছে। কিন্তু কমলাকান্তের ভাগ্যে এ পর্যন্ত একটিও অভিনায়িনী জুটল না। বর্তমানে বিয়ের বাজারে আবার বি, এ পাশ নাহলে চলে না। কমলাকান্তের বিয়ে হয় নাই। অগত্যা সে চন্দ্রকেই বিবাহ করতে চায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কমলাকান্তের মনে পড়ে গেল—চন্দ্র পুরুষ, অবশ্য ইংরাজীতে স্ত্রী। তখন কমলাকান্ত ভেবেছে—জগতে অনেক পুরুষই স্ত্রীলোকের মত কাজ করে, আবার অনেক স্ত্রীলোকই পুরুষের মত শক্তিশালী। অতএব কমলাকান্ত শেষপর্যন্ত চন্দ্রকে স্ত্রীরূপেই গ্রহণ করতে প্রয়াসী হয়েছে।

রচনাটিতে অক্ষয় সরকার বঙ্কিমের কমলাকান্তী চিন্তাধারার সংগে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছেন। অনেকটা সফলও হয়েছেন বলতে পারি। তবে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কিছু পার্থক্য দেখা যাবে। প্রথমতঃ রচনাটিতে দীর্ঘ বিশ্লেষণযুক্ত বাক্য স্থানালাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে সরল অথচ গভীর অর্থপূর্ণ বাক্যই রচনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ রচনাটিতে তথ্যের বাহুল্য লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরে এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

তৃতীয়তঃ, লেখক রচনাটিতে কোথাও কোথাও হাস্তরস আনয়ন করার চেষ্টা করলেও সফল হননি।

তবে রচনাটিতে যেখানে ‘হি’ ও ‘সি’ পার্থক্যে কিছু কিছু এদেশীয় কাপুরুষ রাজ-রাজাদের কথা আছে সেখানে বঙ্কিমের মতই দেশাভিমান প্রকাশিত হয়েছে।

রচনাটির অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য পীড়াদায়ক।

চিত্তরঞ্জণী বৃত্তি (ধর্মঃ/২৭ পরিঃ) ॥

মানুষের বিভিন্ন কার্যকারিণী বৃত্তির মধ্যে চিত্তরঞ্জণী বৃত্তি একটি। এখানে সেই চিত্তরঞ্জণী বৃত্তির অলুশীলন ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে চিত্তরঞ্জণী বৃত্তির পরিচয় আছে। ‘চিত্তবিভা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত এ সকল চিত্তরঞ্জণী বৃত্তির স্মৃতি ও তৃপ্তিবিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জণী বৃত্তির অলুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়।’ কিন্তু আমাদের দেশে এই চিত্তরঞ্জণী বৃত্তির সঠিক ব্যবহার করা হয় না। যেমন রাধা-কৃষ্ণলীলার অনেক অপব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

চিত্তশুদ্ধি (বিবিধপ্রবন্ধ/২য় ভাগ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—‘প্রচার’, ১২২২, ফাল্গুন। চিত্তশুদ্ধিকে হিন্দুধর্ম তথা সকল ধর্মের সার ধরে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ হল ইন্দ্রিয়সংযম। অরণ্যে বসে ইন্দ্রিয়সংযম করলে হবে না। ভোগের মাঝে বসেই নিরাসক্ত জীবন-যাপন করাই শ্রেষ্ঠ সংযম। আবার শুধু ইন্দ্রিয়সংযম করলেই চলবে না। আমি ভাল থাকব এই বাসনাও ত্যাগ করা দরকার। তারপর থাকা দরকার ঈশ্বরে ভক্তি। এই সমস্ত আলোচনার মর্ম এই—“চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থান তাৎপর্য্য হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার স্থল তাৎপর্য্য মনুষ্যে প্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্তশুদ্ধির স্থল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মকথা।” তারপর বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং রামনারায়ণ বিচারতত্ত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর আলোচনার ভিত্তিকে দৃঢ় করেছেন।

রচনাটিতে নিছক ধর্মতত্ত্ব আলোচিত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল মানবপ্রেমের ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে।

চৈতন্যবাদ (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম) ॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ ৩৭৪-৮৩

চৈতন্যবাদ বলতে এখানে মানুষের চৈতন্যের জন্ম কিভাবে হল, সে কথা বলা হয়েছে। আদিম

অধিবাসীদের মধ্যে কিভাবে আস্তে আস্তে দেবতার ধারণা জন্মাল—সেই অহুমানের উপর ভিত্তি করে, সর্বস্বত্বের মাল্লখের মধ্যে দেবতার উদ্ভব আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর যে সমস্ত শক্তির প্রতি ভীতি বা ভালবাসা ছিল মাল্লখের, সেগুলিকে তারা দেবতার মর্যাদা দিয়েছে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (পুস্তক: অপ্রঃ) ॥ প্রঃ প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, শ্রাবণ ১২৮০, পৃঃ ১৪৫-৪৮।

যে সমস্ত পাশ্চাত্য মণীষী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁদের অন্যতম। তাই ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শনে’ তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। মিলের মতবাদ ও কোমৎ-এর সংগে তার পার্থক্যের কিছু উল্লেখও আছে। মিলের সংগে ভারতবাসীর সম্পর্কের গভীরতার আরো একটি কারণ বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন—“যৎকালে ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানি এবং পরিশেষে চিঠিপত্র পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। কোর্ট অব ডাইরেকটর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে, ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্য্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের Lfberly নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে মহারাণীর কর্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হইবার সময় মিলকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর হইতে অহরোধ করা হয়। কিন্তু ঐ নূতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযৌক্তিক বলিয়া তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে, মহারাণীকে এই কার্য্য হইতে, ক্ষান্ত করিবার জন্ত এক আবেদন করা হয়। কথিত আছে যে, মিল তাহার রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষের জায় রাজ্য পার্লামেন্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহার ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক।

জরাসন্ধ (কৃঃ চঃ ৩য় খণ্ড/৩য় পরিঃ) ॥

জরাসন্ধ নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকে কৃষ্ণ কি কৌশলে পরাভূত করলেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাটির মূল অংশটি তিনি মৌলিক বলেই স্বীকার করেছেন। তবে জরাসন্ধ কৃষ্ণরাজ্য আঠারো বার আক্রমণ করেছিলেন এ সত্য তিনি মানেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে যেভাবে জরাসন্ধকে বধ করেছেন তা তাঁর রণকৌশলেরই পরিচায়ক।

জরাসন্ধবধের পরামর্শ (কৃঃ চঃ ৪র্থ খণ্ড/৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥

যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞের কথা চিন্তা করলে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, যে এখন জরাসন্ধই সম্রাট। সম্রাট না হলে কেউ রাজস্বয় যজ্ঞের অধিকারী হতে পারেন না। অতএব আগে জরাসন্ধকে বধ করতে হবে। অনেকে বলেন এটি কৃষ্ণের একটি চাতুরী, নিজ শত্রুকে অস্ত্রের দ্বারা নিধন করতে চান। কৃষ্ণ বহু সৈন্যক্ষয় না করে জরাসন্ধ বধের কৌশলও আবিষ্কার করলেন। ভীমার্জুনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জরাসন্ধকে হঠাৎ আক্রমণ করে বধ করলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই আকস্মিক আক্রমণের কথা অস্বীকার করেন। কারণ তাহলে কৃষ্ণচরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁর মতে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে

প্রস্তুত হবার সময় দিয়েই বৈরথযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জলে ফুল (গত পত্র বা কবিতাপুস্তক)॥

কানন হতে ছেঁড়া একটি শ্রোতে ভাসা ফুল দেখে কবির হৃদয়ে জেগে উঠেছে বেদনা। তিনি যেন তার মধ্যে নিজের আশাহত জীবনের স্বর শুনতে পেয়েছেন।—

“কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে!

কাল শ্রোতে তোর (ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,

কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে?

ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে!

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।

বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি শ্রোতে পড়ে,

আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।

তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।’

কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,

অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।

চল যাই ছুই জনে অনন্ত উদ্দেশে।”

বঙ্কিমের রচনায় ব্যক্তিগত স্বর খুব কমই ধ্বনিত। এখানে সেই ব্যক্তিগত স্বরের কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে বলে কবিতাটি স্মরণীয়।

কবিতাটির প্রথম প্রকাশ—‘ভ্রমর’, বৈশাখ ১২৮১, পৃঃ ২৮-২৯।

জয়দ্রথবধ (কৃঃ চঃ ৬/২)

অর্জুনকর্তৃক জয়দ্রথবধের ব্যাপারটি নিয়ে একটি আঘাতে গল্প প্রচলিত আছে। সেটি এই—অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অভিমুখ্যহত্যাকারী জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের পূর্বে হত্যা করতে না পারলে নিজে অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন করবেন। কৃষ্ণ কোশলে মায়ার দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদিত করলেন। রাত্রি হয়েছে ভেবে জয়দ্রথ ব্যুহ থেকে বেরিয়ে এলে নাকি অর্জুন তাঁকে হত্যা করলেন। এ ঘটনা বিশ্বাস্য নয়। কারণ দেখা যায় অর্জুন নিজ বাহুবলেই অন্যান্য বীরদের পরাস্ত করে, ব্যুহ ভেদ করে, জয়দ্রথকে পরাভূত করলেন। কৃষ্ণের এখানে বিশেষ প্রয়োজন হয়নি।

জাতিবৈর (পুস্তকঃ অপ্রঃ) ॥ প্রঃ প্রকাশ—‘সাধারণী’, ১১ কাঙিক ১২৮০।

এদেশে প্রচারিত ইংরেজী সংবাদপত্রে এদেশীয়দের নিন্দা এবং দেশীয় সংবাদপত্রে ইংরেজদের নিন্দা প্রকাশ পেত। একেই জাতিবৈর বলা হয়েছে। এই জাতিবৈরের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইংরেজ জাতি আমাদের চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাই আমরা যদি জাতিবৈরীভাবশতঃ তাদের সংগে প্রতিযোগিতা করে বড় হতে চাই তাহলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল। তবে এই জাতিবৈর যদি বিধেবে

পরিণত হয় তাহলেই মুশ্কিল।

জ্ঞান (বিবিধ প্রবন্ধ/১ম ভাগ) ॥ প্রথম প্রকাশ—‘প্রচার’, কার্তিক ১২৯৩।

‘জ্ঞান’ প্রবন্ধটিতে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে লেখক ‘ভারতবর্ষের দর্শন কাহাকে বলে?’ আলোচনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য ‘ফিলসফি’র সংগে পার্থক্যটি সংক্ষেপে নির্দেশ করেছেন।

পাশ্চাত্যদর্শন মূলতঃ প্রত্যক্ষবাদকে কেন্দ্র করে গঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে প্রত্যক্ষবাদের সংগে ভারতীয়দর্শনের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি পাদটীকায় লিখেছেন—“অনেকে কোমতের “Positive philosophy” নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুসারে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে “Empirical philosophy” বলে, অর্থাৎ লব্ধ, হ্রস্ব, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।”

হর্বাট স্পেন্সরের প্রত্যক্ষবাদী আলোচনা এতই মনোগ্রাহী যে পাশ্চাত্যদেশে তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে তারই প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষীয় দর্শন—জ্ঞানের বিবিধ উপায় আবিষ্কার করেছে। প্রত্যক্ষ দর্শনে যে জ্ঞান জন্মে তা নয়। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অহুভূত যে জ্ঞান তাকেও আমরা বিশ্বাস করি। একজন মানুষ সবকিছু নিজে দেখতে পারে না। তাই তাদের পূর্বসূরীদের কথা মানতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিদের কথাও তাই অমার্গ করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—“আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিকতবে, প্রাচীন আর্ঘ্যগণ কর্তৃক সৃষ্টিত হয় নাই, এমত তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারায় কোমৎ-মিল প্রভৃতির প্রভাব অতিরিক্ত বলে মনে করেন, তাঁরা এই প্রবন্ধটি থেকে বুঝতে পারবেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা স্বাধীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগৎ থেকেই উদ্ভূত।

জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত (পুস্তক: অপ্রকাশিত) ॥ প্রঃ প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’ ফাস্তন ১২৮১, পৃঃ ৪৮৭-৮৮।

এটি—“তায় পদার্থ তত্ত্ব। বাঙ্গলা দর্শন। শ্রীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকতা। গিরিশ বিহারদ্র যন্ত্র।” গ্রন্থের সমালোচনা। সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র ছায়শাস্ত্রে বাঙালী দার্শনিকদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞানার্জ্জুনী বৃত্তি (ধর্মঃ/৯ম অধ্যায়) ॥

এখানে জ্ঞানার্জ্জুনী বৃত্তির অল্পশীলনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ জ্ঞান না থাকলে অল্প কোন বৃত্তির সম্যক অল্পশীলন করা যায় না। ‘জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না।’ অবশ্য জ্ঞান বলতে কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে শিক্ষা নয়, লোকশিক্ষাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আধুনিক, অর্থাৎ ইংরাজপ্রবর্তিত, শিক্ষাপ্রণালীর তিনটি গুরুতর দোষের কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ, শুধু নীরস তথ্যের

শিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ সকলকে সর্ববিষয়ে সুপণ্ডিত করে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, তৃতীয়তঃ, মুখস্ত বিদ্যার প্রতি মর্যাদা দিয়ে বৃত্তি ক্ষুরণের প্রতি অমনোযোগ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্রণালীর যে দোষত্রুটির উল্লেখ করেছেন, এখানে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

জীবন সৌন্দর্য অনিত্য (বাল্যরচনা/পুঃ অপ্রঃ) ॥ প্রঃ ছত্রঃ—“যামিনী যামেক যায়, সেবিতে শীতল যায়”। প্রথম প্রকাশ—‘সংবাদপ্রভাকর’ ২৮ মে ১৮৫২।

চৌপদীতে রচিত এই দীর্ঘ কবিতাটির প্রথমে গগনে শোভিত চন্দ্র ও তারকার সৌন্দর্যদর্শনে কবি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটি তারা খমার দৃশ্য দেখে তাঁর মনে সৌন্দর্যের অনিত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। তাই তার মনে হল—

“কিন্তু তো তাহারি সম, জীবন যৌবন মম,
তবে কেন তারতম, মিছামিছি করি হে।
যৌবন লাভণ্য নিয়ে, তোমার হইয়ে প্রিয়ে,
আজি আছি বিনাশিয়ে, কাল যাব মরি হে ॥”

এখানে নামের জায়গায় আছে—‘শ্রী ব, চ, চ। হুগলি কলেজ।, জৈবনিক (বিজ্ঞানরহস্য) ॥ প্রঃ প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, কার্তিক ১২৮০।

আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চভূতের কথা আছে। এই পঞ্চভূত হল—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম। মানবজীবনের সংগে এই পঞ্চভূতের সম্পর্ক আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাঁরা জীবদেহ গঠনে বিভিন্ন মিশ্রণের কথা স্বীকার করেন।

“জলজান, অগ্নিজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে; অগ্নিজানাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটি আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবনমাত্রেরই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীবন শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদও জীব; কেন না, তাহাদিগের জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।”

শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের এই জৈবনিক বস্তুটিই, আমাদের দেশের পঞ্চভূতের সমন্বয়। ভারতীয় দর্শনকে এভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংগে মিলিয়ে দেওয়ার কৌশল বঙ্কিমের আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

টেকি (কঃ দঃ/চতুর্দশ সংখ্যা)।

“টেকি” রচনাটি ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে” প্রথম প্রকাশিত হয়। “কমলাকান্ত” নামক গ্রন্থের ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে নিবন্ধটি স্থান পায়।

‘টেকি’ রচনাটিতে আমাদের দেশীয় ধানভানার যন্ত্র টেকিকে কেন্দ্র করে কমলাকান্ত অত্যন্ত লঘুভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বিচরণ করেছে। প্রথমে কমলাকান্ত চিন্তা করেছে, টেকি না থাকলে এ

পৃথিবীতে মানুষের কি দুর্দশাই না হত। তাহলে হয়ত কমলাকান্তকেও গরুর মত চালের অভাবে খান চিবিয়েই খেতে হত। তারপর কমলাকান্ত ঢেঁকি দেখতে গিয়ে দেখল, তার একমাত্র কাজ হল খানায় পড়া। খানায় পড়ার অভিজ্ঞতা কমলাকান্তের অত্যন্ত নিদারুণ। একদিন সে গোরুর তাড়া খেয়ে খানায় পড়ে গোজাতির নিমূল হবার কথা কামনা করেছিল।

তারপর কমলাকান্তের দিব্যচক্ষুর উদয় হয়েছে। ঢেঁকির পিছনে যে দুজন রমণীর চরণ রয়েছে তারাই ঢেঁকির বলের উৎস। সংসারে বিভিন্নপ্রকারের ঢেঁকি আছে। জমিদার ঢেঁকি প্রজাদের হুংপিণ্ড পেবে; আইনজ্ঞ ঢেঁকিরপেবে আইন বের হয়, লেখক ঢেঁকি সরস্বতীর মাথা গিবে স্কলবুক বের করে। সর্বোপরি কমলাকান্ত ঢেঁকি স্বর্গে ধান ভানতে গিয়ে ‘অষ্টরজ্জা’ লাভ করেছে।

রচনাটির মধ্যে অত্যন্ত শৈথিল্য ও ক্লাস্তির ছাপ আছে। বিষয়ের মধ্যে কোন তীব্রতা নেই। নিতান্ত সাধারণ ভাবেই হাক্কা রসিকতা করা হয়েছে তাও বুদ্ধিদীপ্তিতে উজ্জ্বল নয়।

ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে (বিবিধপ্রবন্ধ—২য় ভাগ)।

প্রবন্ধটি “মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম” নামে ১২৮২ সালের বৈশাখ সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মিল ও ডারউইনের মতবাদ আলোচনা করেছেন। মিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তার শক্তির সীমায় বিশ্বাস করেন। ডারউইনের মতে বিবর্তনের ফলেই সৃষ্টির বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেবের তিনশক্তি সৃষ্টি-পালন এবং লয়কে রূপক হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন যে “মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খৃষ্টধর্মোপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে!”

এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের “প্রবন্ধ পুস্তকে” ‘হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই নৈসর্গিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু পূর্বকালে এই ভিত্তি যে আকারে আর্ধ্যগণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমরা তাহা আর খুঁজিয়া পাইব না। তাঁহারা কি প্রকারে চিন্তা করিতেন, কি প্রশ্নালীতে বিচার করিতেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাঁহারা হয়ত তাহা কেবল আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না—গেলে কিছু বুঝিতে পারিব না—কিছু বুঝাইতে পারিব না। এখন কোন তত্ত্বের নৈসর্গিক ভিত্তি বুঝাইতে গেলে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হইবে। নহিলে ঊনবিংশ—শতাব্দীতে কেহ বুঝিবে না। আমরা এ বিচারে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ডার্বিন আমাদের পথ দেখাইয়া দিবেন।”

এ ছাড়া আরও ছোটখাট কিছু কিছু পরিবর্তন ছিল।

দীনবন্ধু শতবার্ষিকী

যে-সমস্ত বিদেশী ভারতসাধক এদেশের কল্যাণের জন্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার্লস ফ্রিয়ার এ্যাণ্ডরুজ, যিনি এদেশে 'দীনবন্ধু' নামে খ্যাত, তিনি অন্যতম। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের নিউক্যামেল-অন-টাইন শহরে এ্যাণ্ডরুজের জন্ম। পিতা জন এডুইন এ্যাণ্ডরুজ ছিলেন ধর্মযাজক। এ্যাণ্ডরুজের বাল্য ও কৈশোরের ছাত্রজীবন বার্মিংহামে অতিবাহিত হয়। তিনি লেখাপড়ায় খুব ভাল ছেলে ছিলেন। খেলাধুলা, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কনেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

উনিশবছর বয়সে তাঁর স্কুলজীবনের সমাপ্তিকালে তাঁর জীবনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় চিন্তা এবং ধর্মভাব প্রবল আকার ধারণ করে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে তিনি সেখানে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মন বসল না, তিনি বৃহত্তর জগতের দিকে পা বাড়ালেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ এ্যাণ্ডরুজ ভারতে পদার্পণ করলেন। এই দিনটিকে তিনি বলতেন এ তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন। নিছক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মিশনারীরূপে তিনি ভারতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্তে।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এ্যাণ্ডরুজ প্রথম বোলপুরে আসেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব বলে স্বীকার করেন, এবং তারপর থেকে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন কাজের সংগে নিজেকে যুক্ত রাখেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেন কলেজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের সেবার জন্ত তিনি গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভারতবাসী পৌছান এবং গান্ধীজীর সংগে পরিচিত হন। সেখানে প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের উপর খেতান্দেবের অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ফিজি যাত্রা করেন। সেখানে ভারতীয় সমাজের স্বাস্থ্য—শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির বিভিন্ন কাজের সূচনা করেন। ফিজিবাসী ভারতীয়রাই তাঁকে প্রথম 'দীনবন্ধু' আখ্যা দেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনিভাতে যান আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা পরিদর্শনের জন্ত। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাঁকে সভাপতি পদে বৃত্ত করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হংকং ও মালয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার শ্রমিক কল্যাণের জন্তে।

এ্যাণ্ডরুজ ছিলেন মানবতাবাদী। তাই তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বদাই প্রতিবাদ জা নিয়েছেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এ্যাণ্ডরুজ কলকাতায় দেহরক্ষা করেন।

দীনবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী বছরে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণে ব্রতী হন, তার মধ্যে 'দীনবন্ধু এ্যাণ্ডরুজ শতবার্ষিকী কমিটি' অন্যতম।

এই কমিটির পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে অগ্রতম হল— (ক) ১৯৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশ। (খ) বর্ষব্যাপী ভারতের সর্বত্র দীনবন্ধু এ্যাণ্ডরুজ স্মরণ সভা আয়োজনের জন্ত বিদ্যালয়, কলেজ ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকে অহরোধ জ্ঞাপন। (গ) ইংরাজিতে দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ। (ঘ) বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর জন্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। (ঙ) যে সমস্ত বিদেশী ভারতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের ছবি ও গ্রন্থ ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন। দীনবন্ধু স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অহরোধ জ্ঞাপন।

এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণে কমিটি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তারমধ্যে হাওড়া, শ্রীরামপুর ও কলকাতায় কয়েকটি সভা ও আলোচনাচক্র অগ্রতম। মূল অহুষ্ঠান হয় ১২ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার। ঐদিন সকালে ৮টায় কমিটির অফিস ৪নং এলগিন রোড থেকে দুইশতাধিক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের এক মিছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ দীনবন্ধুর সমাধিস্থলে যাত্রা করে। বৈতানিকের রবীন্দ্রসংগীতে মিছিলটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমাধিস্থলে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ভাষণে যে মাটিতে দীনবন্ধু শয়ান রয়েছেন সেই মাটি পরম পবিত্র বলে উল্লেখ করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে এক অহুষ্ঠান হয়। অহুষ্ঠানে কমিটির সভাপতি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—দীনবন্ধুর মত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা নিজেরাই ধৃত হয়েছি। অহুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ করে তাঁর সংগে দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা বলেন এবং মানুষ দীনবন্ধুর স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে কাকাসাহেব কালেলকার বলেন—তিনি শুধু দীনবন্ধুই ছিলেন না, ছিলেন সর্ববন্ধু। কি মানুষ, কি পশু সকলের প্রতি ছিল তাঁর অসীম দরদ। সভাপতি আচার্য জে. বি. রূপালনী তাঁর উদাত্ত ভাষণে বলেন—বর্তমান বাংলায় যে মহামানব অবমাননার হুকুম পড়েছে, তাতে কি দীনবন্ধুর ত্যাগের আদর্শ কোন প্রেরণা যোগাতে পারবে? কমিটির সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বহু রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরির প্রেরিত ভাষণটি পাঠ করেন।

কলকাতায় সেন্টপল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের প্যারিস হলেও ঐদিন এক অহুষ্ঠান হয়। অহুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। সভাপতি ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সভায় অগ্রাগ্র বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি এস. এ. মাহমুদ প্রভৃতি।

শান্তিনিকেতনেও শতবার্ষিকী অহুষ্ঠান পালিত হয়। কিছুদিন পূর্বে এখানে রবীন্দ্রসদনে দীনবন্ধু সম্পর্কিত এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ছটায় শ্রীশিক্ষায়তনে এক অহুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রীমতীতারাম সাকসেরিয়া ও শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও অধ্যক্ষ পি. কে. গুহ।

দীনবন্ধু এ্যাণ্ডরুজ শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ১। 1919 oppression in the Punjab and C. F. Andrews. ২। Gandhiji on C. F. Andrews. ৩। Bunch of Letters. ৪। Index of Andrews. Writings. ৫। ধর্মপথের পথিক।

সব্যসাচী গুপ্ত

বিভাসাগর ॥ সন্তোষকুমার অধিকারী । রূপা গ্রাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২ মূল্য : ছয়টাকা

বিভাসাগরকে নিয়ে বই-লেখা কম হয়েছে, একথা বলতে পারি না। তাঁর সমকালেই তাঁর মহত্ব লোকের অগোচর ছিল না যদিও মহৎ ব্যক্তি মাত্রকেই চিরকাল নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাধা ছিল বলেই তাঁর মহত্ব আরও উজ্জ্বল হয়েছে। বাধা অতিক্রম করাতেই বিভাসাগরের চরিত্রের অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠতা, একাভিপ্রায়, তুর্জয় শক্তি, আদর্শবাদ যেন আরো প্রকট হতে পেরেছিল। এজ্ঞা বিভাসাগরের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বাধা এবং বাধা অতিক্রমণে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ স্বভাবতই মুখ্যস্থান অধিকার করে।

এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে চিন্তার নিরঙ্কুশ মুক্তি তখনও ঘটেনি। বিভাসাগরের কর্ম প্রচেষ্টায় সকলেই যে একবাক্যে স্বীকৃতি জানাবে, এপ্রত্যাশা কেনই বা করব? ঝাঁরা ছিলেন তখন দেশের অগ্রণী নেতা এবং চিন্তানায়ক, তাঁরাও বিভাসাগরের উত্তম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত ছিলেন না। স্থিরভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, দ্বিধামুক্ত না হয়ে হয়তো ভালোই হয়েছিল। সংশয় এবং বিচারের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়েই বিভাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাস্কর রূপ সম্প্রতি সে সব গ্রন্থে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারীর ‘বিভাসাগর’ বইখানি তার মধ্যে বিশিষ্ট। এ বই বিভাসাগরের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়; সে জীবনচরিত লিখেছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, শম্ভুচন্দ্র বিহার্য এবং স্তবলচন্দ্র মিত্র। ইদানীন্তন কালে বৃহৎকায় জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে স্রম্য ভঙ্গিতে, সেগুলি পড়লে লেখকদের বর্ণনা ভঙ্গি মনোহরণ করে, বিভাসাগর মশায় গোণ হয়ে না গেলেও লেখক-পোষিত ধারণা এতই প্রবলভাবে অল্পভূত হয় যে বিভাসাগর উপন্যাসের নায়ক রূপে চমৎকার হলেও ইতিহাসের সত্যতা দৃঢ় হয়ে মনে মুদ্রিত হতে পারে কিনা সন্দেহ।

সেইসব গ্রন্থের তুলনায় সন্তোষবাবুর বইখানি ছোট, কিন্তু লেখকের রচনায় এমন একটি ঋজুতা এবং স্পষ্টতা আছে যে জ্ঞাত এই বইটিকে ইতিহাস-মূর্তি বিভাসাগরের যথার্থ বিবরণরূপে গ্রহণ করতে বাধা থাকে না। আক্ষেপ শুধু এইটুকু থাকে যে এখানে সব ঘটনারই উৎস নির্দেশ করা হয় নি। অবশ্য এর অধিকাংশ ঘটনাই পরিচিত। তবু এতে অপেক্ষাকৃত কম-জানা কিংবা অজানা তথ্যেরও অবতারণা লেখক করেছেন যাতে এই পুরুষসিংহকে সম্পূর্ণ নবরূপে না হলেও চরিত্রগত বিশেষত্ব ভাস্কর করে তোলা হয়েছে।

লেখক বিভাসাগর মহাশয়ের জামাতা স্বর্ষকুমার অধিকারীর পৌত্র। স্বর্ষকুমার ছিলেন মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ, বিভাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন। পরে ভুল-বোঝাবুঝি হওয়ায় স্বর্ষকুমার অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। ভুল অবশ্য বিভাসাগরই বুঝেছিলেন, কিন্তু বিভাসাগরের

অটল মনোভাব কিছুতেই টলল না। এ-ঘটনা তাঁর জীবনে কিছুমাত্র নতুন নয়। গ্রন্থকার বলেছেন, বিদ্যাসাগর বেশিদিন কারও সঙ্গে কাজ করতে পারতেন না, কেননা তিনি নিজের মত ছাড়া অন্তকোনো মতই সহ্য করতেন না। তাঁর স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। বলা কঠিন সর্বক্ষেত্রেই এটা প্রশংসনীয় কি না। কলকাতায় সারস্বত-সমাজ স্থাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—হোমরা-চোমরাদের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না।’ এ-ঘটনা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের। বিদ্যাসাগর তখন অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ, সম্ভবত নিজের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যও তিনি অন্ধ ছিলেন না।

আসলে বিদ্যাসাগরের অল্পভূতি ছিল অতি তীক্ষ্ণ। অসাধারণ পণ্ডিত তিনি কিন্তু পাণ্ডিত্যকে তিনি হৃদয়ের দাসীতে পরিণত করেছিলেন, বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি সম্বন্ধেই এ-কথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকে বলেছেন কাকের বাসায় কোকিলের আবির্ভাব। এ রকম আবির্ভাব সমাজে হয়তো বেশি ঘটে না, কিন্তু এই রকম অল্পভূতিপ্রবণ দুর্জয় পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি পাণ্ডিত্যকে হৃদয়ের দাসত্বে পরিণত করেছিলেন, তিনি ছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের জীবনের ব্রত, যদি সমাজের সংস্কার সাধনে নিয়োজিত হত প্রধানত, তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জীবনাচরণে খুব পার্থক্য থাকত না।

এই সূত্রটিকে মনে রেখেই লেখক সন্তোষকুমার অধিকারী এই মহাপুরুষের চরিত্রালেক্ষ্য রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের কাজের দোষগুণ বিচার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বিস্তৃত সামাজিক পটভূমি সহ বিদ্যাসাগর-জীবনী রচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর চিন্তাধারা নির্ণয়ও তাঁর লক্ষ্য নয়। ‘অজ্ঞেয় পৌরুষ’ ‘শিক্ষাবিপ্লবী’ ‘মেট্রোপলিটান কলেজ’ ‘বিদ্রোহী নায়ক’ ‘নারীর বন্ধু’ ‘সহাজ অধর্মণ’। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ‘রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর’ প্রভৃতি অধ্যায় শিরোনামগুলি লেখকের অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে তোলে। বিদ্যাসাগরের চিরকালীন চরিত্র-মহিমা ছাড়াও তাঁরও কয়েকটি কীর্তির তাৎসাময়িক তাৎপর্যও অসাধারণ। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে। আমরা হিন্দু কলেজের বিপ্লবাত্মক নব্যবাদের ভূমিকায় অভিভূত। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই। সংস্কৃতে এত বড়ো পণ্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। ইংরেজি শিক্ষার এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রয়োজন তিনি অল্পভব করেছিলেন। সে প্রয়োজন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতারাও অল্পভব করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহত্ব এখানেই যে তিনি সাধারণ জনসমাজের কথা ভেবেছিলেন। প্রাচীনকালে সংস্কৃতির সম্পদ নিবদ্ধ থাকত দেবভাষায়, ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। আধুনিককালে ইংরেজি শুধু সরকারি ভাষাই হল না, আধুনিক সংস্কৃতিরও সে-ই হল ভাণ্ডার। বিদ্যাসাগরের যুগেও বলতে গেলে শিক্ষিত বলতে প্রথমে বোঝাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের, তারপর বোঝাত ইংরেজি শিক্ষিতদের। সংস্কৃতির এই রাজমর্যাদা থাকলেও বিদ্যাসাগর ভেবেছেন বাঙালির বাংলা-ভাষার কথা। তাঁর সেই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের পরম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

আমরা মানুষকে শ্রেণীগত না করে ঠিক বুঝতে পারি না বা চাই না। স্বীকার করব এটা

মানবস্বতাব। তথাপি এর ফলে ভুল বোঝাবুঝিও কম হয় না। কিন্তু প্রাণের কোনো ছক থাকে না। প্রাণবান্ বিবেকবান পুরুষ বিভাসাগরকে সব সময় ঠিক মতো বুঝতে পেরেছি, এ কথা বলব না। তাঁর যে-কাজ আমাদের সংস্কারের সম্মতি পায় না, সেই দিকটা সম্বন্ধে আমরা অনেক সময়ে মৌন অবলম্বন করি। ইংরেজি শিক্ষার আবেগে বাংলা ভাষা-মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রচারের উত্তম সম্বন্ধে আমরা নীরব থাকি। আজকের দিনে এদিকটা তেমন উল্লিখিত হতে দেখতে পাই না। তেমনি লেখক বলছেন, 'তাঁর প্রগতির পদক্ষেপগুলিকে সম্মেহে উপেক্ষা করে যারা তাঁকে শুধু বিদ্যাসাগর এবং করুণাসাগর বলে চিহ্নিত করেছেন, তাঁরা যেমন বিদ্যাসাগর চরিত্রকে ভুল বুঝেছেন। তেমনি বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে মানবিকতার বিকাশ না দেখে এবং তাঁর ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাকে না জেনে শুধু বিদ্রোহী সমাজসংস্কারক ও আধুনিক ইংরাজী মনোভাবাপন্ন একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে বর্ণনা করে যারা জীবনী লিখেছেন, তাঁরাও তেমনি ভুল করেছেন।'

রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা চিরকাল অটুট রেখে শেষ জীবনে প্রবলভাবে বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে করুণাময় বা দয়ার সাগর বলে উল্লেখ করার মূলে আছে তাঁর সত্যকার মহত্ব থেকে লোকের মনোযোগকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস। তিনি যে হিন্দুসমাজের 'আচারের দুর্গ'কে আক্রমণ করেছিলেন সেখানেই তাঁর মহত্ব। জানি না বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ কি না। আলোচ্য বইয়ের লেখক তাঁর চরিত্রকে একটি নিরপেক্ষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। বিভাসাগর ধর্ম সম্বন্ধে যেমন প্রচলিত বিশ্বাসের অনুগামী ছিলেন না। তেমনি সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার পালনেও বিদ্রোহী ছিলেন না। এ কালের জনপ্রিয় ফরমুলায় একে উনিশ শতকের 'স্ববিবোধ' বলা হবে হয়তো। তাতে শ্রেণীগত চরিত্র নির্ণয় হয় তো করা চলে, কিন্তু মানুষকে চেনা যায় না। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষকে। স্বত্বের বিষয় সন্তোষকুমার এই প্রসাদ থেকে প্রধানত মুক্ত থেকে ইতিহাস নায়কের ত্রিকালোন্নত মূর্তিটি এঁকে তুলেছেন।

লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত তথ্য-সংগ্রহে তাঁর শ্রম আমাদের চমৎকৃত করে। তিনি তথ্য-সংগ্রাহক মাত্র নন, সন-তারিখ লিপিবদ্ধ করে তাঁর কর্তব্য তিনি শেষ করেননি। তিনি চেষ্টা করেছেন মানুষটিকে ফুটিয়ে তুলতে। সে জন্য তাঁর জীবনীর সব ঘটনারই উল্লেখ তিনি করেন নি। তাঁর লক্ষ্য মানুষটির প্রতি পরিপূর্ণ নিবদ্ধ থাকায় সমসাময়িক ইতিহাস পটভূমিও বিস্তৃত করেন নি। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অনবধানতা ঘটেছে মনে হয়। '১৮১১ সালে লর্ড মিন্টোর শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরী হলো যখন, তখন রামমোহন তাঁর পূর্ণ কর্মোদ্যমে বিরাজিত' (পৃ ৪০)—এ কথা ঠিক নয়। রামমোহন তখন রংপুরে চাকরি করছেন ডিগবির অধীনে। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন করলেন তখন একমাত্র তত্ত্বাবধিনী ছাড়া বাংলাদেশের সব পত্রপত্রিকাই তার বিরোধিতা করেছে লেখক বলছেন। এদের মধ্যে বঙ্গদর্শনকেও লেখক ধরেছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বঙ্গদর্শন-এ বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে কড়া প্রবন্ধ' লিখেছেন। (পৃ ৫৩) বঙ্গদর্শন ১৮৭২-এ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্র। তখনও সংবাদ প্রভাকরে কয়েকটি কবিতা ছাড়া কিছু লেখেননি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দেও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন না। ৫৪ পৃষ্ঠায় লেখক বঙ্কিমের উক্তি বলে যে মর্ম উদ্ধার করেছেন সেটির উৎস

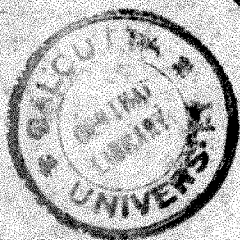
জ্ঞানতে বিশেষ কোঁতুল জন্মে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের প্রতিকূল ছিলেন বলে পরিচিত কিন্তু এ মত প্রচলিত থাকার কারণ সেভাবে পরীক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। 'বিধবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়িকার পরিণতি দেখিয়ে এ মত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারি না। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সামাজিক উপন্যাসে অসবর্ণ বিধবাবিবাহ ঘটিয়েছেন। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অহুজকল্প বন্ধু ছিলেন। তথাপি রমেশচন্দ্র এই উপন্যাসে বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে অতি উৎসাহই দেখিয়েছেন।

নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা ও মমতা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। নারীহৃদয়ের মূল্য নতুন করে উপলব্ধ হয়েছে। সাহিত্যে তার ছায়াপাত হয়েছে। নতুন সমাজ তৈরী হয়ে ওঠাতে এর দান অপরিণীম। কারণ গৃহাশ্রয়ে যে শিশু-তরু বেড়ে ওঠে, সে যার নেবে ছায়াতপ সংগ্রহ করে, তার প্রকৃতি দিয়েই মানবচিত্র গঠিত হয়। কন্যাপোষ পালনীয় শিক্ষণীয়্যতিথ্যতঃ—এই মহাবাক্য তুলে ধরেছিলেন বিদ্যাসাগর। এ জন্ত বিদ্যাসাগরকে আমরা শুধু তৎকালীন কয়েকটা সামাজিক আন্দোলনের নায়করূপে না দেখে বাঙালী সমাজের চিরকালীন নায়ক হিসাবেই দেখব। সেই দেখাতেই সার্থকতা। বিদ্যাসাগর-চরিত্র একটি আশ্চর্য বিস্ময়কর চরিত্র। সে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে কোনো নতুনতর আবিষ্কারেই তার অক্ষয় মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। লেখক সন্তোষকুমার অধিকারী একটি নতুন দলিল আবিষ্কার করেছেন, তাতে তাঁর মহত্ত্বের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

ভবতোষ দত্ত

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত



অষ্টাদশ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৭৭

সমকালীন



মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গোরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ই এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জিলার অন্তর্ভুক্ত পন্দহা গ্রামে মাতুলালয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন পাণ্ডেয় সরযুপারী শ্রেণীর একজন পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, পন্দহার নিকটবর্তী কনৈলা গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। জন্মকালে রাহুলের নাম ছিল কেদারনাথ। উত্তরকালে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া রাহুল সাংকৃত্যায়ন নাম গ্রহণ করেন ও এই নামেই পরিচিত হন। কেদারনাথের পিতা সঙ্কতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার চারিটি পুত্র ও একটি কন্যার মধ্যে কেদারনাথই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। গ্রাম্য পাঠশালায় কেদারনাথ উচ্চ মধ্যপ্রাথমিক ও হিন্দী মধ্যপ্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালেই কেদারনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। ১১ বৎসর বয়সের সময় কেদারনাথের বিবাহ হয়। মাতৃহীন হওয়ার পর কেদারনাথ পুনঃপুনঃ গৃহ হইতে পলায়ন আরম্ভ করেন। নানাস্থান হইতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া তাঁহার পিতা পুনরায় তাঁহাকে বিহ্বলয়ে পাঠাইতেন—এইভাবে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “হিন্দী মিডল” ও “উচ্চ মিডল” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হিন্দী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ারপর তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং জীবিকার জন্ত এক ব্যবসায়ীর ‘গদি’তে কেদারনাথ কার্য করিতে থাকেন, ইতিপূর্বে তিনি আরও একবার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। কিছুকাল কলিকাতা বাসের পর তিনি হিমালয় ভ্রমণ করিতে যান। এই ভ্রমণের সময় তিনি একজন নেপালী পণ্ডিতের সহায়তায় তত্ত্বমতে দেবীপূজার শিক্ষালাভ করেন। হিমালয় ভ্রমণের পর কিছুকাল কাশীতে বাস করিয়া কেদারনাথ—সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কাব্য-ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যাপ্তি লাভ করেন। বারানসী বাসকালে বিহারের সারণ

জিলাবাসী এক বৈষ্ণব সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া কেদারনাথ তাঁহার সহিত তাঁহার মঠে চলিয়া আসেন। এইস্থানে এই সাধু কেদারনাথকে বৈষ্ণব সাধুরূপে দীক্ষাদান করেন। বাবা রামোদার দাস রূপে তাঁহার নূতন নামকরণ হয়। দীক্ষাদানকারী গুরু রামোদারকে তাঁহার উত্তরাধিকারী অর্থাৎ পরবর্তী মোহান্তরূপে মনোনীতও করিয়াছিলেন। একবৎসরের অধিককাল এই মঠে থাকিয়া রামোদার দক্ষিণভারত ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যায় আসেন ও যত্র সহকারে বেদ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অযোধ্যায় বাসকালে সাধু রামোদার আর্য সমাজের মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া আশ্রয় আসেন এবং এখানে আর্য মুসাফির পাঠশালার ছাত্ররূপে বিবিধ শাস্ত্র এবং আরবী ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করেন। ইহার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোরে আসেন এবং দয়ানন্দ এন্ডলো ভেডিক্ কলেজে বিশেষভাবে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। লাহোরে কিছুকাল কাটাইয়া রামোদার লুধিনী, গয়া, সারনাথ, কুশীনগর, প্রভৃতি স্থান হইয়া পুনরায় দক্ষিণ-ভারত গমন করেন। এইবার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তিনি তামিল ও কন্নড় ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের যে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল সাধু রামোদার অথবা কেদারনাথ তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়েন ও ১৯২২খ্রীষ্টাব্দে ছয় মাসের জন্ত কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেল হইতে বাহির হইয়া কেদারনাথ পুনরায় কিষণ আন্দোলন পরিচালনার জন্ত প্রায় দুই বৎসর কালের জন্ত কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে হাজারীবাগ জেলে থাকা কালে—কেদারনাথ নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে অগ্রাগ্র ভাষার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে পালিভাষার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। পালিভাষা আয়ত্ত করিয়া তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ও এই ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অহতব করিতে থাকেন—হাজারীবাগ জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে—১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথ সিংহলে পৌছান ও তথাকার স্বপ্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় পরিবেন-এর ছাত্ররূপে বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালিভাষা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময় ছাত্ররূপে এই বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষাদান করিতে হইত। প্রায় দুই বৎসরকাল অধ্যয়নের পর কেদারনাথ স্বামী রামোদার রূপে বিদ্যালয় পরিবেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক “ত্রিপিটকাচার্য” উপাধিতে ভূষিত হন। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে কেদারনাথ বা স্বামী রামোদার বহু সংস্কৃত-বৌদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পান। অল্পসন্ধানে তিনি জানিতে পারেন যে ভারতে এই গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, তিব্বতের মঠগুলিতে মূলসংস্কৃত গ্রন্থ অথবা তাহাদের তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যাইতে পারে। সিংহলের ন্যায় তিব্বতও একটি বৌদ্ধধর্ম প্রধান দেশ। অতঃপর স্বামী রামোদার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন ও বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিব্বত যাত্রা করেন। বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া রাহুল পদব্রজে তিব্বতে পৌছান এবং প্রায় পনের মাস তথায় বাস করেন। এখানে বাস করিয়া তিনি উত্তমরূপে তিব্বতীভাষা আয়ত্ত করেন এবং এই ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহও অধ্যয়ন করেন। শুধু তাহাই নহে এখানে বসিয়া তিনি ক্যামেরার সাহায্যে বহু দুস্ত্রাপ্য পুস্তকের প্রতিপৃষ্ঠার ফটোচিত্র গ্রহণ করেন অথবা স্বহস্তে সেগুলি ‘কপি’ করেন, কোন

কোন সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও তিনি সংগ্রহ করেন। পনের মাস পরে তিনি তাঁহার এই সংগ্রহ ২২টি অখতরের পৃষ্ঠে চাপাইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিব্বত হইতে বহু দুর্লভ পুঁত্রিপত্র সহ স্বামী রামোদারের ভারতে প্রত্যাবর্তন সংবাদে জগতের বিজ্ঞোৎসাহী পণ্ডিতসমাজে প্রচুর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। তিব্বতের মঠ সমূহে দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ অথবা ইহাদের তিব্বতী অনুবাদের অস্তিত্ব অনেকেই জানা ছিল, কিন্তু সভ্যসমাজের সহিত দুর্গম তিব্বতের স্বাভাবিক যোগাযোগ না থাকায় এই পুস্তকগুলি অধ্যয়ন বা চর্চার কোন উপায় ছিল না। তিব্বত হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরেই স্বামী রামোদার সিংহল যাত্রা করেন। সিংহলে পৌঁছিয়া ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামী রামোদার বৌদ্ধভিক্ষুরূপে দীক্ষালাভ করেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভের পর তাঁহার নামকরণ হয়—রাহুল সাংকৃত্যায়ন। গৌতমবুদ্ধের পুত্রের নাম ছিল রাহুল—ইহা বৌদ্ধ জগতের একটি সম্মানিত নাম। স্বামী রামোদার জন্মস্থানে সাংকৃত্যায়নগোত্রীয় ছিলেন এই জন্ত তাঁহার উপাধি হয় সাংকৃত্যায়ন। ইহার ইচ্ছানুসারেই এই উপাধি রাখা হয়। অতঃপর কেদারনাথ পাণ্ডেয় বা স্বামী রামোদার রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামেই পরিচিত হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইনি যে সকল পুস্তক রচনা করেন—এইগুলি স্বামী রামোদারের নামেই প্রচারিত হইয়াছিল।

তিব্বত বাসকালে রাহুল নিজের চরিত্রগুণে তত্ত্ব লামা বা ধর্মগুরুদের প্রীতি ও আস্থা অর্জন করিয়া তাঁহাদের নিকট মঠে স্বরক্ষিত বৌদ্ধপুঁথি সমূহ দেখিবার অল্পমতি অর্জন করেন। সাধারণতঃ এই পুঁথি-পত্রগুলি লামাগণ যক্ষের ধনের মত সম্বন্ধে ও গোপনে রক্ষা করেন। সাধারণ মনুষ্যকে সেগুলি দেখিতেই দেওয়া হয় না—বিদেশীকে ত কোন মতেই নহে। লামাদের প্রসাদ অর্জন করিয়া রাহুল সেগুলি শুধু পাঠ বা পর্যবেক্ষনই করেন নাই, ঐগুলির ফটো অথবা ‘কপি’ ও প্রস্তুত করিবার অল্পমতি লইয়া ছিলেন। রাহুলের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিজ্ঞানবাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরতন্ত্র হইয়াই লামাগণ রাহুলের প্রতি এই অসাধারণ অল্পগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার তিব্বত যাত্রার পর আরও তিনবার তিনি তিব্বত যান ও প্রত্যেকবারই বহু অমূল্য গ্রন্থ-সম্পদ বিশেষতঃ সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি, ইহাদের তিব্বতী অনুবাদ প্রতিলিপি ফটো প্রভৃতি লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন (১৯৩৪, ১৯৩৬, ১৯৩৮)।

প্রথমবার তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হইতে রাহুল ইংলণ্ড জার্মানী ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। তিব্বত হইতে আহৃত পাণ্ডুলিপিগুলির সদ্যবহার করিতে পারা এই সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের জন্ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জন ও মহাবোধি সোসাইটি প্রচার তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই পরবর্তীকালে তিনি চীন ও জাপান ভ্রমণ করেন। এই সময় রাশিয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ অধ্যাপক ম্যোরবার্ট স্কী তাঁহাকে রাশিয়া আগমনের জন্ত সাদর আমন্ত্রণ জানান।

পাটনার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী ও ধুরন্ধর ঐতিহাসিক কালীপ্রসাদ জয়শোয়ালের (১৮৮১-১৯৩৭) চেষ্টায় রাহুল কর্তৃক আহৃত বিপুল ও অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলির পাটনার সরকারী সংগ্রহ-শালায় (মিউজিয়মে) স্বরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মুখ্যতঃ জয়শোয়াল প্রতিষ্ঠিত ও বিহার সরকার পৃষ্ঠপোষিত বিহার ও ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি এই গুলির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জয়শোয়ালের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বত্যর্থ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা শহরে প্রতিষ্ঠিত জয়শোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট রাহুলের সম্মতিক্রমে এইগুলি সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন। পুনঃপুনঃ তিব্বত যাত্রার ফলে রাহুল বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কিত যে সকল বিখ্যাত অথচ ভারতে ছুপ্রাপ্য বা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া আনেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য—

১. অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ২. সর্দর্শপুণ্ডরীক সূত্র ৩. বাদগ্যায়টিকা (বিপশ্চিৎতার্থা)—শান্তরক্ষিত কৃত ৪. সর্বাভিবাদসূত্র টিকা (অথ ঘোষ) ৫. মধ্যান্তবিভঙ্গ কারিকা (মৈত্রেয়) ৬. মধ্যান্তবিভঙ্গ সূত্র (মৈত্রেয়) ৭. অভিসময়ালঙ্কার (মৈত্রেয়) ৮. সমাধি রাজসূত্র ৯. কাসিকা পঞ্জিকা (জিনেন্দ্র বুদ্ধি) ১০. অভিসময়ালঙ্কার বিবৃতি ১১. ব্যাপ্তি নির্ণয় (রত্নকীর্তি) ১২. চিন্তাভেদ প্রকরণ বাদ (রত্নকীর্তি) ১৩. পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতোপদেশ (বুদ্ধদাস আচার্য) ১৪. জ্ঞানসার সমুচ্চয় (আর্যদেব) ১৫. অভিসময়ালঙ্কারালোক (হরিভদ্র) ১৬. অর্থবিনিশ্চয় সূত্র ১৬. শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ১৮. গায়বিন্দু অল্পটিকা ধর্মোত্তর প্রদীপ ১৯. হেতুবিন্দু অল্পটিকা ২০. মহামায়ুরী বিচারাজ্ঞী ২১. চান্দ্রব্যাকরণ টিকা, স্ববন্ত ২২. কলাপবৃত্তি (ভূগাঙ্গিহ) ২৩. অভিধর্মকোষ কারিকা (বহুবন্ধু) ২৪. কাশিকা বিবরণ পঞ্জিকা (জিনেন্দ্র বুদ্ধি) ২৫. বোধি চর্চাবতার (শান্তিদেব) ২৬. বিংশিকাবিবৃত্তি ২৭. অমরকোশটিকা (স্বভূতিচন্দ্র) ২৮. কলাপ ব্যাকরণ টিকা (উৎসব কীর্তি) ২৯. মধ্যান্তবিভঙ্গ কারিকাতাণ্ড (বহুবন্ধু) ৩০. বাদগ্যায়টিকা ৩১. বাদগ্যায় (ধর্ম কীর্তি) ৩২. বার্তিকালঙ্কার (প্রজ্ঞাকর গুপ্ত) ৩৩. প্রমাণবার্তিক বৃত্তি (ধর্ম কীর্তি) ৩৪. প্রমাণ বার্তিকবৃত্তি টিকা (কর্ণক গোমী) ৩৫. প্রমাণবার্তিক ভাষ্য (প্রজ্ঞাকর গুপ্ত) ৩৬. যোগাচারভূমি (অসঙ্গ) ৩৭. অধ্যাক্ষশতক (মাতৃচৈত) ৩৮. চান্দ্র ব্যাকরণ—চন্দ্রগোমী ৩৯. গণ্ডুবাহ সূত্র ৪০. সর্দর্শপুণ্ডরীক সূত্র ৪১. প্রমাণ বার্তিকবৃত্তি (মনোরথনন্দী) ৪২. গায় বিন্দু পঞ্জিকা (ধর্মোত্তর) ৪৩. প্রমাণবার্তিক (ধর্মকীর্তি) ৪৪. বিনয়সূত্র (গুণপ্রভ) ৪৫. অভিধর্ম প্রদীপ (বিভাষা প্রভাবৃত্তি সহ) ৪৬. বিগ্রহব্যাবর্তনী (নাগার্জুন) ৪৭. দোহাকোষটিকা ৪৮. বার্তিকালঙ্কার (প্রজ্ঞাকর গুপ্ত) ৪৯. কাতন্ত্র পঞ্জিকা (ত্রিলোচন দাশ) ৫০. কাব্য প্রকাশ (রাজানক মক্ষট) ৫১. চান্দ্র ব্যাকরণ বৃত্তি (চন্দ্রগোমী) ৫২. কাতন্ত্র বৃত্তি পঞ্জিকা (ত্রিলোচন দাশ) ৫৩. চান্দ্রব্যাকরণ বৃত্তি (চন্দ্রগোমী) ৫৪. চান্দ্র ব্যাকরণ টিকা (রত্নমতি) ৫৫. চান্দ্র ব্যাকরণ পঞ্জিকা (পূর্ণচন্দ্র) ৫৬. তর্ক জালা—মধ্যমক হৃদয় (ভগবদ্বিবেক) ৫৭. অভিধর্ম সমুচ্চয় ৫৮. ত্রিংশতিকা কারিকা (অসঙ্গ) ৫৯. অভিধর্ম কোষ ভাষ্য—বহুবন্ধু ৬০. দোহা কোষ (সরহ) ৬১. ক্ষণভঙ্গাধ্যায়—জ্ঞানশ্রীমিশ্র।

বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের লুপ্ত রত্নগুলি ভারতে আনয়ন করিয়াই রাহুল ক্ষান্ত হন নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য বহুবন্ধু রচিত অভিধর্মকোষ গ্রন্থটি বিলুপ্ত নালন্দিকা টিকা সহ সম্পাদন করিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহা প্রকাশ করেন। বৌদ্ধাচার্য ধর্মপাল লিখিত বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা সিদ্ধি পুস্তকটির মূল সংস্কৃত পুঁথি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন-চাঙ এই গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনূদিত করেন। তিব্বত হইতে প্রাপ্ত এই চৈনিক অনুবাদের সাহায্যে রাহুল ইহার সংস্কৃত রূপটি পুনর্গঠিত করিয়া সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহার রিসার্চ

সোসাইটি কর্তৃক এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। বিহার ও ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে নিম্নলিখিত দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থগুলিও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন :—

বাদন্যায় ধর্মরক্ষিত কৃত (J. B. O. R. S, Vol 21, 1935) প্রমাণ বার্তিক ধর্মকীর্তিকৃত (J. B. O. R. S. Vol 22, 24 ; 1936, '38) মনোরথ কৃত প্রমাণবার্তিক বৃত্তি (J. B. O. R. S. Vol 24 and 26, 1938, 1940) অধ্যাক্ষতক মাতৃচেতা কৃত (J. B. O. R. S. Vol 23, 1937) বিগ্রহ ব্যবতিনী নাগাজুর্ন কৃত (J. B. O. R. S. Vol 23, 1937)

এই রচনাগুলি বিহার রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক পৃথক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত রাহুল হেতুবিন্দু, সন্ধান পরীক্ষা নিদান সূত্র, মহাপরিনির্বাণ সূত্র প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের টিকা পৃথকভাবে রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

বৌদ্ধ ত্রায় শাস্ত্রের মহান আচার্য ধর্মকীর্তি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ধর্মকীর্তির এক প্রশিষ্ট প্রজ্ঞাকর গুপ্ত আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত প্রমাণবার্তিকের একটি সহজ বোধ্য ভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। প্রমাণ বার্তিক ও প্রমাণবার্তিকের ভাষ্য এই দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থই ভারতের ভূমি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাহুল এই দুইটি তালপত্র লিখিত পুথির প্রতিটি পৃষ্ঠার ফটো তির্যক হইতে সংগ্রহ করেন। রাহুল স্বয়ং এই বিরাট পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল শোধ সংস্থান (রিসার্চ ইনষ্টিটিউট) কর্তৃক প্রায় ৭০০ শত পৃষ্ঠা সমন্বিত এই পুস্তকটি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণ-বার্তিক ভাষ্য নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

তির্যক হইতে রাহুল কর্তৃক আনীত অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থও উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে এইগুলির নাম উল্লেখ যোগ্য :—

কাশ্মিরবাসী বিমল মিত্র কৃত—অভিধর্ম দীপ (রচনা কাল ৫ম শতাব্দী)—সম্পাদক ডঃ পদ্মনাভ জৈনী পোটনা, ১৯৫২ ; অভিধর্ম কোষ ভাষ্যম—অধ্যাপক প্রি, প্রধান (পোটনা, ১৯৫২)। রাহুল কর্তৃক আহৃত গ্রন্থাবলীর পাঠোদ্ধার—সম্পাদন ও প্রকাশ বর্তমানে কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদগণ ও রাহুল আহৃত এই সম্পদগুলির সম্পাদনে তৎপর হইয়াছেন ইহা সন্তোষের বিষয়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে রাহুল সংগৃহীত আচার্য অসঙ্গ প্রণীত 'যোগাচার ভূমি' নামক দুর্লভ গ্রন্থটির কিছু অংশ পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশটি ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনা-ধীন আছে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাহুল জাপান, কোরিয়া ও চীন হইয়া রাশিয়ায় গমন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার রাশিয়া ভ্রমণ কালে কিছুদিন লেনিনগ্রাডস্থ ওরিয়েন্টেল ইনষ্টিটিউটে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় রাশিয়ায় গিয়া এই অধ্যাপক পদে আনীন হন। তিন বৎসর ধরিয়া রাশিয়া বাসের সময় তিনি একটি সংস্কৃত-রুশ অভিধান সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তিন বৎসর রুশ প্রবাসের পরে রাহুল স্বাধীন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর দীর্ঘকাল তিনি ভারতেই অবস্থান করিয়া

স্বাধীনভাবে বিচারচর্চা করিতে থাকেন। এই সময় প্রথমে মুসৌরী ও পরে কালিম্পাঙেই তিনি অধিকতর সময় অতিবাহিত করেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিংহলের বিতালংকার পরিবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে রাহুল তথাকার দর্শনের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। দুই বৎসর তথায় অবস্থানের পর গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চিকিৎসার জন্ত তাঁহাকে রাশিয়াতেও প্রেরণ করা হইয়াছিল কিন্তু কোন ফললাভ না হওয়ায় তাঁহাকে ভারতে ফিরাইয়া আনা হয়। এই সময়ে বিশাল দেহী রাহুলের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার অনন্ত সাধারণ শ্বাসিক্রিয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল।

প্রায় এক বৎসর সম্পূর্ণরূপে অকর্মণ্য থাকিয়া ও গুরুতর অসুস্থতা ভোগ করিয়া ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল দার্জিলিং-এর ইডেন হাসপাতালে রাহুল পরলোক গমন করেন।

রাহুলের ত্রায় বিচিত্র প্রতিভাধর ও বিচিত্র কর্মী পুরুষ জগতে অতি অল্পই ভ্রমগ্রহণ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই যাযাবর রাহুল বহু বর্ষ ধরিয়া শুধু ভারতের প্রতি প্রান্তেই ভ্রমণ করিয়াছেন তাহা নহে দুর্গমের পথে তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ও সিংহল, আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন কোন দেশে একাধিকবার গিয়াছেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিয়াছেন। সনাতন পূজারী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম লাভ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল বৈষ্ণব সাধুরূপে জীবন যাপন করেন এবং পরে আর্থসমাজের দ্বারা প্রভাবিত হন। ইহার পর তিনি বৌদ্ধভিক্ষুরূপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধভিক্ষু হইয়াও রাহুল মৎস্ত মাংস ভক্ষণ করিতেন এবং বিদেশ ভ্রমণের সময় ভিক্ষুর কাষায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন। বাল্যাবধি সাতিশয় জ্ঞান-নিষ্ঠ হইয়াও রাহুল রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন ও প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে প্রথমবার কারাবরণ করিলেও রাহুল মহাত্মার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, পরবর্তী কালে তিনি কিষণ আন্দোলন পরিচালনার জন্ত একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত রক্ষা আইনের বলে দীর্ঘ ২৯ মাস তিনি দেওলী বন্দীনিবাস ও হাজারীবাগ জেলে বন্দী জীবন যাপন করেন। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিহার শাখা প্রধানতঃ রাহুলই সংগঠন করেন। সাম্যবাদের অগ্রতম প্রবক্তা রাহুল শেষ পর্যন্ত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যত্ব বজায় রাখিতে পারেন নাই। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের ভূকম্প-পীড়িত জনগণের ত্রাণ কার্যে রাহুল উল্লেখ যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যে ১১ বৎসর বয়সের সময় রাহুলের প্রথমবার বিবাহ হয়। রাহুলের মৃত্যুকালেও তাঁহার এই বৃদ্ধা স্ত্রী জীবিত ছিলেন। ইনি বাল্যাবধি রাহুলের পরিবারভুক্ত হইয়াই আজীবন সম্মানে বাস করিতেন। তাঁহার অল্প বস্ত্র আশ্রয়ের কোন অভাব কখনও হয় নাই, কারণ রাহুলের পিতৃপরিবারে কখনও অম্মভাব হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই স্ত্রীর সহিত রাহুলের কখনও দাম্পত্য সঙ্গ স্থাপিত হয় নাই। হয়ত ইহার সহিত স্বামী রূপে বসবাসের অনিচ্ছার জন্মই রাহুল বিবাহের পর গৃহ হইতে পলায়ন করেন। রাহুলের এক ভ্রাতৃপুত্রের নিকট হইতে জানা যায় যে রাহুল এই রমণীর জীবন ব্যর্থ করিয়া দিব্যর জন্ত অল্পশোচনা প্রকাশ করিতেন। উচ্চমানবিকতা বোধ সম্পন্ন উদার হৃদয় রাহুলের

বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি এই ঔদাসীন্য প্রহেলিকাময় বলিয়াই বোধ হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪ বর্ষ পরে রাহুল একবার তাঁহার স্বগ্রামে গিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হন। এই সময়েই রাহুল তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রাহুল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার একটি বিদূষী রুশ তরুণীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে রাহুলের একটি পুত্রসন্তান জন্মে। রাহুলের এই পুত্রের নাম রাখা হয় ইগোর আইভান রাহুলোভিচ। রাহুলের ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় রুশ সরকার তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে ভারতে আসিবার অনুমতি দেন নাই।

দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত রাহুল ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কমলা নায়ী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার গর্ভে রাহুলের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাহুলের রোগগ্রস্ত অবস্থায় ও মৃত্যুকালে তাঁহার ওই পত্নী তাঁহার যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে রাহুলের অবিরত দেশভ্রমণ মার্কোপোলো ও হিউয়েন চ্যাঙের ভ্রমণের সহিত তুলনীয়। চারিবার তিব্বতের ছুর্গমপথে যাতায়াতের সময় রাহুলকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটিতে হইত। ভ্রমণ হইতে বিরত অবস্থায় দৈনিক পনের হইতে কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত তাঁহাকে অধ্যয়ন ও লিখিতরত দেখিতে পাওয়া যাইত। রাহুলের দীর্ঘ দেহ স্বাস্থ্য-শ্রীমণ্ডিত ছিল। তিব্বতী, চীনা ও রুশ ভাষায় কথোপকথন ও লিখন রাহুল বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। পালি ও অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। ইতিহাস, দর্শন, পুরাতত্ত্ব এবং তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানেও তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ছিল। ছুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ‘ডিগ্রী’ হীন রাহুলকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি মর্যাদা দেখান নাই। সোভিয়েত ভূমির লেনিন গ্রাড বিশ্ববিদ্যালয় ও সিংহলের বিদ্যালঙ্কার পরিবেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এই সমান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রধানতঃ জীবিকার প্রয়োজনেই রাহুলকে অধ্যাপক পদ লইয়া দীর্ঘকাল বিদেশ বাস করিতে হইয়াছিল। বারবার বিদেশ যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্তও রাহুল কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারের নিকট হইতে সাহায্য পান নাই। নিজের চেষ্টাতেই তাঁহাকে পাথের সংগ্রহ করিতে হইত। কোন কোন স্বহৃদ বিশেষ কালীপ্রসাদ জয়শোয়ালের ব্যক্তিগত সাহায্য অবশ্য তিনি পাইতেন।

সতত ভ্রাম্যমান রাহুল সারাজীবনে প্রায় দুই শতটি পুস্তক রচনা করেন ইহা তাঁহার অসীম অধ্যবসায় ও জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচায়ক। বহুভাষাবিদ রাহুল তাঁহার মাতৃভাষা হিন্দীতেই তাঁহার বহু মূল্যবান গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বিশাল পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার রচিত কয়েকটি উপগ্রাস সবিশেষ খ্যাতি লাভ করে—ভল্লা সে গঙ্গা, জয় যৌধেয়, দিবোদাস সিংহ সেনাপতি। ইহার মধ্যে ভল্লা সে গঙ্গা পুস্তকটি পৃথিবীর প্রায় পনেরটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। রাহুল অনেকগুলি ছোটগল্প রচনা করিয়া তাহা পুস্তককারে প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত ভ্রমণ কাহিনী গুলির নাম—মেরী লাদখ যাত্রা, লঙ্কা, বাত্মকে মুক্ত, তিব্বত মে সওয়া বর্ষ, মেরী যুরোপ যাত্রা, মেরী তিব্বত যাত্রা, জাপান, ইরান, রুশ মে পঁচিশ মাস, এসিয়াকো ছুর্গম থণ্ডো মে, কিম্বদ দেশ, কুমায়, গাটয়াল, নেপাল, জোনসার, দেবাতুন, সোভিয়েত ভূমি, সোভিয়েত মধ্যএশিয়া, দার্জিলিং পরিচয়। রাহুল নিম্নলিখিত বৌদ্ধধর্মগুলিও হিন্দী ভাষায় অনূদিত করেন—মাবিম নিকায় (১৯৩৩), দীঘনিকায় (১৯৩৫),

বিনয়পিটক (১৯৩৪), ধম্পদ (১৯৩৩)। বৌদ্ধধর্ম ও ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে রাহুল নিম্নলিখিত উপাদেয় গ্রন্থগুলি রচনা করেন—মহামানব বুদ্ধ (১৯৫৬), তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম (১৯৩৩), বুদ্ধচর্যা (১৯৩১), বৌদ্ধদর্শন (১৯৪৪) বৌদ্ধ সংস্কৃতি (১৯৫২) রাহুল রচিত দুইখণ্ডে প্রকাশিত বহুতথ্যপূর্ণ মধ্য এশিয়াকা ইতিহাস (১৯৫৬) গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হয়। এই পুস্তকটি সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক সাহিত্যকৃতির জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিল। তিব্বত হইতে সরহপাদ রচিত দোহার অল্পবাদ সংগ্রহ করিয়া রাহুল ইহার মূল অপভ্রংশ রূপ উদ্ধার করিয়া ইহা সরহ দোহা কোষ নামে প্রকাশিত করেন (১৯৫৪)। রাহুল রচিত পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী (১৯৩৬), দক্ষিণী কাব্যধারা (১৯৪২), সংস্কৃত কাব্যধারা (১৯৫৮), সাহিত্য নিবন্ধাবলী (১৯৪২), পালি সাহিত্য কা ইতিহাস (১৯৬৩), ঋগ্বেদিক্ আর্ষ (১৯৫৭), অতীত সে বর্তমান (১৯৫৬), ইসলাম ধর্ম কী রূপরেখা (১৯৬০), মানব কী কহানী (১৯৬৮), মানব সমাজ (১৯৫১), বিশ্ব কী রূপ রেখা (১৯৫০), বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ (১৯৫১) প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি বিদ্বৎ পাঠক সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন উর্দু বা রেখতা যাবনিক ভাষা নহে উহা প্রাচীন হিন্দীরই একধারা এবং দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ তথাকথিত উর্দু ভাষার কবি ওয়ালিওল্লা, মহমদ কুলি, কুতুবশা প্রভৃতি এই ভাষাতেই তাঁহাদের কবিতা রচনা করিয়াছেন দক্ষিণী কাব্যধারা নামক গ্রন্থে রাহুল ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লোক কথা সংগ্রহ ও সংকলনেও রাহুল উৎসাহিত ছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাঁহার দ্বারা সংকলিত ‘আদি হিন্দীকে কাহিনীয়া অউর গীতে’ (১৯৫০) গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার্থীদের জন্য রাহুল তিব্বতী বাল্যাশিক্ষা, পাঠাবলী (তিনখণ্ড), তিব্বতী ব্যাকরণ, সংস্কৃত পাঠমালা (৫ভাগ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

মাতৃভাষা হিন্দীর প্রতি রাহুল গভীর ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, যদিও তিনি বহুভাষায় পারদর্শী ছিলেন তথাপি তিনি মাতৃভাষাকেই তাঁহার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে নির্বাচিত করেন। হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে অভিষিক্ত করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিরোধী ভাষা-নীতি গ্রহণ করায় তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট কমরেডদের বিরাগ ভাজন হইতে হইয়াছিল। তথাপি রাহুল তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতির পদে বৃত্ত হন। রাহুল হিন্দী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু পুস্তক রচনা ব্যতীত রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় আবশ্যকীয় ২০,০০০ শব্দাবলীর একটি কোষ গ্রন্থ সংকলন করেন (শাসন শব্দ কোষ, ১৯৪৮)। ইহা ব্যতীত “সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রভাষা কোষ” নামে একটি কোষ গ্রন্থ ও তিনি সংকলন করেন, ইহা ওয়ার্দ্ধাস্থিত রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানটি রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে অনুবাদ করার জন্য ভারত সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করেন রাহুল তাহার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

১৯৪৪ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্যন্ত রাশিয়ায় অবস্থান কালে রাহুল একটি কৃষ্ণ-সংস্কৃত অভিধান সংকলন করিয়াছিলেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার দ্বারা সংকলিত তিব্বতীয়-সংস্কৃত অভিধানের কথাও উল্লেখযোগ্য, এই পুস্তকটি এলাহাবাদের হিন্দুস্থানী একাডেমি হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সামাজিক সুবিচারের পক্ষাবলম্বী রাহুল রাজনীতি, সম্পর্কেও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন— আজকী রাজনীতি, আজকী সমস্রায়ে, বাইসবী সদী, ভাগো ন'হী দুনিয়োকো বদলো। সাম্যবাদী রাহুল কার্ল মার্কস, লেলিন, স্তালিন ও মাও-সে-তুঙ্গের জীবনীও রচনা করেন।

শেষ জীবনে রাহুল তাঁহার ঘটনাবল্ল জীবনের স্মৃতিচিত্র রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার আত্মচরিত 'মেরি জীবন যাত্রা'র প্রথমখণ্ড ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার শেষ (৫ম) খণ্ডটি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মে স্থপণ্ডিত রাহুল বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়ন করিতে গিয়া অসঙ্গ, বস্তুবদ্ধ, ধর্মকীর্তি, প্রভৃতি বৌদ্ধদার্শনিকদের মতবাদ ও বিচার প্রণালী দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত ত্রায়শাস্ত্র ও অধিবিজ্ঞা (Logic and Metaphysics) প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া জৈন ও বৌদ্ধ ত্রায় শাস্ত্র ও অধিবিজ্ঞার সহিত সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান রহিয়াছে এবং এই তিন ধর্ম প্রভাবিত দর্শনই সন্ধীর্ণতা পরিহার করিয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে সমন্বয়সূচক একটি স্থির লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। নালন্দার বৌদ্ধাচার্যগণের রচনাগুলি বস্তুতঃ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সত্যাত্মসন্ধানের নিদর্শন। খ্রীষ্টপূর্ববর্তী যুগে বিভিন্ন মতাবলম্বী ভারতীয় দার্শনিকদের এই দৃষ্টি আধুনিককালে দর্শনের ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই রাহুলের ধারণা ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি প্রমাণবাত্তিক প্রভৃতি পুস্তক প্রচারে উত্তোগী হইয়াছিলেন এবং সমমতাবলম্বী সতীর্থদের এই কার্ণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দর্শন ও প্রতীচ্যদেশীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া রাহুল 'দর্শন দিগদর্শন' নামে একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

রাহুলের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিব্বতের অসংখ্য মঠের কক্ষগুলিতে ঘরের মেঝে হইতে ছাত পর্যন্ত সর্বত্র থরে থরে বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে। তাঁহার ক্ষোভ ইহাই ছিল যে তিনি ইহার অল্প অংশই উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিয়াছেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয়ে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু নেপাল ও তিব্বতে পুখিপ্রভৃতি লইয়া চলিয়া যান অথবা পুখিপ্রভৃতি সেখানে সুরক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। মগধে ও বাঙলায় পালরাজাদের রাজত্বকালে পূর্বাঞ্চলের নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, জগদল প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারগুলিতে বহু তিব্বতী ছাত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। ইহারা এখানে বসিয়া সংস্কৃত পুথির তিব্বতী অর্থবাদ করিয়া লইয়া যাইতেন। তিব্বতের মঠগুলিতে এইভাবে বৌদ্ধশাস্ত্রের এবং প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত বা অপভ্রংশে রচিত লৌকিক সাহিত্য পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। পরাধীন ভারতে এই লুপ্ত রত্নগুলি উদ্ধারের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। জ্ঞান আহরণার্থে বাঙ্গালী পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) ব্যতীত আর কোন ভারতীয়ই বর্তমান বা গত শতাব্দীতে তিব্বতে যান নাই। একমাত্র রাহুলই ইহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছেন। রাহুলের পূর্বে একমাত্র শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ই তিব্বত হইতে কিছু দুর্লভ পুস্তক ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিব্বতে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রাদুর্ভাব হয়।

এই অবস্থায় তিব্বতের মঠগুলি হইতে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য উদ্ধারের চেষ্টা সম্ভবপর ছিল না। ইহার কিছুদিন পরই তিব্বতে চীনা সৈন্যের অভিযান শুরু হয় এবং পরিশেষে তিব্বত চীন কবলিত হয়।

তিব্বতের বৌদ্ধশাস্ত্র ভাণ্ডারের সম্ভাব্য বিনষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক এই অমূল্য ভাণ্ডারের একাংশের সময়োচিত উদ্ধারসাধন সমগ্র জগতের বিদ্যাহুঁরাগী জনসমাজের অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদের যোগ্য—এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা নাই। এই কার্যের জন্য ভারতের এমন কি জগতের বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম চিরস্মরণযোগ্য হইয়া থাকিবে। রাহুল কর্তৃক আহৃত অমূল্য পুস্তক ভাণ্ডারের পাঠোদ্ধার, সম্পাদন ও প্রকাশনার কার্যে বহুদিন ধরিয়া বহু পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে—এ কথাও মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী

এই পর্ধ্যায়ে চারটি পত্র সংকলন করা হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের নিয়ম ছিল প্রতি প্রতিপদ ও অষ্টমীর দিনে কলেজ বন্ধ থাকত। আর রবিবার খোলা থাকত। শিক্ষা কাউন্সিলকে লিখে বিদ্যাসাগর এই নিয়মের পরিবর্তন করেন। প্রত্যেক চরিতকারই এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন প্রত্যেক রবিবারে কলেজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করলেন সে বিষয়ে সব চরিতকারই নীরব। বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ের সব কাগজপত্র উদ্ধার করেছি। এ থেকে দেখা যায় যে রবিবার কলেজ খোলা থাকায় ছাত্রদের বিশেষ অসুবিধে হচ্ছিল। সে অসুবিধে দূর করবার জন্তই বিদ্যাসাগর এ ব্যবস্থা করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল দরিদ্র। তারা সহর থেকে অনেক দূরে বাস করে, গ্রামের যে সব লোক কলকাতায় চাকরী করে তাদের গাড়ীতে তারা সাধারণত কলকাতায় আসত। রবিবার এরা কলকাতায় আসতেন না, কারণ তাদের অফিস বন্ধ। ফলে, এসব ছাত্ররা রবিবার কলেজে উপস্থিত হতে পারত না। আর আসতে বাধ্য করা হলে তাদের অনেক অসুবিধে হত।

আর একটা অসুবিধে হল যারা সহরে বাস করত তাদের নিয়ে। গরীব বলে তারা বড়লোকের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করত। অফিস খোলা থাকলে এ সব বাড়ীতে সকাল ৮টা বা ৯টার মধ্যে রান্না হয়ে যেত। কিন্তু ছুটির দিনে দুপুর ১২টা বা একটার সময় খাওয়া হত। ফলে ছাত্রদের হয় কামাই করতে হতো না হয় না খেয়ে কলেজে আসতে হত। ছাত্রদেরদী ছাত্রদের এ অসুবিধে উপলব্ধি করতে পেরে শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক ডঃ মোয়টকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠিটি এখানে প্রকাশ করা হল। এটিও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

No. 734

From

The Principal
Sanskrit College.

To

F. J. Mouat, Esq. M. D.
Secretary Council of Education.

Fort William, 25th July 1851

Sir,

I have the honor to state, for the information of the Council of Education that by the existing rules of the Sanskrit College it closes on every Astomee and

Pratipad but I beg leave to propose that every Sunday be substituted in their stead for the following reasons :—

1st. A number of students live at a great distanced from the town and being in indigent circumstances manage to attend the College daily by helping themselves to the conveyance of their friends whose avocations require their attendance in the town. But as all Public offices are closed on Sundays the students being unable to avail themselves of the aid of their friends can not attend the College but when forced to do so they are put to a great variety of inconveniences.

2nd. There is another class of students who keep with their office-going friends in the town live upon their charity and partake of a commonness with them which on office days is prepared at 8 or 9 a. m. but on Sundays so late as noon, These students are therefore compelled to keep home on Sunday or to attend the College without taking their breakfast.

3rd. Almost all the Pundits are in favor of the proposed arragement and some of them, the greater number of whose pupils are exposed to the above hardships are anxious for its speedy adoption.

In conslusion, I beg leave to add that this arragement will in no way be disadvantageous to the Institution the number of working days remaining the same.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant

ESHWAR CHANDRA SHARMA

বিতীয় চিঠিটিও কলেজ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত। বিভাগাগর যে বছর কলেজ ত্যাগ করেন সে বছর থেকেই বৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন হয়। পরীক্ষা হ'ত সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে। কখনও বা অক্টোবর মাসের গোড়াতে। তারপর কলেজ দীর্ঘদিনের জন্ত বন্ধ থাকত। গরমের সময় কলেজ খোলা থাকত। কলকাতার এই প্রচণ্ড গরমে ছাত্রদের ক্লাস করতে হ'ত। কোনবার খুব বেশি গরম পড়লে সরকার থেকে ৩৭ দিন কলেজ বন্ধ রাখা হ'ত। সংস্কৃত কলেজের আর একটি অস্ববিধে ছিল। অগ্ন্যাগ্ন সরকারী কলেজে টানা পাখার ব্যবস্থা থাকলেও সংস্কৃত কলেজে সে ব্যবস্থা ছিল না। বিভাগাগরও করতে পারেন নি। মনে হয় বিনা বেতনে ছাত্ররা পড়ত বলে সরকার এ স্বেবিধে দিতে রাজী হন নি। সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতরা এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করতেন না। কিন্তু ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকরা অনেক প্রতিবাদ করেছেন, কোন ফল হয় নি।

বিভাগাগর এই ব্যবস্থার প্রতিকার করলেন। তিনি দেখলেন বৃত্তি পরীক্ষায় ভাল ফল করবার জন্তে অনেক ছাত্রকেই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। ফলে তারা নানা প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। অনেকে লেথাপড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

বিভাগাগর তাই প্রস্তাব করলেন যে বৃত্তি পরীক্ষা এপ্রিল মাসের প্রথমে হবে। ১৪ দিনের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবে। তার পর ১৫ই এপ্রিল থেকে কলেজ খোলা ২ মাস বন্ধ থাকবে। এই বন্ধের মধ্যে পরীক্ষকরা তাদের খাতাপত্র দেখবেন, রিপোর্ট তৈরী করবেন। পুরস্কার বিতরণের পর বেশ কয়েকদিন কলেজ বন্ধ থাকত। বিভাগাগর ঐ ছুটি তুলে দিতে বললেন।

বিভাগাগর এ ব্যবস্থা করেছিলেন কলেজের ছাত্র ও অধিকাংশ শিক্ষকের মত নিয়ে। এ ব্যবস্থা অবশ্য নতুন কিছু নয়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররা অনেক ভেবে চিন্তেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষা কাউন্সিলও অনেক দিন ধরে এটা চালু করবার চেষ্টা করছিলেন।

পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্তু আর আশুতোষও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বিভাগাগরের এই অপ্রকাশিত চিঠিটিও এখানে প্রকাশ করা হল।

No. 784

From

The Principal,
Sanskrit College.

To

F. J. Mouat, Esq. M. D.
Secretary Council of Education.

Dated Fort William, 16th April 1852

Sir,

I have the honor to forward the following proposal which I request, you will be so good as to submit to the Council of Education.

2. The annual examinations, since the scholarship system has been established, generally takes place in the end of September and or in the beginning of October. This arrangement is highly injurious to the health of the students as the hot and rainy seasons precede this period. The students with a view to distinguish themselves in the scholarship examinations undergo an excess of mental labour which makes them subject to dysentery, dispepsia, continued headache, fever, afthalmia and extreme general debility from which they can not soon recover. Some of them suffer from these complaints almost a year. Some are altogether so incapacitated that they can not resume their collegiate studies and are

therefore obliged to leave the College. I can mention some four or five distinguished students of the Institution who are still suffering under one or other of these complaints, the inevitable result, I presume of their excess of mental labour in the hot and the rainy seasons to prepare themselves for the examination. A change in the period of examinations seems therefore to be absolutely necessary.

3. Under these circumstances I beg leave to propose that the period of examinations be fixed at the beginning of April. The examinations will be all over in about a fortnight and after they are over there should be a vacation of two months from the 15th April to the 15th of June. The examiners should adjust the prizes during the vacation and the annual report should then be prepared. The distribution of prizes would take-place after the vacation. And after the distribution there would be necessity for any other vacation.

4th. If the Council be pleased to sanction the proposed the excessive mental labour in the hot and the rainy seasons on the part of the students will be avoided. The students of the Sanscrit College are generally not in affluent circumstances. In the sultry months of April, May and June, they suffer a great deal in travelling on foot between the hours of 10 and 11 and 4 and 5 a good number of them live at a distance of 5 to 6 miles from the College. When in the College excessive heat prevents their paying due attention to their studies the more so as there is no establishment for pankhas as in the Hindu College.

5th. If the arrangements proposed be sanctioned, the students will be able to beg in their course in the comparatively cool months of the rainy season and to prepare themselves for the examinations, in the winter months when excessive mental labour is not so detrimental to health as in their village homes, they being generally not the inhabitants of the town.

6th. Should the Council be pleased to change the period of examinations from October to April and grant a vacation of two months from the middle of April to the middle of June, a great blessing will be conferred on the Sanscrit College. The student will be relieved from the complaints above enumerated which are the inevitable consequences of excessive mental labour in the hot and the rainy seasons. And it is hoped that they would then make greater progress than they do now.

7th. This arrangement if effected in the Sanscrit College will not interfere

at all with the affairs of the other College under the Control of the Council. Except the distribution of prizes in the Town Hall with the Presidency College, The Sanscrit College has nothing in common with the English or Arabic Institution. The annual examinations takes place in the same month but the subjects of examinations are not the same, the language and literature taught here being different from them.

8th. Under the proposed arrangement the number of Holidays will amount to 85 against 62 under the present system taking into account only 8 days for the vacation after the distribution of prizes as prescribed in the Rules. But this vacation is generally extended to 15 days and thus raises the number of present holidays to 69 the difference in that case is only that of 16 days. The holidays should be these—

Varoonee.....	1
Ramnavamee.....	1
Janmastami.....	1
Mahalaya.....	1
Doorga pooja.....	14
Deepanita.....	1
Jagadhatri Pooja.....	1
Sareswati Pooja.....	2
Sivaratri.....	1
Mahabishoob Sankranti...	1
Her Majesty's Birth day..	1
Vacation.....	60

9th. The proposal here made is not altogether a new one and if Sanctioned will place the Sanscrit College nearly on the same footing with the Medical College.

10. When last year the Council asked the opinion of the Professors and the senior pupils of the Institutibn on the subject of Summer Vacation they were all

in its favor. I have again consulted them and find them eager to have the summer vacation and the period of Examination Changed.

I have the honor to be

Sir

Your most obedient Servant,
ESHWAR CHANDRA SARMA

বিভাগাগর সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। এ সংবাদ অজ্ঞাত। আজ থেকে প্রায় একশ কুড়ি বছর পূর্বে তিনি মুখস্থ করে পাশ করবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করার বিষয় ফল আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি। বিভাগাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে বাৎসরিক পরীক্ষা তুলে দিয়ে মাসিক ও দ্বিমাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিভাগাগরের প্রস্তাব সারা দেশ তখনও গ্রহণ করেনি।

বাৎসরিক পরীক্ষার কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি আছে। বিভাগাগরের মতে এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। এই ব্যবস্থায় ছাত্ররা পরীক্ষার পর নতুন ক্লাসে উঠে হাল ছেড়ে দেয়। এবং পরীক্ষা খুব নিকটবর্তী না হলে পড়াশুনো আরম্ভ করে না। বৎসরের গোড়াতে ছাত্ররা একেবারে উদাসীন থাকে, কিন্তু পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসে ততই তারা মুখস্থ বিভাগার দ্বারস্থ হতে থাকে। স্ততরাং তাঁদের শ্রম অপৰ্যাপ্ত ফলে এরা শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে। এর বিষয় ফল হ'ল কলেজ ছেড়ে যাবার পর আর তাদের পড়াশোনার অভ্যাস থাকে না। তাছাড়া, পরীক্ষার পূর্বকার কয়েকদিন তারা এত বেশি পরিশ্রম করে যার ফলে তারা নানা রকম রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়। অনেকে এত গুরুতর অস্থস্থ হয় যে তাদের আর পরীক্ষাই দেওয়া হয় না। ফলে তাদের একটা বছরই নষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যবস্থার সংস্কার করবার উদ্দেশ্যে বিভাগাগর প্রস্তাব করলেন

১। নীচু ক্লাসে প্রতি মাসে এবং উঁচু ক্লাসে প্রতি দু মাসে একবার করে পরীক্ষা হবে। এই সব পরীক্ষার মোট যোগফল দ্বারা ছাত্রদের বৃত্তি ও অন্যান্য পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে।

২। সংস্কৃত ও ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকদের সাহায্যে অধ্যক্ষ এই সব পরীক্ষা পরিচালনা করবেন।

একমাত্র সর্বশেষ পরীক্ষাটি পরিচালনা করবেন শিক্ষা কাউন্সিলের মনোনীত পরীক্ষকগণ।

এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিভাগাগর শিক্ষা জগতে এক বিপ্লব এনেছিলেন। এই বিষয়ে লেখা বিভাগাগরের পত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সেটি এখানে প্রকাশ করা হ'ল।

No. 939

From

The Principal, Sanscrit College.

To

F. J. Mouat, Esq M. D.,
Secretary Council of Education.

Dated Fort William, 21 January 1854

Sir,

I have the honor to forward the following proposal which I beg to request, you will be so good as to submit to the Council for their consideration and orders.

The examinations in this Institution are held annually. This system of examination is in my humble opinion open to serious objections. The main object of an academic examination ought to be to supply a well regulated stimulus to proper exertion. This object is but very partially gained by making the examinations annual. Under this system the pupils release their labours after the close of the session and do not resume them in an earnest manner till the time of the examinations draw near. During the first months of the year they plod along with their routine course of study with indifferent attention while the "craming" system is in requisition during the concluding months. Their industry therefore is unequable and the consequence is that a habit of industry is not acquired. moreover the over exertion of the last two months of the session induces several chronic diseases such as headache, dyspepsia, dysentery, ophthalmia, etc.. This is another circumstance in the present system of examination which, is deeply to be regulated and which though accidental is not altogether of rare occurrence. A student may be well known to be intelligent industrious and attentive and one who would certainly be entitled to the highest records were it in his power to pass the examination, but he may suddenly fall ill at that time of examination, and all his exertions during the whole year would in the case remain unrewarded. I have with care and attention observed this State of things for the last three years and am convinced that so long as the present system of examination continues it will be impracticable to remove the evils complained of.

Under the circumstances I beg most respectfully to propose that the

present system of examination be discontinued and that in its stead the following plan be adopted.

1. Examination to be held every month in the Junior Classes and every two months in the senior ones.
2. The award of scholarships and other rewards to be decided by the aggregate result of these examinations.
3. Of the Sanscrit and Vernacular portions of studies examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the Professors.
4. Of the English portion of studies the examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the masters and Professors.
5. The final examinations alone to be conducted by the examiners appointed by the council.

If the Council be pleased to sanction the proposal the students will make equal progress throughout the year. They will not be obliged to over exert themselves in the concluding months of the session and there is no doubt they will be thus enabled to attain greater proficiency than they usually manifest under the present system and, above all, they will acquired a habit of industry from the want of which it may be safely affirmed, the great majority of the students do not keep up their studies in after life though they after distinguish themselves while at College.

In conclusion I beg leave to request the favor of your moving the council to sanction the proposal at least experimentally for three years.

I have the honor to be

Sir,

Your most obident Servant

EHSWAR CHANDRA SHARMA

বিভাগার সংস্কৃত কলেজের বৃত্তি পরীক্ষারও ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত বিভাগের জন্ম মোট ৩২৮ ও ইংরেজী বিভাগের জন্ম ৮, এই মোট ৩৩৬ টাকা বৃত্তির জন্ম ব্যয় হ'ত। সিনিয়র বিভাগে ১২টি ও জুনিয়র বিভাগে ১৬টি বৃত্তি ছিল। ইংরেজী বিভাগের পূর্নগঠনের পর স্থির হল যে ইংরেজীর জন্মে আর কোন পৃথক বৃত্তি থাকবে না। বিভাগার দেখলেন যে নীচু ক্লাসের ছাত্রদের কম সংখ্যক বৃত্তি দিয়ে উচ্চ শ্রেণীর জন্মে বেশি সংখ্যক বৃত্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেক ছাত্রই উচ্চ ক্লাসে উঠে চরম দারিদ্র্যের জন্মে কলেজ ত্যাগ করে চলে

যাচ্ছে। অথচ কলেজের স্বার্থে উচ্চ শ্রেণীতেই বেশি ছাত্র থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্তে বিভাগাগরের প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্বের ১২টি সিনিয়র বৃত্তির স্থলে ২০টি করা হল, আর ১৬টি জুনিয়র বৃত্তির পরিবর্তে ১০টি করা হল। অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্তে মোট ৮টি বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়া হল।

দ্বিতীয়ত, এতকাল নিয়ম ছিল শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পেলেই বৃত্তি পাবার অধিকারী হওয়া যেত। সেই বৃত্তি রক্ষার জন্তে পরের বছর শতকরা ৬০ ভাগ এবং তার পরের বছর শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পেতে হোত। শতকরা ৫০ ভাগ যারা পায় তারা অতি সাধারণ মেধার ছাত্র, আর শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পাওয়া একরকম অসাধ্য ব্যাপার। তাই নিয়ম করা হল যে বৃত্তি পাবার জন্তে ও রক্ষা করবার জন্তে শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পেতে হবে।

বিভাগাগর বৃত্তি ব্যবস্থার আর একটি সংস্কার করেছিলেন। তখন অলংকার ও সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্ররা বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে পেত। এই দুই শ্রেণীর জন্ত ভিন্ন দুটি মান ছিল। বিভাগাগর দেখলেন যে এ ব্যবস্থা খুবই অর্থোক্তিক। দুটি পৃথক ব্যবস্থা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সাহিত্য শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের সংস্কৃতে বিশেষ কোন ব্যুৎপত্তি জন্মায় না। তাই নিয়ম করা হল যে সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্ররা কোন বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। অলংকার শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়র বৃত্তি ও তারপর সিনিয়র বৃত্তি এই দুটি মানের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল। এই ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে বিভাগাগর শিক্ষা কাউন্সিলকে যে পত্র দিয়েছিলেন তা সর্বপ্রথম এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে।

No. 874

From

The Principal,
Sanskrit College.

To

F. J. Mouat, Esq., M. D.
Secretary Council of Education.

Dated Fort William, 1st June 1853.

ir,

I have the honor to state that at present 336 Rupees are appropriated to scholarships in this Institution and that the amount is distributed as follows.

No. of Scholarships	Amount
Senior	
4 at 20 Rupees each	80
8 at 15 Rupees each	120
Junior	
16 at 8 Rupees each	128
1 English Junior Scholarshih	8

Company's Rupees 336

I beg leave so propose that in future the Scholarships should be divided in the following manner.

No. of Scholarships	Amount
Senior	
2 at 20 Rupees each	40
4 at 16 Rupees each	64
6 at 12 Rupees each	72
8 at 10 Rupees each	80
Junior	
10/30 at 8 Rupees each	80

336

By the arrangement there will be an increase in number of 8 scholarship in the Senior Branch and a diminution of 6 scholarships in the Junior. An increase in the number of Senior Scholarships is highly desirable as it will enable the college to retain a greater number of senior pupils for a longer time than has hitherto been the case, In many instances pupils when promoted to Senior Classes are under untoward circumstances obliged to leave the Institution. But by increasing the number of senior scholarships this evil will in a great measure be avoided. Ten scholarships, are, I am of opinion, quite sufficient for the Junior Branch of this Institution. Here is no need of allotting a separate, English Junior Scholarship as the scholarship examination will in future consist of both Sanscrit and English Branches.

I beg leave to state also that at present students of both the Sahitya and

Alankar classes are allowed to compete for Junior Scholarship and that this two separate Junior Scholarships standards ; one for the Sahitya and the other for the Alankar classes. Instead of this I beg leave to propose that there should be but one Junior standard and that the students of the Alankar only, which is considered as the first in the Junior Department, should be allowed to compete for Junior Scholarship. The progress generally made by the Sahitya Students is not quite up to that which should be the standard for the Junior Scholarship.

I further beg leave to state that presents students are entitled to scholarships on obtaining half the complete number of marks. They are allowed to retain their scholarships on obtaining in the second year sixty marks and in the third year seventy marks out of hundred. Half the number of marks, I am convinced is too low a standard being indicative only of mediocrity and seventy percent too high a standard for the generality of students, I beg leave to propose therefore that sixty percent of marks be fixed upon as the minimum for attaining and retaining scholarships. I beg leave strongly to recommend that this proposal be at least sanctioned experimentally for three years.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient servant

ESHUR CHUNDER SHARMA

বঙ্গ-ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের স্থান

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বঙ্গে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্ব-কালে তথাকথিত বার-ভুঁইয়াদের সঠিক ভূমিকা-সম্পর্কে এ পর্যন্ত আচার্য যত্ননাথ সরকার, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, মীর্জা-নাথন-এর “বহারিস্তান-ঈ-ঘাইবী” প্রমুখ যে সকল রচনা আমাদের হাতে এসেছে তা’ থেকে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। সে ধারণায় এই কালের দ্বন্দ্ব স্বদেশ-প্রেমের তথা স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব নয়, বরং সামন্তশক্তির পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মাত্র। কিন্তু আজও যখন এই কালের ভূ-স্বামীদের সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনা হ’বার পরও ভিন্ন কথা কোন কোন বিদ্বানের কাছে শুনি, তখন পুরাতনকে নূতনরূপে দেশের প্রকৃত ইতিহাস-জ্ঞানেচ্ছুর কাছে পরিবেশন করতে চাই। বর্তমান আলোচনার সূচনা সে কারণেই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মাহুযেরা সমকালীন ঘটনাবলী খুব কমই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বিশেষ করে হিন্দুযুগে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত বাস্তব উপাদান, দানলিপি তথা যশোলিপি, স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং মূত্রার প্রমাণ থেকেই যা তদানীন্তনকালের যথাযথ ইতিহাস রচনার সার্বিক চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলেও প্রাচীনভারতের বহু বিষয় আজও অমীমাংসিত, আমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ এক হস্তাকর মন্তব্য করে বলেছেন ইতিহাসে উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ শিলালিপি ও মূত্রা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অল্পশীলনকালে ঐ দু’টি প্রমাণ বিশেষ ভূমিকা নেয়, তবে প্রত্নবস্তু, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, বিদেশীর ও দেশীয় সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা না থাকলে সেই কালের ইতিহাস রচনায় বহুবিধ ফাঁক থেকে যায়। এ সম্পর্কে এখানে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এটুকুই বলা যায়—সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের যে বর্ণনা মুসলমান আমলে পাওয়া যায়, পূর্ববর্তীকালের তেমন পাওয়া যায় না। সে দিক থেকে মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার উপাদান প্রচুর এবং ইতিহাস-রচনাও অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রতাপ যে কালের মাহুয, সেই কালের সঠিক খবর আমরা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যতখানি পেতে পারি, ‘মূত্রা’ এবং ‘শিলালিপি’ থেকে কিছুতেই তা’ পেতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, পাই-ও না। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কীয় বাঙ্গালী রচিত সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক কোন গ্রন্থই নেই। আবুলফজলের স্থবিখ্যাত “আকবর-নামা” ও “আইন-ই-আকবরী”তে প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ নেই। বিভারিজ-অনুদিত “আকবর-নামা”র একস্থানে মজলিস প্রতাপ নামধেয় জনৈক বাঙ্গালী জমিদারের উল্লেখ আছে। প্রতাপ-সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামাণিক ও সমসাময়িক বিবরণী মীর্জানাথন-রচিত পার্সী-গ্রন্থ “বহারিস্তান-ঈ-ঘাইবী”তে পাওয়া যায়। ইনি সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বিশেষতঃ স্ববাদের ইসলাম খাঁ, কাসিম খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে (১৬০৮-২৫) বঙ্গ আসামে বিদ্রোহ দমনে ও মোগল-আধিপত্য বিস্তার-কল্পে সংঘটিত যুদ্ধে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয় সাজাহানের সময়ে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে। সমসাময়িক আর দু’জনের রচনায়, আব্দুল লতিফের ভ্রমণ-বিবরণ এবং ডু-জারিক-এর গ্রন্থে প্রতাপ-প্রসঙ্গ রয়েছে। আব্দুল লতিফ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা থেকে বঙ্গে আসেন। ১৫৯৮ থেকে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের

পতুগীজ পাদ্রীরা যে সকল চিঠিপত্র লেখেন তা' ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন থেকে ছাপা হয়। জনৈক ফরাসী লেখক ডু-জারিক সেইসব চিঠিপত্র অবলম্বন করে ফরাসী ভাষায় সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করে (Historic des choses plus memorables advenues tant es Indes Orientales = পূর্বভারতে সংঘটিত স্মরণীয় ঘটনাবলীর ইতিহাস) ১৬০৮ থেকে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক খণ্ডে ফ্রান্সের বোর্দো শহর থেকে প্রকাশ করেন। তাতে প্রতাপের নাম নেই, কিন্তু তিনি যে চ্যাণ্ডিকান-এর অধিপতি এবং রামচন্দ্রের শত্রুর—তা'র উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রতাপ কর্তৃক কার্তালো-হত্যার কাহিনীও বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে।

প্রতাপ-সম্পর্কীয় তথ্য বাঙ্গালী রচিত গ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা' সবই অর্বাচীন কালের। কবিরামের “দিগ্বিজয় প্রকাশ”, ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”, রামরাম-বহুর “প্রতাপাদিত্য-চরিত্র”, নিখিলনাথ রায়ের “প্রতাপাদিত্য” প্রভৃতি-তে প্রতাপ-সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল-এর রচনাকাল ১৭৫২ খ্রিঃ, প্রতাপাদিত্যের থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী পরে রচিত। রামরাম বহুর “প্রতাপাদিত্য চরিত” ১৮০১ খ্রিঃ-তে রচিত এবং তাতে পারসিক গ্রন্থের উল্লেখ থাকলেও নাম ও রচয়িতার নাম না থাকায় এবং কতটুকু উপাদান বহু মহাশয় সংগ্রহ করেছেন—সে সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। কবিরামের “দিগ্বিজয় প্রকাশ” সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর নিখিলনাথ রায় তো বর্তমান শতকে গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতএব এইসব রচনাকে কিছুতেই ‘পাথুরে প্রমাণ’রূপে গ্রহণ করা যায় না।

আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেন, কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির নায়ক প্রতাপাদিত্যের কল্পচিত্র “বহারিস্তান-ঈ-ঘাইবী”-পাঠে জানা যায়। অতএব তিনি কিভাবে কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির নায়ক হলেন—তা' আমাদের দেখতে হবে।

স্বদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ বিদেশীর অধীন ছিল। মুসলমান যুগের পূর্বে যে সেন-বংশ বঙ্গে রাজত্ব করেন তাঁরা বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে অবাঙ্গালী আক্রমণকারীই ছিলেন। তারপর ত্রয়োদশ শতক থেকে অব্যাহত স্রোতে এদেশে মুসলমান অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ আরম্ভ হয়। বঙ্গের সামন্তশক্তি তথা রাজশক্তি এবং ‘জন’শক্তি সেই অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেননি। বরং তার পরের আমাদের ইতিহাস পারিবারিক কলহ, অসংবদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ। ফলে বঙ্গ প্রথমে পাঠানের এবং পরে মোগলের করতল গত হ'ল। এই স্বদীর্ঘকাল বিদেশীর অধীন ও পদানত থাকায় বাঙ্গালীর অন্তরে যেন একটা অপমান ও গ্লানিবোধ জন্মায়। আর আমাদের আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য অপরিহার্য হল বিদেশী রচিত আমাদের অতীত ইতিহাসের চরিত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তা প্রমাণিত করা। তখন গৌড়াধিপ শশাঙ্কর হাতে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও মৃত্যু, পালরাজগণের দিগ্বিজয় প্রভৃতি কাহিনী বাঙ্গালীর শৌর্ধের প্রমাণ রূপে নেওয়া হল। কিন্তু মুসলমান আমলে তেমন দৃশ্য বিরল। মোগল পূর্বকালে যে বিদেশী-আফগান বা পাঠানরা বাঙ্গলাদেশে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন, মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে সেইসব জাতির প্রতিরোধ চেষ্টাকে বঙ্গের ও বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরূপে গণ্য করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে প্রচার করা হ'ল। এবং তথাকথিত বার-ভুঁইয়াদের তৎপরতাকে বহুভাবে পল্লবিত করা হল, যেন মনে হয়—সেই তৎপরতা ঐ সংগ্রামেরই অঙ্গ। এই

দৃষ্টিভঙ্গি তথা চেতনার কথা মনে রাখলে ঘটককারিকা, বংশাবলী প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অনুধাবন করা যাবে। এবং প্রতাপাদিত্য-সম্পর্কীয় কিংবদন্তীর উৎসও কোথায়—তা'ও হৃদয়ঙ্গম হবে। প্রসঙ্গতঃ কুলঙ্গীগ্রন্থ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মন্তব্য স্মর্তব্য।

যাই হোক, তথাকথিত বার-ভুঁইয়াদের বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগমন ও মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও শৌর্য কাহিনী নানা আকারে পল্লীগীতিতে, লোকমুখে, ঘটককারিকায়, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীতে পল্লবিত হয়েছে। এখানে প্রতাপের আবির্ভাবের পূর্বের রাজনৈতিক অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বকালে বঙ্গে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রতম ঘটনা হচ্ছে মোগল পক্ষীয় মুনিম খাঁর গোড়ের রাজধানী টাণ্ডার প্রবেশ (২৫শে সেপ্টেম্বর)। পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে দাউদ সাতগাঁও হয়ে উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। আর অগ্রাগ্রা আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গে জড় হন। আমরা আরও দেখি, মজনুন খান সুলেমান খান মনুকীকে নিহত ও অপরাপর আফগানদের বিতাড়িত করে ঘোড়াঘাট অধিকার করছেন। বিদ্রোহী জুনেদ খান কররাণী ও এই সময়ে বাড় খণ্ডের অরণ্যাকুল হাতে বের হয়ে মোগল সেনানী মুহম্মদ খান গখর ও রায়বিহার মল্লকে নিহত করেছেন। ডঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ২য়, পৃঃ ১২৭। ছুজুন নায়ক মাহমুদ খান ও মুহম্মদ খান সেলিমপুর অধিকার করেছেন। এই সময়েই তোড়রমল্ল প্রেরিত সেনা-কর্তৃক মামুদ খাঁ (মুহম্মদ খাঁ) নিহত হন। অপরদিকে মোগল সৈন্যাদ্যক্ষ মুহম্মদ কুলী খান বরলাস সাতগাঁও-এর চল্লিশ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হলে আফগানরা সাতগাঁও থেকে পলায়ন করে। মোগল বাহিনী সাতগাঁও অধিকার করার পর সংবাদ এল যে দাউদের অগ্রতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শদাতা শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা "চতর" (যশোর) দেশের দিকে পলায়ন করছেন। (.....বহু ধনসম্পদ নিয়ে—বাঙলার ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩১১)। তখন মুহম্মদ কুলী খান পশ্চাধাবন করেও শ্রীহরিকে আর ধরতে পারলেন না। এই হচ্ছে প্রতাপাদিত্যের যশোর অঞ্চলের ভূম্যধিকারী হওয়ার কাহিনী। "আকবর নামা"র উল্লিখিত হয়েছে যে, *Mati who had brought together some of Doud's choice treasures*. অর্থাৎ 'মতি' নামধেয় জনৈক অলুগামী দায়ুদের কিছু সম্পত্তি সঙ্গে রেখেছিল। এই উদ্ধৃতি দেখিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ বলতে চান—অধিকাংশ সম্পত্তি মতির কাছেই গচ্ছিত ছিল। সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দায়ুদের সঙ্কটময় কালে তাঁর সমস্ত না হ'লেও অধিকাংশ ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে প্রতাপের পিতা শ্রীহরি এবং পিতৃব্য জানকীবল্লভ ভূম্যধিকারী হয়ে বসেন। কিন্তু, ঠিক এই ভাষায় এই সত্যকে প্রকাশ করতে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বার ভুঁইয়াদের কাহিনী লোকমুখে, পল্লীগীতিতে এবং কিংবদন্তীতে পল্লবিত হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কেউই তদানীন্তনকালে বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য তৎপর ছিলেন না। স্বাধীনতার বোধ—জাতিগতভাবে কারও-মধ্যে তখন আমরা প্রত্যক্ষ করি না। মোগলেরা বঙ্গদেশ যাদের কাছ থেকে দখল করেছে তারা বাঙালী নন, মোগলদেরই মত বিদেশী। আচার্য যদুনাথ এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন—if the Mughal who come in 1574 must be

called foreign invaders, so were the Karranis who come in 1550, and the Lohanis who were servants of the Karranis. প্রসঙ্গতঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্যও উদ্ধৃতি করা যায়—“যাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ঈশা খা, উসমান প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান। যে অর্থে মুঘলেরা বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এইসব পাঠানেরাও বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের খাতিরে বাংলার হিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া সাধারণ শত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বারো ভূঞার যুগ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালী জাতির বিদেশী মুঘল শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংগ্রামের যুগ এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।.....মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় হইতে বাংলার মুসলমান নবাবগণ বাংলা দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেদ নাই। সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যাহারা ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। সুতরাং হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনা মুঘলযুগের প্রারম্ভের ক্ষেত্রেও যেরূপ, ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতিহাসিক।”

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন কিন্তু তাঁকে যে ধরনের বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা পূর্বে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে (দ্রঃ—নব পর্যায় “ইতিহাস” পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য; শারদীয়া বহুমতী, ১৩৭৫, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এর “মহারাজ প্রতাপাদিত্য”) তাতে আচার্য যদুনাথ সরকার কথিত “সঙ্গীর্ণ দেশাভিমান-ই” স্তপ্রকট। প্রকৃত ইতিহাস এই কথাই বলে যে, তদানীন্তনকালে বঙ্গের স্বাধীনতার জ্ঞাত তথাকথিত বারভুঁঞাদের কেউই তৎপর ছিলেন না। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ভূতপূর্ব আমলা, কেউ বা ছিলেন ছোট বা বড় ভূম্যধিকারী। এক কথায়, অধিকাংশই ভুঁইফোড় জমিদার মাত্র। মোগল পাঠান দ্বন্দ্ব যখন চলেছে, তখনই তাদের তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হলেই এঁদের সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেত। অধিকাংশ জমিদারই হুরধিগম্য দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বা ব্রহ্মপুত্র তিস্তা এবং শ্রীহট্ট ত্রিপরার প্রত্যন্ত প্রদেশেই যে তৎপরতা প্রকাশ করেছেন—তার মধ্যে স্বার্থসিদ্ধিই সমধিক কাজ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের মত দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে লক্ষ্য করি না। অবশ্য স্বীকার্য যে এঁদের মধ্যে প্রকৃতই ক্ষমতাসালী ও বীরের দেখা মিলেছে। তদানীন্তন ভূম্যধিকারীদের মধ্যে প্রতাপের নেতৃত্ব অপরাপর ভূম্যধিকারীরা মেনে নিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ আমাদের নেই। আবুল ফজলের গ্রন্থে অগ্রাগ্র ভুঁইয়ার নামোল্লেখ থাকলেও প্রতাপের নেই। আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই এই অহুত্বের সঙ্গত কারণ স্বরূপ মনে করেন যে যশোররাজ যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়ে উঠবার পূর্বেই আবুলফজলের মৃত্যু হয় এবং তাঁর ‘আকবর নামা’ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ স্মরণ্য যে, আবুলফজল ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের রাজ্যাভ্যাস থেকে ১৬১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকাল যে সময়—

তৎকালেই বঙ্গের বিভিন্নাংশে একাধিক জমিদারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শক্তিত গোড়ের স্বতন্ত্রতা বা বাদশাহের স্ববাদের বিভিন্ন সময়ে সৈন্য পাঠিয়েছেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষও হয়েছে। এইসব পাঠিয়েছেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষও হয়েছে। এইসব ভূ-স্বামীদের প্রাপ্ত নামের মধ্যে রয়েছে ঈশা খাঁ ও পুত্র মুসা খাঁ, কেদার রায়, কহুলি, ওসমান, মাহমুদ খাঁ প্রভৃতির নাম। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তথা যুদ্ধকুশলী ছিলেন ঈশা খাঁ এবং তাঁর নেতৃত্ব প্রায় সকলেই মেনে চলতেন। আর মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় নিতেন। ‘এই নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে যে প্রতাপাদিত্য ‘একচ্ছন্দস্তমো হস্তির’ মত বিরাজ করতেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না—জনশ্রুতি যাই বলুক না কেন’ (ড্র—শারদীয়া কম্পাস, ১৩৭৩, পৃ: ১১৩৭)।

এইকালের ভূঁইয়ারা সম্পদ ও রাজ্যবৃদ্ধির জন্ত সৈন্য রেখেছেন, কখনও দিল্লীর আয়ুগতা স্বীকার করেছেন, প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছেন, আবার নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছেন। কিন্তু কেউই একত্র হয়ে স্বাধীনতার জন্য মোগলের বিপক্ষে সমরভিযান চালান নি।

পূর্বে উল্লিখিত বিদ্বানদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে “বাংলা দেশে মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়ানো এবং তার জন্ত অশেষ লাঞ্ছনাভোগ ও পরিশেষে মৃত্যুবরণ এই হল প্রতাপাদিত্যের প্রধান ঐতিহাসিক ভূমিকা” (ইতিহাস পত্রিকা, ঐ, পৃ: ৩০৬)। কিন্তু আমাদের ইতিহাস অনুশীলনের মানস “যশোহর-খুলনার ইতিহাস” রচয়িতা সতীশচন্দ্র মিত্র’র কাল থেকে অনেকখানি বিবর্তন হয়েছে। পাঠানের অধীনে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা-ই ছিল দায়ুদ বা অগ্ন্যন্ত ভূঁইয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বাস্তবে দেখি, প্রতাপ যে দিকে সামরিক পাল্লা ভারী—সেই মোগলদের পক্ষ-ই নিয়েছিলেন। প্রকৃত স্বাধীনতাকামীরা পক্ষে প্রতাপের মত উদ্ভিগ্নার যুদ্ধে মোগলের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব। বিশেষ করে মোগল-শক্তি যেখানে সর্বাংশে বঙ্গের সম্মিলিত ভূ-স্বামীদের শক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত-প্রস্তাবে, মোগলের বিরুদ্ধে প্রতাপের যে সংগ্রাম, তা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ-ই। নিজে তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেননি বা স্বাধীনতা ঘোষণা করে আক্রান্তও হননি। বসন্ত রায়ের (জানকীবল্লভ) হত্যার পরই কচু রায়-এর অভিযোগ-ক্রমে মানসিংহ তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ওসমান, মগ, কেদার রায়, মুসা খাঁ প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে মানসিং প্রথমে অবস্থাটা আয়ত্তে আনেন এবং পরে প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাতে প্রতাপের পরাজয় ঘটে এবং কচুরায়কে রাজ্যাংশ প্রত্যাপণ করে সন্ধি করতে হয়। আকবরের মৃত্যুর পর কেন্দ্রের দুর্বলতার স্বযোগে তিনি সন্ধির সর্ব ভঙ্গ করে নিজের কিছু স্ববিধা করে নেবার ফিকিরে ছিলেন। কিন্তু ইসলাম খার আগমনের পরই সম্ভবতঃ ভীত হন, আর সেকারণে পুত্রকে ঢাকায় পাঠান। কিন্তু বিশেষ সফলকাম না হওয়ায় নিজেই অর্থ, উপঢৌকন প্রভৃতি নিয়ে ইসলাম খাঁর সঙ্গে দেখা করেন (২৬শে এপ্রিল, ১৬০২ খ্রি:) ৪০০ রণতরী ও সৈন্য পাঠিয়ে ভাটি অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে বাদশাহী “নাওয়ারা” ও মোগল-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তন করে প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর হলেন না। অপর পক্ষে, যখন মুসা খাঁ ও অগ্ন্যন্ত ভূঁইয়া ইসলাম খাঁর অভিযানে বশ্তা-স্বীকার করল, তখনই প্রতাপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্ত অল্পতপ্ত-চিত্তে ক্ষমা চেয়ে পুত্রকে (সংগ্রামাদিত্য) ৮০টি রণতরী সহ পাঠালেন।

কিন্তু ইসলাম খাঁর মন আর তাতে ভিজলো না। তিনি রণতরীগুলি ধ্বংস করলেন এবং তখনই আরম্ভ হয় প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান। ইহা-ই হচ্ছে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। সালিখা'র প্রথম যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন প্রতাপ নয়, পুত্র—উদয়াদিত্য। ফল—শোচনীয় পরাজয়। শেষ যুদ্ধ—ধুমঘাটের অদূরে—“খাগড়াঘাট”—এ। প্রথমেই পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্বল্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, প্রতাপ এমন একটিও যুদ্ধ মোগলের বিরুদ্ধে করেননি যাতে প্রকৃতই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতাপ ‘বিরোহী বীর’ অথচ সমসাময়িক রচনাবলীতে এমন কোনও সংগ্রামের পরিচয় আমরা পাইনি না যাতে তিনি বীরোচিত সংগ্রাম করেছেন সেই ‘মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে’, এ কেমন কথা! তাঁর পুত্রও তো কোথাও জয়ী হতে পারেননি। শেষ যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়ের মুহূর্তে জামাল খাঁ মোগল-পক্ষে যোগ দিয়েছেন। একবারও প্রতাপ অগ্রবর্তী হয়ে মোগল-শক্তিকে আক্রমণ করেননি। দু’বার আত্মরক্ষার্থে ক্ষীণ প্রতিরোধ করেছেন মাত্র, কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। পুনরুজ্জীবিত প্রয়োজন হচ্ছে, তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাতে পারেননি; তেমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও আমরা পাইনি। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোগল স্ববাদারকে সাহায্য করবেন বলেই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। (দ্রঃ—বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২১৭।) পুত্র, সৈন্য ও সেনাপতিগণ যখন যুদ্ধে রত, তিনি তখন দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করছেন। শুধু তা’-ই নয়, তিনি যদি যুদ্ধ-কুশলীই হবেন তবে ইচ্ছামতী’র মত শীর্ণকায়া ও অসংখ্য বাঁকে পূর্ণ নদীতে ঘুরাব-শ্রেণীর বৃহদায়তনের সামরিক নৌ-যান বহাল রাখতেন না। স্থল-সৈন্তের অক্ষমতায় মোগল স্থলবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে যখন প্রতাপের নৌ বাহিনীর অন্তর্গত ঘুরাবশ্রেণীর কোনও নৌ যান মোগলের অধিকারে এসেছে তখন নদী বক্ষের এক বৃহত্তম অংশই গিয়েছে তাদের দখলে। এই শ্রেণীর নৌ যান নদীবক্ষে অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকে এবং ইচ্ছামতীর বক্ষে এমন কোনও সংগ্রামের মুহূর্তে যথেষ্ট ও সঠিকভাবে চলাচল করতে পারত না। (দ্রঃ—History of Bengali, Dacca University, vol 11, pp 267) এই কারণেই প্রতাপের বিপক্ষে মোগলের জয় অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। বক্ষমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই বলা যেতে পারে, যে, পূর্বে উক্ত বিদ্বানদের মতামতসম্মতী তাঁর বিস্তৃত রাজ্য ও বিপুল রণসম্ভার (!) দেশরক্ষা তথা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যপথে কোন কাজেই লাগে নি। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মৌলবী বাজারের সন্নিকটে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে কতলু খাঁ’র ভাগিনেয় ওসমান খাঁ যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপকে ‘বীর’—এই আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ জাগে। (১)

আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর পূর্বে পরলোকগত ডঃ যদুনাথ সরকার রাজ্যবর্ধন নিহন্তা শশাঙ্কের ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয় স্থানে তৎপর রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের ‘বাংলার ইতিহাস ১ম খণ্ড’র সমালোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন। ২। অবশ্য আজও সঠিকরূপে নির্ধারিত হয় নি, কিভাবে শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছিলেন এবং শশাঙ্কের ব্যক্তিগত দায়িত্ব তাতে কতখানি। যদুনাথের মন্তব্য এইরূপ :—গৌড়রাজ, শশাঙ্ক থানেশ্বরের সন্ন্যাসী রাজ্যবর্ধনকে গোপনে নিহত করেন, বাণভট্টের এই উক্তি আধুনিক বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ জাতীয় আত্মমর্যাদার পুনঃস্থাপনের জন্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কেন? ইংরাজীতে একটি ব্যঙ্গ উক্তি আছে, যে প্রাচীন রোমের

শাসনকর্তা জুলিয়াস সিজর আদিম ফ্রান্সের স্বদেশী বীর ভার্গিস্ গোটোরিককে বন্দী করেন বলিয়া ঘটনার ১৯০০ বৎসর পরে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের নেতাগণ সেই ঐতিহাসিক অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত আধুনিক রোমের শাসনকর্তা পোপের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছেন। স্বদেশপ্রিয় বাঙ্গালী কি সেইরূপ কিছু করতে বাধ্য?” তিনি বার-ভুঁইয়াদের সম্পর্কে আরও বলেছেন—“এঁদের সম্বন্ধে যে এতটা বাড়াবাড়ি করা হয়, এঁদেরকে যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বলে চিত্রিত করা হয় তার মূলে আছে একটা ভিত্তিহীন সঙ্কীর্ণ দেশাভিমান।”

একজন প্রাচীন ইতিহাস বেত্তা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতাপ সম্পর্কীয় মন্তব্য এইরূপ—
“প্রকৃত বীর বা দেশনায়কের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যিক, প্রতাপাদিত্যে তাহার কিছুই ছিল না। তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্ত খুল্লাতাত বসন্ত রায়কে স্বহস্তে এবং আশ্রয় ভিক্ষার্থী কার্তালোকে ঘাতক দ্বারা ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছেন; প্রবাদে বিশ্বাস করিতে হইলে স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদ করাইয়াছেন। দাতা ছিলেন বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন না এই গুণে অমানুষিক নির্দয়তা উপেক্ষিত হইতে পারে না। বীরধর্ম ও কাপুরুষতায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ বীরের অভাবেই আমরা প্রতাপাদিত্যে সন্দেহ থাকি।” (মধ্যযুগে বাঙ্গালা, পৃ: ১৩৩-৩৪)।

এই প্রতাপকে একদা মেবারের মহারাণা প্রতাপের সঙ্গে তুলনা করা হলে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছিলেন—The height of absurdity is reached where our dramatist calls Pratapaditya of Jessore as the counterpart of Maharana Pratap Singh of Mewar. It is therefore necessary to debunk this Bengali here by turning the dry light of history on him. প্রতাপ সম্পর্কীয় আলোচনায় ইতি টানবার পূর্বে যদুনাথ সরকারের আর একটু মন্তব্য উল্লেখ করি :—

If we call such a man “The Pratab Singh of Bengal,” then we must admit that the great hero of Haldighat in his transition to Bengal

Has suffered a sea change

Into some thing mean and strange.

একথা সর্বদাই স্মর্তব্য যে, ঐতিহাসিকের একমাত্র দায়িত্ব সত্যকেই প্রকাশ করা, বিশেষ কোন ও মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। তন্নিম্ন, বাঙ্গালীর আত্মসম্মানকে উজ্জীবিত করবার জন্ত (অবশ্যই এই বিশ শতকের সপ্তম দশকে) কাল্পনিক কোনও আদর্শ বীরপুরুষ সৃষ্টি করাও ঐতিহাসিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

(১) ওসমান উড়িষ্কায়া, ফতাবাদে (ফরিদপুর), মৈমনসিংহে এবং শ্রীহট্টে মোগল কর্তৃক উপকৃত ও পশ্চাদ্ধাবিত হয়েও বশতা স্বীকার করেন নি। মৌলবীবাজারের সন্নিকটবর্তী রণক্ষেত্রে এই যোদ্ধা হস্তীপৃষ্ঠে মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সময় তীরবিদ্ধ হয়ে যখন বামচক্ষু হারালেন, তখন বামহস্তে সেই তীর উপরে ফেলে দিলেন; তাতে দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও গেল। একহাতে দুই চক্ষু ঢেকে তিনি শত্রু ব্যূহের মধ্যে হস্তী চালনা করেছিলেন, স্বল্প ক্ষণের মধ্যেই বাকশক্তি হারিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে মৃত্যুর কোলে চলে পড়েন। (২) প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২২, পৃ: ৫৬৯।

পল্লী-সংগঠন ও রবীন্দ্রনাথ

অমিয়কিশোর মণ্ডল

গ্রামই বাংলার প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে গ্রামের উন্নতি সাধন সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন। এই সত্য উপলব্ধি করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন গিয়েছিলেন “ফিরে চল মাটির টানে—যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।” ও অঙ্কিত লিখেছেন “মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যে, এইখানেই প্রাণের নিকেতন, লক্ষ্মী এইখানেই তাঁর আসন সন্ধান করেন”।

সে প্রায় পয়ষট্টি বছর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন জমিদারীর ভার নিয়ে শিলাইদহে পদ্মানদীর পারে জমিদারীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩০ বৎসর। তিনি জমিদারী বিত্তা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—“রবীন্দ্রনাথ জমিদারী বিত্তায় ও বিষয় বুদ্ধিতে বাংলার জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন একথা পূর্বকার কোন জমিদারের মুখে শোনা।” এই সময় তিনি পল্লীগ্রামের আসল রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন। এই মানুষগুলো-যাদের রাস্তা তৈরী করে বাঁধতে বললে মনে করে সহরে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা করা হবে। এই মানুষগুলো যারা নিজেদের ঘরে আগুন লাগলে নিভোবার শক্তি পায় না, পাটায় জলের কুয়া তৈরী করে দিতে চাইলে এরা মনে করে ‘মাছের তেলে মাছ ভাজার ব্যবস্থা করা হবে।’ পল্লীগ্রামের এই পরিবেশ তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল। তাই তিনি বলেছিলেন—“আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের স্থখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেয়েছি। তখন পল্লী গ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে।.....গ্রামের লোকের খাণ্ড নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে—স্পর্শ করেছিল।.....আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম। আমার অন্তঃনিহিত গ্রাম্য-সংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।”

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে ভদ্রলোকেরা দেশের সাধারণ মানুষকে আপন ভাবতে পারে না। তাদের সাথে কোন মিলন হলে তা ভাবতে হবে অস্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ, (যাকে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ‘লোক সাধারণ’ বলেছেন) শক্তিশালী হয়ে উঠুক এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা। যদি তাদের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করতে হয় তা হলে এমন কাজ করা উচিত যাতে তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, “আর কোন দানই দান নয়, শক্তিদানই একমাত্র দান।” সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তিনি চেয়েছিলেন। এই জ্ঞত যে—এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা একটা যোগসূত্র রচনা করতে পারবে। ‘তাহাদের এলাকার দুঃখে যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত, এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন—সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে

সেই সময়টার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত।' এইখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গীর সংগে সে যুগের অধিকাংশ রাষ্ট্রনেতার দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার প্রসার ও সংযুক্তভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন এবং ঐক্য সাধন। এই আদর্শ সামনে রেখে তিনি পল্লী সংগঠনের কাজে লেগেছিলেন। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তার স্বল্প পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন ঠাকুর এণ্টেটের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। অভিপ্রেত কর্মে রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবরণী থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কৃষির উন্নতি ও সেই সাথে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদার ও ১৯০৭ সালে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়কে আমেরিকা পাঠিয়ে ছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখাবার জন্ত। শিক্ষা সমাপ্ত করে রথীন্দ্রনাথ বাবার সংগে গ্রাম্য সংগঠনের কাজে যোগ দিলেন। এই কাজে রবীন্দ্রনাথের অগ্ন্যাগ্ন সহযোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত এল, কে, এলমহাষ্ট্র ও শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন মহোদয়গণ। রথীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হতে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থির করেছিলেন কালিগ্রাম পরগণাতে। এখনকার প্রজারা গ্রামের প্রতিনিধি ও জমিদারের একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমিতি নির্বাচন করেছে। তার নাম হয়েছে 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। এই সভার প্রধান কাজ হল (১) কাজের প্রোগ্রাম করা ও (২) খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। এছাড়া জমিদারী পরিচালনায় কর্মচারীদের কোন দ্রুতি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে জানানো। এই সভার কাজ চালানোর জন্ত প্রজারা খাজনা আদায়ের সময় প্রতি টাকায় তিন পয়সা অতিরিক্ত খাজনা দিত। আদায়ী টাকা (যা বার্ষিক প্রায় ৫—৬ হাজার টাকা) সভার "সাধারণ ফাণ্ড"-এ জমা হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ এণ্টেট হতে আরো দু'হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হিতৈষী সভা গ্রামের শিক্ষা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বুজে যাওয়া মজা ভোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার, জঙ্গল পরিষ্কার, পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ প্রভৃতি কল্যাণ মূলক কাজে ব্রতী ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলুম। শিয়ালদহ কুঠি বাড়ীর সংলগ্ন কত জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়া সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষীরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু'একটা money crops করা যায় কি না পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষীদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখানো হল। শিলাইদহের দো-আঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি খাদ্য সামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্ত ছোট খাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরি গড়ে তুললুম। চাষীদের মধ্যে ক্রমশ উৎসাহ দেখা গেল। আলু, আখ, টমেটো ইত্যাদির চাষ ক্রমশ বাড়তে লাগল।" এ ছাড়া বাস্তব বাড়ী ও আইলে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতির চাষ, শিমূল, আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগানো, ট্রাক্টর দ্বারা জমির উন্নতি সাধন, চাষের আসরে চাষীদের কুটির শিল্পের কাজে লাগানো ইত্যাদি গঠন মূলক কাজে রবীন্দ্রনাথ সব সময় উৎসাহ দান করে এসেছেন। "কালিগ্রামে ভালো তাঁত ছিল না। মুসলমানদের

মধ্যে কয়েক ঘর জোলা ছিল; তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতের কাপড় বোনা শেখাবার জন্ত। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল সাধারণ ফাঁড়ের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়ন শিক্ষার স্কুল খোলা হল।” এ ছাড়া গ্রামে ধানভানার কল চালু রাখা, pottery এর কাজ শেখানো ও ছাতা তৈরীর কাজেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্ত কালিগ্রাম পরগণায় প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিসরে একটি হাইস্কুল খোলা হয়। ঋণগ্রস্ত পল্লীবাসীদের মহাজনদের কবল হতে মুক্ত করার জন্ত রবীন্দ্রনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন “বন্ধুবান্ধব ও হুঁ একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষিব্যাঙ্ক খুলে বসলেন.....নোবেল প্রাইজের ১০৮০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা। অথচ প্রজাদের হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুসী হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কি করবেন। সুরেন দাদা (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে।” এতে দুদিকেই উপকার হবে। তাই করা হল।.....কালিগ্রাম পরগণার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।.....ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরীব প্রজা প্রথম সুযোগ পেলে ঋণ মুক্ত হবার।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীদরদী মনের পরিচয়, ১৯১৫ সালে (ভাদ্র ১৩২২) বাঁকুড়ায় মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়কে লেখা তাঁর একটা চিঠিতে পাই—“পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে। নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে—এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি—আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলা যথেষ্ট রহিয়াছে। এই জন্ত কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নিয়ম বাধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সংগে কর্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্মচারীরা প্রজাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। এ সময়ে আমি যদি অতিশীঘ্র না যাই তবে অল্পতাপ করিতে হইবে। ইহার উপর গ্রামের ওলাউঠা ব্যপ্ত হইয়া পড়িতেছে—আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভাল রূপ প্রতিকার হইতে পারিবে।”

১৯১৫—১৬ সালে পল্লীর উন্নতি চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী শ্রীঅতুল সেনের প্রদত্ত তথ্যাবলী হতে কবি-নির্দিষ্ট কাজের পাঁচটি উদ্দেশ্যের কথা জানা যায়। উদ্দেশ্য গুলি হচ্ছে (১) যথাযোগ্য চিকিৎসা বিধান (২) প্রাথমিক শিক্ষা বিধান (৩) পাবলিক ওয়ার্কস অর্থাৎ কৃপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা (৫) মালিন্দী বিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

“প্রথমে কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে, পাতিমর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে। হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি বেডের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সংকল্পের ব্যয় ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও অংশত প্রজারা বহন করিতেন। খাজনায় টাকা পিছু এক আনা তিনি দিতেন প্রজারা দিতেন এক আনা। আর এক উপায়েও অর্থ সংগ্রহ হইত। আমাদের দেশের রীতি এই যে (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে) কোনও ব্যক্তি সামাজিক কোনও অপরাধ করিলে তাহাকে সামাজিক ভাবে বেশ কিছু অর্থ দণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হয়। সেই অর্থে একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় সাধারণ ফাণ্ডে সামান্য কিছু টাকা দিয়েই এই বিরাট ব্যয়ের হাত হইতে অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাইত। সাধারণ ফাণ্ডের টাকা এই সকল সংকল্পে ব্যয়িত হইত।”

নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে রাত্রির ও দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল। শিশু ও বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্ম দ্রুতাবিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল।

পাবলিক ওয়ার্কসের কাজ ব্যয় সাধ্য ছিল। তাই অতুলবাবু একটি স্বেচ্ছাসিদ্ধ পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংগতিসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে টাকা এবং দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে “জন” মজুরি আদায় করে কাজ হাসিল করতেন। এই ভাবে মাত্র সাত আট মাসের মধ্যে কালিগ্রাম পরগণায় বহু হাজার টাকার কাজ করা সম্ভব হয়েছিল।

গরীব প্রজাদের ঋণমুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল প্রাইজের সমস্ত টাকা পতিমরে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়ে হয়েছে। এ ছাড়া গরীব প্রজাদের এষ্টেট হতে শতকরা ২ টাকা হার সুদে ঋণ দেওয়া হত। ফসল কাটার পরে ও ঘরে তোলার আগেই ঐ ঋণ শোধ করে দিতে হত। সবক্ষেত্রে শতকরা তিনটাকা হারে সুদ মাফ করা হত। ফসলের দাম শোধ করে উদ্ধৃত টাকা প্রজারা ঘরে নিয়ে যেত। যে ক্ষেত্রে ঐ টাকায় টান পড়ত তাহা প্রায়ই মাফ করা হত। Bengal district gazatier Rajshahi (1916) নামক সরকারী report-এ আছে যে একমাসে এক বছর ৫৭০০০ টাকার বেশী মাফ করা হয়েছিল।

সালিশীর ব্যবস্থা ঠাকুর এষ্টেটে আগেও ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি যখন জমিদারের কাজ দেখতে আরম্ভ করেন তখনই তিনি সালিশী বিচারের প্রবর্তন করেন। এই কাজের দায়িত্ব অতুলবাবু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কালিগ্রাম পরগণায় গ্রহণ করেছিলেন। তাই “অনেক বৎসর এই পরগণা হইতে একটি মামলাও সদরে যাইতে পারে নাই।”

রবীন্দ্রনাথের জীবনীর সঙ্গে যাদের ভাল রকম পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে কত নীরবে কত ত্যাগ, কত দরদ দিয়ে তিনি গ্রামের লোকের দুঃস্থতার কথা চিন্তা করতেন। তিনি কোনদিন নিজের প্রচার চান নি। তাই এক জায়গায় তিনি লিখেছেন “আমার কাজকে আমি কোনমতেই প্রচার করতে চাই না; যে কাজ আমার জীবনের সাধনা তাহাকে বাহিরের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ধরা আমার সাধনার প্রতিকূল অর্থাৎ কাজের ক্ষতি হয়; নিজেরও” অন্তত তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন “মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষীর টাকা এবং এই চাষীরই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করেছে। এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায়

তোমাদের উপর রইল—নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটাই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে। আজকাল যে সমস্ত বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নেই, কিন্তু অনাহার থেকে দেশের লোককে যথা সম্ভব বাঁচানোই তোমাদের জীবনের ব্রত হবে। এতে তোমাদের নিজেদের যদি ক্ষতি হয় তাও স্বীকার করতে হবে।” আরেকটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—“দেশ যে আমাদের হয়নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীন। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, তাগের দ্বারা, তপস্কার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা আত্মীয় করে তুলিনি—একে অধিকার করতে পারিনি।” রবীন্দ্রনাথ দেশকে “অধিকার” করতে চেয়েছিলেন এবং আন্তরিক ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে দেশবাসীও এই সত্য উপলব্ধি করবে। রবীন্দ্রনাথের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সফল রূপায়ণের জন্ত তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। একটি প্রবন্ধে তিনি তাই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন—

“You know how for a long time I have been cherishing my hope of establishing an ideal centre of education at Sriniketan—an ideal which is not curtailed to the strictest measure of a narrow village environment, which is not specially set apart to be doled out as a famine ration, carefully calculated to be just good enough for an emaciated life and a dwarfed mentality.”

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে শ্রীযুক্ত এল. কে. এলমহাষ্টের পরিচালনায় পল্লীগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামীণ কৃষক ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্ত ও তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধনের জন্ত তিনি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করেন। যেমন (১) বনবল্লভপুরে, কৃষিক্ষেত্র কৃষকদের উন্নত পদ্ধতি শিক্ষা দিত। (২) পশুপালন বিভাগে উন্নত জাতের গরু মহিষ, হাঁস-মুরগীর চাষ করা হত। (৩) সমবায় বিভাগ। (৪) শিল্প সদন বিভাগ। (৫) জন স্বাস্থ্য বিভাগ। (৬) শিক্ষাসত্র বিভাগ

শিক্ষাসত্র বিভাগের মধ্যে আবার ছোট ছোট বিভাগে (ক) সাহিত্য সভা (খ) লোক শিক্ষা সংসদ (গ) ব্রতী বালক (ঘ) সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ সমস্তা ও অসুবিধাগুলি নির্ণয় করে তাঁর স্বল্প সমাধানের জন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে বহুবিধ প্রয়াসের মধ্যে নিজে ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষাসত্র বিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত এলমহাষ্টকে লিখেছেন “I myself attach more significance to the educational possibilities of Siksha-Satrs than to the school and college at Santiniketan which are every day becoming more and more like so many schools and colleges else where in this county; borrowed cages that treat the student's minds as captive birds, whose sole human value is judged accordingly to the mechanical repetition of lessons, prescribed by an educational dispensation foreign to the soil.”

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

Three Years in Europe (পু: অগ্রঃ) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৭২, পৃ: ৫০৩-৭।

এটি অজ্ঞাতনামা এক লেখকের ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা। (Three years in Europe, being Extracts From Letters sent from Europe. Calcutta, J. C. Bose & Co. 1872.) সম্ভবতঃ গ্রন্থটির লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত। লেখক তিনবছর ইউরোপ-ভ্রমণের সময় ভ্রাতাকে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন। কারণ ইংরাজ-জাতি সম্বন্ধে বাঙালীর মোহমুক্তি প্রয়োজন। একজন বাঙালী যদি ইংলণ্ডে গিয়ে তাদের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করেন, তবে আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়। অবশ্য ইংরাজদের কোন কোন জিনিষ লেখকের ভাল লাগেনি তার আলোচনা এ গ্রন্থে না থাকার জন্য বঙ্কিম অভিযোগ করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র এককালে ইংরেজীতে সাহিত্যকর্ম স্বরূপ করেছিলেন, তিনি যে পরে বাঙালীর ইংরেজী রচনার কি পরিমাণ বিরূপ ছিলেন, এখানে তার প্রমাণ আছে।—“লেখক মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালী হইয়া যিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করেন, আমরা যখন তাহার প্রশংসা করিব না, ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। স্বতরাং তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।”

সবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র লেখককে গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ—“যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা যাদৃশ মনোরঞ্জক এবং উপকারী, ইংরাজি অভিজ্ঞদিগের নিকট তাদৃশ নহে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছু কিছু জানেন, যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছুই জানেন না। বিলাত কি—মরুভূমি কি জলাশয়, ভূত প্রেত কি রাক্ষসের বাস, তাহার কিছুই জানেন না। অন্ততঃ গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি যে, বঙ্গভ্রমরীদিগে পাঠার্থে ইহা বাংলায় প্রচার করুন। তজ্জগৎ যে কিছু পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা কষ্টকর হইবে না; কষ্টকর হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালীদিগের মেয়ের এমন শক্তি হইয়াছে যে, এরূপ গ্রন্থ পড়িয়া মর্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বাংলায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে, তাঁহাদের শয়নগৃহের পূচ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত করায়। স্বতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে; কেন না সাহেব কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল ধরিবে?”

দয়্য (ধর্ম | ২৬) ॥

এই অধ্যায়ে দয়ার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দয়া ধর্মেরই অন্তর্গত। এবং দয়ার যথার্থ অনুশীলন হয় দানে। দান বলতে কেবলমাত্র অর্থদানই বোঝায় না। যার যা নেই, তাকে তাই দেওয়ার নামই দান। কিন্তু দান করার সময় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করা উচিত।

অযোগ্য দান সর্বনাশের মূল। এই প্রসঙ্গে গীতার উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু টীকাকাররা সেই উক্তির অনেকক্ষেত্রে যেসমস্ত সঙ্গীর্ণ অর্থ করা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তা সমর্থন করতে পারেন নি।

দাম্পত্য দণ্ডাবিধির আইন (লোকরহস্য) ॥

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে স্ত্রীস্বত্বরক্ষণী সভার সম্পাদিকা একজন শ্রীমতী অমৃতহৃন্দরী দাসীকে খাড়া করেছেন, তিনি নির্ধাতিত স্ত্রীজাতির পক্ষে কিছু আইন প্রণয়ন করেছেন। সেই আইন প্রধানতঃ স্বামীদের প্রতিই প্রযোজ্য হবে। আইনগ্রন্থের চিরাচরিত রীতি অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইংরাজীতে আইনগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, পরে বাংলায় তার ভাষ্য করেছেন। যদিও ইংরাজীর যথাযথ অনুবাদ করা হয়েছে, তবুও কোথাও কোথাও উভয়ের মধ্যে রসের বৈচিত্র্যসাধন করেছেন। যেমন—বর্ষ অধ্যায়ে—স্ত্রী-বিরোধিতার অপরাধ-এর ১৪নং ধারাটির ইংরাজী—

“14. The state shall in this code mean the married state only. এবং বাংলা অনুবাদে বঙ্কিম লিখেছেন—“১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)।”

প্রবন্ধটির সর্বত্রই হাক্কা রসিকতার মেজাজ।

দ্বারকাবাস—শ্রমস্তুক (কৃঃ চঃ ২য় খণ্ড/৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥

দ্বারকায় কৃষ্ণ যখন বাস করতেন, তখন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। সকলের সঙ্গে সমানভাবে বাস করতেন। ‘শ্রমস্তুক’ নামক মণি অপহরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করে দেখান হয়েছে যে কৃষ্ণ কিরূপ নির্লোভ ও গ্রায়পরায়ণ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এই উপানথ্যানটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন নি।

তাবাপৃথিবী (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম) ॥

প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৬৬৩-৬৭।

দো—অর্থে পিতারূপ আকাশ, এবং পৃথিবীরূপিণী মাতা। এই দুইই সৃষ্টির মূল। পৃথিবীর অগ্রাগ্রদেশের আকাশ ও পৃথিবীকে পিতা-মাতারূপে পূজা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়স্তরের কবি (কৃঃ চঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড/৩য় পরিঃ) ।

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের প্রক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। এখানে পুনরায় তিনি দ্বিতীয়স্তরের কবিদের প্রক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এইসব কবির কৃষ্ণের ঈশ্বর অবতারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দুঃখ কি ? (ধর্মঃ/১ম অধ্যঃ) ॥

ধর্মতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে দুঃখ কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শিষ্য জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অরবস্ত্রের অভাবকেই দুঃখ বলে অভিহিত করতে চান, কিন্তু গুরু দুঃখের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে বলছেন। এই অধ্যায়ে অবশ্য কোন গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা করা হয়নি। সহজ ভঙ্গীতে কিছু কথোপকথন সন্নিবেশিত হয়েছে।

দুর্গা (পুঃ অগ্রঃ) ।

প্রঃ প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃঃ ৪৯-৫৩।

দুর্গা আমাদের দেশের বহুপূজিত দেবী। কিন্তু এই দেবীর উৎপত্তি-ইতিহাস কি? বঙ্কিমচন্দ্র

এখানে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। বেদের বাক্তিসূক্ত উদ্ধার করে তিনি বলেছেন, এই বাক্তিই কি দুর্গা? এছাড়া আরও কয়েকস্থানে দুর্গার মত কয়েকটি দেবীর উল্লেখ আছে। কিন্তু শেষপর্বন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কোন সিদ্ধান্তে আসেননি। তিনি প্রথমে বলেই দিয়েছেন যে যারা এ সম্বন্ধে গবেষণা করবেন, এ প্রবন্ধে তাঁদের পথনির্দেশ করবে।

দুর্গোৎসব (গল্প-পত্ৰ বা কবি: পুং) ॥

প্রথম প্রকাশ—‘বঙ্গদর্শন’ ভাদ্র ১২৮৫, পৃ: ২০২-২০৯।

এটি বাংলাদেশে দুর্গোৎসবের ব্যঙ্গপূর্ণ একটি কবিতা। দুর্গতিনাশিনী দুর্গের পূজা আমরা করি, কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান দুর্গতির আর অন্ত নেই। কবি সেই দুর্গতির বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলেছেন—“এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।” ছন্দের নিয়ম লঙ্ঘন করে ও কতকগুলি শব্দের বিকৃতি ঘটিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। একস্থানে দুর্গার শক্তির প্রতি কিছুটা বিশ্বাসস্থাপন করেও পুনরায় অবিশ্বাসের রাজ্যে ফিরে গেছেন। সেই স্থানটি হল—

‘ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে

ঐশিকী মানসী শক্তি! তীব্র জ্যোতির্ময়ি!

বলি তো দিয়েছি স্থখ,

এখন বলি দিব দুখ,

শক্তিতে ইন্দ্রিয় জানি হইব বিজয়ী।

এ শক্তি দিতে কি পার?

ঠুসে তবে পাঁচটা মার,

প্রণাম্যি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।

নৈলে তুমি মাটির টিপি,

দশমীতে গলা টিপি,

তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সিদ্ধিরস্ত কই।

ঐটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায় যুগ্ময়ি!”

দুর্ঘোধন বধ (প্র চ: ৬ষ্ঠ খণ্ডাচম পরি:) ॥

ভীম দুর্ঘোধনকে গদাযুদ্ধে নিহত করেন। গদাযুদ্ধে কোমরের নীচে আঘাত করা অত্যাচার। কিন্তু ভীমকে পূর্বপ্রতিজ্ঞা-রক্ষার জগু উরুদেশে আঘাত করতে হল। উরুভঙ্গ হলে দুর্ঘোধন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কটুবাক্য বললেন। এখানে দুর্ঘোধন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাংশ কোন নিকৃষ্ট কবির রচনা বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন।

অতুলপ্রসাদের গান

সঙ্গীতের মূল্য যাচাই হয় ভাবীকালের কষ্টিপাথরে। কালজয়ী অমরতার মধ্যেই তার প্রতিষ্ঠা। অতুলপ্রসাদের গান সেদিক থেকে সার্থক সৃষ্টি। এতদিন পরেও তাঁর সঙ্গীত কোথাও এতটুকু স্নান হয় নি।

কবির যৌবনে সে গান রচিত হয়েছিল আজও তা ভাষার হয়ে আছে বাঙালীর ঘরে ঘরে সার্থক শিল্পীদের কণ্ঠে কণ্ঠে, সত্য সাধকের অন্তরে অন্তরে অতুলপ্রসাদের গান বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। সঙ্গীতের ভাঙারে এক অমূল্য সংযোজন।

অতুলপ্রসাদের একথানা মালা, যা আমরা লাভ করেছি শতবর্ষ আগে আজও তা সতেজ সুরভিত এবং এগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। শ্রষ্টার সার্থক দৃষ্টিতে যথার্থ সম্মান দিয়েই ভক্ত মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করে। মনে করাই ত উচিত।

যিনি সত্যকারের গীতিকার তিনি শুধু কাব্যাংশ লিখেই যবনিকা টানেন না। যথাযথ সুর সংযোজনা করে কাব্যরচনাকে অনির্বচনীয় করে তোলেন। কথা এবং সুরে হয় হরগৌরীর মিলন। অতুলপ্রসাদের গানে আছে সেই যুগলমিলনের আভাস। তাই বাইরের প্রকাশ এমন আন্তরিক এমন আঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা খুবই অল্প। মনে হয় দুইশতের বেশি নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি গান কাব্যসৌন্দর্যে সুরমাধুর্যে ও ছন্দবৈচিত্র্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এদিক থেকে অতুলপ্রসাদের গান অতুলনীয়।

সংখ্যার দিক থেকে সীমিত হলেও বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কিছু গান আমরা পাই। ধর্মসঙ্গীতের পর্যায়ে ‘কত গান ত হল গাওয়া’ ‘যখন তুমি গাওয়াও গান’ ‘আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে তোমার তরী’ ‘ক্ষুধিত হে শিব’ ‘তোমায় ঠাকুর বলব নিষ্ঠুর’ ‘নংসারে যদি নাহি পাই সাড়া’ ‘আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়’ ‘কে আবার বাজায় বাঁশি’ ‘চিন্তহুয়ার খুলবি কবে মা’ ‘তোমার কাছে আসব মাগো শিশুর মতো’ ইত্যাদি গানগুলি। প্রকৃতি পর্যায়ের মধ্যে ‘আইল আজি বসন্ত’ ‘আইল শীত ঋতু হেমন্তের পরে’ ‘মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে’ ‘মধুকালে এল হোলি’ ‘বাদল রুমরুমা কোলে’ ‘শ্রাবণ ফুলাতে বাদল রাতে’ ‘বধু এমন বাদলে তুমি কোথা’ ‘ঝরিছে বর সর গরকে গরগর’ ইত্যাদি গানগুলি স্মরণীয়।

প্রেম পর্যায়ের মধ্যে পাই ‘আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল হৃদর’ ‘বধূয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে’ ‘ক্রন্দসী পথচারিনী’ ‘তুমি মধুর অজ্ঞেয় নাচ গো রঙ্গে, ‘বধু ধর ধর মালা পর গলে’ ‘মোরা নাচি ফুলে ফুলে ফুলে ফুলে’ ‘কে তুমি বসি নদীফুলে একেলা’ ‘ওগো আমার নবীন শাখী’!

আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে মধ্য পাই 'ওহে জগতকারণ। একী নিয়ম তব' 'তোমারি উত্তানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া' 'আর কতকাল থাকব বসে' 'আমার মনের মন্দিরে এসো গো'।

স্বরের দিক থেকেও অতুলপ্রসাদের গান রীতিমত বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব আছে তেমনি লোকসঙ্গীতেরও। 'বধূয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' (বেহাগ) 'শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে' (মিয়ামল্লার) কী আর চাহিব বল (ভৈরবী) 'আইল আজি বসন্ত' (বসন্ত বাহার) 'ক্ষমিওহে শিব' ইত্যাদি গানগুলিতে উদ্দামসঙ্গীতের প্রভাব আছে। আর লোকসঙ্গীতের প্রভাব আছে মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে (বাউল) প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোলগো বধু এই (কীর্তনান্দ) 'জল বলে চল মোর সাথে চল' (গজল) আপন কাজে অলস হলে' (সারিগান)।

তালের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে অতুলপ্রসাদের গানে শাস্ত্রীয় তালের প্রয়োগ এবং প্রচলন আছে। তার মধ্যে দাদরা, কাহরবা, ঝাঁপতাল, একতাল ত্রিতালের সংখ্যাই সর্বাধিক।

যাঁরা কবি, যাঁরা শ্রুষ্ঠা তারা সকলে সমগোত্রীয়। দেশ, কাল, জাত ধর্মের কোন বাধাকে তাঁরা স্বীকার করেন না। আর ভাবের ঘরে চুরিতে কোন অপরাধ নেই। কারণ একই প্রেরণা হতে উৎসারিত তাঁদের চিন্তাধারা, ভাবধারা এবং রসধারা প্রবাহমান। তাই অতুলপ্রসাদের গানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রভাব থাকলে তা নিজস্ব ছাতিতে জ্যোতিয়ান। অল্পকৃতি দোষণীয় কিন্তু অল্পভূতি করেন সাধকরাই।

যা চির সুন্দর তাই স্থায়ী আসন লাভ করে মানুষ্যের হৃদয়ে। সৃষ্টির সার্থকতা তো সেইখানেই। সঙ্গীতেই মানুষ্যের পরম শান্তি, সঙ্গীতেই তার চরম তৃপ্তি। অতুলপ্রসাদের গানে আছে সেই পরম শান্তি আর চরম তৃপ্তির সন্ধান। দেদীপ্যমান আলোকের মধ্যেও সেই দীপশিখা আজও তার পরিপূর্ণতা নিয়ে জাজ্বল্যমান সম্পূর্ণতা নিয়ে প্রকাশমান।

মানুষ্যের মুক্তিযজ্ঞে তিনি নৈবেদ্য সাজিয়েছেন ধোড়শোপচারে নয় সামান্য দুইশত গানের ডালি দিয়ে। আপন মহিমায় তা তেজদীপ্ত হয়ে আজও বিরাজমান।

প্রকাশের মধ্যে যে আনন্দ, উদ্ঘাটনের মধ্যে যে আত্মনিবেদন তাই ত মানুষ্যের চিরজীবনের সাধনা। অতুলপ্রসাদের গান সেই সাধনালব্ধ ধন। কারোর অহুরোধে নয়, অর্থের প্রয়োজনে নয়, কর্মশেষে নয়, কেবলমাত্র প্রাণের তাগিদে, প্রেরণার উচ্ছলতায় আত্মপ্রকাশিত।

যুগ যুগ ধরে মানুষ্য অসীমের সাধনা করছে সীমার তীরে দাঁড়িয়ে। গীতিকার অতুলপ্রসাদের গানে আছে তাঁরই সাধনা। আমরা সেই স্বরে নিজেদের জীবনতন্ত্রী যদি বেঁধে নিতে পারি তাহলে আমরা ধন্য হবো, মুক্ত হব, সিদ্ধিলাভ করতে পারবো।

শৈলেশ ভট্ট

কখনো মুহূর্তের আলো। শিশির ভট্টাচার্য। বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-২
তিন টাকা।

কখনো মুহূর্তের আলো' শিশির ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল ১৩৭৪-৭৫। কখনো মুহূর্তের আলোয় কবি অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হন; যেহেতু 'আলোকিত চোখের উদ্ভাস | জীর্ণমন আলোড়িত করে। | বিদীর্ণ বিবরে— | ঘটে স্বর্ষপাত কোন | কখনো কখনো'।

শিশির ভট্টাচার্য মূলত রোমান্টিক ভাবনায় মগ্ন হতে প্রয়াসী। তাঁর ভাবনার মুখবোধ ক্ষেত্র বিশেষে পাঠকের ভালো লাগবার কথা : অকস্মাৎ | বৃষ্টি নেমেছিল কাল | অনেক রাত্তিরে। | আমার ঘরের পাশে | চাতালে টিনের ছাতে— | বাদল-মল্লারে তার | রিমঝিম সুর। | থমথম রাতের তিমিরে | মনে মনে খবর পেলাম | পথ চেয়ে আছ তুমি | হৃদয় শূন্যতা ছুঁয়ে আশ্চর্য শরীরে।' (তুমি কি আসনি), কিংবা 'এইখানে কুয়াশার এপারে | শীতের রাতের নৈঃশব্দে ডানা ভাসিয়ে | আত্মাকে শরীরের বাইরে নিয়ে আসা যায় | এবং ওপর থেকে মুগ্ধ বিষয়ে দেখা যায় | বিষন্ন জোছনায় মাথা | ঘুমন্ত পৃথিবী, নিজের দেহ, সবকিছু—দেখা যায়, | যদি ছাতে যাওয়া যায়।' (এই মুহূর্তে ছাতে গেলে)

'কখনো মুহূর্তের আলো' গ্রন্থের কবিতা সংখ্যা বত্রিশ। অগ্রগত কবিতাবলীর মধ্যে 'ছবি', 'বুকের মধ্যে পাগলাঘোড়া', 'অস্তিত্বের সেতুকাঁপে', 'তোমার মতো কিংবদন্তী', 'যদিও', 'তোমার স্মৃতির মতো' কিংবা 'স্মৃতিমহলের জায়গা নেই' এবং 'কোথায় যেন দিনের শুরু' কবির অগ্রতর বিশিষ্ট ভাবনার পরিচায়ক। 'কোথায় যেন দিনের শুরু' কিংবা 'এই তো আমার' কবিতার ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, অগ্রদিকে, আধুনিক তরুণ কবি হিসেবে সর্বাগ্রে যেটা আশা করা গিয়েছিল অর্থাৎ কবিতায় নতুন পরীক্ষার ব্রতে কবিকে ততখানি স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করা গেল না। সংযম কবিতার শরীরকে লাভণ্যে উদ্ভাসিত করে; আবেগ প্রধান থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে কবিতার টোটাল এফেক্টে, কিন্তু শিথিলতা কাব্যপাঠকের মনকে অপূর্ণ রাখে।

অজয় গুপ্ত-কৃত প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা মনোরম।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সমালোচনা : দুর্লভ এক খেলায় আমি ॥ ইন্দ্রনীল সেন ৩১৭

পরিবার পরিকল্পনা ক্রোড়পত্র : বিংশ শতাব্দীর একটি সমগ্রা ॥ কে কে শাহ ৩১৯

কার্তিক

প্রাচীন রোম ও মিউজিয়মের রূপকল্পনা ॥ তারাপদ সাতরা ৩৪৫

লোকশ্রুতির সংস্কৃতি বিশ্লেষণ ॥ গৌরাচাঁদ কুণ্ডু ৩৫১

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বৈষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৬৮

ভারতের চিরায়ত নৃত্য ॥ স্বভদ্রা প্রামাণিক ৩৭৩

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণাঙ্কমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ৩৮১

সমালোচনা : সমিহিত কোণ ॥ শোভন গুপ্ত ৩৮৩

অগ্রহায়ণ

ডঃ শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভেলকর ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩৯৫

মালিনী ও রবীন্দ্রনাট্যে গ্রীক প্রভাব প্রসঙ্গ ॥ পুলিন দাশ ৪০১

তিন প্রেমের কবিতা ॥ শকুন্তলা দেবী ৪১৬

অতন্ত্র সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেন ॥ স্বথরঞ্জন চক্রবর্তী ৪২৫

আলোচনা : প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যসংকলন ॥ বিদ্যুৎ মৈত্র ৪২৯

সমালোচনা : এপার বাংলা ওপার বাংলা ॥ অধীর দে ৪৩২

পৌষ

কীটসের কবিসত্তা ও সৌন্দর্যবোধ ॥ স্বরত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩৯

আচার্য যত্ননাথ সরকার ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৪৩

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মায়াকানন' ॥ স্বরেশপ্রসাদ নিয়োগী ৪৫৫

কথকের কথকতা ॥ স্বভদ্রা প্রামাণিক ৪৭১

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণাঙ্কমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ৪৭৩

সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ৪৭৭

মাঘ

মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওয়া ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৮৭

লোকগীতি ও শ্রীকৃষ্ণ ॥ গুরুপ্রসাদ রায় ৪৯৩

দীনবন্ধু এণ্ড্‌জ ও অত্যাচারিত পঞ্জাব ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু ৫০০

স্বপ্রাচীন বঙ্গভাষার কল্পিত রূপ ॥ রামপ্রসাদ মজুমদার ৫০৬

আদিত্য—মধু ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৫১৬

বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণাঙ্কমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ৫২০

আলোচনা : কবিনট জয়দেব ও নটী পদ্মাবতী ॥ বিদ্যুৎ মৈত্র ৫২১

সমালোচনা : সংগীতে স্নেহ ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৫২৪

ফাল্গুন

অলঙ্কার কথা ॥ ভোলানাথ ভট্টাচার্য ৫৩৫
 একটি হারানো প্রথা : একটি হারানো গান ॥ অজিতকুমার মিত্র ৫৪২
 বিজ্ঞানাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ স্বরেশপ্রসাদ নিয়োগী ৫৫১
 বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণাহুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৫৬২
 আলোচনা : দীনবন্ধু শতবার্ষিকী ॥ সব্যসাচী গুপ্ত ৫৬৯
 সমালোচনা : বিজ্ঞানাগর ॥ ভবতোষ দত্ত ৫৭১

চৈত্র

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ॥ গৌরানন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৫৭৯
 বিজ্ঞানাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ স্বরেশপ্রসাদ নিয়োগী ৫৮৯
 বঙ্গ-ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের স্থান ॥ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬০০
 পল্লী-সংগঠন ও রবীন্দ্রনাথ ॥ অমিয়কিশোর মণ্ডল ৬০৭
 বঙ্কিম উপন্যাসের বর্ণাহুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৬১৩
 আলোচনা : অতুলপ্রসাদের গান ॥ শৈলেশ ভট্ট ৬১৬
 সমালোচনা : কখনো মুহূর্তের আলো ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ৬১৮
 বার্ষিক স্মৃতি (মে ১৯৭০—এপ্রিল ১৯৭১) ✓

সমকালীন

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা
অষ্টাদশ বর্ষ ॥ মে ১৯৭০—এপ্রিল ১৯৭১
সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত



সূচী পত্র

বৈশাখ

- ডঃ রঘুবীর ॥ গৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত ১৭
নারী ॥ সম্বরণ রায় ২৬
বিলাত যাত্রার আদিপর্ব ॥ চণ্ডী লাহিড়ী ৩৫
বিস্মৃত সীতানাথ ঘোষ ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৪
অখ্‌তর নগর ॥ চিয়য় চট্টোপাধ্যায় ৫২
আলোচনা : মানবপ্রেমিক রাসেল ॥ সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ৫৫
সমালোচনা : বঙ্কিম অভিধান ॥ ভবতোষ দত্ত ৫৮

জ্যৈষ্ঠ

- মানবতাবাদী রাসেলের বিজ্ঞান-চিন্তা ॥ অমিয়কুমার মজুমদার ৭৩
ভাষার আলোকে ছতোম প্যাচার নকশা ও হরিদাসের গুপ্তকথা ॥ নবেন্দু সেন ৮১
সুখের আখড়াই ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৯৩
দেশ কাল সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভূমিকা ॥ রণজিৎকুমার সেন ১০০
বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণাহুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ১০৫
সমালোচনা : সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ ॥ তারাপদ পাল ১০৯
প্রথম মুখ ও আলোকিত অন্ধকারে ॥ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ১১১

আষাঢ়

বাংলাদেশে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান ॥ দেবকুমার চক্রবর্তী ১২১
 ভূগোলের উপেক্ষিতা ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ১২৭
 তুর্কী আমলে বাংলাদেশ ॥ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৩১
 জীবনানন্দের কবিতা ও সেলুলয়েড ॥ স্বথরঞ্জন চক্রবর্তী ১৩৬
 লোকদেবতা ও লোকসাহিত্য ॥ অজিতকুমার মিত্র ১৪২
 বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণাত্মকমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ১৫১
সমালোচনা : দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময় ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৫২

শ্রাবণ

মিউজিয়ামের রূপকল্পনার ইতিহাস ॥ তারাপদ সাঁতরা ১৬২
 পেরুর আদিম ইতিহাস ॥ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৭
 জীবনী ও আত্মজীবনী ॥ মানসী দাশগুপ্ত ১৮৫
 অগ্নি দৃষ্টিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯১
 বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণাত্মকমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ১৯৪
আলোচনা : আশ্রমিক সংঘের রবীন্দ্রনাট্যোৎসব ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ১৯৮
সমালোচনা : সাহিত্যে শালীনতা ও অগ্ন্যাগ্নি প্রবন্ধ ॥ তারাপদ পাল ২০১

ভাদ্র

বিদ্যাসাগরের গল্প ষ্টাইল ॥ নবেন্দু সেন ২১৭
 রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব ॥ বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২২৬
 বাংলাসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান ॥ স্বথরঞ্জন চক্রবর্তী ২৩১
 বিভূতি মানসের ভূমিকা : দিনলিপি ॥ দীপক চন্দ্র ২৩৫
 হাওড়া জেলার প্রাচীন গ্রন্থ ও ভাষা ॥ রামপ্রসাদ মজুমদার ২৪০
 বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণাত্মকমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ২৪৪
সমালোচনা : জলছবি। নিঃশব্দ শব্দ ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ২৫৩

আশ্বিন

গঙ্গাধর কবিরাজ ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২৮১
 জন কোম্পানীর এক অধ্যাত বাঙালী কর্মচারী—রামচন্দ্র ॥ নারায়ণ দত্ত ২৮৯
 রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক এগুরুজ ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু ২৯৭
 আত্মজিজ্ঞাসা ॥ মানসী দাশগুপ্ত ৩০৩
 পুষ্পপট ॥ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৩০৯
 'পরধনে লোভে মত্ত' রাম শর্মা ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩১২